লোককথার সাতকাহন

সম্পাদনা

বরুণকুমার চক্রবর্তী

অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স

(প্রকাশন বিভাগ)

৭৩, মহাত্মা গান্ধি রোড

কলকাতা-৭০০ ০০৯

রেভারেণ্ড লালবিহারী দে
দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর
স্মৃতির উদ্দেশে

সম্পাদকের রচিত অথবা সম্পাদিত লোকসংস্কৃতি বিষয়ক গ্রন্থাবলী

১। বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস, ৬ষ্ঠ সংস্করণ।
২। বাংলা প্রবাদে স্থান কাল পাত্র, ৪র্থ সংস্করণ।
৩। লোকবিশ্বাস লোকসংস্কার, ৪র্থ সংস্করণ।
৪। প্রগল্প, ২য় সংস্করণ।
৫। বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ, ২য় সংস্করণ (সম্পাদিত)
৬। গীতিকা : স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য, ২য় সংস্করণ।
৭। তুলনামূলক লোকসংস্কৃতি (সম্পাদিত)
৮। বাংলাদেশে লোকসাহিত্য চর্চা (সম্পাদিত)
৯। প্রসঙ্গ : লোকপুরাণ।
১০। দৃষ্টান্ত বাক্য সংগ্রহ (উইলিয়ম মর্টনের, সম্পাদিত)
১১। বাংলার লোকক্রীড়া।
১২। লোকজ শিল্প।
১৩। লোক প্রযুক্তি।
১৪। লোক ঔষধ ও লোক চিকিৎসা।
১৫। লোক সংস্কৃতির সুলুক সন্ধানে, ২য় সংস্করণ।
১৬। ধাঁধা : স্বরূপ সন্ধান (সম্পাদিত)
১৭। প্রবাদ প্রসঙ্গ (সম্পাদিত)
১৮। বাংলার লোকসংস্কৃতি (দিব্যজ্যোতি মজুমদারের সঙ্গে সম্পাদিত)
১৯। লোকসংস্কৃতির সাতকাহন (বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত)
২০। Folk Literature of Bengal by Dinesh Ch. Sen (সম্পাদিত)
২১। Stalwarts of Bengali Folk Lore.
২২। লোকসংস্কৃতি : নানা প্রসঙ্গ, ২য় সংস্করণ।
২৩। লোকসংস্কৃতি ও নৃবিদ্যার অভিধান (সুমহান বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সম্পাদিত)
২৪। লোক উৎসব ও লোকদেবতা প্রসঙ্গ।
২৫। গ্রামীণ মানুষের জীবনগান টুসু।
২৬। Essays on Folkloristics.
২৭। লেটো
২৮। লোকসংস্কৃতি : প্রেরণা ও প্রেক্ষিত (বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত)

মুখপাত

'লোককথা' 'লোকসাহিত্য' সংসারের এক অতি মান্য সদস্য। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই মান্য সদস্যকে তার প্রাপ্য গুরুত্ব এ যাবৎকাল দেওয়া হয়নি। দু' বাংলাতেই লোককথার বিভিন্ন সংগ্রহ ও সংকলন প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু সংগৃহীত লোককথাগুলির সামগ্রিক বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা করা হয় নি। অবশ্য অধ্যাপক মযহারুল ইসলাম, দিব্যজ্যোতি মজুমদারের মত কতিপয় লোকসংস্কৃতিবিজ্ঞানী লোককথার বিশ্লেষণাত্মক আলোচনার প্রয়াস করেছেন বিশেষ বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণে। এঁদেরই উত্তরাধিকারী রূপে দেখা গেছে রীতা ঘোষ, অজন্তা মিত্রদেরও। যাইহোক, এই প্রেক্ষিতেই 'লোককথার সাতকাহনে'র পরিকল্পনা। আমরা লোককথাগুলিকে আলোচনার সুবিধার্থে কয়েকটি পর্যায়ে বিন্যস্ত করেছি। প্রথম পর্যায়েই লোককথার বিভিন্ন আঙ্গিকের প্রেক্ষিতটিকে উপস্থাপন করা হয়েছে। রূপকথা, পশুকথা, ব্রতকথা, হাসির গল্প, পরীকাহিনী, কিংবদন্তী, প্রবাদের গল্প, গীতিকার গল্প এসব বিষয়েই বিস্তারিত আলোচনা স্থান পেয়েছে।

দ্বিতীয় পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বিভিন্ন জনজাতিদের মধ্যে প্রচলিত লোককথা যেমন মেচ, লেপচা, ওরাওঁ, লোধা, শবর, মুণ্ডা, রাভা, টোটো, বাংলাদেশের প্রান্তিক নৃগোষ্ঠী ইত্যাদি।

তৃতীয় পর্যায়ে ভারতের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের লোককথা আলোচিত হয়েছে। অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে উল্লেখ্য হিমাচল প্রদেশ, ঝাড়খণ্ড, বিহার, আসাম, ত্রিপুরা ইত্যাদি।

বহির্ভারতীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে স্পেন, অস্ট্রেলিয়া ও বাংলাদেশের লোককথাও আলোচিত হয়েছে।

গ্রন্থটির বোধকরি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল বিভিন্ন পদ্ধতির প্রয়োগে লোককথার বিশ্লেষণ ও আলোচনা। রূপতাত্ত্বিক পদ্ধতি, ঐতিহাসিক ভৌগোলিক পদ্ধতি, জাতীয়তাবাদী পদ্ধতি, টাইপ মোটিফ ইনডেক্স পদ্ধতি, তুলনামূলক পদ্ধতি, মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতি, এমনকি একটি লোককথাকে বিভিন্ন পদ্ধতির সাহায্যে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে উপস্থাপন করা হয়েছে। Epic Laws এর নিরিখেও লোককথা ব্যাখ্যাত হয়েছে। লোককথার content নির্ভর আলোচনাও গ্রন্থটির একটি গুরুত্বপূর্ণ

অংশ। এই পর্যায়ে বেশ অনেকগুলি লেখা স্থান পেয়েছে যেমন ক্ষুদ্র তুচ্ছের জয়, ব্যভিচার, শ্রেণী চেতনা, প্রতিবাদ, নারীমন, মানবমনের ইচ্ছাপূরণ, জাদুবাস্তবতা, নারী নির্যাতন, পেশাজীবী প্রসঙ্গ, সামন্ত প্রভাব ইত্যাদি।

পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে লোককথার রাক্ষস ও ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমী শীর্ষক আলোচনা দুটি। বাংলাদেশে লোককথা চর্চার সংক্ষিপ্ত কিন্তু তথ্যবহুল ইতিহাস যেমন গ্রন্থভুক্ত হয়েছে, তেমনিই গ্রন্থভুক্ত হয়েছে লোককথা সংগ্রহে মিশনারী ও প্রশাসকের ভূমিকা প্রসঙ্গও।

আলোচকদের মধ্যে রয়েছেন প্রবীণ লোকসংস্কৃতিবিদ যেমন, তেমনিই নব প্রজন্মের একনিষ্ঠ গবেষকরাও। বিশেষভাবে উল্লেখ্য, বাংলাদেশের আটজন লোকসংস্কৃতিবিদ ও গবেষকদের আলোচনার অন্তর্ভুক্তি বর্তমান গ্রন্থটির গুরুত্ব অনেকখানি বৃদ্ধি করেছে।

বর্তমান গ্রন্থটির পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন লোককথা গবেষণায় নিবেদিত চিত্ত প্রবীণ লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানী দিব্যজ্যোতি মজুমদার মহাশয়। গ্রন্থটির প্রকাশ লগ্নে বিশেষভাবে তাই তাঁকে স্মরণ করি।

পাঠকদের দ্বারা গ্রন্থটি সমাদৃত হলেই সম্পাদক ও প্রকাশকের পরিকল্পনার সার্থকতা।

বরুণকুমার চক্রবর্তী

বিষয় সূচী

(ক) *বিভিন্ন আঙ্গিকের লোককথা* :

(খ) *বিভিন্ন জনজাতির লোককথা* :

(গ) [illegible]

(চ) *লোককথার বিষয় বিশ্লেষণ* :

(ছ) *বিবিধ* :

রূপকথার প্রসঙ্গ

বরুণকুমার চক্রবর্তী

রূপকথা বলতে সাধারণভাবে আমরা Fairy tales বা Marchen কেই বুঝে থাকি। তবে Fairy tales বলতে যে পরীকথার কথা বোঝায় তার সঙ্গে আমাদের রূপকথার মিল যত না, তার থেকে গরমিলই বেশি। ফেয়ারী টেলস্-এ ফেয়ারী থাকবে। ফেয়ারী মানে পরী সুন্দরী রমণী পাখীর মত দুটি ডানা সম্বলিত। আমাদের রূপকথায় কদাচিৎ পরীর সন্ধান মেলে। সাদা যাদু এবং কালো যাদু White magic এবং black magic এর মত দুষ্টু পরী ও ভাল পরী এই দুটি স্পষ্ট বিভাজন আছে। তবে সংখ্যাধিক্যে ভাল পরীরা এগিয়ে। এরা ক্লিষ্ট, নির্যাতিত, ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিতদের সহায়তা করে। অসহায় মানুষের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করে। Marchen এর সঙ্গে আমাদের রূপকথাগুলির গুণগত ও চরিত্রগত সাযুজ্য। কিরকম? Marchen সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'A marchen is a tale of some length involving a succession of motifs or episodes. It moves in an unreal world without definite locality or definite characters and is filled with the marvellous. In this never never land humble heroes kill adversaries, succeed Kingdom, and marry princesses.'

রূপকথাতেও একটি নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের গল্প থাকে আর সেই গল্পের কাঠামো তৈরি হয় কতকগুলি motif বা এপিসোডের সহায়তায়। রূপকথাতেও আখ্যানের যে প্রেক্ষাপটটি তা unreal. নির্দিষ্ট কোনো ভূখণ্ডকে বা স্থানকে চিহ্নিত করা সেখানে সম্ভব নয় এমনকি উত্থাপিত চরিত্রগুলিও হয় নৈর্ব্যক্তিক। কিছু কিছু ব্যতিক্রম যে নেই তা নয় যেমন লালকমল নীলকমল, মধুমালা ইত্যাদি। তবে এগুলি ব্যতিক্রমই। রূপকথার চরিত্রগুলি সাধারণভাবে নৈর্ব্যক্তিকই হয়। এগুলি বিশেষের পরিবর্তে নির্বিশেষ। রূপকথায় বিস্ময় ও চমৎকারিত্বের সব উপাদান মজুত থাকে। রূপকথার নায়ক প্রতিকূলতাকে, শত্রুকে নিঃশেষিত করে সুখে শান্তিতে সংসারযাত্রা নির্বাহ করে। মোটের ওপর পরিণতি হয় মিলনান্তক happy end দেখা যায়। যদিও marchen জার্মানিতে লভ্য, কিন্তু আমাদের রূপকথার সঙ্গে তার মিল অনেকখানি। নামে কি বা আসে যায়? মানুষ বাস্তবে কি চায়, চায় সুখের জীবন, অভিলষিত লক্ষ্যে উপনীত হতে ঈপ্সিত সাফল্যের অধিকারী হতে। কিন্তু বাস্তব যে বড় রূঢ়, বড় নির্মম তা যে ঘাতপ্রতিঘাতময়। আনুকূল্যের তুলনায় প্রতিকূলতার পরিমাণই যে অধিক। প্রকৃতপক্ষে

বাস্তবজীবন সেদিক দিয়ে মানুষের কাছে কখনই আদর্শ হতে পারে না। কিন্তু মানুষ যে নাছোড়বান্দা, সহজে হার মানার পাত্র নয়। তাই সে তার মনোবাসনা চরিতার্থতার বিকল্প ব্যবস্থা করেছে, এই বিকল্প হল রূপকথা। রূপকথা মাত্রই মিলনান্তক, আমরা কেই বা বিয়োগান্ত পরিণতির জন্য ব্যাকুলতা বোধ করি যতই কেন বলি 'our sweetest songs are those that tell of saddest thought.'

রূপকথায় যেসব প্রতিকূলতার পরিচয় পাই সব বাস্তব, নিদারুণভাবে সত্য। বিমাতার সতীন কন্যাদের প্রতি অমানবিক ও নির্মম আচরণ সত্য, রাজা দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহের পর প্রথমা পত্নীর সন্তানের প্রতি দায়বদ্ধতা বিস্মৃত হন, চালিত হন দ্বিতীয়া পত্নীর দ্বারা, পরিণামে প্রথমা স্ত্রীর সন্তানের জীবন হয়ে ওঠে দুর্বিষহ। সন্তানহীন রাজার সন্তানের জন্য ব্যাকুলতা সত্য, সত্য সন্ন্যাসী প্রদত্ত ফল বা শিকড় রানীদের মধ্যে সমান ভাবে বণ্টন না করা, বিশেষত ছোট রানীকে বঞ্চিত করার উদ্যোগ বা অভিসন্ধি তাও সত্য কেননা মানুষ সাধারণত পরশ্রীকাতর, আত্মকেন্দ্রিক ও স্বার্থপরই হয়। রাজা কিংবা তাঁর প্রিয়জন নিদারুণ অসুস্থতার শিকার হন। নানা চেষ্টাতেও নিরাময় লাভ ঘটে না। এতসব নেতিবাচকতা কিংবা প্রতিকূলতা নিয়েই আমাদের জীবন। কিন্তু বাস্তবে তো আমরা এসব থেকে রেহাই চাই, মুক্তি চাই। মানুষ তাই আশ্রয় নিয়েছে কল্পনার যার পরিণতিতে রূপ পেয়েছে রূপকথা যেখানে শেষ পর্যন্ত সব মুশকিলের আসান ঘটেছে, অপারগ মানুষ আশ্রয় নিয়েছে অলৌকিকত্বের, যাদুশক্তির। সে যুক্তি দিয়ে বিশ্বাস করে যদি সৎ থাকা যায়, কারো ক্ষতি না করা হয়, যথাযথভাবে কর্তব্যপালন করা যায় তবে Poetic Justice লাভ হবেই। বাস্তবে তা যে সবসময় ঘটে এমন নয়। মানুষ তাই তার আশা পূরণ করেছে রূপকথার মধ্য দিয়ে। রূপকথা হল আশাপূরণের আখ্যান। ইচ্ছাপূরণের গল্প। সকল প্রতিকূলতাকে জয় করার নির্ঘোষ ঘোষণা। তাই অত্যাচারিতা কন্যার সহায়তায় আত্মপ্রকাশ করে দয়ালু পরী কিংবা সংবেদনশীল রাজকুমার। রাজার সন্তান লাভের বাসনা চরিতার্থতা লাভ করে সন্ন্যাসীর আনুকূল্যে। রাজা কিংবা তাঁর প্রিয়জনের দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময় লাভ করে দুরূহ দুর্গম স্থান থেকে আশাতীতভাবে প্রাপ্ত দ্রব্য বিশেষে। অন্যায়কারী শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ে, লাভ করে উপযুক্ত দণ্ড। নির্যাতিত পুরস্কৃত হয়, রাজকুমার প্রতিকূল শক্তিকে পর্যুদস্ত করে অন্তরীণ রাজকন্যার সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়। বিশ্বাসঘাতকের স্বরূপ উদঘাটিত হয়, সত্য গোপন থাকে না। জীবনের কণ্টকাকীর্ণ পথে রূপকথা তাই সাময়িকভাবে হলেও পথশ্রান্ত পথিকদের বৃক্ষচ্ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণের মত। বাস্তবের নেতিবাচকতাকে কল্পনায় ইতিবাচকতায় রূপান্তরিত করার আর এক নাম হল রূপকথা।

তাই বলে রূপকথাকে Like produces like তত্ত্বের আধারে ব্যাখ্যা করা যাবে না। যাদুক্রিয়ার ক্ষেত্রে এটি সত্য বলে গৃহীত হলেও রূপকথার সঙ্কটমোচনে, ঈপ্সিত

লক্ষে উপনীত হওয়ার ক্ষেত্রে বাস্তব জীবনে কোনোপ্রকার সহায়তা করে না, তা সাময়িকভাবে, ক্ষণিকভাবে মানসিক তৃপ্তিলাভের উপায় মাত্র। বাস্তবে যা মেলে না, রূপকথায় তাই মেলে। একদিক দিয়ে ব্রতের সঙ্গে রূপকথার কিছু সাযুজ্য রয়েছে। ব্রতে নির্দিষ্ট কিছু কৃত্যাদির কারণে ব্যবহারিক জীবনে কিছু প্রাপ্তি ঘটবে বলে মানুষ বিশ্বাস করে এবং তাই ব্রতানুষ্ঠানের আয়োজন করে। রূপকথায় তেমনি যে Poetic Justice বাস্তব জীবনে সচরাচর মেলে না, তারই প্রাপ্তির আয়োজন। বাংলা লোককথা পরিবারের সর্বাপেক্ষা সম্মানিত সদস্যরূপে যদি কাউকে অভিহিত করতে হয়, তবে তা হল রূপকথা। দীর্ঘকালাবধি লোককথা মাত্রকেই রূপকথা বা উপকথা বলে ভেবে আসা হয়েছে। রূপকথা এমন কতকগুলো বৈশিষ্ট্যের অধিকারী যেগুলো সচরাচর লোকপুরাণ কিংবা পশুকথায় মিলবে না। রূপকথা লোককথা পরিবারের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বের অধিকারী, ইতিমধ্যেই তা উল্লিখিত। রূপকথা তামাম লোককথার মধ্যে দীর্ঘতম রচনা এবং সর্বোত্তম রচনা। বস্তুতপক্ষে সাহিত্যগুণের নিরিখে রূপকথার জুড়ি মেলা ভার।

রূপকথা মাত্রই মিলনান্তক, কখনই তা বিয়োগান্তক পরিণতিকে স্বীকার করে না। রূপকথার শুরুতেই দেখি রাজা বিষণ্ণ কেননা তিনি সন্তানহীন। রাজবাড়ির নিম্নপদের কর্মীরাও রাজার মুখ সকালে দেখে না, কেননা আঁটকুড়ো রাজার মুখ দেখলে সারাটা দিন খারাপ যাবে। মর্যাদাহত রাজা সিদ্ধান্ত নেন, তিনি বনবাসী হবেন, রাজত্বে আর তাঁর কাজ নেই। কিন্তু সত্য সত্যই আর তাঁর রাজত্ব ত্যাগ করা হয়ে ওঠে না; কেননা ইতিমধ্যে কোনো সন্ন্যাসীর আবির্ভাব ঘটে যায়, যিনি রাজাকে আশ্বস্ত করেন তাঁর সন্তানলাভের ব্যাপারে। সন্ন্যাসী রাজার হাতে তুলে দেন একটি শিকড় বা একটি ফল কিংবা একটি পাখি। সন্ন্যাসীর পরামর্শ মতো রানিদের সেই শিকড় বা ফল কিংবা পাখির মাংস খাওয়ানো হয়, তাঁরা সন্তানসম্ভবা হন। রাজার মনস্কামনা চরিতার্থতা লাভ করে।

দেখা যায় এই শিকড় খাওয়া প্রসঙ্গে সতীন বিদ্বেষ। রাজার সব রানি শিকড়ের ভাগ পেলেও বঞ্চিতা হন ন রানি কিংবা ছোটোরানি। এদের কপালে জোটে শিল ধোওয়া জল। আর সেই জল খেয়ে এরা প্রসব করেন বিকৃত দর্শন জীব। কালে এরাই কিন্তু বাঞ্ছিত সাফল্য লাভ করে। ছোটোরানি কিংবা তার বিকৃত দর্শন সন্তানকে নিয়ে রাজার সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটে। দোষী রানিরা শাস্তিও পান।

রূপকথার আর একটি বৈশিষ্ট্য হল রাজার একমাত্র কন্যার বিবাহ নিয়ে হটকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ। রানি রাজাকে রাজকন্যার বিবাহ নিয়ে তাগাদা দিলে রাজামশাই হঠাৎই ঘোষণা করে বসেন—পরদিন সকালে প্রথমে যার মুখ দেখবেন, তার সঙ্গে রাজকন্যার বিবাহ দেবেন। দেখা যায় অতি সাধারণ কারও সঙ্গে হয়ত বা রাজকন্যার পরিণয় হল। রাজা পাত্রের ঠিকুজি কিংবা বংশপঞ্জি বিচার করেন না, প্রয়োজন বোধ করেন না তার

উপার্জনের হাল হকিকত জানতে। আপাতভাবে মনে হবে বুঝি বা পিতা হিসেবে রাজা তাঁর কর্তব্য পালনে অপারগ, তা কিন্তু নয়। আসলে রূপকথাগুলো সম্ভবত মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাকে আশ্রয় করে আত্মপ্রকাশ করেছিল। ফলে রাজকন্যা বিবাহের পর পিতৃগৃহেই থেকে যায়, পতিগৃহে তার যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। রাজা শুধু কন্যাকেই পাত্রের হাতে সমর্পণ করেন তা নয়, সেই সঙ্গে অর্ধেক রাজত্বও তিনি দিয়ে বসেন। ফলে রাজার জামাইয়ের আর্থিক সামর্থ্য নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন পড়ে না। যে সামাজিক প্রেক্ষিতে রূপকথাগুলো আত্মপ্রকাশ করেছে, সেখানে জাতপাত নিয়ে কারোর মাথাব্যথা ছিল না। তাই রাজাও পাত্রের কুল, গোত্র নিয়ে আগ্রহী নন।

অসহায় এক অভাগিনী রাজকন্যার সাক্ষাৎ মেলে রূপকথায়, আর মেলে রাক্ষসের সন্ধান। সে মাংস আহার করে। তবু রাজকন্যাকে খায় না, তাকে সে নিজগৃহে অন্তরীণ রাখে। রাজকুমারীর পায়ের কাছে পড়ে থাকে রূপার কাঠি, আর মাথার কাছে রাখা থাকে সোনার কাঠি। রূপার কাঠির স্পর্শে রাজকন্যা ঘুমিয়ে পড়ে, অপরপক্ষে সোনার কাঠির স্পর্শে তার ঘুম ভাঙে।

আসলে সোনার কাঠি রাজকন্যার চেতনাকে জাগ্রত করে, অন্যদিকে রূপার কাঠি চেতনার অবলুপ্তি ঘটায়। আপাতভাবে রাক্ষস চরিত্রটি অসম্ভব বলে মনে হবে; কিন্তু এটি মোটেই অবাস্তব চরিত্র নয়। নৃতাত্ত্বিকেরা যাকে Cannibal বলেন, এটি হল তাই। 'The ogre is nothing but the dead, who has been variously imagined by different people.' পৃথিবীর বুকে নরমাংস আহারকারী, সভ্যতার দিক থেকে পিছিয়ে থাকা আদিবাসীদের সন্ধান আজ আর মিলবে না। রূপকথার রাক্ষস তার রূপ পরিবর্তনে পটু শুধু তাই নয়, তার প্রাণ থাকে এমন সুরক্ষিত, যা সহজে বিনাশ হবার নয়। 'সোনার কাঠি রূপার কাঠি' গল্পে রাক্ষসদের প্রাণ কীভাবে সুরক্ষিত আছে এবং তাও বিনাশ করা যে সম্ভব তার হদিস দিয়েছে রাক্ষসি এক অসতর্ক মুহূর্তে। রাজকন্যাকে রাক্ষসি বলে, পুঁকুরে যেঁ ফঁটিক স্তঁম্ভ আঁছে, তাঁর মঁধ্যে এঁক সাঁতফণা সাঁপ আঁছে; এঁক নিঁঃশ্বাসে ঐ সোঁনার তাঁল গাঁছের তাঁলপত্র খাঁড়া পাঁড়িয়া যঁদি কোঁনো রাঁজপুত্র ফঁটিক স্তঁম্ভ হইতে সাঁপ বাঁহির কঁরিয়া বুঁকের উঁপর রাঁখিয়া কাঁটিতে পাঁরে, তঁবেই মোঁদের মঁরণ। কোনটিতে যদি এঁক ফোঁটা রঁক্ত পঁড়ে, তোঁ এঁক এঁক ফোঁটায় সাঁত সাঁত হাঁজার কঁরিয়া জঁন্ম নিঁবে।'

রাজপুত্র মাত্রই অসাধ্য সাধন করে অন্তরীণ রাজপুত্রীকে রক্ষা করে এবং তারা পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়।

রূপকথায় আমরা প্রায়শই সর্বপ্রাণবাদের প্রতিফলন লক্ষ করি। 'সোনার কাঠি রূপার কাঠি' গল্পে রাজপুত্র অনুসরণকারী রাক্ষসির হাত থেকে রক্ষা পেতে সম্মুখস্থ আমগাছের কাছে আবেদন জানিয়েছে—

'হে আমগাছ! যদি তুমি সত্যিকারের বৃক্ষ হও, রাক্ষসির হাত হইতে আমাকে রক্ষা

কর।' আমগাছ দুফাঁক হয়ে গিয়েছে এবং রাজপুত্র দিব্যি তার মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে। 'শীত বসন্ত' গল্পে দেখি বসন্ত বলেছে—

'হে বৃক্ষ, যদি সত্যিকারের বৃক্ষ হও, তো, তোমার কাপড় চোপড় আর তোমার রাজমুকুট আমাকে দাও।' বৃক্ষ বসন্তকে কাপড়চোপড় আর রাজমুকুট প্রদান করেছে। আসলে অতীতে মানুষ যখন ছিল শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যে বসবাসকারী, তখন বৃক্ষ তাকে দিয়েছে নিরাপদ আশ্রয়, মানুষ বৃক্ষের সেই সহায়তা বিস্মৃত হয় নি। রূপকথায় বৃক্ষের সেই মহান ভূমিকা পরিবর্তিতরূপে উপস্থাপিত হয়েছে।

রূপকথায় আমরা বেশকিছু motif বা অভিপ্রায়ের সন্ধান পাই। এগুলোর অন্যতম হল taboo বা নিষেধাজ্ঞা। 'সিদ্ধিলাভ' গল্পে সাধু রাজপুত্রকে উত্তর দিকে যেতে নিষেধ করেছিলেন। রাজপুত্র সেই আদেশ অমান্য করায় বিপদাপন্ন হয়েছিল। 'শঙ্খনাথ' গল্পে সন্ন্যাসী শঙ্খনাথকে দক্ষিণ দিকের দরজা খুলতে নিষেধ করেছিলেন। 'নরঘাতক সন্ন্যাসী' গল্পে সন্ন্যাসী জ্যেষ্ঠ কুমারকে বলেছেন, 'কাজের মধ্যে প্রতিদিন প্রাতে ফুল তুলিয়া আমার পূজায় সাহায্য করিবে। পশ্চিম দিকে যাওয়া ব্যতীত আর কোনো কার্যেরই নিষেধ নাই।' অর্থাৎ এই গল্পে পশ্চিম দিকে রাজপুত্রের গমন নিষিদ্ধ ছিল। লালবিহারী দে'র 'ফোকটেলস্ অব বেঙ্গল' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'স্ট্রাইক বাট হিয়ার' গল্পে ঘোড়া রাজাকে বিষমিশ্রিত জল খেতে নিষেধ করেছিল। 'দ্যা স্টোরি অব হীরামন' গল্পে দেখি যাত্রাপথে যাদু ঘোড়াকে একবারের অধিক চাবুক মারা নিষিদ্ধ ছিল, নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করায় ঘোড়া শক্তিহীন হয়ে পড়ে। 'দ্য বল্ড ওয়াইফ' গল্পে একশতের অধিক ডুব দেওয়া নিষিদ্ধ ছিল। 'কিরণমালা' গল্পে অরুণ বরুণ পেছনে তাকানোর ফলে পাথরে পরিণত হল, কেননা পেছনে তাদের তাকানো বারণ ছিল। কেবল নিষেধাজ্ঞাই নয়, আরও অনেক অভিপ্রায়ের সন্ধান মেলে রূপকথাগুলোতে। যেমন কথাবলা পাখি (talking bird, সি ৩৩১), কথা বলা শুক পাখি (বি ২১১.৩.৪), কথা বলা পশু (বি ২১০), উপকারী ঘোড়া (বি ৪০১), মানুষ খেকো নারী (জি ১১.৬), রূপ পরিবর্তন—মানুষ থেকে শুকপাখি (ডি. ১৫৭), মানুষ থেকে ডাইনী (ডি ৯৭), মানুষ থেকে বানর (ডি ১১৮.১), জীয়নকাঠি-মরণকাঠি (ই ৬৪.১.১), কনিষ্ঠ পুত্রের বিজয়ী হওয়া (Successful youngest son), অলৌকিকভাবে গর্ভসঞ্চার (Supernatural birth motif-টি ৫১০) ইত্যাদি।

আমরা দীর্ঘকাল ধরে রূপকথাকে শিশুমনের রোমান্স ভেবে এসেছি। এ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় শিশু তার মানসিক খোরাক পায় রূপকথার রাজ্যে। রাজপুত্রের সঙ্গে সে নিজেকে অভিন্ন কল্পনা করে নেয় এবং রাজকন্যার জন্য রাজপুত্রের প্রয়াসে সেও অংশীদার হয়ে পড়ে। মনে মনে রাজকন্যাকে লাভ করার স্বপ্নও হয়ত দেখে। কিন্তু তাই বলে আপাদমস্তক রূপকথাগুলো শিশু সাহিত্য নয়। সত্যি কথা বলতে কী রূপকথাগুলোর প্রকৃতি বিচার করলে এগুলো বয়স্কদের সাহিত্য বললে অত্যুক্তি হবে না। সমাজ জীবন, মানব চরিত্র, সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব ইত্যাদির সমাবেশ রূপকথাগুলোকে

যেমন বহুমাত্রিক করে তুলেছে, তেমনি এগুলোর শিশু সাহিত্য হওয়ার দাবিকেও অনেকখানি নস্যাৎ করে দিয়েছে। রূপকথার রাজকুমার অশেষ ক্লেশ স্বীকার করে, কারণ তার অন্তরের অমোঘ শক্তি হল প্রেম। এই শক্তির জোরেই সে সব প্রতিকূলতা অতিক্রম করে। শিশুর পক্ষে প্রেমের এই অমোঘ শক্তিকে অনুধাবন করা কী সম্ভব?

সিণ্ডেরেলার কাহিনীই হোক কিংবা সুখু দুখুর গল্পই হোক—সতীন বিদ্বেষ এবং তা থেকে সতীন পুত্রকন্যাদের প্রতি বিদ্বেষ সঞ্চারিত হয়েছে। শিশুদের পক্ষে এই সতীন বিদ্বেষ কিংবা সতীন পুত্রকন্যার প্রতি সৎ মায়ের বিদ্বেষের কারণ বোঝা সম্ভব নয়।

রূপকথায় যে কেবল অলৌকিক কল্পনার রাজকীয় আধিপত্য তা নয়, প্রাত্যহিক জীবনের অভিজ্ঞতাকেও এসব গল্পে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। 'কলাবতী রাজকন্যা' গল্পে বর্ণিত হয়েছে, 'আজ বড়ো রানি ভাত রাঁধিবেন, মেজরানি তরকারি কাটিবেন, সেজরানি ব্যঞ্জন রাঁধিবেন, ন-রানি জল তুলিবেন, কনে রানি যোগান দিবেন, দুয়োরানি বাটনা বাটিবেন, ছোটোরানি মাছ কুটিবেন। পাঁচরানি পাকশালে রহিলেন; ন'রানি কুয়োর পাড়ে গেলেন; ছোটোরানি পাঁশগাদার পাশে মাছ কুটিতে বসিলেন।' —কোথায় গেল রাজবাড়ি সুলভ পরিচারক-পরিচারিকার সমাবেশ কিংবা তাদের কর্মব্যস্ততা?

রূপকথায় ইচ্ছাপূরণের সহায়ক শক্তি রূপে স্বীকৃত হয়ে থাকে যাদুশক্তি। কি রকম? মানুষ যখন তার বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখে তার সারল্য, নিষ্ঠা, সততা, কর্মতৎপরতা এবং অন্যান্য নানাবিধ গুণাবলী থাকা সত্ত্বেও দৈহিক ও মানসিক পীড়নকে এড়াতে পারে না, ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হয়, তখন ভাগ্যের আনুকূল্যের ওপর ছেড়ে দিয়ে অপেক্ষমান থাকে সুবিচার লাভের আশায়। বাস্তব জীবনে দুরারোগ্য ব্যাধির উপশমে কিংবা নির্মূল করতে প্রচলিত চিকিৎসা পদ্ধতিগুলি ব্যর্থ হলে মানুষ দৈবীশক্তির শবণাপন্ন হয়। ভাবে অলৌকিকভাবে অলৌকিক শক্তির সহায়তায় মুক্তি ঘটবে। ঠিক তেমনি রূপকথায় প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির মোকাবিলায় কল্পনাপ্রবণ মানুষ আশ্রয় করেছে যাদুশক্তির ওপর। দীর্ঘদিনের অত্যাচার, শোষণ, পীড়ন, অবিচার, অনশন নিঃশেষিত হয় এখানে যাদুশক্তির সহায়তায়। কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাক। পৃথিবী বিখ্যাত Cinderella রূপকথাটিতে দেখি অত্যাচারিত সিণ্ডেরেলাকে সহায়তা করতে উপস্থিত হয়েছে পরীদের রানী। সে সিণ্ডেরেলাকে বলেছে তাদের বাগান থেকে একটি বড় দেখে লাউ নিয়ে আসতে। সিণ্ডেরেলা সেইমত একটি বড় লাউ এনেছে। পরী রানী লাউটিকে তার যাদু দণ্ডের স্পর্শে সোনার রথে পরিণত করেছে। শুধু কি তাই, ছয় ছয়টি ইঁদুরকে যাদুদণ্ডের স্পর্শে ঐ রথের সারথী করেছে। পরীদের রানীর কথামত সিণ্ডেরেলা বাগানে জল দেওয়ার ঝারির নীচ থেকে ছটি চামচিকে নিয়ে এসেছে। পরী রানী যাদুদণ্ডের স্পর্শে তাদের ছটি দারোয়ান বালকে পরিণত করেছে। Snow white গল্পেও দেখি যাদুর খেলা। রাজার দ্বিতীয় পরিণীতা

স্ত্রীর ছিল একটি যাদু আয়না। এই আয়নার কাছেই রানী জানতে চাইত তার থেকে সুন্দরী পৃথিবীতে কেউ আছে কিনা। যাদু আয়না এই প্রশ্নের দিব্যি জবাব দিত। এমন কী আয়নার মাধ্যমেই রানী জেনেছিল যে স্নো হোয়াইট বেঁচে আছে, শুধু তাই নয় সে অবস্থান করছে ছয় বামনের সঙ্গে। আয়নার কারণেই রানীর স্নো হোয়াইটের সন্ধান লাভ ঘটে। সব রূপকথাতেই প্রায় কমবেশি যাদুশক্তির ব্যবহার দেখা যায়। 'দি ইনডিজেন্ট ব্রাহ্মণ' গল্পে দুর্গাভক্ত ব্রাহ্মণকে শিবদুর্গা যাদু হাঁড়ি দিয়েছেন যা ওল্টালেই অফুরন্ত মুড়কি মিলবে। The story of Swet Basanta তে জেলে এক আশ্চর্য মাছ ধরেছে, যে মাছ খাবে সে হাসলে তার মুখ দিয়ে মানিক ঝরবে. কাঁদলে ঝরবে মুক্তো।

The story of Prince Sabur গল্পে বণিক ক্রীত বাক্সে রয়েছে যাদুপাখা। এই পাখায় ছোট মেয়ে হাওয়া খেতেই সবুজ রাজ হাজির হয়। The field of bones গল্পে চারবন্ধু গভীর বন মধ্যেকার মন্দিরে সাধুর কাছ থেকে যাদু শেখে। তার বলে বণিকের ছেলে হাড় জড়ো করতে শিখেছে, কোটালের ছেলে হাড় জোড়া দেওয়া শিখেছে, মন্ত্রীর ছেলে হাড়ে মাংস চামড়া গজিয়ে তোলা শিখেছে, আর রাজপুত্র শিখেছে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে। 'শীত বসন্ত' গল্পে ঋষির ঘাটে দুয়োরানির মাথায় ওষুধ টিপে সুয়োরানী তাকে টিয়া পাখিতে পরিণত করেছে। 'কলাবতী রাজকন্যা'য় সন্ন্যাসী প্রদও গাছের শিকড় খেয়ে রানীরা সন্তানবতী হয়েছে। গাছের শেকড় আর কিছু নয়, তা যাদু ওষুধ। 'ঘুমন্ত পুরী' গল্পে পদ্মফুলের মত ঘুমন্ত রাজকন্যার সোনার কাঠির স্পর্শে যাদু ঘুম ভেঙেছে। রাজপুত্রের বাবা কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয়ে গিয়েছিল, সোনার কাঠির ছোঁয়ায় তার অন্ধত্ব দূর হয়েছে। গল্পে বর্ণিত সোনার কাঠি রূপোর কাঠি আসলে যাদুদণ্ড। 'কিরণমালা' গল্পে হীরের গাছের সোনার পাখির কথায় জলের ছিটেফোঁটার কারণে বহু রাজপুত্র পুনর্জীবন লাভ করেছে। আসলে যাদুজলের কথা বলা হয়েছে। 'দেড় আঙ্গুলী' গল্পে পিম্পলকুমার থুথু দিয়ে রাজকন্যার অন্ধত্ব ঘুচিয়েছে। সেও তো যাদুশক্তির প্রভাবেই। জি. এইচ. ডামান্ট সংকলিত Bengali Folk lore from Dinajpur -এ ইণ্ডিয়ন এন্টিকোয়েরি পার্ট ৪এ সন্ন্যাসী কর্তৃক দুয়োরানীর ছেলেকে যাদু তরবারি প্রদত্ত হয়েছে। এই তরবারি শত্রুকে পরাস্ত করতে সক্ষম।

লক্ষণীয় যাদুশক্তি কেবল মানুষের কল্যাণকর্মেই নিয়োজিত হয়নি তার ক্ষতিকারক কাজেও ব্যবহৃত হয়েছে। তবে তুলনামূলকভাবে যাদুশক্তি যত না মানুষের অকল্যাণে ব্যবহৃত হয়েছে, তদপেক্ষা অনেক বেশি ব্যবহৃত হয়েছে মানব কল্যাণে, বিশেষত নির্যাতিত মানুষের আনুকূল্যে। মানুষ তার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন, সচেতন প্রতিকূলতার তীব্রতা ও গভীরতা সম্পর্কেও। সেই কারণেই প্রবল পরাক্রান্ত প্রতিকূল শক্তির মোকাবিলায় মানুষ কল্পনা করেছে যাদুশক্তির অব্যর্থ লক্ষ্যভেদী ভূমিকাকে। তার দুর্বলতাকে অতিক্রমণে যাদুশক্তি আত্মপ্রকাশ করেছে রূপকথাগুলিতে সহায়ক শক্তিরূপে।

শিশুসাহিত্য রূপেই সাধারণত বিবেচিত হয়ে আসছে রূপকথা। কেননা Juvenile Literature বা শিশুসাহিত্যে ফ্যান্টাসির রাজকীয় আধিপত্য। রূপকথাতেও তারই সাক্ষাৎ মেলে। পরিণত পাঠকদের সাহিত্যে সে সৃষ্টিধর্মিতা সৃজনশীলতার সমারোহ শিশু সাহিত্যে তার একান্তই অভাব। শিশুসাহিত্য হল বিশ্বাসের জগৎ। শিশুরা যেমন সহজ সরল সবকিছুকেই সে বিশ্বাস করে, সব কিছুকেই সত্য বলে মনে করে, রূপকথাতেও তারই হদিশ মেলে। এ এক স্বপ্নলোক যেখানে অসম্ভব বলে কিছু নেই। পাখী কথা বলে, পক্ষীরাজ ঘোড়ার পিঠে চড়ে সাত সমুদ্দুর তের নদী অনায়াসে অতিক্রম করে আসা সম্ভব হয়। অপরূপ সুন্দরী পরীরা মনোবাসনা পূরণের জন্য যেন সদাই ব্যাকুল। এখানে হীরের গাছে মুক্তো ফল ঝোলে। উপকারী মাছ, পাখী, জন্তু জানোয়ারের ছড়াছড়ি। অনায়াসে সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হয়ে পাতালপুরীতে উপনীত হওয়া যায়। গাছে গাছে সোনার ফল ঝুলতে দেখা যায়। শিশু চিত্ত উদ্বেল হয়। সে তার কল্পলোকের সন্ধান পায়। রূপকথায় পাঠশালার কথা নেই, গুরুমশায়ের রক্তচক্ষুর সম্মুখীন হতে হয় না। মা-বাবা গুরুজনদের প্রতিপদে নিষেধাজ্ঞা মেনে চলতে হয় না। যেমন খুশী করোর রাজ্য এটা। সকল বাধা নিষেধের থেকে মুক্ত এ জগৎ। রূপকথায় শিশুর অ্যাডভেঞ্চার প্রিয়তার নিবৃত্তি ঘটে। সব থেকে বড় কথা রূপকথার বিশেষ বিশেষ চরিত্রের সঙ্গে তার একাত্মতাবোধ, ইনভলমেণ্ট। বিশেযত ছোট রাজকুমারের। শিশু পাঠক নিজেকেই ছোট রাজকুমার ভেবে বসে যে রাজকুমার অজানাকে জানতে চায়, অদেখাকে দেখতে চায়। কূপমণ্ডুকতার জীবন যার না-পছন্দ। শিশুও তো গৃহবন্দী থাকতে চায় না। বহির্জগৎ তাকে টানে বেশি। রূপকথায় সে যেন সেই অপরিচিত বহির্জগতের সন্ধান পায়। ছোট রাজকুমার জীবন পণ করে চলে তেপান্তরের দেশে। উপস্থিত হয় সাতমহলা প্রাসাদে। দেখা মেলে অপরূপ সুন্দরী রাজকন্যার। রাক্ষসদের তীক্ষ্ণ নজরদারিতে যে আবদ্ধ। সোনার কাঠির স্পর্শে রাজকন্যার ঘুম ভাঙায় সে। পরস্পর পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হয়। শুরু হয় পূর্ণোদ্যমে বন্দিনী রাজকন্যার মুক্তিসংগ্রাম। প্রবল বলশালী রাক্ষসকে ঘায়েল করে রাজপুত্র। বারংবার রাক্ষস তার রূপ পরির্তন করে, রাজকুমারও নাছোড়বান্দা। সহজে হার মানার পাত্র নয় সে। অসম সংগ্রামে শেষ পর্যন্ত জয়ী হয রাজকুমার। মারা পড়ে রাক্ষস। বন্দিনী রাজকন্যার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয় রাজকুমার, লাভ করে তার দীর্ঘ সাধনা ও পরিশ্রমের পুরস্কার। শিশু পাঠক অথবা শ্রোতা তার মনের অগোচরে সংগ্রামী সাহসী রাজকুমারের মধ্যে নিজেকে আবিষ্কার করে, রাজকুমারের মধ্যে তার প্রক্ষেপণ ঘটে। রাক্ষসদের সঙ্গে সংগ্রামে সেও রাজকুমারের যেন সহযোগী হয়ে ওঠে। এমন কি, রাজকুমারী লাভকেও সে নিজেরই লাভ বলে বিবেচনা করে। শিশু প্রেরণা পায় তার অসীম ক্ষমতা সম্পর্কে। কিছু একটা করে দেখাতে। পাঁচজনের কাছে তার স্বাধীন সত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে।

আর একটি দিক আছে। সেটি আদর্শের। কোনো কোনো রূপকথায় দেখি অত্যাচারীরাক্ষসকে অথবা পশুকে কিংবা ক্ষতিকারক শক্তিকে রাজকুমার পর্যুদস্ত করে

বিপন্ন মানুষদের রক্ষা করে সকলের স্নেহ ভালোবাসা ও স্তুতির পাত্র হয়েছে। লাভ করেছে পুরস্কার। রবীন্দ্রনাথের 'বীরপুরুষ' কবিতায় যেমন ডাকাতদের দ্বারা আক্রান্ত 'মা'কে ডাকাতদের কাছ থেকে মুক্ত করার শ্লাঘা বোধ করে শিশু কিশোর পাঠক, তেমনি রাজকুমারের প্রকাশিত বীর্যবত্তার অংশীদারত্ব লাভ করার আত্মপ্রসাদ লাভ করে শিশু পাঠক শ্রোতা। ত্রাণকর্তার ভূমিকায় রাজকুমারের ব-কলমে সে নিজেকে দেখে। কিন্তু সেইসঙ্গে একথাও তো সত্য যে রূপকথার প্রথম ও প্রধান উপজীব্য বিষয় হল প্রেম যা শিশু কিশোর পাঠক কিংবা শ্রোতার বোধগম্য নয়। প্রেমের অমোঘ শক্তি অনুধাবনের জন্য যে maturity-র প্রয়োজন শিশুর তার একান্তই অভাব। তাই সাম্প্রতিককালে রূপকথা শিশু উপভোগ্য নয় পরিণত বয়স্কদের উপভোগ্য এমন বলা হয়ে থাকে। কিছুটা তা সত্য মানতেই হবে, তবে পুরোটা নয়।

রূপকথার শিক্ষা : রূপকথা নিশ্চিতভাবে Fable বা নীতিকথা নয় যে আদর্শবাদ প্রচারকে মুখ্য করে এগুলি রচিত হয়েছে। মোটেই রূপকথা সেদিক দিয়ে উদ্দেশ্য প্রণোদিত রচনা নয়। তবু একটু সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে প্রতিটি রূপকথাই শেষপর্যন্ত একটি শিক্ষা দেয়। তা হল যে সৎ, কর্তব্যনিষ্ঠ, দায়বদ্ধ, অন্যায়কর্মে লিপ্ত নয় শেষপর্যন্ত তারই জয় হয় যতই না কেন প্রথমদিকে সে অত্যাচারিত, অপমানিত কিংবা নির্যাতিত হোক। যার যা প্রাপ্য তা শেষপর্যন্ত মিলবেই। কোনো প্রতিকূলতাই চিরকাল তা লাভে অন্তরায় হয়ে থাকতে পারে না। রূপকথাগুলি আমাদের শিক্ষা দেয় যা সত্য শেষ পর্যন্ত তা প্রকাশ পাবেই। অসত্য দিয়ে সত্যকে চিরটাকাল ঢেকে রাখা সম্ভব নয়। মেঘাবৃত আকাশ শেষ পর্যন্ত যেমন মেঘমুক্ত হয়, নির্মল আকাশ আত্মপ্রকাশ করে ঠিক তেমনিভাবে সত্যেরও প্রকাশ ঘটে। আর একটি কথা। রূপকথায় দেখি অন্যায়কারী শেষে দণ্ডিত হয়। কখনও কখনও নির্যাতিত যে তার মহত্ত্বের কারণে অন্যায়কারীর ক্ষমাপ্রাপ্তি ঘটে। কিন্তু মোটের উপর অন্যায়কারী দণ্ড লাভ করে, রেহাই পায় না। অতএব রূপকথার পাঠক অথবা শ্রোতা এই শিক্ষালাভ করে যে সৎ থাকলে. ন্যায়পথের পথিক হলে পুরস্কৃত হবেই কোনো শক্তিই এক্ষেত্রে বাদ সাধতে পারে না। 'লাইফস্ সিক্রেট' (লালবিহারী দে) গল্পে ষড়যন্ত্রকারী দুয়োর কারণে ডালিমকুমারের মৃত্যু হয়। মৃত ডালিমকুমারের সঙ্গে বিধাতা পুরুষের মেয়ের বিবাহ হল। নাপিতানী সেজে সেই মেয়ে দুয়োরানীর ঘর থেকে কৌশলে হার নিয়ে এল। ডালিমকুমার বেঁচে উঠল। দুয়োকে এক মানুষ গভীর গর্তে হেঁটোয় কাঁটা মাথায় কাঁটা দিয়ে জ্যান্ত পুঁতে ফেলা হল। অর্থাৎ ষড়যন্ত্রকারী হয়ে তার উচিত শাস্তি লাভ করল। 'দ্য বয় উইথ দ্য মুন অন হিজ ফোরহেড' (ঐ) গল্পে যে দুয়োরানী সন্তানহীনা হওয়ার কারণে সন্তানবতী ছোট রানীর বিরোধিতা করে ধাইমার সাহায্যে তার যমজ ছেলে মেয়েকে মেরে ফেলার আদেশ দিয়েছিল, দেখা গেল ধাইমা তাদের মারেনি, তারা অন্যত্র মানুষ হল। দুয়োরানীর চক্রান্ত ফাঁস হল এবং তাদের মাটিতে পুঁতে দেওয়া

হল। 'সাত ভাই চম্পা' গল্পে দেখি প্রথম ছয়রানী ছোট রানীকে হিংসা করে এবং তার সাত ছেলে ও এক মেয়েকে হাঁড়িসরায় পুরে ছাইগাদায় পুঁতে দেয়। ছোট রানী পরিণত হয় দাসীতে। শেষপর্যন্ত কিন্তু সত্য আর গোপন রইল না। বড় রানীদের চক্রান্ত ফাঁস হল। সাত রাজপুত্র ও তাদের পারুল বোন তৎসহ ছোটরানী রাজপুরীতে সমাদরে গৃহীত হল। দুয়োরানীকে মাটিতে পুঁতে ফেলা হল।

রূপকথায় আমরা সমাজ বাস্তবতার প্রতিফলন লক্ষ্য করি। যদিও ফ্যান্টাসির ছড়াছড়ি এখানে Creative imagination এখানে ফ্যান্টাসির কাছে পর্যুদস্ত, তাই বলে রূপকথা বাস্তবতা বঞ্চিত নয়। যাঁরা রূপকথাগুলির স্রষ্টা, তাঁরা তাঁদের এই মৌখিক রচনাতে হয়ত বা অসচেতন ভাবেই প্রাত্যহিক জীবনের অভিজ্ঞতাকে মাঝে মধ্যে প্রকাশ করে ফেলেছেন। যা তাদের করায়ত্ত নয়, যে বিষয়ে তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা নেই সে সবের উপস্থাপনায় স্রষ্টারা সীমাবদ্ধ জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা প্রসূত নানা তথ্যের আমদানি করে বসে আছেন। রাজা রানী রাজপুত্র এদের চিত্রিত করলেও স্রষ্টারা রাজকীয় ঐশ্বর্য কিংবা বিলাসিতা সম্পর্কে অনভিজ্ঞ থাকাতেই রানীদের দিয়ে প্রতিদিনের ঘরকন্নার কাজ করিয়ে নিয়েছেন। রূপকথার রানী বাসন মাজে, ঘর ঝাঁট দেয়, কুটনো কোটে, মাছ কোটে, রান্না বাড়ায় ব্যস্ত থাকে। অর্থাৎ পরিচারিকা কিংবা বেতনভুক্ কর্মচারীদের কাজ রানীরা দিব্যি করেন তাতে তাদের আভিজাত্য নষ্ট হয় না। 'ডালিমকুমার' গল্পে দেখি রাজপ্রাসাদে ভিক্ষাপ্রার্থী এক ফকির। সোনার চাল আর সব্জি সাজিয়ে সুয়োরানী তাকে ভিক্ষা দিতে গিয়েছে। ভিক্ষা চাওয়া এবং ভিক্ষাদান অসম্ভব ব্যাপার নয়। অবাস্তব হল সোনার চাল আর সুয়োরানীর নিজের হাতে ফকিরকে ভিক্ষা দিতে আসা। মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্ত সাধারণ ঘরে বাড়ির মেয়েরা ভিক্ষা দেয় নিজেদেব হাতে। কিন্তু অভিজাত পরিবারে, সরাসরি ভিক্ষুকের প্রবেশাধিকার যেমন থাকে না, তেমনি সেক্ষেত্রে ভিক্ষা দেওয়া হয় বড়জোর পরিচারিকার সহায়তায়। গল্পে তার পরিবর্তে সরাসরি সুয়োরানী নিজেই ভিক্ষা নিয়ে হাজির হয়েছে। 'পুষ্পমালা' গল্পে দেখি কোটালপুত্র এবং রাজকন্যা পুষ্পমালা পাঠশালায় পড়তে গেছে। বুঝতে বাকি থাকে না এ পাঠশালা রাজপ্রাসাদের মধ্যেকার নয়, তার বাইরের। শুধু তাই নয় রাজকন্যা কোটালপুত্রের সঙ্গে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে পড়েছে। আশ্রয় নিয়েছে এক গ্রামে। সেখানে আশ্রয় নেওয়া গৃহে রাজকন্যা খিচুড়ি রেঁধেছে। রাজকন্যার তো বিলাসিতায় মানুষ হবার কথা। তার তো রান্নাবান্না শেখার কথা নয়। তাও রাঁধলই যদিবা তাও কিনা খিচুড়ি, সাধারণ মানুষ যা খায়! রাজভোগের বিকল্প নিশ্চয়ই তা নয়। 'সাত মায়ের এক ছেলে' গল্পে রাজা একটি গাছ থেকে আম এনে রানীদের খাইয়েছে। রাজা আভিজাত্য বিস্মৃত হয়ে স্বয়ং গাছ থেকে ফল পাড়বেন তাও কি হয়? 'রূপকুমার' গল্পে দেখি বড়রানীর ভাত রাঁধার কথা, দুয়োরানীর ওপর বাটনা বাটার ভার, ছোট রানী মাছ কেটেছে।

শুধু বিষয় নিয়েই রূপকথা নয়, তার প্রকাশভঙ্গিরও আছে স্বাতন্ত্র্য। সে আলোচনা ব্যতিরেকে রূপকথার পরিচয় গ্রহণ অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

রূপকথার একটি বিশেষ আঙ্গিক আছে। এর নিজস্ব একটা রচনারীতি রয়েছে। শুধু বিষয়বস্তুগতই নয়, প্রকাশভঙ্গী তথা উপস্থাপনের আদলটি সম্পূর্ণভাবে বৈচিত্র্যমণ্ডিত। আমরা রূপকথার সেই গঠনগত কৌশল সম্পর্কে কিছু আলোচনার প্রয়াস পাব।

রূপকথা গদ্য রচনা Prose narrative। এগুলি মৌখিকভাবে সৃষ্ট, তাই রচয়িতার সন্ধান মিলবে না। রূপকথা নাতিদীর্ঘ। এগুলিতে উপস্থাপিত চরিত্রগুলি নৈর্ব্যক্তিক। তাই রাজা রানিদের নাম অনুল্লিখিত থেকে যায়, এমনকী রাজার রাজ্যের নামও থেকে যায় অনুল্লিখিত। 'The characters of the tale are usually anonymous, and the places are vague and namelss.' রূপকথার আরম্ভ এইভাবে—এক যে ছিল রাজা। রাজার সাতরানি। অর্থাৎ রাজা কে আর রানিরা বা কারা সেসব জানার উপায় নেই।

রূপকথার গদ্য বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে মাঝে মধ্যেই অন্ত্যমিলযুক্ত পদ্য সংযোজিত হতে দেখা যায়। এ সংযোজন শিশুদের মনোরঞ্জনের জন্য যেমন, তেমনি কথকের তৃপ্তিলাভের কারণেও।

ক. দিব না তো কি, সাত হাঁড়ি ঘি (দেড় আঙুলে)

খ. না বলতে শশা খেলি, বুড়ির শাপে পাতলা গেলি (দেড় আঙুলে)

গ. কাঠুরেটি কোথায় থাকে; কাঠুরেটি দাও না মোকে। (দেড় আঙুলে)

ঘ. নিয়ে এল হাটুরে, কড়ি দিয়ে কিনলাম কাঠুরে। (দেড় আঙুলে)

ঙ. চোর যদি ছাড়ে পুরী, তবে কন্যা দিতে পারি। (দেড় আঙুলে)

চ. সিপাহী শাস্ত্রী ধোঁকা, রাজা হলেন বোকা! (দেড় আঙুলে)

ছ. কটা হল ছ্যাঁক? মনে মনে ল্যাখ। (ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী)

জ. পাওয়া গেল, পাওয়া গেল! বামুনের সব খুলে গেল। (ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী)

ঝ. সিংহাসন ছেড়ে রাজা পড়ে এসে পায়। আজ হতে হইলা তুমি পণ্ডিত সভায়। (ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী)

ঞ. সুয়োরানির ডরে থর্ থর্ থর্ করে (শীত বসন্ত)

রূপকথায় শব্দদ্বৈতের ব্যবহার প্রাচুর্য চোখে পড়ার মতো। আসলে ভাষার ঠাটে মুখের ভাষা তথা কথ্যরীতিকে বজায় রাখতেই এটি ঘটেছে। প্রথমাবধি লেখ্য ভাষায় রচিত হলে এমনটি সম্ভবত ঘটত না।

ক. রানি আহার-নিদ্রা ছাড়িলেন।

খ. রাজা চর-অনুচর দিলেন।

গ. রানি মণি-মাণিক্যের ডালা লইয়া আসিলেন।

ঘ. বনে পাখ-পাখালির শব্দ নাই, বাঘ-ভালুকের সাড়া নাই।

ঙ. পুরীর মধ্যে জন-মানুষ নাই, কোনো কিছুর সাড়া শব্দ পাওয়া যায় না।

চ. কুঠরীর মধ্যে কত রকমের ঢাল তলোয়ার, তীর ধনুক সব হাজারে হাজারে টানানো রহিয়াছে (ঘুমন্ত পুরী)

ছ. কোলে-কাঁখে করিয়া মানুষ করিয়াছি।

জ. বসন্ত এক গাছের তলায় ধূলা-মাটিতে শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

ঝ. সিপাই লস্কর লইয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন (শীত বসন্ত)।

আহার-নিদ্রা, চর-অনুচর, মণি-মাণিক্য, জন-মানুষ, সাড়া-শব্দ, ঢাল-তলোয়ার, তীর-ধনুক, কোলে-কাঁখে, ধূলা-মাটি, সিপাই-লস্কর প্রতিটি শব্দদ্বৈতের ব্যবহারে দুটি শব্দেরই প্রাধান্য রক্ষিত এবং দুটি শব্দেরই ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বিদ্যমান।

রূপকথায় অনুকার শব্দের ব্যবহারও লক্ষণীয়। একটি শব্দের অনুষঙ্গে আর একটি শব্দ পরিকল্পিত হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রথম শব্দটির অর্থকেই সম্প্রসারিত করেছে দ্বিতীয় শব্দটি। কিন্তু উল্লেখ্য, প্রথম শব্দটির সহায়তা ব্যতিরেকে দ্বিতীয় শব্দটি সম্পূর্ণরূপে অর্থহীন। এমন কতকগুলো শব্দ হল—

ক. চক্ষেও দেখিনা মক্ষেও দেখি না ছাই— (দেড় আঙুলে)

এখানে 'চক্ষে'র অনুকরণে 'মক্ষে' শব্দটি পরিকল্পিত, 'চক্ষে' ব্যতিরেকে স্বতন্ত্রভাবে 'মক্ষে' শব্দটি অর্থহীন।

খ. তখনি, স্নান-টান করিয়া, কাপড়-চোপড় ছাড়িয়া শিব মন্দিরে ফুল-বেলপাতা অঞ্জলি দিয়া, রাজপুত্র নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া তালগাছে উঠিয়া তালপত্র খাঁড়া পাড়িলেন। (সোনার কাঠি রূপার কাঠি)

'স্নানে'র অনুকরণে 'টান' এবং 'কাপড়ে'র অনুকরণে 'চোপড়' শব্দ পরিকল্পিত হয়েছে।

গ. পিটে-সিটে করিয়া, দুইজনে আলপনা দিতে গেলেন। (কাঁকনমালা, কাঞ্চনমালা)

'পিটে' শব্দের অনুকরণে সৃষ্ট হয়েছে 'সিটে' শব্দটি।

ঘ. ও দাসী-মানুষ যোগাড়-যাগাড় দিক? (কাঁকনমালা, কাঞ্চনমালা) 'যোগাড়ের' অনুকরণে 'যাগাড়' শব্দটি সৃষ্ট।

ঙ. দাসী, আঙ্গিনার এক কোণে একটু ঝাড়-ঝুড় দিয়া পরিষ্কার করিয়া একটুকু চালের গুঁড়ায় খানিকটা জল মিশাইয়া...(কাঁকনমালা, কাঞ্চনমালা) 'ঝাড়' শব্দের অনুকরণে জাত 'ঝুড়' শব্দটি।

চ. জল নাই টল নাই, কুঠরীর মাঝখানে লাখে লাখে পদ্মফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। (ঘুমন্ত পুরী)

'জলে'র অনুকরণে পরিকল্পিত হয়েছে 'টল'। 'টল' শব্দটির নিজস্ব কোনো অর্থ নেই।

এবারে শব্দদ্বৈতের দৃষ্টান্ত :

ক. কুঠরীর মাঝখানে লাখে লাখে পদ্মফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। (ঘুমন্ত পুরী)

'লাখে লাখে' অবিকৃত শব্দদ্বৈতের দৃষ্টান্ত।

খ. বাতাসের সাথে সাথে সুখু চাঁদের মা বুড়ির বাড়ি গেল। (সুখু আর দুখু)

'সাথে সাথে' অবিকৃত শব্দদ্বৈত।

গ. বাতাসের পিছু পিছু ছুটিল (ঐ)। 'পিছু পিছু' শব্দদ্বৈতের দৃষ্টান্ত।

ঘ. নিখোঁজ পেঁচোর জন্য বুড়ি দেশে দেশে লোক পাঠাইল। (পাতাল কন্যা মণিমালা)

'দেশে দেশে' শব্দদ্বৈত।

ঙ. এক কাল-অজগর তাঁহাদের ঘোড়া দুইটাকে আস্ত আস্ত গিলিয়া খাইতেছে। (পাতাল কন্যা মণিমালা)

'আস্ত আস্ত' শব্দদ্বৈত।

রূপকথার পরিবেশকে জীবন্ত করে তোলার অভিপ্রায়ে, শিশু শ্রোতার কাছে বক্তব্যকে গ্রাহ্য করে তুলতে প্রচুর পরিমাণে ধ্বন্যুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে।

ক. রাজার চোখ দিয়া **টস্‌টস্‌** করিয়া জল গড়াইয়া গেল। (কলাবতী রাজকন্যা)

খ. রানিরা সকলে **কিল্‌ কিল্‌** করিয়া উঠিলেন। (কলাবতী রাজকন্যা)

গ. মাল্লা ও মাঝি সব লইয়া **ভুস** করিয়া ডুবিয়া গেল। (কলাবতী রাজকন্যা)

ঘ. পদ্মফুলের গন্ধে ঘর **মম** করিতেছে। (ঘুমন্ত পুরী)

ঙ. সেওড়া গাছের এক ডাল **মটাস** করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল। (সুখু আর দুখু)

চ. দেখিতে দেখিতে **হড়্‌মড়্‌** করিয়া গাছ পড়িল। (দেড় আঙুলে)

ছ. নরুণটা **মট** করিয়া ভাঙ্গিয়া গেল। (শিয়াল পণ্ডিত)

জ. এক এক উকুন দুই পাথরের চাপ দিয়ো **কটাস্‌ কটাস্‌** করিয়া মারেন। (সোনার কাঠি রূপার কাঠি)

টস্‌টস্‌, কিল্‌কিল্‌, ভুস, 'ম ম', মটাস, হড়্‌মড়্‌, মট, কটাস্‌ কটাস্‌ ধ্বন্যুক্তির নিদর্শন।

রূপকথায় দেখি সংখ্যাবাচক শব্দের অঢেল ব্যবহার। যেমন—

ক. সুয়োরানির তিন ছেলে হইল। (শীত বসন্ত)

খ. রাজার সাতরানি। (কলাবতী রাজকন্যা)

গ. পাঁচরানি ঘরে গিয়া খিল দিলেন। (কলাবতী রাজকন্যা)

ঘ. তিন ছেলে কোলে, পাঁচ পাত সাজাইয়া, খাইতে বসিলেন। (শীত বসন্ত)

ঙ. চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে গলাগলি পাঁচ ভাই রাজপুরী গেলেন। (কলাবতী রাজকন্যা)

চ. পঞ্চ চৌদোলা শীতরাজার রাজ্যে পৌঁছিল। (কলাবতী রাজকন্যা)

ছ. বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচি আছে। (সোনার কাঠি রূপার কাঠি)

জ. ছত্রিশ গণ্ডা দাঁতে কুমীর পণ্ডিতের ঠ্যাংটি ধরিয়া ফেলিল। (শিয়াল পণ্ডিত)

রূপকথায় সংখ্যাবাচক শব্দগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট শব্দার্থেই প্রযুক্ত হয়েছে, ভিন্নতর ব্যঞ্জনা প্রকাশ করেছে বিরল ক্ষেত্রে।

মৌখিকভাবে সৃষ্ট সাহিত্যে সংগত কারণেই পুনরাবৃত্তিমূলকতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়, কিংবা বলা চলে স্মরণে রাখার জন্য আশ্রয় করা হয়। রূপকথাও এর ব্যতিক্রম নয়। সুখু আর দুখু গল্পে বর্ণিত হয়েছে।

পথে ঘোড়া বলিল—"দুখু, দুখু, এস এস, আর কি দিব. এই নাও।" ঘোড়া খুব তেজী এক পক্ষীরাজ বাচ্চা দিল।

সেওড়া গাছ বলিল,—"দুখু দুখু, এস এস, আর কি দিব, এই নাও।" সেওড়া গাছ এক ঘড়া মোহর দিল।

কলাগাছ বলিল,—"দুখু, দুখু, এস এস, আর কি দিব. এই নাও।" কলাগাছ মস্ত এক ছড়া সোনার কলা দিল।

গাই বলিল,—"দুখু, দুখু, এস এস, আর কি দিব, এই নাও।" গাই এক কপিলা লক্ষণ বক্‌না দিল।

এখানে ঘোড়া, সেওড়া গাছ, কলাগাছ ও গাই চারটি পৃথক অস্তিত্বের, সকলেই দুখুকে নিজ নিজ ক্ষমতানুযায়ী উপঢৌকন দিয়েছে, কিন্তু চারজনেরই ক্ষেত্রে দুখুকে, আহ্বান জানানো হয়েছে এক ভাষায় একই ভঙ্গিতে—'দুখু, দুখু, এস এস, আর কি দিব, এই নাও।

বিপরীতার্থক শব্দও ব্যবহৃত হয়েছে রূপকথাগুলোতে—

ক. 'আজ যায় কাল যায় (শীত বসন্ত)

আজ এবং কাল বিপরীতার্থক শব্দের নিদর্শন।

খ. দেশ-বিদেশ ছাড়াইয়া বারো বছর তেরো দিনে 'দুধ-মুকুটে' ধবল পাহাড়ের কাছে গিয়া পৌঁছিলেন। (শীত বসন্ত) দেশ-বিদেশ বিপরীতার্থক শব্দ।

গ. সাত দিন সাত রাত্রি বসিয়া রহিলেন। (শীত বসন্ত)

দিন ও রাত্রি বিপরীতার্থক শব্দ।

ঘ. চৌদোলায়। রঙ্ বিরঙের, আঁকন, ময়ূর পাখার ঢাকন্। (শীত বসন্ত)

রঙ বিরঙ বিপরীতার্থক শব্দ।

ঙ. রাজ্যের লোক সুখে আছে, কি দুঃখে আছে, জানিলাম না! (কিরণমালা) সুখে দুঃখে বিপরীতার্থক শব্দ।

চ. মহারাজ! ভয়ে বলি, কি, নির্ভয়ে বলি? (কিরণমালা) ভয়ে নির্ভয়ে বিপরীতার্থক।

ছ. রাত্রি হলে ছদ্মবেশ ধরিয়া প্রজার সুখ-দুঃখ দেখিতেন। (কিরণমালা)

সুখ-দুঃখ বিপরীতার্থক।

জ. কে আপনি! দেব না দৈত্য, দানব বা মানব, এখানে কেমন করিয়া আসিলেন? (সোনার কাঠি রূপার কাঠি) দেব-দৈত্য, দানব-মানব বিপরীতার্থক শব্দ।

মুখের ভাষায় ক্রিয়াপদ, সর্বনাম প্রভৃতিদের সংক্ষিপ্তরূপে ব্যবহার করার দিকে প্রবণতা লক্ষিত হয়। সেই প্রবণতার সন্ধান মেলে রূপকথার ভাষাতেও—

ক. কতদিন বোনদিগে দেখি না। (কিরণমালা)

বোনদিগকে > বোনদিগে।

খ. রাজাজ্ঞা, অমনি রাজার হাজার ছুতোর গিয়া আমগাছে কুড়ুল মারিল। (সোনার কাঠি রূপার কাঠি)

রাজার আজ্ঞা > রাজাজ্ঞা; রাজা + আজ্ঞা > রাজাজ্ঞা।

গ. ওঘরে গিয়া আগে চাট্টি খাও, তারপরে তুলো দেবো এখন। (সুখু আর দুখু) চারিটি > চারটি > চাট্টি।

ঘ. বিদ্যের মা জননী! বল্লেম আমি গণি। (ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণী)

বলিলাম > বল্লেম।

ঙ. কড়ি আনতে চল্লাম। (দেড় আঙুলে)

চলিলাম > চল্লাম।

চ. আপনি আসিয়া আমাদিগে জাগাইয়া রক্ষা করিলেন। (ঘুমন্ত পুরী)

আমাদিগকে > আমাদিগে।

কথা বলার সময় আমরা সবসময় হিসাব মতো ক্রিয়াপদ ব্যবহার করি না। অনেক সময়েই আমাদের মুখের কথায় ক্রিয়াপদ উহ্য থেকে যায়, অবশ্য সেজন্য শ্রোতার ঐ ক্রিয়াহীন বাক্য অনুধাবনে কোনো অসুবিধা হয় না—

ক. নাকের ডাকে গলার ডাকে নিশি ভোর! (ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণী)

এখানে 'হল' ক্রিয়াপদটি উহ্য রয়েছে।

খ. মাঠের উপর দিয়া চারদিকে চার পথ। (সোনার কাঠি রূপার কাঠি)

'চারপথ গিয়াছে' না বলে ক্রিয়াপদ 'গিয়াছে' অনুল্লিখিত রয়ে গেছে।

গ. রাজপুত্র ঘুমে (ছিল অচেতন)। (সোনার কাঠি রূপার কাঠি)

ঘ. তারপরেই হাড়ের পাহাড়। (ডালিমকুমার)

'অবস্থিত ছিল' ক্রিয়াপদ অনুল্লিখিত।

ঙ. কতক দূরে গিয়া কড়ির পাহাড়। (ডালিমকুমার)

চ. পরদিন রাজ্যে হুলুস্থূল। (নীলকমল আর লালকমল)

ছ. ঘরে ঘরে মানুষের হাড়, পথে পথে হাড়ের জঙ্গল। (")

জ. মুনির পাতার কুঁড়ে; (শীত বসন্ত),

'ছিল' ক্রিয়াপদটি এখানে অনুপস্থিত তবে বাক্য মধ্যে ক্রিয়াটির ব্যবহার না থাকলেও শ্রোতার বক্তব্য অনুধাবনে কোনো অসুবিধা হয় না।

ঝ. রাজা রাজপুত্রের কাঞ্চনমালা রানি, ভাণ্ডারভরা মাণিক, কোথাকার রাখাল, সে আবার বন্ধু! (কাঁকনমালা কাঞ্চনমালা)

রূপকথার ভাষায় প্রায়শই দেখা যায় দুই কর্তা (ক্রিয়া যে সম্পাদন করে) পরস্পরের মধ্যে ক্রিয়ার বিনিময় সাধনে রত। এমনতর ভাবে দুটি কর্মেরও পরিবর্তন ঘটানো হয়। পারস্পরিকভাবে, তবে শর্তসাপেক্ষে নয়।

ক. রাজার চোখের জলে রাখাল ভাসিল। রাখালের চোখের জলে রাজা ভাসিলেন। (কাঁকনমালা কাঞ্চনমালা)

এখানে দুটি কর্তা যথাক্রমে রাজা এবং রাখাল, ক্রিয়া হল ভাসা, একে অন্যের চোখের জলে ভেসেছে।

খ. হাসিয়া মন্ত্রিপুত্র মণিমালার গলার মালা রাজপুত্রের গলায় দিলেন, রাজপুত্রের গলার মালা মণিমালার গলায় দিলেন। (পাতাল কন্যা মণিমালা)

গ. পৃথিবীর খবর বসন্তের কাছে যায় না, বসন্তের খবর পৃথিবী পায় না। (শীত বসন্ত)

এভাবেই রূপকথাগুলো বিষয়বস্তু ও প্রকাশভঙ্গিতে নিজস্বতা বজায় রাখে। দুয়ের সমন্বয়েই রূপকথার সৌন্দর্য সার্থকতা।

ব্রতকথা

গোকুলানন্দ মিশ্র

ব্রতকথা মঙ্গলকামনা কেন্দ্রিক। দেবদেবীর মানসঋদ্ধ পরিকল্পনার দ্বারা মানুষের মঙ্গলসূত্রটি নিহিত আছে। দীর্ঘকাল ধরে বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে ব্রতকথার প্রচলন, তবে এসবকিছু লোকসাহিত্যের অন্তর্গত তো বটেই, আমরা বলব, গ্রাম্যসাহিত্যেরও অঙ্গীভূত। লক্ষ্মীর পাঁচালী রচয়িতা অনেক, তারা বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখ করে দেবীর কৃপা লাভ করবার মতো পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। নারী সমাজের স্বীকৃতির দ্বারা ব্রতকথার প্রচলন হয়েছে সবচেয়ে বেশি। ভারতবর্ষে তেত্রিশ কোটি দেবদেবী, যুক্ত হয়েছে আদিবাসী দেবদেবীর দয়ামায়ার কাহিনী। মুখে মুখে প্রচলিত দেবতার মঙ্গলগান থেকে নিয়মনিষ্ঠার মাধ্যমে ব্রতপালন ও দেবতার প্রশস্তি নিয়ে ব্রতকথার প্রচলন, এজন্য এগুলো লোকসাহিত্যেরও বিষয় হয়ে উঠেছে। নারী গৃহলক্ষ্মী, তাই তাদের মঙ্গল চিন্তার মধ্য দিয়ে ব্রতকথা বা ব্রতগান দীর্ঘ বয়স লাভ করেছে। আর উচ্চতর সমাজেও এর প্রচলন রয়েছে যথেষ্ট পরিমাণে। তাই ব্রতকথা লোকসংস্কৃতি ও উচ্চতর সংস্কৃতি উভয়ের অন্তর্গত। Motif হল মঙ্গল-কামনা। ব্রতকথার দেবতাদের সঙ্গে মঙ্গলকাব্যের দেবতাদের ভাবগত সম্পর্ক আছে। প্রকৃতপক্ষে ব্রতকথা ভিত্তি করেই উচ্চতর সাহিত্য মঙ্গলকাব্য সৃষ্টি হয়েছে। তবুও ব্রতকথার একটি স্বতন্ত্র প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্র আছে। মঙ্গলকাব্যের দেবচরিত্রে যে মানবিক গুণের সন্ধান পাওয়া যায়, ব্রতকথার দেবচরিত্রেও সেই গুণের সন্ধান পাওয়া যায়। ঐহিক জীবনই ব্রতকথার লক্ষ্য, এর দেবদেবীরা কোথাও মানুষের মতো সুখদুঃখভাগী, কোথাও নেমেসিস-এর রূপক। তাই ব্রতকথার বিষয়বস্তু কিংবা দেবচরিত্র লোকসাহিত্য-বিরোধী নয়।

লোককথায় যে সব মৌলিক বিষয় (motif) আছে, প্রত্যেক ব্রতকথাতে তার সন্ধান পাওয়া যায়। ব্রতকথার কাজ গার্হস্থ্য নিয়ম অনুসরণ করে মঙ্গলের সুলুক-সন্ধান। গৃহের সমৃদ্ধি বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা মেটাবার জন্য কোন কোন রূপকথা, ব্রতকথার রূপে সামান্য পরিবর্তন করে পাওয়া যায়। আশুতোষ মজুমদারের 'মেয়েদের ব্রতকথা' গ্রন্থে একটি রূপকথার পরিচয় আছে। স্বার্থপর সন্ন্যাসী শঙ্খরূপী এক রাজপুত্রকে নিজের ক্ষমতা বলে বনে নিয়ে গেল। প্রতিবেশীদের পরামর্শে পুত্রের মাতা 'সঙ্কটার ব্রত' করলেন। সন্ন্যাসীর সাধ পূর্ণ হল না। বুদ্ধিবলে রাজপুত্র নিজে বাঁচল, অন্য মৃতদের জীবনদান করল এবং রাজকন্যাকে বিয়ে করে ফিরে এল। রাজার আদেশে দেশবাসী সঙ্কটার ব্রত পালন করতে লাগল। সাঁওতাল উপকথায় এমন কাহিনী আছে (পি.ও.বডিং)। সঙ্কটা বা মঙ্গলচণ্ডী নামক যে দেবীর উল্লেখ করা হয়েছে সেখানে

ব্রতকথার একটি বিশেষ দিককে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই কাহিনীর মধ্যে রয়েছে রসময় রূপকথার সাহিত্যরস, দৈবকাহিনীর ভক্তিরস নয়। কতকগুলো ব্রতকথার মধ্য দিয়ে কোন দেবদেবীর উল্লেখের পরিবর্তে নিয়তি বা ললাট-লিপির সম্ভাব্যতার কথা বর্ণিত হয়েছে। অদৃষ্টবাদী সমাজ এদের দ্বারা সাধারণ লোকসমাজের জীবনকার্য অভিব্যক্ত করে। এইসব গুণে ব্রতকথাগুলো লোকসাহিত্যের অঙ্গ, ধর্মীয় চেতনার অঙ্গ নয়। যে সব অসম্ভব বিষয় রূপকথার স্বাভাবিক নিয়মে ঘটে থাকে, রূপকথায় তাদের মূলে দেবতার হস্তক্ষেপের উল্লেখ থাকে মাত্র. এছাড়া, রূপকথায় ও ব্রতকথায় উল্লেখযোগ্য পার্থক্য নেই। ভাবের দিক দিয়ে সমস্ত ব্রতকথায় সাহিত্যিক মূল্য রক্ষিত হয়ছে, এ কথা বলা যায় না। কোন কোন ব্রতকথায় পুরাণের অনুরূপ দেবমাহাত্ম্য কীর্তন করা হয়েছে, তবে তাদের সংখ্যা বিশেষ নয়। কিন্তু বাঙালির গৃহগত পরিবেশ রচিত হয়েছে, এটাই সাহিত্য মূল্য। আর, ব্রতকথাগুলোর ভেতর দিয়ে বাঙালীর সমাজজীবনের চিত্র যে পাওয়া যায় তাকেও মূল্য দিতে হবে। রাজার সাতরাণী, আটরাণী, সতীন-বিদ্বেষ প্রভৃতি বহুবিবাহ প্রথার কুফল। এ সময় থেকেই ব্রতকথার উদ্ভব হতে পারে। সতীনের কণ্টক ছিল বলেই প্রত্যেক নারী স্বামীসৌভাগ্যবতী হওয়ার জন্য কামনা করতো। আবার নারী বহুপুত্রবতী হওয়ার জন্যও কামনা করতো। তাই ব্রতকথাগুলোর মধ্যে সমাজচিত্রের ঐতিহাসিক দলিল খুঁজে পাওয়া যায়। আদিম সমাজের বহু উপকরণ এগুলোর ভেতর দিয়ে আত্মরক্ষা করে বেঁচে আছে। এগুলোর মধ্যে ঐন্দ্রজালিক শক্তি (magical power) -তে বিশ্বাস অন্যতম। কতকগুলো ব্রত ঐন্দজালিক ক্রিয়াছাড়া কিছুই নয়। যেমন ধরা যাক, বৈশাখ মাসের ব্রত। 'পুণ্যিপুকুর ব্রত', 'অশ্বত্থপাতা ব্রত', 'পৃথিবী ব্রত' প্রভৃতি। ঐন্দজালিক ক্রিয়ার দ্বারা বৃষ্টিপাত করিয়ে ধরিত্রীর শস্যসম্পদ রক্ষা করবার প্রবৃত্তি থেকে জাত। আদিম সমাজের কতকগুলো সংস্কার ব্রতগুলোর ভেতর দিয়ে পালন করা হয়। এগুলো ঐতিহাসিক যুগের সৃষ্টি নয়। পুরনো ও নতুনের মিশ্রণে নবরূপ লাভ করেছে। ধর্মাচার অবলম্বন করে ব্রতগুলো দলবদ্ধভাবে আবৃত্তি করা হয়। অতএব ব্রতগুলো বাঙালী হিন্দুর জীবনে একটা আনুষ্ঠানিক (ritual) মূল্য লাভ করেছে। তবে ব্রতকথাগুলোর যে নির্দিষ্ট কাঠামো আছে তা পরিবর্তিত হওয়ার সুযোগ কম। লোকসাহিত্য পরিবর্তনশীল, কিন্তু ব্রতকথার বিশেষ পরিবর্তন নেই। বিভিন্ন সময়ে নতুন লেখকের দ্বারা দেবদেবী সম্পর্কে নতুন গল্প রচিত হতে পারে। সতনারায়ণ ব্রত বা লক্ষ্মীব্রত একটি ধাঁচে রচিত হয়ে পঠিত হয়ে আসছে। ব্রতাচারের ভেতর দিয়ে ব্রতকথার বিকাশ। আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্ম যুগের সঙ্গে সঙ্গে বিবর্তিত হতে পারছে না।

ব্রতকথা বাক্ বা কথাকেন্দ্রিক এবং লোকসাহিত্য। ব্রতের সঙ্গে যুক্ত আচার-অনুষ্ঠান, বিশ্বাস-সংস্কার লোকসংস্কৃতির অংশ। বাংলার ব্রত বাঙালী নারীর এক নিজস্ব জগৎ। নারীর কথা বলা হচ্ছে এজন্য যে পরিবার, কৃষি প্রভৃতির মঙ্গল ও উন্নয়নসূত্রে গ্রাম্য বধূরাই বিশেষ নিষ্ঠায় ব্রতপালন করে। বাঙালী নারী তার

আশা-আকাঙ্ক্ষা, কামনা-বাসনা ব্রতপালনের মধ্য দিয়ে সংশ্লিষ্ট দেবতার কাছে নিবেদন করে। এখনকার নারীরা মানত করে বা মানসিক করে এবং পুজো দেয়। ব্রতপালনের নিয়মকানুন দলবদ্ধভাবে নারীরা পালন করে, নির্দিষ্ট আচার পালন করে। নারীর ব্যক্ত আশা-আকাঙ্ক্ষার মধ্যে ধরা পড়ে যায় সমাজ-ইতিহাস, মনস্তত্ত্ব এবং নৃতত্ত্বের নানা দিক। এই দেশীয় ঐতিহ্য জানবার জন্য ঠাকুরবাড়ীর সন্তান অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর উদ্যোগী হয়েছিলেন। একই সঙ্গে লোকায়ত সংস্কৃতিকে রক্ষা করবার যে চেষ্টা তার জন্য অবনীন্দ্রনাথকে প্রশংসা করতে হয়। ছবি, শিশুমন, সমাজ-সংস্কৃতি -সভ্যতা সব কিছুই সাঙ্গীকৃত হয়ে গেছে তাঁর ব্রত-সম্পর্কিত আলোচনায়। √বৃ-ধাতু থেকে 'ব্রত' শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে যার অর্থ হল নিয়ম বা সংযম। নারীর কামনা-বাসনা পুরণের জন্য কৃত্য সম্পাদনই 'ব্রত'। যে ব্রত পালন করে তাকে বলা হয় 'ব্রতী'। প্রতি মাসে বাংলার কোন না কোন স্থানে নারীরা নানারূপ ব্রত পালন করে থাকে। অবনীন্দ্রনাথের 'বাংলার ব্রত'-র মধ্যে অন্ততঃ ১৮ টি ব্রতের পরিচয় আছে এবং কৃত্য পালনের উপাদান ভিত্তিক নিয়ম পালনের প্রক্রিয়া পরিস্ফুট হয়েছে। কোনকিছু কামনা করে দেবতার কাছে বিশেষ প্রার্থনা জানিয়ে, ক্ষেত্রেবিশেষে আলপনা দিয়ে কোন বিশেষ আচার-অনুষ্ঠান, কিংবা পার্থিব কল্যাণ কামনায় দশে মিলে যে সামাজিক নিয়ম বা অনুষ্ঠান পালন করা হয় তাকে 'ব্রত' বলা হয়।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রত-আলোচনার পথপ্রদর্শক। তিনি ব্রতের শ্রেণীবিভাগ করে 'শাস্ত্রীয় ব্রত' এবং 'মেয়েলি ব্রত'— এই দু'টি নামকরণ করেছেন। প্রচলিত ব্রতকে তিনি আবার দুটি ভাগে বিভক্ত করেছেন— 'কুমারী ব্রত' এবং 'নারীব্রত'। এই লোকায়ত ব্রত-পরিচয়ের পাশাপাশি লেখক সমাজে প্রচলিত শাস্ত্রীয় ব্রতকে অশ্রদ্ধা করেননি। দুই শ্রেণীর ব্রতের তুলনামূলক আলোচনাও করেছেন এবং এইভাবে ব্রতের সম্যক আলোচনা করেছেন।
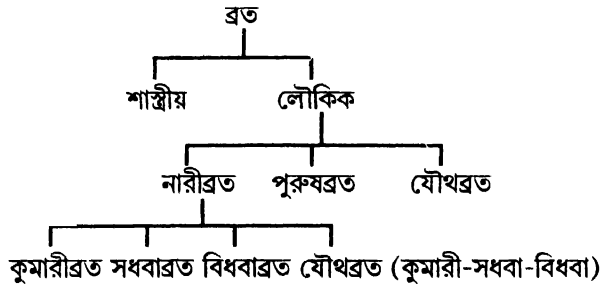
শাস্ত্রীয় বা পৌরাণিক ব্রতের উপাদান বা গঠন উপচারও ব্রতকথার মিশ্রণের ওপর নির্ভরশীল। এ-জাতীয় ব্রত একটা গতানুগতিক পদ্ধতি-নির্ভর। উপচার বলতে (সামান্যকাণ্ড) আচমন, স্বস্তিবাচন, কর্মারম্ভ, সংকল্প, ঘটস্থাপন, পঞ্চগব্য, পঞ্চশস্য

প্রভৃতি শোধন, শান্তিমন্ত্র, সামান্য অর্ঘ্য, আসনশুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি, ন্যাস প্রভৃতি। এরপর ভোজ্যদ্রব্য উৎসর্গ এবং ব্রাহ্মণকে দক্ষিণাদান। এগুলো বরাবরই প্রচলিত। শাস্ত্রীয় ব্রতপালনে এ সবই অবশ্য প্রয়োজন। অপরদিকে নারীব্রত কিছুটা শাস্ত্রীয় ব্রত ও কিছুটা মেয়েলি ব্রতের মেলবন্ধন। অর্থাৎ শাস্ত্রীয় ও অশাস্ত্রীয় ব্রতের মেলবন্ধন। বৈদিক অনুষ্ঠানের গভীরতা ও সজীবতা চলে গিয়ে লৌকিক ব্রতের সরলতা কিছুটা যুক্ত হয়ে আনুষ্ঠানিকতা প্রাধান্য পেয়েছে। একমাত্র কুমারী ব্রতই শাস্ত্রীয় আনুষ্ঠানিকতার বাঁধন এড়িয়ে অনেকখানি আপন অকৃত্রিমতায় অক্ষত রেখেছে নিজেকে। ব্রতের গঠন হল— আহরণ, আচরণ, কামনা জ্ঞাপন, ব্রতকথা শ্রবণ। আহরণ হল— জিনিষ সংগ্রহ করা। আচরণ হল— কামনার প্রতিচ্ছবি স্বরূপ আলপনা দেওয়া। পুকুরকাটা প্রভৃতি। কামনাজ্ঞাপন পর্যায়ে কামনার কথা জানিয়ে প্রতিচ্ছবিতে ফুল দেওয়া এবং সবশেষে ব্রতকথা শোনা। শেষ কামনা জানিয়ে ব্রত সাঙ্গ করা। এখানে পুরোহিতের কোন ভূমিকা নেই। খাঁটি মেয়েলি ব্রতগুলোতে, তার ছড়ায় ও আলপনায় একটা জাতির মনের, তাদের চিন্তার ছাপ স্পষ্ট। বেদের মূল সূক্তগুলোতে সমগ্র আর্যজাতির চিন্তা, তার উদ্যম-উৎসাহ ফুটে উঠতে দেখা যায়। তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচারের চেষ্টা করেছেন অবনীন্দ্রনাথ। নদী, সূর্য প্রভৃতি বৈদিক দেবতার উদ্দেশে ছড়া বলা হয় মেয়েলি ব্রতে। শাস্ত্রীয় ব্রত পুরুষতান্ত্রিক আর্যসভ্যতার অবদান, আর মেয়েলিব্রত মাতৃতান্ত্রিক অনার্য সমাজের সৃষ্টি— আর্যপূর্ব সমাজে এসবের উদ্ভব। বৈদিক ঋষিরা যা চাইছেন পুরুষব্রত পালনে পুরুষেরাও তাই চাইবেন। ইন্দ্র আমাদের সহায় হোন, শত্রুরা পলায়ন করুক। পরবর্তী কালে উপবাস-ভক্তি প্রভৃতির মধ্য দিয়ে পুরুষেরা গাজন প্রভৃতি শিবকেন্দ্রিক ব্রত, গম্ভীরা উৎসব ব্রত পালন করছে। মেয়েলি ব্রতগুলো অন্তর্মুখী। অবনীন্দ্রনাথ বৈদিক ও মেয়েলি ব্রত সম্বন্ধে বলেছেন, 'দুজনেই পৃথিবীর ... ধানের সবুজেব ওপর নীল আকাশের গান, উদার পৃথিবীর গান, আর ব্রতের ছড়াগুলি যেন নীড়ের ধারে বসে ঘন-সবুজের আড়ালে পক্ষীমাতার মধুর কাকলি কিন্তু দুই গানই পৃথিবীর সুরে বাঁধা।'

শাস্ত্রীয় ব্রত গতানুগতিক তবে কামনা চরিতার্থের উপায় মন্ত্র, ভক্তি, শাস্ত্রীয় আচার। অন্যদিকে মেয়েলি ব্রতের বৈশিষ্ট্য স্বতন্ত্র। কামনা-বাসনা যত রকমের তার চরিতার্থতার প্রক্রিয়াও তত রকমেব। এই রকমারি রূপের প্রধান কারণ, এগুলো লোকসমাজের সম্পদ। লোকসমাজে কোনকিছুর নিয়ম থাকেনা। আসলে, ব্রত হচ্ছে মানুষের সাধারণ সম্পত্তি। ঋতুপরিবর্তনের সঙ্গে মানুষের যে দশাবিপর্যয় ঘটতো সেগুলোকে ঠেকাবার জন্য ব্রতক্রিয়ার উৎপত্তি হয়েছে। লোকসংস্কৃতির যে কোন সৃষ্টির পেছনে গণমানসের ভূমিকা আছে। মেয়েলি ব্রতের নিয়ম কানুন বা আচার-অনুষ্ঠানের রীতিপদ্ধতি কামনা ভেদে পৃথক এবং অঞ্চলভেদে পৃথক। মেয়েলিব্রত কামনাবাসনাপূর্ণ; মন্ত্রহীন, তার সঙ্গ প্রকৃতির একাত্মতা। কামনা-বাসনা চরিতার্থতার বৃহত্তর দিকের সমান্তরালে লোকায়ত যে রূপ, তার ভেতর দিয়েই

মেয়েলি ব্রতের উদ্ভব। মেয়েলি ব্রতের অন্যতম অঙ্গ হল 'আলপনা'। এ হল মানসিক কামনা-বাসনার প্রতীক। ব্রতের ছড়াগুলোর সঙ্গে ব্রতীর কামনার যে যোগ, ব্রতের আলপনাগুলোর সঙ্গে ঠিক সেই যোগ দেখা যায়। ব্রতের আলপনাগুলোকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন অবনীন্দ্রনাথ। একরকমের আলপনা অক্ষর বা চিত্রমূর্তি। এ যেন অনেকটা মিশরের চিত্রাক্ষরের মতো। এইসব আলপনায় মানুষ নানা অলংকারের কামনা করে পিটুলির গয়না আঁকে। মনস্কামনার মানচিত্র আলপনার মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়। যেমন, সেঁজুতি ব্রতের আলপনায় চন্দ্রসূর্য, ঘরবাড়ি, সুপুরিগাছ, রান্নাঘর, গোয়ালঘর প্রভৃতি ব্যাপক জীবনচিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়। আর এক ধরনের আলপনা শিল্পসৃষ্টি। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সেই শিল্প নারীর হৃদয়বৃত্তির পরিচায়ক। যেমন, চালতালতা, শঙ্খলতা, খুন্তিলতা, কলালতা— প্রভৃতি আলপনা পরিবেশকে সুন্দর করে তোলে। আলপনার ছবিগুলোকে অবনীন্দ্রনাথ শ্রেণীবিভাগ করেছেন। যেমন, ক) পদ্মগুলি, খ) লতামণ্ডপ, গ) গাছ, ফুলপাতা, ঘ), নদনদী ও পল্লীজীবনের দৃশ্য, ঙ) পশুপাখি, মাছ, জন্তু-জানোয়ার, চ) চন্দ্রসূর্য, গ্রহনক্ষত্র, ছ) আভরণ ও আসবাব, জ) আসনপিঁড়ি। আলপনার চিত্র স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়, কারণ ব্রতীর কামনার পরিচয় এর ভেতর দিয়ে গড়ে ওঠে। পিটুলি দিয়ে ছবি আঁকা হয় এবং শেষে ছড়ার ভিতর দিয়ে তা ব্যক্ত হয়। তাহলে ব্রত হল মনস্কামনার প্রতিচ্ছবি, আলপনায়, গীতে, ছড়ায় যেন তার প্রতিধ্বনি, আর প্রতিক্রিয়া নাট্যে নৃত্যে— সচল জীবন্ত কামনা। 'আদর-সিংহাসন' ব্রতে ব্রতী আদরের অভিনয় ক্রিয়া সংঘটন করে। 'ভাঁজো ব্রতে' শস্য কামনায় নারী পাঁচ রকমের শস্য ভিজিয়ে রাখার অভিনয় করে, 'বসুধারা ব্রতে' বৃষ্টি কামনায় বৃষ্টি ধারার অনুকরণ করা হয়। অবনীন্দ্রনাথ ছড়ায়, ব্রতের আচারে অভিনয়কলার পরিচয় দেখেছেন। নাট্য-নৃত্য-গীতকলার যথেষ্ট অবসর ব্রতের মধ্যে আছে বলে মনে করেন অবনীন্দ্রনাথ। 'মাঘমণ্ডলব্রতে'-র ছড়াকে তিনি তিনটি অঙ্কে বিভক্ত করেছেন। সেখানে ব্রতের ছড়াগুলো এক-একটি চরিত্র তা নাটকের সংলাপের মতো ব্যক্ত হয়েছে। সংলাপের মতো ছড়ার ব্যবহার 'ফুলাই ব্রতে' লক্ষিত হয়। সেখানে বহুরূপী বাঘের অনুকৃতিও অভিনয়ের দিককে স্পষ্ট করে। 'ভাজুলী ব্রতে'-র মধ্যেও নাট্য লক্ষণ বিদ্যমান। তাঁর মতে, ব্রতের আলপনা যেন নাটকের দৃশ্যপট। সংলাপধর্মী ছড়াও লক্ষ্য করা যায়।

বাংলার ব্রতগুলোর মধ্যে নানারকমের বৈশিষ্ট্য আছে।

ক) ব্রত একক ক্রিয়ানুষ্ঠান নয়, একের কামনা অন্যদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হয়।

খ) কামনা-বাসনার বাস্তব রূপায়ণের জন্য ব্রতের আয়োজন।

গ) বাংলার মেয়েলি ব্রতের পর্যায়গুলি হল-আহরণ, আচরণ, কামনাজ্ঞাপন, ব্রতশ্রবণ।

ঘ) আহরণ এর জিনিষপত্র— ঘট, আমশাখা, ফুল, দূর্বা, ধান, প্রদীপ, তুলসী, সিদ্ধি, বেলপাতা, হরিতকি, তিল, দুধ, চিনি. মধু, দই, ঘি, সশীষডাব, পান. পঞ্চশস্য,

সুপারি, চাল, চালের গুঁড়ো, কুলো, সিঁদুর, পিটুলি, গঙ্গাজল, আসনপিঁড়ি, চাঁদমালা, নৈবেদ্য, পাটকাঠি, চন্দনকাঠ প্রভৃতি।

ঙ) আচরণ হল ব্রতের পালিত নিয়মবিধি। শুচিবস্ত্রে উপবাসী থেকে ব্রতী ব্রত পালন করবে। প্রাতঃস্নান, উপবাস, আলপনা দেওয়া, পুকুরকাটা, ছড়া বলা, ব্রতকথা বলা— আচরণীয় নিয়ম।

চ) আলপনার অলঙ্করণে ব্রতীর কামনার রূপটি ধরা পড়বে। কামনার বাঙ্‌ময় প্রকাশ ঘটে আকাঙ্ক্ষার প্রতিমূর্তি স্বরূপ আঁকা ছবিগুলোতে। আলপনায় ফুল দেওয়ার পর কামনাজ্ঞাপক ছড়া উচ্চারণ।

ছ) এরপর ব্রতকথা শোনার পর্ব। এটা কতকটা ক্রিয়াকর্ম শেষ করে পাঁচজনে মিলে গল্প করার মতো। ছড়া-অংশটি বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির অংশ। আচরণ-অংশটি আচার-অনুষ্ঠান কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির অংশ, আর সমগ্র ব্রতের মধ্যে থাকে বিশ্বাস, বিশ্বাস-সংস্কারের অংশ।

জ) ব্রত হল কামনা-বাসনার আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া। এর মধ্যে ছবি, গদ্য, পদ্য, মণ্ডন শিল্প, ছড়ার সংলাপ, নাটকের মতো পাত্রপাত্রী, দৃশ্য, অঙ্ক থাকবে। ব্রতের মধ্যে উত্তরাধিকার সূত্রে চলে আসা নৃত্য, গীত, চিত্র, উপাখ্যান সবই থাকছে।

ঝ) বাঙালী জীবনের বহুমুখী ছবি ধরা পড়ে, আশা-আকাঙ্ক্ষার ভেতর দিয়ে প্রকাশিত হয় সমাজ-মানস।

ঞ) 'মানুষ ইচ্ছাকে হাতের লেখায় গলার সুরে এবং নাট্য নৃত্য এমনি নানা চেষ্টায় প্রত্যক্ষ করে তুলে ধর্মাচরণ করছে, এই হল ব্রতের নিখুঁত চেহারা।'

ট) ব্রতের মধ্যে একের কামনা উৎসব-ক্রিয়ার ভেতর দিয়ে সকলের কামনা ও আনন্দের প্রকাশরূপে পরিগণিত হয়।

ব্রতের মধ্যে ঐতিহাসিক ও নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়। অবনীন্দ্রনাথ কখনো ঐতিহাসিক, কখনো সমাজতাত্ত্বিক, কখনো নৃতাত্ত্বিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। সমাজজীবনের ছবি ফুটে উঠেছে 'সেঁজুতি ব্রতে।' এখানে বাঙালী নারীর ঐকান্তিক কামনা ফুটে উঠেছে।

ময়না, ময়না, ময়না।
সতিন যেন হয় না।

* * * *

সতিন মাগি মরতে যাচ্ছে
ছাদে উঠে দেখি
বঁটি বঁটি বঁটি।
সতিনের শ্রাদ্ধে কুটনো কুটি।

কৌলীন্য প্রথার ফলে পুরুষের বহু-বিবাহ প্রচলিত ছিল। সতিনের সংসার যেহেতু নারীর কাছে দুর্বিষহ, তাই ব্রতের মধ্যে বাঙালী নারী তাব ঐকান্তিক প্রার্থনা জানায়,

সতিন যেন না হয়। এই ব্রতটিতে নারীর মনস্তত্ত্বের প্রকাশের আড়ালে সমাজের ছবি পরিস্ফুট হয়েছে। কয়েকটি ব্রতের ছড়ায় সমসাময়িক সমাজজীবনের চাওয়া-পাওয়ার দিক, মেয়ে-জামাই-সন্তানের সুখ, 'সাত ভায়ের বোন হয়ে, সাবিত্রী সমান হয়ে' বাঁচার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেয়েছে। যেমন,

'দরবার-আলো বেটা পাব
সভা-আলো জামাই পাব
কিংবা,
'কোঁড়ার মাথায় ঢালি ঘি
আমি যেন হই রাজার ঝি'
কিংবা,
'ব্রতী হয়ে মাগলাম বর
ধনে পুত্রে পুরুক বাপ-মার ঘর।'

এছাড়া প্রচলিত আকাঙ্ক্ষার ছড়া লক্ষণীয়

'আমি সতী লীলাবতী
ভাইয়ের বোন পুত্রবতী
হয়ে পুত্র মরবে না
পৃথিবীতে ধরবে না'।

'ভাদুলি ব্রতে' বাঙালির বাণিজ্য যাত্রার ছবিটি ইতিহাস প্রসিদ্ধ।

'নদী নদী কোথা যাও?
বাপ-ভায়ের বার্তা দাও।
নদী নদী কোথা খাও?
সোয়ামী-শ্বশুরের বার্তা দাও।'

বাঙালী যে যুদ্ধে ভীরু ছিল না তার পরিচয় পাই 'রণে এয়ো' ব্রতে। সেখানে সতী নারী সিঁদুরের কৌটো ধরে বলে, 'রণে রণে এয়ো হব।' কিছু কিছু শাস্ত্রীয় ও অশাস্ত্রীয় ব্রতে নৃতাত্ত্বিক (Anthropological) লক্ষণ এবং অনুকরণমূলক যাদুর পরিচয় ফুটে উঠেছে। মেয়েলি ব্রত অনার্যদের কাছ থেকে এসেছে এবং উত্তরাধিকার সূত্রে পরিস্ফুট হয়েছে। সমাজ-নৃবিজ্ঞানের পরিচয় ঘটেছে ব্রতীর উপচার আহরণের ক্ষেত্রে। শুয়োরের দাঁত, নারকেলের মালা, হলুদ মাখানো ডাব, পেঁচার ছবি— অনার্য প্রভাবজাত, আবার লক্ষ্মীব্রতের প্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন 'আদর সিংহাসন' ব্রতে মনুষ্যমূর্তি পূজা যাদু-ভাবনা জাত। শিকার করবার আগে শিকারীরা শত্রু-মূর্তি গড়ে তাতে তীর মারতো। লক্ষ্য- শত্রু ধ্বংস করা। এখানেও যাদু-ভাবনা ক্রিয়াশীল। আর তার মূর্তিমতী কামনাকে অর্পণ করছে এবং জানছে যে তার কামনা চরিতার্থ হবে। 'বসুধারা ব্রত' এবং 'ভাঁজো ব্রতে'ও যাদুর প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।

কিছু বাংলাব্রতের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি উল্লেখ্য। বাঙালী নারীরা বিশেষতঃ যে সব

পালা-পার্বণ ব্রত অনুষ্ঠান করেন বছরভোর তার ওপরই আমাদের উচ্চতর ও লৌকিক সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত। ব্যাপক ও বৃহৎ ঐতিহ্যময় ব্রত হল 'লক্ষ্মীব্রত' (শাস্ত্রীয় ব্রত)। এ ব্রতের বিনাশ নেই। বাঙালী নারীরা ধনসম্পদ ও সৌভাগ্যের কামনায় এই ব্রত পালন করে। তবে এই ব্রতে পুরুষ এবং বাড়ীর সকলের অংশ গ্রহণ ও ছড়াপাঠ, ব্রতপাঠ ঐতিহ্য। লক্ষ্মীপুজোর পূর্বে 'অলক্ষ্মী বিদায়' পর্ব পুরোহিতকে দিয়ে সারা হয়। সবুজবর্ণ, হলুদবর্ণ ও অরুণালক্ষ্মীর পরিচয় দিয়েছেন অবনীন্দ্রনাথ। গৃহস্থবাড়ি কিংবা নির্দিষ্টভাবে কৃষক বাড়িতে লক্ষ্মীপুজো হয় ফসল -উৎপাদনকে কেন্দ্র করে। দেশভেদে লক্ষ্মীপুজোর তুলনামূলক দিকের পরিচয় দিতে গিয়ে পেরু এবং মেক্সিকোর-র পুজো এবং দেবতার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। 'তোষলা বা তুষ-তুষলি' ব্রত একটি কুমারী ব্রত। পৌষ মাস জুড়ে এই ব্রত পালনে লাগে আতপ চালের তুষ মিশিয়ে ১৪৪টি নাড়ু, সরষে ফুল। ব্রত পালিত হয় ছড়া বলতে বলতে।

তুষ-তুষলি কাঁধে ছাতি।
বাপ-মার ধন যাচাযাচি।
স্বামীর ধন, নিজপতি।
বাপের ধন কান্নাকাটি।
পুত্রের ধন পরিপাটি।

মেক্সিকোর ব্রতের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা করে অবনীন্দ্রনাথ বাংলা ব্রতের বিশ্বব্যাপকতার পরিচয় দিয়েছেন। 'অশ্বত্থপাতা ব্রত' পালন করা হয় বৈশাখ মাসে। চারবছরের ব্রত, মূলতঃ বৃক্ষবন্দনা। ব্রতটির কামনায় আছে সুসন্তান, ঐশ্বর্য, সম্পদ অবৈধব্য। ব্রতের ছড়ার সঙ্গে প্রকৃতি এসে যুক্ত হয়েছে।

অশ্বত্থ পাতা কুঞ্জলতা চমকা সুন্দরী
গঙ্গাস্নান করতে গেলেন শ্যাম পণ্ডিতের ঝি
-ইত্যাদি

তিন বনসুন্দরীর সঙ্গে সেজেগুজে ব্রত করতে বেরিয়েছেন শ্যামপণ্ডিতের ঝি। কেউ পাকা পাতার তামাটে লাল, কেউ কাঁচা পাতার সতেজ সোনালী সবুজ, কেউ কচি পাতার কোমল শ্যাম, কেউ শুকনো পাতার তপ্ত সোনা, কেউ ঝরা পাতার পাণ্ডুব রঙে সেজেছে। খাঁটি ও আশ্চর্যরকম সৌন্দর্যে রসে শিল্পে পরিপূর্ণ বাঙালীর নিজের ব্রত। অঘ্রাণ মাসে 'সেঁজুতি ব্রত', পিটুলির ছবি ও প্রদীপ নিয়ে এই ব্রত। আলপনাগুলো প্রতীকী, সুখ-দুঃখের এক অকপট অভিব্যক্তি। এখানেও নারী মনস্তত্ত্ব, সতিন সমস্যা। ছড়ায় আছে—

ময়না ময়না ময়না।
সতিন যেন হয় না।
হাতা হাতা হাতা
খা সতিনের মাথা

আবার,

অসৎ কেটে বসত করি,

সতিন কেটে আলতা পরি।

'মাঘমণ্ডল ব্রত' এবং 'সস্‌পাতার ব্রত' (ভাঁজো ব্রত) কুমারী ব্রত। প্রকৃতির বিবর্তন হচ্ছে বিভিন্ন ঋতুতে। তার পরিবেশের সঙ্গে মিলিয়ে ব্রতগুলো পালন করা হয়। গ্রামবাংলায় কুমারী মেয়েরা আঞ্চলিকভাবে নানারকম ব্রত পালন করে। বর্ধমান-হুগলী -বাঁকুড়ায় এরকম একটি ব্রত প্রচলিত। সেখানে নানা রীতির সঙ্গে তুলসীতলায় মন্ত্রপাঠসহ কামনা নিবেদন আছে। ছড়ার ভেতর দিয়ে তার পরিচয় ফুটে ওঠে।

দশ পুতুলের বেতো করি

দশহারার সেবা করি।

* * * *

রামের মত পতি পাব

লক্ষ্মণের মত দেবর পাব,— ইত্যাদি।

কার্তিক ব্রত উপলক্ষে পূর্ববঙ্গের বিবাহিতা নারীরা সমস্ত রাত্রিব্যাপী গীত-কে প্রাধান্য দেয়। এ হল কৃষিব্রত। এগুলো calendric অনুষ্ঠান সঙ্গীত।

'পক্ষীরে, আরে রে, বাবুইরে, ক্ষেতের পাক্‌না ধান খাইলে।'

পৌষপার্বণ ব্রত উপলক্ষে (Harvest festival) ছড়া ও সঙ্গীত প্রচলিত আছে।

এস পৌষ যেওনা

জন্ম জন্ম ছেড়ো না।

ভাতের হাঁড়িতে থেকো।

পৌষ যেও না।

মধ্যভারতের উপজাতীয় বালিকাদের মধ্যে 'ভাজলি' নামক এক উৎসব প্রচলিত আছে যা ভাদ্রমাসেই অনুষ্ঠিত হয়। 'ভাজো' উৎসব ও ব্রতের সঙ্গে এর মৌলিক সম্পর্ক থাকতে পারে। রূপকথার একটি গল্পে বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য 'সঙ্কটার ব্রত' করবার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। ব্রতের বয়স যে দীর্ঘতর তার প্রমাণ পাওয়া যায় এখান থেকে। সর্বোপরি বলবো, বাংলার অধুনাকালের ব্রতকথা পুরাকাহিনীর অন্তর্গত। পুরাকাহিনী লোকসাহিত্য, পুরাণ ধর্মীয় রচনা। লোকজীবন ধারার সঙ্গে সম্পর্কায়িত ব্রত আচরণ এবং ব্রতকথার সিদ্ধি লোকসাহিত্যে দেখতে পাই। অতি আধুনিক কালে গ্রাম বাংলায় পূজাসূত্রে ব্রতকথা (লৌকিক) প্রচলিত। তবে সভ্যতার বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ব্রতকথার রীতিও বিবর্তিত হচ্ছে। আধুনিক মানুষের সময়ের অভাব। দেবদেবীর প্রতি ভক্তি হয়তো মনে মনে থাকে, কিন্তু দলবদ্ধভাবে ব্রতপালনের ক্রিয়াপ্রক্রিয়া (rituals) এবং উৎসব, ছড়া ও সঙ্গীতের আনুষ্ঠানিক পরিচয় বর্তমানে বিরলদৃষ্ট।

পরীকথা ও ফারসী সাহিত্যের এক পরীকাহিনী 'সয়ফল-মুলুক-ওয়াবাদী উজ্‌জামান'

প্রদ্যোত ঘোষ

বাংলায় 'পরী' শব্দটি ফারসী 'পরী' থেকে জাত। পর (পক্ষ)- যুক্ত অপ্সরা বিশেষ এই 'পরী'-বলে জানিয়েছেন অভিধানকার হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্যদিকে জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস শব্দটি সংস্কৃত অপ্‌সরা — অপ্‌সরী থেকে আগত বলে মনে করেন। পক্ষযুক্ত সুশ্রী দেবযোনী বিশেষ এই পরী। পরমাসুন্দরী দিব্যাঙ্গনা— এই পরী। অর্থাৎ ভারত উপমহাদেশে পরী নারী বিশেষ। কিন্তু ইউরোপীয় সাহিত্যে বা লোকশ্রুতিতে এমন চিত্র মেলে না।

ইংরেজী Fairy শব্দটি প্রাচীন ফরাসী (french) ভাষার Faerie থেকে জাত— যার অর্থ জাদুকরী। ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতাসম্পন্ন পক্ষযুক্ত কাল্পনিক ক্ষুদ্র প্রাণী বিশেষ। এই ইংরেজী শব্দটি ল্যাটিন শব্দ Fature Fate, অন্ত্যল্যাটিন শব্দ Fata থেকে উদ্ভূত। মধ্য ইংরেজীর অর্থ হল— ১। যাদুকরণ, ২। যে দেশে মায়াবিনীরা অবস্থান করে।

আসলে 'পরী' এক অলৌকিক চরিত্র। এরা সাধারণতঃ অদৃশ্য। এরা কখনো উপকারী, কখনো খল বা বদ অর্থাৎ বিপজ্জনক। কখনো এরা অনিষ্টকারী। অর্থাৎ এক অর্থে খেয়ালী চরিত্র এই পরীদের। মানুষের জীবন ও জগতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকে তারা।

অবশ্য রোমান ও ইংরেজী ভাষায় Fays, Fees, Faeries কিন্তু পশ্চিম ইউরোপীয় সংস্কৃতিতে সীমাবদ্ধ নয়। পৃথিবীর সর্বত্রই বিভিন্ন নামে এদের খবর মেলে। তবে এশিয়া ও ইউরোপে এদের সম্পর্কে নানা কাহিনী ও লোককথা ব্যাপকভাবে প্রচলিত। কিন্তু আমেরিকা ও আফ্রিকায় পরীদের কথা এত ব্যাপকভাবে প্রচলিত নয়।

সমগ্র পৃথিবীতে পরীদের সম্পর্ক কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। যেমন তারা অতিক্ষুদ্র, অধিকাংশ সময়ে পিগ্‌মির মত, ইচ্ছানুসারে তারা অদৃশ্য হতে পারে, ঐন্দ্রজালিক টুপী পরে ইত্যাদি। সাধারণতঃ তারা দীনহীন কুটীরের নীচে বা পাহাড়ের পাদদেশে অথবা স্তূপীকৃত শিলাখণ্ডের ভিতরে থাকে। পুরুষ পরী সবুজরঙের পোষাক পরে। কখনো তাদরে গায়ের রঙ এবং চুল সবুজ রঙের। সাদা রঙ পরীদের সঙ্গে গভীরভাবে কল্পিত। আবার নিঃসঙ্গ বা একা একা যে সব পরীরা ঘুরে বেড়ায় তাদের রঙ বাদামী বা ধূসর বর্ণের।

সাধারণত পরীরা ক্ষতিকারক নয়। এমন কি তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে শিশু অপহরণের প্রকৃতিও দেখা যায়। তবে সেখানে তারা ক্ষতি করে না। কেবল মজা করে।

অবশ্য তাদের সঙ্গে কুব্যবহারে তারা প্রতিশোধ গ্রহণে বদ্ধ পরিকর হয়। যেমন গৃহ ভস্মীভূত করে বা শস্যাদি নষ্ট করে। রঙ্গতামাসা তাদের চরিত্রের বিশেষ দিক। যেমন মাঠের গরুর দুধ দুইয়ে বা পরিচ্ছদ নষ্ট করে বা দুধ নষ্ট করে তারা কৌতুক করে। তবে পরীরা উপকারীও বটে। তারা কখনো দরিদ্রদের ভোজন সামগ্রী দিয়ে বা অর্থ দিয়ে, অথবা শিশুদের খেলা দিয়ে বা ডাইনীদের সম্মোহনী শক্তিকে বিনষ্ট করতে পারে।

প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে পরীদের জন্মেতিহাস সম্পর্কে বহু তত্ত্ব আছে। তন্মধ্যে একটা তত্ত্ব হল যে বর্তমান লোকসাধারণ কর্তৃক আদি বিজিত জনগণের লোকশ্রুতিতে তাদের জন্ম হয়েছে। এইসব অবশিষ্ট বিজিত মানুষ পাহাড় বা গুহায় তাদের বিজয়ীদের ভয়ে বাস করতো। স্বাভাবিক ভাবে তারা সকলের নজর এড়িয়ে রাত্রিতেই অভিযান চালাতো। এই সময়েই তাদের অদ্ভুত এবং অলৌকিক বস্তুর ব্যাখ্যানের অতিরেকই এমন চরিত্র সৃষ্টির সহায়ক হয়েছে।

দ্বিতীয় তত্ত্বটি হল— পরীরা গুরুত্বহীন চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের এক রূপ। অর্থাৎ প্রাচীন এক শ্রেণীর দেবতাদেরই নূতন রূপে আবির্ভাব।

তৃতীয় তত্ত্ব হল— পরীরা আদিম প্রকৃতির আত্মারই প্রতিমূর্তি। আদিম মানুষরা বিশ্বাস করতো যে প্রতিটি বস্তুই তার বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক চরিত্রকে প্রকাশ করে। যেমন তাদের মধ্যে পরবর্তী যুগে বৃক্ষের আত্মা বনপরী রূপে আবির্ভূত হয়েছে।

চতুর্থতত্ত্বে তাদের মৃতদের আত্মা বলা হয়েছে। কারণ সাধারণতঃ তারা মাটির নীচে থাকে বলে বিশ্বাস।

এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে পরীদের দুটি বৃহৎ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। যেমন :-

১. সুসংবদ্ধভাবে পরীরা এক দেশে একই জাতি হিসেবে বস-বাসকারী।

২. বিশেষ বিশেষ স্থানে বা পেশায় যুক্ত পৃথক পৃথক পরী।

পরীর গল্প বা Fairy Tale মরণশীলদের সঙ্গেই যুক্ত দেখা যায়। এদের মধ্যে কতিপয় সাধারণ ধর্ম দেওয়া যায়।

যেমন— ১. পরীরা মরণশীল মানুষদের সাহায্য করে।

২. পরীরা মরণশীল মানুষদের ক্ষতিসাধন করে।

৩. পরীরা বিশেষ কারণে মরণশীল মানুষকে অপহরণ করে।

৪. পরীরা পরিবর্তনশীল।

৫. পরীর দেশে নশ্বর মানুষদের ভ্রমণ।

৬. পরীপ্রভু বা পরীপ্রেমিক।

পরীরা মানুষকে বিভিন্ন ব্যাপারে সাহায্যও করে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ইংরেজীতে পরীবাদ এসেছে জার্মানীর ক্ষুদ্রাকার বামনাকার জীব (Dwarf-elf) ভাবনার সঙ্গে পার্বত্য প্রদেশের কেল্‌ট (Celt) জাতির চিন্তা-চেতনাকে যুক্ত করে। তাবে তাদের সাহিত্যে পরী-ঐতিহ্য ফরাসী রোমান্সের মাধ্যমেই উদ্ভুত।

আরও একটি কথা। তা হল এই যে ইউরোপে পরী পুরুষ চরিত্র। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্য ও ভারতীয় ভাবনায় তারা নারী বিশেষ।

উপরিউক্ত পরী-ভাবনার প্রেক্ষাপটে সপ্তদশ শতকের ফারসী সাহিত্যে লৌকিক উপাদানে রচিত শুহুদ-এর (প্রকৃতনাম মীর আবুল মাকারিন) 'সয়ফল মুলুক ওয়াবাদী উজ্‌জামান' গ্রন্থের পরী কাহিনী বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক। এই গল্প কাহিনীর সংক্ষিপ্ত রূপরেখা এমনভাবে উপস্থিত করা যায় ঃ

প্রাচীনকালে মিশরের এক সম্রাট ছিলেন। আজিম শাহ। বিশাল তাঁর সাম্রাজ্য ও অতুল তার ধনৈশ্বর্য। আপাত দৃষ্টিতে তাঁর কোন অভাবই ছিল না বটে। কিন্তু একটি অভাব তাকে প্রতিনিয়ত দগ্ধ করতো। তা হল— তাঁর কোন সন্তান ছিল না। সম্রাটের এই মর্ম যাতনা স্বাভাবিক ভাবেই রাজকার্য পরিচালনাতেও প্রভাব ফেলায় রাজত্বও সেইভাবে চলছিল। তিনি কেবলমাত্র ঈশ্বরের প্রতি নিবিষ্ট ছিলেন এ ব্যাপারে। সভাসদদের সান্ত্বনাও তিনি অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করায় অপারগ ছিলেন।

এরই মধ্যে একদিন রাজজ্যোতিষী গণনা করে তাঁকে পুনরায় বিবাহ করার পরামর্শ দেন। জ্যোতিষীর কথা তাঁর মনে ধরায় তিনি ইয়েমেনের সম্রাট শাহতান শাহ-এর কন্যাকে বিবাহ করেন। এবং ঈশ্বরের অপার করুণায় তাঁর এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। সম্রাট তার নাম রাখেন— সয়ফল। পুত্রের মুখ দেখে প্রতিনিয়ত সম্রাট খুশী ও সুখী।

ক্রমে সয়ফল কুড়ি বছরের সুন্দর যুবক হয়ে উঠল। একদিন সয়ফল সম্রাটের নিজস্ব কক্ষে এক অসামান্যা রূপবতী নারীর চিত্র দেখে গভীর প্রেমে পড়ে গেল। ঐ চিত্রটির নীচে লেখাছিল—"গুলিস্তান-ই-ইরান-'এর পরী।"

সয়ফল দিনে দিনে এই পরীর প্রেমে এমনই উন্মত্ত হয়ে উঠল যে তার খোঁজে সে নানান দেশ পরিক্রমা শুরু করল। কারণ এই পরীকে হৃদয়সঙ্গিনী করা ছাড়া সে অন্য কিছুই ভাবতে পারে না। সয়ফল চীন, জাঞ্জিবার প্রভৃতি নানান দেশ পরিক্রমা করেও তাকে না পেয়ে উন্মত্ত হয়ে উঠল। সে অসংখ্য বিপদ-আপদ থেকে উদ্ধার পেল। বহু দৈত্য-দানবের হাত থেকেও উদ্ধার পেল। এমন করে শেষ পর্যন্ত সয়ফল ইসপানদিয়ার দ্বীপে গিয়ে পৌঁছুল।

এই দ্বীপে ছিল এক বিরাট দুর্গ। যুবরাজ সয়ফল সেই দুর্গে প্রবেশের সময় দুর্গের কক্ষের সম্মুখে দেখে একটি সিংহমূর্তি। সেই সিংহমূর্তির গলদেশে ঝুলানোছিল এক যাদুর কবজ। সেই যাদুর কবজ পেরিয়ে সয়ফল এক কক্ষে প্রবেশ করতেই এক অনিন্দ্যসুন্দরী কন্যাকে দেখতে পায়। আসলে এই অসামান্যা সুন্দরী হচ্ছে সিংহলের রাজকন্যা মালিকা বা মুলুক। রাজকন্যার রূপের বর্ণনাটিও অসামান্য। যেমন ঃ-

দীদ নাজেক তানী চো
পিকার হোর।
হাকায়ে তাম ওয়া আতলাস্
ওয়া সায়ফোর।

(তার দেহের লাবণ্যে স্বর্গের হুরের জ্যোতি জ্বলে এবং তার আবরণ ও আভরণ কী উল্লাসে খেলা করে)।

দৈত্য ও দানবেরা এই রাজকন্যাকে বন্দী করে রেখেছিল এই দুর্গে। তবে সেখানে বলা ছিল — 'যে নদীর ধারে একটি গাছে ঝুলানো খাঁচায় আবদ্ধ পাখীটি বধ করতে সক্ষম হবে— সে-ই এই কন্যাকে লাভ করবে।'

এদিকে মুলুকের প্রতি সয়ফলের সুগভীর প্রেম ও তাকে পাওয়ার জন্য দুর্গম পথে যাবার কথা জানতে পেরেছিল এক পরী। এই পরীর সহানুভূতি ও প্রচেষ্টাই সয়ফলকে তার প্রেমিকাকে পাওয়ায় সহায়ক হয়। এই পরীই প্রতি মাসে একবার মালিকাকে দেখতে আসতো। এই পরীর সহায়তায় সয়ফল শেষ পর্যন্ত পাখীটিকে বধ করতে সক্ষম হল এবং মালিকাকে উদ্ধার করল।

এদিকে সিংহলের রাজা তাঁর কন্যার বন্দীদশা থেকে মুক্তির খবর পেয়ে তাদের আমন্ত্রণ জানান। সেখানে সয়ফল, মালিকা ও পরী উপস্থিত হল। অনুষ্ঠিত হল এক বিরাট আনন্দানুষ্ঠান এবং এই অনুষ্ঠানেই সয়ফল ও মালিকা মুলুকের হল বিবাহ।

আসলে ফারসী সাহিত্যের এই লোককাহিনী ভারতীয় উপমহাদেশে প্রচলিত অনেক লোককাহিনীরই রূপান্তর বিশেষ।

সম্রাট কক্ষের চিত্রে রূপায়িত মুলুকের নাম ছিল— গুলিস্তান-ই-ইরানের পরী। কিন্তু এই মুলুক প্রকৃত পরী নয়। অনিন্দ্যসুন্দর বলেই তাকে কল্পিতা সুন্দরী পরী হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। প্রকৃত পরীর এমন বন্দীদশায় থাকার কথা নয়। তাদের যাদুকরী প্রভাবই এ ব্যাপারে সবচেয়ে বড় সহায়। প্রকৃত পরীর ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতাই তো তাকে দৈত্য-দানবদের কাছ থেকে রক্ষা করতে পারতো। সুতরাং কল্পিতা পরমাসুন্দরী হিসেবেই মুলুক 'পরী' হিসেবে সর্বসাধারণের কাছে পরিচিতা ছিল। কিন্তু যে পরী মালিকা বা মুলুককে প্রতিমাসে একবার দর্শন করতে আসতো, তার মুলুকের প্রতি সৌন্দর্যতৃষ্ণা মেটানোর কারণেই সে-ই এখানে আসল পরী। তার এই আকাঙ্ক্ষা বিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ সিগমুণ্ড ফ্রয়েড, কার্ল ইয়ং এবং ব্রুনো বেটেলাহাইম প্রমুখের বিশ্বজনীন আকাঙ্ক্ষারই প্রকাশক। এরই সঙ্গে নিগৃহীত বা দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের হিতৈষী হিসেবেই শেষ পর্যন্ত সয়ফলকে সাহায্য করেছে এবং তার অকৃত্রিম প্রেমকেও সে মর্যাদা দিয়েছে বলে পাখী হত্যা করার কৌশল যেমন তাকে শিখিয়েছে, তেমনই পরিণামে মিষ্টিমধুর মিলন সভার সে সাক্ষী হয়ে রইল। তার মিলনান্ত পরিণামের এই পরীই অনুঘটক।

সূত্র :—

১. Maria Leach- Dictionary of Folk lore etc.
২. Encyclopaedia Britanica, 2010
৩ আবদুস সাত্তার— ফারসি সাহিত্যে লৌকিক উপাদান।

লোকপুরাণ : একালের এক বীক্ষা

অচিন্ত্যকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

মানুষের চরিত্রের আন্তর্বয়নে যুক্ত রয়েছে প্রকৃতিকে অতিরঞ্জন করে প্রকাশের চেষ্টা। ফলে পুরাণে যা হয়েছে তার মূলে কিছু সত্য থেকে থাকলেও তা কালের ব্যবধানে বিকৃত বা পরিবর্তিত হয়ে আমাদের কাছে উপস্থিত হয়েছে যার মধ্য থেকে প্রকৃত সত্যের সন্ধানলাভ দুরূহ। কেউ কেউ মনে করেন, লোকপুরাণ একেবারে আদিম কালের রচনা যখন মানুষের কল্পনাশক্তি তত প্রখর ও ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠেনি। যা প্রত্যক্ষগোচর হয়েছে তাকে বিশ্লেষণের পরিবর্তে পুনারাবৃত্তির প্রকাশই বড় হয়ে উঠেছে।

লোকপুরাণ লোকসংস্কৃতির এক বিশিষ্ট ক্ষেত্র রূপে চিহ্নিত। লোকসংস্কৃতির প্রতীকী রূপে বিশ্বাস ও তৎপ্রসূত নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া একটা বিশাল সাক্ষ্য বহন করে এই বিভাগটিতে। বিশ্বাসের সাথে ধর্মের কথা সবার মনেই মিশে যায়। বিশ্বজুড়ে নানান লোকবিশ্বাস ও কুসংস্কার লোসসমাজে যে যথেষ্ট পরিমাণে আজকের দিনেও সক্রিয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কখনো আঞ্চলিক অনুষ্ঠানাদিতে, কখনো বা লোকাচারে, প্রাকৃতিক জাদুবিশ্বাস জনিত নানা অনুষ্ঠান—যেমন গ্রহণ, বৃষ্টি নামানো, টিকটিকির অবস্থান, ভূমিকম্পের সময় বাসুকী সাপের মাথা নাড়ানো ইত্যাদি ঘটনার অনুষঙ্গ আসে। প্রকৃতপক্ষে আকাল, ব্যাধি, মহামারী. খরা. বন্যার কবল থেকে পরিত্রাণ পেতে এবং একধরনের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে মানুষকে হতে হয়েছে সংগ্রামশীল। যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে প্রতিপক্ষের সঙ্গে। প্রকৃতির পরাজয় স্বীকার করে মানুষ এখানে গোষ্ঠীবদ্ধভাবে একটা বিশ্বাসকে লালন করতে চেয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে বিশ্বচরাচরের অসংখ্য বিষয়ের প্রকৃত উপলক্ষ সম্পর্কে আদিমকাল থেকেই মানুষ নানা ধরনের সংস্কার ও বিশ্বাস মণ্ডিত ব্যাখ্যা কল্পনা করে এসেছে, সেগুলি কাহিনি রূপে সংগঠিত হয়ে লোকপুরাণে পরিণতি পেয়েছে। তাই লোকপুরাণ হল মানুষের আদিমতম সাহিত্য।

গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের জীবনে বা তার স্থানিক প্রাকৃতিক পরিবেশে ঘটে যাওয়া বুদ্ধির অসম্ভাব্য ঘটনা, বস্তু বা বিষয়ের অন্তর্নিহিত কারণ খুঁজে বার করতে চেয়েছে মানুষ যুগে যুগে। পারিপার্শ্বিক অভিজ্ঞতা থেকে জন্ম নেওয়া সহজাত সংস্কারে বিশেষত ধর্মবিশ্বাস ও দৈবনির্ভরতার সংগে মানুষ প্রাকৃতিক নানা ঘটনাকে সংযুক্ত করে দেওয়ার চেষ্টা চালিয়েছে।

লোকপুরাণ যে প্রেক্ষিতেই গড়ে উঠুক না কেন, তার মধ্যে অন্তর্লীন হয়ে থাকে মানসলোকের সুগভীর কতকগুলি বাস্তব প্রতীতি (Impression)। সেজন্যেই, আদিম মানুষরা যেসব একান্ত বাস্তব ঘটনাগুলির দৈব নির্ভর ব্যাখ্যা দিয়েছিল, সেগুলি আসলে প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানবোধ সৃষ্টির আগে মানুষের রূঢ় বাস্তব অনুভূতি থেকে উৎসারিত বিজ্ঞানমুখিনতাকে প্রকাশ করে।

লোকপুরাণকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভাজন করা হয়েছে (**বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ** অনুসারে) তা হল—

১) বিশ্বজগৎ সৃষ্টি বিষয়ক।

২। মহাপ্রলয় বিষয়ক।

৩) দেবতার উদ্ভব সম্পর্কিত।

৪) মানুষ ও জীবজন্তুদের জন্মসংক্রান্ত।

৫) বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনার কারণ সম্পর্কিত।

৬) পশুপাখিদের শারীরিক বৈশিষ্ট্য সূচক।

৭) সামাজিক রীতিনীতি মূলক।

মধ্যযুগে বাংলার মহাকাব্যের কথাকার স্বয়ং কৃত্তিবাস লোকপুরাণের আখ্যানকে যথেষ্ট মুন্সিয়ানার সাথে ব্যবহার করেন। 'হরিশচন্দ্র উপাখ্যানে' তিনি নিপুণভাবে তুলে ধরেন রাজা হরিশ্চন্দ্রের স্বর্গারোহণের অক্ষমতার প্রসঙ্গকে। একদা রথে আরোহণ করে হরিশ্চন্দ্র যখন সশরীরে স্বর্গের নিকটবর্তী স্থানে চলে আসেন সেসময় ধর্মরাজ তাকে জিজ্ঞাসা করেন, কোন কোন কারণে তিনি এই নরদেহ ধারণ করেই স্বর্গলোকে আসতে পারছেন। তখন হরিশ্চন্দ্র ধর্মদেবতার প্রশ্নের উত্তরে সবিস্তারে জানান তাঁর সারাজীবনব্যাপী বিরাট কর্মকাণ্ডের বর্ণনা। তাঁর বর্ণনা চলাকালীন দেখা যায়, যে রথে চড়ে তিনি উপরে উঠছিলেন, সেটা নিচে নেমে আসছে। এই গল্পের মূল কথা হল ব্যক্তিগত সুকৃতির প্রশংসাবাদ কখনোই স্বকণ্ঠে উচ্চারণ করা উচিত নয়। একইসঙ্গে ঐ রামায়ণী কথায় পাই লোকপুরাণ প্রসিদ্ধ সীতাদেবীর দশরথের মৃত আত্মার উদ্দেশে পিণ্ডদানের কথা। সেখানে নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে দেখে সীতাদেবী এগিয়ে আসেন পিণ্ডদানের জন্য। কিন্তু এই কাজ তিনি রামের অনুপস্থিতিতে করছেন। তাই পরবর্তীকালে প্রভু রামের গোচরে নিয়ে আসার জন্যে তিনি সাক্ষ্যস্বরূপ তুলসীগাছ, ফল্গুনদীর ধারা আর চন্দ্রকে বলে রাখেন। এর বেশকিছুক্ষণ পরে রামচন্দ্র সেখানে উপস্থিত হয়ে সীতাদেবীর পিণ্ডদানে বিস্ময় প্রকাশ করলেন। তখন একে একে তুলসী, ফল্গু আর চন্দ্রের কাছে গিয়ে সাক্ষ্যদানের জন্য আর্জি জানান। কিন্তু তারা কেউই সাক্ষ্যদানে সম্মত হলেন না। এতে সীতাদেবী নিরাশ হন এবং মিথ্যাবাদী হয়ে ওঠেন রামচন্দ্রের চোখে। এমতাবস্থায় রাগান্বিতা সীতা তাঁর তিন সাক্ষীকেই অভিশাপ দেন। তুলসীগাছকে উদ্দেশ করে বলেন, তুলসীর পবিত্রতা নষ্ট করবে কুকুর মূত্রত্যাগ করে,

বহমান ফল্গু নদীটি হবে অন্তঃসলিলা আর যে চন্দ্র সীতাদেবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, সে মাঝে মাঝে রাহু এবং কেতুর দ্বারা আচ্ছন্ন হবে।

লোকপুরাণ অনুসারে কার্তিকের চিরকৌমার্য লাভের ক্ষেত্রেও একটি গল্পকথা প্রচলিত আছে। ঊষার সঙ্গে কার্তিকের বিবাহ অনুষ্ঠিত হবে। কার্তিক বর সেজে বরযাত্রীদের নিয়ে বাড়ি থেকে রওনা দিলেন। কিছুদূরে গিয়ে তাঁর মনে পড়ল হাতের দর্পণটি বাড়িতে ফেলে এসেছেন। দর্পণ আনতে ঘরে গিয়ে দেখেন পার্বতী কুলোর আড়ালে চারটে মহিষের পোড়া মাংস দিয়ে ভাত খাচ্ছেন। এদৃশ্য কার্তিক আশা করেননি, তিনি পার্বতীকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। পার্বতী বলেন, বাড়িতে বৌ আসবে। তখন সে পাঁচখানা জিনিসের মধ্যে একটি মাত্র খেতে দেবে কিংবা কোনদিন হয়তো তাও দেবে না। তাই তিনি জন্মের সাধ খেয়ে নিচ্ছেন। একথাশুনে কার্তিক বিমর্ষ হন এবং ভবিষ্যতে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

পাশাপাশি গণেশের জন্মরহস্য এক চমৎকার পৌরাণিক আখ্যানে ধরা পড়েছে।

হিমালয়ের কন্যা পার্বতীর সঙ্গে শিবের বিবাহ হওয়ার দীর্ঘদিন পরেও পার্বতীর কোন সন্তান না হওয়ায় বিষ্ণুকে সন্তুষ্ট করার জন্য পার্বতী পুত্রক ব্রত পালন করেন। একবছর ব্রত উদ্‌যাপনের পর বিষ্ণু সন্তুষ্ট হয়ে বরদান করেন। যথাসময়ে পার্বতীর এক শিশুপুত্র হয়। শনিসহ সবদেবতারা সদ্যোজাত সন্তানকে দেখতে আসেন। শনি তার অভিশাপের কথা জানতেন। যার ফলে তিনি এই শিশুর মুখদর্শন করতে চাননি। কিন্তু পার্বতীর বিশেষ অনুরোধে শনি বাধ্য হয়ে শিশুটিকে দেখতে আসেন। শনির দৃষ্টিপাতের সঙ্গে সঙ্গে শিশুটির মুণ্ডটি খসে পড়ে। সংবাদ পেয়ে বিষ্ণু ছুটে আসেন এবং এক নিদ্রামগ্ন হাতির মাথা সুদর্শন চক্র দ্বারা কেটে ঐ শিশুর মুণ্ডহীন দেহে জুড়ে দেন আর সেইসঙ্গে নিয়ম করেন সর্বাগ্রে গণেশের পূজা করতে হবে। অন্য মতানুসারে শিশু গণেশের দেহে যে হাতির মাথা যুক্ত করা হয়, সেই হাতি উত্তর দিকে শায়িত ছিল, সামাজিক রীতি এর মধ্য দিয়ে প্রবর্তনের চেষ্টা দেখা যায় যে, উত্তর দিকে নিদ্রিত থাকা সঙ্গত নয় যে কোন মানুষের পক্ষে।

উপরে বর্ণিত লোকপুরাণের কাহিনিগুলির উদ্ভবের মূলে মানুষের কারণানুসন্ধান ও তার নিবৃত্তির ভাবনা কার্যকর হতে দেখা গেলেও এই কাহিনিগুলির স্রষ্টারা বিশেষ বিশেষ প্রাণী বা দ্রষ্টব্যের রহস্য যেন তেন প্রকারেণ উন্মোচন করেই কর্তব্য কাজে ইতি টানেননি, সাধ্যমতো সৃষ্টি রহস্য উন্মোচন সংক্রান্ত কাহিনিকে শিল্পরূপ দান করে তাকে আকর্ষণীয় করে তুলেছেন।

লোকপুরাণগুলির অন্যবিধ তাৎপর্যও বর্তমান। বিশেষত জাগতিক সব ধরনের সৃষ্টির ব্যাখ্যাদানের মাধ্যমে লোকপুরাণের স্রষ্টারা প্রকারান্তরে কার্যকারণ সম্পর্ককে স্বীকার করে নেন। এই লোকপুরাণ বহুক্ষেত্রে স্থানীয় সমাজ বা গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের চেতনাকেই বহন করে। কোথাও কোথাও মহাকাব্যের চরিত্র ও তাকে কেন্দ্র করে

ঘটনাবলীর আমূল পরিবর্তনও দেখা যায়। যেমন, সীতাদেবী রামচন্দ্রের ভগ্নী হিসাবে পূর্ব এশিয়ার অঞ্চল বিশেষে পরিচিতা হয়েছেন। যে কারণে রাবণের সঙ্গে তার স্বামীত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠতে বাধে না। একদিক থেকে এই উপ্যাখ্যানের সাথে যুক্ত রয়েছে পুরুষপ্রধান সমাজের স্পষ্ট স্বাক্ষর যা অলৌকিক কার্যাবলীর ধারায় ও অস্বাভাবিক ঘটনাসমূহের সন্নিবেশে সহজেই আমাদের চেতনায় সম্ভাব্যতাকে (possibilities in impossibilities) স্মরণ করায়।

একালের মনস্তাত্ত্বিকেরা উল্লেখ করেন যে, ভীতিভাবনা থেকেই লোকপুরাণের উদ্ভব হয়েছে, বলা বাহুল্য এই লোকপুরাণের অনেক ব্যাখ্যার মধ্যে যেগুলি বিশ্বাসযোগ্য বলে মানুষের মনে হয়েছিল, সেগুলি গৃহীত হয়েছে। সমষ্টিবদ্ধ জীবনের রোষ, ক্ষোভ বা প্রতিহিংসার সঙ্গে যুক্ত করে তার সামাজিক বা প্রাকৃতিক বিপর্যয় সৃষ্টিকারী উপাদান বা ঘটনা সমূহকে ব্যাখ্যা করেছে মানুষ। ক্রমান্বয়ে সেগুলি যথার্থ বলে লোকপুরাণের মর্যাদা পেয়েছে।

লোককাহিনিগুলি লোকে বিশ্বাস করে এবং তা বিশ্বাসী সংস্কারের মধ্যে মিশেও যায়। সৃষ্টিরহস্য ভেদ করার লক্ষ্যে এই ধরনের লৌকিক ও অলৌকিক ঘটনাবলী ক্রমান্বয়ে পুরাকথাকে প্রজন্মের পর প্রজন্ম জীবন্ত করে রাখে। উৎস সন্ধান করলে দেখা যায় আদিম সমাজ জীবন বিশ্ব প্রকৃতি ও সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে অসীম কৌতূহলী ছিল। আর সেই সঙ্গে এক অদম্য বিস্ময়বোধ আদি মানবের মনে ভয় ও আনন্দ মিশ্রিত অলৌকিক কাহিনির অবারিত স্রোত খুলে দিয়েছে। অনেক সমাজবিদের চোখে এই সৃষ্টি রহস্যে আদিম মানুষের বিজ্ঞান বোধ জন্ম নিয়েছে। এর নেপথ্যে যদিও কোন যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা নেই, তবু তা যুগ যুগ ধরে ক্রম সঞ্চরমান ধারায় সমাজ জীবনে আজও অব্যাহত গতিতে চলছে।

সহায়ক গ্রন্থাদি :

১। প্রসঙ্গ লোকপুরাণ— বরুণকুমার চক্রবর্তী।
২। লোকসংস্কৃতি ও নৃবিদ্যার অভিধান— বরুণকুমার চক্রবর্তী ও সুমহান বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত)।
৩। বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ— বরুণকুমার চক্রবর্তী (সম্পাদিত)।

প্রগল্প : প্রবাদের গল্প

সৈকত সিনহা

আজকের এই কর্পোরেট-ম্যানেজমেন্টের যুগে আগেকার আমলের মত কথায় কথায় প্রবাদ- প্রবচনের ব্যবহার নেই। তবে প্রবাদের ব্যবহার যে একেবারে উঠে গেছে তাও নয়। আজও আমরা নানা প্রসঙ্গে প্রবাদের ব্যবহার করি। এহেন প্রবাদের উৎপত্তির মূলে, সব প্রবাদের ক্ষেত্রে না হলেও বহু প্রবাদের উৎপত্তির মূলেই নানা ধরনের গল্প বাসা বেঁধে আছে। এসব গল্পের অনেকগুলি যেমন কাল্পনিক, তেমনি অনেকগুলি আবার সত্যি। 'দীর্ঘকালের ব্যবধানে গল্পের হারগুলি হারিয়ে গেছে, রয়ে গেছে প্রবাদরূপ লকেটগুলি'। কিন্তু আমরা যদি সেই হারিয়ে যাওয়া গল্পকে খুঁজে নিয়ে প্রবাদগুলিকে বোঝার চেষ্টা করি তবে প্রবাদের এক ভিন্ন অর্থ ও মাত্রার সুলুক সন্ধান করতে পারব। প্রসঙ্গত একটি কথা বলা দরকার— তা হল, প্রবাদের এই নেপথ্য কাহিনির কোনটিই স্বকপোলকল্পিত নয়, প্রতিটি পূর্বসূরীদের কাছ থেকে সংগৃহীত। অনেক ক্ষেত্রেই প্রাপ্ত কাহিনীর কাঠামোকে সুপরিণত গল্পে রূপ দেওয়ার সুযোগ ছিল। কিন্তু ঐতিহ্যের মর্যাদা রক্ষাকল্পে কোনও গল্পকেই আনুপূর্বিক পরিবর্তন বা রূপান্তর করা হয়নি।

এবারে আমরা বেশ কিছু প্রবাদের কাহিনি বা গল্প সম্পর্কে পরিচয় গ্রহণ করব। আর সেই সূত্রে অন্বেষণ করে জেনে নেব সমসাময়িক সমাজ জীবনের নানা খুঁটিনাটি তথ্য।

অতি লোভে তাঁতী নষ্ট। এই প্রবাদের গল্পরূপ—

এই রাজার একটি গাভী ছিল। একদিন দুধ দুইবার সময় গাভীটি খুব জ্বালাতন করল। রাজা ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, পরদিন সকালে উঠে যাকে দেখবেন তাকেই গাভীটি দিয়ে দেবেন। পথ দিয়ে সেই সময় যাচ্ছিল এক তাঁতী। সে রাজার কথা শুনে মনে মনে ঠিক করল পরদিন সকালে সেই প্রথমে রাজার সামনে হাজির হবে, তাহলেই গাভীটি মিলবে।

বাড়ি ফিরে সে ভাবল গাভীটি আনতে গেলে তাকে বাঁধবার জন্য দড়ির প্রয়োজন। তাঁতীর বাড়িতে কাপড় বোনার সুতো ছিল। সব সুতো দিয়ে সে মোটা দড়ি বানাল। তারপর ভাবল গাভী দুধ দিচ্ছে দেখলে বুড়ী মা দুধ চাইবে ঘন ঘন। বুড়ী মা যাতে তা না চাইতে পারে সে জন্য তাঁতী বুড়ী মা'র দুটো চোখ নষ্ট করে দিল।

পরদিন সকালে ভোর ভোর উঠে তাঁতী রাজ প্রাসাদের সামনে এসে হাজির হল। রাজার সঙ্গে দেখা হতে রাজা তাঁতীর উপস্থিতির কারণ জানতে চাইলেন। তাঁতী গাভী

লাভের কথা বলতেই রাজা ক্ষুব্ধ হয়ে দারোয়ান দিয়ে মেরে তাঁতীকে তাড়িয়ে দিলেন। তাঁতীর কপালে গাভীও জুটল না, উল্টে সব সুযোগ নষ্ট হল।

এই গল্পের মধ্য দিয়ে তাঁতীর লোভ লালসার যেমন প্রকাশ ঘটেছে, প্রকাশ ঘটেছে তেমন অর্থের আশায় মানবিক অধঃপতনের কথাও। পাশাপাশি রাজার খামখেয়ালীপনার কথাও প্রকাশ পেয়েছে। এককথায় তাই সামন্ততান্ত্রিক সমাজের ছবি ধরা আছে এই প্রবাদের দেহে।

দ্বিতীয় প্রবাদটি হল— **আঁখের জল কুকসীমায় মারে।** এই প্রবাদের গল্প নিম্নরূপ—

উত্তর বাঁকুড়ার গঙ্গাজলঘাটী ও বড়জোড়ায় দীর্ঘদিন ধরে এই প্রবাদটি চলে আসছে। এই এলাকা আখ চাষের জন্য বিখ্যাত। এখানকার আখের গুড় বেশ উচ্চমানের। যে জমিতে আখ চাষ করা হয় তাকে 'আঁখ বাড়ি' বলে। সাধারণতঃ আঁখ বাড়িতে আখ গাছ বড় হবার পর তিন থেকে চার বারের মত জলসেচের ব্যবস্থা করতে হয়। চারা যখন ছোট অবস্থায় থাকে, তখন দু'তিনদিন অন্তর সেচ দিতে হয়। ক্রমে চারাগুলি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়। আখ গাছের বয়স যখন ৮-৯ মাস তখন গাছের গোড়ার মাটিতে আর রস থাকে না। ফলে তখন সেচ দেওয়া খুব জরুরী হয়ে পড়ে। এই সময় 'আঁখ বাড়ি'তে কুকসীমা নামে একধরনের গুল্ম জাতীয় চারা গাছ আখ গাছের পাশে পাশে জন্মে। ফলে আখ গাছে সেচ দেওয়া হলে সেই সেচের জল কুকসীমাও পায়। এই জলপাওয়াকে কেন্দ্র করেই প্রবাদটির উৎপত্তি।

এই প্রবাদের অন্তরালে এই সত্য গোপন করে আছে যে, প্রকৃতপক্ষে গ্রাম বাংলার দুঃস্থ মানুষদের কল্যাণের জন্য নির্দিষ্ট অর্থ বণ্টনের দায়িত্বে থাকা বড় ব্যক্তিরা কীভাবে তা আত্মসাৎ করে নেয়।

তৃতীয় প্রবাদটি হল— **ঈশ্বর যা করেন তা সবই মঙ্গলের জন্য।** এই প্রবাদের গল্পরূপ—

এক রাজার একটি আঙুল কেটে গেলে রাজা যন্ত্রণায় কাতর হন। মন্ত্রী রাজাকে সান্ত্বনা দিতে এসে বলেন— ঈশ্বর যা করেন তা সবই মঙ্গলের জন্য।

রাজা মন্ত্রীর এই কথা শুনে খুব ক্ষুব্ধ হন। ক্রোধে প্রতিশোধ স্পৃহা জেগে ওঠে। একদিন মৃগয়ায় যাবার সময় রাজা মন্ত্রীকে সঙ্গে নেন। বনমধ্যে রাজা সুকৌশলে মন্ত্রীকে একটি জলশূন্য কূপে ঠেলে ফেলে দেন। এদিকে শিকারের সন্ধানে মগ্ন হয়ে রাজা নিজ সৈন্য সামন্তদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। দেখতে দেখতে ডাকাতরা তাকে বন্দী করে কালী ঠাকুরের কাছে বলি দেবে বলে। বলির বন্দোবস্ত পাকা হলে এক ডাকাত লক্ষ্য করে রাজার একটি আঙুল কাটা। ফলত রাজাকে তারা ছেড়ে দিল। কেননা খুঁত যুক্ত মানুষকে বলি দেওয়া যায় না।

নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে রাজা বুঝলেন মন্ত্রী ঠিকই বলেছিল। এরপর অনুতপ্ত রাজা নিজে এসে মন্ত্রীকে উদ্ধার করে পূর্বাপর সমস্ত ঘটনা বললেন। মন্ত্রীও

জানাল রাজা ঠিক কাজই করেছেন নতুবা তাকেই বলি দেওয়া হত। কেননা তার কোনও খুঁত ছিল না।

এই প্রবাদে নিয়তির সর্বময় কর্তৃত্বকে স্বীকার করা হয়েছে। কাকতালীয় ঘটনার আড়ালে ঈশ্বরের ইচ্ছা সংঘটনের যে কৌশল তা বোধাতীত নয়। চতুর্থ প্রবাদটি হল— **উল্টা বুঝলি রাম**। এই প্রবাদের গল্পরূপ এরকম— এক ছিল সাধু। একদিন পথশ্রান্ত হয়ে সে ভগবানের উদ্দেশে একটা লাভের আরজি জানাল। ভাবল ঘোড়া পেলে তার ওপর দিব্যি চড়ে যেতে পারবে। পথশ্রমে আর ক্লিষ্ট হতে হবে না।

হঠাৎ সেখানে এক পুলিশের দারোগা এসে উপস্থিত হল। দারোগাটি ছিল অশ্বারূঢ়। তার অশ্বটি ছিল মাদী, সঙ্গে ঘোটকীর শাবকটিও ছিল। শাবকটি চলতে অশক্ত হওয়ায় ঘোটকীও অগ্রসর হতে চাইছিল না। এমনকি চাবুক প্রহার করলেও নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ছিল। একারণে দারোগাটি একজন বাহকের সন্ধান করছিল। এমন সময় সাধুকে পেয়ে দারোগা বাহকের কাজ সম্পন্ন করতে নির্দেশ দিল। সাধু প্রথমটায় ইতস্তত করলেও দারোগার উগ্রমূর্তির সামনে অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করল। অনিচ্ছা সত্ত্বেও শাবকটিকে কাঁধে নিয়ে দারোগার অনুগমন করতে থাকল সে। আর মনে মনে বলল— উল্টা বুঝলি রাম।

পুলিশের প্রতাপ সর্বজনবিদিত। তাই ক্ষমতার অপব্যবহার ঘটিয়ে সাধুকে দিয়ে অশ্বশাবক বহন করিয়ে নিতে পুলিশের বাধে না। বেচারী সাধুর তথাকথিত অলৌকিক ক্ষমতাও সেখানে হার মানে। এই প্রবাদটি তারই পরিচায়ক।

পঞ্চম প্রবাদটি হল— **উদোর বোঝা বুধোর ঘাড়ে**! এই প্রবাদের গল্পরূপ—

এক পল্লীতে উদয়চাঁদ নামে এক চাষী কৈবর্ত আর বুধুইচাঁদ নামে এক সদ্‌গোপ বাস করত।

একদিন উদয় বা উদো পল্লীর 'চাঁই' বলাইচাঁদের কাছে গিয়ে বলল তাব বড় বিপদ, মাতৃদায় উপস্থিত। অথচ হাতে কোনও পয়সা নেই। কি করবে কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না। সে বলাইয়ের সাহায্য প্রার্থনা করল।

উদো ভেবেছিল, বলাই হয়তো তাকে কিছু আর্থিক সাহায্য করবে। অথচ বলাই বলল উদো এপর্যন্ত কেবল অন্যের বাড়ি গিয়ে খেয়ে এসেছে। এখন মাতৃশ্রাদ্ধে তার কর্তব্য পাঁচজনকে নিমন্ত্রণ করা। অর্থের জন্য তাকে চিন্তা করতে হবে না। পরদিন উদো এবং তার বন্ধু বুধুই বা বুধো যে জমিতে চাষ-বাস করছিল সেখানে গিয়ে বলাই হাজির হল। বুধোর কিছু পয়সা কড়ি ছিল। বলাই সেটা জানত। এও জানত বুধুই আর উদোর ভাব ছিল বেশ। বলাই উদোকে বলল, উদো, আর কতদূর? উদো উত্তর দিল, দেরী আছে। হাতে পয়সা নেই। লেখাপড়াও জানে না যে চাকরী বাকরী করে অর্থ উপার্জন করবে। খেটেই খেতে হবে, কি আর করা!

বলাই অমনি বলল, লেখাপড়া তো বুধুই জানে না। উদো একথা সমর্থন করল। বুধু

রাগে গজগজ করে বলল, কাগজ কলম থাকলে সে লিখে জানিয়ে দিত যে সে লেখা জানে। কাগজ কলম আনা হল। বলাইয়ের দেখানো স্থানে বুধুই স্বাক্ষর করল। বলাই বুধুইকে ধন্যবাদ দিয়ে কাগজটা নিয়ে চলে গেল। এভাবে কৌশলে উদোর মাতৃদায়ের সমস্ত খরচের দায় বুধুইয়ের, এই কথা বুধুইকে স্বাক্ষর করিয়ে লিখিয়ে নেওয়া হল। লোকে এই থেকে বলাইকে দেখে বলত— কিবা কাল কিবা কর্ম/ ধনী হয়ে এই কর্ম/ কারো গলে দিয়ে ছুরি/ কারো বা ক্ষীরের খুরী।/ এতে কী পুণ্য হইবে;/ যম যে দণ্ড করিবে!/ হাতীর বোঝা দিলে ষাঁড়ে / উদোর বোঝা বুধোর ঘাড়ে।

এইভাবে এই প্রবাদে দেখা যায়, কারও সরলতার সুযোগ নিয়ে একদল লোক কীভাবে অপরকে ব্যবহার করে নিজস্ব স্বার্থ সিদ্ধি করে। বন্ধুবেশি লোক কীভাবে বন্ধুকে বাঁচার পন্থা করে জীবনের বৈতরণী পার হয়ে যায়। সমাজের এই গভীর ক্ষত প্রবাদটিকে জনপ্রিয় করেছে।

ষষ্ঠ প্রবাদটি হল— **কে জানে তার লেখা জোখা**
তিন চাঁড়ালের তিন টাকা।

এই প্রবাদটির গল্পরূপ এরকম—

তিন চাঁড়াল নদীতে মাছ ধরছিল। এমন সময় এক শঠ নদী পার হতে এসে তাদের দেখে কিছু আদায় করার মতলবে বলল যে তারা যেহেতু মাছ ধরছে তাই তাদের খাজনা দিতে হবে। চাঁড়াল তিনজন খুব ভয় পেয়ে জানতে চাইলে, কত খাজনা তাদের দিতে হবে। শঠ বললে তিন সিকে। এখন চাঁড়ালদের শিকেতে টাকা ছিল। তারা চিন্তা করল যদি রাজস্ব আদায়কারী শিকে নিয়ে যায় তবে তো সব টাকাই যাবে। তাই তারা তিনজনে তিনটি টাকা দিয়ে বহু অনুনয় করে রেহাই পাবার কথা চিন্তা করে। মাঝখান থেকে শঠ ব্যক্তির তিনটি সিকির পরিবর্তে তিনটি টাকা লাভ হয়ে গেল।

এই প্রবাদটিতে নিরক্ষর মানুষদের কাণ্ডজ্ঞানহীনতার পরিচয় প্রকাশিত। পাশাপাশি শঠ ব্যক্তিদের বলপ্রয়োগ করার মানসিকতার পরিচয়ও পাওয়া যায়।

সপ্তম প্রবাদটি হল— **কেঁচে গন্ডুষ করা।**

এই প্রবাদটির গল্পরূপ এরকম—

জনৈক ভক্ত গুরুদেবের প্রসাদ পাবার আশায় গুরুর ভোজনের সময় তাঁর কাছে বসেছিল। গুরুদেব যথারীতি গণ্ডুষ করে ভোজন পর্ব শুরু করলেন। তারপর ভোজনান্তে তিনি আচমনের জন্য যখন পুনরায় এক গণ্ডুষ জল নিলেন তখন উপবিষ্ট ভক্তটি ভাবল গুরুদেব নিশ্চয়ই দ্বিতীয়বার গণ্ডুষ করে ভোজনে প্রবৃত্ত হতে চলেছেন। ভক্তটি খুবই নিরাশ হল। সে ভাবল তাহলে তার কপালে আর গুরুদেবের প্রসাদ জুটল না। কারণ ইতিমধ্যেই গুরুদেবের যৎসামান্য ভুক্তাবশেষ পড়ে ছিল।

এই প্রবাদটিতে ব্যক্তিটির বুদ্ধিহীনতার প্রকাশ ধরা আছে। এককথায় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যমূলক প্রবাদ হিসেবে এটিকে সহজেই আখ্যায়িত করা যায়।

অষ্টম প্রবাদটি হল— **কাঙালী মেরে কাছারী গরম।**

এই প্রবাদটির গল্পরূপ এরকম—

এক জমিদারের কাছারীতে সবাই ম্রিয়মাণ হয়ে বসে রয়েছে। কারণ অজন্মার জন্য তেমন খাজনা জমা পড়ছে না। এদিকে দেশের মানুষ দুর্ভিক্ষের মুখোমুখি। সর্বত্র এক কথা— হা অন্ন, হা অন্ন। অন্নের অভাবে সবাই ভিক্ষের ঝুলি হাতে রাস্তায় নেমেছে। এমনি করে এক চাষী অবস্থার ফেরে ভিখারি হয়ে কাছারীতে এসে হাত পেতেছে দুটি চালের জন্য। ভেবেছে জমিদার হল প্রজার মা-বাপ। অতএব তাকে নিরাশ হয়ে ফিরতে হবে না। কিন্তু কাছারিতে প্রবেশ করা মাত্র কাঙালিকে ঘিরে ফেলে জমিদারের মো-সাহেবের দল। কেন না, তারা তাকে নিয়ে মজা করবে এখন। কি রকম মজা? না কাঙালীকে ঠেঙিয়ে তারা মজা লুটবে। শুরু হল প্রহার। অনেকক্ষণ এই পর্ব চলল। শেষে কাঙালীকে যখন ছাড়া হল যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে চলতে চলতে সে বলল— 'হারামজাদা পো'রা কাঙালী মেরে কাছারী গরম কচ্চেন।'

এই প্রবাদের গল্প থেকে ব্যঞ্জিত হয় জমিদারী বিলাসিতার নগ্নরূপ। যে রূপ বিকৃত বিলাস বই অন্য কিছু নয়। অর্থহীন ইচ্ছাপূরণের এই দৃষ্টান্ত সমসাময়িক সমাজের মুখ চিনিয়ে দেয়।

নবম প্রবাদটি হল— **ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখনি।**

এই প্রবাদের গল্পরূপ এরকম—

দুই ভাই ছিল ঘুঘু ও ফাঁদ। ঘুঘু ছিল গোবেচারা ধরনের। এক গৃহস্থের বাড়ি গেল চাকরী করতে। চাকরীর শর্ত হল— দাঁড়ালে ছেলে ধরবে, বসলে পাট কাটবে আজ খাবে কাল খাবে, খাওয়ার পূর্বে ইচ্ছামতো এক খোরা আমানি খেয়ে যত খুশি সে ভাত খাবে। এছাড়াও ঠিক হল যদি ঘুঘু চাকরী ছাড়ে তবে মনিব তার কান কেটে নেবে, বিপরীত ক্রমে মনিব যদি তাকে ছাড়ায় তবে সে মনিবের কান কাটবে। অল্প দিনেই ঘুঘুর খেটে খেটে এবং সেই সঙ্গে না খেতে পেয়ে করুণ অবস্থা দাঁড়াল। সে প্রাণ বাঁচাতে মনিবকে কান দিয়ে সরে পড়ল। তখন তার জায়গায় চাকরী নিল ফাঁদ। শর্ত ঘুঘুর মতই। সে দাঁড়ালেই গিন্নী তাকে ছেলে দেয়, সে ছেলের একটা হাত বা পা ধরে ঝুলিয়ে রাখে। ফলে ছেলে কাঁদতে থাকে। কোলে করতে বললে ফাঁদ বলে 'না' কেননা ও কথা তো শর্তে নেই। ফাঁদ বসলে তাকে পাট দেওয়া হয়। ফাঁদ দা নিয়ে সেই পাট কুচি কুচি করে কাটে। কেউ কিছু বললে সে বলে পাট কাটার শর্ত ছিল, পাট পাকাবার কোন শর্ত ছিল না। খাবার সময় সে কলাপাতে এক খোরা আমানি ঢেলে দেয়। কারণ খোরায় করে খেতে হবে এমন কোন শর্ত ছিল না। ফলে পাতায় যেটুকু আমানি থাকে, তাই গণ্ডুষ করে গাণ্ডেপিণ্ডে ভাত খায় সে। গৃহস্থ লোক বিরক্ত হয়ে একদিন তাকে বলে, 'যা বেটা দূর হয়ে যা'। আর যায় কোথা, ফাঁদ অমনি একটা ক্ষুর বের করে মনিবের কান কেটে নিয়ে বলে— 'ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখনি।'

এই প্রবাদের গল্পে জমিদারী অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী মানসিকতার পরিচয় লভ্য। নীচুতলার মধ্যেও যে কূটনৈতিক আচরণ দেখা যায় ফাঁদ তার প্রমাণ।

দশম প্রবাদটি হল— **চোরে চোরে মাসতুতো ভাই।**

এই প্রবাদের গল্পরূপ এরকম—

কয়েকজন চোর রাত্রিবেলা চুরি করতে বেরল। সারা রাত ঘোরাঘুরি করেও কার্যসিদ্ধি না হওয়ায় তারা ক্ষুব্ধ ছিল। হঠাৎ তাদের খেয়াল হল রাত কেটে ভোর হতে বেশি দেরি নেই। অতএব তাড়াতাড়ি আত্মগোপন করার স্থান খুঁজল। এমন সময় এক বৃদ্ধ প্রাতঃকৃত্য সম্পাদনের জন্য বাইরে এলে চোরেরা তার ঘরে ঢুকল। তারপর বৃদ্ধের ঘর থেকে একে একে জিনিস চুরি করে একটি চেয়ারে রাখল। তারপর সংগৃহীত মাল দড়ি দিয়ে মাদুরে বাঁধল। তারপর খাটের ওপর একটি কাপড় বিছিয়ে দিল যেন মৃতদেহ। তারপর খাটের চার পা ধরে শবদেহ বহন করার ঢঙে পথে বেরিয়ে এল। মুখে মুখে বলতে লাগল— 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে'।

পথচারীরা প্রভাতে মড়া দেখে সবাই পথের ধারে সরে দাঁড়াল। চোরেরা নির্বিঘ্নে পথ চলতে লাগল।

বেশকিছুদূর পথ চলার পর একটি চোর সেই পথে এসে দাঁড়াল। সে চারপেয়ের নীচে গাড়ুর নল দেখতে পেয়ে বাহকেরা যে চোর তা বুঝতে পারল। তখন চোরেদের কানে গিয়ে বলল— 'ঐ নল দেখা যায় রে'। আগের চোররা বুঝল এত সমূহ বিপদ। অতএব বলল— ভাগ নেবে তো এস। একলা চোর মহানন্দে চোরদের সঙ্গ নিল।

এই গল্প থেকে বোঝা যায় চোরেদের কোনও স্থির নীতি নেই, যখন যেমন তখন তেমন এই নিয়মে এরা বিশ্বাসী। যে কোনও মূল্যে কার্যসিদ্ধি ঘটলেই তারা খুশি।

একাদশতম প্রবাদটি হল— **ঝাঁকের কই ঝাঁকে থাক।**

এই প্রবাদটির গল্পরূপ এরকম—

এক লোভী গোস্বামী তার ভৃত্যকে সঙ্গে নিয়ে এক শিষ্যের বাড়ি গিয়েছিল। গোস্বামী অন্যের হাতে খাবে না। তাই ভৃত্যটি তার খাবারের সব জোগাড় করে দিল। সে গোস্বামী প্রভুর জন্য ডিমওয়ালা বড় বড় অনেকগুলি কইমাছ এনেছিল। গোস্বামী দিব্যি মনোমত রান্না করে ভাত বাড়ল। একদিকে ভৃত্যকেও খেতে দেওয়া হল। রান্না করা মাছের সবগুলি নিজে খেয়ে একটি মাত্র মাছ সে ভৃত্যকে খেতে দিল। কিন্তু সে মাছের কোন ডিম ছিল না। ভৃত্যটি এরকম বণ্টনের বহর দেখে খুবই ক্ষুব্ধ হল। সে নিজের মাছটি গুরুদেবের পাত্রে ছুঁড়ে দিয়ে বলল— ঝাঁকের কই ঝাঁকে থাক। পরিণামে বেচারী গোস্বামীর আর মাছ খাওয়া হল না। সব মাছ ভৃত্য খেল।

এই গল্পে দেখা যায় ধর্মগুরুদের সর্বগ্রাসী মনোভাব কিভাবে সারাক্ষণ বলে খাব খাব। আর তাতে অপমানিত হতে হয় সাধারণ মানুষকে। চরিত্রের স্বরূপ উন্মোচন করার মধ্য দিয়ে এই প্রবাদটির জন্ম।

দ্বাদশ প্রবাদটি হল— **ঢাল নেই, তলোয়ার নেই নিধিরাম সর্দার।**

এই প্রবাদের গল্পরূপ এরকম—

নিধিরাম নামে একজন নিজেকে সর্দার বলে পরিচয় দিত। তার হাবভাব এমন ছিল যেন তার মত পালোয়ন দ্বিতীয়টি আর নেই। একদিন নিধিরামের গ্রামেই ডাকাত পড়ল। দেখা গেল নিধিরাম নির্বিকার। ডাকাত দল চলে যাবার পর নিধিরামের নিষ্ক্রিয়তার কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে সে জবাব দিল তার হাতে ঢাল তলোয়ার থাকলে সে ক্ষমতা দেখাত।

এহেন নিধিরামের আসল বাড়ি ছিল বর্ধমানের কোন এক গ্রামে। তাকে দেখতে যেমন কদাকার ছিল তেমন উচ্চতা ছিল খুব বেশি। তবে তার অনেক গুণ ছিল। যেমন— সে ভাল খেলতে জানত, সমাজ সেবায় আগ্রহ ছিল। নিধিরামের একটি কীর্ত্তনীয়ার দল ছিল। দলটি নৃত্য গীত পরিবেশন করত। সংগৃহীত অর্থ দরিদ্র নারায়ণদের দান করে দিত। দলের সবাই তাকে শ্রদ্ধা করে সর্দার বলত।

এই প্রবাদটি আদ্যন্ত ব্যক্তিচরিত্র কেন্দ্রিক। ঐতিহাসিকও বটে। খামখেয়ালী স্বভাবের জন্যই চরিত্রটি বিখ্যাত আর সেই খ্যাতি মুদ্রিত হয়েছে প্রবাদের দেহে।

ত্রয়োদশ প্রবাদটি হল— **তাঁতীকুলও গেল, বৈষ্ণবকুলও গেল।**

এই প্রবাদের গল্পরূপ এরকম—

এক তাঁতী মনে মনে ভাবল আর তাঁত না বুনে বৈষ্ণব হয়ে বেশ বসে বসে খাবে। আর পরিশ্রম করতে হবে না। একারণে সে বৈষ্ণবের ভেক ধরল। ভেক নেবার পর আখড়ার মোহান্ত তাঁতীকে ভিক্ষা আনতে পাঠাল। তাঁতী ভিক্ষায় অনভ্যস্ত। সে ভাবল এর থেকে তার তাঁত চালানোই ছিল ভাল। দোরে দোরে ঘুরে ভিক্ষা করার কষ্ট করতে হত না। সে মোহান্তের কাছে জানাল তার দ্বারা ভিক্ষা করা সম্ভব হবে না। এই কথা শুনে মোহান্ত তাকে আখড়া থেকে তাড়িয়ে দিল। উল্টোদিকে বৈষ্ণবের ভেক নেওয়ায় তাঁতী সমাজেও তার আর ঠাঁই হল না।

এই প্রবাদটি একটি অলস পুরুষের সমাজচ্যুত হওয়ার কাহিনি। যে চরিত্র সিদ্ধান্তে স্থির হতে পারে না সে কখনই কোন বৃত্তে নিজস্ব অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারে না।

চতুর্দশ প্রবাদটি হল— **দশচক্রে ভগবান ভূত।**

এই প্রবাদের গল্পরূপ—

এক রাজা ছিলেন। তাঁর এক মন্ত্রী ছিল, যে অত্যন্ত প্রভাবশালী বলে পরিচিত। তার উদ্দেশ্য ছিল রাজাকে তালুবন্দী রাখা। রাজাও তাই মন্ত্রীকে বেশ ভয় করে চলতেন। মন্ত্রীর কারণে রাজবাড়িতে কারও কোন অভীষ্ট পূর্ণ হত না যদিও রাজার কাছে কেউ মন্ত্রীর নামে নালিশ করতেও পারত না। শেষে সকলে মিলে মন্ত্রীর বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র করল।

একদিন সকালবেলা মন্ত্রী রাজসভায় যাবে কিন্তু দারোয়ান জানাল, হুকুম নেই। মন্ত্রী অনেক চেষ্টা করল কিন্তু রাজার সাক্ষাৎ পেল না।

এদিকে রাজা মন্ত্রীর অনুপস্থিতি সম্পর্কে অনুসন্ধান করে জানতে পারলেন ভগবানের মৃত্যু হয়েছে শুধু তাই নয়, ভূত হয়ে পাড়ায় বড় অত্যাচারও শুরু করেছে। সকলের মুখে ভূতের অত্যাচারের কথা শুনে রাজা সব কিছু বিশ্বাস করলেন।

একদিন সকালে রাজা চলেছেন গঙ্গাস্নানে। ভগবান তা জানতে পারলে কিন্তু নাগরিক অক্রোশের ভয়ে সামনা সামনি দেখা করল না। রাস্তার একটি গাছে উঠে বসল। রাজা যেই গাছতলা দিয়ে গেলেন, ভগবান গাছে বসে মহারাজকে সম্বোধন করল। রাজা গাছের ওপর তাকিয়ে বললেন, যতদিন মন্ত্রী জীবিত ছিল ততদিন রাজাকে জ্বালিয়েছ। এখন ভূত হয়েও নিস্তার নেই, রাজাকে জ্বালাতে চাইছ। তখন মন্ত্রী বলল, 'দশচক্রে ভগবান ভূত'।

এই প্রবাদে দেখা যায় রাজনৈতিক আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটলে ক্ষমতার ব্যাখ্যা কীভাবে অন্য সংজ্ঞায় মূল্যায়িত হয়ে যায়। যে ছিল চালক সে কীভাবে বেকার হয়ে গেল।

পঞ্চদশ প্রবাদটি হল— **'নয় মন তেলও পুড়বে না, রাধাও নাচবে না।'**

এই প্রবাদটির গল্পরূপ এরকম—

এক বাবু ছিলেন। এক সময় তাব আর্থিক অবস্থা খুব ভাল থাকলেও পরে অত্যধিক বিলাসিতায় তার আর্থিক অনটন দেখা যায়। কিন্তু বাবুটির পারিষদবর্গ বাবুটিকে নানা আমোদ প্রমোদের ব্যাপারে নিরন্তর উৎসাহ দিয়ে যেত।

শহরে রাধারানী নামে এক অতি সুন্দরী নর্তকী ছিল। পারিষদবর্গ একদিন প্রস্তাব দিলে ওই নর্তকীর নৃত্যের আয়োজন করতে হবে। বাবুটিও প্রস্তাবে সম্মত হলেন। অতএব রাধারানীর কাছে লোক প্রেরিত হল। রাধারানি নৃত্যের প্রস্তাবে সম্মতি দিল। যদিও একটি শর্ত রাখল— নৃত্যের দিন বাবুটিকে নয় মন তেল পুড়িয়ে আলো জ্বালার ব্যবস্থা করতে হবে। আসলে রাধারানী বাবুটির আর্থিক অবস্থার কথা জানত। তাই এই প্রস্তাব। যাই হোক, পারিষদবর্গ উৎসাহে আত্মবিস্মৃত। বাবুটি এসব দেখেশুনে বললেন— অদূর ভবিষ্যতে নয় মণ তেল পোড়াবার ব্যবস্থা করে রাধারানীর নৃত্যের আয়োজন করা হবে। একথা শুনে একজন স্পষ্টবাদী পারিষদ বলে উঠল— নয় মন তেলও পুড়বে না, রাধাও নাচবে না।

এই প্রবাদে দেখা যায় পারিষদদের কূট চক্রান্ত কীভাবে স্তাবকতার আড়ালে ঢাকা পড়ে থাকে।

ষোড়শ প্রবাদটি হল— **ব্যাঙের আধুলি**

এই প্রবাদটির গল্পরূপ এরকম—

একবার একটা ব্যাঙ একটা আধুলি পেয়েছিল। আধুলিটি পেয়ে সে খুব অহংকারী হয়ে পড়ল। ভাবল তার মত বিত্তবান আর কেউ নেই। সে সেই আধুলিটার ওপর সারাক্ষণ বসে থাকত, আর যখনই কেউ তার সামনে দিয়ে যেত তাকেই সে লাথি

দেখাত।

একদিন এক পথিক এভাবে লাথি দেখে খুব রুষ্ট হল। সে এর কারণ অনুসন্ধান করতে নামল। সব জানল। তারপর স্থির করল এর একটা উচিত শিক্ষা ব্যাঙকে দিতে হবে। একদিন দেখল ব্যাঙটা আধুলির পাশে ঘুমচ্ছে। পথিক আধুলিটি সরিয়ে নিল। ব্যাঙ ঘুম ভেঙে দেখল আধুলি নেই। তখন আগের অভ্যাস ত্যাগ করল।

বলাই বাহুল্য যে এই প্রবাদটি রূপকাশ্রিত। সম্পদ চঞ্চলা। তাকে ধরে বেঁচে থাকা যায় না। তার সাহায্য নিয়ে চলাই জীবন। বিত্তের বৈভব দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে।

সপ্তদশ প্রবাদটি হল— **ভূতের বাপের ছেরাদ্দ।**

এর গল্পরূপ এরকম—

একবার সব ভূতে মিলে ঠিক করল মানুষদের মত বাপের শ্রাদ্ধ করবে। অতএব একটি মাঠে শ্রাদ্ধের আয়োজন করল তারা। এখন শ্রাদ্ধের জোগাড় হলেই তো আর হবে না, শ্রাদ্ধ করাতে পুরোহিত চাই। ভূতেরা যখন পুরোহিতের সন্ধানরত, এমন সময় এক ভট্টাচায্যি ব্রাহ্মণ ওই মাঠের কাছ দিয়ে যাচ্ছিল। ভূতেরা তাকে শ্রাদ্ধ করার অনুরোধ করল। ব্রাহ্মণের তো অবস্থা কাহিল। এরকম বিপদও যে হতে পারে তা তার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। যাই হোক অবস্থা বেগতিক দেখে ভূতেদের সঙ্গে ব্রাহ্মণ মাঠের মধ্যে গিয়ে হাজির হল। তারপর শ্রাদ্ধ করার সময় বলল ভূতের বাপের নাম কী? কার বাপের শ্রাদ্ধ হবে?

সঙ্গে সঙ্গে সব ভূত চীৎকার করে উঠে বলল— 'আমার বাবার শ্রাদ্ধ হবে।' ব্রাহ্মণ বলল একসঙ্গে সবার বাবার শ্রাদ্ধ করা যাবে না। একে একে করতে হবে।

কিন্তু ভূতেদের কে থামায়। সবাই বলল 'আমার বাবার শ্রাদ্ধ আগে হবে।'

পুরোহিত তখন প্রস্তাব দিল প্রধান ভূতের বাবার শ্রাদ্ধ আগে হবে। সঙ্গে সঙ্গে ভূতেদের মধ্যে শুরু হল বিরোধ— কে প্রধান। তাই নিয়ে সব ভূত চীৎকার চেঁচামেচি শুরু করে দিল। এমন চরম বিশৃঙ্খলতার সুযোগ নিয়ে ব্রাহ্মণ পালিয়ে বাঁচল।

এসময় ব্রাহ্মণের আধিপত্যবাদের সময় নয়। সংস্কৃতায়নের সময়। একথা মনে রেখে বলা যায়, সে যুগে যখন ব্রাহ্মণরা নিজ কর্তৃত্বে সমাজে আসীন তখন তাদের নিয়ম-তান্ত্রিকতাকে অনুসরণ করে যারা উর্ধ্বে উঠে আসতে চাইত তাদেরকে বিদ্রূপ করার জন্যই এ প্রবাদের উৎপত্তি।

অষ্টাদশ প্রবাদটি হল— **যত দোষ নন্দ ঘোষ**

এই প্রবাদটির গল্পরূপ এরকম—

বাল্যকালে শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন অতিশয় দুর্দান্ত প্রকৃতির। তিনি কাউকেই গ্রাহ্য করতেন না এবং অন্যের উপর উৎপীড়ন অত্যাচারে রত থাকতেন। শ্রীকৃষ্ণের উৎপাতে ব্রজবাসীরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। তাদের মনে এরকম একটা ধারণা হল যে নন্দ ঘোষের ছেলে ছাড়া অন্য কারো একার পক্ষে অন্যায় করা সম্ভব নয়। সুতরাং অন্য কেউ অন্যায়

করলেও শ্রীকৃষ্ণের নাম করে নন্দ ঘোষের কাছে অভিযোগ করা হত। এরূপ অভিযোগ প্রায়শই হত। নন্দ ঘোষ যখন জানতে পারলেন যে সব অন্যায় কার্যের জন্য কৃষ্ণ দোষী নয়, তখন তিনি মিথ্যা অভিযোগে বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন— 'যত দোষ, নন্দ ঘোষ।' এইভাবেই প্রবাদটির উৎপত্তি।

ঊনবিংশ প্রবাদটি হল— **লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন।**

এই প্রবাদের গল্পরূপ এরকম—

বৈষ্ণবচরণ শেঠ ছিলেন প্রাচীন কলকাতার একজন স্বনামধন্য ব্যক্তি। এর বাসস্থান ছিল বড়বাজার। বৈষ্ণব চরণের ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে নানা কাহিনি প্রচলিত। তেলেঙ্গানার রাজকুমার রামরাজা কলকাতা থেকে তাঁর দেবারাধনার জন্য গঙ্গাজল নিয়ে যেতেন। এবং সেই জলে বৈষ্ণবচরণের মোহর অঙ্কিত না থাকলে তা নিতেন না। একদা বৈষ্ণবচরণ তাঁর এক অংশীদার গৌরী সেনের নামে প্রচুর রাঙতা কিনেছিলেন। পরে দেখা গেল সেই রাঙতার অধিকাংশ রুপো মিশ্রিত। বৈষ্ণবচরণ তাই এই ব্যবসায় যা লাভ হল তার কর্পদকও গ্রহণ করলেন না। তিনি বললেন গৌরী সেনের নামে কেনা জিনিসের লভ্যাংশ অবশ্যই গৌরী সেনের প্রাপ্য। ফলে সামান্য ব্যবসায়ী গৌরী সেন অচিরেই বিপুল বিত্তের মালিক হয়ে গেলেন।

এহেন গৌরী সেন তার অর্থ দিয়ে সামাজিক কাজ করতেন। যদি কেউ দেনার দায়ে জেলে যেত তিনি তাকে অর্থ সাহায্য করতেন। বা কোন দরিদ্র ব্যক্তি অন্যায়ভাবে রাজসভায় অভিযুক্ত হলে তাকে তিনি অর্থ সাহায্য করতেন।

এইভাবে নানা উপায়ে গৌরী সেন অর্থ বিতরণ করে যেতেন বলে এক সময় জনতার মুখে মুখে একথা চালু হয় যে, টাকা লাগলে গৌরী সেন দেবে।

এই প্রবাদটি ব্যক্তি চরিত্রের প্রশংসার দৃষ্টান্ত। অর্থ সর্বদা অনর্থ করে না, অর্থের প্রাসঙ্গিকতাই, অর্থ ব্যবহারের মানসিকতাই আসল। গৌরী সেন তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। পাশাপাশি যারা তার ওপর নির্ভর করে বাঁচতে চাইত তাদের বিদ্রূপ করা হয়েছে।

বিংশতম প্রবাদটি হল— **লোহার কার্ত্তিক**

এই প্রবাদের গল্পরূপ এরকম—

নদীয়া জেলার এক পল্লীগ্রামে কার্ত্তিক দুলে নামে এক ভয়ঙ্কর দস্যু ছিল। কোন এক সময়ে দস্যুতার অপরাধে সে ধরা পড়ে এবং প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়। সেকালে যে গ্রামে যে অপরাধীর বাস, সেই গ্রামেই তাকে ফাঁসী দেওয়া হত। উদ্দেশ্য দণ্ডিত ব্যক্তির গ্রামবাসীদের সাবধান করা। কার্তিকের ফাঁসি হওয়ার পর তার মা 'আমার লোহার কার্তিক কোথা গেল' বলে কেঁদেছিল। সেই থেকে কথাটি প্রবাদে পরিণত হয়েছে।

এই প্রবাদটি ব্যক্তি চরিত্রের অকাল পরিণতি, সামাজিক রীতির পরিচায়ক।

'গোড়ায় গলদ' বলতে আমরা 'বিসমিল্লায় গলদ' বলে থাকি। এর কাহিনিটি এরকম— এক মুসলমান ফকির তার চেলাদের পরামর্শে নবাবের কাছ থেকে

অর্থনৈতিক সুবিধা আদায়ের জন্য খোদাতালার নির্দেশ গভীর অরণ্যের একটি বৃক্ষে লিখে আসলেন। বনমধ্যে উপস্থিত হয়ে মন্ত্রী দেখলেন এই নির্দেশের প্রথমে 'বিসমিল্লা' লেখা রয়েছে। এই কথাটি পড়েই তিনি বুঝলেন ব্যাপারটা চক্রান্তের সঙ্গে যুক্ত। অতএব সুযোগ দানের প্রশ্নই নেই। কেননা খোদা কখনই নির্দেশ দিতে গিয়ে নিজেকে স্মরণ করবেন না।

বাঙালির জাতিগত বৈশিষ্ট্যের কথা বলবার সময় আমরা প্রায়শই বাঙালির রোদনপ্রিয়তা নিয়ে কথা বলি। দীর্ঘদিনব্যাপী এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়ে আছে। কিন্তু আমরা যদি স্বাভাবিক বুদ্ধির নিকষে ব্যাপারটা দেখি তবে দেখব এই পরিচয় পূর্ণ পরিচয় নয়, আংশিক পরিচয় মাত্র। বাংলা প্রবাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাহিনিগুলো তার প্রমাণ। বাঙালীর রসবোধ অত্যন্ত শীলিত এবং বাঙালী গল্প রচনায় বিশেষ পারদর্শী এই দুই মুদ্রা যেন ভাস্বর হয়ে আছে প্রবাদের দেহে।

এহেন প্রবাদের গল্পে যে চরিত্রগুলো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তার অধিকাংশই আমাদের চেনাজানা গণ্ডীর মধ্যেই ঘোরাফেরা করে। এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয়, আধ্যাত্মিক বা পৌরাণিক চরিত্রের তুলনায় সাধারণ পরিচিত মানুষই গুরুত্ব লাভ করেছে। আসলে প্রবাদের মূল লক্ষ্য মানবচরিত্র। আরও একটু স্পষ্ট স্বচ্ছ করে বললে মানবচরিত্রের সমালোচনা। এই সমালোচনায় দুটি উদ্দেশ্য নিহিত। এক. বিশেষ বিশেষ চরিত্রের নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যকে জনসমাজের কাছে উপস্থাপন করা। দুই. ওই বৈশিষ্ট্য বুঝে ব্যক্তি মানুষকে সংশোধন করিয়ে নেওয়া। এখানে সেই ছাপ স্পষ্ট।

আর একটি প্রসঙ্গের কথা বলে পূর্ণযতি টানব। প্রবাদের প্রতিটি গল্পেই একটি নীতি বা উপদেশ বর্ণিত। কিন্তু এই উপদেশ বর্ণনা করতে গিয়ে গল্পরস খণ্ডিত হয়নি। কেননা তাতে প্রবাদের প্রচারধর্মিতা বিঘ্নিত হত। এইসব কাহিনি জানা থাকলে প্রবাদের গভীরতর অর্থ অন্বেষণ যে সহজ হবে তা নিশ্চিত। তবেই প্রবাদ চর্চা সার্থক হবে, হবে যথাযথ।

তথ্যসূত্র :

১. চক্রবর্তী বরুণকুমার 'প্রগল্প' দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮৮
২. চক্রবর্তী বরুণকুমার 'লোকসংস্কৃতির সুলুক সন্ধানে' দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১০

গীতিকার গল্প

চূড়ামণি হাটি

গীতি অর্থে বোঝায় শুধুমাত্রই সঙ্গীত। কিন্তু গীতিকাতে সঙ্গীতের পাশাপাশি মুখ্য বিষয় কাহিনী। মৌকিক ঐতিহ্যে প্রাপ্ত জটিলতা মুক্ত একমুখী ঘটনা কেন্দ্রিক যে নাটকীয় সংলাপ ধর্মী বর্ণনাত্মক লৌকিক প্রণয় কাহিনী তা বেশ কয়েকটি ক্ষুদ্রাকৃতি পালায় চারণ কবিরা পরিবেশন করে থাকেন; তাই হলো গীতিকা। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় বাংলাদেশের প্রাচীনতম গীতিকা নাথ গীতিকার কথা এবং মোটামুটি ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যে রচিত বাংলাদেশের দক্ষিণাংশ ও মৈমনসিংহ থেকে সংগৃহীত গীতিকা। এই সকল গীতিকাতেই আছে একটি ঘটনা প্রবাহ। সভ্যতার বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ে মানব মনের মধ্যে বিস্ময়বোধ বেশী করে ক্রিয়া করেছে। তাই প্রথম পর্যায়ে সৃষ্ট নাথগীতিকাগুলি অলৌকিক বিশ্বাস থেকে মুক্ত হতে পারেনি। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে সৃষ্ট মৈমনসিংহ সহ পূর্ববঙ্গের অন্যান্য গীতিকাগুলি ছিল ধর্মীয় প্রভাব মুক্ত; ফলে এগুলিতে অলৌকিকতা অনুপস্থিত। আবার ধর্মীয় প্রভাব মুক্ত বলে আদিরসাত্মক বা স্থূলত্বে ভারাক্রান্ত এমন অভিযোগও আনা যায় না। বাস্তব ও কল্পনার দক্ষ প্রকাশ। মূলতঃ বাদ্যযন্ত্র সহযোগে পাঁচালী ভাটিয়ালী সুরে গীত গীতিকাগুলির রচয়িতার নাম নিয়ে প্রশ্ন-বিতর্ক থাকলেও একথা ঠিক, কারোর ভাবনা থেকে উঠে আসা বা কারোর নির্দেশে দলগত ভাবে তৈরি গীতিকার গল্পের বীজ মুখে মুখে বিকশিত বা অল্প-বিস্তর পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে প্রচণ্ড প্রাণশক্তির গুণে শ্রুতি ও স্মৃতি নির্ভর হয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। পল্লী কবিরা ছন্দবদ্ধ গীতিকার পালাগুলিতে সুর সংযোজন করে গেয়ে বেড়াতেন। কিন্তু সঙ্গীত অপেক্ষা গীতিকার গল্পগুলিই ছিল বেশী আকর্ষণীয়। ধৈর্যের অবকাশ না রেখে একটি ধারাবাহিক কাহিনী দ্রুত বেগে পরিণতির দিকে এগিয়ে গেছে। অবশ্য মিলনের পরিণতির দিকে ঝোঁক কম। সহজ-সরল ভাবেই কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটেছে। স্বাভাবিক কথন ভঙ্গী অর্থাৎ গদ্য রীতি না থাকলেও কাহিনীর মাধুর্যেই গীতিকা লোকসমাজের মনোরঞ্জনে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিল। এই গীতিকাগুলি সংগ্রহের কাজে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন চন্দ্রকুমার দে, আশুতোষ চৌধুরী, কবি জসীমুদ্দীন, মনসুরউদ্দীন, নগেন্দ্রচন্দ্র দে, বিহারীলাল রায়, শিবরতন মিত্র, মনোরঞ্জন চৌধুরী, কেদারনাথ মজুমদার, দীনেশচন্দ্র সেন, ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক এবং স্যার জর্জ গ্রীয়ারসন প্রমুখ।

নাথগীতিকায় প্রাধান্য পেয়েছে প্রধানত দুটি কাহিনী। একটি হলো 'গোর্খনাথ-মীননাথের কাহিনী' বা 'গোরক্ষ বিজয়' বা 'মীনচেতন'। আর অন্যটি হলো 'গোপীচন্দ্র-ময়নামতী'র কাহিনী বা 'গোপীচন্দ্রের গান'। 'গোর্খনাথ-মীননাথের কাহিনী'র সূচনাতেই আছে সৃষ্টি রহস্য, আদিনাথ শিবের উৎপত্তি এবং নাথ সিদ্ধাগণের জন্মবৃত্তান্ত। এরপর শিব-গৌরীর কথোপকথনে ধর্মতত্ত্ব বিবৃত হয়। এই গূঢ়তত্ত্ব মীননাথ লুকিয়ে শুনে মর্তে প্রচার করেন। কিন্তু পরে মহাদেবের অভিশাপে তা ভুলে যান। মীননাথের শিষ্য গোর্খনাথ তা হেঁয়ালী ভাষায় স্মরণ করিয়ে দেন। ফলস্বরূপ গুরু দিব্যদেহ লাভ করেন। যাই হোক, নাথগীতিকায় রাজা মানিকচন্দ্রের ও ময়নামতীর পুত্র গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস গ্রহণের কাহিনীটিই সর্বাধিক জনপ্রিয়; যা মূলতঃ 'গোপীচন্দ্রের গান' নামে বেশী পরিচিত। অধুনা বাংলাদেশের রংপুর জেলায় এই গীতিকার বেশ চল ছিল। কাহিনীতে দেখি, পিতার মৃত্যুর পর গোপীচন্দ্র পিতার সিংহাসনে অভিষিক্ত হন; আর মা বুঝতে পারেন ছেলের আয়ু বেশিদিন নয়। তাই মা একমাত্র পুত্রকে সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য বলেন কিন্তু তরুণ গোপীচন্দ্র রাজি হন না। এ ব্যাপারে এগিয়ে আসেন দুই পত্নী অদুনা ও পদুনা। নানা ভাবে মা ময়নামতীকেই পরীক্ষা করা হলো। গোর্খনাথের শিষ্যা ময়নামতী সব পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হলে গোপীচন্দ্র সন্ন্যাস-জীবন গ্রহণ করলেন এবং পরে মহাজ্ঞানের অধিকারী হয়ে ফিরে আসেন। বলাবাহুল্য তুলনামূলক ভাবে 'গোপীচন্দ্রের গান' গীতিকাটিতে মানবিক আবেদন নাথ ধর্মতত্ত্বের জটিলতাকে অতিক্রম করে যায়। উল্লেখ্য নাথ গীতিকার রচয়িতা হিসাবে বেশ কয়েকটি নাম উঠে আসে; এঁরা হলেন ভবানী দাস, সুকুর মামুদ, শেখ ফয়জুল্লা, দুর্লভ মল্লিক প্রমুখ। দীনেশচন্দ্র সেন ও বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভের সম্পাদনায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'গোপীচন্দ্রের গানে'র প্রথম খণ্ডটি ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে এবং দ্বিতীয় খণ্ডটি ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এরই পাশাপাশি দীনেশচন্দ্র সেনের সম্পাদনায় ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে 'ময়মনসিংহ গীতিকা'র ইংরাজী অনুবাদ 'Eastern Bengal Ballads—Mymensingh' প্রকাশিত হয়। বলাবাহুল্য 'Ballad' শব্দটি নিয়ে আপত্তি তোলা যেতে পারে। পাশ্চাত্যে 'Ballad' হলো নৃত্যগীত। যাই হোক, ঐ বছরই বাংলা সংস্করণও প্রকাশিত হয়।

'ময়মনসিংহ গীতিকা'র ১ম খণ্ড ২য় সংখ্যায় স্থান পেয়েছে দশটি পালা। পালাগুলি হলো 'মহুয়া' (দ্বিজ কানাই প্রণীত), 'মলুয়া' (সম্ভবতঃ চন্দ্রাবতী প্রণীত), 'চন্দ্রাবতী' (নয়ান চাঁদ প্রণীত), 'কমলা' (দ্বিজ ঈশান প্রণীত), 'দেওয়ান ভাবনা' (চন্দ্রাবতী প্রণীত), 'দস্যু কেনারামের পালা' (চন্দ্রাবতী প্রণীত), 'রূপবতী' (অজ্ঞাত), 'কঙ্ক ও লীলা' (দামোদর দাস, রঘুসূত, শ্রীনাথ বেনিয়া, নয়নচাঁদ ঘোষ এই চারজন চারণকবির ভণিতা যুক্ত।), 'কাজল রেখা' (অজ্ঞাত), 'দেওয়ানা মদিনা' (মনসুর বয়াতি প্রণীত)। আর 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র ৩টি খণ্ডে মোট চুয়াল্লিশটি পালা স্থান লাভ করেছে। পালাগুলি

হলো ধোপার পাট, মইষাল বন্ধু, কাঞ্চন মালা, শান্তি, নীলা, ভেলুয়া, কমলারাণীর গান, মানিকতারা ডাকাইতের পালা, মদনকুমার ও মধুমালা, সাঁওতাল হাঙ্গামার ছড়া, নেজাম ডাকাইতের পালা, দেওয়ান ঈশা খাঁ মসনদ আলি, সুরৎজামাল ও অধুয়া, ফিরোজ খাঁ দেওয়ান, মঞ্জুর মা, কাফেন চোরা, ভেলুয়া, হাতীখেদা, আয়নাবিবি, কমল সদাগর, শ্যামরায়, চৌধুরীর লড়াই, গোপিনী কীর্তন, সুজা তনয়া বিলাপ, বারোতীর্থের গান, নছর মালুয়া, শীলা দেবী, রাজা রঘুর পালা, নুরন্নেহা ও কবরের কথা, মুকুট রায়, ভারাইয়া রাজার কাহিনী, আন্ধাবন্ধু, বগুলার বারমাসী, চন্দ্রাবতীর রামায়ণ, সন্নমালা, বীরনারায়ণের পালা, রতন ঠাকুরের পালা, পীর বাতাসী, রাজা তিলক বসন্ত, মলয়ার বারমাসী, জিরলনী, পরীবানুর হাঁহলা, সোনারায়ের জন্ম, সোনা বিবির পালা। বলে নেওয়া ভালো 'ময়মন সিংহ গীতিকা'র অন্তর্ভুক্ত 'কাজল রেখা' আসলে রূপকথা। আবার 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র অন্তর্গত 'কাঞ্চন মালা'-ও রূপকথা। এমনকি 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'রই অন্তর্ভুক্ত 'সাঁওতাল হাঙ্গামার ছড়া', 'গোপিনী কীর্তন' আসলে কী—তা নামেতেই পরিষ্কার; অর্থাৎ ছড়া-কীর্তন গীতিকা নয়। আবার এও বলে নেওয়া প্রয়োজন সব পালা গানই গীতিকা নয়; যেমন 'বনবিবির পালা'-র মতো ওস্তাদ দ্বারা রচিত বিভিন্ন যাত্রা পালা। এসকল পালাতে কাহিনী অপেক্ষা দ্বন্দ্বই প্রধান। কিন্তু গীতিকায় কাহিনীর সরল প্রকাশভঙ্গীই মুখ্য। মনের গভীরতাকে আশ্রয় করে কবিতা গান হয়ে উঠেছে। মৈমনসিংহ সহ পূর্ববঙ্গের গীতিকার কাহিনীগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে মধ্যযুগের হয়েও ধর্মীয় অলৌকিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন। গীতিকায় লক্ষণীয় বিষয়টি হলো স্ত্রী চরিত্রের রমরমা এবং তুলনামূলক ভাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরুষ চরিত্রগুলি নিষ্প্রভ। আর এরই পাশাপাশি নীতি উপদেশে কাহিনীকে ভারাক্রান্ত না করে প্রেমের স্বাধীনতা ও যন্ত্রণাকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। কিন্তু লোককবিরা শ্রোতার মনোরঞ্জনের জন্য দেহজ বর্ণনার সুযোগ নেননি।

প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখা ভালো 'ময়মনসিংহ গীতিকা'র মধ্যে 'মহুয়া' পালাটি নানা বৈচিত্র্যগুণে উল্লেখযোগ্য। বন্দনা অংশটি ছাড়া 'মহুয়া' পালার কাহিনী চব্বিশটি অংশে বিভক্ত। পরপর ঘটনাগুলি সংযুক্ত করলে যে কাহিনীটি দাঁড়ায় তা হলো, ডাকাত সর্দার হুমরা বেদে কাঞ্চনপুর গ্রামের ব্রাহ্মণ কন্যা 'মহুয়া সুন্দরী'কে অপহরণ করে। তারপর খেলা দেখানোর উদ্দেশ্যে দলবল নিয়ে গোরা পাহাড় ত্যাগ করে বামনকান্দা গ্রামে উপস্থিত হয়। নদের চাঁদের সভায় বেদের দলের আগমন সংবাদ এলো এবং এরই সঙ্গে নদ্যার ঠাকুর জানতে পারলেন পরম এক সুন্দরী কইন্যাও এসেছে। পরের দৃশ্যই হলো খেলা প্রদর্শন এবং নদ্যার ঠাকুরের আশাতীত পুরস্কার দান। এরপর একদিন নদ্যার ঠাকুরের সঙ্গে মহুয়ার জলের ঘাটে দেখা এবং নদ্যার ঠাকুর সেই নির্জন পরিবেশে বিবাহের প্রস্তাব দেন। কিন্তু মহুয়া সুন্দরীর উত্তর—"লজ্জা নাই নির্লজ্জা ঠাকুর লজ্জা নাইরে তর।/গলায় কলসী বাইন্দা জলে ডুব্যা মর।" আর এরই সাথে

প্রেমিক নদ্যার ঠাকুরের উত্তর—"কোথায় পব কলসী কইন্যা কোথায় পাব দড়ি।/তুমি হও গহীন গাঙ্গ আমি ডুব্যা মরি।" আর এর পরের দৃশ্যেই দেখি মহুয়া তার প্রাণের দোসর পালঙ্ক সইয়ের কাছে অকপটে নদ্যার ঠাকুরের প্রতি তার তীব্র আকর্ষণের বিষয়টি উপস্থিত করে। অন্যদিকে হুমরা ভাই মাইন্‌কিয়াকে জানায় মহুয়া ও নদ্যার ঠাকুরের মতিগতি। আসলে মহুয়া তাদের দলের ব্যবসায়িক সম্পদ। তাই মহুয়া হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে এই ভাবনায় অন্যত্র যাবার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে চায়। এরপরই দেখি গভীর রাতে নদ্যার ঠাকুরের বাঁশির স্বরের ইঙ্গিতে মহুয়া পাগলের মতো ঘর থেকে বেরিয়ে নদ্যার ঠাকুরকে জড়িয়ে ধরে ভেতরের যন্ত্রণার প্রকাশ ঘটালো। কিন্তু দলের সিদ্ধান্তে মহুয়াকে বিদায় নিতে হলো। অবশ্য সে জানিয়ে যেতে ভোলেনি—"দেখা করতে যাইও বন্ধু খাওরে আমার মাথা"। বেদের দলের পলায়ন এবং এরই সাথে সাথে নদ্যার ঠাকুরও বিচ্ছেদ যন্ত্রণায় পাগল হয়ে যান। তারপর মায়ের কাছে তীর্থ ভ্রমণের কথা বলে মহুয়ার সন্ধানে বিদায় নেন। হলেন নিরুদ্দেশ। 'জইতান পাহাড়ে'র কথা মহুয়া যাবার আগে বলে গিয়েছিল। নদ্যার ঠাকুর সেই ঠিকানা খুঁজতে লাগলেন। বেদের দল এখন ভিন্ন দেশে। ঘুরে ঘুরে নদ্যের ঠাকুরও উপস্থিত এবং মহুয়ার দর্শন পেয়ে যখন আনন্দে মত্ত হয়ে ঘুমিয়ে আছেন, সেই সময় পালক-পিতার বিষযুক্ত ছুরি দিয়ে মহুয়াকে বলে নদ্যার ঠাকুরকে হত্যা করতে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সব কিছু ত্যাগের মধ্য দিয়ে প্রেমেরই জয় হয়। হুমরা বেদেরই তেজি ঘোড়া নিয়ে দেশান্তবি হয়। কিন্তু পার্বত্য নদী পথে একটির পর একটি বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছে এবং এরই সাথে সাথে কূটবুদ্ধিরও পরিচয় মেলে। যেমন দুই জনে যখন সাধুর ডিঙ্গায় তখন কৌশলে সাধু নদ্যার ঠাকুরকে জলে নিক্ষেপ করলে মহুয়াও কৌশলে বিষ মিশানো পান খাইয়ে সাধু ও তার দলবলকে অচেতন করে নৌকা ডুবিয়ে দেয়। এরপর নদীর পরপারে নদ্যার ঠাকুরকে খুঁজতে থাকে। খুঁজেও পায় এবং এক সন্ন্যাসীর সহযোগিতায় স্বামীর প্রাণ ফিরে পায। কিন্তু সন্ন্যাসীও মহুয়ার 'যইবন' স্পর্শ করার ইচ্ছা প্রকাশ করল আর তখনই কৌশলে মহুয়া নদ্যার ঠাকুরকে নিয়ে দূরে সরে যায়। এরপর বনের মধ্যে ছ'টি মাস বেশ সুখেই গেল। সুখ-দুঃখ-বিপদের মধ্যদিয়েই বনের মধ্যে দিনগুলি কাটতে লাগল। এরপর হঠাৎই বিভীষিকার মতো হুমরা বেদের উপস্থিতি। আবার মহুয়াকে বিষযুক্ত ছুরি দিয়ে নদ্যার ঠাকুরকে হত্যার নির্দেশ দিয়ে পালিত পুত্র সুজনকে বিয়ে করতে বলে। কিন্তু নিরুপায় মহুয়া আত্মঘাতিনী হয় এবং শেষ পর্যন্ত হুমরার নির্দেশে বেদের দল নদ্যার ঠাকুর অর্থাৎ নদের চাঁদকে হত্যা করে। অবশ্য এরপরই হুমরা বেদের অনুতাপ প্রকাশ পেয়েছে। হুমরার নির্দেশেই দুজনকে একসঙ্গে কবর দেওয়া হয়। এইভাবে গীতিকার কাহিনীগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে সমাজের নানা দিক যেমন আমরা খুঁজি পাবো তেমনি টানটান উত্তেজনার মধ্যে মনে দাগ কাটার মতো গল্পের বিষয় বস্তু পাঠক-শ্রোতার মনকে তৃপ্তি দেবে।

গীতিকার কাহিনীকে আকর্ষণীয় করেছে নারীর প্রেমের ব্যাকুলতা, মিলনের আকাঙ্ক্ষা, বিচ্ছেদ-বেদনা, সামাজিক ও পারিবারিক বাধা, সমাজপতির নিষ্ঠুরতা, ভাগ্য-বিপর্যয় এবং এরই সাথে শব্দ প্রয়োগে শৈল্পিক চেতনা। এ সব কিছুর মধ্যদিয়েই মনের গভীরতা, প্রেমের মাধুর্য এবং হাহাকার প্রকাশ পেয়েছে। 'মলুয়া' পালায় দেখি কলসী নিয়ে ঘাটে জল আনতে গিয়ে ঘুমন্ত সুন্দর পুরুষকে দেখে মলুয়ার মনে ঢেউ ওঠে। নানা কথোপকথন পরিচয় দানের পর ভিন দেশী বিনোদকে স্বামী হিসাবে পাওয়া। এরপর দেখি কাজীর নজরে পড়ে যায় মলুয়ার রূপ। কিন্তু কাজী নানা লোভ দেখিয়েও স্বামীর প্রতি বা স্বামী-গৃহের প্রতি মলুয়ার একনিষ্ঠ ভক্তিকে টলাতে পারেনি। তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় দিয়েই কাজী এবং দেওয়ান সাহেবের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করেছে সে। কিন্তু আত্মীয়দের নিষ্ঠুর বিচারে মলুয়া হয়ে যায় অসতী এবং জাতিচ্যুত। আবার বিনোদের বিয়ে দেওয়া হয়। তবুও সে দাসী হয়ে স্বামীর সেবা করেছে। শেষ পর্যন্ত কালনাগের কামড়ে বিনোদের যখন আশঙ্কাজনক অবস্থা তখন কেঁদে উঠেছে মলুয়ার মন। যদিও শেষ পর্যন্ত ওঝাদের চেষ্টায় বিনোদ প্রাণ ফিরে পায়। তার গায়ে জোর করে লাগিয়ে দেওয়া কলঙ্কের দাগ নিয়ে মলুয়া আত্ম সমালোচনা করে। আবার এও ভাবতে থাকে সে থাকতে যখন স্বামীর এতো দুঃখ; তখন সে আত্মহত্যার পথই বেছে নেয়। আবার 'চন্দ্রাবতী' গীতিকার কাহিনিটিতে দেখবো, চন্দ্রাবতী সঙ্গী জয়ানন্দকে ভালোবাসে কিন্তু এর পরেও এক মুসলমান কন্যার সঙ্গেও ভাব জমায় জয়ানন্দ। তাকেই বিবাহ করে, ফলে বীতশ্রদ্ধ চন্দ্রাবতী বাপের বাড়িব মন্দিরে দিন কাটাতে লাগলেন। এমন একটি মুহূর্ত এলো যে দিন জয়ানন্দ বুঝতে পেরেছিল তার ভুল। ছুটে আসে মন্দিরে চন্দ্রাবতীর কাছে কিন্তু চন্দ্রাবতী মন্দিরের দরজা বন্ধ করে দেয়, কিন্তু গুমরে কেঁদে ওঠে তার মন। ততক্ষণে জয়ানন্দ মন্দির ত্যাগ করেছে। ছুটে জয়ানন্দের কাছে যেতে চায় চন্দ্রাবতী। বেরিয়ে পড়ে। দেখে মৃত জয়ানন্দের ভাসমান দেহ। নীরবে এক কঠিন যন্ত্রণায় চন্দ্রাবতী স্থির হয়ে যায়। এভাবে প্রতিটি পালার গল্প বা কাহিনীগুলি চোখের সামনে আনলে ফুটে উঠবে নানান অবস্থায় প্রেমিকা-নারীর নানা বিচিত্র গতিপথ।

সংগৃহীত গীতিকাগুলির শীর্ষভাগই নারীমন দখল করে আছে। অল্প বয়সে বিয়ে এবং তারই মধ্যে প্রেম; আর তারই সাথে দায়িত্ব-কর্তব্য পালন। ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে নানা বাধাকে অতিক্রম করার চেষ্টা নিয়ে নারী চরিত্রগুলি চঞ্চল। সুখ-দুঃখে জড়ানো প্রেমের বৈচিত্র্যের গুণে প্রতিটি মানুষকেই গীতিকার কাহিনীগুলি আকৃষ্ট করে। চরিত্রগুলির মানসিক দ্বন্দ্বের মধ্যদিয়ে চুঁইয়ে-চুঁইয়ে পড়া প্রেমের রস পাঠক-শ্রোতাদের মনে একটা আলাদা অনুভবের জগৎ তৈরি করে দিতে পারে। প্রতিটি গীতিকাতেই আছে এক একটি আলাদা গল্প। এগুলি সংগ্রহ না হলে সাহিত্যের এই ঐতিহ্যাশ্রিত মৌখিক ধারাটি অধরাই রয়ে যেতো। বেশ কিছু ক্ষেত্রে বন্দনা অংশ

ছাড়া পালাটি সংগ্রহ হয়েছে বা বন্দনা অংশটি গুরুত্বহীনতার কারণে হারিয়ে গেছে। আসলে বন্দনা অপেক্ষা গল্পই মানুষকে বেশি টানে। গীতিকার গল্পগুলি গদ্যে পরিবেশিত না হলেও ছন্দ-অলঙ্কারের মাধুর্যে উপযুক্ত পল্লী কবি বা গায়েনের কণ্ঠে ও গল্পের বাঁধনে দিনের পর দিন পল্লী সমাজকে আকৃষ্ট করেছে, যেভাবে কথক ঠাকুরের কথকতা কিংবা কবিরলড়াই শুনতে একদিন পল্লীর সাধারণ মানুষ ভীড় জমাতো। আজ গীতিকার কাহিনীর মধ্যে গ্রাম বাংলার পরিবেশকে পেলেও সুর তুলে গীতিকা পরিবেশন করার মতো তেমন সঠিক সংখ্যক গীদান নেই। যেমন বাদ্য যন্ত্র হিসাবে থাকতো সারিন্দা, দোতারা, ঢাক, ঢোল, সানাই এবং ধুয়া দেওয়ার জন্য সহযোগী শিল্পীরা। যাই হোক প্রেমের নানা লীলায় সমৃদ্ধ গীতিকাগুলি আকৃষ্ট করে আজকের বর্তমান পাঠক সমাজকেও। ঐতিহাসিক উপাদান খোঁজার লক্ষ্য নিয়ে নয় বিচিত্র গল্প বিন্যাসের টানেই সংগৃহীত হয়েছে একটির পর একটি গীতিকা। বর্তমানে গীতিকার গল্পকে আশ্রয় করে তৈরি হচ্ছে চলচ্চিত্র। গীতিকাগুলির সাহিত্য মূল্য জনপ্রিয়তার বিচারে আজও অমূল্য।

গ্রন্থ ঋণ

ড. দীনেশচন্দ্র সেন : 'মৈমনসিংহ গীতিকা' (কলকাতা, ১৯২৩)
'Eastern Bangal Ballads', Vol-1 (১৯২০)
ঐ, Vol.-2 (১৯২৬)
ঐ, Vol.-3 (১৯২৮)
ঐ, Vol.-4 (১৯৩২)
ড. বরুণকুমার চক্রবর্তী : 'গীতিকা : স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য' (২য় সংস্করণ) ২০০৩

লৌকিক হাসির গল্প

সুব্রত চক্রবর্তী

গ্রামবাংলায় এক সময় এই গল্পগুলা মুখে মুখে ফিরত। জনপদ থেকে দূরান্তে। গ্রাম থেকে শহরে। বিভিন্ন প্রান্তে গল্পগুলো ছড়িয়ে পড়েছিল একদিন। এসব গল্পে সন তারিখ নেই। জানা যায়নি রচয়িতাদের নাম। তাই নেই কোন প্রামাণ্য লিপি। নেই কোন রকম ইতিহাস সাক্ষ্য। এই গল্পগুলোতে পাওয়া যায় গ্রামীণ ঐতিহ্যের নিজস্ব আঘ্রাণ। যা তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে হয়েছে উজ্জ্বল। আর অকৃত্রিম সারল্যে ভরপুর।

বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতদের অভিমত হাসির গল্পগুলো আমাদের গ্রাম বাংলায় রচিত হয়েছিল প্রথমে। পরে বাইরে ভারত তথা অন্যান্য দেশে যথা ইউরোপ, আমেরিকা চেকোস্লোভাকিয়া প্রভৃতি দেশে পাড়ি জমায়। তাই বলা যায় এই গল্পগুলো আমাদের জাতীয় সম্পদ। আমাদের সাহিত্যের ঐতিহ্য। সংস্কৃতির মাইলস্টোন।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে এমন কিছু গল্প আলোচনা সহযোগে নিবেদিত হয়েছে যাতে পাঠক গ্রাম বাংলার হাসির গল্পের ধারার স্বাতন্ত্র্যকে বুঝতে পারেন। এই গল্পগুলো উপস্থাপিত করার এটাই মুখ্য উদ্দেশ্য।

আয়না

সেই সময় এই দেশে আয়নার প্রচলন ছিল না। একদিন এক চাষী ধান কাটতে গিয়ে জমি থেকে একটা আয়না কুড়িয়ে পেয়ে নিজের মুখ দেখে। যেহেতু আয়নার ব্যবহার জনিত জ্ঞান তার ছিল না তাই নিজের মুখকে আয়নায় নিজের বাপজান মনে করে। মাঝে মাঝে কথা কয়। একদিন চাষী চাষ করতে গেছে। চাষীর বৌ আয়নাটা বের করে দেখে ভাবে এ নিশ্চয় অন্য কোন নারী হবে। কারণ জীবনে আয়নায় নিজের মুখ দেখেনি কখনো। মনে করে চাষী নিশ্চয় একে নতুন বিয়ে করেছে। চাষী আসতেই শুরু হয়ে গেল তুমুল ঝগড়া। চাষী যত বলে, ওটা আমার বাপজান। চাষী বউ তত বলে, একে কেন বিয়ে করলে? শেষকালে পাড়া প্রতিবেশী সকলে ক্রমে আয়নার সামনে জড় হল। দেখা গেল আয়নায় সকলের মুখের ছবি উঠেছে। তখন সকলের ভুল ভাঙল। বুঝল এটার নাম আয়না।

আয়নার ব্যবহার জনিত পরিচয় না থাকার ফলে আয়নায় প্রতিফলিত নিজেদের মুখ অন্য কারও বলে মনে করাতে এখানে হাসির উদ্রেক ঘটেছে। এবং ফলত চাষী ও চাষী বৌ-এর মধ্যে অযথা ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। এই একটা নিছক আয়নাকেই কেন্দ্র করে।

এখানে আয়না প্রতীক অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। আসলে মানুষের অনেক সম্পর্ক খুব তুচ্ছ কারণে ভেঙে যায়। এই তুচ্ছ কারণের প্রতীক হল আয়না। আমরা যদি তুচ্ছ কারণ গুলোকে ভাল মত বিশ্লেষণ করি তা হলে অহেতুক ভুল বোঝাবুঝিকে চিহ্নিত করতে সক্ষম হব। তখন তুচ্ছ নগণ্য কোন বিষয়ই আর আমাদের সম্পর্কের মাঝে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। সমাজ বিজ্ঞানের দিক থেকে এ গল্পের গুরুত্ব অবশ্যই অসামান্য। আয়না আমাদের শুভ বোধ বুদ্ধির দিশা দেখিয়েছে।

জিদ

এখন বড় বড় কাপড়ের মিল বসেছে শহরে। মিলের কাপড় সস্তা এবং টেঁকসই। তাই তার চাহিদাও প্রচুর বিক্রিও ভাল। অপরদিকে গরীব তাঁতি তাঁতের কাপড় বুনে মিলের কাপড়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেরে ওঠে না। তাই তাঁতির বাজার মন্দ। এমনঅবস্থায় কোনক্রমে ভুলু তাঁতির দিন কাটে। একদিন ভুলুর বৌ মাছ খাবার বায়না করে। অনেক কষ্টে ভুলু তিনটে মাছ কিনে আনে। ভুলুর বৌ মাছ রান্না করে খেতে ডাকে। কিন্তু মাছ ভাগ করাই সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। ছোট তিনটে মাছ। কে দুটো খাবে আর কে একটা খাবে এই নিয়েই বিবাদ শুরু হয়ে গেল। শেষে ঠিক হল তারা দুজনে চুপ করে ঘুমিয়ে থাকবে। আর যে আগে কথা বলবে সে একটা খাবে। দুজনেই ঘরবন্ধ করে শুয়ে পড়ে। রাত কেটে ভোর। ভোর কেটে দুপুর। কোন সাড়াশব্দ নেই। পাড়ার লোকেরা ডাকাডাকি করে। দেখে সাড়াশব্দ কিছুই হচ্ছে না। তখন দরজা ভেঙে ভেতরে দেখে তাঁতি ও তার বৌ শুয়ে আছে নড়েও না চড়েও না। শেষে মোল্লা পরীক্ষা করে মৃত্যু হয়েছে বলে ঘোষণা করে। এরপর মোল্লা এবং আর দুজন তাদের কবর দিতে নিয়েযায়। মাটি চাপা দিতে যাবার সময় ভুলু বলে ওঠে, 'তুই দুটো খা, আমি একটা খাব'। সঙ্গের লোকেরা ভাবল তাঁতিরা ভূত হয়ে তাদের খাবে মনস্থ করেছে। তারা তক্ষুনি দে ছুট। ভুলু তাঁতি ও আর বৌ তখন হেসে সারা।

এই গল্পে তাঁতশিল্পের করুণ অবস্থায় তাঁতিরা যে কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তা তুলে ধরা হয়েছে। আবার অপরদিকে অতিরিক্ত জেদ মানুষকে যে কোন বিপাকে ফেলে সেটাও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ভুলু তাঁতি ও তার বৌ জীবিত তবু পাড়ার লোকেরা তাদের মৃত বলে ভুল করে কবর দিতে নিয়ে যায়। এইখানেই এক নাটকীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। তাদের যেই মুহূর্তে মাটি চাপা দিতে শুরু করে তক্ষুনি ভুলু বলে ওঠে, 'তুই দুটো খা, আমি একটা খাব।' কারণ না হলে তাদেরকে মৃত ভেবে মাটি চাপা দিয়ে কবর দিয়ে দিত। তাই প্রাণ রক্ষার্থে ভুলু বাধ্য হয়েই কথা বলেছিল। কারণ মাছের চেয়ে জীবন দামী। অন্য দিকে ভুলুর ঐ কথা শুনে সঙ্গের দুজন আর মোল্লা এই তিনজন ভাবল ভুলু ভূত হয়ে বুঝি তাদেরই খেতে চাইছে। কারণ ভুলুদের মাছ খাবার ব্যাপার তাদের অজানা। তাই তারা প্রাণ ভয়ে দৌড়তে লাগল। এখানেই হাসির প্রসার ঘটেছে।

অচ্ছুৎ

কাকের কালো কদর্য চেহারা আর কর্কশ স্বরের জন্য কেউ তাকে পছন্দ করে না। কাক খুবই নোংরা। তাই তার বন্ধুও জোটে না। একদিন চড়ুই পাখি বলল, কাক তুমি তোমার ঠোঁট নদীতে ধুয়ে এস তাহলে তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করব। কাক নোংরা ঠোঁট ধুতে নদীতে যেই গেল নদী তাকে অচ্ছুৎ বলে তাচ্ছিল্য করল। বলল একটা মাটির ঘটি নিয়ে জল ভরে তাতে ঠোঁট ধুয়ে নিতে। কাক গেল মাটির ঘটি আনতে কুমোরের কাছে। কুমোর বলল, মাটি দাও ঘটি করে দেব। মোষের কাছে গেল মাটির জন্য। মোষ বলল, সাতদিন ঘাস খাইনি, ঘাস এনে দাও, তারপরে মাটি দোব। কাক গেল মাঠের কাছে মাটির জন্য। মাঠ বলল, কাস্তে এনে ঘাস কেটে নাও। তাই সে গেল কামারের কাছে কাস্তে আনতে। কামার বলল, আগুন নেই আগুন এনে দাও। কাস্তে তৈরি করে দেব। কাক তারপরে গেল গেরস্তর কাছে আগুন নিতে। গেরস্ত আগুন এনে দিল। কিন্তু কিসে করে সে আগুন নিয়ে যাবে? আগুন না নিয়ে গেলে তো জাতে উঠতে পারবে না। অচ্ছুৎ হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যু শ্রেয়ঃ। কাক তার পাখা পেতে যেমন আগুন নিল অমনি সে পুড়ে মারা গেল।

এই গল্পের আখ্যানে কাকের মাধ্যমে আসলে অচ্ছুৎ শ্রেণী মানুষেরই বেদনাবিধুর প্রতিচ্ছবি প্রকাশিত হয়েছে। সমান অধিকার ও সাম্যবাদের গুরুত্বের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতেই এই গল্প রচিত। সমাজে অচ্ছুৎ শ্রেণীর মানুষজনেরা ব্রাত্য। উচ্চশ্রেণীর মানুষেরা এদেরকে ঘৃণার চোখে দেখে। যা ভীষণভাবেই অমানবিক। আমাদের সমাজে কেউই অচ্ছুৎ নয়। কেউই ব্রাত্য নয়। এই কথাটা মনে রাখা জরুরী। ভেদাভেদ বা শ্রেণীগত দূরত্ব থেকে কখনই শান্তি সুখ আসতে পারে না সমাজে। তাই তো বিবেকানন্দ বলেছিলেন, মূর্খ ভারতবাসী দরিদ্র ভারতবাসী চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই। অর্থাৎ সবার ওপরে মানুষ সত্য। কেউই ছোট নয়। কেউই নীচু নয়। কেউই অবজ্ঞার নয়। প্রত্যেক মানুষেরই রয়েছে বেঁচে থাকার অধিকার আর আত্মসম্ভ্রম বোধ।

এগল্পে আর একটা দিক স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তা হল আমরা সামাজিক জীব। আমরা সবাই প্রত্যেকে প্রত্যেকের ওপর নির্ভরশীল। প্রত্যেকেরই অন্যের সাহায্যের প্রয়োজন। তাইতো কাক কুমোর কামার গেরস্ত প্রভৃতি সকলের কাছে গিয়েছিল নিজস্ব প্রয়োজনের তাগিদে।

টুনটুনি আর টুনটুনা

এক বনে একটা টুনটুনি ও তার সাথী টুনটুনা বাস করত। একদিন টুনটুনির খুব ধনী হবার ইচ্ছে জাগে। বনে ঘুরতে ঘুরতে সে একটা কড়ি কুড়িয়ে পায় এবং বাসায় এনে গান ধরে, 'রাজার আছে যত টাকা মোদের আছে তত টাকা।' কানে কানে খবর যায়

রাজার কাছে। রাজা টুনটুনির সব কথা শুনে রেগে ওঠেন। বলেন, ওকে এক্ষুনি বন্দী করে নিয়ে এস। রাজার আদেশে টুনটুনি ও টুনটুনাকে বন্দী করে রাজার কাছে আনা হল। রাজা জল দিয়ে টুনটুনি ও টুনটুনাকে গিলে নিলেন। সতর্ক মন্ত্রী সাথে সাথে রাজার দুইপাশে দুজন সেপাইকে তরোয়াল নিয়ে দাঁড় করিয়ে দেয়। রাজা যদি দৈবাৎ হেসে ওঠেন। এবং সেই সুযোগে টুনটুনি যদি রাজার মুখ থেকে বেরিয়ে যায়। তাহলে তখন সেপাইয়ের তরোয়াল পড়বে টুনটুনির ঘাড়ে। এমন সময় রাজা হেসে ওঠেন। টুনটুনি টুনটুনা সেই মুহূর্তে ফুড়ুৎ। সাথে সাথে সেপাইয়ের তরোয়াল টুনটুনির ঘাড়ে না পড়ে পড়ল রাজার নাকে। নাক হল দু'টুকরো।

এগল্পটা খুবই জনপ্রিয়। রাজার নাক কাটার দৃশ্য আর টুনটুনির পলায়ন এক অনাবিল হাসির পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। তরোয়াল টুনটুনির ঘাড়ে না পড়ে রাজার নাকে পড়াতেই হাসির উদ্রেক ঘটেছে। মনে হতে পারে লঘু দোষে গুরু সাজা দিতে গিয়েই রাজার এই শাস্তি ভোগ। আর অন্যদিকে টুনটুনির ধনী হবার লোভ তাকে বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিয়েছে। বন থেকে কড়ি এনে টুনটুনি অহংকারের বশবর্তী হয়ে গান ধরে— 'রাজার আছে যত টাকা, মোদের আছে তত টাকা। আর এইখান থেকেই টুনটুনিদের দুর্ভোগ শুরু হয়ে যায়। রাজা তাকে বন্দী করে। শেষে গিলে খায়। এ সবই লোভ ও অহংকারের ফল।

নিঝুমপুরের তিন ঠকানি

নিঝুমপুরের রাজা ঠিক করলেন, যে তাঁর রাজ্যে তিনবার ঠকাতে পারবে সেই রাজার ছেলের সঙ্গে তাঁর একমাত্র অপরূপা রাজকন্যা হিরণ বালার বিয়ে দেবেন। পাশের বকুলপুরের রাজা এই শর্তে রাজি হন। ও তাঁর মন্ত্রী ঠকাবার দায়িত্ব নিয়ে নিঝুমপুরে ছদ্মবেশে এক গ্রামে ঢুকে এক চাষীকে বোকা বানিয়ে তার কালো গরুকে মন্ত্রপূত মাটি মাখিয়ে দোষ খণ্ডন করে চাষীর বৌ-এর কছে পাঁচ হাজার টাকা দাবী করে। বলে যে তার বরকে একটা নতুন গরু বিক্রী করেছে। চাষী বৌ জানালা দিয়ে দূরে মাটিমাখা কালো গরুকে কিছুটা সাদা দেখে বিশ্বাস করে। এবং টাকা দিয়ে দেয়। এরপর মন্ত্রী চলে যায় একটা শহরে সেখানে একটা ছোট ছেলের সঙ্গে চকোলেট দিয়ে ভাব জমায়। ছেলেটা বলে, তোমায় কী বলব? মন্ত্রী বলে, বাবা। এরপর একটা শাড়ীর দোকানে ছেলেটাকে নিয়ে যায়। এবং তাকে দোকানে বসিয়ে পাঁচটা শাড়ী নিয়ে বাড়ীতে দেখিয়ে আনার নাম করে মন্ত্রী পালায়। অনেক পরে দোকানদার বুঝতে পারে ঐ ছেলেটা ঐ লোকের নয়। এরপর মন্ত্রী সোজা চলে যায় রাজবাড়িতে সেখানে পুকুরে জাল দিয়ে টাকা তোলার অভিনয় করে রাজা মশাইকে বোকা বানায়। রাজাও নিজের পোশাক খুলে মন্ত্রীর কথামত মন্ত্রীর পোশাক পরে পুকুরে জাল দিয়ে টাকা তুলতে থাকেন। সেই সুযোগে মন্ত্রী রাজার পোশাক পরে রাজমহলে তন্দ্রাচ্ছন্ন রানীর কাছ

থেকে সোনার হার নিয়ে সোজা বকুলপুরে। শেষে নিঝুমপুরের রাজা মেয়ের বিয়ে বকুলপুরের রাজপুত্রের সঙ্গেই দেন।

আগেকার দিনে রাজারা অনেক রকম শর্ত আরোপ করতেন। যা পালন করা রীতিমতই খুব কঠিন হত। ক্ষেত্র বিশেষে প্রাণ বিপর্যয়েরও সম্ভাবনা থাকত। রূপকথা বা রাক্ষসদের গল্পেও এমন কিছু শর্তের প্রয়োগ হতে দেখা গেছে। শর্ত গল্পে অতিরিক্ত আকর্ষণের মাত্রা যোগ করে। এতে গল্পে এক অন্যধরনের গতির সঞ্চার হয়। টান টান উত্তেজনার সৃষ্টি করে।

এই গল্পে তিন তিনবার ঠকাবার মজার কৌশল হাসির সৃষ্টি করেছে। অভিনব ঠকাবার পদ্ধতি বকুলপুরের মন্ত্রীর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে থাকে। গরুকে মাটি মাখিয়ে সাদা করা। শহরের ছোট ছেলেটাকে ভুলিয়ে দোকান থেকে শাড়ী নিয়ে পালালো এবং রাজাকে টাকা তুলতে জাল হাতে পুকুরে নাবানো এ ঘটনাগুলোই হাসির সূত্রপাত ঘটিয়েছে।

ঠাকুরমশায়ের লাঠি

এক গরীব ব্রাহ্মণ কাজের সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে শেষে পথক্লান্ত হয়ে একটা কুয়োর পাড়ে বসে পড়ে। এবং খিদে পাওয়ার জন্যে ব্রাহ্মণীর করা চারটে রুটি বের করতে করতে বলতে লাগল এই চারটেকে এখন খাব। এখন ঐ কুয়োর ভেতর চারটে পরী থাকত। তারা ভাবল ব্রাহ্মণ বুঝি তাদেরই খাবে বলছে। এইভেবে তারা ব্রাহ্মণকে বলল, দোহাই আমাদেরকে খেও না এই হাঁড়িটা দিচ্ছি। এর থেকে তুমি যা খেতে চাইবে তাই পাবে। মহানন্দে ব্রাহ্মণ হাঁড়ি নিয়ে পথে এক বন্ধুর বাড়ী ওঠে। বন্ধু সব শুনে ব্রাহ্মণকে ঠকিয়ে অন্য হাঁড়ি দিয়ে দেয়। ব্রাহ্মণ নকল হাঁড়ি নিয়ে বাড়ি আসে আর ব্রাহ্মণীর সামনে হাঁড়ি থেকে খাবার আনতে ব্যর্থ হয়। পরদিন আবার চারটে রুটি নিয়ে কুয়োর পাড়ে গিয়ে ব্রাহ্মণ আবার বলতে থাকে চারটেকেই খাব। আবার পরীরা এসে ব্রাহ্মণকে না খাওয়ার জন্য মিনতি করে এবং একটা বাক্স দেয়। বলে, এই বাক্সের কাছে যা গয়না কাপড় চাইবে তাই পাবে। আবার ব্রাহ্মণ পথে সেই বন্ধুর বাড়ি বাক্স নিয়ে ওঠে এবং সে ব্রাহ্মণকে আবার যথারীতি ঠকায়। ব্রাহ্মণ বাড়ি গিয়ে নকল বাক্সের কাছে শাড়ি গয়না চেয়ে ব্যর্থ হয়। পরদিন আবার সে চারটে রুটি নিয়ে কুয়োর পাড়ে গিয়ে বলতে থাকে, চারটেকেই খাব। আবার পরীরা বের হয় মিনতি জানায় না খাবার জন্যে। এবার ব্রাহ্মণের কাছে হাঁড়ি ও বাক্সের ব্যর্থতা এবং বন্ধুর বাড়িতে ওঠার খবর পেল। তখন তাকে একটা লাঠি দিয়ে বলল, তোমার বন্ধুর বাড়ি গিয়ে এই লাঠিকে মারতে বলবে। তাহলেই কাজ হবে। ব্রাহ্মণ ঐ লাঠি নিয়ে বন্ধুকে মারতে বলার সঙ্গে সঙ্গে লাঠির মার আরম্ভ হয়ে গেল। তখন বন্ধু তার আসল হাঁড়ি ও বাক্স ফেরত দিয়েছিল।

পরীর দেওয়া লাঠির মার যখন বন্ধুর ওপর পড়ল তখনই একটা হাসির পরিবেশ গড়ে উঠল। আবার ব্রাহ্মণ যখন কুয়োর পাড়ে বসে রুটিগুলো বের করে বলতে লাগল এই চারটেকেই খাব, আর অপরদিকে কুয়োর ভেতরে থাকা পরীরা ভাবল বুঝি বা তাদেরকে ব্রাহ্মণ খাবে বলছে, কারণ সংখ্যায় তারাও চারজন, রুটির সংখ্যার সমান। কাজেই এক্ষেত্রে ভ্রম বশতঃ পরীদের না খাওয়ার জন্য ব্রাহ্মণের কাছে মিনতি জানানোও একটা হাসির পরিমণ্ডল গড়ে দেয়। অন্যের জিনিসের ওপর লোভ করা বা অন্যের জিনিস আত্মসাৎ করা ঠিক নয়। তাই ব্রাহ্মণের ঠক বন্ধুকে রীতিমত মার খেয়ে শেষে হাঁড়ি বাক্স ফেরৎ দিতে হল। লোভের এও এক পরিণাম।

নাপিত-ব্রাহ্মণ

এক চতুর নাপিত দীর্ঘদিন এক ব্রাহ্মণের সেবক হবার সুবাদে ব্রাহ্মণের পুজো আর্চা শিখে নেয়। এরপর গলায় পৈতে পরে ব্রাহ্মণ সেজে বহু দূরে শহরে পসার জমায়। ঘটনাচক্রে এক গরীব ব্রাহ্মণের দুই মেয়ের সাথে তার বিয়ে হয়। একদিন হঠাৎ পথে ঐ ব্রাহ্মণ ভেকধারী নাপিতের সাথে আর পূর্বপরিচিত নিমাইদত্তর দেখা হয়ে যায়। বুদ্ধিমান নিমাই নাপিতের ব্রাহ্মণে রূপান্তরিত হওয়া, বিয়ে করা ইত্যাদি ঘটনা জেনে নেয়। এও জানতে পারে নাপিত তার বড় বউকে ভালচোখে দেখে না। গণৎকার সেজে নিমাই এবার নাপিতের অনুপস্থিতিতে খুঁজে খুঁজে ঐ নাপিতের বাড়ি গিয়ে হাজির। তারপর নিজের পরিচয় দিয়ে বড় বউয়ের হাত দেখে বলে তার স্বামী তাকে ভালচোখে দেখে না, দুর্ব্যবহার করে। বিস্মিত বড় বৌ প্রতিকার জানতে চাইলে তার কানে নিমাই একটা মন্ত্র বলে—

সেছিল নিমাই দত্ত
বলেগেছে সকল তত্ত্ব
তোমার এতগুণ
তুমি নাকি এমন তেমন।

এই মন্ত্র দিয়ে বলে, স্বামী রেগে গেলে এইমন্ত্র বললেই স্বামী ভালব্যবহার করবে। এরপর নিমাই মোটা দক্ষিণা নিয়ে পালিয়ে যায়। স্বামী খারাপ ব্যবহার করলে, বড় বৌ এই মন্ত্র তাকে শোনালেই মন্ত্রর মতই কাজ হত। স্বামী ভাল ব্যবহার করতে শুরু করত।

এই গল্পে গ্রাম্য-সংস্কারের প্রভাব স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। ভাগ্যগণনা এবং মন্ত্রযোগে তার প্রতিকার সেই কথাই মনে করিয়ে দেয়। আবার নাপিতের ব্রাহ্মণের ভেক ধারণ যেমন একদিকে তার শঠতার পরিচয়, তেমনই সমানভাবে তাকে লোভী মানুষ হিসেবে চিহ্নিত করে। যে কোন ছলনা বা কপটতা দুর্গতির কারণ হয়ে উঠতে পারে। এ গল্প তারই প্রমাণ। প্রকৃত 'মন্ত্র' বলতে যা বোঝায় নিমাই দত্তর শেখানো মন্ত্র আদপে তা ছিল না। কেবল কতকগুলো কথা এবং তা ছিল নিছক ঐ নাপিতকে

ব্ল্যাকমেল করার এক অপকৌশল মাত্র। পূর্ব পরিচিত নিমাই দত্তর নাম ঐ মন্ত্রে ব্যবহৃত হয়েছে, যাতে সহজেই নাপিত বুঝতে পারে তার বড় বউ তার পূর্ব পরিচয় জেনে ফেলেছে। 'বলেগেছে সকল তত্ত্ব' এর অর্থ হল নাপিতের পূর্ব পরিচয় জানিয়ে গেছে এখানেই হাসির উপাদান দানা বেঁধে উঠেছে

মাঝি ও পণ্ডিত

খুবই প্রচলিত এ গল্প। একবার এক মাঝির নৌকায় এক দিকগজ পণ্ডিত উঠেছেন। পদ্মায় নৌকা চলছে। পণ্ডিত একথা সেকথা বলার পর মাঝিকে একের পর এক প্রশ্ন করতে শুরু করলেন— মাঝি তুমি ভূগোল পড়েছ, বিজ্ঞান পড়েছ ইতিহাস পড়েছ? মাঝি এক কথায় না বলায়, পণ্ডিত তাকে বলেন, তবে তো তোমার জীবনটাই বৃথা। মূর্খ হয়ে বেঁচে থাকার কোন অর্থই হয় না। এমন সময়ে আকাশ মেঘে মেঘে ছেয়ে গেল। আকাশে উঠল প্রবল ঝড়। নৌকা টলমল করতে লাগল। মাঝি তখন পণ্ডিতকে জিজ্ঞেস করে, পণ্ডিত মশায় আপনি সাঁতার জানেন? পণ্ডিত ভয়ে ভয়ে বলেন, না। তখন মাঝি বলে, আমি পড়াশোনা শিখিনি বলে আমার জীবন বৃথা। কিন্তু এত বিদ্যা জেনেও কেবল সাঁতার না জানার জন্যে আপনার জীবন যে আর রক্ষা পাবে না। কথা বলতে বলতেই নৌকা জলে ডুবে গেল। মাঝি সাঁতরে পাড়ে উঠে গেল। আর পণ্ডিতমশায় জলে ডুবে গেলেন।

এই গল্প থেকে এটাই বোঝা যায় বেশি অহংকার ভাল নয়। পণ্ডিত মশাই বিদ্যার অহংকারে স্ফীত হয়ে মাঝিকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করছিলেন। লেখাপড়া না জানার জন্যে তাকে অপমানিত করে বলেছিলেন, তোর জীবনটাই বৃথা। এ অবজ্ঞা করার হেতুই অহংকার। আবার অন্য দিক দিয়ে যে মাঝির নৌকা চড়ে পণ্ডিতমশায় নদী পারাপার হচ্ছিলেন সেই কাণ্ডারী মাঝিরই তিনি খুঁত ধরতে ব্যস্ত হয়ে তাকে মূর্খ প্রতিপন্ন করেছেন। এতে পণ্ডিত মশায়ের অকৃতজ্ঞতাই ফুটে উঠেছে। মাঝি পণ্ডিতমশায়ের উপকারই করছিল। কিন্তু পণ্ডিত মশাই প্রতিদানে তাকে হেয় জ্ঞান করে ভাল কাজ করেননি। সাঁতার শিক্ষাও যে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ও জীবনদায়ী একথা পণ্ডিত মশাই তেমন ভাবে ধর্তব্যের মধ্যে আনেননি তাই মৃত্যুর মাধ্যমে তাকে খেসারৎ দিতে হল।

খাইয়ে খাঁ

এই গল্পটা যে সময় রচিত হয়েছিল তখন মানুষ খেতে ও খাওয়াতে ভীষণ ভালবাসত। তখন জিনিসপত্রের দামও ছিল সস্তা। সেই সময়ে যে যত বেশি খেতে পারত তার তত কদর ছিল। বেশি খেলে তখন পাওয়া যেত পুরস্কার। খাইয়ে খাঁ ছিলেন এমনই একজন নামজাদা খাইয়ে মানুষ যিনি প্রতিদিন রাক্ষসের মত খেতেন। খেতে খেতেই তার সব টাকা ফতুর হয়ে যেত। তাই তার খাজনা দেওয়া হত না। বাকি

থেকে যেত। একবার জমিদার এলেন খাজনা আদায় করতে। আর তলব করলেন খাইয়ে খাঁকে। জমিদারের সঙ্গী খাইয়ে খাঁকে সঙ্গে করে আনতে আনতে বললেন, এ খেতে পারে বটে। সেবার আপনার ঠাকুরদার শ্রাদ্ধে একশ লুচি খেয়েছিল। খেয়েই এর সব শেষ। জমিদার বললেন, দূরে ঐ যে খাসিটা চরছে ওটা গোটা খেতে পারবে? খাইয়ে খাঁ বলল, হ্যাঁ। তারপর খাসিটা কেটে রান্না করে তাকে পুরো মাংসটা দেওয়া হল। খাইয়ে খাঁ পুরোটাই খেয়ে নিল। তখন জমিদাব পুরস্কার হিসেবে তাকে একটা পুরো মহলই দান করেছিলেন। এই মহলের কারণে উপার্জিত টাকাতেই খাইয়ে খাঁর উদরপূর্তি হত।

একটা গোটা খাসি খাওয়া অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি ঘটেছিল এই ঘটনা। গোটা খাসি খাওয়ার কারণে কৌতুক মিশ্রিত হাসির পরিবেশ তৈরি হয়েছে। খাইয়ে খাঁ স্থানীয় অঞ্চলে একজন ক্ষুদে রাক্ষস হিসেবেই পরিচিত ছিল। প্রত্যেক মানুষেরই প্রয়োজন মত খাবার খাওয়া উচিত। পরিমিতি বোধ মানুষকে বিভিন্নভাবে রক্ষা করে চলে। বেশি বা কম খাওয়া কখনই কাম্য নয়। বরং অতিরিক্ত খাওয়া অনেক রোগের কারণ হয়ে উঠতে পারে। এতে অনাবশ্যক অর্থেরও অপচয় হয়। এমন ভাবেই সবার চলা উচিত যাতে সবদিকের ভারসাম্য বজায় থাকে। যাতে কোন সমস্যার সৃষ্টি হতে না পারে জীবনে।

জামায়ের শ্বশুরবাড়ি যাত্রা

বিয়ের পর প্রথম জামাই শ্বশুরবাড়ি রওনা হবে। শ্বশুর বাড়ি যাবার জন্যে সে বউয়ের জন্য একটা শাড়ি, কয়েক গোছা চুড়ি ও একটা পুঁতির মালা কিনল। জামায়ের মা তাকে উপদেশ দিল যেন সে শ্বশুরবাড়ি যাবার সময়ে কাউকে সঙ্গে না নেয়। এবং শ্বশুর বাড়িতে কোন কিছু খেতে দিলে, না না দিতে হবে না বলে। তা না হলে তারা পেটুক ভাববে। দুপুরবেলা রাস্তায় হাঁটার সময়ে জামাই দেখে তার ছায়া সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। মা তাকে একলা যেতে বলছে। তাই সে ছায়াকে বলল, তুই সঙ্গে আসিস না। তবু ছায়া ছাড়ে না। তখন বাধ্য হয়ে সে একে একে চুড়ি, মালা, শাড়ি পথে ফেলে বলে, সব তোকে দিয়েছি এবার বাড়ি যা। সন্ধ্যে হয়ে গেছে। ছায়াও অদৃশ্য। জামাইকে শ্বশুরবাড়িতে খুবই যত্ন করে খেতে দিল। মিঠাই মণ্ডা আরো কত কী। কিন্তু মা বলে দিয়েছে সবেতে না না করতে। জামাই খাবার দেখে, আর না না করে। শ্বশুরবাড়ির সবাই ভাবে বুঝি জামায়ের শরীর খারাপ। রাতে যে যার ঘরে শুতে চলে যায়। এদিকে জামায়ের রাতে প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে। কিছুই সে খায়নি। অগত্যা রাতের অন্ধকারে রান্না ঘরে ঢোকে খাবারের সন্ধানে। ওদিকে অন্ধকারে হাড়িতে হাত লেগে শব্দ হয়। শ্বশুরবাড়ির লোকজন চোর ভেবে তাড়া করে জামাইকে। আলোয় দেখে তাদের

জামাই। জামাই বলে, আমি কিছু খাইনি। তখন আবার জামায়ের খাবার ব্যবস্থা করা হল।

এ গল্পে নিবুর্দ্ধিতার পরিণাম যে কী করুণ হতে পারে তারই ছবি এখানে ফুটে উঠেছে। সঙ্গে কাউকে নিয়ে যেতে মা নিষেধ করেছে। এখানে সঙ্গে কাউকে বলতে মানুষকেই বুঝিয়েছে। অন্যকিছুকে নয়। কাজেই এখানে বোকামো করার জন্যে হাসির পরিবেশ গড়ে উঠেছে। পথে ছায়াকে চলে যাবার জন্য মালা, চুড়ি, শাড়ি দিয়ে দেওয়ায় হাস্যরসের উদ্রেক ঘটায়। আবার শ্বশুর বাড়িতে খাবার সময়ে মা না না করতে বলেছে, অর্থাৎ অত্যধিক খেতে বারণ করেছে। উপোসী থাকতে বলেনি না খেয়ে। জামাই তাই করেছে। উপোসে থেকেছে। ফলে রাতে জামায়ের প্রচণ্ড খিদে পায়। অবশেষে অন্ধকারে রান্না ঘরে ঢুকে শব্দ করে একটা ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। নিজেই শেষে চোর দায়ে ধরা পড়ার মত অবস্থায় পৌঁছে স্বীকার করে, আমি কিছু খাইনি। এখানে হাসির মাত্রা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌচেছে। জামায়ের সম্মান এখানে মাটিতে মিশেছে।

বাঙালী নাকি করুণ রসের ভক্ত। কাঁদতে পেলে সে আর কিছু চায় না। কান্নায় বুক ভাসাতে তাব জুড়ি মেলা ভার। কিন্তু বাঙালী যে হাসতেও পারে, হাস্যরসেও তার আসক্তি এসব গল্পই তার প্রমাণ। প্রসন্নতা এবং জীবনাসক্তি ব্যতিরেকে পবিত্র হাস্যরস সৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয়। এই হাসির গল্পগুলির মধ্যে লক্ষণীয়, কোনো স্থূলত্ব নেই। অনাবিল হাস্যরস সৃষ্টির মুহূর্ত ও উপলক্ষ সৃষ্টিতে রচয়িতারা যথেষ্ট মুন্সীয়ানার স্বাক্ষর রেখেছেন স্বীকার করতে হয়।

গল্পসূত্র ঃ-

১। বাঙ্গালীর হাসির গল্প— জসীমউদ্দিন
২। গ্রামবাংলার হাসির গল্প— ঐ
৩। কিংবদন্তীর কাহিনীমালা— রাজর্ষি

কিংবদন্তি

অনুপম দে

"নিতাইয়ের বাপ ছিল সিঁদেল চোর। পিতামহ ছিল ঠ্যাঙাড়ে। নিজের জামাইকেই নাকি সে রাতের অন্ধকারে পথিক হিসাবে হত্যা করেছিল। জামাইমারীর মাঠ এখান হইতে ক্রোশ খানেক দূরে।"

(কবি; তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়)

স্বাভাবিক ভাবেই বুঝতে পারা যায় নির্জন মাঠে ঠ্যাঙাড়ে শ্বশুর পথিক ভেবে নিজের জামাইকে টেঙিয়ে মেরে ফেলেছিল বলেই ঐ মাঠের এরূপ নামকরণ। এই রকম অনেক স্থান নাম, নদনদী বৃক্ষের উদ্ভব বা তাদের নামকরণ সম্পর্কিত নানা কাহিনি এবং অশরীরী থেকে শুরু করে বিভিন্ন অলৌকিক শক্তির আশ্চর্যজনক অনেক কাহিনি আমরা জানি বা শুনে এসেছি। ফলে স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে এই সমস্ত কাহিনিগুলির স্বতন্ত্র কোন নাম আছে কিনা, এগুলির উৎপত্তি কোথা থেকে, কে বা কারা এগুলির স্রষ্টা। একটু লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারা যায় এই কাহিনি বা বৃত্তান্তগুলি লোক সমাজ কর্তৃক সৃষ্ট এবং লোকসমাজেই মৌখিকভাবে প্রচলিত। তাই এগুলিকে আমরা লোকসাহিত্যের শাখায় অন্তর্ভুক্ত করতে পারি। এরপর আমরা লোকসাহিত্যের বিভিন্ন শাখাগুলিকে অনুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা করলে দেখতে পাই. এই কাহিনি বা বৃত্তান্তগুলি লোকসাহিত্যের শাখায় 'কিংবদন্তি'— এই বিশিষ্ট নামে পরিচিত।

কিংবদন্তি কথার অর্থ যা বলা হয়েছে এমন। বহু প্রাচীনকাল থেকে মানুষ যা শুনে আসছে তাই বর্ণনা করে যাচ্ছে। কে-কি কবে কেন কোথায় দেখেছে বা শুনেছে এই সব প্রশ্নের উত্তর লোককথার অন্যান্য শাখার মতো কিংবদন্তিতেও অনুপস্থিত। বরং তৎ পরিবর্তে উত্তর, যেহেতু সে এমনটি শুনেছে তাই সেও বল্‌ছে বেমালুম ভাবে। ফলে এগুলি বংশ-পরম্পরায় বা পুরুষানুক্রমে চলে আসছে। সুতরাং স্পষ্টই বুঝতে পারা যায় লোকসাহিত্যের (লোককথা) অন্যান্য শাখার ন্যায় এগুলিও স্মৃতি ও শ্রুতি নির্ভর। কিংবদন্তিতে যে কাহিনি বর্ণিত হয় লোক-সমাজ মনে করে একদিন এঘটনা তাদের এলাকায় সংঘটিত হয়েছিল। ফলে পুরুষপরম্পরায় বাহিত এই কাহিনগুলি হয়ে উঠেছে, লোকসংস্কৃতিবিদ বরুণকুমার চক্রবর্তীর ভাষায়, 'সত্য মিথ্যা সম্ভাবনার ত্রিবেণীসঙ্গম'; তবে কিংবদন্তি কেবল মাত্র সম্ভব-অসম্ভবের কাহিনিই মাত্র নয়, এর মধ্যে ইতিহাসের ক্ষীণ সূত্রও পাওয়া যেতে পারে। আলোচনার সূচনাতেই যে

কিংবদন্তির উল্লেখ করা হয়েছে, এ থেকে বোঝা যায় এদেশে এক সময় ঠ্যাঙাড়েদের বিশেষ উপদ্রব ছিল— যা ঐতিহাসিক সত্য। তবে কিংবদন্তিতে অনেক ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া গেলেও একথা কখনোই বলা যাবে না যে কিংবদন্তি ও ইতিহাস অভিন্ন। কেন না, ইতিহাসে বিশ্বাসের উপর, কিংবা অনুমানের কোন স্থান নেই, বিশ্বাসের কোন অবকাশ নেই, আর একটা কথা অবশ্য স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে কিংবদন্তির মধ্যে থাকে অনেকখানি অতিরঞ্জন। পুরুষানুক্রমে লোকমুখে বাহিত হতে হতে অনেক সময় এগুলি এমনও রূপ নেয় যার সঙ্গে সত্যের সম্পর্ক ক্ষীণ হয়ে পড়ে বা ছিন্ন হয়ে যায়, সেই জায়গায় প্রবেশ করে অবিমিশ্র কল্পনা।

তাই বলা যায়, অতীতে সংঘটিত এমন কোন ঘটনা যার কার্যকারণ সম্পর্ক বুঝতে না পেরে মানুষ যখন তার কল্পনার দ্বারা ঘটনাটিকে একটি অবিমিশ্র আখ্যানে পরিণত করে (যদিও এর সঙ্গে বাস্তব ঘটনার বা সত্যের ক্ষীণ সূত্র থাকলেও থাকতে পারে) স্মৃতি ও শ্রুতির সাহায্যে পুরুষানুক্রমে তাকে বহন করে নিয়ে এসে লোককাহিনির মর্যাদা দেয়, সেই রকম ক্ষুদ্রায়তন আখ্যায়িকা গুলিকে আমরা কিংবদন্তি নামে অভিহিত করতে পারি। আসলে মানুষ যতই আধুনিক হয়েছে তার বিজ্ঞান মনস্কতা, চিন্তাধারা, যুক্তি ও বুদ্ধি দিয়ে সবকিছুকে বোঝবার ক্ষমতা ততই বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু আদিম সমাজভুক্ত মানুষ এসব বিষয়ে ছিল অজ্ঞ। ফলে তাদের পারিপার্শ্বিক কোন ঘটনাকে যখন তারা বুঝতে পারত না বা কার্যকারণ সূত্রে মেলাতে পারত না, তখন তারা মনগড়া একটা ব্যাখ্যা গড়ে নিত। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই সংঘটিত ঘটনাটির সঙ্গে কল্পনার মিশ্রণ হত এবং তা থেকে এসমস্ত কাহিনিগুলির উদ্ভব। ঠিক একই রকম ভাবে কিংবদন্তিগুলিরও উদ্ভব। কোন অঞ্চলে কোন এক সময় ঘটনাটি ঘটেছিল এর উপর ভিত্তি করেই কিংবদন্তিগুলির উদ্ভব। ফলে এর আখ্যান ভাগে সত্যতার তুলনায় কল্পনা তথা অতিরঞ্জনের পরিমাণই বেশি। এজন্য এর মধ্যে আমরা নানা অলৌকিক ঘটনা থেকে অশরীরী চরিত্র পর্যন্ত পাই, তবে লৌকিক চরিত্রের অভাব আছে এমনটাও নয়। আগেই বলেছি যেহেতু কিংবদন্তি টিঁকে থাকে লোকবিশ্বাসের উপর এবং একটি বিশেষ স্থানের ঘটনা বা বিশেষ সময়কে কেন্দ্র করে এগুলি গড়ে ওঠে, তাই এতে অভিজ্ঞতার কথা একটা থেকেই যায়।

এরপর আমরা কিংবদন্তির কিছু বৈশিষ্ট্য সূত্রাকারে জেনে নিতে পারি—

ক. কিংবদন্তি কোনো ঘটনা, কোনো স্থান নাম, বিশেষ বিশেষ দেবদেবীর উৎপত্তি অথবা তাদের আক্রোশ বা করুণা বিতরণ, নদনদী বৃক্ষের উদ্ভব বা তাদের নামকরণ সম্পর্কিত কাহিনি। অশরীরী বিভিন্ন শক্তিদের ক্রিয়াকলাপ সংক্রান্ত বিষয় মূলত কিংবদন্তির উপজীব্য।

খ. কোন অঞ্চলে কোন এক সময় ঘটনাটি ঘটেছিল এর উপর ভিত্তিকরেই কিংবদন্তির সৃষ্টি। সুতরাং লোকবিশ্বাসই এর ভিত্তি ভূমি।

গ. কিংবদন্তিগুলি সাধারণত ক্ষুদ্রাকৃতির হয় এবং এতে গল্পরসের পরিমাণও অকিঞ্চিৎকর। এতে কাহিনী কাঠামো ও ধারাবাহিকতাও অনেক সময় তেমন ভাবে অনুসৃত হয় না।

ঘ. কিংবদন্তি সামগ্রিকভাবে লোককথার অন্তর্ভুক্ত এবং লোকসমাজ কর্তৃক মুখে মুখে কথিত ও শ্রুত হয়ে পুরুষপরম্পরায় মৌখিকভাবে প্রচলিত। অর্থাৎ এগুলি শ্রুতি ও স্মৃতি নির্ভর।

ঙ. লোককথার অন্যান্যশাখার মতো কিংবদন্তিরও রচয়িতার সন্ধান পাওয়া যায় না।

চ. লৌকিক এবং অলৌকিক উভয় প্রকার চরিত্র অবলম্বনে কিংবদন্তির সৃষ্টি হতে পারে। তবে অলৌকিক চরিত্রগুলিতে তাদের ক্রিয়াকলাপ লোকসমাজ দ্বারা গৃহীত হয়ে লোকমুখে প্রসার লাভ করে লৌকিকতা লাভ করে।

ছ. লোকমুখে কথিত ও শ্রুত হয়ে পুরুষের পর পুরুষ ধরে চলে আসা কিংবদন্তিগুলির মধ্যে অনেক সময় সত্যতা থাকে না বললেই চলে, বরং থাকে অতিরঞ্জন। তবে অবিমিশ্র বাস্তব ও ঘটনা অবলম্বনেও কিংবদন্তির সৃষ্টি হতে পারে, সেক্ষেত্রে অনেক সময় অতিরঞ্জন বা কল্পনার অনুপ্রবেশ ঘটে না।

বাংলা কিংবদন্তিগুলির পর্যালোচনা করলে পাই—

ক. ঐতিহাসিক চরিত্র বা ঘটনাকেন্দ্রিক কিংবদন্তি,

খ. পৌরাণিক ঘটনা বা দেবদেবী কেন্দ্রিক কিংবদন্তি,

গ. অশরীরী চরিত্র কেন্দ্রিক কিংবদন্তি,

ঘ. স্থান, বৃক্ষ, নদনদীর উদ্ভব ও নামকরণ কেন্দ্রিক কিংবদন্তি— মূলত এই চার প্রকার কিংবদন্তির পরিচয় পেয়ে থাকি।

এবার দৃষ্টান্ত হিসাবে আমরা কিছু কিংবদন্তির পরিচয় তুলে ধরতে পারি—

ক. **তিস্তার উৎপত্তি** :- তিস্তার উৎপত্তি সম্বন্ধে সুন্দর একটি কাহিনি প্রচলিত আছে। একবার অসুর ও দুর্গার যুদ্ধ বাধে। দুর্গা অসুরকে তাড়া করলে সে জলের নিচে আশ্রয় নেয়। তখন দুর্গা সবজল শুষে নেন। অসুর তখন শিবের উপাসনা করে এবং শিব তাতে তুষ্ট হয়ে তার (অসুরের) মনস্কামনা পূর্ণ করেন। পার্বতী তখন আপন স্তনের যে তিনটি পয়োধারা ছড়িয়ে দেন তাই ত্রিস্রোতা নামে পরিচিত এবং প্রবাহিত। আর একটি কাহিনিতে আছে তিস্তা ও রঙিতা দুই বোন। তারা একদিন হিমালয়ের অরণ্যে কাঠ কাটতে যায়। সেখানে দেখে একটি ঢিবির উপর মরা কাঠ পড়ে আছে। তখন তারা কুড়াল দিয়ে কাঠে কোপ দিতে গিয়ে ঢিবিতে কোপ দেয়। সেই ঢিবিতে ছিল এক ধ্যানরত সন্ন্যাসী। কুড়ালের কোপ সন্ন্যাসীর গায়ে লাগে তাতে তিনি রুষ্ট হয়ে তিস্তাকে অভিশাপ দেন— 'তুই অজগর সাপের মতো ধারায় নামবি।' আর রঙিতাকে অভিশাপ দেন, 'তুই পাখির মতো উড়ে উড়ে যাবি।' পরে ওদের কান্নাকাটিতে

সন্ন্যাসীর অনুকম্পা হয় এবং শেষ পর্যন্ত ওরা মিলবার অনুমতি পায় এবং মিলিত হয়।

খ. **কুমারপুরের রাধামাধবের মূর্তি** :— মুর্শিদাবাদের নবাব নওয়াজেস মহম্মদ খাঁর নির্মিত মোতিঝিলের পূর্বপাশে কুমারপুরে রাধামাধবের মূর্তিটি প্রতিষ্ঠিত আছে। জনশ্রুতি রয়েছে মন্দিরের প্রতিদিন ঘণ্টা শঙ্খ ধ্বনি নবাব নওয়াজেস খাঁকে খুব বিরক্ত করতো। পুজো বন্ধ করার হুকুম দিলে কোন খারাপ প্রভাব পড়তে পারে, তাই নবাব কৌশলে মুসলমানী খাদ্য রান্না করে পুরোহিতের কাছে পাঠান। পুরোহিত খাবারের ঢাকনি খুলে দেখেন জুঁইফুলের মালা। নবাব বিশ্বাস করতে না পেরে নিজের হাতে মুসলমানী খাদ্য এনে পুরোহিতকে দিলে আগের মতোই জুঁই ফুলের মালাই দেখতে পান। এরপর নবাব সেই পুজো বন্ধ করার কোন চেষ্টা করেন নি। দেব মাহাত্ম্য প্রচারিত এই কিংবদন্তিতে।

গ. **বৌ কথা কও পাখির কাহিনি** :— সত্য যুগে কোন এক স্থানে কোন এক গৃহস্থ ছিল। মা-ছেলে ও নতুন বৌ এই তিনজনকে নিয়ে ছোট্ট পরিবারটি বেশ সুখেই দিন কাটাচ্ছিল।

বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসের দিন। এই সময় কৃষকেরা কাজে কর্মে অপরাপর সময়ের তুলনায় একটু বেশি ব্যস্ত থাকে, বিশেষ করে ক্ষেত নিড়ানোর কাজে। কৃষকেরা সকাল বেলা কিছু পান্তা ভাত খেয়েই ছুটে যায় মাঠের পানে, কাজের চাপে কখনো কখনো দুপুরে ভাত খাবার জন্য বাড়ি ফেরারও সময় হয়ে ওঠে না। এইরকম একদিনে এক গৃহস্থ গেছে মাঠের কাজ করতে, বাড়িতে রয়েছে তার মা ও নববিবাহিতা স্ত্রী। তার মাও খানিকক্ষণ পরই পাড়া বেড়াতে বের হয়ে যায়, এবাড়ি ও বাড়ি ঘুরতে ঘুরতে একটু দেরী হয়ে যায় তার।

এদিকে নতুন বৌ ক্ষিদেয় অস্থির হয়ে ওঠে এবং শাশুড়ীর আগমনের প্রতীক্ষা করতে থাকে। অবশেষে অনন্যোপায় হয়ে মাচায় রক্ষিত একটি পাকা কাঁঠাল ভেঙ্গে খেতে শুরু করে। সেও কাঁঠালের কোষ মুখে দিয়েছে ঠিক সেই সময়ই শাশুড়ী এসে হাজির। এমনিতে তো শাশুড়ীর বিনা অনুমতিতে কাঁঠাল খাওয়ার জন্য বধূটি লজ্জায় মরে যাচ্ছিল তার উপর তার শাশুড়ী যখন এই কাজের জন্য সজোরে দুই গালে এমন দুই ঠোক্‌না মেরে দিল যে, কাঁঠালের কোষ গলায় আটকে বউটি মরেই গেল।

আদুরে বউটির এমন অপ্রত্যাশিত মৃত্যুতে শাশুড়ী হতভম্ব হয়ে গেল। বৌকে বার বার ডেকেও যখন সাড়া পাওয়া গেল না, তখন শাশুড়ী বউয়ের শোকে পাগলিনী হয়ে গেল। তারপর 'বউ কথা কও, বউ কথা কও' বলে একদিন বনের পাখীই হয়ে গেল। আজো পর্যন্ত সেই শাশুড়ীর দল আম-কাঁঠালের দিনে অবিরাম বউকে ডেকে হয়রান হয়ে যায়। এই হল 'বউ কথা কউ' পাখির কিংবদন্তি।

ঘ. **পোয়াতিবিল** :— টাংগাইল মহকুমার কালিহাতী থানায় ভণ্ডেশ্বর নামে এক গ্রামে পোয়াতিবিল নামে একটি বিলে প্রতি বৎসর মাঘি পূর্ণিমায় হিন্দুরা স্নান করে।

কথিত আছে জনৈকা কুলীন কন্যা সন্তানহীনতার জন্য শাশুড়ীর হাতে অবিরাম নির্যাতিত হয়ে উক্ত বিলে ডুবে মরতে যায়। এই সময় স্বয়ং দুর্গা দেবী এসে তাকে উক্ত স্থানে স্নান করে গৃহে ফিরে গেলে সন্তানবতী হবে বলে জানান। সেই থেকেই পোয়াতিবিলে উক্ত মাঘি পূর্ণিমায় স্নানোৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

ঙ. **রাধানগর নামের কিংবদন্তি** :— এটি একটি ছোট গ্রাম, মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙ্গা থানার অন্তর্গত।

জানা যায় পূর্বে রাধানগর বলে কোনো গ্রাম ছিল না। তখন 'জাফরাবাদ' নামে একটি মৌজা ছিল, এই মৌজার অন্তর্গত ছিল এই গ্রামটি। তখন ছিল জমিদার জোতদারদের বাস। এখানকার জমিদার ছিলেন মুর্শিদাবাদ জেলারই কেদার চাঁদপুর গ্রামের রাধাসুন্দর মুখার্জী। তাঁর জমিদারিতে বিভিন্ন মৌজা ছিল, তার মধ্যে জাফরাবাদ মৌজাও ছিল একটি। শোনা যায় নাকি এঁর ভাগ্নে জীবনকালী মুখার্জীকে তিনি এই মৌজাটি পত্তনি দেন। পত্তনি মানে হল দেখাশোনা করা অর্থাৎ মৌজার যাবতীয় আয়, ব্যয়, খরচ সব এখন থেকে তার ভাগ্নে দেখবে। তখন থেকে তাঁর ভাগ্নে এই মৌজাটি দেখাশোনা করতে থাকে। তাঁর মামার স্মৃতিরক্ষার্থে যেহেতু তাঁর মামা তাকে এটি পত্তনি দিয়েছেন, তাই মামার নাম অনুসারে ভাগ্নে জীবনকালী মুখার্জী এই মৌজাটির নাম রাখেন রাধানগর। সেই থেকে রাধাসুন্দর মুখার্জীর স্মৃতিতে এখানকার নাম হয়ে আসছে রাধানগর।

চ. **শাঁখারিপুকুর** :— বাঁকুড়া জেলার পাত্রসায়ের থানার অন্তর্গত বাল্‌সী গ্রামের পশ্চিমপাড়া মৌজায় এই পুকুরটি অবস্থিত। বাল্‌সী প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি এই পুকুরের পাড়েই প্রতিষ্ঠিত।

জনশ্রুতি আছে এই পুকুরটির দক্ষিণ পাড়ে তিনটি বিরাট বট, অশ্বত্থ ও বকুলের গাছ ছিল। শোনা যায় একদিন এই গাছতলায় বসে দেবী দুর্গা এক বালিকার বেশ ধরে তেল হলুদ মাখছিলেন। ঠিক সেই সময় সেখান দিয়ে এক শাঁখারি যাচ্ছিলেন। তাকে দেখে বালিকাটির শাঁখা পরতে ইচ্ছা যায়। তখন শাঁখারিকে ডেকে তার কাছ থেকে দুই হাতে একটি করে মোট দুটি শাঁখা পরেন। এরপর শাঁখারি শাঁখার জন্য টাকা চাইলে বালিকা বেশী দুর্গা বলেন তার বাবা অমুক (নাম জানা যায় না) নায়েকের কাছ থেকে টাকা নিতে এবং আরো বলেন দক্ষিণদুয়ারী ঘরের তাকে টাকা রয়েছে। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন এই নায়েকদের আরাধ্যদেবতা হলেন দুর্গা। এরপর শাঁখারি মেয়েটির কথা মতো নায়েকদের বাড়িতে এসে টাকা চাইলে নায়েকদের কর্তা আশ্চর্য হয়ে যান। কেন না তার কোন কন্যাসন্তান ছিল না। তারপর তিনি শাঁখারির সব কথা শুনে শাঁখারিকে বলেন তিনি (শাঁখারি) যদি মেয়েটিকে দেখাতে পারেন তা হলে তিনি টাকা পাবেন। তখনই শাঁখারি ঐ ব্যক্তিকে নিয়ে ঐ পুকুরের পড়ে যান। কিন্তু সেখানে কেউই ছিল না। এরপর ঐ ব্যক্তিটি গলায় গামছা দিয়ে হাত জোড় করে বলেন যে মা, কে

শাঁখা পরেছিস একবার দেখা দে; তখন জলের মধ্য থেকে দশটি হাত উপরের দিকে উঠে আসে। তারপর শাঁখারিকে টাকা দিতে চাইলেও তিনি তা নেননি বরং তৎপরিবর্তে ঐ শাঁখারি যতদিন বেঁচেছিলেন ওতদিন দুর্গা পূজার আগে একজোড়া করে শাঁখা দিয়ে যেতেন। দেবীর শাঁখা পরা নিয়ে এই বৃত্তান্তের সাক্ষী এই পুকুরটি তারপর থেকে শাঁখারি পুকুর নামে পরিচিতি।

ছ. **আখড়া কালী** :— বর্ধমান থেকে হিংজুরি হয়ে বিষ্ণুপুর যাবার পথে বারাসত মোড় বাসস্ট্যাণ্ডের কাছে এই আখড়াকালীর অধিষ্ঠান। শোনা যায় এখানে দেবী (কালী) লাঠি খেলায় পারদর্শী এবং ডাকাতদের দ্বারা পূজিতা ছিলেন। এখানে ডাকাতেরা পূজা দিয়ে তবে ডাকাতি করতে বের হত। জনশ্রুতি আছে ডাকাতদের মধ্যে অনেকেই দেবীর কাছে লাঠি খেলা শিখেছে এবং দেবীর সঙ্গেও লাঠি খেলেছে। ফলে এই জায়গাটি হয়ে উঠেছিল লাঠি খেলার একটি আখড়া এবং তা থেকেই দেবীর এরূপ নামকরণ।

জ. **জগন্নাথের ঠুঁটো হওয়ার পিছনে কিংবদন্তি** :— জগন্নাথ দেবের অধিষ্ঠান পুরীতে হলেও বাংলার বিভিন্ন গ্রামে জগন্নাথদেবের ঠুঁটো হওয়ার পিছনে একটি কাহিনি শোনা যায়। কাহিনিটি এই রকম— কোন এক কারিগর (সম্ভবত বিশ্বকর্মা) বানের জলে ভেসে আসা নিমকাঠ দিয়ে জগন্নাথ দেবের মূর্তি তৈরি করবেন এবং যতদিন না পর্যন্ত তিনি নিজে না দরজা খুলছেন ততদিন পর্যন্ত কেউ যেন না দরজা খোলে, এই বলে তিনি বদ্ধ ঘরে বসে মূর্তি তৈরিতে মনোনিবেশ করেন। দীর্ঘ আড়াই মাস কেটে যায় কিন্তু কারিগর তখনও দরজা খোলেন না, ফলে লোকের মনে সন্দেহ জাগে কারিগর হয়তো না খেয়ে এতদিনে মরেই গেছেন, তাই তারা দরজা খোলেন। কিন্তু কারিগরের কাজ তখনও সমাপ্ত বা সম্পূর্ণ হয়নি, জগন্নাথের হাত পায়ের আঙুল তখনও তিনি তৈরি করে উঠতে পারেন নি এবং তার আগেই ঘরের দরজা খুলে যাওয়ায় মূর্তির কাজ অসম্পূর্ণ রয়ে যায়। তাই হাত পায়ের আঙুল না থাকায় জগন্নাথদেবকে ঠুঁটো বলা হয়।

ঝ. **দলমাদল কামানের কিংবদন্তি** :— বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরের ছিন্নমস্তা মন্দিরের কাছে একটি কামান সংরক্ষিত আছে। এটি দলমাদল নামে পরিচিত। এই কামানটি নিয়ে একটি কিংবদন্তি প্রচলিত আছে। জানা যায় বিষ্ণুপুরের মল্ল রাজাদের কুলদেবতা ছিলেন মদনমোহন। ইনি বর্গীদের আক্রমণের সময় দুই হাতে দুটি কামান দেগে বর্গী আক্রমণ ঠেকিয়ে ছিলেন। সেই কামানদুটির মধ্যে একটি হল এই দলমাদল। বিষ্ণুপুরের ছিন্নমস্তা মন্দিরের পাশে এই কামানটিকে 'হেরিটেজ' হিসাবে সংরক্ষিত অবস্থায় দেখা যায়।

ঞ. **মহামায়ার কেবলমাত্র মাথাটি পূজার পিছনে কিংবদন্তি** :— রাধানগর গ্রামটি বাঁকুড়ার পাত্রসায়ের থানার অন্তর্গত, বাল্সী গ্রামের পার্শ্ববর্তী। এখানে মহামায়ার

মন্দির রয়েছে। আসলে এখানে দেবী দুর্গা মহামায়া নামে পূজিতা। তবে এখানে পুরোচালচিত্রসহ সমগ্র মূর্তির পূজা হয় না তৎপরিবর্তে শুধু মুণ্ডটির পূজা হয় এবং এখানে দেবীর দেহ বেলকাঠের। বহু পূর্বে এখানে সমগ্রমূর্তিরই পূজা হত কিন্তু এখন কেবল মাত্র মাথাটির পূজা হয়। এর পিছনে একটি কাহিনি রয়েছে। জানা যায় এই ঠাকুরটির সেবায়েত ছিলেন রাধানগরের রায়েরা। এই রায়েদের একটি মেয়ে ছিল, সে ছিল অপরূপ সুন্দরী ও গুণবতী এবং সে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে পূজার্চনা করত। শোনা যায় সে এতটাই সুন্দরী ছিল যে দর্শনার্থীরা পূজা দেখতে এসে দেবীর পরিবর্তে এই মেয়েটিকেই বার বার দেখত। এতে নাকি দেবীর মনে ঈর্ষা জন্মায় এবং তাতেই দেবী নাকি একদিন সন্ধ্যাবেলায় মেয়েটিকে গ্রাস করেন। অনেকক্ষণ মেয়ে ঘরে না ফেরায় চারিদিকে মেয়েটির সন্ধানে খোঁজ খোঁজ রব ওঠে এবং শেষে মন্দিরে প্রবেশ করে দেখা যায় সেখানেও সে নেই, দেখা যায় দেবীর মুখের কোনে একটুকরো কাপড়ের খুঁট আটকে আছে। তা দেখে তাদের পরিবারের কোন এক জন রেগে দেবীকে দ্বিখণ্ডিত করেন। এবং এরপর থেকে পূজা বন্ধ হয়ে যায়। পরে আবার দেবীর স্বপ্নাদেশে বেলকাঠের দেহের উপর কেবলমাত্র মুণ্ডটির পূজার প্রচলন হয়।

ট. **লক্ষ্মীনারায়ণের চাঁপাগাছের বৃত্তান্ত :—** বাঁকুড়া জেলার পাত্রসায়ের থানার অন্তর্গত একটি গ্রাম হল বাল্‌সী। এই গ্রামটির বাইশটি পাড়ার মধ্যে একটি হল চৌধুরী পাড়া। এখানে লক্ষ্মীনারায়ণের একটি মন্দির রয়েছে। জনশ্রুতি আছে এই লক্ষ্মী নারায়ণের বিগ্রহ এক সন্ন্যাসীর কাছ থেকে পেয়েছিলেন মোহন চৌধুরী ও তার মা। উভয়েই ছিলেন লক্ষ্মীনারায়ণের ভক্ত। জানা যায়, এক সন্ন্যাসীকে মোহন চৌধুরীর মা একদিনের জন্য তার বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছিলেন এবং সেবা করেছিলেন। তার এই আতিথ্যে তুষ্ট হয়ে সন্ন্যাসী বলেছিলেন যে তিনি তাকে (মোহনের মাকে) একটি লক্ষ্মী নারায়ণের বিগ্রহ দেবেন। সেই রাতেই স্বপ্নে ঐ মহিলা আদেশ পান যে ঐ সন্ন্যাসী যখন তাকে বিগ্রহ দিতে চাইবেন তখন সে (মোহনের মা) যেন ঐ সন্ন্যাসীর জটায় লুকানো বিগ্রহটি চান। এরপর সন্ন্যাসী যখন বিগ্রহ দিতে যান তখন ঐ মহিলা স্বপ্নাদেশের কথা মনে রেখে জটায় লুকানো বিগ্রহটি চান। স্বাভাবিক ভাবেই সন্ন্যাসী আশ্চর্য হয়ে যান, কারণ তাঁর জটার ভেতরে যে বিগ্রহ লুকানো আছে সে কথা এদের জানার কথা নয়। তখন সন্ন্যাসী বুঝতে পারেন ঐ মহিলাটি তাঁরই মতো লক্ষ্মী নারায়ণের একনিষ্ঠ ভক্ত। তাই তিনি তখন ঐ বিগ্রহটি তাকে দান করেন। কিন্তু বিগ্রহটি ছিল সন্ন্যাসীর প্রাণস্বরূপ তাই তিনি এই স্থান ছেড়ে আর কোথাও যেতে পারেন নি। এরপর এখানে কিছু দিন থাকার পর ঐ সন্ন্যাসী ইচ্ছা মৃত্যু বরণ করতে চান এবং মন্দির প্রাঙ্গণেই (বিগ্রহ পাবার পরই কিছুদিনের মধ্যে এখানে লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির স্থাপিত হয়) একটি স্থান দেখিয়ে বলেন যে এখানেই যেন তার শরীরটিকে সমাধিস্থ করা হয় আর তার সেই সমাধির উপর যেন একটি চাঁপাগাছ লাগানো হয়। তিনি নাকি আরো

বলেছিলেন যে তিনি যতদিন এখানে থাকবেন তত দিন পর্যন্ত চাঁপাগাছটিতে ফুল ফুটবে এবং সেই ফুল দিয়েই যেন ঠাকুরের নিত্য পূজা করা হয়। শোনা যায় এই গাছটি নাকি একবার মৃতপ্রায় হয়ে গিয়েছিল কিন্তু তখনও গাছটিতে অন্তত পক্ষে একটি হলেও ফুল ফুটত। এই মৃতপ্রায় গাছটি নব পুষ্প ও পত্রে পরে আবার ভরে উঠেছিল। ঐ মন্দিরে গেলে আজও তার উত্তর দিকে এই গাছটি দেখতে পাওয়া যায়।

ঠ. **মানিক সায়ের নামক পুকুর থেকে উৎসবের প্রয়োজনে থালা-বাসনাদি ভেসে আসার ইতিবৃত্ত :—** বাঁকুড়া জেলার জয়পুর থানার অন্তর্গত ছত্রআড়া গ্রামের টানা দিঘি মৌজাতে এই মানিক সায়ের পুকুরটি রয়েছে। এই অঞ্চলের মানুষদের মুখে শোনা যায় অতীতে কোন উৎসব উপলক্ষে যে সমস্ত বাসন পত্রাদির দরকার হত তা সব এখান থেকেই নাকি পাওয়া যেত। শোনা যায় উৎসব উপলক্ষে যার এই সব বাসনপত্রাদির দরকার হত সে স্নানান্তে আর্দ্রবস্ত্রে গলায় বস্ত্র দিয়ে করজোড়ে প্রার্থনা জানিয়ে পানসুপারী ও কিকি জিনিস লাগবে তা জানিয়ে আসলেই নাকি পরের দিন ভোরে সেই সব জিনিসপত্র পুকুরের পাড়ে পাওয়া যেত। তারপর উৎসব সম্পন্ন হয়ে গেলে ভালো করে মেজে ঘষে ধুয়ে তেল সিঁদুর মাখিয়ে যেখান থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল সেখানে রেখে দিয়ে আসলেই রাতের অন্ধকারে তা পুকুরের জলে নেমে যেত। তবে বর্তমানে এঘটনা আর ঘটে না। তার পিছনে একটি কারণ রয়েছে বলে এই অঞ্চলের মানুষের বিশ্বাস। কারণটি এইকরম, কোন এক ব্যক্তি উৎসব উপলক্ষে এই রকমভাবে থালা-বাসনাদি নিয়েছিল কিন্তু সে তা ভালো করে পরিষ্কার না করে ফিরিয়ে দিয়েছিল এবং তাতে নাকি উক্তদেবতা অর্থাৎ যিনি এই সমস্ত জিনিস দিয়ে সাহায্য করতেন তিনি রুষ্ট হন। আর তারপর থেকেই ঐ দেবতা থালাবাসনাদি দিয়ে সাহায্য করা বন্ধ করে দেন।

এইরকম বহু পুকুর, বহু গ্রাম, বিল-ঝিল, মাঠ-ঘাট, নদ-নদী, খাল-দিঘি, মন্দির-মসজিদ ইত্যাদির নামের সঙ্গে বহু কিংবদন্তি এবং কাহিনি জড়িয়ে আছে। এগুলি সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে উঠে আসতে পারে অনেক চকমপ্রদ তথ্য। কিন্তু সংগ্রহ ও চর্চার অভাবে এগুলির অনেকেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে, বাকি যা আছে তাও একই কারণে বিলুপ্তির পথে। তাই বলা যায় এগুলি সংগ্রহ না করলে অচিরেই এই রকম মূল্যবান সম্পদগুলিকে আমরা হারিয়ে ফেলব।

গ্রন্থঋণ :

চক্রবর্তী বরুণকুমার; লোকসংস্কৃতির সুলুক সন্ধানে (২য় সং)।

পশুকথার অন্দরমহলে

পার্থসারথি হাটী

আদিম লোকসমাজে কথা বলতে শেখার আগে থেকেই ভাব প্রকাশে প্রতীকের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। জড় ও জীব জগতের অতি প্রয়োজনীয় বস্তু ও প্রাণীদের প্রতীকায়ণের মধ্য দিয়ে গুছিয়ে কথা বলতে শেখার প্রায় শুরুর পর্ব থেকেই গোষ্ঠীবদ্ধ বৈঠকী আসরে মৌখিক রীতিতে ভয়-ভক্তি, রহস্য-রোমাঞ্চ, বিস্ময়-বিমোহন নিয়ে লোককথার উদ্ভব বলেই মনে হয়। লোককথাগুলি ছিল তাদের কাছে কথনমূলক জাদু-ক্রিয়ারই অংশ। এবং অবসর বিনোদনেরও মাধ্যম। পশু ও মানুষের শত্রুতামূলক ও মিত্রতামূলক সম্পর্কের অভিযোজনের প্রচেষ্টাই ছিল মানবজীবনের বুদ্ধিনির্ভরতার প্রাথমিক ও গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। সেই কারণেই বিশ্বের বিভিন্নপ্রান্তীয় লোককথায় পশুকথার তাৎপর্যময় বাহুল্য লক্ষ্য করি। পশু-চরিত্রগুলির প্রয়োগ উদ্দেশ্যমুখী, কিন্তু নির্দিষ্ট ভাবে একমুখী নয়। কেননা সমস্ত মৌখিক বাকশিল্পই বহুমুখচারী, সময়ান্তরে কাহিনীতে সংযোজন-বিয়োজন ঘটে। আবার বক্তার মানস-বৈশিষ্টেরও প্রতিফলন ঘটে। পশুকথাগুলিতে পশুচরিত্রের রূপায়ণ তাই দেশভেদে, গোত্রভেদে, গোষ্ঠীভেদে, ভৌগোলিক পরিবেশভেদে ভিন্ন ভিন্ন। অর্থাৎ তাদের cultural hero/ heroin ভিন্ন। তবে সবদেশের পশুকথাতেই খণ্ড খণ্ড কাহিনী-রেণুর মধ্য দিয়ে সেই দেশের স্বতন্ত্র মানস-বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটেছে। কিন্তু একথাও সত্য যে, সভ্যতার সিঁড়িভাঙার ক্ষেত্রে সবদেশের পশুকথাতেই আন্তরিক অভিপ্রায়ের বিশ্বজনীনতা অদ্ভুত রকম-লোককথার টাইপ- মোটিফ ইনডেক্সেই তার প্রমাণ আছে।

অ্যান্টি আর্নে-স্টিথ টমসন উদ্ভাবিত পশুকথার যে টাইপ ইনডেক্স তা হল -বন্যপশু (১-৯৯), বন্যপশু ও গৃহপালিত পশু (১০০-১৪৯,) মানুষ ও বন্যপশু (১৫০-১৯৯), গৃহপালিত পশু (২০০-২১৯), পাখি (২২০-২৪৯), মাছ (২৫০-২৭৪) এবং অন্যান্য জন্তু ও বস্তু (২৭৫-২৯৯)। এই টাইপ ইনডেক্স অনুযায়ী পশুকথার আংকিক বিশ্লেষণে না গিয়ে আমরা পশ্বাবলীর ভিতরকার মানবীয় অভিব্যক্তির রস গ্রহণের চেষ্টা করব।

আদিম সমাজ-জীবনে মানুষ যখন অরণ্যবাসী/ গুহাবাসী ছিল তখন থেকেই পশু তাদের প্রবল প্রতিপক্ষ। পশু কখনো মানুষের জীবন-ধারণের উপযোগী হয়েছে, কখনো বা জীবন নাশের কারণ হয়েছে। জীবন-ধারণের উপযোগী নিরীহ পশুকে তারা পরবর্তীকালে পোষ মানিয়েছে, পরিবারের সমান্তরাল পশু-পরিবার নিয়ে একত্রে বসবাস করেছে। আর জীবনবিনাশী হিংস্র পশুদের পাশবিকতার ওপরে মানুষ বুদ্ধির প্রভাব খাটিয়ে বাঁচতে চেয়েছে। জীবন-মৃত্যুর দোলায় সংশয়িত জীবন উভয় ক্ষেত্রেই

প্রাণের সৃষ্টিকর্তাকে দেবতার আসন দিয়েছে। নিরীহ পশুর উপকারী ভূমিকার পেছনে যেমন তারা দেবতার মঙ্গলহস্তের স্পর্শ উপলব্ধি করে গো-অর্চ্চনার প্রচলন করেছে, তেমনি শিকারপ্রবণ জীবন হিংস্রপশুর হাত থেকে রক্ষার জন্য বনবিবিকে তুষ্ট করতে চেয়েছে। মানব-পরিবারের সহযোগী জীব হিসাবে মানুষ প্রথমে কিছু চতুষ্পদ জীবকেই কাছে পেয়েছে। তাদের বৎসরা হয়েছে মানবশিশুর খেলার সঙ্গী। মানব-মায়ের শিশুরা পশুমায়ের স্তন্যেও ভাগ বসিয়েছে। মানুষের পরিবারে তারা যত্ন পেয়ছে। আমাদের প্রচলিত লোককথাতেও সেই সহাবস্থানের ছবি ধরা পড়েছে। কপিলা গাই গোয়ালা মনিবকে ফাঁকি দিয়ে অনাথ শিশুদের দুধ খাইয়ে জীবন বাঁচিয়েছে। উৎপাদন থেকে শুরু করে বিনোদন পর্যন্ত পশুর সজীব উপস্থিতিকে তাই মানব-জীবনে উপেক্ষা করা সম্ভব হয়নি। মানব-জীবনের সঙ্গে পশুর এই প্রত্যক্ষ সংযোগেই আমাদের মানব-পরিবেশ পূর্ণতা পেয়েছে। তাই মানুষের রচা দৈনন্দিন কথা-কাহিনীতেও পশুর প্রতি ভয় ও ভালোবাসা, শত্রুতা ও মিত্রতা এবং সর্বোপরি পশুশক্তির উপরে মানুষের বৌদ্ধিক শক্তির বিজয়বার্তা অনায়াসে স্থান পেয়েছে। কিন্তু গল্পের গরু গাছে উঠলেও বা বাঘে ধান খেলেও বা রীতিমত মানুষের মত কথা বললেও বাস্তবিক তা সম্ভব নয়। কিন্তু মানুষেব উপলব্ধি ও বিশ্বাস পশুরবুদ্ধিমত্তার নানাবিধ পরিচয়কে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং তাদের কাজ-কর্মের গতিবিধিকে পূর্বপুরুষের বা স্রষ্টার ভেবে তাদের মুখে ভাষা দিয়েছে। অর্থাৎ পশুকথা বা পশুর আচার-আচরণের মধ্য দিয়ে মানুষেরই আন্তরিক চিন্তা-চেতনার প্রকাশ ঘটেছে। এই সূত্রেই মানুষ সেদিন তার বৌদ্ধিক শক্তিকে হিংস্রপশুদের পাশবিক শক্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করেছে। হিংস্রপশুকে ক্ষুদ্র প্রাণীদের দ্বারা পরাজিত করে মানুষই তার কর্তৃত্বকে জাহির করেছে। শ্রেণীদ্বন্দ্বের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম ঘোষিত হয়েছে। কখনো বলবান পশুর অতীব শক্তির মধ্যেই মানুষ নিজেকে দেখেছে। তাই কখনো বুদ্ধিকে, কখনো শক্তিকে বা কখনো বুদ্ধি ও শক্তির জোড়াতালিকে পশুকথার মধ্যে মানুষই উপস্থাপিত করেছে। স্বাভাবিকভাবেই যে সব পশুর শক্তি কম তারা বুদ্ধি চাতুর্যকে কাজে লাগিয়ে বাঁচতে চেয়েছে। শেয়াল, বিড়াল, ইঁদুর, খরগোশ প্রভৃতি পশুরা অস্তিত্বরক্ষার তাগিদে ধূর্তামির আশ্রয় নিয়েছে। এসবই মানুষের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান। তাই পশুকথাগুলো যেন মানুষের চোখে দেখা পশুসমাজের নানা ক্রিয়া-কর্মর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভাষিক প্রতিফলন। পশুর আচরণ যেন মানব-মনের সংশয়-বিশ্বাস, কামনা-বাসনা, দ্বন্দ্ব-সমাধানের রূপক-কথা। ধূর্ত মানব-চরিত্রের রূপক হিসাবে এসেছে শেয়াল, শক্তির দম্ভ নিয়ে এসেছে বাঘ-সিংহ-কুমির। ইঁদুর-বিড়াল-খরগোশ-কচ্ছপ প্রভৃতি ক্ষুদ্র প্রাণীরা এসেছে নিম্নবর্গীয় মানুষের রূপকে। শেয়ালের চুরিবিদ্যাকে বড়বিদ্যা মেনে সাধারণ মানুষের যেমন 'চোর- চক্রবর্তী' হওয়ার বা রাজা হওয়ার উদাহরণ লোককথায় আছে, তেমনি ধরা পড়লে দণ্ডের দৃষ্টান্তও আছে।

প্রতিটি জীবের বেঁচে থাকার বা অস্তিত্বরক্ষার প্রবল প্রচেষ্টাই পশুকথার জীবনচিত্রে

চিত্রায়িত। মানুষ তাদের অস্তিত্বরক্ষার চেষ্টায় যত বেশি পরিস্থিতি সাপেক্ষে পরিবর্তিত হতে পেরেছে, অন্য জীব তা পারেনি। তাই মানুষ সবার উপরে। আর পশুসমাজ এসেছে মানুষেরই পূর্বসূরী হিসাবে, ফেলে আসা নিম্নবর্তী জীবনস্তর হিসাবে। তাই শক্তি ও বুদ্ধির উপরে অতিবুদ্ধির কারণে জয়লাভের শিরোপা মানুষ যেখানে পেয়েছে, সেখানে অন্য কেউ পায়নি। 'কথাসরিৎসাগর'-এর ইঁদুরবণিকের কথা নিশ্চয় সকলের মনে আছে। ইঁদুরবণিকের কথা আসলে একজন নিঃসম্বল মানুষের শ্রম ও বুদ্ধির দ্বারা ধনবান হওয়ার কাহিনী। টোটেমের প্রতি বিশ্বাসবোধকেও মানুষ এই উত্থান-পতনের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়েছে। পশুপাখিদের জীবনরক্ষার কৌশলকে বুদ্ধির মাপকাঠিতে বিচার করেছে মানুষ। পশুকথার চমৎকারিত্ব সৃষ্টি হয়েছে সেখানেই, যেখানে বিড়ালের চালাকির উপরে টুনটুনির বুদ্ধি জিতেছে, বাঘের উপরে জিতেছে শেয়াল, রাজার উপরে জিতেছে টুনটুনি, কিম্বা সিংহের উপরে জিতেছে শশক। মানুষ আসলে ক্ষুদ্রজীবের প্রতি মমত্ববোধে বড় বড় প্রাণীদের দৈহিকশক্তিকে পরাজিত করেছে এবং সংহত ক্ষুদ্রজীবের কৌশলগত বুদ্ধির জয় চেয়েছে। আবার টোটেম দেবতাদের প্রতি আনুগত্যও কোনো কোনো লোককথায় পশুর জয়ের কারণ হয়েছে। এই টোটেমকে কেন্দ্র করে যেহেতু সভ্যতার বিবর্তনের পথে আমাদের পা পড়েছে সেহেতু পশুকথা বা জড়বস্তু কেন্দ্রিক লোককথাগুলোই আমাদের আদিতম লৌকিক কথাসাহিত্য— সে কথা জোর দিয়ে বলা যায়। কেননা টোটেম বা গোত্রগুলো কোনো না কোনা পশুপাখি বা জড়-পদার্থর নামে চিহ্নিত।

কিন্তু একটা কথা এখানে স্মরণে রাখতে হবে যে, শক্তিমান পশু তথা মানুষের অমিত পরাক্রমকে যেখানে কোনো ক্ষুদ্রজীব পরাস্ত করেছে, সেখানে অনিবার্যভাবেই এসে গেছে সভ্যতার অনেক সিঁড়ি ভাঙা সমাজের শ্রেণীদ্বন্দ্বের বিষয়টি। সমাজ ও সভ্যতার বিভিন্ন বাঁকে উচ্চবর্গের সঙ্গে নিম্নবর্গের তো বটেই, এমনকি নিম্নবর্গের মানুষদের মধ্যেও পারস্পরিক প্রতিদ্বান্দ্বিতার ছবি পশুকথার মধ্যে দেখা যায়। অস্তিত্বের টানাপোড়েনে কিছু মানুষ নিজস্ব সংস্কৃতি ও শ্রেণীবৃত্তের বাইরে গিয়ে প্রভুসমাজের প্রতি আনুগত্য দেখিয়েছে। এই বিচ্যুতি ইতিহাসেরই অঙ্গ। কিন্তু এটাই তাদের আন্তরিক সত্য-আচরণ নয়। কখনো আবার শাসকের অত্যাচার থেকে রেহাই পাওয়া নিম্নবর্গের মানুষকে প্রতিদান দিতে হয়েছে অনেক বেশি। কিম্বা শোষিতদের বিদ্রোহ থেকে অত্যাচারী শাসককে বাঁচিয়ে নিজের জীবনকে নিরাপদ ও সুনিশ্চিত করেছে। উভয়ক্ষেত্রে অস্তিত্বযাপনের উপায় অবলম্বনই বাস্তবিক সত্য। তা চূড়ান্তভাবে আপেক্ষিকও। তবে পশুকথাগুলোতে বর্ণিত পশুদের জীবন-যাপনের ঘরানা একান্তভাবেই শোষিতশ্রেণী বা নিম্নবর্গের নির্মিত জীবনশৈলিরই অঙ্গ। জঙ্গলে গুহায় যখন মানুষ বসবাস করেছে তখন পশুপাখি ও প্রাকৃতিক নানা জড়বস্তুর উপরেই তাদের প্রাণের নির্ভরতাকে কায়েম করেছে। বিশেষ করে প্রাণীকুলই যে তাদের স্রষ্টা একথা বিশ্বাস করেছে। পশুপাখিদের বুলিকেই তারা অনুকরণ করেছে। পশুপাখিদের

চিৎকার বা বুলিই যে ভাবপ্রকাশের উপায় হিসাবে মানুষের ভাষার রূপ নিয়েছে এই ধরনের অনুমানও যুক্তিগ্রাহ্য। গোত্র-আনুগত্য, যাপনকথা ও ভাষার স্মরণপথে পরবর্তী কালের লোককথায় স্বাভাবিকভাবেই পশুকথার উপস্থাপনা ঘটেছে। কিন্তু পশু যখন মানুষের ভাষা মুখে নিয়ে চরিত্র হয়ে ওঠে তখন নিম্নবর্গের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রতি অনুসন্ধিৎসু সামাজিকের মন জাগ্রত হয়ে ওঠে।

যে কথাটা বলা বিশেষ প্রয়োজন সেটি হল, জীবকুলের বেঁচে থাকার জন্য এবং যোগ্যতমের প্রাণ-প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিকূল পরিবেশ-পরিস্থিতির সঙ্গে লড়াই-প্রতিবাদ-প্রতিরোধের ঘটনাই সিংহভাগ পশুকথার মূল বিষয়। শক্তিমান ও প্রতিপত্তিশালী অত্যাচারীর বিরুদ্ধেই নিম্নবর্গীয় মানুষের অর্থাৎ পশুপাখিদের চিরন্তন বিদ্রোহ। পশুকথাগুলিতে সাংকেতিক অভিজ্ঞানে শক্তিমান ও অসহায়ের লড়াইয়ে সমাজের উচ্চবিত্ত ও নিঃস্ব-রিক্ত অন্তেবাসীর শ্রেণীগত লড়াইটিও স্পষ্ট হয়ে গেছে। প্রচারিত হয়েছে পাশবিক শক্তির সঙ্গে মানবিক জীবন-রক্ষার কঠিনতম সংগ্রামে লড়াকু মানবের বুদ্ধি-নির্ভর জীবন জয়ের কাহিনী। এই শক্তির বিরুদ্ধে বুদ্ধির জয় ঘোষণাতেই লোকসাধারণের অভিজ্ঞান নির্ভর পশুকথা ভিত্তিক লোককথাগুলির সৃজন। তাই নদীমাতৃক পরিবেশে শক্তিশালী জলের কুমীরকে ডাঙায় এসে ক্ষুদে শেয়ালের কাছে নাস্তানাবুদ হতে হয়েছে, নিঃস্ব হতে হয়েছে। সামাজিক মাৎস্যন্যায়ের চরম দুর্বিপাকে প্রকৃত না হোক, অন্তত নিম্নবর্গীয় অসহায় মানুষের দিনবদলের স্বপ্ন নিহিত হয়ে গেছে পশু-পাখিদের জীবন-যুদ্ধের অন্তরালে। চিরকাল যে কারোর সমান যায় না ধনহরণকারী রাজাকে এই শিক্ষা দিয়েছে ছোট্ট টুনটুনি। শুধু তাই নয়, শক্তিমানের অস্ত্র একদিন তারই নাক কেটে ছেড়েছে। তোষণপ্রিয় ব্রাহ্মণ বাস্তব বুদ্ধির অভাবে যখন চরম অসহায়, তখন শেয়ালের বুদ্ধিবৃত্তির কারুণ্যেই ব্রাহ্মণের প্রাণ বেঁচেছে। সুতরাং আমরা এও বলতে চাই যে, বেশিরভাগ পশুকথা আসলে মানব-কথারই শাশ্বত রূপ।

গোত্র বিশ্বাসও তার বাইরে নয়। 'শ্বেত-বসন্ত' লোককথাটিতে কুয়োয় পড়ে যাওয়া বাঘকে রাজপুত্র শ্বেত উদ্ধার করেছে, জীবনদান করেছে। বাঘ কথা দিয়েছিল সে ও তার বংশধররা রাজপুত্রের উপকার মনে রাখবে। বিপর্যয়ের শিকার শ্বেতকে যখন ছাগল চরাতে পাঠাল সওদাগর, তখন জঙ্গলে সেই বাঘ ও তার বংশধররা রাজপুত্রের প্রতি কৃতজ্ঞতা বশতঃ ছাগল রক্ষার দায়িত্ব নেয়। এতো দেশ-দেশান্তরের প্রজা শাসনের রাজকীয় রাজসখ্যতা। কিম্বা ছাগলরা তো সেই নিম্নবর্গীয় সাধারণ মানুষ, যাদের গোত্রপিতা হল বাঘ, যে তার উত্তরপুরুষদের রক্ষার দায়িত্ব নিয়েছে। ডেনমার্কের 'যমজ ভায়ের গল্প' নামক একটি লোককথায় রাজকন্যাকে বিয়ের দাবিদার মৎস্যদানবের হাত থেকে রাজকন্যাকে বাঁচাতে বড় ভাইকে সাহায্য করেছে তার ঘোড়া, কুকুর ও বাজপাখি। একদিকে এরা যেমন গোত্রপ্রতীক বা গোত্রপিতা হয়ে তাকে রক্ষা করেছে, তেমনি মৎস্যদানবের সঙ্গে যুদ্ধে শক্তি, বুদ্ধি ও গতির সমন্বয়ে গঠিত সেনার ভূমিকা পালন করেছে। প্রভুত্ব ও আনুগত্যের মুখ্য সম্পর্ক সূত্রেই কিছু পশুকথা

রচিত হয়েছে। আনুগত্য সত্ত্বেও বর্গীয় বা সাবলটার্ন শ্রেণীর প্রতিবাদী চেতনা প্রভুত্বকামী শ্রেণীর বিপরীত বিন্দুতে যে অবস্থান করবে— তা বলাই বাহুল্য।

লোককথাগুলোর কাহিনী চরিত্র অনুযায়ী বোঝা যায়, লোককথাগুলোর কথক ছিল ঐ সাবলটার্ন শ্রেণীর মানুষরাই। যারা চরম আনুগত্য প্রদর্শনের লাঞ্ছনা নিয়েই একদিন পশুখামারে জেগে উঠেছিল, প্রতিরোধ করেছিল এবং ক্ষমতাবান প্রভুদের অবিশ্বাস্য বিপদে ফেলে দিয়েছিল। এই শ্রেণী দ্বন্দ্বের মধ্যেই রয়ে গেছে সামাজিক বিবর্তনের ইঙ্গিত। পশুকথাগুলোর মধ্য থেকে বার্তা পেরিয়ে এসেছে যে সাবলটার্ন শ্রেণিও বিত্তবান/ শক্তিশালীদের বিপরীত মেরুতে অবস্থান করে তাদের জীবন-যাপনের সামগ্রিক ধারাকে স্বতন্ত্রভাবে টিকিয়ে রাখতে বদ্ধ পরিকর ছিল। আবার প্রভুত্ব-আনুগত্যের চরম বৈপরীত্যও বিদ্যমান ছিল। এই দুইয়ের মধ্যিখানেই আছে তাদের স্বপ্ন-সন্ধান এবং স্বপ্ন-পূরণের কাহিনীগুচ্ছ, জেগে উঠার ইতিহাস।

প্রভুত্বকামী কায়েমী শক্তিগুলোও একে অপরের থেকে ভিন্ন কৌশলী। স্বার্থ ছাড়া কখনো একে অপরের সঙ্গে সখ্যতা করে না। শক্তির নিজস্ব প্রয়োজনেই তারা বৃত্তবন্দী। এই এক বৃত্তে অন্যের অনুপ্রবেশকালে কায়েমী শক্তিগুলো একে অপরের শত্রুও। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর ক্ষেত্রেও এই সম্পর্ক একইভাবে সত্য। কিন্তু অধীনস্ত মানুষেরা সবক্ষেত্রেই স্বতন্ত্র অস্তিত্বের বিনষ্টির খাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে লাঞ্ছনা, অপশাসন, অত্যাচার, অবিচার, দাসত্ব থেকে মুক্তি কামনায় এককাট্টা। যদিও কিছু মানুষ স্বার্থের বিপরীত বিন্দুতেই অবস্থান করে। তাই সাবলটার্ন শ্রেণীর মানুষ যখন প্রাকৃতিক উৎপাদনের উপর বা সম্পদের উপর নিজের প্রয়োজন সিদ্ধ করতে তৎপর হয়েছে, তখন সবলের রোষ দৃষ্টি তাদের উপর পড়েছে। অর্থাৎ প্রভুত্বকামী শ্রেণির কাছে দুর্বল শ্রেণির অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে অধীনতা স্বীকার করার প্রশ্নটি এসে যায়। হয় অধীনতা, নয় মৃত্যু। তাই জল ঘোলা করার অপবাদ দিয়ে জীবন-যাপনের প্রাকৃতিক রসদ জল থেকে ভেড়াকে বঞ্চিত করেছে বাঘ। এখানেও প্রভুত্ব ও অধীনতার বিরোধ পুরুষানুক্রমে চলে এসেছে। পিতৃপুরুষের বিদ্রোহের দোষ বহন করতে হয়েছে ভেড়াকে। অর্থাৎ নিম্নবর্গের মানুষকে। নিম্নবর্গীয় মানুষের ইতিহাস খুঁজতে হলে তাদের সাংস্কৃতিক চেতনার অন্যতম দলিল হিসেবে পশুকথা কেন্দ্রিক লোককথাগুলো অত্যন্ত বেশি গুরুত্বের দাবি করতেই পারে। প্রভুশ্রেণীর বিলাস-ব্যসন, ঘর ছেড়ে অন্য রাজ্যে অধিকারের আধিপত্যকামী শক্তির তলায় পড়ে থাকা নিম্নবর্গের চাপা পড়া ইতিহাস খোঁজার জন্যই কথা বলা পশুদের জীবন পর্যালোচনার যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে। কেননা, রাজা, জমিদার, সামন্তপ্রভু থেকে শুরু করে দেশীয় জোতদারদের শোষণ, আধিপত্য বিস্তারের অত্যাচার অপশাসনই যে নিম্নবর্গের মানুষকে প্রতিরোধের পথে নামতে বাধ্য করেছিল তার ভূমিকাংশের বিস্তার পশুকথাগুলোর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। এই বিরোধ-বিদ্রোহের প্রেক্ষাপটেই সাবলটার্ন ক্লাসের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষার শ্রেণিগত চেতনা স্পষ্টতা পায়। সাবলটার্ন

স্টাডিজের ঐতিহাসিকদের ইতিহাস অন্বেষণের এটাই ছিল মূল প্রেক্ষণস্থল। আমরা দেখেছি পশুকথাগুলোর মধ্যেও সেই ইতিহাসের চূর্ণ অংশ রূপকাত্মকভাবে লুকিয়ে আছে। সাবলটার্ন শ্রেণি একেবারেই যে সংগঠিত শক্তি নিয়ে মাস্টার ক্লাসকে প্রতিহত করেছে তা ভাবাটাই অসম্ভব। বরং প্রবল শক্তির বিরুদ্ধে অস্তিত্ব রক্ষার দায় নিয়ে ব্যক্তিগত স্তরের কৌশলী লড়াইগুলোই পরবর্তীকালে সাংগঠনিক প্রতিরোধ হয়ে উঠেছে।

একদিকে মাস্টার ক্লাস চায় পুরুষানুক্রমিক আনুগত্য, অন্যদিকে সাবলটার্ন ক্লাস চায় পিতৃপুরুষের সূচনা-বিদ্রোহের কৌশলী প্রসার। আনুগত্য ভঙ্গ করার চরম শাস্তি জুটেছে দুর্বল মানুষের জীবনে। নেকড়ে ভেড়াকে হত্যা করেছে এবং এই বিজ্ঞপ্তি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চেয়েছে যে, জীবন রক্ষা কিম্বা প্রাকৃতিক জ্ঞাপনের দায়িত্ব অনিচ্ছাভরে মেনে নিয়েও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নিয়ে টিঁকে থাকার সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে সাবলটার্ন ক্লাসের ব্যক্তিগত ক্ষোভগুলো দানা বাঁধছিল, কিন্তু প্রয়োগের পথ পায় নি। তাই আনুগত্য না দেখিয়ে সাম্যবাদী আন্দোলনের ইঙ্গিত দেওয়ার জন্য টুনটুনিকে দেশ ছাড়তে হয়েছে। উৎপাদিত পণ্য বা প্রাকৃতিক সম্পদের একচ্ছত্র ভোগাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শাসক যখন স্বেচ্ছাচারী ও স্বৈরাচারী মানসিকতায় দুর্বল মানুষকে হত্যা করে, দাসে পরিণত করে, তখন দুর্বল মানুষকে পথ খুঁজে নিতে হয় আত্মসমর্পণে, নয় আত্মবলিদানে। সাবলটার্ন ক্লাসের কাছে এও এক ধরনের প্রতিরোধ। দুর্বল মানুষ সেদিন ব্যক্তি বৃত্তে দাঁড়িয়ে জানতে পেরেছিল যে, প্রভুত্বের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মাস্টার ক্লাসও ব্যক্তিগত অধিকারী তত্ত্বে বিভাজিত এবং তারা একে অপরের প্রবল প্রতিপক্ষ ও শত্রু। ওদের মধ্যে অবিশ্বাসের বাতাবরণ তৈরি করতে পারলে সামাজিক ইতিহাসে তৃতীয় পক্ষের জয়লাভের সম্ভাবনা নিশ্চিত। শক্তির দম্ভে সিংহ আর অন্য কোন শক্তিমানের অস্তিত্ব সে স্বীকার করবে না এবং তাকে যে সমূলে বিনাশ করতেই আগে যাবে,- মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দুর্বল খরগোশের কথামতো সিংহ কুয়োর মধ্যে দেখলে তার আত্মরূপের আড়ালে দাম্ভিক প্রতিপক্ষকে। তাকে পরাজিত করতে সিংহ কুয়োয় ঝাঁপ দিল। ছায়ার সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে নিজের প্রাণ গেল। নিম্নবর্গের প্রতি একচ্ছত্র আধিপত্য কায়েমের বাসনাই এই মৃত্যুর প্রধান কারণ। কিন্তু দুর্বল প্রতিপক্ষের জয় ঘোষিত হল। কাব্যের ভাষায় সেই ইতিহাসতো আছে— 'কামানে কামানে ঠোকাঠুকিতে/ আজ তারা চূর্ণ-চূর্ণ।' (কাস্তে-দিনেশ দাশ)। এই কৌশলী সংগ্রামী প্রতিরোধ সেদিনের নিম্নবর্গীয় মানুষকে সংগঠিত বিদ্রোহের মন্ত্র জুগিয়েছে। সুতরাং স্বেচ্ছাচারী বলবানের পরাজয় একটা মিটিং-এ সম্ভব হয়নি। দীর্ঘ সময়পর্বের ঘটনা এই একটা কাহিনীতে ঢুকে গেছে বলেই মনে হয়। প্রায় এই একই রকম পশুকথার সন্ধান মেলে ভুটান, তিব্বত, গ্রীস, তুরস্ক প্রভৃতি দেশের লোককথায়। পশুকথাগুলোতে লাঞ্ছিত, শোষিত নিম্নবর্গের প্রতিরোধ এবং অবশেষে প্রভুত্ববাদের অবশ্যম্ভাবী পরাজয়ের ইতিহাস মনগড়াভাবে নির্মিত হয়নি। আবার জয়ের ইতিহাস রচনাও

তাদের অভিপ্রেত নয়। ক্ষমতাশালী উচ্চবর্গীয়দের ইতিহাস রচনার রসদ বা মাধ্যম হিসাবে কাজ করেছে নিম্নবর্গের মানুষের বিদ্রোহ, প্রতিরোধ ও প্রতিক্রিয়া। আমাদের জাতীয়তাবাদী ইতিহাসের এটাই সত্য। কিন্তু কয়েনের চাপা পড়া দিকটাতেই রয়েছে নিম্নবর্গের Survive এবং দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে জীবন-বাজি রাখা লড়াইয়ের রোজনামচা। এটাই চাপাপড়া ইতিহাস, নিম্নবর্গের ইতিহাস।

'টুনটুনি ও নাপিতের কথা' নামক লোককথাটিতে নিম্নবর্গের সংগঠিত জয় প্রকাশিত হয়েছে। রাজার বৃত্তিভোগী হওয়ার কারণে টুনটুনির মতো একটা নগণ্য পাখির ফোঁড়া কাটতে নাপিত রাজি না হওয়ায় টুনটুনি রাজার কাছে সুবিচার চেয়েছে, প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। কিন্তু টুনটুনি নাপিতকে চ্যালেঞ্জ করেছে এবং শ্রেণি সচেতন টুনটুনি রাজাকে বুঝিয়ে দিয়েছে নিম্নবর্গের হলেও জীব মাত্রেরই বাঁচার অধিকার আছে। সেই অধিকারকে যে উপেক্ষা করবে রাজার উচিত তাকে শাস্তি দেওয়া। রাজা যদি তা না মানে তবে ধরে নেওয়া যায় সুশাসন দিতে অক্ষম রাজা নাপিতের চেয়েও অপরাধী। একজন নিম্নবর্গের লোক যদি রাজ্যবৃত্তিভোগী কর্মচারীর বিরুদ্ধে রাজার কাছে নালিশ করে ও সাজা প্রার্থনা করে তবে তা নিশ্চয়ই জাগ্রত চেতনার প্রতিরোধী ভূমিকা হিসাবেই বিবেচিত হয়। কিছু মধ্যস্বত্তভোগী নিম্নবর্গীয় রাজার চুঁইয়ে পড়া খাদ্যাখাদ্যের প্রত্যাশী হয়ে বা রাজার ভয়ে টুনটুনিকে শক্তি সামর্থে সাহায্য না করলেও মশার মতো সংখ্যা গরিষ্ঠ সর্বহারা শ্রেণির প্রতিবাদী চেতনাকে সে সঙ্গে পেয়েছে। আর এই গণঅভ্যুত্থানের চাপের কাছে সবরকম শক্তিই হার মেনেছে। নিম্নবর্গের এই আন্দোলনের মধ্য দিয়েই সামাজিক পরিশুদ্ধি সম্ভব হয়েছে।

দুর্বলের বুদ্ধি এবং সবলের শক্তির মধ্যে কখনো কখনো একটা অসম সম্পর্কের বাতাবরণ গড়ে উঠতে দেখি পশুকথাগুলোর মধ্যে। উচ্চবিত্তকে বা রাজা/ জমিদারকে নিম্নবর্গের সাধারণ মানুষ/ প্রজারা যেমন তাকে উচ্চাসন দান করেছে তেমনি এইসব নিম্নবর্গীয়রা উচ্চবর্গীয়দের সমপর্যায়ে নামিয়ে আনতে পেরেছে। অর্থাৎ সম্পর্কগত মান্যতার ভেতরে অসাম্যের চোরা স্রোত নিম্নবর্গের মানুষকে যে শক্তি জুগিয়েছে তা বলা যায়। তাই বাঘ ও শেয়ালের সম্পর্ক মামা-ভাগ্নের হলেও, বাঘের হাতে চিরকাল মার খাওয়া শেয়ালের অবস্থান মনের দিক থেকে অন্য অক্ষে। শক্তির বিরুদ্ধে বুদ্ধিতে শাণ দিতে হয়েছে তাকে বাধ্য হয়েই, অস্তিত্ব রক্ষার প্রবল তাড়নায়। সুতরাং উচ্চবিত্ত ও নিম্নবর্গের মানুষ কখনো কখনো সমাজে মিশে গেলেও তাদের অস্তিত্বের অন্তর্গত স্তরে তারা সতন্ত্রই থাকে। শোষক-শোষিত সম্পর্কের দীর্ঘকালীন রাস্তাতেই শেয়াল বাঘকে জলখাবারের টোপ দিয়ে কুয়োর উপর মাদুর বিছিয়ে দিয়েছে। আনুগত্যে তুষ্ট বাঘ সেই মাদুরে বসতে গিয়ে কুয়োয় পড়েছে। কোনরকমে প্রাণেও বেঁচেছে। শেয়ালরূপী নিম্নবর্গের মানুষ তাদের অভিজ্ঞতা দিয়ে জেনেছে শোষক শ্রেণি আধিপত্য ও আনুগত্য সবচেয়ে বেশি পছন্দ করে। সুতরাং তোষণ। কেননা শত্রুর শেষ রাখতে নেই। বাঘের সঙ্গে বিবাদ করে ডাঙ্গায় বাস করা কঠিন। তাই এবার বাঘকে

জলবিহারের টোপ দিয়ে ডাঙায় পড়ে থাকা কুমীরকে নৌকা বানাল। বাঘ নৌকা ভেবে কুমিরের পিঠে চাপতে গেলে বাঘ কুমিরের পেটে গেল। কুমিরের জল থেকে ডাঙ্গায় চরতে আসার ক্রিয়াকলাপ জনিত চরিত্রটির সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বেশ মিলে যায়। দেশীয় শাসকের/উচ্চবিত্তদের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মানুষের উভয় সঙ্কট— জলে কুমির ডাঙায় বাঘ। সাধারণ মানুষকে দুয়েরই মোকাবিলা করতে হয়েছে। তবে সাধারণ মানুষ সেদিনের অভিজ্ঞতায় দেখেছে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তাদের আধিপত্য বিস্তারে দেশীয় বিত্তবানদেরও ধনে-প্রাণে মারতে ছাড়েনি। তাই অত্যাচারী দেশীয় বিত্তবানের সংহারে বা নিজস্ব অস্তিত্বের সঙ্কট মোচনে শত্রুর শত্রুকে মিত্র ভাবতেও সাধারণ মানুষ দ্বিধা বোধ করেনি। দক্ষিণ আমেরিকার লোককথায় খেঁকশিয়ালকে ট্রিকস্টার বা ধূর্ত হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। ভারতীয় লোককথাতেও তাই। রেড ইণ্ডিয়ানদের একটি লোককথায় খেঁকশিয়ালের দ্বারা জাগুয়ারের নাস্তানাবুদের কাহিনী আছে। সন্তান হন্তা শেয়ালকে জব্দ করার জন্য শেষ পর্যন্ত মরার ভাণ করেও কুমির শেয়ালকে শাস্তি দিতে পারেনি। রেড ইণ্ডিয়ানদের গল্পটির মধ্যেও এই একই কৌশল অবলম্বন করে খেঁকশিয়ালের বুদ্ধির কাছে পরাজিত হয়েছে জাগুয়ার।

সাধারণ মানুষের উপরে শাসক ও শোষক শ্রেণি অনেক সময় তাদের শাসন-শোষণকে অব্যাহত রাখতে বা সাধারণ মানুষের প্রতিরোধ থেকে মুক্তি পেতে ব্রাহ্মণ্য শ্রেণিকে কাজে লাগিয়েছে। কাজ হাসিল হলে আবার রাজকীয় মেজাজে তাকে নিশ্চিহ্ন করে দিতেও চেষ্টা করেছে। যাতে শক্তিমানের দুর্বলতার সাক্ষ্য না থাকে। অর্থাৎ এখানে ধর্মীয় কারণে ব্রাহ্মণ্য শ্রেণির প্রতি একটা দুর্বলতাকে কাজে লাগানো হয়েছে। বীরের জন্য যদি এ বসুন্ধরা ভোগ্য হয় তবে উপকারীর উপকার স্বীকার করলে চলে না। প্রকৃতির কাছ থেকে উপকার পেয়েও তো পরিবেশকে ধ্বংস করতে মানুষ কার্পণ্য করেনি। এই অকাট্য যুক্তির মুখে দাঁড়িয়ে শোষক শ্রেণির আর এক প্রতিনিধি ব্রাহ্মণকে নিম্নবর্গের মানুষ কৌশলে বাঁচিয়েছে। আধিপত্যের একই লাইনে দাঁড়ানো দুই পক্ষের পরস্পরের অসম অবস্থান সেদিন শেয়াল দেখিয়ে দিয়েছে। নির্বুদ্ধিতার শক্তির চেয়ে বুদ্ধির উপরেই সাধারণ মানুষের আস্থা অর্জনের প্রচেষ্টা চলেছে। আবার মানুষের বিবেচনাহীন ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপই যে তাদের বিপদের কারণ এই বার্তাও 'আল' ও 'বৃক্ষের' সাক্ষ্য থেকে উঠে এসেছে। একটি সাঁওতালি লোককথাতেও একই বিষয় লক্ষ্য করি। সেক্ষেত্রে সাক্ষ্য দিয়েছে একটি কুকুর ও একটি বটগাছ। প্রাকৃতিক পরিবেশে এই দুটিরই গুরুত্ব অনস্বীকার্য। সেখানেও মানুষের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে ও অকৃতজ্ঞতার মনোভাবে রুষ্ট হয়ে বাঘের প্রাণ বাঁচানো উপকারীকে বাঘের খাওয়া কর্তব্য বলেই সওয়াল করেছে। মানুষকে এই শিক্ষা দিতে চেয়েছে যে, প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর নির্ভর করে বেঁচে থেকে তাকেই ধ্বংস করা— মৃত্যুকে ডেকে আনা ছাড়া আর কিছুই নয়। আবার 'কথাসরিৎসাগর'-এ দেখি শক্তিদেবকে রক্ষা করেছে বটগাছ ও শকুন জাতীয় পাখি। এই পাখিই তাকে সন্ধান

দিয়েছে কনকপুরীর। সকালে বেরিয়ে যে পাখিরা সন্ধ্যায় ঘরে ফেরে তারা তো খেটে খাওয়া নিম্নবর্গের মানুষ, তারাই কনকপুরী নির্মাণ করে। তাই শকুন পাখিই তাকে দিতে পেরেছে কনকপুরীর সন্ধান। এখানে রক্ষকরা টোটেম দেবতা হিসাবেও উত্তর পুরুষকে রক্ষার দায়িত্ব নিয়েছে— এ বিশ্বাস সাধারণ মানুষেরই।

মানুষ যতো সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে ততই বুদ্ধির জোরে সমস্যা থেকে মুক্তি চেয়েছে। জ্ঞানের সৃষ্টি ও তার প্রায়োগিক কৌশলেই মানুষ শ্রেষ্ঠ। একটি সাঁওতালী লোককথায় শেয়াল পরস্পর বিবদমান দুই গোষ্ঠীর বিতর্কের অবসান ঘটিয়েছে জ্ঞানের সৃজনশীলতায়। আষাঢ়-শ্রাবণ শীতকাল, না পৌষ-মাঘ শীতকাল- এই নিয়ে ভালুক ও বাঘের বিতর্কের অবসানে শেয়ালের উত্তর বেশ বিজ্ঞান নির্ভর। বিচারের রায় যার বিপক্ষে যাবে সে-ই শেয়ালকে খাবে। বাস্তব বুদ্ধি ও জ্ঞানের মিশেলে শেয়াল বলেছে— আষাঢ়-শ্রাবণেও শীত করে, পৌষ-মাঘেও শীত করে। আসলে শীত নির্ভর করে বাতাসের উপরে। এই শেয়ালরাই সেদিনের ব্রাহ্মণ্য শ্রেণির মানুষ বা মোড়ল, যারা সাঁওতাল সমাজের বিচারক হয়ে উঠেছিল এবং রাজাকে বিচার শিখিয়েছে। বাংলার ‘গাছেরছানা’ লোককথাটিতে সওদাগরের ঘোড়াচোর রাজার কাছে বলেছে ঘোড়াটি সে চুরি করেনি, সেটি আসলে তার গাছের ছানা। রাজা সে কথা বিশ্বাস করে ঘোড়ার প্রকৃত মালিক হিসাবে চোরকেই মেনে নিয়েছে। সওদাগরের কাছ থেকে এই বিচার শুনে শেয়াল সওদাগরকে জানাল যে, সে তার পক্ষে সাক্ষ্য দেবে। তবে সাক্ষ্যদানের সময় রাজার কুকুরকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিতে হবে। সওদাগর রাজাকে একথা জানালে রাজা সাক্ষ্যদান পর্বের আয়োজন করেছে, শেয়ালের শর্ত মতো। শেয়াল সাক্ষ্য দিতে গিয়ে কেন ঘুমোচ্ছে রাজা জানতে চাইলে শেয়াল বলেছে,— জলে আগুন লাগে একথা সে কখনো শোনেনি। শেয়ালের উত্তর— ঘোড়া যে গাছের-ছানা একথা কেউ কখনো শুনেছে? রাজা তার বিচারের ভুল বুঝতে পেরে চোরকে ধরে এনে শাস্তি দিল এবং সওদাগরকে ঘোড়া ফিরিয়ে দিল। সাক্ষ্যদান পর্বে রাজার কুকুরকে তাড়িয়ে দেওয়ার বিষয়টি খুব তাৎপর্যপূর্ণ। প্রভুভক্ত কুকুর তার প্রভুর পরাজয় মেনে নিতে পারবে না, শেয়ালের সঙ্গে সে অহেতুক ঝগড়া বাঁধাবে এবং বিচারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ বিলম্বিত হবে। আসলে প্রতীক রূপে কুকুর বলতে পারিষদ বা রাজার পোষা লেঠেলদেরকেই বোঝানো হয়েছে। যারা যুক্তির ধার না ধেরে রাজার পরাজয় আটকাতে শতগুণ বাজে বকবে এবং শক্তির আস্ফালন করবে। শেয়ালের এই বাস্তব বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা সেদিনের ব্রাহ্মণ্য সমাজের বুদ্ধিবৃত্তির অনুসারী।

পশুকথাগুলো শিশুমনে বা সাধারণ মানুষের মনে চমৎকারিত্ব সৃষ্টির জন্য যে শুধু রচিত হয়নি, সেখানে পশুকথার আড়ালে যে মূলত মানুষের কথা বলারই চেষ্টা হয়েছে ‘নরহরি দাস’, ‘মজন্তালী সরকার’ প্রভৃতি গল্পগুলোই তার প্রমাণ। নরহরি দাস লোককথাটি একটি সম্পূর্ণ পশুকথা। একদিকে গৃহপালিত দুর্বল পশু হিসাবে ছাগল ও গরুর সহাবস্থান, অন্যদিকে শেয়াল ও বাঘের সবল শক্তির সহাবস্থান। দুর্বল একদিন

সবলের অধিকারী শক্তিকে খর্ব করেছে। বাসস্থান দখল করেছে। অর্থাৎ হরিদাসের দল একদিন সবল অত্যাচারীদের নাকাল করেছে। তাদের অধিকার আদায় করে নিয়েছে। এবং প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর মধ্যেও বিভেদ তৈরি করে দিয়েছে। অধিকার পুনরুদ্ধারে শেয়াল বাঘের সঙ্গে জোট তৈরি করে যৌথভাবে যখন ছাগলকে আক্রমণ করার চেষ্টা করেছে তখনই জোটশক্তির কানে বিভেদ তৈরির মন্ত্রটি ছাগল পৌঁছে দিয়েছে—

'দূর হতভাগা! তোকে দিলুম দশবাঘের কড়ি,
একবাঘ নিয়ে এলি লেজে দিয়ে দড়ি!' (টুনটুনির বই/ উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী)

শেয়ালের চক্রান্ত ভেবে বাঘ বিশ্বাসঘাতক শিয়ালকে নাস্তানাবুদ করল। জোট জটে পরিণত হয়ে দুই বিরুদ্ধ শক্তি হয়ে দাঁড়াল। সেই থেকে বাঘের উপর নাকি শেয়ালের এমন রাগ হলো, সেই রাগ আর কিছুতেই গেল না। এখান থেকেই আমরা জানতে পারি বাঘ ও শেয়ালের মামা-ভাগ্নের সম্পর্কের আড়ালে প্রবল শত্রুতার কারণ এবং কেনই বা শেয়াল বাঘকে শাস্তির মুখে ঠেলে দিয়ে তবে স্বস্তি পায়।

উৎপাদন ব্যবস্থার কাছাকাছি থাকা মানুষেরা চিরদিনই নিম্নবর্গের মানুষকে উপেক্ষা করেছে। তাদের লড়াইকে অবজ্ঞা করেছে। তাদের উত্থানকে স্বভাববশেই স্বীকার করতে চায়নি, বরং পিছিয়ে থাকা মানুষের পরাজয়েই তাদের আনন্দ। কচ্ছপের প্রতি শশকের আচরণেই মানব সমাজের এই তত্ত্ব আরোপিত। নিম্নবর্গের মানুষ যেমন একদিন তাদের প্রতি অবজ্ঞার জবাব দিয়েছে, কচ্ছপও তেমনি শশকের উদ্ধত আধিপত্যকে প্রত্যাঘাত করেছে। কচ্ছপের প্রতি কথক শ্রেণির টোটেম বিশ্বাসের আনুগত্য প্রকাশিত হলেও, শ্রেণিদ্বন্দ্বের সুদৃঢ় ভিত্তিটিই এই পশুকথাটির প্রকৃত মোটিফ। 'চড়াই ও কাক' লোককথাটিতে নানা বৃত্তিয় জীবনের এক শৃঙ্খলাবদ্ধ শ্রেণি সমাজের ছবি আছে। গোষ্ঠীবদ্ধতা যে শ্রেণীভিত্তিক জীবনে টিঁকে থাকার প্রাথমিক শর্ত সেটাই কাককে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। একই শ্রেণীবৃত্তের মধ্যে অবস্থান করে পারস্পরিক সহযোগিতাই যে সমাজ-জীবনের মূল নিয়ন্তা শক্তি সেকথাই কাককে বোঝানো হয়েছে। আর এই বৃত্ত থেকে বেরিয়ে গেলে অন্য শ্রেণির হাতের আগুন যে আলো দেখাবে না পুড়িয়ে মারবে, কাকের মৃত্যুই তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

ডেনমার্কের একটি লোককথায় গৃহপালিত ষাঁড়ের সঙ্গে মানুষের পারিবারিক সম্পর্ক স্থাপনের এবং সম্পদ-সম্পত্তির উত্তরাধিকার প্রদানের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশিত হয়েছে। সন্তানহীন চাষী দম্পতি ষাঁড়কে কথা শেখানোর দায়িত্ব অর্পণ করেছে চার্চের এক সঙ্গীত শিক্ষকের উপর। এই অসম্ভবকে সম্ভব করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে চাষীর কাছ থেকে সে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছে এবং একসময় ষাঁড়টিকে উদরস্থ করেছে। চার্চ যে সাধারণ বা নিম্নবর্গের মানুষকে ধর্মের আবরণে শোষণ করতো তার ছবি এখানে স্পষ্ট। অবশেষে শিক্ষিত ষাঁড় পীডার-ই যে, বণিক পীডার ওকসে তা দম্পতির কাছে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছে। পশুই যে মানবের আদি রূপ তা যেমন এই গল্পে বর্ণিত তেমনি প্রতিফলিত হয়েছে ধর্মীয় শোষণ ও বঞ্চনার ইতিহাস। এরকম পশুকথা ও

মানবকথার মিশ্র উপাদানে তৈরি একটি লোককথা হল 'বাঘঘর'। এই গল্পটিতে কাক ও বাঘের অশুভ যোগসাজসের মধ্য দিয়ে দরিদ্র ব্রাহ্মণকে চরম লাঞ্ছনার হাত থেকে রক্ষার্থে গ্রামীণ মানুষের প্রতিরোধই প্রধান হয়ে উঠেছে। কাক এখানে কুৎসিত চরিত্রেরই রূপক এবং বাঘ জাতে উঠতে চাওয়া ক্ষমতাবান নারীলোলুপ অসামাজিক মানুষের প্রতিনিধি। এগল্প প্রতিশোধস্পৃহা এবং প্রতিরোধের গল্প। সমাজ-সংসারে এমন কিছু মানুষ থাকে যাদের মতলবে জল ঢেলে দিতে তারা প্রতিশোধোন্মুখ হয়ে ওঠে এবং সুযোগ পেলেই তারা ক্ষমতাবানদের দিয়ে প্রতিশোধ নিতেও দ্বিধা করে না। গরিব ব্রাহ্মণের বাড়িতে একফোঁটা পায়েস না পেয়ে বিরক্ত কাক ভেবেছে 'এর শোধ নিতেই হবে।' তাই কাকা বাঘের সঙ্গে ব্রাহ্মণের মেয়ের বিয়ের যোজকতার ছলে একদিকে বাঘের লালসাকে বাড়িয়ে দিয়েছে, অন্যদিকে ব্রাহ্মণের প্রতি প্রতিশোধস্পৃহায় ব্রাহ্মণের সামাজিক মানমর্যাদা এবং জাত দুইই নষ্ট করতে উদ্যত হয়েছে। ব্রাহ্মণের দারিদ্র্যের সুযোগে যৎসামান্য কন্যাপণ হিসাবে ব্রাহ্মণের পরিবারে লেবু দান করতেও বাঘকে বুদ্ধি দিয়েছে। বাঘ লেবু দানও করেছে। বাঘের স্বপ্নপূরণ বিলম্বিত করে কাক তাকে ক্রোধান্বিত করতে চেয়েছে। ফলও ফলেছে। বাঘ হুমকি দিয়েছে কাল রাত্রে বিয়ে না দিলে ব্রাহ্মণের বাড়ির সবাইকে চিবিয়ে খাবে। কাক ব্রাহ্মণের হয়ে সম্মতির কথাও জানিয়েছে। কাক বুঝেছে এবার প্রবল প্রতিপত্তিশালীর সামনে ব্রাহ্মণের জাতও যাবে, জমিদারী থেকে উচ্ছেদও হবে এবং বাঘের দ্বারা চরম লাঞ্ছিতও হবে। ব্রাহ্মণবাড়িতে কাক জানিয়েদিল 'ওগো শুনছো? কাল রাত্রে বাঘ আসবে তোমাদের মেয়ে বিয়ে করতে। যদি বিয়ে না দাও সকলকে চিবিয়ে খাবে।' ব্রাহ্মণের মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। অবশেষে গ্রামের সাধারণ মানুষের প্রবল প্রতিরোধের মুখে বাঘের প্রাণ গেল। আজকের দিনেও সমাজে এই কাক ও বাঘ জাতীয় মানুষের অভাব নেই। এখানে কাক যেমন অসামাজিক, অমঙ্গল প্রত্যাশী তেমনি বাঘ প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী ধর্মাধর্মজ্ঞানহীন ভ্রষ্টাচারী। যাইহোক, কাকের চক্রান্ত এবং বাঘের হুমকি গ্রামের মানুষের প্রতিরোধে থমকে গেছে। 'বাঘের রাঁধুনি' শীর্ষক লোককথায় বউয়ের মৃত্যুতে বাঘরূপী প্রতিপত্তিশালী সামন্তবাদী দুই সন্তানের পিতা হয়েও জোর করে বাড়ির মেয়েকে তুলে নিয়ে এসেছে। ক্ষমতার জোরে নারীর উপর আধিপত্য কায়েমের ছবি এই গল্পটিতে ধরা আছে। বাঘিনী বিয়ে না করে মানুষের মেয়েকে বিয়ে করার মধ্যে ভিন্ন গোত্রের বিয়ের ব্যাপারটিও স্পষ্টতা পেয়েছে। এইসূত্রেই মানুষ ও পশুর বিয়ের বিষয়ত বিভিন্ন দেশের লোককথাতেই প্রচলিত। রেড ইণ্ডিয়ানদের লোককথাতেও ভালুকিনী ও একটি ছেলের সম্পর্ক স্থাপনের কথা আছে। বাঘের রাঁধুনি গল্পটিতে সামন্তবাদী পুরুষের প্রভুত্ব প্রদর্শনের শিকার হয়েছে নারী। প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী ব্যাঘ্র ব্যক্তিত্বকে বাধা দেওয়ার সাহস হয়নি নিম্নবর্গীয় বাবা-মায়ের। আকাঙ্ক্ষা ও অসহায়তার দ্বন্দ্বে দীর্ণ বাবা-মা চোখের জল ফেলে ফেলে যখন অন্ধ হয়ে গেছে তখন দাদা গিয়ে কৌশলে বোনকে উদ্ধার করেছে। স্বেচ্ছাচারী

সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে এ যেন পরবর্তী প্রজন্মের প্রতিবাদের জয়। মৃত্যুকালে বাঘিনী যেভাবে তার দুই সন্তান প্রতিপালনের দায়িত্ব তার স্বামীর উপর দিয়েগেছে তা যেমন শাশ্বত মাতৃত্বের আবেদন, তেমনি ভালোবাসাহীন অসম সাংসারিকতা থেকে মানুষের মেয়ের পলায়ন নারীরই শাশ্বত অভিপ্রায়। ব্রতকথায় দেখি নারী সতীন কেটে আলতা পরে স্বামীর সঙ্গে এক সংসার জীবন অতিবাহিত করতে চেয়েছে। আর এই লোককথায় নারী সতীনপোদের কেটে অনিচ্ছার সাংসারিক দাসত্ব থেকে মুক্তি চেয়েছে। এই নিষ্ঠুরতা নারীকে রাঁধুনি বা দাসী হিসাবে দেখার বিরুদ্ধে প্রবল এক প্রতিবাদের আঙ্গিক। উচ্চবর্গের প্রতি আনুগত্যকে ছাড়িয়ে উঠেছে সাধারণ জীবন-মানসের বিদ্রোহী মানসিকতা। চরম সর্বনাশ হওয়া সত্ত্বেও বাঘ এই বিরোধিতার মুখে দাঁড়িয়ে প্রতিশোধাত্মক হয়ে ওঠার সাহস পায়নি। 'মজন্তালী সরকার' লোককথাটিতে নিম্নবর্গীয় লোকের ছদ্ম প্রশাসকের ভূমিকা লক্ষ্য করি। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের পশুদের গোহারি বা ক্রন্দন অংশে বলবানদের অত্যাচারে বিপর্য্যস্ত নিপীড়িত মানুষের প্রতিনিধি হিসাবে ভালুক বলেছে 'উইচারা খাই মোরা নামেতে ভালুক/ নেউগি চৌধুরী নই না রাখি তালুক।'

নিম্নবর্গের যন্ত্রণা শুধু নয় সংগুপ্ত বাসনাও এই অসহায় অবস্থার মধ্য দিয়ে উঁকি মারে। স্বাস্থ্যকে সম্পদ করে প্রশাসকের বাসনাকে মজন্তালী কৌশলে কার্য্যকরী করতে চেয়েছে। যেন পাশার চাল উল্টে গেছে। এই গল্পে মজন্তলী সরকার ওরফে বিড়াল রাজকর্মচারী হয়ে বসেছে। খাজনা চাইলে বাঘিনী বলেছে— 'খাজনা কাকে বলে তা তো জানিনে। আমরা খালি বনে থাকি, আর কেউ এলে তাকে ধরে খাই।' এককালের শাসকের সরলার স্ত্রীর এইতো সরল স্বীকারোক্তি! কিন্তু বনের রাজা বাঘ এসে নকল সরকারকে আক্রমণ করতে গিয়ে গাছের ডালে আটকে তার মৃত্যু হলে মজন্তলী তার গায়ে নখের আঁচড় কেটে ছদ্ম বীরত্ব প্রকাশ করেছে। ভাবটা এমন, যেন নখের আঁচড়েই বাঘকে সে হত্যা করতে পারে। সন্তানদের বাঁচাতে এবং নিজের অস্তিত্ব টিঁকিয়ে রাখার জন্য বাঘিনী শক্তিশালী মজন্তলীর কাছে দাসী হয়ে আত্মসমর্পণ করেছে। তার ছদ্মবীরত্বই তাকে বাঘিনীর ঘাড়ে চেপে-বসে খাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে স্বামীহারা একজন নারীর অসহায়তার সুযোগ নিয়ে ধূর্ত রাজকর্মচারী জীবনকে নিশ্চিন্ত করেছে। যেমনটা করে ক্ষমতাপুষ্ট ব্যক্তিরা। শেয়ালের মৃত্যুর মতোই Natural Justice সেদিনের অসহায় মানুষের চাহিদার মধ্যেই ছিল, যেমন করে 'ধর্মের কল বাতাসে নড়ে'। শেয়ালের ছদ্মবীরত্বের মধ্য দিয়ে একদিকে সাধারণের প্রতি রাষ্ট্রিয় ক্ষমতাভোগীদের ভীতি প্রদর্শন, প্রতারণার সত্য রূপ যেমন প্রকাশিত তেমনি তার জীবনাবসানের মধ্য দিয়ে একটি tragic আবেদনও প্রচারিত হয়েছে। 'টুনটুনি ও রাজার কথা' গল্পে টুনটুনি যেন বঙ্কিমচন্দ্রের socialist বিড়ালের মার্জিত প্রত্নরূপ। টুনটুনি রাজার প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থের সামান্য তুলে নিয়ে সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থার পক্ষে আন্দোলনের ভূমিকাংশ রচনা করে দিয়েছে। System-এর বদলে ভীত

রাজা টুনটুনির মতো নগণ্য প্রতিবাদী শক্তিকে হত্যার দায়িত্ব দিয়েছে রানীদের উপরে। নারীরা ব্যর্থ হবার জন্য তারা শাস্তি পেয়েছে। 'টুনটুনি আর বিড়ালের কথা' গল্পে সদ্যোজাত সন্তান নিয়ে বেগুন গাছে বাস করে টুনটুনি। বিড়ালিনীর আগ্রাসন থেকে সন্তানদের বাঁচানোর জন্য তাকে পুরোনো বাসা ছাড়তে হয়েছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে শুধু পুরুষ নয় নারীর শত্রুতাও নারীর জীবন বিপর্যস্ত করেছে। তাহলে একথা পরিষ্কার যে, নারীদের সামাজিক অবস্থান মোটেই সুখকর ছিল না। শ্রেণীগত অবস্থান নির্বিশেষে সব নারীকেই ক্ষমতার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে বাঁচতে হয়েছে। সুতরাং পশুকথাকেন্দ্রিক যে নারীজীবন আমরা পাই তাতে তাদের নিম্নবর্গীয় বলতে বাধা কোথায়? আবার নারী-পুরুষের পরস্পর সহযোগী জীবন- যাপনের ছবি দেখতে পাই পিঁপড়ে ও পিঁপড়ীর জীবন-যাপনে। 'সোনার পাওয়ালা মুরগী' নামক একটি ডেনমার্কীয় লোককথায় নিম্নবর্গের নারীর প্রতি দাসীসুলভ আচরণ করছে পর্বত-মানব। পর্বত-মানব আসলে উচ্চবিত্ত নির্দয় মানব সমাজেরই প্রতিনিধি। সঠিক সময়ে কাজ শেষ করতে না পারার অপরাধে দুই বোনকে পর্বত-মানব হত্যা করে। কিন্তু বিড়ালের কথা মতো তৃতীয় বোন কাজে সফল হওয়ায় বিপত্নীক পর্বত-মানব তাকে বিয়ের লোভ দেখিয়েছে। 'সোনার পাওয়ালা মুরগী' তিন বোনের বাড়িতে থাকত আর সোনার ডিম পাড়ত পর্বত-মানবের গুহায়। মুরগী একদিকে যেমন নির্দয় উচ্চবিত্ত মানবের টোপ হয়ে কৌশলে দাসীর ব্যবস্থা করেছে, তেমনি তিন বোনকে তার সোনার ডিমেরও সন্ধান দিয়েছে। বিড়াল পর্বত-মানবের দাস হয়েও তিনি বোনকে সে বুদ্ধি দিয়ে সাহায্য করেছে। সঠিক সময়ে নির্দিষ্ট শন বুনে শেষ করতে হলে দড়িটা বিড়ালের লেজের মতো মোটা করতে হবে, সে যুক্তি প্রথম ও দ্বিতীয় বোন শোনেনি বলেই তাদের মৃত্যু হয়েছে। বিড়ালের কথা শুনে সফল তৃতীয় বোন পর্বত-মানবের প্রস্তাবিত বিয়ের প্রহসনকে প্রত্যাখ্যান করে ফিরে এসেছে। মুরগীও তৃতীয় বোনের সাহসে সাহসী হয়ে পর্বত মানবকে পরিত্যাগ করেছে।

লোককথাগুলিতে প্রাণীদের বিবর্তনের ধারণাও প্রতিফলিত। জলজ জীব হিসাবে মাছের বিবর্তিত রূপ যে মানুষ, আদিম মানুষের এই ধারণার সঞ্চার ঘটেছে মৎস্য-মানবের চিত্রায়ণে। নারী ও পুরুষের শাশ্বত যৌনতার প্রতীক বোধহয় পক্ষীরাজ, গতি এবং শক্তির বুদ্ধি নির্ভর মেলবন্ধনও ঘটে। গোত্র পিতা হিসাবে বাঁদরের চিত্রায়ণ ও এই একই ধারণার অনুসারী। রেড ইণ্ডিয়ান লোককথায় নেকড়েকে মানবের আদিম সৃষ্টি ও স্রষ্টা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। রেড ইণ্ডিয়ানদের একটি গল্পে মেয়েদের গোত্র মাতা হিসাবে পাখিদের নাম পাওয়া যায়। পাখিদের মধ্যে যেমন সাদা রাজহাঁস, মেয়ে সারস, বালি হাঁস, সাদা ছোট পানকৌড়ি, হলুদ রঙা পাখি রেড ইণ্ডিয়ানদের কাছে স্ত্রী ধারা অনুযায়ী বংশধারার প্রতীক। ভারতীয় আদিম উপজাতিরা বিশ্বাস করতো যে তারা পাখির সন্তান। মানুষের সঙ্গে মেয়ে সজারু বা মেয়ে পাখিদের বিবাহের মধ্য দিয়ে ভিন্ন গোষ্ঠী-বিবাহ প্রথার ইঙ্গিত রয়েছে। সন্তানরা মাতৃকা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত তাই

গোত্রগুলো মেয়ে পাখিদের নামেই প্রচলিত। বিবাহ সূত্রে মেয়েরা যে উৎপাদিকা শক্তির অংশ তার ইঙ্গিত এখানে আছে। ফসল ঘিরে নৃত্য উৎসবের আয়োজন আছে। গোত্র সমন্বিত গোষ্ঠীর মধ্যে সর্দারনী ছিল। রাজহংসীকে এখানে আমরা সর্দারনীর ভূমিকায় পাই। ঢাক বাজানো এবং ঢাকের চারদিকের বালি হাঁসের পায়ের ছাপ আঁকার মধ্যে তাদের যাদু বিশ্বাসের স্পষ্ট প্রকাশ রয়েছে। অবশেষে সব পাখি বউরা তাকে ছেড়ে চলে যাওয়ায় একটা tragic আবেদনও স্পষ্ট। কাকাতুয়া গোত্রের মেয়ের সঙ্গে কালো হাঁস গোত্রের ছেলের আদিম অস্ট্রেলীয় বিবাহ রীতিটি একটি অস্ট্রেলীয় লোককথায় বিবৃত হয়েছে। সাঁওতালদের কাছেও হাঁস-হাঁসলী ছিল প্রথম মানব-মানবী। বাংলাতে এমন বিহঙ্গম-বিহঙ্গমী, শুক-সারী প্রভৃতি জোড় জীবনের কথাও পাওয়া যায়। গোষ্ঠী জীবন থেকে পরিবার জীবন রচনার ইঙ্গিত এখানে আছে। দেবতার কাছে মানবের পরাজয় 'কয়োট বুড়োর শাস্তি' নামক রেড ইণ্ডিয়ান লোককথাটির মূল বিষয়। ঝড়ের দেবতা পাভায়োয়কশি-র বাগ্‌দত্তাকে কয়োট গোত্রভুক্ত বুড়ো বা সর্দ্দার যাদু মুখোশের সাহায্যে ছদ্মবেশে অধিগ্রহণ করলে ঝড়ের দেবতার হাতে তাকে মরতে হয়েছে। এই গল্পে রূপসী তার বর নির্বাচনে বিত্ত বা সম্পদের উপরেই গুরুত্ব দিয়েছে। তাই রূপসীকে বিবাহের ক্ষেত্রে বিত্তশালী উচ্চবর্গীয় পাভায়োয়কশি জয়ী হয়েছে, নিম্নবর্গীয় কয়োটের পরাজয় ঘটেছে। সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষা এবং শ্রেণি দ্বন্দ্বের বিষয়টি এই গল্পে স্পষ্টতা পেয়েছে।

একটি রেড ইণ্ডিয়ান লোককথা (কয়োটের কাণ্ডকারখানা)-য় কয়োটেকেই আবার আদি গোত্র পিতা বা বিধাতার আসন দেওয়া হয়েছে। কয়োট মানুষকে পশু এবং পশুকে মানুষ বানিয়ে দিচ্ছে। সাধারণ মানুষের বিদ্রোহ কয়োটের এই স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে। কয়োটকে তারা হত্যা করার জন্য যখন অস্ত্র তৈরিতে মনোযোগী তখন কয়োট তাদের অস্ত্রের দ্বারা কাউকে হরিণ, কাউকে বিড়াল, কাউকে আবার লেজ বিশিষ্ট মিংকে পরিণত করেছে। আর শক্তির আস্ফালন না করা কুকুরগুলোকে মানুষে পরিণত করেছে। একটি মদ্দা ও মাদী কুকুরকে মানব-মানবী করে বংশ বিস্তারের ধারা উন্মুক্ত করেছে। শিখিয়ে দিয়েছে শিকারের কৌশল। আর যাদেরকে মানুষ থেকে পশুতে পরিণত করেছে তারা উৎসর্গীকৃত মানুষের জীবনধারণের জন্য। কয়োটের এই কাণ্ডের মধ্যে গোষ্ঠীর অভ্যন্তরস্থ গোত্র ধারণার রূপটি স্পষ্ট। তাছাড়া সাধারণ বিদ্রোহী মানুষের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে স্বেচ্ছাচারী শক্তিমান কিভাবে বিদ্রোহ দমন করে এবং নির্বিরোধী গোষ্ঠীকে সামান্য পুরস্কারে কিভাবে শাসকের প্রতি অনুগত রাখা যায়— এই কাহিনী তারই রূপক। মানুষের মধ্যেকার পাশবিকতার জন্যই কয়োট যেন মানুষগুলোকে পশুতে পরিণত করেছে— সমাজের ভালো মানুষদের সেবায় লাগার জন্য। আর কুকুরের অন্তর্গত মানবিক রূপকে মনুষ্যত্বে রূপান্তরিত করে শিকারের শিক্ষা দিয়েছে এবং মানব-মানবীর মাধ্যমে বংশ বিস্তার করে লড়াকু গোষ্ঠীতে পরিণত করেছে। ভবিষ্যতের যোগ্য জাতিগোষ্ঠী গঠনের শিক্ষা ও পরিকল্পনা এই কাহিনীর

মোটিফের মধ্যে নিহিত। টাইলরের মতানুযায়ী উত্তর আমেরিকার ইণ্ডিয়ানদের লোককথার সঙ্গে অস্ট্রেলীয় লোককথার দারুণ মিল। আগুনের উপর সাধারণের অধিকার নিয়ে অস্ট্রেলীয় লোককথার সঙ্গে রেড ইণ্ডিয়ান লোককথার এমনি মিল পাওয়া যায়। রেড ইণ্ডিয়ানদের 'কেমন করে আগুন এল' লোককথাটি অনেকটা মিথের পর্যায়ে উন্নীত। ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীর আগুন চুরির কথা আছে রেড ইণ্ডিয়ানদের উক্ত কাহিনীটিতে। দাঁড় কাক কেন কালো, পেঁচার মুখ কেন কালো, দৌড়দার সাপ কেন কালো এসবই মিথের অংশ। কিন্তু একথা ঠিক যে মুষ্টিমেয় মানুষের কুক্ষিগত আগুন থেকে সাধারণ মানুষের প্রতি বঞ্চনা এবং বহু চেষ্টার পর আগুনের উপর অধিকার কায়েমের লৌকিক ইতিহাসের চূর্ণ অংশ লুকিয়ে আছে লোককথাটিতে। শেষ পর্যন্ত মাকড়সা বুড়ি উচ্চবর্গীয়দের কাছ থেকে আগুন চুরি করে অসভ্য সাধারণ্যে সভ্যতার আলো পৌছে দিয়েছে। একদিনের নয়, বহুদিনের আদিম অধিবাসীদের survive করার ঘটনারেণু নিয়ে লোককথাটি গড়ে উঠেছে। এইরকম অধিকার আদায়ের কাহিনী 'ঝুঁটির আগুন ঘাসের বনে' (সংকলক ও অনুবাদক- দিব্যজ্যোতি মজুমদার) নামক অস্ট্রেলীয় লোককথাটিতে পাই। সেখানে লালঝুঁটি কাকাতুয়া গোত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল আগুনের ব্যবহার। গোষ্ঠীর শিকার করা ক্যাঙারুর মাংসের ভাগ নিয়ে আড়ালে গিয়ে লালঝুঁটি কাকাতুয়া একদিন শুকনো ডালপালায় নখদিয়ে ঘসে শুকনো ঘাসে আগুন জ্বালিয়ে মাংস রান্না করতে লাগল। বঞ্চিত সাধারণ কাকাতুয়াদের মধ্যে থেকে অবশেষে একটি ছানা-কাকাতুয়া লালঝুঁটি কাকাতুয়ার রন্ধনশালা থেকে আগুন চুরি করে এনে দিল। সেই আগুনে পাতিহাঁসের ঘরবাড়ি যখন জ্বলতে লাগল তখন সে ডানার ঝাপটে জল ছিটিয়ে আগুন নিভিয়ে দিল। গাছের ডালে এবং ঘাসে হাত দিয়ে ঘষে আবার তারা আগুন জ্বালাতে সমর্থ হল। সুতরাং তারা আগুন জ্বালানো ও আগুন নেভানো দুই-ই শিখলো।

আমরা দেখেছি জাতির অভ্যন্তরে বিধি-বিধান যত শিথিল হয়েছে গোত্রপ্রথা ততই সভ্যতার অনুকূলে এগিয়ে গেছে। একটি অস্ট্রেলীয় লোককথায় দেখি কালো টিকটিকি গোত্রের সংগে সাদা টিকটিকি গোত্রের বিবাহ নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও কালো টিকিটিকি মহিলা উলাকে সাদা টিকটিকি উইম্‌বো বলপ্রদানের মাধ্যমে বিয়ে করেছে। কালোদের উপরে সাদাদের অত্যাচারের ইঙ্গিত এখানে রয়েছে। সর্দার এই বিয়ের বিরোধিতা করলেও কালো টিকটিকিদের বিরুদ্ধে উইম্‌বো বুদ্ধি ও কৌশলের জোরে একাই লড়াই করেছে। বর্ণবিদ্বেষ, গোত্রধর্মী জল-অচল বিবাহ পদ্ধতি এবং সংকীর্ণ বিধিবদ্ধ গোত্র জীবনকে সে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিয়েছে। বুদ্ধি ও বলে ব্যক্তি শাসনের ইঙ্গিতও এখানে আছে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, পশুকথাগুলোতে মানুষের যাবতীয় রহস্য ও বিস্ময়, সৃষ্টি ও স্রষ্টা, সমাজ ও সভ্যতার বিবর্তায়ণ সম্পর্কে গোত্রগত, গোষ্ঠীগত এবং শ্রেণীগত চিন্তাভাবনারও প্রকাশ ঘটেছে। সেক্ষেত্রে তাদের ধর্মীয় সংস্কার, ট্যাবু-টোটেম-মানার

প্রতি বিশ্বাস এবং নানান ধরনের যাদু ক্রিয়ারও প্রকাশ ঘটেছে। আদিম সমাজ-সভ্যতার মূল থেকে উত্থিত মৌখিক সূত্রেই এইসব কথারত্ন ছড়িয়ে আছে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন গোত্র ও গোষ্ঠী সমন্বিত মানুষের ও পরিমার্জিত তথা মানব সভ্যতার বিভিন্ন স্তরীয় জীবন কথায়।

তথ্যসূত্রাবলী

১) ঠাকুরমার ঝুলি— দক্ষিণরঞ্জন মিত্র মজুমদার

২) ঠাকুরদাদার ঝুলি-- দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার

৩) বাংলার লোকসাহিত্য— আশুতোষ ভট্টাচার্য-- ৪র্থ খণ্ডঃ কথা। ক্যালকাটা বুক হাউস।

৪) বাংলার লোককথা— মুহম্মদ আয়ুব হোসেন। পুস্তকবিপণি। কোলকাতা।

৫) বাংলা লোককথার টাইপ ও মোটিফ ইনডেক্স্— দিব্যজ্যোতি মজুমদার। অনুষ্টুপ। জানুয়ারী ১৯৯৩

৫) নিম্নবর্গের ইতিহাস— গৌতম ভদ্র/ পার্থ চট্টোপাধ্যায়। আনন্দ। ৪র্থ মুদ্রণ। ডিসেম্বর ২০০৪

৬) সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ — রেবতী বর্মন। ন্যাশনাল বুক এজেন্সী। ৬ষ্ঠ সংস্করণ ১৯৯০।

৭) বাংলার সামাজিক ইতিহাস— অতুল সুর

৮) এনসিয়েন্ট সোসাইটি (প্রাচীন হেনরী মর্গ্যান)— লুইস হেনরী মর্গ্যান সম্পা— অসীম চট্টোপাধ্যায়। ১৯৪০, ৩য় সং দীপায়ন। কোলকাতা।

৯) সামাজিক সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান— ডঃ সুমহান বন্দ্যোপাধ্যায়। পারুল প্রকাশনী, কোলকাতা, ২০০৯.

১০) সাঁওতালী ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস— ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে। পরিবেশক— সুবর্ণরেখা। কোলকাতা। ৩য় সং, ২০০৮।

১১) সাঁওতালী ছোটগল্পের ভূমিকা— সুহৃদ কুমার ভৌমিক। মারাং বুরু প্রেস। মেছেদা মেদিনীপুর। জানুয়ারী- ২০০০

১২) অস্ট্রেলিয়ার লোককথা— সম্পা— দিব্যজ্যোতি মজুমদার। করুণাময়ী। জানু· ২০০৭

১৩) রেডইণ্ডিয়ান রূপকথা— অনুবাদ ও সম্পা . পল্লব সেনগুপ্ত। পুস্তকবিপণি। আগস্ট ১৯৮৪

১৪) ডেনমার্কের লোককথা— বরুণকুমার চক্রবর্তী। দে বুক স্টোর্স। কোলকাতা, নভেঃ ২০০৬

১৫) জিপসী লোককথা— নিখিল সেন। সাহিত্যলোক। কোলকাতা। মার্চ ১৯৮২

১৬) টুনটুনির বই— উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। ক্যালকাটা পাবলিশার্স।

মুণ্ডাদের লোককাহিনী : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

মুহম্মদ আবদুল জলিল

বাংলাদেশে অস্ট্রিক নৃ-গোষ্ঠীভুক্ত যেসব আদিবাসী সম্প্রদায় রয়েছে তাদের অন্যতম হচ্ছে মুণ্ডা। এই শব্দটির ব্যুৎপত্তি ঘটে মুণ্ড তথা মস্তক থেকে।[১] অনুমান করা হয় মুণ্ডারা ক্ষাত্র শক্তির দিক থেকে অন্যান্য অস্ট্রিক নৃ-গোষ্ঠীর তুলনায় ছিল অনেকটাই প্রাগ্রসর। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় তিরিশ হাজার মুণ্ডার নিবাস রয়েছে। ১৯৮৫ সালে 'রাজশাহী আদিবাসী উন্নয়ন সংস্থা' মুণ্ডাদের উপর যে জরিপ সম্পন্ন করে তা থেকে শুধু বৃহত্তর রাজশাহী জেলাতেই ১৩১১০[২] জন মুণ্ডার পরিচয় লাভ করা যায়। এর সঙ্গে রয়েছে উত্তরবঙ্গের ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া, পাবনা, সিরাজগঞ্জ ও বৃহত্তর সিলেট জেলার চা-বাগানে কর্মরত আরও কিছু মুণ্ডা। এদের সংখ্যা সঠিকভাবে নির্ণীত হয়নি। অনুমানের ভিত্তিতে যদি এদের সংখ্যা ৫০০০ ধরে নেওয়া যায় তাহলে এদের সামগ্রিক সংখ্যা উপনীত হয় প্রায় আঠারো হাজারে। ম্যালথাসের থিওরি অনুসারে ২৫ বছরে যে কোন জনগোষ্ঠীর সংখ্যা দ্বিগুণ হয়। এ থেকেই বাংলাদেশের মুণ্ডাদের বর্তমান সংখ্যা ৩৬০০০ অথবা তারও বেশি বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে মুণ্ডা ছাড়া অস্ট্রিক নৃ-গোষ্ঠীর আর যে সব আদিবাসী জনগোষ্ঠীর পরিচয় পাওয়া যায় তারা হল সাঁওতাল, ওরাওঁ, মাহালী, মালপাহাড়ি, তুড়ি, কোল, শিং রাজোয়ার, কোড় প্রভৃতি। অবিভক্ত ভারতে বৃহত্তর দিনাজপুর জেলার সঙ্গে ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকে বিহারের পূর্ণিয়া জেলার ছিল ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। এই পথ ধরেই বিহারের হাজারীবাগ সাঁওতাল পরগণা নাগপুর থেকে উপরিউক্ত অস্ট্রিক জনগোষ্ঠীর আগমন ঘটে উত্তরবঙ্গে নানাসূত্রে। বিশেষ করে উত্তরাঞ্চলের অরণ্য অধ্যুষিত জমিদার শ্রেণী অরণ্য পরিষ্কার করে কৃষি জমি তৈরির উদ্দেশ্যে নাগপুর সহ প্রভৃতি অঞ্চল থেকে আদিবাসীদের এ অঞ্চলে নিয়ে আসে। এছাড়া নীল চাষের জন্য নীলকর সম্প্রদায় এবং রেললাইন স্থাপনের জন্য রেল কোম্পানি অস্ট্রিক নৃ-গোষ্ঠীর আদিবাসীদের এ অঞ্চলে কর্মসূত্রে আনয়নের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। এর প্রমাণ মেলে এ অঞ্চলের আদিবাসীদের সঙ্গে ভারতে অবস্থানরত আদিবাসীদের আত্মীয়তার বন্ধন থেকে।

অর্থনৈতিক সংকট, সমাজ বিবর্তনের অনিবার্য প্রভাবে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের অস্ট্রিক নৃ-গোষ্ঠীর আদিবাসীরা ধর্মান্তরিত হতে বাধ্য হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকায়

রয়েছে মিশনের অর্থপুষ্ট কতিপয় বেসরকারি সংস্থা। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, এ অঞ্চলে মুণ্ডারা স্রোতের অনুকূলে তাদের সনাতন ধর্মকে বিসর্জন দেয়নি। এর ফলে তারা মিশন পরিচালিত বেসরকারি সংস্থাগুলোর নিকট থেকে সর্বদাই বৈরী আচরণের সম্মুখীন হচ্ছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং আর্থিক দিক থেকে তারা অন্যান্য আদিবাসী জনগোষ্ঠী থেকে পশ্চাৎপদ অবস্থায় বিরাজমান রয়েছে।

আদিবাসীরা সংস্কৃতি পরায়ণ। তাদের পারিবারিক ও সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠানে নৃত্যগীতের পাশাপাশি হাড়িয়া পানের মহোৎসব পরিলক্ষিত হয়। এর সঙ্গে মৌখিক সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য দিক লোককাহিনী, ছড়া, প্রবাদ-প্রবচন, ধাঁধার মত ধারা সমূহের সংরক্ষণ ও পরিবেশনা অসামান্য অবদান রেখে চলেছে। মুণ্ডারা সাম্প্রতিক কালে যে ভাষায় কথা বলে তা অনেকটাই বাংলা ভাষার কাছাকাছি। কতিপয় বিশেষ্য ও সর্বনাম পদে উর্দু ও হিন্দির প্রয়োগ ঘটলেও তাতে বাংলা ভাষী জনগণের কাছে দুর্বোধ্য মনে হয় না। এ কারণে তাদের কথিত ভাষাকে শাদ্‌রী হিসেবে চিহ্নিত করাই শ্রেয়ঃ। বাংলাদেশের মুণ্ডা সম্প্রদায়ের মধ্যে অসংখ্য লোককাহিনীর প্রচলন রয়েছে। এর কারণ ভাদ্র মাসের অবসর কালীন মুহূর্তে নৈশকালে কিছুদিন পূর্বেও মুণ্ডা সমাজপতিরা নানা বয়সের মানুষকে নিয়ে বিশেষ বিশেষ আঙিনায় সমবেত হত। সমাবেশে গল্প কথকেরা একের পর এক নানা ধরনের গল্প বলে যেত। সম্প্রতি এক্ষেত্রে কিছুটা হলেও ভাটা পড়েছে। টেলিভিশন মুণ্ডা প্রধান গ্রামে কিছুটা হলেও বিনোদনের বিকল্প মাধ্যমে উপনীত হয়েছে। এখন আর ভাদ্রের সন্ধ্যায় গল্প বলার আসর বসেনা। সে আসর বসে টেলিভিশনকে কেন্দ্র করে। অদূর ভবিষ্যতে যান্ত্রিক সংস্কৃতির অনিবার্য প্রভাব যে আদিবাসী সংস্কৃতি লালনে বিপর্যয় ঘটাবে সেদিন খুব দূরে নয়।

পৃথিবীর তাবৎ লোককাহিনীর সিংহভাগ অধিকার করে আছে পশু কাহিনী নিয়ে। বাংলাদেশে প্রচলিত মুণ্ডা সমাজে প্রচলিত লোককাহিনীও এর ব্যতিক্রম নয়। মুণ্ডাদের লোককাহিনীতে সভ্যতার প্রথম স্তরের এমন অনেক বর্ণনা উঠে এসেছে যা নৃতাত্ত্বিক দিক থেকে অসামান্য বলে বিবেচিত হয়। একসময় যে আদিবাসী সমাজে নরমাংস ভক্ষণের রীতি ছিল এরও প্রমাণ পাওয়া যায় মুণ্ডা সমাজে প্রচলিত দু-একটা কাহিনীর থেকে। এ প্রসঙ্গে দু একটা গল্পের উল্লেখ করলেই আমার কথার যৌক্তিকতা প্রতীয়মান হবে।

এক. নরখাদক পাঁচ ভাই

এক মোড়লের ছিল পাঁচ ছেলে আর এক মেয়ে। ভাই বোনদের মধ্যে ছিল মধুর সম্পর্ক। ভাইয়েরা কাজের জন্য যেখানেই যেত ফেরার সময় বোনের জন্য কিছু না কিছু উপহার সামগ্রী নিয়ে আসত। বোনও ভায়েদের জন্য শাক তুলতো, মাছ ধরতো

আর সে গুলো ভালোভাবে রান্না করে রাখতো। একদিন বোন ক্ষেত থেকে শাক তুলে এনে কাটতে বসে। হঠাৎ তার একটা আঙুল কেটে সব শাকে রক্ত লেগে যায়। সে পুকুরের ঘাটে গিয়ে ভালো ভাবে শাক পরিষ্কার করে এবং উত্তমরূপে রান্না করে। ভাইয়েরা কাজ থেকে ফিরে এসে শাক-ভাত খেতে থাকে। তারা তো আগেও শাক খেয়েছে কিন্তু আজকের মত সুস্বাদু রান্না শাক তারা কখনো খায়নি। ভাইয়েরা বোনকে বারবার জিজ্ঞেস করে, আজ সে কি দিয়ে শাক রান্না করেছে। বোন সহজেই উত্তর দেয় অন্য দিনে যেভাবে রান্না করে আজও সে ভাবেই রান্না করেছে। এতে ভাইয়েরা সন্তুষ্ট হতে পারেনা। ভাইদের বারবার প্রশ্নের উত্তরে বোনটি বলে, আজকে শাক কাটার সময় তার হাত কেটে গিয়েছিল এবং শাক রক্তাক্ত হয়ে গিয়েছিল। শাক পরিষ্কার করা হয়েছিল এবং আগের দিনের মত রান্না করা হয়েছিল। ভাইয়েরা বুঝতে পারে শাকের ভিন্ন স্বাদ হওয়ার কারণ মূলত বোনের হাতের রক্ত। এরপর পাঁচ ভাই বসে ভাবে বোনকে কিভাবে হত্যা করা যাবে এবং তার রক্ত খাওয়া যাবে। তারা একদিন কাজে যাওয়ার সময় বোনকেও সঙ্গে নিয়ে যায়। তারা প্রবেশ করে এক গভীর জঙ্গলে। এরপর সিদ্ধান্ত নেয় বোনকে হত্যা করার। এতে বিরোধিতা করে ছোট ভাই। সে কোনক্রমেই বোনকে হত্যা করার সঙ্গে যুক্ত হবে না। এবং তার মাংসও খাবে না। বড় ভাইয়েরা তার কথায় গুরুত্ব না দিয়ে বোনকে হত্যা করে এবং মাংস খাওয়ার আয়োজন করে। এদিকে ছোট ভাই চলে যায় নদীতে স্নান করতে। সে নদী থেকে কিছু কাঁকড়া ধবে আনে এবং সেই কাঁকড়া রান্না করে। বড় চার ভাই যখন বোনের মাংস খায় ছোট ভাই তখন কাঁকড়া খায়। এরপর অন্যান্য ভাই যখন বাড়ি ফেরে সে সময় ছোট ভাই বোনের শরীরের হাড্ডি ও উচ্ছিষ্ট মাংস জঙ্গলের পাশে পুকুরে ফেলে দেয়। কিছুদিন পরে সেই পুকুরের মধ্যে গজিয়ে উঠে একটা ডালিম গাছ। তাতে ধরে অসংখ্য ডালিম। সে ডালিম দেখতে যেমন সুন্দর তেমনই তার স্বাদ। বড় চাব ভাই পুকুরে নেমে ডালিম পাড়ার চেষ্টা করে। আর তখনই ডালিম ভাইদের হাতের নাগালের ঊর্ধ্বে উঠে যায়। আর সঙ্গে সঙ্গে গান ধরে,

'ছুয়ো না ছুঁয়ো না দাদা দুশমনেরো ডালোবে।'

চার ভাই ডালিমের মুখে এ গান শুনে অবাক হয়ে যায়। অবাক হয় না শুধু ছোট ভাই। সে বড় ভাইদের বুঝিয়ে বলে, এ ডালিম সাধারণ ডালিম নয়। এ ডালিম আমার বোনের রক্ত-মাংসে তৈরি। তোমরা তো বোনের দুশমন তাই বোনের আত্মা ডালিমের মধ্য থেকে তোমাদের দুশমন হিসেবে ঘৃণা করে।

উল্লেখ্য যে এরকম একটা গল্প স্থান পেয়েছে আমার লেখা 'উত্তর বঙ্গের আদিবাসী লোকজীবন ও লোকসাহিত্য : ওরাওঁ' গ্রন্থে। সে গল্পে ভাইয়ের সংখ্যা উল্লিখিত হয়েছে সাতটি। সেখানেও ছোট ভাই বড় ভাইদের সাথে দ্বিমত পোষণ করে। সেও বোনের

মাংস না খেয়ে কাঁকড়া খায়। তার বোনের হাড্ডি ও উচ্ছিষ্ট মাংসগুলো একটি জায়গায় পুঁতে রাখে। তা থেকে জন্ম নেয় একটি তরলা বাঁশ। সেই বাঁশ দিয়ে একজন ভিখারি তৈরি করে একটি বাঁশি। ভিখারি যখন বাঁশি বাজায় সে বাঁশি থেকে যে সুব উঠে তা হল ছয় ভাইয়ের নিষ্ঠুর কাহিনী। এ দুটো গল্প থেকে দুটো মোটিফের সন্ধান মেলে, এর একটি হল রক্ত খেকো ভাই, অপরটি হল আত্মার পুনরাগমন।

দুই: সিংহ ও খরগোশ

এক জঙ্গলে ছিল এক অতি বৃদ্ধ সিংহ। সে তার ডেরার বাইরে আসতে পারে না। কিন্তু সে তো বনের রাজা, অন্য সবাই খাবে সে খেতে পারবে না এতো হতে পারে না। একদিন সে বনের সব পশুকে ডাকল তার ডেরার সামনে। সবাইকে বলল, তোমরা একেকদিন একজন আমার সামনে আসবে আমি তোমাদের খেয়ে বেঁচে থাকব। পশুরা তো রাজার কথার বিরোধিতা করতে পারে না। তারা পশুরাজের কথায় রাজি হয়ে গেল। একেকদিন একেক পশু সিংহরাজার কাছে উপস্থিত হয়। আর বৃদ্ধ সিংহ তার ঘাড় ভেঙ্গে মটমট করে খেয়ে ফেলে। শেষে পালা পডল এক খরগোশের। সে তো সহজে জীবন দিতে রাজি নয়। সে পথে যায় আর ভাবতে থাকে কিভাবে সিংহ তাকে খেয়ে ফেলবে। এভাবে খরগোশের অন্তরাত্মা শুকিয়ে যায়। পিপাসায় ছটফট করতে থাকে। পথের ধারেই দেখতে পায় একটা কূপ। কূপের দিকে যখন তাকায় তখন দেখে আর একটি খরগোশ পানির দিকে তাকিয়ে আছে। খরগোশের ধারণা হয় নিশ্চয়ই একটি খরগোশ পানি খেতে গিয়ে কূপে আটকে গেছে। এদিকে সিংহ রাগে গরগর করতে থাকে খরগোশ কেন আসছে না, সে ভাবনায় সে অস্থির হয়ে উঠে। যখন সিংহের সামনে খরগোশ হাজির হয় তখন তার বিলম্বে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করে। খরগোশ উত্তর করে, রাজামশাই আমি আগেই আসতে পারতাম কিন্তু কূপের মধ্যে পড়ে থাকা এক খরগোশ আমাকে আসতে বারণ করে। এ কথা শুনে সিংহ তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে। বলে, চল দেখে আসি কোন খরগোশ তোকে বাধা দিয়েছে। সিংহ খরগোশের পেছনে পেছনে আসতে থাকে। কূপের কাছে এসেই খরগোশ নিচের দিকে তাকিয়ে সিংহকে দেখায় ওই দেখো খরগোশ বসে আছে। ওই আমাকে বাধা দিয়েছে। একথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই সিংহ রেগে কুয়ার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সিংহের হাত থেকে এমনিভাবে খরগোশ মুক্তি পেয়ে চলে আসে অন্যান্য জীবজন্তুর কাছে। তারা তো খরগোশকে দেখে হতবাক। সে কিভাবে সিংহের হাত থেকে বেঁচে আসে সে কথা খুলে বলে। অন্যান্য পশু তখন খরগোশের বুদ্ধির প্রশংসা করে।

এ গল্পে দুটো মোটিফের প্রমাণ পাওয়া যায়। একটি হল হিংস্র প্রাণীরা সহজে রাগন্বিত হয় অপরটি হল ছোট প্রাণীরা বুদ্ধির জোরে সবলের হাত থেকে নিষ্কৃতি পায়।

তিন : শেয়াল ও কাক

রাস্তার ধারে বসে একটা ছোট্ট ছেলে মুরগির মাংস খাচ্ছিল। মাংস দেখে কাকের খুব লোভ হয়। সে মাংসের টুকরোটি পাওয়ার জন্য নানা বুদ্ধি আঁটতে থাকে। সে বাচ্চাটির প্রশংসা করতে থাকে। এক পর্যায়ে তার হাত থেকে মাংসের টুকরোটি পড়ে যায়। কাক ছোঁ মেরে টুকরোটি নিয়ে এক গাছের ডালে গিয়ে বসে।

ঐ সময় ঐ পথ দিয়ে যাচ্ছিল এক শেয়াল। শেয়ালের ইচ্ছা কাকের মুখ থেকে মাংসটি নিয়ে খাওয়া। সেও কাকের খুব প্রশংসা করতে থাকল। কিন্তু কাক শেয়ালের কোনো কথাতেই কান দেয় না। সে মাংস খেতেই থাকে। কিন্তু শেয়াল তো পরাজিত হওয়ার পাত্র নয়, ছলে বলে কৌশলে সে তার বাসনা চরিতার্থ করতে চায়। এক পর্যায়ে শেয়াল কাকের প্রশংসা না করে দুর্নাম করতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে কাক ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে আর কা কা করে ডাকতে শুরু করে। আর অমনি তার মুখ থেকে মাংস পড়ে যায়। শেয়াল কাককে বলতে থাকে,

দুষ্ট লোকের মিষ্টি কথা
ঘনিয়ে বসে কাছে,
কথা দিয়ে কথা নিয়ে
প্রাণ বধিবে শেষে।

এই গল্পে একটি মাত্র মোটিফের সন্ধান মেলে তাহল, দুষ্ট লোকেরা শেষে দণ্ডিত হয়।

চার : মোড়ল ও বোকা রাখালের গল্প

এক মোড়লের ছিল সুন্দর একটা ঘোড়া। ঘোড়াটা দেখাশুনা করত ১২ বছর যাবৎ এক রাখাল। সে ঘোড়াকে খুবই আদর যত্ন করত ঘোড়াও তার খুব অনুগত ছিল। এক পর্যায়ে রাখালটার মনে হল সে আর মোড়লের কাছে থাকবে না। সে নিজে ঘোড়া কিনবে এবং ঘোড়ার লালনপালন করবে। একদিন সে মোড়লের কাছে তার ইচ্ছার কথা জানায়। মোড়ল রাখালের প্রাপ্য ১২ বছরের বেতন দিয়ে বিদায় করে দেয়। রাখাল মোড়লের কাছে জানতে চায় ঘোড়া কোথায় কিনতে পাওয়া যাবে। মোড়ল ছিল খুব বুদ্ধিমান। সে রাখালকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। মোড়ল বলে ঘোড়ার বাচ্চা তো পাওয়া যাবে না। কিনতে হবে ঘোড়ার ডিম। সে ডিম থেকে ঘোড়ার বাচ্চা হবে। রাখাল জানতে চায় ঘোড়ার ডিম কোথায় পাওয়া যাবে। মোড়ল হাসতে হাসতে একটা হাটের নাম বলে। রাখাল খুব খুশি। সে মোড়লের কাছ থেকে পাওয়া টাকা নিয়ে হাটে যায় ঘোড়ার ডিম কিনতে। সে গোটা হাটে ঘোড়ার ডিম খুঁজতে থাকে। কিন্তু কেউই ডিমের সন্ধান দিতে পারে না। রাখাল নিরাশ হয়ে বাড়ির

দিকে ফিরতে থাকে। হঠাৎ হাটের একপ্রান্তে একটা বুড়িকে দেখতে পায়। তার সামনে ছিল তিনটা সাদা রঙের কুমড়ো। রাখাল বুড়িকে জিজ্ঞেস করে, তোমার কাছে কি ঘোড়ার ডিম আছে। বুড়ি বুঝতে পারে এ এক বোকা রাখাল। সে বলে, আছে।এই তিনটিই তো ঘোড়ার ডিম। সে কুমড়া তিনটা দেখিয়ে বলে, একটা বাচ্চা দেবে আড়াই দিনে, আর একটা বাচ্চা দেবে ৫ দিনে আরেকটা ১০ দিনে। সে কোনটা চায়?

রাখালের ইচ্ছা আড়াই দিনে ঘোড়ার বাচ্চা হোক। সে একটি ডিম নিয়ে রওয়ানা দেয়। পথে যেতে রাখালের পায়খানার বেগ পায়। সে পথের পাশে কুমড়োটি রেখে ঝোপের মধ্যে যায় পায়খানা করার জন্য। ওদিকে একটি শেয়াল সে পথ দিয়ে যাচ্ছিল। সে কুমড়োটিকে দেখে খাবার বস্তু মনে করে কামড় দেয়। এতে কুমড়ো যায় ফেটে। অমনি রাখালেরও নজর পড়ে সেদিকে। শেয়ালকে দেখে সে মনে করে এইটিই ঘোড়ার বাচ্চা। সে তাড়াতাড়ি উঠে শেয়াল ধরতে যায়। শেয়াল দৌড়ে পালায়। ঘোড়ার বাচ্চা পালিয়ে যাচ্ছে ভেবে সেও পেছন পেছন ছুটতে থাকে। ছুটতে ছুটতে সে এক গভীর বনের মধ্যে ঢুকে পড়ে। তারপর শেয়ালটিকে হারিয়ে ফেলে।

ঘোড়ার বাচ্চা হারিয়ে রাখালের মন খারাপ। সে বনের মধ্যে একটা জায়গায় বসে থাকে। এ সময় টিপটিপ করে বৃষ্টি আরম্ভ হয়। বৃষ্টির মধ্যে এক বাঘ শিকার ধরার জন্য বের হয়। বাঘটি যখন রাখালের কাছে আসে। রাখাল তখন এক লাফে বাঘের পিঠে উঠে বসে। রাখালের তো আগে থেকেই ঘোড়ায় উঠা অভ্যাস। সে ভালোমতো বাঘের দুই কান ধরে পিঠে বসে থাকে। বাঘ সারা বন ছুটতে থাকে। কিন্তু কোনোভাবেই রাখাল বাঘের পিঠ থেকে পড়ে না। এভাবে সারারাত ছোটার পর যখন সকাল হয়ে আসে তখন রাখাল মনে করে দিনের আলোতে বাঘ তো তাকে চিনে ফেলবে। তাই বাঘ যখন একটি বট গাছের নিচ দিয়ে যাচ্ছিল, রাখাল বট গাছের লই ধরে ঝুলে পড়ে। বাঘের ছোটা থামে না। সে ছুটতে ছুটতে বনের এক প্রান্তে চলে যায়। সেখানে দেখা হয় এক শেয়ালের সাথে। শেয়াল জিজ্ঞাসা করে মামা কী হয়েছে? অমন করে দৌড়াচ্ছ কেন? বাঘ বলে, পালাও ভাগনে, পালাও। বনে টিপটিপানি এসেছে। সারা রাত আমাকে সে দৌড় করিয়েছে, পালাও তাড়াতাড়ি পালাও।

শেয়াল বাঘের কথা বিশ্বাস করে না। সে বলে, দেখি কেমন টিপটিপানি।

এই বলে শেয়াল যখন ঐ বটগাছের নিচে আসে তখনও রাখাল উপরে ঝুলন্ত। সেখান থেকেই শেয়ালকে দেখে সে মনে করে এই তো ওর ঘোড়ার বাচ্চা। ঘোড়ার বাচ্চা যাতে পালিয়ে না যায় সে কারণে, সে লই ছেড়ে নিচে শেয়ালের পিঠের উপর পড়ে। শেয়াল চিৎকার করতে করতে বনের বাইরে চলে যায়। সেখানে দেখা হয় এক খেঁকশেয়ালের সাথে। খেঁকশেয়াল জিজ্ঞাসা করে, ভাই দৌড়াও কেন? শেয়াল বলে পালাও পালাও বনে উপরচাপ এসেছে। খেঁকশেয়াল বুঝতে পারে না উপরচাপ কী? সে উপরচাপ দেখতে যায়। খেঁকশেয়াল যখন রাখালের কাছে আসে রাখাল তখন তার

লেজ ধরে ঘুরাতে থাকে। এভাবে ঘুরাতে ঘুরাতে সে যখন ছেড়ে দেয় খেঁকশেয়াল তখন ছুটতে ছুটতে চলে যায় বনের অন্য প্রান্তে। আর অন্যদের বলে, বনে ঘূর্ণিপাক এসেছে, সবাই পালাও। ওদিকে রাখালও বুঝতে পারছে না বার বার তার সাথে এসব কী হচ্ছে। সে ভয় পেয়ে যায় এবং বন ছেড়ে বের হয়ে আসে।

এভাবে রাখালও ভালো থাকে, বনের পশুরাও ভালো থাকে।

পাঁচ : সাপের সাথে মানুষের বিয়ে

এক গর্ভবতী মেয়ে গেছে বনে। বাঁশের কুরোল সংগ্রহ করার জন্য। সেখানে অনেকগুলো কুরোল দিয়ে বোঝা বাঁধার পর সে আর বোঝাটি মাথায় তুলতে পারছিল না। তাই সে বনের পশু-পাখিদের কাছে সাহায্য চায়। তখন এক সাপ এগিয়ে আসে তাকে সাহায্য করার জন্য। সাপ মহিলাটিকে বলে, আমি তোমাকে সাহায্য করলে তুমি আমাকে কী দেবে? মহিলাটি বলে, আমার ছেলে হলে তোমার সাথে বন্ধুত্ব করিয়ে দেব, আর মেয়ে হলে তোমার সাথে বিয়ে দেব।

মহিলাটির যমজ সন্তান হয়। একটি ছেলে একটি মেয়ে।

একদিন সাপটি ঐ বাড়িতে এলে মেয়েটি সাপ দেখে চিৎকাব করে ওঠে। মেয়েটির চিৎকারে মা এগিয়ে এসে বলে, ওকে ভয় কী, ওতো জামাই।

মেয়েটির সাথে সাপটির বিয়ে হয়। তারপর তারা চলে যায়। যাবার পথে একটি নদী পার হবার বেলা মেয়েটি বলে, আমি এতো বড় নদী পার হবো কী করে?

অবশেষে সাপ সামনে যায় আর মেয়েটি সাপের লেজ ধরে নদী পার হয়। তারপর সাপের দেশে গিয়ে তারা সুখে সংসার করতে থাকে।

একদিন মেয়েটির ভাই, মেয়েটির বাড়িতে আসে। মেয়েটি খাইয়ে-নাইয়ে তাকে লুকিয়ে রাখে। রাতে সাপ ফিরে এসে মেয়েটিকে বলে, মানুষের গন্ধ আসে কোথা থেকে? মেয়েটি বলে, আমি ছাড়া এখানে আর মানুষ আসবে কোথা থেকে?

সাপ মেয়েটির কথা বিশ্বাস করে।

পরের দিন সাপটি আবার বলে, মানুষের গন্ধ আসছে কোথা থেকে?

মেয়েটি আবার একই জবাব দেয়।

এভাবে কয়েকদিন অতিবাহিত হয়। তারপর মেয়েটি নিরাপদেই তার ভাইকে বাড়িতে ফেরৎ পাঠায়।

এই গল্পটির বিশেষত্ব হল সাপের সাথে মানুষের সখ্যতা। তাছাড়া সমাজে এমন অনেক মানুষ আছে যারা সাপের মতোই ভয়ঙ্কর। গল্পে সাপটি ব্যবহৃত হয়েছে রূপক অর্থে।

তথ্যসংকেত :

১. Sarat Chandra Roy The Mundas and their Country Calcutta, 1912. Page-62

২ মুহম্মদ আবদুল জলিল : বাংলাদেশের সাঁওতাল সমাজ ও সংস্কৃতি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯১, পৃষ্ঠা-৯৬

যাদের কাছ থেকে গল্পগুলো সংগৃহীত :

১। নারায়ণচন্দ্র মুণ্ডা, পিতা : রবীন্দ্রনাথ মুণ্ডা, বটতলী, গোদাগাড়ি, রাজশাহী (গল্পটি সে তার দাদুর কাছে শুনেছে। দাদুর নাম : আশুতোষ মুণ্ডা)

২। অঞ্জলি মুণ্ডা, পিতা, : সুকচাঁন মুণ্ডা, বটতলী, গোদাগাড়ি, রাজশাহী (গল্পটি সে তার মায়ের কাছে শুনেছে।)

৩। অঞ্জলি মুণ্ডা, পিতা : সুকচাঁন মুণ্ডা, বটতলী, গোদাগাড়ি, রাজশাহী (গল্পটি সে তার দাদুব কাছে শুনেছে। দাদুর নাম : অভিনন্দন মুণ্ডা)

৪। অঞ্জলি মুণ্ডা, পিতা : সুকচাঁন মুণ্ডা, বটতলী, গোদাগাড়ি, রাজশাহী (গল্পটি সে তার মায়ের কাছে শুনেছে।)

লেপচা জনজাতির লোককথা

হরেন ঘোষ

পার্বত্য অঞ্চলের অন্যতম জনজাতি লেপচা। লেপচাদের সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাওয়া কঠিন। নৃতত্ত্ববিদ ঐতিহাসিক ও সমাজবিজ্ঞানীরা দীর্ঘকাল ব্যাপী গবেষণা করেছেন কিন্তু সর্বার্থে সার্থক হননি। কারণ কোন লিখিত তথ্য পাওয়া যায়নি। অধিকাংশ তথ্যই অনুমান-নির্ভর। তাছাড়া অধিকাংশ নির্ভর যোগ্য সূত্রই তিব্বতীরা ধ্বংস করেছে। সেজন্যে লোককথা, লোকসাহিত্য ও প্রচলিত কাহিনীর ওপরই নির্ভর করতে হয়।

সিকিমের আদি-অধিবাসী লেপচা। এই অঞ্চলকে বলা হয় পবিত্রভূমি, যেখানে অসীম পবিত্রতা বিরাজমান। যদিও এদের সংখ্যা ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে তথাপি নিজস্ব সংস্কৃতি, লোকাচার, সযত্নে রক্ষা করে চলেছে। তিন শতাব্দী আগে তিব্বতীদের সঙ্গে এদের প্রথম সংঘাত হয়। পরবর্তীকালে নেপালীদের সঙ্গে।

পশ্চিমবঙ্গের তপশীল তালিকাভুক্ত ৩৮টি আদিবাসীদের মধ্যে লেপচা অন্যতম। সিকিমেও তাই। বর্তমান সিকিম গঠনের আগে সিকিমের আয়তন অনেক বড় ছিল। দীর্ঘদিন তারা লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিল। সমাজবিজ্ঞানীরাও তাদের দিকে দৃষ্টি দেননি। ভাষাগত বিভাজন, পেশাগত বিভাজনের ক্ষেত্রে তাদের উল্লেখ পর্যন্ত নেই। কখন য়ুরোপীয়রা প্রথম গভীর অরণ্য অঞ্চলে অভিযান শুরু করে তখন তাদের আবিষ্কার করে। তিব্বতীরা প্রথম তাদের অঞ্চলে অনুপ্রবেশ করে। আজ আমরা লেপচাদের সম্পর্কে যতটুকু জানতে পারি তা একমাত্র য়ুরোপীয় পর্যটক ও সাংবাদিকদের দৌলতে। General G. B. Manwaring একজন লেপচা রমণীকে বিবাহ করেন এবং দীর্ঘকাল লেপচাদের সঙ্গে বসবাস করেন। তিনি লিখেছেন লেপচা জাতি ও প্রথাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া বর্বরোচিত কাজ হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ পর্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে এদের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয় নি।

লেপচা শব্দটি কিভাবে এল? এরা নিজেদের লেপচা বলে না। বলে রঙ বা Mutanchi Rong. Manwaring বলেছেন এই নাম গোর্খাদের দেওয়া। নেপালে এক নিরীহ জনগোষ্ঠী বাস করে, যারা লাপচে নামে পরিচিত। এদের শান্ত প্রকৃতির জন্যে এই নামকরণ।

জার্মান ভাষাবিদ G.B. Manwaring বলেছেন— লেপচাভাষা হিব্রু এবং সংস্কৃতের থেকেও প্রাচীন। মনে হয় পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষা। তাই মনে করা হয় ভাষার চাইতেও এই জনগোষ্ঠী প্রাচীন।

লেপচারা স্বাভাবিক ভাবেই ধর্মপ্রবণ। তারা নিজেদের ঈশ্বরের সন্তান বলে মনে

করে। বলা হত তাদের নিজস্ব কোন ধর্ম নেই। তারা আরাধনা করে পর্বত, নদী, অরণ্য— অর্থাৎ চারিপাশের প্রকৃতিকে। পরবর্তীতে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মগ্রহণ করে এবং খৃস্ট ধর্মও।

লেপচা জনজাতির সৃষ্টিকাহিনী অভিনব। নিজেদের এরা বলে রঙ। এদের আরাধ্য দেবতার নাম 'রম'। সৃষ্টির আদিতে রম পৃথিবী সৃষ্টি করেন। যার মধ্যে রয়েছে পর্বতমালা, নদী, উপত্যকা, জন্তু জানোয়ার পাখি। পর্বতের মধ্যে শক্তিশালী কাঞ্চনজঙ্ঘা সৃষ্টি করেন, যা কিনা হিমালয়ের তুষারাবৃত শিখর।

কাঞ্চনজঙ্ঘার শিকর থেকে রম দুখণ্ড বরফ হাতে নেন। ডান হাতের বরফ দিয়ে নয়জন পুরুষ সৃষ্টি করেন। তার নাম দেন 'ফাদা' থিঙ।' যার অর্থ সর্বশক্তিমান। বাঁ হাতের বরফ দিয়ে তৈরি করেন নারী। নাম দেন নজা শুয়ু। এর অর্থ চির ভাগ্যবতী। লেপচাদের বিশ্বাস এরা দুজনেই তাদের আদি জনক জননী।

এদের সাতটি সন্তান হয়। প্রথম লেপচা পিতামাতা তাদের সন্তানদের জঙ্গলে ফেলে দিয়ে আসে। এই সাতছেলের কিন্তু মৃত্যু হয়নি। তারা শক্তিশালী দৈত্যে পরিণত হয়। তাদের মধ্যে যে বড় তার নাম লাসো মুং-পনু। সে হল দৈত্যকুলের রাজা। সে স্থির করে লেপচাদের ওপর প্রতিশোধ নেবে। তারা যখন নিতান্তই শিশু তখনি তাদের পিতা নিষ্ঠুর ভাবে তাদের জঙ্গলে নির্বাসন দিয়েছে। সে লেপচাদের উদ্দেশে বলে — হে পাপাচারী, আমি তোমাদের ধ্বংস করব। আমি ডেনজঙের অধিপতি হব। তোমাদের সাহস থাকে তো আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর।

যখন কেউই এগিয়ে এল না, সে ক্রোধে এবং ঘৃণায় চিৎকার করে উঠল— কেন তোমরা লুকিয়ে রয়েছ? কাপুরুষের দল!

এরপর লেপচাদের যুদ্ধ করা ছাড়া কোন বিকল্প রইল না। তারা তাদের তিরধনুক বার করল এবং দৈত্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেল। দীর্ঘদিন ধরে যুদ্ধ চলল। লেপচারা খুব সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করল। চারিদিকে তির ছুঁড়ল। দুপক্ষেই অনেকে মারা গেল।

লেপচাদের তরবারির আঘাতে লাসো-মুং-পনুর দৈত্য যোদ্ধারা মারা পড়ল। লাসো প্রচণ্ড ক্ষেপে গিয়ে হুঙ্কার ছিল— কি, এত বড় স্পর্ধা! ওরা আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে চায়? তার দানবিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে সে যুদ্ধ ক্ষেত্রে মায়ার জগৎ সৃষ্টি করল। একসময় লেপচারা দেখতে পেল, তারা একদল ইঁদুরের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। কখনো দেখা গেল বাঁদরের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। কখনো বাঘের সঙ্গে। এতে তারা ভয় পেয়ে গেল। সাহস হারালো। তারা পালিয়ে গেল গভীর জঙ্গলে বা পাহাড়ের মাথায়।

দীর্ঘদিন ধরে লেপচারা অরণ্যবাস করে অনেক দুঃখ সহ্য করল। তারা সবসময় ভয়ে ভয়ে থাকত, কখন্ দৈত্যরা তাড়া করে তাদের মেরে ফেলবে। ভয়ে ভয়ে চলাফেরা করত। জঙ্গল ছেড়ে বাইরে বেরোবার সাহস ছিল না।

অবশেষে তারা এক গোপন জায়গায় মিলিত হল। তারা আলোচনা করে স্থির করল একমাত্র ঈশ্বরই তাদের রক্ষা করতে পারবেন।

তারা আরাধ্য ঈশ্বর রম এর কাছে প্রার্থনা জানালো— 'হে ঈশ্বর, তোমাকে ছাড়া আমরা অসহায়। দীর্ঘদিন যাবৎ দৈত্যদের দ্বারা আমরা অত্যাচারিত হচ্ছি। আমরা আশ্রয়হীন দৈত্যদের ভয়ে এক গুহা হতে অন্য গুহায় ছুটোছুটি করছি। হে ঈশ্বর আমাদের দয়া কর। দৈত্যদের হাত থেকে আমাদের বাঁচাও।

'রম' তাদের প্রার্থনা শুনলেন। একদিন ছদ্মবেশে এক বৃদ্ধ লেপচার সঙ্গে দেখা করলেন এবং বললেন— তিনি লেপচাদের রক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই কথা শুনে লেপচারা আশার আলো দেখতে পেল, আনন্দোচ্ছ্বাস প্রকাশ করল।

এবার রম কাঞ্চনজঙ্ঘার পার্শ্ববর্তী পানদিন শিখর থেকে এক মুঠো পবিত্র বরফ নিয়ে সেটি দিয়ে একজন শক্তিশালী যুবক সৃষ্টি করলেন। তার নাম দিলেন তামসাং থিঙ। যার মানে পবিত্রতা।

ঈশ্বর তামসাংকে বললেন— দ্যাখো আমার সৃষ্টির মধ্যে তুমি সর্বাধিক প্রিয়। আমি তোমাকে অলৌকিক ক্ষমতা দিচ্ছি। তুমি পৃথিবীতে যাবে এবং সমস্ত দৈত্য বধ করে লেপচাদের রক্ষা করবে।

তামসাং প্রথম এল থার-কোল-থামএ। এখানেই লেপচারা প্রথম স্বাধীনতা লাভ করে। এখানে এসে সে বজ্রগম্ভীর শব্দে হাসল। সে হাসির শব্দ এত প্রচণ্ড যে সমস্ত পাহাড় কেঁপে উঠল। এই শব্দে দৈত্যরাজ লাসো-মুং পনুর ঘুম ভেঙ্গে গেল। সেতার সেনাদের দেখতে পাঠালো, কে এমন গোলমাল করছে। দৈত্যরা তামসাং থিংকে দেখল। তার ভয়ঙ্কর চেহারা দেখে ভয় পেয়ে গেল। তারা দৌড়ে রাজার কাছে এসে বলল— হে প্রভু, আমরা লোকটাকে দেখেছি। প্রচণ্ড শক্তিশালী ব্যক্তি। তার হাসিতে পৃথিবী কেঁপে ওঠে। তার কাছাকাছি যেতেই ভয় করল আমাদের। হে প্রভু দয়া করে শুনুন। সে একজন মহান ব্যক্তি।

—দূর হ কাপুরুষ। চিৎকার করে উঠল লাসো। এবার তার মন্ত্রীকে পাঠালো। বৃদ্ধ মন্ত্রী তামসাং থিং এর কাছে গেল। সে বলল— হে শক্তিশালী ব্যক্তি— তুমি কে? এখানে কি জন্যে এসেছ? আমাকে তেনজঙের রাজা পাঠিয়েছেন সত্য ঘটনা জানার জন্যে। আমি তোমার উত্তর আশা করছি।

তামসাং থিং বলল— ওহে মন্ত্রী, আমি ঈশ্বরের প্রিয়তম সৃষ্টি। আমি দৈত্যদের রাজাকে হত্যা করার জন্যে প্রেরিত হয়েছি। লেপচাদের রক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আমার ওপর। তোমাদের রাজাকে বল, সে যদি বাঁচতে চায় এই মুহূর্তে যেন তেনজঙ থেকে চলে যায়। সে নিশ্চিন্তে পাতালে গিয়ে বসবাস করতে পারে। আমি যদি ইচ্ছে করি তোমাকে এই মুহূর্তে ভস্ম করে দিতে পারি। কিন্তু তুমি যথেষ্ট বয়স্ক এবং দূত হিসেবে এসেছ তাই আমি কোন ক্ষতি করব না। এখন তাড়াতাড়ি তোমাদের রাজার কাছে গিয়ে সব বলো।

মন্ত্রী রাজার কাছে এসে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করার পর দৈত্যরাজ ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে হুঙ্কার দিল— এত বড় দাম্ভিক বলে কিনা আমি যেন রাজত্ব ছেড়ে পাতালে গিয়ে

বসবাস করি। সে জানে আমি কে? সে কি জানেনা, এই সাপূর্ণ ডেনজঙ অঞ্চলের রাজা আমি? আমার বিরুদ্ধে কেউ-ই দাঁড়াতে পারবে না। সে যদি যুদ্ধ চায়, তাই হবে। এই কথা বলে লাসো তার সৈন্যদের যুদ্ধ করার হুকুম দিল।

এগিয়ে আসা সৈন্যদলের দিকে তাকিয়ে তামসাং থিং প্রচণ্ড শব্দে হেসে উঠল। পৃথিবী কেঁপে উঠল সেই হাসির শব্দে। দৈত্যসৈন্যরা ভয় পেয়ে গেল।

রাজা লাসো ভয় পায় নি। চিৎকার করে বলল— আমি তোমাকে হত্যা করব। এই বলে একসঙ্গে অনেকগুলি তীর ছুঁড়ল। তামসাং সব তীর ধ্বংস করে সহস্র তীর ছুঁড়ল। প্রচুর দৈত্য মারা গেল। বাকিরা ভয় পেয়ে যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালাতে থাকল। লাসো-মুং-পনু হতাশ কণ্ঠে বলল— আমার সেনারা কাপুরুষ! কোনও কাজের নয়।

এরপর শুরু হল মায়াযুদ্ধ।

রাজা লাসো বাঘের রূপ ধরে তামসাঙের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তামসাং তৈরিই ছিল। তার তরবারির আঘাতে বাঘ লুটিয়ে পড়ল।

এবার লাসো ঘোড়ার রূপ ধরল। ল্যাজ উঁচু করে ঘোড়াটা তামসাংকে প্রচণ্ড শক্তিতে লাথি মারতে থাকল। তামসাং একটি বর্শা দিয়ে ঘোড়াকে বিদ্ধ করল। রক্তপাত হল প্রচুর। তবু যুদ্ধ বন্ধ হল না। এবার তামসাং একটি তীর বার করে চীৎকার করে বলল— হে দুষ্টু দৈত্য, এই তীর ছুঁড়ে তোমায় হত্যা করব।

দৈত্যরাজ ঈগলের রূপ ধরে আকাশে উড়ে গেল। রাজা চলে যাওয়ায় সৈন্যরাও ভয়ে ছুটে পালাল। সবাই গিয়ে পাতালে আশ্রয় নিল।

সমস্ত লেপচারা তামসাংকে ধন্যবাদ দিল। তারা বলল— লাসোকে জীবন্ত ছেড়ে দেওয়া ঠিক নয়। রাজা তখন ভয়ঙ্কর পর্বতশীর্ষ মাবোলি-তে আশ্রয় নিয়েছে।

তামসাংএর নেতৃত্বে লেপচারা পর্বত শীর্ষে গেল। তারা দেখতে পেল একটি গাছের মাথায় বিশাল এক ঈগল। তামসাং তীর ছুঁড়ল। ঈগল অজ্ঞান হয়ে নিচে পড়ে গেল। একটু পরেই তার জ্ঞান ফিরল। আর একটি গাছের মাথায় গিয়ে বসল। তামসাং আবার তীর ছুঁড়ল। তার হৃদপিণ্ড বিদীর্ণ হল।

এভাবেই দৈত্যরাজের জীবন শেষ হল। তার আত্মা রয়ে গেল প্রতিহিংসা নেবার জন্যে। তার শরীরের মাংস দিয়ে সৃষ্টি হল হল ছোট ছোট উকুন। কিছু অংশ দিয়ে হল মশা, মাছি, ছারপোকা, জোঁক, বোলতা। সৃষ্টি হল দৈত্যরাজের রক্ত দিয়ে বিছে, সাপ, ব্যাঙ, বিষাক্ত পোকা-মাকড়। এরা সবসময় লেপচাদের বিরক্ত করে।

এবার লেপচারা বিজয়োৎসবের জন্যে উপত্যকায় সমবেত হল। সাতদিন ধরে উৎসব হল। তামসাং বীর যোদ্ধাদের সম্মান দিলেন। প্রত্যেককে পুরস্কৃত করলেন। প্রত্যেক লেপচাকে পদবী দিলেন। লেপচারা নতুন জীবন লাভ করল।

সঙ্গীত-নৃত্যে মেতে উঠল লেপচা সমাজ। দেবতারাও বিভিন্ন উপহার দিলেন। লেপচারা সামাজিক স্বীকৃতি পেয়ে একটি পৃথক জাতিরূপে পরিচিত হল।

রাভা লোককাহিনি : বিষয় বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য

বিমলেন্দু মজুমদার

পূর্বভারতের একটি বিশিষ্ট আদিবাসী হচ্ছেন রাভা সম্প্রদায়। রাভারা তিব্বত-বর্মী নৃ-গোষ্ঠীর বোড়ো পরিবারের একটি জনশাখা। ১৯৯১ সালের আদমসুমারি অনুসারে রাভাদের মোট জনসংখ্যা— ২,৭১,৩৫৭ (এর মধ্যে- অসমে— ২,৩৬,৯৩১ জন, মেঘালয়ে—২০,৪৪৫ জন্য এবং পশ্চিমবঙ্গে ১১,০৭১ জন*) আদমসুমারি অনুসারে অসম ও পশ্চিমবঙ্গে রাভা জনগোষ্ঠীকে একটি সমতলের অনুসূচিত আদিবাসী (Scheduled Tribe, Plain) হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। রাভারা কোন নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকায় বাস করেন না। তাঁরা প্রধানত জীবিকার কারণে অসম মেঘালয় ও পশ্চিমবঙ্গে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বাস করেন।

বাসভূমির বাস্তুতান্ত্রিক গড়ন (Habital eco-system) অনুসারে প্রাচীনকাল থেকেই রাভা সম্প্রদায় দুটি ভাগে বিভক্ত। যেমন ক) কৃষি-বলয়ে স্থায়ী গ্রামসমাজে বসবাসকারী রাভা, এবং খ) বনবাসী রাভা।

কৃষি-বলয়ে বসবাসকারী রাভাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান (status) কিছুটা পরিমাণে, তাঁদের অন্যান্য প্রতিবেশী গ্রামের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর কাছাকাছি। অন্যদের তুলনায় আর্থিক দিক থেকে তাঁরা অবশ্য পিছিয়ে রয়েছেন। কিন্তু তাঁদের ধর্মাচরণ সামাজিক অনুষ্ঠান ও ভাষা-সংস্কৃতি, বর্তমানে স্থানীয় প্রভাবশালী মানুষদের সমাজের দ্বারা প্রভাবিত। তাই তাঁদের মধ্যে হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু সমাজের নানা প্রকার পুজোপার্বণ যেমন স্থান করে নিয়েছে, তেমান ভাষা সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও ব্যাপকভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছে। তাঁদের কোনো কোনো গোত্রের মানুযেরা নিজেদের মাতৃভাষার বিলুপ্তি ঘটিয়ে রাজ্যের প্রভাবশালী ভাষাকে ঘরে-বাইরে ও শিক্ষায়তনের ভাষা হিসেবে রপ্ত করে নিয়েছেন (Code switching) । তবে শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে, তাঁদের মধ্যেও আত্মপরিচিতির (self identity) চেতনা জাগ্রত হয়েছে। পরিণামে রাভা জনগোষ্ঠী বেশ কিছুকাল আগেই তাঁদের নিজস্ব সংগঠন তৈরি করে তাঁদের ভাষা-সংস্কৃতির পুনরুদ্ধারের কাজে ব্রতী হয়েছেন এবং শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে তাঁদের মাতৃভাষা চালু করার জন্য আন্দোলন করে আসছেন। তাতে (অসমে) কিছুটা সাফল্যও অর্জন করেছেন। অন্যদিকে আধুনিক সাহিত্য রচনার পাশাপাশি তাঁদের লোকসাহিত্যের উপাদানগুলি সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ব্যাপক প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন। একাজে পশ্চিমবঙ্গ ও মেঘালয়ের রাভারা অনেকটা পিছিয়ে আছেন।

খ) বনবাসী রাভাদের বলা হত 'পানিকোচ'। রাভাভাষায় পানিকোচ শব্দের অর্থ

(পান/ফান= বনভূমি + কোচ = রাভা) বনবাসী কোচ বা রাভা। পানিকোচরা তাদের জীবন ধারণের জন্য বনের ওপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল ছিলেন। তাঁদের জীবিকার অঙ্গ ছিল ঝুমচাষ (Shifting Cultivation) শিকার, মাছধরা ও বনজসংগ্রহ (gleaning)। ঝুমচাষের প্রয়োজনে দুতিন বছর পর পর জমি পরিবর্তন প্রয়োজন। তাছাড়া একই বন-এলাকায় বেশিদিন বাস করলে, সেখানে শিকার এবং বনজসংগ্রহের পরিমাণ কমে যায়। সেজন্য দুতিনবছর পরপরই নতুন মাটি আর বনজসম্পদ সমৃদ্ধ অহল্যা বনের সন্ধানে পানিকোচরা বেরিয়ে পড়তেন। এভাবে তাঁরা ক্ষেত্রান্তরী চাষ (shifting cultivation) আর স্থানান্তরী জীবনে (Nomadic life) অভ্যস্ত হয়ে পড়েন এবং প্রাক-ঔপনিবেশিক শাসনকাল পর্ব পর্যন্ত তাঁদের এই ভ্রাম্যমান জীবনচক্র বলবত থাকে।

১৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দের বন আইন (Indian Forest Act 1866) অনুসারে দেশের অধিকাংশ বনাঞ্চলকে সংরক্ষিত বনভূমির আওতায় আনা হয়। এর ফলে প্রায় সম্পূর্ণভাবে বনের ওপর নির্ভরশীল অসংখ্য আদিবাসী ও আধা-আদিবাসী জনগোষ্ঠী বনের ওপর অধিকার হারায়। এই অবস্থায় প্রায় সম্পূর্ণভাবে বনের ওপর নির্ভরশীল রাভা সম্প্রদায় (অন্যান্য সমগোত্রের আদিবাসীরাও) প্রচণ্ড সমস্যার সম্মুখীন হন। এর ফলে রাভাদের একটা অংশ নতুন বাসভূমির সন্ধানে অসমের দিকে পূর্বমুখী প্রব্রজন (Eastward migration) করেন। উত্তরবঙ্গের পানিকোচদের বেশিরভাগই, বিকল্প জীবিকা সম্পর্কে অনবহিত থাকার ফলে এখানকার বনাঞ্চলেই থেকে যান এবং দোলাচল চিত্তে চলে যাবার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকেন। এই অবস্থায় ব্রিটিশ সরকার দেশের বিশাল সংরক্ষিত বনভূমির পরিচর্যা ও অন্যান্য কাজের জন্য বনাঞ্চলে শ্রমিক নিয়োগেব প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। অথচ জনশূন্য এই দুর্গম এলাকায় শ্রমিক হিসেবে কোন মানুষ পাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। এরপর এই সমস্যা সমাধানের জন্য চালু করা হয় 'টঙ্গিয়া আইন ১৮৯৪' (Tongia Act 1894)। এ অবস্থায় তাৎক্ষণিকভাবে শ্রমিকের চাহিদা মেটানোর জন্য বনকর্তৃপক্ষ 'পানিকোচদের' 'বনশ্রমিক' হিসেবে নিয়োগ করে এবং তাঁদের বসবাসের জন্য পত্তন করা হয় স্থায়ী 'বনবস্তি' (Forest)। অবশ্য পানিকোচ ছাড়া অন্যান্য কিছু সম্প্রদায়ও বনশ্রমিকের কাজে যোগ দেন। এভাবে পানিকোচরা-যাঁরা আবহমান কাল থেকে জলের মাছের মত তাঁদের মাতৃসমা বনভূমির কোলে স্বাধীনভাবে ভ্রাম্যমান জীবন যাপন করতেন, তাঁরা সকলপ্রকার স্বাধীনতা হারিয়ে নির্দিষ্ট পরিধিতে বাঁধা বনশ্রমিকে পরিণত হলেন। সেই সঙ্গে তাঁদের আগের পরিচিতির পরিবর্তন ঘটিয়ে তারাও সরকারী নথিপত্রে 'রাভা' হিসেবে পরিচিত হলেন। এর ফলে তাঁদের নৃ-গোষ্ঠীগত অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে ও সাংস্কৃতিক অবিচ্ছিন্ন বিকাশের ধারা ব্যাহত হয়।

বর্তমানে রাভাদের সমাজে পুরুষ প্রাধান্য দেখা গেলেও মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাই ছিল রাভাসমাজের মূল পরিচালিকা শক্তি। তাঁদের চিরায়ত সমাজবিধি অনুসারে রাভা সমাজে সন্তানের পরিচয় এখনও মাতৃগোত্রের পরম্পরা অনুসারেই

পরিচিত হয়ে থাকে। তাঁদের সমাজে সম্পত্তির অধিকার ছিল কনিষ্ঠ কন্যার (Female ultimogeniture) এবং বংশ পরম্পরায় মাতৃগোত্রের 'বারাইহুরী' বা বীজমন্ত্র বহনের অধিকারীও কনিষ্ঠা কন্যা। রাভা জনগোষ্ঠী মোট আটটি 'খেল' বা 'শাখায়' বিভক্ত। এই শাখাগুলি হচ্ছে ১ রংদানি, ২ মাইতরি, ৩. কোচবা কোচা, ৪. পাতি, ৫. দাহরি, ৬. বিটলিয়া, ৭. হানা ও ৮. টোট্না। এই আটটি শাখার নিজ নিজ ভাষাও পৃথক। কয়েকটি শাখা অবশ্য রাভা ভাষার প্রায় সকল বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলেছেন এবং অন্যভাষাকে নিজেদের মাতৃভাষার মতো গ্রহণ করেছেন। তা সত্ত্বেও রাভাদের আটটি শাখার সকলে যৌথভাবে একটি সর্বজনগ্রাহ্য কথ্য ও লেখ্য ভাষার প্রচলন এবং উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন। ইতিমধ্যে তাঁরা তাঁদের লোকসাহিত্যের অন্যান্য উপাদানের মত বেশ কিছু লোককাহিনি সংগ্রহ করে লিখিত আকারে প্রকাশ করেছেন।

কৃষি-বলয় ও অরণ্য-বলয়ে বসবাসকারী প্রায় সকল গোত্রশাখার রাভাদের লোকসাহিত্যের উপাদান খুবই সমৃদ্ধ। তাঁদের লোকগান এবং মন্ত্রাশ্রয়ী কাহিনিগুলিতে তাঁদের আর্থ সামাজিক চিত্র পাওয়া যায়। লোককাহিনিগুলিতে সমাজচিত্রের বর্ণনা যেন আরও বেশি বাস্তবধর্মী প্রকাশ ঘটেছে। সৃষ্টিতত্ত্ব থেকে পশুকাহিনি সকল প্রকার লোককাহিনিতে রাভা জনগোষ্ঠীর অতীতদিনের আর্থসামাজিক অবস্থার কোনো না কোনোভাবে প্রতিফলন ঘটেছে। রাভা লোককাহিনিগুলির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, বৃহৎ বোডো জনগোষ্ঠীর অন্যান্য ভ্রাতৃপ্রতিম জনশাখার প্রধান লোককাহিনিগুলির মধ্যে বেশ কিছু লোককাহিনির সঙ্গে অন্যদের মতো অনেকগুলি রাভা লোককাহিনিও মূলাদর্শগত (Archetypal) সাদৃশ্য দেখা যায়। অন্যদিকে তাঁদের দীর্ঘ ভ্রাম্যমান জীবনে (Migratory life) তাঁরা তাঁদের নানা প্রতিবেশী জনগোষ্ঠীর কাছ থেকেও লোককাহিনি সংগ্রহ ও আত্মস্থ করে নতুনভাবে বেশ কিছু লোককাহিনিকে তাঁদের লোককাহিনির ভাণ্ডারে স্থান করে দিয়েছেন। এভাবে রাভা জনগোষ্ঠীর লোককাহিনি বিষয় বৈচিত্র্যের দিক থেকে এক সমৃদ্ধ ভাণ্ডারে পরিণত হয়েছে।

লোকসংস্কৃতিবিদরা লোককাহিনির যে বিস্তৃত শ্রেণি বিন্যাস করেছেন, তা স্মরণে রেখে ও আলোচনায় সুবিধের জন্য রাভা লোককাহিনির বিষয়বৈচিত্র্য অনুসারে তাঁদের লোককাহিনিগুলিকে তিনটি শ্রেণিতে বিন্যাস করা যেতে পারে। যেমন— ক. মিথ্ (Myth) বা লোকপুরাণ, খ. লেজেণ্ড (Legend) বা গ. টেল (Tele) বা লোককাহিনি। রাভাভাষায় প্রচলিত লোককাহিনির ভাণ্ডারে প্রায় সকল প্রকার লোককাহিনির সন্ধান পাওয়া যায়।

আদিমকাল থেকে লোককাহিনির বিবর্তন ও স্বরূপ পরিবর্তনের গতিপ্রকৃতির উপর নির্ভর করে লোকসংস্কৃতিবিদরা নির্দিষ্ট পদ্ধতিবিদ্যা অনুসারে এই শ্রেণীগুলি বিন্যাস করেছেন। এই সূত্র অনুসারে মিথ বা লোকপুরাণই হল কোন একটি বিশেষ জনগোষ্ঠীর প্রাচীনতম লোককাহিনি। এ ধরনের লোকপুরাণ রচনার ক্ষেত্রে সেই জনগোষ্ঠীর সমকালের আদিম ধর্মবিশ্বাস ও দৈবী ঘটনার ভূমিকা অত্যন্ত গভীর। ফলে এই আদিম

লোককাহিনিগুলিতে দেবতা বা দেবায়িত (Apotheosis) কোনো ব্যক্তি বা টোটেম (বা দেবায়িত পূর্বপুরুষ) জাতীয় কোন চরিত্রের ভূমিকা ছিল প্রধান। এসব কাহিনির কেন্দ্রীয় পরিচালিকাশক্তি হচ্ছে 'ধর্মীয় পবিত্রতা।'

পরবর্তীকালে সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে লোককাহিনি রচনার ক্ষেত্রে সেই 'পবিত্রতা' বা দৈবীশক্তির' গুরুত্ব অনেকটা পরিমাণে হ্রাস পেয়ে থাকে। তার ফলে আদিম ধর্মবিশ্বাস, দেবায়িত চরিত্র বা ধর্মীয় পবিত্রতার ধারণার পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু মানুষের মনের গভীরে সেই আদিম অলৌকিক ঘটনাগুলি সম্পর্কে বিশ্বাসের তেমন হেরফের না ঘটলেও লোকপুরাণের কাহিনির ওপর আদিম ধর্মবিশ্বাসের প্রভাবমুক্ত সমকালের লোকবিশ্বাস নির্ভর মানসিকতার প্রলেপে আর একধরনের কাহিনির সৃষ্টি হয়। এভাবে উদ্ভব ঘটে সাধারণ উপকথা, রূপকথা জাতীয় লোককাহিনির। আবার দেখা যায় যে, লোককাহিনির সংবর্তনের মাধ্যমে একটি সাধারণ লোককাহিনির মূলকাঠামোর ওপর অলৌকিকতা বা দৈবীশক্তি আরোপ করে বা কোন সাধারণ চরিত্রকে দেবায়িত করে নতুন একধরনের কাহিনির উদ্ভব ঘটে। তখন সাধারণ লোককাহিনিই একটা লেজেণ্ড (Legend) বা কিংবদন্তিতে পরিণত হয়। দেবী চৌধুরানীর কাহিনি এধরনের বাস্তব ঘটনানির্ভর কিংবদন্তির বাস্তব উদাহরণ।

রাভা জনগোষ্ঠীর মিথ (Myth) বা লোকপুরাণ : মিথ বা লোকপুরাণ হচ্ছে যে কোনো জনগোষ্ঠীর আদিমতম সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও নৃ-গোষ্ঠীগত ভাবনার এক অন্তর্লীন (Letent) অভিজ্ঞান। মিথকে বলা হয়েছে বিজ্ঞানপূর্ব যুগের বিজ্ঞান ভাবনার ফসল। সভ্যতার ঊষালগ্নে আদিম মানবসমাজের মানুষ যখন কোন প্রাকৃতিক ঘটনাকে বুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারত না, তখন সেখানে কোনো অতিমানবিক শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করে নিত। আকাশে চন্দ্র সূর্যের উদয় অস্ত, মেঘ-বৃষ্টি, নদীনালা বন্যা, ভূমিকম্প, গ্রহণ ইত্যাদি ঘটনা বা বৃক্ষ ও প্রাণিকুলের উৎপত্তি ইত্যাদি আদিমকালের ঘটনাগুলিকে ঘিরে গড়ে ওঠে প্রাক-সাক্ষর মানুষের লোকবিশ্বাস। বিশেষ বিশেষ জনগোষ্ঠীর গুণীন মানুষেরা প্রতিটি ব্যাখ্যাতীত "কেন"র একটা গ্রহণযোগ্য মনগড়া ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করতেন। আবার কোনো কোনো লোকপুরাণের মধ্য দিয়ে সেই বিশেষ জনগোষ্ঠীর সামাজিক রীতিনীতি বা আচরণবিধিগুলিকে কাহিনির মাধ্যমে যুক্তিগ্রাহ্যভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করতেন। এই আলোচনার নিরিখে রাভা জনগোষ্ঠীর মিথ বা লোকপুরাণগুলি বিশ্লেষণ করলে তাঁদের প্রাচীন আর্থ-সামাজিক অবস্থান ও ঐতিহাসিক উত্তরণ সম্পর্কে বহু মূল্যবান তথ্য পাওয়া যেতে পারে।

মিথ বা লোকপুরাণ : পৃথিবীর যে কোন আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মতো রাভা লোকভাষায় রচিত লোকপুরাণগুলি অত্যন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ। তাদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য লোকপুরাণ হচ্ছে—'হা তাঙি' বা সৃষ্টিতত্ত্ব। এটি একটি মন্ত্রাশ্রয়ী উপ্যাখ্যান। এই হা-তাঙি বা সৃষ্টিতত্ত্বের অভিপ্রায় হচ্ছে 'জল'। রাভা হা-তাঙির সূচনাতে বলা হয়েছেঃ-

"নিরাকার নিরাপ্রবট সমুদ্র মাঝারায়
বাম্বাং চাক্সা চাক্ নিঙায় পাঙাইতা। ইত্যাদি।
ভাবার্থ— অসীম নির্জন সাগরে শয়ান,
বীলীরাজা—বীলীবুড়ি দেবতা মহান;
কাঁটাযুক্ত পদ্মের পাতা—
ভাবিত তারা কেমনে কাটবে দিন,
সাগরে কুমির আর শিশু-মীন।"

(মীঙ্গিদাতা—পূঁজারু রাভা, কোটকু ঝোড়া, ধুবড়ি, সংগ্রাহক- ডা. রেবতী মোহন সাহা (ছুরগীরাং)। সম্পাদনা-শ্রীজগতকামা। সংকলিতগ্রন্থ-রাভা স্তুতি-মন্ত্র-গীত, ১ম খণ্ড, বেবাক রাভা ২০০১, পৃ-৯৬)

পূর্বে পৃথিবী ছিল শুধু জলময়। অসীম নির্জন সমুদ্রে কণ্টকিত পদ্মপাতার ওপর ভেসে ছিলেন— বীলীবুদা ও বীলীবুড়ি। তাঁরাই ছিলেন, এই নিরাকার জগৎ সংসারের সৃষ্টিকর্তা। রাভা ভাষায় যাঁকে বলা হয় 'মামাবীলা। তিনি বিভিন্ন প্রাণির সাহায্যে জলের তলা থেকে মাটি তুলে আনিয়ে কিভাবে জগৎ সংসার সৃষ্টি করলেন তা-ই হচ্ছে রাভা লোকপুরাণের মূলকাহিনি।

এই কাহিনির পরিপূরক দ্বিতীয় কাহিনিটি অত্যন্ত আদিম। তা হচ্ছে-পাতাল থেকে মাটি তুলে আনার পর সৃষ্টিকর্তা 'মামাবীলা' রাম্বাংপাতার ওপর সেই মাটি রেখে সৃষ্টি করলেন পৃথিবী। কিন্তু পৃথিবীকে তো জনপ্রাণিহীন করে রাখা যায় না। তাই এবার তিনি মাটি দিয়ে মানুষ গড়লেন, গড়লেন অন্যপ্রাণি। কিন্তু একদিন হাদাতারা আর বিদাতারা নামে নামে দুই শয়তান এসে মূর্তিগুলি ভেঙে দিল। তিনি তাদেরপ্রাণ সঞ্চার করতে পারলেন না। এরপর তিনি একটি কুকুর সৃষ্টি করলেন। কুকুর সর্বক্ষণ পাহারা দিতে লাগল। একসময় ঐ দুই শয়তান আসতেই কুকুর তার সৃষ্টিকর্তাকে খবর দিল। সৃষ্টিকর্তা ফিরে এসে শয়তানদের যুদ্ধে হারিয়ে তাড়িয়ে দিলেন। এবার তিনি মানুষের মূর্তিগুলোকে লোহার প্রাণ অর্থাৎ অমর করার জন্য তার সন্ধানে বেরিয়ে যান।

এদিকে তিনি লোহারপ্রাণ নিয়ে ফিরে আসায় আগেই বীলীরানি কচুপাতার ওপরে জমে থাকা টলমল করা জল এনে, তা ঐ মূর্তিগুলিলোর ওপর ছিটিয়ে দিলেন। মুর্তিগুলো প্রাণ পেয়ে, আনন্দে নাচগান করতে লাগল। অথচ তারা জানতেই পারল না যে বীলীরানির ভুলের জন্য মানুষ অমরত্ব লাভ করতে পারল না। মীমীবীলা অমরপ্রাণ নিয়ে ফিরে এসে দেখলেন মানুষগুলো কচুপাতায় জলের মতো টলমলে প্রাণ নিয়ে আনন্দে নাচগান করছে। এতে তিনি খুব দুঃখ পেলেন। কিন্তু তাঁর আর কিছু করার থাকল না। তাই মানুষ মরণশীল। এভাবে রাভা লোকপুরাণে দুটি কাহিনির সমাপ্তি ঘটে।

রাভাদের মন্ত্রাশ্রয়ী লোকপুরাণ 'হা-তাঙি'র কাহিনি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, পৃথিবীর অধিকাংশ সৃষ্টিতত্ত্বের মতো, রাভাদের সৃষ্টিতত্ত্বেরও প্রধান অভিপ্রায় (Mo-

tif) হচ্ছে জল। আর্যদের সৃষ্টিতত্ত্ব অনুসারে সৃষ্টির আদিতে শুধু জলের অস্তিত্বের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। ঋকবেদে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'অপ' বা 'জল' থেকেই প্রথম ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়েছিল। সৃষ্টির আদিতে সেই জল থেকে হিরণ্যগর্ভরূপে উদ্ভব ঘটেছিল প্রজাপতি ব্রহ্মার। মনুস্মৃতিতেও বলা হয়েছে সেই আদিম অন্ধকার থেকে সৃষ্টি হয় জল এবং জলের মধ্যে সৃষ্টিকর্তা তাঁর বীজ সংস্থাপন করেন। তা থেকে সৃষ্টি হয় স্বর্ণ অণ্ড। আর সেই স্বর্ণ অণ্ড থেকে জন্ম হয় স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার।।

অসমের বোডো জনগোষ্ঠীর রাভাদের ভ্রাতৃপ্রতিম অন্যতম জনশাখা কাছাড়ি লোকপুরাণেও বর্ণনা করা হয়েছে যে, আদিতে গভীর নিঃস্তব্ধতার মধ্যে ছিল কেবলমাত্র অনন্ত জলরাশি। তাতে জন্ম নেয় আদি মানব ও মানবী। তাদের মিলনে সৃষ্টি হয় মানবসমাজ। 'টাংশা' লোকপুরাণ এবং 'দেউর' লোকপুরাণেও সৃষ্টির আদিতে অনন্ত জলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। রাভা লোকপুরাণের মত কোল জনগোষ্ঠীর লোকপুরাণেও অনন্ত জলরাশির উল্লেখ করা হয়েছে। (Griffiths, w.g. "The Kol Tribes of Central India Rpt 1993, P-206)। আবার 'বাইবেলের' আদিপর্ব ' দি বুক অব জেনেসিস-এ একইভাবে সৃষ্টির আদিতে অনন্ত জলরাশির কথা উল্লেখ করা হয়েছে (Bible Old Testament, Genesis II)। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে রাভাদের সৃষ্টিতত্ত্বমূলক কাহিনি-হা-তাঙি'-তে বর্ণিত ঘটনা, পৃথিবীর প্রায় সকল জনগোষ্ঠীর লোকপুরাণেই সমানভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। বর্তমান লেখকের পক্ষে রাভাদের মধ্যে প্রচলিত অন্তত ন-টি লোকপুরাণ পর্যায়ের লোককাহিনি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। সবকটি লোকপুরাণ নিয়ে এই স্বল্প পরিসরে আলোচনা করা সম্ভব নয়।

কিংবদন্তি : রাভাদের লোককাহিনির ভাণ্ডারে 'কিংবদন্তি' শ্রেণীর বেশ কিছু লোককাহিনি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। ভৌগোলিক দূরত্ব ও বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস ও ভাষাগত বিভিন্নতার কারণে সব সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। সংগৃহীত রাভা কিংবদন্তিগুলির মধ্যে রাভাদের জাতীয় বীর 'রাজা দদানের কাহিনি' ও তাঁদের পূর্বপুরুষ দেবতা 'লাঙা দেবতার কাহিনি' বিশেষভাবে উল্লেখ্য। এর মধ্যে 'লাঙা দেবতার কাহিনি' অত্যন্ত প্রাচীন। এই কিংবদন্তি থেকে রাভাদের প্রাচীন জীবনের (Migratory life) আভাস পাওয়া যায়। তবে লাঙা দেবতা একা নন, সঙ্গে তাঁর নয় দিদিকে (আহুলি, বিহুলি, সোনাই, শকুনি, কালকাটি, কাকলি, নারায়ণী, উলমুলা ও যশরবাও) ছোটভাই 'কলমনি হেরকাপেটা', বা লাঙার ভ্রাম্যমান জীবনের সূত্রপাত ঘটে। পরে নানা ঘটনা ও যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে লাঙা। এই কাহিনিতে মাতৃতান্ত্রিক রাভা সমাজের নারীদের বীরত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। তারাও ছোটভাই লাঙার পক্ষ হয়ে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে। বিশেষ করে দস্যুদের বিরুদ্ধে লাঙার দিদির মেয়ে 'ভয়রা'র যুদ্ধযাত্রার কাহিনি, এই কিংবদন্তিতে বর্ণিত এক স্মরণীয় ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। কিন্তু সেই যুদ্ধে ভয়রার মৃত্যু হয়। প্রব্রজনের শেষে লাঙা দেবতা, তাঁর দলবলকে নিয়ে অসমের 'চান্দরডিঙা' নামক স্থানে বসতি স্থাপন করেন।

'রাজা দদানের কাহিনির', দদান, রাভা আদিবাসীর জাতীয় বীর। অসম ও মেঘালয়ের বেশকিছু স্থান নামে ও একটি দুর্গের নামে (টিকরি কিল্লা) দদানের নাম জড়িয়ে আছে। তাই কেউ কেউ মনে করেন দদান একটি ঐতিহাসিক চরিত্র। কিন্তু রাভাদের কোন লিখিত ইতিহাস না থাকায় দদান সম্পর্কে এই বহু প্রচলিত 'কিংবদন্তিটি' ছাড়া আর কোন নজির পাওয়া যায় না। রাজা দদানের কাহিনি হচ্ছে রাভা জনগোষ্ঠীর প্রকৃত ভ্রাম্যমান জীবনের অলিখিত ইতিহাস। কিংদন্তি হিসেবে দেবতা লাঙার সঙ্গে এই কিংবদন্তির প্রব্রজনকেন্দ্রিক ঘটনার কিছুটা সাদৃশ্য থাকলেও 'রাজা-দদান-কিংবদন্তি' পরবর্তীকালের ঘটনা বলেই অনুমিত হয়। অসমে (বোডদেশ বা তিব্বত) প্রবেশ করার পর বোডো জনগোষ্ঠীর রাভারা কোচ্ জনশাখা-রাজা দদানের নেতৃত্বে জাতি হিসেবে সংঘবদ্ধ হন। তারপর রাজা দদান তাঁদের নিয়ে একটি শান্তিপূর্ণ নিরাপদ স্থানের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়েন। কারো সঙ্গে বিবাদে লিপ্ত না হওয়া এবং শান্তি বজায় রাখা ছিল তাঁর নীতি। পরে তিনি দলবল নিয়ে কোন এক বসন্তকালে ব্রহ্মপুত্র নদি পেরিয়ে দক্ষিণ তীরে এসে উপস্থিত হন। সঙ্গে ছিল তাঁর বোন ও ভাগ্নী, যারা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে প্রতিপক্ষের সঙ্গে সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করে। তবে তার আগে তাঁরদলে এক যুবক এসে যোগদান করে। পরে সেই যুবক সেনাপতি মারুক্ষেত্রী নামে খ্যাতিলাভ করে। এরপর তিনি মেঘালয়ের ঠিকরিকিল্লাতে এসে তিনি তাঁর রাজধানী ও ঐ কিল্লা স্থাপন করেন এবং রাভাদের নিয়ে সুখে বসবাস করতে থাকেন। কিন্তু ইতিমধ্যে প্রতিবেশী কিছু রাজ্যের রাজা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। যুদ্ধে জয়লাভ করে ফিরে আসার সময় গুপ্ত শত্রুর বিষ মাখানো তীরের আঘাতে দদান হাতির পিঠ থেকে পড়ে মারা যান। যেখানে তিনি মারা যান- সেই জায়গার বর্তমান নাম 'দদানডুবি' (হ্রদ)। সেখানে প্রতিবছর মেলা বসে।

এই কিংবদন্তি প্রকৃতপক্ষে রাভা আদিবাসীর সবচেয়ে গৌরবজনক ঐতিহাসিক ঘটনাবহ কাহিনি বলে রাভাদের বিশ্বাস। এই কিংবদন্তিতে 'রাজা দদান' তাঁদের জাতীয় বীর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ও স্মরণীয় এবং পূজাপ্রাপ্ত এক পূর্বপুরুষ দেবতায় পরিণত হয়েছেন। রাভাদের আরও বেশ কিছু কিংবদন্তি রয়েছে। যেগুলি অতিদ্রুত বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যেতে বসেছে।

লোককাহিনি ঃ ভারতের অন্যান্য আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মতো রাভাদের লোককাহিনির ভাণ্ডার খুব সমৃদ্ধ। প্রধানত্বের দিক থেকে মিথ-এর (Myth) মতো সমকালেই লোককাহিনির উদ্ভব ঘটে। কিন্তু মিথ-এর সঙ্গে লোককাহিনির পার্থক্য আছে। মিথ-বা লোকপুরাণগুলি প্রধানত সমাজের গুণীদের সৃষ্টি। কিন্তু যে কোন সাধারণ মানুষই লোককাহিনির স্রষ্টা হতে পারেন। সেদিক থেকে লোককাহিনির বিচরণক্ষেত্র অনেক বিস্তৃত। কোন একটি নৃ-গোষ্ঠীর সমকালীন আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থানের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে লোককাহিনির গুরুত্ব অপরিসীম। কোনো উপজাতি বা প্রাকসাক্ষর সমাজের লোককাহিনিতে সেই সমাজের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির

ছায়া পড়ে বলে রুথ বেনেডিক্ট বোয়াজ তাঁর দীর্ঘ গবেষণায় প্রমাণ করেছেন। তিনি বলেন যে একটি উপজাতির লোককাহিনিতে প্রাচীন সমাজের জীবনচিত্র বিধৃত এবং এ কারণেই লোককাহিনিতে একটি উপজাতির ইতিহাস প্রণয়নের উপযুক্ত অসংখ্য উপাদান নিহিত থাকে। (ড. মযহারুল ইসলাম : "ফোকলোর পরিচিতি ও পঠন পাঠন" বাংলা একাডেমি, ঢাকা ১৯৯৩, পৃ. ১৫৯)।

লোককাহিনির মধ্যে একটি জনগোষ্ঠীর লোকজীবনের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলির প্রকাশ ঘটে। রাভা লোককাহিনিগুলির Folktales) মধ্যেও তাঁদের সমাজজীবনের সহজ সরল প্রতিফলন ঘটেছে। রাভাদের সামাজিক রীতিনীতি, পোশাক পরিচ্ছদ, বাদ্যযন্ত্র ও প্রাত্যহিক প্রান্তিক অর্থনীতির (Marginal economy) (বনজ সংগ্রহ, শিকার, মাছধরা, ঝুমচাষ প্রভৃতি) চিত্র ফুটে উঠেছে। ফলে রাভা লোককাহিনিগুলি তাঁদের সামাজিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এক ঐতিহাসিক নিদর্শন হিসেবেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। লোকসংস্কৃতির তত্ত্ববিদ্যা অনুসারে সাধারণ লোকাহিনিগুলির (Tales) যতপ্রকার শ্রেনি বিন্যাস করা যেতে পারে (রূপকথা, পরীকথা, পশুকাহিনি, ভৌতিক কাহিনি, নীতিবাচক লোককাহিনি বা উপকথা, শিকারকাহিনি, সাংসারিক লোককাহিনি, হাস্য কৌতুকময় কাহিনি প্রভৃতি) রাভা লোককাহিনিগুলিতে সেধরনের প্রায় সকলশ্রেণীর লোককাহিনিরই সন্ধান পাওয়া যায়। রাভা লোককাহিনির আরও কতকগুলি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে যা দক্ষিণ এশিয়া ও তিব্বত-চিনের লোককাহিনিতে পাওয়া যায়। রাভা লোককাহিনিগুলির মধ্যে এমন বেশ কয়েকটি কাহিনি পাওয়া যায়, মূলকাহিনি (বা মূলাদর্শ Archetypal) বজায় রেখে চিন ভারত, তিব্বত প্রভৃতি দেশে সেগুলির একাধিক পাঠান্তর পাওয়া গিয়েছে। এপ্রসঙ্গে কাহিনিগুলির মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যমূলক (contrastive study) তুলনাত্মক আলোচনার জন্য উদাহরণ হিসেবে রাভাদের 'ময়ূর' বিষয়ক কাহিনিগুলির উল্লেখ করা যেতে পারে।

লোকসংস্কৃতির ময়ূর . লোকসংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য ও বিষয় বৈচিত্র্যের দিক থেকে বেশকিছু লোককাহিনি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এর মধ্যে রাভা লোকসাহিত্যের সহায়ক লোককাহিনিগুলির সঙ্গে ভিন্ন জনগোষ্ঠীর লোককাহিনির সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য লোককাহিনিগুলির গবেষকদের কাছে অত্যন্ত কৌতূহল-উদ্দীপক বলে গণ্য হতে পারে। রাভাদের লৌকিক পূজাপার্বণের ক্ষেত্রে ও ধর্মীয় আচরণে, কাব্যে ও সাহিত্যেও ময়ূর একটি বহু আলোচিত নান্দনিক প্রসঙ্গ উপকরণ। ময়ূর ভারতের জাতীয় পাখি, দেবতার বাহন হিসেবে যেমন ময়ূরের অবস্থান দেখা যায়, তেমনি আবার দেবতার শিরোভূষণ হিসেবেও ময়ূরের পালকের ব্যবহার দেখা যায়। এ সম্পর্কে বিশিষ্ট অসমীয়া সাহিত্যিক ও গবেষক যোগেশ দাসের লেখার অংশ বিশেষ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। "একটি দেউরি উপকথায় বলা হয়েছে যে প্রথমে পৃথিবীর চতুর্দিকে থৈ থৈ করত জল। ভগবান থাকতেন স্বর্গে। প্রাণী সৃষ্টি করার ইচ্ছায় তিনি একটি ময়ূর ও একটি টিমটিম পাখিকে পাঠালেন দেখে আসতে, যে জল থেকে পৃথিবী মাথা চাড়া

দিয়ে উঠছে কিনা। সুন্দর সুন্দর রঙিন পাথর দেখে ময়ুর তার কাজের কথা সম্পূর্ণ ভুলে গেল। এদিকে টিমটিম পাখি ঠিক স্বর্গে ফিরে গিয়ে ভগবানকে জানাল যে পৃথিবী বেরিয়ে আসছে জলের ভেতর থেকে। ভগবান তখন মর্ত্যে নেমে এসে প্রাণীজগতের সৃষ্টি করলেন। ময়ুর নিজের ভুল বুঝতে পেরে ভগবানের কাছে ক্ষমা চাইল। ময়ূর ভগবানের প্রিয়পাত্র ছিল বলে ভগবান থাকে ক্ষমা তো করলেনই, উপরন্তু বিধান দিলেন যে ময়ূরপুচ্ছ তার শিরের শোভা বর্ধন করবে।" (আসামের লোকসংস্কৃতি, যোগেশ দাস, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ১৯৮৬, পৃ ২৪-২৫)। এই দেউরি সৃষ্টিতত্ত্বের মধ্যে যোগেশ দাশ হিন্দু প্রভাব আছে বলে মনে করেন। কারণ বৈষ্ণবধর্মে ময়ূরের পাখা ও শ্রীকৃষ্ণ অভিন্নভাবে চিত্রিত হয়েছে।

ভারতের বিভিন্ন উচ্চমার্গীয় নৃত্যে এবং জনজাতীয় ও সাধারণ লোকনৃত্যেও ময়ূরের নানা অঙ্গভঙ্গির ও ময়ূর পাখার পোশাক পরার রীতি প্রচলিত। রাভাদের লোকসাহিত্যের ধর্মীয় শাখা মন্ত্রসাহিতে ও ময়ূরের চালের প্রসঙ্গ দেখা যায়। রাভাদের অন্যতম প্রধান দেবতা বায়খো পূজারি করা মাথায় দশ হাত সাদা কাপড়ে পাগড়ি পরে তার মধ্যে গুঁজে দেয় ময়ূর পাখা। আবার আদ্যাশক্তি মা দাদুরীর পূজাতেও দুজন পূজক ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মতো পোশাক পরে মাথার ময়ূর পাখার মুকুট পরে ভক্তজনের সামনে দর্শন দেয়। এর পেছনে বিশেষ কারণ আছে। রাভাদের বিশ্বাস অতীতে রাভারা শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ অসমের তেজপুরে এসেছিলেন। এসম্পর্কে একটি কিংবদন্তি আছে। শোণিতপুরের রাজা (বর্তমান তেজপুর। অসমিয়া ভাষায় তেজ শোণিত বা রক্ত) বাণের একমাত্র কন্যা ঊষা। ঊষা যখন বড় হয়ে পরিপূর্ণ যুবতিতে, পরিণত হয়, তখন দ্বারকার রাজা শ্রীকৃষ্ণের নাতি প্রদ্যুম্মের পুত্র অনিরুদ্ধ গোপনে গন্ধর্ব মতে তাকে বিয়ে করে। এই সংবাদ পেয়ে বাণ রাজা সসৈন্যে এসে অনিরুদ্ধকে বন্দি করে।

"নাগপাশে অনিরুদ্ধ বান্ধে দৈত্যপতি,
এ সংবাদ কৃষ্ণপাশে যায় দ্রুতগতি।" ভাগবত।

এই খবর পেয়ে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা থেকে শোণিতপুরে ছুটে আসেন। সেখানে উভয়পক্ষের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে যখন আহত হয়ে রাজা বাণ মাটিতে পড়ে গেল, তখন ভক্তের অবস্থা দেখে মহাদেব মধ্যস্থতা করায় যুদ্ধের অবসান ঘটে। এর পর আনন্দিত মনে অনিরুদ্ধের সঙ্গে বাণরাজকন্যা ঊষার বিবাহ হয়। সেই থেকে রাজা বাণ এবং সেনাপতি দদান সকলে শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত হয়। ফলে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে শিখিপাখা শোভিত শ্রীকৃষ্ণের রূপ ধারণ করার রীতি প্রচলিত হয় (আয়া বায়খোর মাহাত্ম্য-ব্রজেন্দ্রনাথ রাভা, ২০০২, পৃ ৯-১০)

আবার বোড়ো রাভা প্রভৃতি আদিবাসীদের লোকনৃত্যে যেমন 'ময়ূর নাচ' একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নাচ। এছাড়া রাভাদের মন্ত্রাশ্রয়ী নৃত্যের ক্ষেত্রেও 'ময়রা চাল' একটি বিশেষ নৃত্যশৈলী হিসেবে খুবই জনপ্রিয়।

রাভা লোককাহিনির বর্তমান সংকলনে অন্তত সাতটি লোককথায় ময়ূরের প্রসঙ্গ রয়েছে। কাহিনিগুলি হচ্ছে— ১. ময়রা বায়, ২. গেলাও রাঁভিন, ৩. ময়ূর ময়ূরীর কথা, ৪. কাম্বাং, লৗফুন, কালায় ৫. মেঘের ডাকে ময়ূর কেন নাচে, ৬. ময়ূরের জন্মকথা, ৭. এলেহুয়া রজা (আলসে রাজা)।

এই কাহিনিগুলির 'পাঠান্তর' এক না হলেও কোনো না কোনো ভাবে অন্তত একটি গুরুত্বপূর্ণ বা প্রভাবশালী (Dominent) মোটিফ হিসেবে ময়ূরের প্রসঙ্গ স্থান পেয়েছে। এই সাতটি পাঠান্তরের মধ্যে তিনটি লোককাহিনির পরিকাঠামোর মধ্যে গঠনগত সাদৃশ্য সুস্পষ্টভাবে লক্ষিত হয়। আবার ওই তিনটি লোককাহিনির অনুরূপ পরিকাঠামোগত পাঠান্তর দেখা যায়— একটি 'চীনা' লোককাহিনি ও একটি 'মারমা' (বাংলাদেশের) লোককাহিনিতে। আলোচনার সুবিধের জন্য চারটি লোককথার মোটিফ (Motif) বা গল্পাংশগুলিকে সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হয়েছে। অবশ্য ব্যাপক অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে ভারতীয় উপমহাদেশে বহুলপ্রচলিত 'হংসপরী' (Swan Maiden) বা হংসকুমারীর মত— ময়ূরকুমারী কাহিনির মত অসংখ্য পাঠান্তর রয়েছে বিভিন্ন দেশে ও বিদেশে। কিন্তু এই ক্ষুদ্র পরিসরে দীর্ঘ আলোচনার অবকাশ নেই। ফলে আলোচনার জন্য এই চারটি পাঠান্তরকেই গ্রহণ করা হয়েছে।

তালিকায় উদ্ধৃত গল্পাংশগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে রাভা লোককাহিনি দুটির নায়ক বিধবার একমাত্র ছেলে বা দিদিমার আদরে লালিত অনাথ বালক। অন্যদিকে চীনা এংব মারমা লোককাহিনির দুই নায়কই রাজপুত্র (যাওশূথুন ও সা-থ-নৃ)। এ থেকে সহজেই একথা অনুমান করা যায় যে রাভা লোককাহিনিগুলির "কথক ও শ্রোতা" অত্যন্ত সাধারণ মানুষ এবং তাদের পরিবেশও অতি সাধারণ। আর বক্তা শ্রোতার এই পরিবেশ যদি সম পর্যায়ের না হয় তবে বক্তা ও শ্রোতার যোগসূত্রও সঠিকভাবে স্থাপিত হয় না। ফলে বক্তার কথিত কাহিনি শ্রোতার কাছে সঠিকভাবে সঞ্চালিত হয় না। দুটি রাভা লোককাহিনিতে রাজা বা রাজকন্যার উপস্থিতি ঘটলেও তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা একজন আদিবাসী দলপতির মতই। রাভা লোককাহিনীর বিধবার ছেলে-রাজার বাড়ির গরু চরায়। এটা আদিবাসী গ্রামের এক অতিপরিচিত চিত্র। দুটি লোককাহিনির পারিবারিক চালচলন, খাদ্যাভ্যাস প্রভৃতি চিত্রও অতি সাধারণ রাভা পরিবারেরই চিত্র। দ্বিতীয় কাহিনীটিতে অনাথছেলের গ্রামের অন্যান্য মানুষদের সঙ্গে 'বাহা' প্রথায় মৎস্য চারণা উৎসব বা মাছ ধরার চিত্রও কোনো রাজপরিবারের ঘটনা নয়। কিন্তু দুটি রাভা লোককাহিনিতে চীনা ও মারমা লোককাহিনির মত শিকারী ও সন্ন্যাসী এবং বন্য পশুপাখিদের সাহায্য গ্রহণের প্রসঙ্গ রয়েছে। তেমনি জাদুমন্ত্রের প্রয়োগের মাধ্যমে কোনো কোনো ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য সাধন করা হয়েছে।

চারটি লোককথার নায়করাই নানা বিড়ম্বনা বা প্রতিবেশী রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে তাদের স্ত্রীদের (ছোট রাজকন্যার) কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। পরে পুরনো

পাঁচটি লোককাহিনীর তুলনাত্মক চিত্র				
ভারতীয় (রাভা) লোককাহিনী। **ময়ূর-ময়ূরী কথা।** ১	চীনা লোককাহিনী **ময়ূরকুমারী** ২	ভারতীয় (রাভা) লোককাহিনি **আলসে রাজা।** ৩	বাংলাদেশের (মারমা) লোককাহিনি **মনরি মাঁসুমী।** ৪	ভারতীয় (রাভা) লোককাহিনি **'কাম্বাংলীফুন-কালায়'** ৫
১. **প্রাথমিক অবস্থা** : কোনো রাজ্যের গরিব বিধবার ছেলে রহিত। রাজার ঘরে গোরু চরায়। সে খুব বুদ্ধিমান।	**প্রাথমিক অবস্থা** : মেংবানাজিয়া রাজ্যের অপূর্ব সুন্দর রাজকুমার—যাওশৃথুন। তার রূপে মুগ্ধ যুবতিরা, ভালোবাসার পান সুপারি দিতে উন্মুখ।	**প্রাথমিক অবস্থা** : কোনো এক গাঁয়ের অনাথ ছেলে আলসে। দিদিমার আদরে মানুষ।	**প্রাথমিক অবস্থা** : স্বর্গরাজ ইন্দ্রের সাত কন্যা। পরি বলে তারা ডানা মেলে উড়তে পারত। মর্তে একটা সরোবরে তারা জল খেলতে আসত।	**প্রাথমিক অবস্থা** : কোনো এক রাজ্যের এক গরিব বিধবার ছেলে জাম্বা। সে মাঠে মাঠে গোরু চরাত। গোরু চরানোর সময় ফাঁদ পেতে পাখি ধরত।
২. **ময়ূররূপী ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণী** : রাজার বাঁহেকো ফুলের বাগানে মধু খেতে এসে ময়ূররূপী ইন্দ্র রহিতের পাতা ফাঁদে	২. **সুন্দরী ও বুদ্ধিমতী যুবতীর সন্ধানে** : পথে বেরিয়ে শিকারী গোহাগানের সঙ্গে বন্ধুত্ব এবং সন্ন্যাসী পালাসীর	২. **পাম্পে ঝোরায় গিয়ে স্নানরত কুমারীদের দেখা** : একাধিকবার স্নানরত কন্যাদের মধ্যে ছোটো রাজকন্যার ময়ূর পোশাক লুকোনোর চেষ্টা। (ঋতু	২. **শিকারি কর্তৃক স্নানের পোশাক লুকিয়ে ছোট কন্যাকে আটক করা** : নাগরাজের কাছ থেকে পাওয়া জাদু জ্ঞানের সাহায্যে ছোটো	২. **বকরূপী ছোটো দেবকন্যা** : একদিন বিলের ধারে ফাঁদ পাতায়, ধরা পড়ল বকরূপী ছোটো দেবকন্যা। তাকে

বন্দি হওয়া। নিজের কন্যাকে হরিতের সঙ্গে বিয়ে দেবার শর্তে মুক্তি। পুটুলিতে সর্ষে বেঁধে স্বর্গের পথে যাত্রা।	আদেশে লাংসিনা হ্রদে গিয়ে স্নানরত দেবকন্যাদের, ছোটজনের ময়ূর পোশাক লুকোনো।	দেবতা সিংকে আটক করে, ফসল ফলানোর প্রতিশ্রুতি আদায় করা) শেষ পর্যন্ত দিদিমার জাদুমন্ত্রে পোশাক লুকোতে সক্ষম হওয়া।	রাজকন্যাকে আটক করা। ছোটো রাজকন্যা তাকে ধর্মভাই পাতানোয় নিজে বিয়ে করতে না পারায় রাজপুত্র মা-থা-নূ-র কাছে নিয়ে যাওয়া।	বাড়িতে নিয়ে এসে মায়ের হাতে দিল পরদিন রান্না করার জন্য।
৩. স্বর্গের পথে যাত্রা (সুন্দরী রাজকন্যার সন্ধানে : সর্ষে ফুলের চিহ্ন ধরে, রহিতের ইন্দ্রের মালিনী বুড়ির ঘরে পৌঁছানো। মালিনীবুড়ির পরামর্শে সেখানে স্নানরত ময়ূর পোশাক লুকিয়ে রাখে। পোশাকের সূত্রে বিধবার ছেলের সঙ্গে ছোটো রাজ-কন্যার সাক্ষাৎ। বিয়ে। তাকে নিয়ে বিধবা মায়ের ঘরে ফিরে এসে ঘরসংসার করা।	**ছোট রাজকুমারীকে নিজের প্রাসাদে নিয়ে আসা :** ময়ূর পোশাক নিতে এসে যাওশূথুনের সঙ্গে ছোটো রাজকুমারীর সাক্ষাৎ। তারপর রাজ-কুমারীকে নিয়ে নিজের রাজ্যে ফিরে আসা ও সুখে শান্তিতে বাস করা।	**দুজনের মধ্যে ভালোবাসা ও অভিজ্ঞান বিনিময় :** দিদিমার পরামর্শে আবার পাম্পে ঝোরায় গিয়ে ছোটো দেবকন্যার পোশাক লুকোনোর সূত্রে, তার সঙ্গে দেখা। দুজনের দুজনকে ভালোবাসা। তারপর অভিজ্ঞান বিনিময়। তারপর সাতদিনের মধ্যে বিয়ে করার জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়ে দুজনের নিজ নিজ ঘরে ফিরে যাওয়া।	**ছোটো দেবকন্যাকে নিজের ঘরে নিয়ে আসা :** প্রথম সাক্ষাতেই রাজপুত্র মা-থা-নূও রাজকুমারী মনরির ভালোবাসা। তাকে রাজবাড়িতে নিয়ে যাওয়া ও সুখে ঘরসংসার করা। এমন সময় প্রতিবেশী রাজার আক্রমণ প্রতিহত করতে মা-থা-নূর-এর যুদ্ধ যাত্রা। মনরি তখন সন্তান সম্ভবা।	**বকরূপী যুবতির পরিচয় :** পরদিন রান্নার জন্য তার মা বকটাকে কাটতে গেলে, বক তাকে জানাল কীভাবে তারা সাতবোন বকরূপে স্বর্গ থেকে বিলে স্নান করতে এসে (সে) ধরা পড়ল। সব শুনে বিধবা তাকে ছেড়ে দিল।

৪. দিদিদের সঙ্গে রাজকুমারীর স্বর্গে দেখা : সুখ তাদের জীবনে স্থায়ী হল না। ছোটো দেবকন্যার দিদিরা এসে জাদুমন্ত্রের সাহায্যে রহিতকে ঘুম পাড়িয়ে, ছোট দেবকন্যাকে আবার স্বর্গে ফিরিয়ে নিয়ে যায়।	**যাওশৃথুনের যুদ্ধ যাত্রা নানমৌরানার পিতৃ-রাজ্যে ফিরে যাওয়া :** নানমৌরানার রূপের কথা শুনে প্রতিবেশী রাজা কর্তৃক যাওশৃথুনের রাজ্য আক্রমণ। যাওশৃথুনের যুদ্ধযাত্রা। তার অবর্তমানে, পুরোহিত ও মহামন্ত্রীর ষড়যন্ত্রে নানমৌরানার প্রাণ নাশের চেষ্টা। ময়ূরের পোশাক পরে কোনক্রমে নানমৌরানা তার পিতৃরাজ্যে ফিরে যায়।	**ছোট রাজকুমারীকে বিয়ে করার জন্য আলসের স্বর্গের পথে যাত্রা :** অনেক বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে, পশুপাখি বন্ধুদের সাহায্যে আলসে স্বর্গে পৌঁছায়। সেটা ছিল সপ্তম দিন অর্থাৎ তার বিয়ে করতে যাওয়ার শেষ দিন।	**ব্রাহ্মণের ষড়যন্ত্রে, জঙ্গলের ঋষির কাছে অভিজ্ঞান রেখে মনরির পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্তন :** মনরির ছেলে হওয়ার পর সে বৌদ্ধভিক্ষুদের দানধ্যান করে। ফলে রাক্ষসরা এমনভাবে ষড়যন্ত্র করে যে মনরি তখন তার পিতৃগৃহে ফিরে যেতে বাধ্য হয়। ফিরে যাওয়ার আগে মনরি জঙ্গলের ঋষির কাছে তার আংটি রেখে যায় এবং কীভাবে স্বর্গে পৌঁছানো যাবে তাও বলে যায়।	**জাদুবিদ্যার সাহায্যে :** সে সকলের অগোচরে যুবতির রূপ ধরে ঘরের সব কাজ সেরে রাখত। বাইরে বের হত না এতে সকলে অবাক হত।
৫. রাজকন্যার সন্ধানে স্বর্গে যাত্রা : ঘুম থেকে উঠে ছোটো দেবকন্যাকে না দেখে	**যুদ্ধ জয় করে ফিরে আসার পর নানমৌরানার সন্ধানে স্বর্গে যাত্রা :**	**অভিজ্ঞান পাঠিয়ে ছোটো রাজকন্যার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা :** বিয়ে	**যুদ্ধ জয় করে ফিরে এসে মনরির সন্ধানে স্বর্গযাত্রা :** পথে সেই জঙ্গলের ঋষির	**দেবকন্যা ধরা পড়ল :** অবশেষে একদিন জাম্বার

রহিত তার সন্ধানে ছুটল। মালিনীবুড়ির পরামর্শে কপিলা গাইএর লেজ ধরে সে স্বর্গে পৌঁছোয়। সেদিন সেখানে ইন্দ্রের সাত কন্যার বিয়ে উপলক্ষ্যে জল নিতে আসা একজন মেয়ের মাধ্যমে অভিজ্ঞান পাঠিয়ে ছোটো কন্যার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন। ছোট কন্যা ইন্দ্রকে জানায় সে রহিতকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবে না।	সন্ন্যাসী পালাসীর পরামর্শে অনেক বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে যাওশৃথুন স্বর্গে পৌঁছোয়। ছোটো রাজ -কুমারী ফিরে আসায় সেদিন সেখানে উৎসব। সেই উপলক্ষ্যে জল নিতে আসা এক পরিচালিকার সাহায্যে তার অভিজ্ঞান পাঠিয়ে যোগাযোগ করার পর দেবরাজ সব জানতে পারে।	উপলক্ষ্যে জল নিতে আসা এক দেবকন্যার সাহায্যে আলসে ছোটো রাজকুমারীর সঙ্গে যোগাযোগ করে। তখন ছোটো রাজকন্যা তার বাবাকে সব জানায়।	কাছ থেকে আংটি নিয়ে, ঋষির পরামর্শে নাগরাজের পিঠে ভর দিয়ে সা-থ-নূ এক নির্জন দ্বীপে গিয়ে পৌঁছাল। সেখান থেকে স্বর্গে। সেখানে রাজ কুমারীর স্নানের জল নিতে আসা এক সখীর মাধ্যমে আংটি পাঠিয়ে মনরির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে।	মায়ের অবর্তমানে জাম্বা লুকিয়ে থেকে দেবকন্যাকে ধরে ফেলল। তারপর তার দিদিমার পরামর্শে মন্ত্রপূত তেল ও দুধ প্রয়োগ করে মানবীরূপী ছোটো দেবকন্যাকে ধরে ফেলল। ছোটো দেবকন্যা আর বকের রূপধারণ করতে পারল না। স্বর্গেও ফিরে যেতে পারল না।
৬. ইন্দ্র কর্তৃক বিয়ের পূর্ব শর্ত আরোপ : রহিত ইন্দ্রকে তার প্রতিশ্রুতির কথা মনে করিয়ে দিলে, ইন্দ্র তখন কতকগুলি কঠিন	**রাজা তখন কতকগুলি শর্ত আরোপ করল :** রাজা সব শুনে তাকে	**রাজা কর্তৃক আলসের সঙ্গে ছোটো রাজকন্যাকে বিবাহে রাজপুত্রের দ্বন্দ্বযুদ্ধের**	**রাজা কর্তৃক বিয়ের পূর্ব শর্ত আরোপ** : দেবরাজ তখন সব শুনে দুটি কঠিন পরীক্ষার শর্তে বিয়ে দিতে রাজি হল।	**ছোটো দেবকন্যার সঙ্গে বিবাহ :** যুবতিরূপী ছোটো দেবকন্যাকে পেয়ে জাম্বার মা সমাজের

পরীক্ষার পর বিয়ে দিতে রাজি হল। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে রাজকন্যা লাভ নাহলে মৃত্যু!	বিয়ের কতকগুলি কঠিন পরীক্ষার শর্ত আরোপ করল।	**শর্ত** : ঠিক হল শর্ত অনুযায়ী দ্বন্দ্বযুদ্ধে যে জয়ী হবে তার সঙ্গে ছোটো কন্যার বিয়ে দেওয়া হবে।		সকলকে ডেকে দিনক্ষণ দেখে ছোটো দেবকন্যার সঙ্গে জাম্বার বিয়ে দিয়ে দিল।
৭. **কঠিন পরীক্ষায় জয়লাভ** : রহিত তার পোকা মাকড় ও পশুপাখি বন্ধুদের সহায়তায় সব পরীক্ষায় জয়লাভ করল।	**পরীক্ষায় জয়লাভ**: রাজপুত্র যাওশৃথুন তার জাদুধনুক আর জোনাকি পোকার সাহায্যে সব কঠিন পরীক্ষায় জয়লাভ করল।	**দ্বন্দ্বযুদ্ধে জয়লাভ** : আলসে তার পশুপাখি বন্ধুদের সহায়তায় দ্বন্দ্বযুদ্ধে তার প্রতিদ্বন্দ্বী রাজপুত্রকে যুদ্ধে হারিয়ে দিল।	**পরীক্ষায় জয়লাভ** : ছোটো রাজকুমারীর সাহায্যে সা-থ-নৃ দুটি পরীক্ষাতেই জয়লাভ করল।	**ছ-বোনের আগমন** : এদিকে ফাঁদে পড়ার সময় তার বাকি ছ-বোন পালিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেদিনের পর থেকে তারা তাদের আদরের ছোটো বোনকে খুঁজছিল।
৮. **অনভিপ্রেত পরিণতি** : ইন্দ্র তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করে রহিতকে হত্যার জন্য ষড়যন্ত্র করতে থাকে। রহিত তার ষড়যন্ত্রে একটা ময়ূরে পরিণত	**যাওশৃথুন ও নানমৌরানার মিলন** : রাজা তখন যাওশৃথুনের বীরত্বের পরিচয় পেয়ে	**আলসের সঙ্গে রাজকন্যার বিবাহ** : আলসের বীরত্বে খুশি হয়ে রাজা তার সঙ্গে ছোটো কন্যার বিয়ে দিল।	**সা-থ-নৃ ও মনরির বিবাহ** : সা-থ-নূর বীরত্বের পরিচয় পেয়ে রাজা তখন মনরির সঙ্গে তার বিয়ে দিল।	**ছোটো বোনের সাক্ষাৎ** : এবার একদিন তারা তাকে দেখতে পেল। তারপর মায়াবিদ্যার সাহায্যে নানাপ্রকার

হয়। তা দেখে মনের দুঃখে ছোটো কন্যাও একটা ময়ূরীতে পরিণত হয়। তারপর একসময় তারা আকাশে উড়ে যায়।	নানমৌরানার সঙ্গে তার বিয়ে দিল। তারপর তারা নিজের রাজ্যে ফিরে এসে মহাসুখে বসবাস করতে লাগল।	তারপর তারা আলসের ঘরে এসে সুখে বসবাস করতে লাগল। (এরপর তাদের একবার বিচ্ছেদ ঘটে। কিন্তু পশুপাখি বন্ধুর সাহায্যে আলসে আবার ছোটো রাজকন্যাকে ফিরিয়ে আনে।)	ইন্দ্র তখন তাদের নিজেদের ঘরে পাঠানোর ব্যবস্থা করল। সেখানে নানা ঘটনার পর তাদের ছেলের সঙ্গে মিলন ঘটল। তারপর তারা সুখে শান্তিতে বসবাস করতে লাগল।	পশুপাখির রূপ ধরে, ছোটো বোনকে উদ্ধার করার চেষ্টা করল। ছোটো বোনও তার যাদুবিদ্যার সাহায্যে তাদের চেষ্টা ব্যাহত করল।
				ময়ূরের রূপধারণ : একদিন ছোটো বোন মাছ ধরতে গেল। উঠোনে শুকোতে দেওয়া তার কাপড় তুলতে গিয়ে বড়ো বোনদের জাদুমন্ত্রে জাম্বা ময়ূরে পরিণত হল। তা দেখে ছোটো কন্যাও তার স্বামীর কলারটা (ধুতি) গাছে

				জড়িয়ে ময়ূরে পরিণত হল। তারপর আকাশে উড়ে গেল।
"ময়ূর ময়ূরীর কথা" 'আতো আবুর সাধু' সংগ্রহ : ডা: শরৎচন্দ্র রাভা বোকো, অসম-২০০২, পৃ-১-১৬।	'ময়ূর কুমারী' গ্রন্থের প্রথম লোককাহিনি। চীনের লোককাহিনির নির্বাচিত সংকলন, বিদেশী ভাষা প্রকাশনালয়, পেইচিং, ১৯৯০, পৃ-৩১।	'আলসে রাজা' সংগ্রহ বরদলৈ রঙান, অসমীয়া অনুবাদ প্রসেনজিৎ মৌজি; অসম। বাংলা-বিমলেন্দু মজুমদার।	'মনরি মাঁসুমি' মারমা রূপকথা। উপজাতীয় নন্দন সংস্কৃতি। জাফার আহসাদ হানাফী। ১৯৯৩। পৃ. ২৪১-২৪৭। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী। সেগুন বাগিচা, রমনা, ঢাকা-১০০০।	কাম্বারং—লৌকুন-কানায়; ড. রেবতী মোহন সাহা। অজিতেশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'মধুপর্ণী'তে ১৯৯১ সালে প্রকাশিত।

বন্ধু বা সাহায্যকারীদের সাহায্যে আবার স্বর্গরাজ্যে পৌঁছোয়। কিন্তু সেখানে পৌঁছে নায়িকার সঙ্গে সরাসরি সাক্ষাৎ না করে, তাকে স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য নির্দিষ্ট কোনো অভিজ্ঞান কখনো আংটি কখনও চুলবাঁধার চিরুনি পাঠিয়ে ছোট রাজকুমারী (বা স্ত্রীদের) সঙ্গে যোগাযোগ করে। এক্ষেত্রে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে ছোট রাজকুমারী যখনই তাদের স্বর্গরাজ্যে পিতার বাড়িতে ফিরে গিয়েছে, তখন, হয় তাদের বিয়ের আয়োজন করা হয়েছে বা তাদের ফিরে পাওয়ায় আনন্দ উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। এধরনের উৎসবের প্রয়োজনে সকল ক্ষেত্রে রাজবাড়ির বাইরে গ্রামের কোনো নির্দিষ্ট জলাশয় থেকে (যেখান থেকে গ্রামের সকলেই স্নানের বা পানের জল সংগ্রহ করে থাকে) জল সংগ্রহ করে। এই ঘটনার মধ্যে দিয়ে জলাশয়টি যে গ্রামের সকলের যৌথ সম্পত্তি (Community property বা Common property) তার পরিচয় পাওয়া যায়। (যা প্রাচীন সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থারই একটা প্রতীক)। তেমনি জলভরার ঘটনার সঙ্গেও সমকালীন আর্থ-সামাজিক অবস্থানের পরিচয় পাওয়া যায়। একমাত্র চীনা লোককথাটি ছাড়া আর তিনটি লোককাহিনিতেই হয় নায়িকা নিজে অথবা, তার গাঁয়ের মেয়েরা কলসীতে করে জল নিতে আসে। একমাত্র চীনা লোককথায় জল নিতে আসে রাজকন্যার পরিচারিকা এবং তার সংলাপের মধ্যেও পরিশীলিত উচ্চবর্গের মানুষের বাক্যালাপের পরিচয় পাওয়া যায়।

গল্পাংশগুলির শেষ পর্বের আগের পর্বে— অর্থাৎ রাজকন্যার সঙ্গে নায়কের দ্বিতীয়বার যোগাযোগের পর— রাজা কর্তৃক নায়কের পরীক্ষা গ্রহণ (যাকে লোকসংস্কৃতির ভাষায় বলা হয়েছে— জামাতা পরীক্ষা— Suitortest) এবং জাদু প্রক্রিয়ার সাহায্যে বা নায়িকার সাহায্যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর রাভা লোককাহিনি— 'ময়ূর ময়ূরী কথায়' নিষ্ঠুর শ্বশুরের ষড়যন্ত্রে নায়ক-নায়িকা দুজনই ময়ূরের রূপ ধারণ করে আকাশে উড়ে যায়। অন্য তিনটি কাহিনিতে অবশ্য নায়ক-নায়িকা নায়কের ঘরে ফিরে এসে সুখে শান্তিতে বসবাস করার কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

কাহিনির পরিণতি অবশ্য খুব স্বাভাবিকভাবেই দুর্বলের জয়-দুর্জনের পরাজয় সূত্র অনুসারেই ঘটেছে। কিন্তু এক্ষেত্রে শুধুমাত্র দুর্বলের জয়ই নয় স্বর্গলোকের দেবতাদের পরাজিত করে দেবকন্যার সঙ্গে সাধারণ মানুষের বিয়ের মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের জয় ঘোষিত হওয়া।

আলোচিত চারটি কাহিনির মধ্যে আর একটি বিশেষত্ব হচ্ছে নায়িকা প্রাধান্য। অর্থাৎ লোককাহিনিগুলিতে সকল ক্ষেত্রেই আপাতদৃষ্টিতে নায়কের জয় ঘোষিত হলেও কাহিনিগুলির মূল পরিচালিকা শক্তি হচ্ছে নায়িকা (এক্ষেত্রে পরিকুমারী বা ছোট রাজকুমারী বা দেবকন্যা)।

কাহিনির শুরুতে স্বর্গের দেবকন্যাদের (বা ময়ূর কুমারীদের) নিজ নিজ ময়ূর-পোশাক খুলে রেখে জলখেলার বা স্নান করার দৃশ্য অত্যন্ত প্রবলভাবে কাহিনির

নায়কদের আকৃষ্ট করেছে।

দ্বিতীয়ত, কোনো কোনো ক্ষেত্রে শিকারি বা সন্ন্যাসীর (মালিনী বুড়ি বা দিদিমার) মাধ্যমে বা আনুকূল্যে নায়ক সেই জলখেলা দেখার সুযোগ পেয়েছে। জলখেলার সময় ছোট রাজকন্যার পোশাক লুকোনোর ক্ষেত্রে নায়কের তুলনায় রাজকন্যা অনেক বেশি প্রবল। অবশেষে কারো সহায়তায় ছোট রাজকন্যার সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয় এবং রাজকন্যারই ইচ্ছা অনুসারে তার সঙ্গে বিবাহিত জীবনযাপন শুরু করে।

চতুর্থ পর্যায়ে, রাজপুত্রের যুদ্ধযাত্রা এবং রাজপুরোহিতের চক্রান্তের ফলে রাজকন্যার পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্তন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই চক্রান্তের মাধ্যমে রাজকন্যাকে হত্যা করার চেষ্টা করা হলেও, কার্যত তা করা সম্ভব হয়নি। সবক্ষেত্রে রাজকন্যা কখনও স্বেচ্ছায় কখনও জাদুবিদ্যা প্রয়োগ করে ময়ূরের পোশাক পরে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করেছে।

ষষ্ঠত, নায়ক যাতে দ্বিতীয়বার স্বর্গলোকে পৌঁছতে পারে এবং রাজকন্যার সঙ্গে আবার মিলিত হতে পারে, সেজন্য নায়িকা নিজেই কোনো না কোনো প্রকার অভিজ্ঞান রেখে গিয়েছে।

সপ্তমত, রাজকন্যাদের বিয়ের অনুষ্ঠান বা উৎসবের ক্ষেত্রে নারীপ্রাধান্য দেখা যায়। গ্রামের কোনো মেয়ে বা পরিচারিকার সাহায্য ছাড়া, অভিজ্ঞান থাকা সত্ত্বেও নায়কের পক্ষে রাজপ্রাসাদে গিয়ে ছোট রাজকন্যার সঙ্গে দেখা করা সম্ভব হত না। এক্ষেত্রে রাজকন্যার জল নিতে আসা কোনো না কোনো মহিলার সহায়তায় তা সম্ভব হয়েছে।

নবমত, রাজা বা ভাবি শ্বশুর কর্তৃক আয়োজিত কঠিন পরীক্ষায় জয়লাভ করার ক্ষেত্রেও নারীপ্রাধান্যই প্রকাশ পেয়েছে। ছোট রাজকন্যা সর্বক্ষেত্রে সেসব যুদ্ধ জয় করার একটা উপায় নায়ককে আগে থেকেই জানিয়ে রেখেছে। তবেই এতসব কঠিন পরীক্ষায় নায়কের জয়লাভ সম্ভব হয়েছে।

সবশেষে ঘরে ফেরার পালা। রাজকন্যা বা নায়িকার আত্মত্যাগের ফলেই তা সম্ভব হয়েছে। কোনো কোনো অনাথ বালকের ক্ষেত্রে রাজবাড়িতে থাকা সম্ভব নয়, এমনকি সাধারণ রাজপুত্র হলেও নয়। মর্ত্যলোকের সাধরণ মানুষ স্বর্গলোকের দেবকন্যাকে জয় করলেও স্বর্গলোকে বাস করা সম্ভব নয়। তাই কাহিনির শেষে দেবকন্যাকে নিয়ে 'মানুষ'কে আবার মর্ত্যেই ফিরে আসতে হয়। এক্ষেত্রে বাভা সমাজব্যবস্থায় প্রচলিত সামাজিক রীতি (Social custom) লঙ্ঘন করা হয়েছে। মাতৃতান্ত্রিক রাভাসমাজে বিয়ের পর ছেলেকে স্ত্রীর বাড়িতে সংসার করতে যেতে হত। আর পরিবারে মায়ের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হত কনিষ্ঠা কন্যা। কিন্তু আলোচ্য সবকটি কাহিনিতেই,কাহিনির নায়ক (অনাথ বালক/ আলসে/ রাজপুত্র) ছোট রাজকন্যাকে নিয়ে নিজের ঘরে ফিরে এসেছে বা ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছে। (যদিও বর্তমানে রাভাসমাজে এখন আর এই ব্যবস্থা বলবত নেই। পরিবর্তে পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রচলিত হওয়ায় সম্পত্তির উত্তরাধিকারীর ক্ষেত্রেও পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে)। অথচ লোককাহিনিগুলির অন্যান্য

ঘটনা চিত্র থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, অন্তত রাভ'
যা সুদূর অতীতে রচিত হয়েছিল, তার বিশেষ কোনো পরিব৬
নারীচরিত্রের প্রাধান্যও তা প্রমাণ করে। চারটি কাহিনিতেই দেখা ৮.
রাজকন্যা প্রত্যক্ষভাবে অনুপস্থিত থেকেও মূল ঘটনাক্রমকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। এ৮
পূর্বভারতের মাতৃতান্ত্রিক আদিবাসী সমাজের অন্যতম লক্ষণ।

সহায়ক গ্রন্থ :

১. হাকাচাম, ড. উপেন ৰাভা (২০০০) "ৰাভা ভাষা আবু সাহিত্য', গুয়াহাট, অসম।

২. দত্ত, ভবতারণ (১৯৯০) "ময়ূরকুমারী" ও "সাতবোন" চীনের লোককাহিনি নির্বাচিত সংকলন। ৩য় খণ্ড। বিদেশী ভাষা প্রকাশনালয়।, পেইচিং, চীন।

৩. চেৰেঙ্গা, জনশ্রী (সম্পাদক) (২০০২) "টিক্রিবাও (স্মৃতিগ্রন্থ), বেবাক ৰাভা ক্রৌরাং বুঞ্জুম সম্মেলন" টিক্রিকিল্লা, মেঘালয়।

৪. প্রকাশ, ৰাভা (সম্পাদক) (২০০১) "ৰাভা স্তুতি-মন্ত্র-গীত" (প্রথম খণ্ড) বেবাক ৰাভা ক্রৌযাং বুঞ্জুম। দুধনৈ, উদয়পুর, অসম।

৫. ৰাভা ডাঃ শৰৎচন্দ্র (২০০১) "বগেজাৰী, পাৰবাঁহ, হানাঘোঁৰা," বোকো, কামরূপ, অসম।

৬ ৰাভা, ড মলিনাদেবী (২০০২) "ৰাভা সাহিত্যের বুৰঞ্জী (প্রথম খণ্ড) গুয়াহাটি, অসম।

৭ মজুমদার বিমলেন্দু (২০০৯) "আদিবাসী ও পরিবেশ . অস্তিত্ব ও সংস্কৃতির অবিচ্ছিন্নতা, 'পরিবেশ-কথা', সমতট প্রকাশন ১৬১ ১৬২, কোলকাতা।

৮. মজুমদার বিমলেন্দু (২০০৮) 'রাভা জনজীবন ও লোককাহিনি, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা।

৯. Majumder, D N (1961 rpt) "Races and cultures of India, '
Asia Publishing House, India

১০. Chatterjee, Suniti Kumar (1981 Rpt) "Kirata-Jana-Kriti, 'The Asiatic Society, Kolkata

১১ Satter, Abdus (1975) "Tribal culture in Bangladesh, Muktadhara Dhaka, Bangladesh

১২. হানাফী, জাফার আহমদ (১৯৯৩) "উপজাতি নন্দন সংস্কৃতি" শিল্পকলা একাডেমী ঢাকা, বাংলাদেশে।

১৩. কামা, জগৎ (২০০১), "হা-তাণ্ডি", "রাভা স্তুতি-মন্ত্র-গীত", (প্রথম খণ্ড) সম্পাদনা প্রকাশ রাভা।

১৪ Griffiths, W.G (1993) Rpt "The Kol Tribes of Central India", The Asiatic Society, Kolkata

মেচ লোককথা

প্রমোদ নাথ

একটি জনগোষ্ঠীর বংশ পরম্পরায় মুখে মুখে প্রচলিত গল্পকে সাধারণত লোককথা বা Folk Tale বলা হয়ে থাকে। এই লোককথা বা লোক কাহিনীতে সাধারণত মানব জীবন ও সমাজের ছবি যেমন থাকে তেমনি থাকে নানা অজানা ইতিহাস এবং সমাজের বিভিন্ন বিষয়ের গল্প। গবেষকরা বলেন—যে জাতি যত বিচিত্র বিষয়ক লোককথার জন্ম দেয় সে জাতি তত বেশি সাংস্কৃতিক চেতনায় সমৃদ্ধ—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

আধুনিক কাহিনী ধর্মী উপন্যাস বা ছোটগল্পের সঙ্গে লোক কথা বা Folk Tale-এর মৌলিক পার্থক্য আছে। আমাদের আলোচ্য লোককথাগুলি আকারে ছোট গল্পের মতো হলেও আঙ্গিকের দিক থেকে আধুনিক গল্পের সাথে একটা মৌলিক পার্থক্য আছে। আধুনিক গল্প, উপন্যাসে কয়েকটি উপাদান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কাহিনী, চরিত্র, সংলাপ, সময় ও ঘটনাস্থল, রচনারীতি এবং লেখকের জীবনদর্শনই প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় আধুনিক উপন্যাসে। লোককথা আধুনিক কথা সাহিত্যের প্রথম পর্ব হলেও লোককথা মূলত গতানুগতিক ভাবে বর্ণিত হয়। এই বর্ণনায় আধুনিক কথা সাহিত্যের শৈলী ভাবনা কৌশল থাকে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কথকতার ভঙ্গিতে কাহিনী ব্যক্ত হয় লোককথায়। ফলে লোককথায় আধুনিক কথা সাহিত্যের নাটকীয়তা, চমক বা বৈচিত্র্য থাকে না।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে কতকগুলি সু-নির্দিষ্ট মৌলিক বিষয় বস্তু বা অভিপ্রায় বা মোটিফ অবলম্বন করেই দেশ-দেশান্তরে এক জাতীয় লোককথা রচিত হয়। ফলে চীন দেশের রূপকথার গোল রুটি ভারতের রূপকথায় অন্য কোন খাদ্য বস্তু হয়ে উঠে। তবে জীব-জন্তু বিষয়ক লোককথা পৃথিবীর সব দেশেই পাওয়া যায়। বুদ্ধি মান শিয়াল, কথা বলা পাখি, সাপ, ভালুক, বাঘ ইত্যাদি পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই পাওয়া যাবে। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর টুন-টুনির বই-এর উপকথা উত্তর ব্রহ্ম দেশ (মায়নামার) জন সমাজেও ব্যাপক ভাবে প্রচলিত।

লোককথা সাধারণত ঐতিহ্যের অনুসারী। ফলে এখানে নতুনত্ব আনার প্রশ্ন উঠে না। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে কাহিনী বর্ণনায় সামান্য হের ফের ঘটানো হয়ে থাকে। শৃগাল সম্পর্কিত উপকথার উৎস সাঁওতাল পরগনার ছোটনাগপুর হলেও সমগ্র বাংলা

দেশে তার ব্যাপ্তি। আধুনিক লোককথার ভিতর একটা চিরন্তন প্রাণ শক্তি বা গ্রহণ যোগ্যতা আছে। তার জন্য লোককথা দেশদেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ে। যেমন ছড়িয়ে পড়েছিল—দেশ-দেশান্তরে বণিকদের মাধ্যমে। বাণিজ্য সূত্রে ভারত থেকে লোক কথা চলে গেছে ঈশপের গল্পে বা ইউরোপের নানা দেশে। মধ্য প্রাচ্যে, চীন দেশে। ঈশপ পৃথিবীর সব দেশের লোককথার সাধারণীকরণ ঘটিয়েছিলেন। ঈশপের গল্পের পরিচিতি বিপুল ও ব্যাপক। আমাদের দেশের বিষ্ণু শর্মা কথিত পঞ্চতন্ত্র কাহিনীর প্রভাব বিদেশের লোককথায় প্রচ্ছন্ন ভাবে পাওয়া যায়।

লোককথায় ধর্ম একটা বড় ভূমিকা গ্রহণ করে। নানা দেশের নানা ধর্ম। কিন্তু ধর্ম নির্ভরতা, ধার্মিক ব্যক্তি, ধর্ম বিশ্বাস, শিলাকে দেবতা জ্ঞান, গাছের মধ্যে ঈশ্বর কল্পনা পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই আদিম জন জাতি নির্ভর মানব সমাজের মধ্যে দেখা যায়। অনেক ক্ষেত্রে লোককথায় গুরুত্ব পায় লোকপুরাণ। পশুর মধ্যে দেবতা, নদী-দেবতা, সৌভাগ্যের দেবতা ইত্যাদির সঙ্গে সৃষ্টির্কতা এবং সৃজন, স্বর্গ, সূর্য, মানুষের জন্ম, মানুষের নানা পেশা নিয়ে লোকপুরাণ রচিত।

লোককথায় বিশ্ব জনীনতা প্রতিফলিত হয়। লোককথা আঞ্চলিক হয়েও বিশ্বজনীন। লোককথার পরিধি একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। মোটিফের মাধ্যমে বিশ্বের যে কোন প্রান্তের লোককথা বিশ্লেষণ করা হলে দেখা যাবে তাদের মধ্যে মানসিক অভিপ্রায়ের এক আশ্চর্য একাত্মতা বা মিল রয়েছে। আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য বা স্থানীয় বৈশিষ্ট্য অনেক লোককথার মধ্যে থাকলেও—তার ঊর্ধ্বে উঠে বা সেই আঞ্চলিক বা স্থানীয় বৈশিষ্ট্যকে ছাপিয়ে আমরা সার্বজনীন অভিপ্রায়ের রূপ দেখতে পাই বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন লোককথার মধ্যে।

আমেরিকান গবেষক স্টিথ টমসন লোককথার মোটিফ সূচীর (motif) পূর্ণাঙ্গ রূপ দেন। 'মোটিফ' শব্দটি ফরাসি ভাষা থেকে গৃহীত হয়েছে। গবেষক স্টিথ টমসন ইংরেজি বর্ণমালার কুড়িটি বর্ণ নিয়ে কুড়িটি বর্গ বা শ্রেণী চিহ্নিত করেছেন বাদ দিয়েছেন তিনটি বর্ণ—যথা--ও, আই এবং ওয়াই। যেমন—এ = লোকপুরাণ, বি = জীবজন্তু, সি = ট্যাবু ইত্যাদি। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে—এই বর্গী করণ এমন ভাবে করা হয়েছে বা সাজানো হয়েছে যে, এর বাইরে আর কোন বিষয় না থাকে। লোককথা যেহেতু ঐতিহ্য নির্ভর তাই এখানে নতুন বিষয় বা আধুনিক জীবন নির্ভর কোন উপকরণ যুক্ত হতে পারে না। তাই লোককথায় রিষ্ট ওয়াচ (হাত ঘড়ি), বিমান, যন্ত্র নির্ভর যান ইত্যাদি বিষয় আসতে পারে না। লোককথা একান্তভাবে গ্রাম নির্ভর। প্রাকআধুনিকতা পূর্ব সমাজ্-জীবনের সৃষ্টি। স্বাভাবিক ভাবেই এই লোককথা লোক সংস্কৃতির মতোই ব্যক্তি চিহ্নিত নয়। এ গুলির স্রষ্টা বা লেখকের ব্যক্তি নাম নেই। এক হিসেবে লোককথা গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় নির্ভর সৃষ্টি।

আলোচ্য নিবন্ধে আমাদের আলোচ্য বিষয় মেচ জনগোষ্ঠীর লোককথা নিয়ে।

লোককথা বিষয়ে যাবার পূর্বে আমরা মেচ জন গোষ্ঠী বিষয়ে কিছু আলোকপাত আবশ্যিক বলে মনে করি। উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি, কোচবিহার এবং দার্জিলিং জেলায় বসবাসকারী বিভিন্ন আদিবাসী জন গোষ্ঠীর মধ্যে মেচ বা বোড়ো সম্প্রদায়ের মানুষেরা এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। নৃ-তাত্ত্বিক বিচারে এই সম্প্রদায়ের মানুষেরা ইন্দো-মঙ্গোলয়েড গোষ্ঠীর অন্তর্গত একটি শাখা। 'মেচ' ভাষাকে 'বোড়ো' বা 'বোডো' (Bodo) ভাষাও বলা হয়। বি. এইচ. হজসন 'বোড়ো' শব্দটিকে জাতি এবং ভাষাগত শব্দ বোঝাতে প্রথম ব্যবহার করেন। পরবর্তীকালে 'বোডো' শব্দটিকে জাতি ও ভাষা বোঝাতে ব্যবহার করা হয়। এদের দেহবর্ণ হলদে আভাযুক্ত ফর্সা। চোখ ছোট ও ফোলা। নাক মোটা ও চাপা। ঠোঁট ও চোয়ালের গঠনে এদের মঙ্গোলীয় ছাপ প্রকট। গোঁফ প্রায় নেই। চুলের রং কালো। দেহের গড়ন সুঠাম। উচ্চতা মাঝারি ধরনের। মেচ সম্প্রদায়ের মানুষেরা মূলত প্রকৃতির উপাসক। এদের প্রধান দেবতা হল 'বার্থৌ' বা 'বাঠৌ'। বার্থৌ-এর প্রতীক হল সিজু গাছ। 'বার্থৌ'-এর অবস্থান প্রতিটি 'মেচ' বাড়ির উত্তর পূর্ব কোণে। প্রধান দেবতা হলেন 'বার্থৌ' এবং প্রধান দেবী হলেন—'মাইনাও'।

মেচ বা বোড়ো সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত আছে নানাবিধ লোককথার। 'কচু চাষ' নামে একটা লোককথা প্রচলিত আছে এই সম্প্রদায়ে। গল্পটির সারাংশ এইরূপ।

মেচ লোককথা—১

অতি প্রাচীনকালে এক গ্রামে এক বুড়া-বুড়ি বাস করতো। তাদের আর কেউ ছিল না। একবার তারা ধান-পাটের বদলে কচু চাষে উদ্যোগী হয়। কিন্তু কিভাবে কচু চাষ করতে হয় তা তারা জানতো না। হাট থেকে তারা পঞ্চমুখী কচু নিয়ে এসে টুকরো টুকরো করে কেটে জমিতে লাগাতে মনস্থ করে। সেই সময় সেখানে এক শিয়াল এসে-তাদের বলে কচু কাঁচা অবস্থায় লাগাতে নেই। কচু সিদ্ধ করে কলাপাতায় মুড়ে লাগাতে হয়। এবং জমিতে যেখানে সিদ্ধ করা কচু লাগাবে সেখানে একটি বাঁশের কঞ্চি বা পাটকাঠি পুঁতে রাখার পরামর্শ দিল।

বুড়া-বুড়ি শিয়ালের পরামর্শ মতো কিছু জায়গায় সিদ্ধ করা কচু লাগিয়ে সেখানে—পাটকাঠি বা বাঁশের কঞ্চি লাগিয়ে দিল। বাকি জায়গায় কাঁচা কচু লাগালো। কয়েকদিন পর বুড়া জমিতে গিয়ে দেখলো—সিদ্ধ কচু লাগানো জায়গায় শুধু শিয়ালের পায়ের ছাপ আর কোন জায়গাতেই সিদ্ধ করা কচু নেই। আর যেখানে তারা কাঁচা কচু লাগিয়েছিল—সেখানে কচুগাছ হয়েছে। বুড়া সব কিছুই বুঝতে পারলো। সে শিয়ালকে উচিত শিক্ষা দিতে মনস্থ করে শিয়ালকে একদিন খাবারের জন্য আমন্ত্রণ করলো। নির্দিষ্ট দিনে শিয়াল এসে উপস্থিত হল। বু বুড়ি তাকে আপ্যায়ন করে ঘরে বসতে দিল। এদিকে রান্না আর শেষ হয় না। এর পরেই শিয়ালকে তারা ঘরের দরজা বন্ধ করে লাঠি দিয়ে পেটাতে থাকে এবং লাথি মেরে ঘর থেকে বের করে দেয়।

এই জাতীয় গল্প পৃথিবীর নানা দেশের লোককথায় পাওয়া যায়। কৃষি-নির্ভর মেচ সমাজ ব্যবস্থায় যে সামাজিক ব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যায় এই লোককথায় সেখানে শিয়ালকে ধূর্ততার প্রতীক এবং সমাজের খল চরিত্র হিসেবে ধরা হয়েছে। থমসন বর্ণিত মোটিফ সূচী অনুযায়ী B—জীবজন্তুর এখানে মানবীকরণ ঘটেছে। আবার J চালাক ও বোকার বিষয়টিও এখানে আছে। তাই ধূর্ত শিয়াল বুড়া-বুড়িকে প্রতারণা করেও পার পায় না—উচিত শিক্ষাও পায়। এই লোককথায় নৈতিকতার জয় সূচিত হয়েছে।

মেচ লোককথা—২

'খৈনারী রাজকুমারী' লোককথাটি মেচ সমাজে বহুল প্রচালিত একটি লোককথা। এই গল্পের সারাংশ সংক্ষেপে দেওয়া হলো।

কোন একদেশের ধার্মিক রাজার একমাত্র সুন্দরী কন্যা ছিল যার নাম খৈনারী। রাজার কোন পুত্র সন্তান ছিল না। রাজকুমারীকেই তিনি উপযুক্ত করে তোলেন সব দিক থেকে—এমনকি যুদ্ধবিদ্যাতেও। রাজকুমারী একদিন একটি গ্রামে গিয়ে অপরূপ সুন্দর বৃক্ষ দেখতে পেলেন। সেই বৃক্ষকে রাজবাড়ির বাগানে এনে লাগানোর জন্য তিনি বায়না ধরলেন। এবং টুলটুলি বুড়ির মাধ্যমে রাজকুমারীর এই ইচ্ছার কথা জেনে রাজা লোক-লস্কর পাঠিয়ে গ্রাম থেকে সেই গাছ উঠিয়ে আনার চেষ্টা করতেই বৃক্ষটি বলে উঠলো—'এ ভাবে আমাকে নেওয়া যাবে না—রাজকুমারী সপ্ত-নদীর জল দিয়ে কোন মুনিকে দিয়ে শান্তিরজল আমার মাথায় দিলে আমি মুক্ত হব। আমার মাকে রাক্ষসেরা পাষাণপুরীতে বন্দী করে রেখেছে—সেও উদ্ধার হয়ে পূর্ব রূপ ফিরে পাবে'। সেই কথা মত রাজকুমারী বৃক্ষের মাথায় সপ্তনদীর জল দিতেই এক অপূর্ব লাবণ্যময় রাজকুমারের আবির্ভাব ঘটলো। বীরচক্র নামক রাজকুমার জানালেন, এই রাজকন্যার জন্যই এতদিন অপেক্ষায় ছিলাম। এই রাজকুমারীকে বিবাহ করে রাজসুখ ভোগ করবো। তার আগে রাক্ষসদের হাত থেকে মাকে উদ্ধার করে আনবো।'

যথারীতি রাজকুমার রাক্ষসদের আস্তানায় গিয়ে তাদের অমরাত্মাকে মেরে প্রবল যুদ্ধের পর রাজমাতাকে উদ্ধার করে ফিরে এলেন খৈনারীর রাজ্যে। অবশেষে দিন ক্ষণ দেখে রাজকন্যা খৈনারীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পিতৃ রাজ্যে ফিরে এলেন এবং উভয় রাজ্যের রাজা হয়ে সুখে রাজত্ব করতে লাগলেন।

এই লোককথায় অলৌকিকতা এবং অবিশ্বাস্য ঘটনার যোগ রয়েছে। আবার রাজমাতার বন্দিনী হবার বিষয়টিও লোককথার অন্তর্গত রূপকথা ধর্মী। রূপকথাধর্মী কাহিনী ভারতীয় নানা-জাতি-জনজাতির মধ্যে প্রচলিত আছে। বাংলা সাহিত্যে এ জাতীয় লোককথা অনেকেই সংকলিত করেছেন। তার মধ্যে লালবিহারী দে উল্লেখযোগ্য। শুধু ভারতে নয় এ জাতীয় লোককথা মিশর, চীন, জাপান, রাশিয়াসহ ইউরোপের নানা দেশে এবং আফ্রিকার আদিম অধিবাসীদের জীবনেও পাওয়া যাবে।

তবে দেশ-কাল ও রুচি ভেদে একই গল্প নানা ভাবে পরিবেশিত হয়েছে। মোটিফ এক থাকলেও পরিবেশনা বা উপস্থাপনা ভিন্ন। প্রকৃত পক্ষে বিশেষ বিশেষ জাতি বা সম্প্রদায়ের সমাজ জীবন, আচার আচরণ এককথায় জীবনচর্যা প্রতিফলিত হয় লোককথায়। পরবর্তীকালে এই লোককথাই সাহিত্যের আদি উৎস হয়ে উঠে। মেচ সম্প্রদায়ের গ্রাম নির্ভর কৃষি নির্ভরতা প্রসঙ্গটি আমাদের আলোচিত লোককথায় লক্ষণীয়। আবার ট্যাবু বা নিষেধ বিধির ইংগিতও আছে এই লোককথায়। যখন খৈনারি রাজকুমারীর নির্বাচিত বৃক্ষটি কোদাল দিয়ে গর্ত খুঁড়ে তুলতে যায় গ্রামবাসী, তখন এই নিষেধ বিধির কথা বৃক্ষটির কাছে থেকে জানা যায়। এ ভাবেই গল্পে রাক্ষসের কথা যেমন এসেছে, এসেছে নিষেধ বিধির পাশাপাশি অলৌকিকতা। বৃক্ষ হয়ে উঠে রূপ লাবণ্যময় রাজকুমার।

মেচ লোককথা—৩

'দাওয়ারাম জহলাউ' লোককথাটি খুব জনপ্রিয় লোককথা মেচ সমাজে। বহুল প্রচারিত। সংক্ষেপে এই লোককথাটির সারাংশ দেওয়া যাক।

রাজা গ্রাংগ্রিম বীর খুব প্রতাপশালী রাজা ছিলেন। তার দুই রানী। ছোট রানীর দুই পুত্র সন্তান। বড় রানী নিঃসন্তান। এ নিয়ে বড় রানীর মনে খুব দুঃখ ছিল। ছোট রানীও খুব হিংসা করত বড় রানীকে—কিন্তু কাউকে বুঝতে দিত না।

একদিন স্বপ্নে বড় রানী জানতে পারলেন তাদের গৃহদেবতার কাছ থেকে যে, তাদের বাড়ির বাগানে দাওয়াগাছের পুবদিকের ডালে একটি দাওয়া ফল আছে—সেই ফলটি খেলে পর পুত্র সন্তান হবে। গৃহ দেবতা আরোও জানালেন—সেই পুত্রের নাম 'দাওয়ারাম' রাখতে।

স্বপ্ন অনুযায়ী পরের দিন বড় রানী সেই দাওয়া ফল খেলেন এবং সন্তান সম্ভবা হলেন। রাজ বাড়িতে খুশির হাওয়া। কিন্তু ছোট রানী জানতে পেরে চক্রান্ত শুরু করলেন। যথা সময়ে বড় রানী একটি পুত্র সন্তান প্রসব করলেন—কিন্তু ছোট রানী চক্রান্ত করে সেই শিশু পুত্রটিকে একটি দাসীর হাতে দিয়ে নদীতে ভাসিয়ে দিতে বললেন। এবং বড় রানীর পুত্র সন্তানের জায়গায় একটি বিড়াল শাবক রেখে দিলেন। প্রচারিত হল বড় রানী একটি বিড়াল শাবক প্রসব করেছেন। রাজা সহ অন্যান্যরা এই ঘটনায় অত্যন্ত আঘাত পেলেন।

এদিকে সেই দাসীর শিশুটির প্রতি খুব মায়া হল। সে তাকে নদীতে ভাসিয়ে না দিয়ে মন্ত্রী মশাই-এর স্ত্রীর কাছে নিয়ে গেলেন এবং সব ঘটনা জানিয়ে দিলেন। মন্ত্রীমশাই-এর নির্দেশে সেই শিশু একটি আশ্রমে বড় হতে লাগল। ঘটনাটি খুবই গোপন রাখা হল।

বিড়াল শাবক প্রসবের জন্য রাজা বড় রানীকে বনের ধারে একটি কুটিরে নির্বাসিত করেছিলেন। চিন্তায় চিন্তায় রাজা অসুস্থ হয়ে পড়লেন। রাজা স্বপ্নে জানতে পারলেন

যে, তার অসুস্থতা দুরারোগ্য নয়। তাঁর দেহে এক রাজকুমারীর হাতের ছোঁয়া লাগলে তিনি সুস্থ হয়ে উঠবেন। কিন্তু সেই রাজকুমারী এক পর্বত চূড়ায় দৈত্য দ্বারা অপহৃত হয়ে বন্দী হয়ে আছেন।

বন্দীশালা থেকে রাজকুমারীকে উদ্ধারের জন্য কনিষ্ঠ দুই রাজকুমার রওনা দিলেন। মন্ত্রীমশাই-এর পরামর্শ মত দাওয়ারামকেও সাহায্যকারী হিসেবে তাদের সাথে পাঠিয়ে দিলেন। পথে যেতে যেতে এক জায়গায় তারা ব্যাঙের আর্তনাদ শুনতে পেল—দুই রাজকুমার সে দিকে পাত্তা না দিয়ে এগিয়ে গেলেন। দাওয়ারাম ঘোড়া থামিয়ে কাছে গিয়ে দেখলো—একটি ব্যাঙ পাথর চাপা পড়ে আছে। সে তাকে উদ্ধার করলো। ব্যাঙ এতে খুশি হয়ে ভবিষ্যতে কোন প্রয়োজনে তাকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিল। এ ভাবে যেতে যেতে একদিন একদল পিঁপড়ে দেখে তাদের উপর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে রাজকুমার চলে গেল। এতে অনেক পিঁপড়ে মারা গেল। কিন্তু দাওয়ারাম সেখানে নেমে পিঁপড়েদের না মেরে ঘোড়াটিকে নিয়ে গেল। এতে পিঁপড়েরাও খুশি হয়ে—তাকে প্রয়োজনে সাহায্যের আশ্বাস দিল। পথে যেতে এক সাধুকে পাত্তা না দিয়ে রাজকুমাররা এগিয়ে গেল ঘোড়া ছুটিয়ে। দাওয়ারাম নেমে তার আগমনের কথা সাধুকে সবিস্তারে জানালো। সাধু এ প্রসঙ্গে খোঁজ-খবর দিতে রাজি হলো—সে দাওয়ারামকে দুটি কাজ করে দিতে বললো। দাওয়ারাম ব্যাঙের রাজা এবং পিঁপড়েদের রাজার সাহায্যে সাধুর সেই কাজ দুটি করে দিল। সাধু খুশি হয়ে তাকে রাজকুমারীর অবস্থানের ঠিকানা জানিয়ে সম্মুখের নদী পার হবার জন্য সারস পাখির সাহায্য নিতে বললো।

সাধুর পরামর্শ মতো দাওয়ারাম এগিয়ে গিয়ে একটি বটগাছে সারস পাখির আস্তানা দেখতে পেয়ে সেখানে অপেক্ষায় রইলো। হঠাৎ দাওয়ারাম গাছের উপর পক্ষী শাবকের চিৎকার শুনে তাকিয়ে দেখলো একটি সাপ পক্ষী শাবকদের খেতে উদ্যত হয়েছে। দাওয়ারাম সেই সাপটিকে মেরে পক্ষী শাবকদের রক্ষা করলো। সন্ধ্যায় সারস পাখি ফিরে এসে শাবকদের কাছে সব শুনে দাওয়ারামকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিল।

পরদিন প্রতিশ্রুতি মতো সারস পাখি দাওয়ারামকে নিয়ে নদী পার হয়ে যে পর্বত চূড়ায় রাজকুমারী বন্দী ছিল সেখানে নিয়ে গেল। সেখান থেকে দৈত্যদের পরাজিত করে রাজকুমারীকে উদ্ধার করে দাওয়ারাম মন্ত্রীর বাড়িতে ফিরে এল। মন্ত্রীর পরামর্শ মত রাজকুমারীর হাতের ছোঁয়ায় রাজা সুস্থ হয়ে উঠলেন। এদিকে রাজকুমাররা শূন্য হাতে ফিরে এসে—রাজকুমারীকে পাওয়া যায়নি বলে জানালো। সমস্ত ঘটনা তখন মন্ত্রীমশাই রাজাকে খুলে বললেন এবং জানালেন দাওয়ারামই বড় রানীর পুত্র-যাকে চক্রান্ত করে ছোট রানী নদীতে ভাসিয়ে দিতে বলেছিলেন। সমস্ত শুনে রাজা ছোট রানীকে নির্বাসনে পাঠালেন, বড় রানীকে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন এবং রাজকুমারীর

সাথে দাওয়ারামের বিবাহ দিয়ে রাজ্যের ভার তার উপর সঁপে দিয়ে ধর্মচিন্তায় মনোযোগ দিয়ে রাজা সুখে দিন কাটাতে লাগলেন।

এই মেচ লোককথাটি আয়তনে বেশ বড়। উপভোগ্যও। 'Successful youngest son' মোটিফটি এই গল্পে পাওয়া যায়। সতীন বিদ্বেষ তাও রয়েছে। দুটি বিষয়ে গল্পে অভিনবত্ব রয়েছে। সচরাচর বড় রানীর চক্রান্তে ছোট-রানীর জীবন হয় দুর্বিষহ। আলোচ্য গল্পে তৎ পরিবর্তে দেখি ছোট রানীর চক্রান্তে বড় রানীর দুর্বিষহ জীবন যাত্রা। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যটি হল—অন্যান্য লোককথার মত এই গল্পে সন্ন্যাসী কোন ফল রাজাকে দেয়নি। স্বপ্নে বড় রানী জেনেছেন দাওয়া গাছে থাকা পাকা দাওয়া ফল খেলেই তিনি সন্তান সম্ভবা হবেন, হয়েছেনও। অর্থাৎ রাজার কোন ভূমিকা নেই মধ্যস্থতাকারী হিসেবে। বড় রানির গর্ভ সঞ্চার হয়েছে—একটি পুত্র সন্তানও প্রসব করেছেন। অর্থাৎ 'Super Natural birth' মোটিফটিও এই গল্পে লভ্য। তাছাড়া উপকারী পিঁপড়া, উপকারী ব্যাঙ, কথা বলা প্রাণী, বড় রানীর শাস্তি লাভ Misdeed Punished ইত্যাদি মোটিফগুলিরও সন্ধান পাওয়া যায় এই লোককথায়। এই গল্পে দুই জনের শাস্তি নৈতিকতার জয় ঘোষণা করেছে। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন এই প্রবচন নির্ভর এই লোককথাটি।

মেচ লোককথা—৪

'দুখীরাম ও সুখীরাম' লোককথাটি আয়তনে ছোট। এই লোককথার সারাংশ নিম্নরূপ—

মাওরিয়া গ্রামে দুখীরাম ও সুখীরাম দুই ভাই ছিল। তারা ছিল কৃষিজীবী। সারাদিন মাঠে কাজ করতো। বাড়িতে দুখীরামের বউ পিঠে তৈরি করে অর্দ্ধেক পিঠে লুকিয়ে রেখে—মাত্র কয়েক খানি পিঠে তাদের খাওয়ার জন্য দিত। দুখীরাম এবং সুখীরামের সন্দেহ হওয়াতে তারা লুকানো পিঠে সব খেয়ে নিয়ে মাঠে কাজে চলে যেত। এদিকে লুকোনো পিঠের খোঁজ না পেয়ে দুখীরামের বউ এক ওঝার শরণাপন্ন হলো। ওঝা তাকে এক আনা দিতে বললো। দুখীরামের বউ-এর কাছে পয়সা ছিল না। দুখীরাম ঘুমিয়ে পড়লে তার কোমর থেকে এক আনা পয়সা চুরি করে ওঝাকে দিল। ওঝা তাকে জানালো—তার ঘরেই দুই রাক্ষস আছে। যারা পিঠে চুরি করে খায়। সে চোর ধরার জন্য মদ (জৌ) তৈরি করে কলার ডোনায় রেখে দিয়ে পাহারা দিয়ে চোর ধরার পরামর্শ দিল।

এদিকে দুখী রামের বৌ ঘরে মদ (জৌ) তৈরি করে দুটি কলার ডোনায় রেখে পাহারা দিতে লাগলো। দুখীরাম এবং সুখীরাম আড়াল থেকে কলার ডোনা টেনে নিয়ে গিয়ে মদ খেয়ে কাজ চলে গেল মাঠে। দুখীরামের বউ বুঝতে পারলো না কে চোর। সে আবার ওঝার কাছে গেল। ওঝা আবাব পয়সা চাইলো। তার কাছে পয়সা ছিল না। সে নিজের ভুল বুঝতে পারলো এবং কপাল চাপড়াতে লাগলো।

কৃষি নির্ভর মেচ জন জাতির পারিবারিক চিত্র, গ্রাম জীবনের পটভূমিতে বর্ণিত দুখীরাম ও সুখীরাম নামে দুই কৃষিজীবী ভাই এবং দুখীরামেব স্ত্রীই এই কাহিনীর প্রধান চরিত্র। গল্পটির মধ্যে দুখীরাম ও সুখীরাম সু-কৌশলে দুখীরামের বউকে প্রকৃত পক্ষে প্রতারিত ও বিভ্রান্ত করে। তাদের চুরির বিষয়টি দুখীরামের বউ বুঝতে পারে না। না পেরে ওঝার শরণাপন্ন হয়ে পয়সা দিয়েও প্রতারিত হয়। এই গল্পে motif বা অভিপ্রায় হিসেবে যাদু নির্ভরতা, প্রতারণা (k) এবং চালাক বোকার ব্যাপারটিও (J) প্রচ্ছন্ন। গ্রাম জীবনে পিঠে চোর জানার জন্য দুখী রামের কোমর থেকে এক আনা চুরি করতে হয় ওঝাকে দেবার জন্য। এই বিষয়টিও চৌর্য বৃত্তির মধ্যেই পড়ে। আবার ওঝাকে নিয়োগের বিষয়টির মধ্যে অলৌকিতায় আস্থা যে গ্রামীণ জীবন চর্যার একটা ধর্ম তা স্পষ্ট হয়। ঐন্দ্রজালিকতা বা যাদুর সাহায্য নেওয়া একটি বিশেষ motif বা অভিপ্রায়। অদৃষ্ট নির্ভরতাও একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে এই লোককথায় সেই বিষয়টিও মোটিফ (L) হিসেবে লক্ষ্য করা যায়। শেষ পর্যন্ত ভাগ্যচক্রে বিড়ম্বিত হয়েছে বৌটি।

মেচ লোককথা—৫

'তরুণী মৌনাসি' লোককথাটির সারাংশ এইরূপ—

মানস সরোবরের পাদদেশে এক জন বসতিতে হাফাৎ বীরাই ও হাফাও বুরের নামে এক গোষ্ঠীপতি বাস করতেন। তারা খুব ধার্মিক ছিলেন। তাদের একটি মাত্র মেয়ে ছিল। মানস সরোবরের নাম অনুযায়ীই তার নাম ছিল মৌনাসি।

মৌনাসি মেয়েটি যে শুধু রূপবতী ছিলেন তাই নয়, গুণেও তিনি ছিলেন সর্ব জীবের ত্রাণকর্তা। সবাই তাকে খুব ভালোবাসতো। তিনি খুব ভক্তিমতী ও ধর্মপরায়ণা ছিলেন। প্রতিদিন তিনি ভগবান রীরাই বার্থৌ দেবী মাইনাও এবং ১৮ জোড়া দেব দেবীর বন্দনা করতেন।

কাছাকাছি অরণ্য অঞ্চলেই এক রাক্ষস বাস করতো। সে খুব ছলনাময়ী ছিল। যে কোন রূপ ধারণ করতে পারতো। একদিন সুন্দর রাজকুমারের রূপ ধারণকরে মৌনাসির কাছে এসে তাকে ছলনা করতে গিয়ে ধরা পড়ে যায়। লজ্জায় এবং ক্ষোভে সে তখন মৌনাসিকে বধ করতে উদ্যত হয়। কিন্তু ভগবান বার্থৌ এবং দেবী মাইনাও-এর আশীর্বাদে মৌনাসির হাতে তার পরাজয় ঘটে এবং সেই রাক্ষস নিহত হয়।

তরুণী মৌনাসি গল্পটি আয়তনে ছোট। এটির গল্পরসও সাধারণ মানের। তবে এই লোককথায় নারী শক্তির জয়গান ঘোষিত হয়েছে। পরাজিত ও নিহত হয়েছে অত্যাচারী রাক্ষস। চরিত্র ধর্মে গল্পটি লিজেণ্ড ধর্মী। এ ধরনের লিজেণ্ড ধর্মী লোককথা প্রায় সব জনগোষ্ঠীর মানুষের লোককথাতেই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। Transformation মোটিফও (motif)-এই গল্পে লভ্য।

মেচ লোককথা—৬

'ধূর্ত শৃগাল' নামে লোককথাটি অনেকটা 'কচু চাষ' লোককথার মত। ধূর্ত শৃগাল গল্পের সারাংশ এখানে দেওয়া হল।

কোন এক গ্রামে এক মেচ দম্পতি বাস করতো। তাদের সব কিছুই ছিল। কোন অভাব ছিল না। কিন্তু তারা ছিল নিঃসন্তান। গৃহপালিত পশু পাখি, ধান চালের রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি কাজেই তাদের সময় কেটে যেত। নিকট আত্মীয়ের বাড়ি গিয়ে দু'চার দিন থাকা সম্ভব হতো না। অথচ স্বজন ব্যক্তিরা মাঝে মাঝেই এদের বাড়ি থেকে যেত।

এক সময় বুড়ি সাতদিনের অনুমতি নিয়ে তোর্ষা নদীর পারে বড়শাল কুমার গ্রামে বেড়াতে যায়। সেখানে সে কচুখেত দেখে। মুরগী এবং শুয়োরের মাংস দিয়ে কচু খায় আনন্দে।

ফেরার সময় বুড়ি ২০ সের কচু নিয়ে হেঁটে বাড়ি ফেরে। কচু দিয়ে শুয়োরের মাংস রান্না হয়। বুড়া-বুড়ি কচু চাষের সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু সেই পরামর্শ এক শিয়াল শুনতে পায়। পরের দিন শিয়াল এসে কচু চাষের ব্যাপারটি বুড়া-বুড়ির কাছে জানতে চায়। শিয়াল পরামর্শ দিতে রাজি হয়। শিয়ালের বুদ্ধি মত কচু জলে সিদ্ধ করে কলা পাতায় পোটলা করে জমিতে রোপণ করে তিন জনে মিলে। শিয়াল সাতদিন রোপণের জায়গায় যেতে নিষেধ করে। গোপনে শিয়াল সব সিদ্ধ কচু খেতে থাকে। ছয় দিনের মাথায় বুড়ো কৃষক মাঠে গিয়ে কোন অঙ্কুরের চিহ্ন দেখে না। তখন শিয়াল বলে—সে সাতদিনের আগেই কচু খেতে পা দিয়েছিল—তাই কচু মাটির সাথে মিশে গেছে। এভাবেই ধূর্ত শিয়াল বুড়া-বুড়িকে ঠকায়।

এই লোককথায় কৃষি নির্ভর মেচ-দম্পতির সামাজিক চিত্র বর্ণিত আছে। বর্ণিত হয়েছে হালের বলদ, দুধের গাই, ছাগল, হাস-মুরগি, ফুলগাছ ইত্যাদি সাংসারিক সচ্ছলতার চিত্র।

এই গল্পে ধূর্ত শিয়ালের প্রতারণা জয়ী হয়। স্বাভাবিক ভাবেই এর মোটিফ (motif)-এ আমরা প্রতারণা K দেখতে পাই। প্রতারিত হয় সরল মেচ দম্পতি। আবার জীব-জন্তু B বিষয়ক মোটিফের মানবীকরণ আছে এই লোককথায়। যেমনটি দেখা যায় 'কচু চাষ' গল্পে। দুটি গল্পের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য লোক জীবনের পটভূমিতে বিচার্য হয়ে উঠে।

লোধা শবর লোককথা : একটি জনজাতির মুক্তির গল্প

দীপককুমার বড়পণ্ডা

'শবরেরা বাস করিত পাহাড়ে জঙ্গলে, ময়ূরের পাখা ছিল তাদের পরিধেয়। গলায় গুঞ্জাবিচির মালা কর্ণে বজ্রকুণ্ডল। শবর শবরীদের গানেরও একটি বিশিষ্ট ধরন আছে, সেই ধরন 'শবরী রাগ' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। কয়েকটি চর্যাগীতিযে এই শবরী রাগে গীত হইত- সে প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এই চর্যাগীতির মধ্যেই আমরা বজ্রযানী বৌদ্ধ দেবতা পর্ণ শবরীর রূপাভাস পাইতেছি........ ।' ডঃ নীহাররঞ্জন রায় রচিত "বাঙালীর ইতিহাস" (আদিপর্ব) গ্রন্থের ২৮৪ পৃষ্ঠা থেকে জানা গেল যে, দেশের মধ্যে জনজীবনে প্রাচীন কালেও প্রাচীন জাতি শবর কত মর্যাদাপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল। স্বভাবতই তাদের জীবনের ছবি থেকে গেছে তৎকালীন নানা কাব্য কথায়।

যেমন চর্যাগীতিতে শবরপাদের একটি গানে গলায় গুঞ্জা বিচির মালা, পাহাড় জঙ্গলবাসী সেই শবর-শবরীর জীবনের ছবি চিত্রিত হয়েছে এইভাবে—

'উঞ্চা উঞ্চা পাবত তঁহি বসই সবরী বালী।
মোরঙ্গি পিচ্ছ পরিহণ সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী॥
উমত্ত সবরো পাগল শবরো মা কর গুলী গুহাড়া তোহৌরি।
নিয় ঘরণী ণামে সহজ সুন্দারী॥
ণাণা তরুবর মউলিলরে গঅণত লাগেলি ডালী।
একেলী সবরী এ বন হিণ্ডই কর্ণকুণ্ডল বজ্রধারী॥
তিএধাউ খাট পড়িলা সবরো মহাসুহে সেজি ছাইলী।
সবরো ভুজঙ্গ ণইরামণি দারীপেম্হ রাতি পোহাইলী॥
হিঅ তাঁবোলা মহাসুহে কাপুর খাই।
সুন নিরামণি কণ্ঠে লইয়া মহাসুহে রাতি পোহাই॥
গুরুবাক পুঞ্চয়া বিন্ধ ণিঅমণে বাণেঁ।
একে সর সন্ধাণেঁ বিন্ধহ বিন্ধহ পরম নিবাণেঁ॥
উমত সবরো গরুআ রোষে।
গিরিবর সিহর সন্ধি পইসন্তে সবরো লোড়িব কইসেঁ॥

জনবসতি থেকে দূরে উঁচু উঁচু পাহাড়ের ওপর শবর শররীদের বাসা। সাজগোজে তাঁদের আগ্রহ চিরকাল। কিন্তু শিকার করেই তাঁদের জীবন কাটত। নেশার ঝোঁকে শবর

পুরুষ শবর নারীকে যেতেন ভুলে। ক্রোধে শবর পুরুষ পর্বতের কন্দরে অনেক দূরে চলে যেতেন। শবর নারী কী করবেন? অগত্যা তাঁকে খুঁজতে বেরোতেন। এ শুধু কাব্যে নয়, এখনকার দিনেও শবরদের জীবনযাত্রা এইরকমই।

"শ্রী শ্রী গৌড়ীয় অভিধান' বই তে (হরিদাস দাস সঙ্কলিত 'শবর' প্রসঙ্গে (৭৭২ পৃষ্ঠা) যা বলা হয়েছে তাতে শবর জাতির প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হয়। 'পম্পা নদীর তীরবর্তী মতঙ্গ মুনির শিষ্যগণের আশ্রমের নিকটে 'শ্রমণী ' নামে এক শবরী বাস করিতেন। শ্রীরামচন্দ্র তাঁহার গৃহে অতিথি হইলে শবরীর উচ্ছিষ্ট বহুদিনের পরযুষিত অথচ অমৃত বিনিন্দিত স্বাদযুক্ত ফল ভোজন করিয়া পরমানন্দ লাভ করেন এবং তাঁহাকে পরমাভক্তি দান করেন। শ্রীরাম লক্ষ্মণের দর্শনে চরম কৃতার্থতা লাভ করিয়া শবরী স্বধামে প্রস্থান করেন' (রামায়ণ ঃ অরণ্যকাণ্ড ঃ ৭৩-৭৪)

তাছাড়া একটি লোককথা থেকে জানা যায় বশিষ্ঠের কামধেনু নন্দিনীকে জোর করে বিশ্বামিত্র অধিকার করার চেষ্টা করলে, বশিষ্ঠের নির্দেশে নিজেকে বাঁচানোর জন্য নন্দিনী নিজের শরীরের বিভিন্ন অংশ থেকে বিভিন্ন জাতির জন্ম দেন। সেই সময় নন্দিনীর মল থেকে নাকি জন্ম হয় শবরদের। কিংবদন্তী অনুযায়ী শবরদের জন্ম হল শরীরের মল থেকে। একটি জাতির জন্মের মাধ্যমেই শুরু হল লাঞ্ছনা। মল যেমন অচ্ছুৎ, জাতিটাও তেমনি সকলের কাছে অচ্ছুৎ হয়ে থাকল চিরকাল। কী আশ্চর্য মানুষের বিচার!

লোককথাটির কাহিনী ও চরিত্রগুলি প্রাচীন রামায়ণ-মহাভারতীয় যুগের, তাতে আছে শবর জাতির জন্ম রহস্য। লক্ষণীয় যে লোককথাটি শবর জাতির অস্তিত্বের প্রাচীনতার দিকে ইঙ্গিত করে।

অন্য আর একটি লোককথা থেকে জানা যায়, কোনও এক ঋষি পৃথিবীতে পূজার জন্য লোকের প্রয়োজন অনুভব করেন। সেই ঋষি মানুষ তৈরী করার জন্য নদী থেকে এক অঞ্জলি জল ও বালি তুললেন। সেই বালি থেকে তৈরি হল শবর রাজা ও রাণি। তাঁদের সন্তান ললিতা। এই লোককথা অনুযায়ী শবররা রাজা ছিলেন। পৃথিবীতে শবররাই প্রথম মানুষ হিসাবে জন্ম নেন এবং আমাদের আদি পুরুষ হিসাবে শবরদের চিহ্নিত করা যেতে পারে। এছাড়া দেবতার পূজার জন্য শবরদের আবির্ভাব হয়েছিল. একথাও বলা যেতে পারে। অর্থাৎ শবররা কোনোভাবেই নিম্ন শ্রেণীর নয়।

নৃতাত্ত্বিক অতুলকৃষ্ণ সুর এর মতেও শবর জাতি ও তাদের সভ্যতা আদিম। 'বাংলার আদিম অধিবাসী অস্ট্রিক ভাষাভাষি আদি অস্ট্রালদের বংশধর হচ্ছে সাঁওতাল লোধা, হো, জুয়াং, শবর, মুণ্ডা প্রভৃতি উপজাতি সমূহ। প্রাচীনকালে যে এখনকার মত নিম্নমানের ছিল, তা নয়। প্রাচীনকালে এই সভ্যতা বা এদের সভ্যতা এত প্রভাবশালী ছিল যে আজকের দিনেও ব্রাহ্মণ শাসিত সমাজ সে প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেনি। দুর্গাপুজোর সহিত সংশ্লিষ্ট নব পত্রিকার পূজা, চড়ক গাজন, লক্ষ্মীপূজার ঝাঁপি, বৃক্ষপূজা, বৃষকাষ্ঠ, আনুষ্ঠানিক কর্মে কলা, হরিদ্রা, সুপারি, পান. সিন্দুর, ঘট, শঙ্খধ্বনি,

উলুধ্বনি, আলপনা, গোময় প্রভৃতির ব্যবহার অস্ট্রিক ভাষাভাষি গোষ্ঠী তথা শবর সংস্কৃতির দান।'(বাঙালী সভ্যতা কতো প্রাচীন, বর্তমান পত্রিকা,১৫.০৬.১৯৮৬)

বিভিন্ন পণ্ডিতদের লেখা থেকে আমরা জানতে পারি, শবর একটি প্রাচীন জাতি। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের হিউবার্ট হিউয়েট রিসলে শবর জাতিকে একটি কৃষিজীবী ও কৃষিমজুর দ্রাবিড় জাতি বলে উল্লেখ করেছেন। ডালটন-এর মতে বিহারের সাহাবাদ জেলায় শবররা চেরোদের পরাজিত করে ৫০০ খৃঃ থেকে ৯৯০ খৃঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। শবব রাজা ফুদিচন্দ্র পরবর্তীকালে সাহাবাদ থেকে বিতাড়িত হন। ফুদিচন্দ্র পরাজিত হন ভোজরাজা কিংবা তাঁর বংশধর জয়দেবের কাছে। এরপর এখানে ভোজপুর রাজ্য ও ভোজ বংশের প্রতিষ্ঠা হয়। সাহাবাদ জেলার পুরনো অনেক কিছুর মধ্যে রিসলে শবরদের অস্তিত্ব অনুধাবন করেছেন। মেজর জেনারেল স্যার আলেকজাণ্ডার ক্যানিংহাম ভাষার দিক থেকে বিচারে শবরদেরকে কোল গোষ্ঠীর জাতি বলে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর মতে 'সগর' শব্দটি থেকে শবর এসেছে। স্কাইথিয়ান ভাষায় সগর শব্দটির অর্থ কুঠার। শবরেরা বনে জঙ্গলে ঘোরার সময় কুঠার নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন বলে তাদের এই নাম হয়েছে। ডঃ নীহাররঞ্জন রায় এর মতে শবররা প্রাচীন অস্ট্রিক জাতির একটি শাখা। গঙ্গা, যমুনার অববাহিকায় কোল, মুণ্ডা অসুর, নিষাদ প্রভৃতি উপজাতির সঙ্গে এঁরা বাস করতেন (বাঙালীর ইতিহাস)।

বর্তমানকালে শবররা বিভিন্ন জায়গায় লোধা শবর এবং খেড়িয়া শবর নামে পরিচিত। "The Lodhas feel pride in asserting themselves as 'Savara' a generic term used in ancient literature for the forest dwelling communities." [Bhowmic P. K. Some Aspects of Indian Anthropology(1980 page 39]২০০১ সালের জনগণনা অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে শবরদের লোকসংখ্য ৪৩হাজার ৫৯৯ জন। পাশাপাশি ২০০১ সালে জনগণনা অনুযায়ী ছিল ৮৪ হাজার ৯৬৬ জন। যাই হোক বাস্তবক্ষেত্রে লোধা এবং শবর আলাদা করা মুশকিল। কারণ এঁদের জীবনযাপন এবং সংস্কৃতি প্রায় এক। এমনিতে পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য কয়েকটি জেলায় লোধা কিংবা শবররা থাকলেও পুরুলিয়া (শবর ১৬.৪ শতাংশ) এবং অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলায় (লোধা ৪৩.১ শতাংশ, শবর ৫৯.৪ শতাংশ) এঁরা বেশি পরিমাণ বসবাস করেন। জলপাইগুড়ি জেলায় দেশান্তরী লোধারা আছেন (৩৯.৪ শতাংশ) ব্যাপকভাবে পুরুলিয়ার শবরদের খেড়িয়া শবর এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের শবরদের লোধা শবর বলে মনে করা হয়।

এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে আমরা একে একে এই সমাজে প্রচলিত লোককথাগুলি শুনব। পরে সেই লোককথাগুলির অভিপ্রায় আলোচনা করব।

রামায়ণ মহাভারতের আদিরূপ বলে একটি লোককথাকে চিহ্নিত করা বোধহয় ভুল হবে না। সেই লোককথা থেকে জানতে পারি, বালী আর সুগ্রীব নামে দুই ভাই ছিলেন। এঁদের মধ্যে বড় ভাই হলেন বালী, আর ছোট হলেন সুগ্রীব। বালী হলেন

বানরদের রাজা। তাঁর ছেলে অঙ্গদ রাজ্যের যুবরাজ। বালীর পরে রাজা হবেন অঙ্গদ, এই ভেবে ভেবে সুগ্রীবের খুব মন খারাপ হয়। তিন ভাবেন এই জন্মে তাঁর আর রাজা হওয়া হল না। শুধু তাই নয় রাজা হওয়ার জন্য মাঝে মাঝে সুগ্রীব রাজা বালীর সঙ্গে যুদ্ধও করেন, কিন্তু পেরে ওঠেন না। প্রতি বারেই তিনি যুদ্ধে হেরে যান। একবার তিনি ভাবলেন দাদাকে যুদ্ধে হারাতে হলে অন্য কারোর সাহায্য দরকার। কিন্তু তাঁকে এই কাজে কে আর সাহায্য করবে? দিন যায় মাস যায়, বছরও ঘুরে যায়। পাহাড়-পর্বতের এই দেশে সুগ্রীব কাউকে আর সাথী রূপে পান না। সুগ্রীব ধীরে ধীরে হতাশ হয়ে পড়লেন, এ জীবনে রাজা হওয়া আর তাঁর হবে না। মনের দুঃখে তিনি জঙ্গলে বসে থাকেন।

এই সময় হঠাৎ একদিন হারানো সীতার খোঁজে ওখানে হাজির হলেন রামচন্দ্র। রামচন্দ্রের সঙ্গে সুগ্রীবের বন্ধুত্ব হল। যেন এতদিন সুগ্রীব ওঁর জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। সুগ্রীব রামচন্দ্রকে সব কথা বললেন। তাঁর রাজা হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন আর রামচন্দ্রকে সাহায্যের জন্য অনুরোধ করলেন। রামচন্দ্র রাজী হলেন। বাধল সুগ্রীব আর বালীর যুদ্ধ। পাহাড় পর্বত, বন জঙ্গল কাঁপতে লাগল। বালী সুগ্রীবকে হারিয়ে দেবেন, এমন সময় রামচন্দ্র আড়াল থেকে বালীকে লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়লেন। বালী মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। সুগ্রীবের বহুদিনের ইচ্ছা পূরণ হল। রাজা হলেন সুগ্রীব। বালী পুত্র অঙ্গদ রাজত্ব থেকে বঞ্চিত হলেন। তবে অঙ্গদের এতে কিছু যায় আসে না। তিনি ভগবান রামচন্দ্রের প্রেমে রাজত্ব থেকে বঞ্চিত হলেন। অঙ্গদ রামচন্দ্রের পেছন পেছন লঙ্কা বিজয়ে চললেন। রামচন্দ্র লঙ্কা জয় করে সীতাকে ফিরে পেলেন। সীতাকে নিয়ে রামচন্দ্র অযোধ্যায় ফিরলেন। অযোধ্যার রাজপ্রাসাদের সকলে আনন্দে মেতে উঠল। এবার অঙ্গদের বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল। শুধু রাজত্ব হারানোর জন্য নয়, অঙ্গদ দুঃখ পেলেন, বাবাকে এইরকম অন্যায়ভাবে পেছন থেকে তীর ছুঁড়ে হত্যা করার জন্যও। বলব না বলব না করেও অঙ্গদ রামচন্দ্রকে সেই দুঃখের কথা বললেন। জানতে চাইলেন কোন দোষে তার বাবাকে মরতে হল? রামচন্দ্র কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। তাঁর মুখ থেকে কোনো কথা বেরোল না। তিনি অঙ্গদকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, তাঁর ভুল হয়েছে, তাঁর অন্যায় হয়েছে। তিনি অঙ্গদের কাছে ক্ষমা চাইলেন। আরো বললেন যে, প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য পরের জন্মে তুমিই আমাকে হত্যা করবে শবর রূপে।

অন্যদিকে, মহাভারতের যুদ্ধ থেমে গেছে। দুঃখে কাতর বাসুদেব নিজের রাজ্যে ফিরে গেছেন। নিজেদের মধ্যে মারামারি করে যদু বংশও প্রায় ধ্বংসের পথে। এমনি এক দিন শ্রীকৃষ্ণ মনের দুঃখে জঙ্গলের মধ্যে অর্জুন গাছে উঠে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। চোখ দুটি তাঁর বন্ধ। সেইসময় ওখানে এসে হাজির হন জরা শবর। সারাদিন তিনি হন্যে হয়ে ঘুরেছেন পাহাড় জঙ্গলে, কিন্তু কোনো শিকার মেলেনি। হতাশ জরা শবরের হঠাৎ চোখে পড়ে ডালপালার আড়ালে 'মৃগী'র কান। কানের ভেতরটা রাঙা ফুলের

মতন। আসলে ওটাতো কান নয়, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রাঙা পা। জরা আর লোভ সামলাতে পারলেন না, তীর ছুঁড়লেন। শ্রীকৃষ্ণ গাছ থেকে নিচে মাটিতে পড়লেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে পেয়ে জরা শবর চিৎকার করে বিলাপ করতে লাগলেন, এ কী করলেন তিনি। শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন। বললেন, তোমার কোনো দোষ নেই। আগের জনমে আমি রামচন্দ্র ছিলাম, আর তুমি ছিলে অঙ্গদ। আমি তোমার বাবা বালীকে বিনা দোষে হত্যা করেছিলাম। আজ তুমি হত্যা করে সেই অন্যায়ের প্রতিশোধ নিলে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য যাই বলুন, জরা শবর কিন্তু নিজেকে শান্ত করতে পারলেন না। শ্রীকৃষ্ণের দেহ দাহ করা হল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের বুকের পাঁজর দগ্ধ হল না। ওটা সমুদ্রের জলে ভাসিয়ে দেওয়া হল। পাঁজর সমুদ্রে ভেসে ভেসে যেদিকে যেতে লাগল জরা শবরও সেদিকেই দৌড়তে লাগলেন। জরা শবর এইভাবে একসময়ে পৌঁছালেন ওড়িশার পুরীতে। ওখানে শ্রীকৃষ্ণের বুকের পাঁজর সমুদ্রের জল থেকে তোলা হল। ততদিনে পাঁজর নীল পাথর হয়ে গেছে। এবার সেই নীলপাথরকে জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে পুজো শুরু করলেন জরা শবর। জরা শবর হলেন শবরদের আদি পুরুষ আর নীলপাথরটাই লোধা শবরদের আদি দেবতা নীলমাধব। লোধা শবররা নীলমাধবকে তাদের আপন করে পুজো করতে লাগলেন।

একসময় মালবরাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন ভারতবর্ষে বিষ্ণু উপাসনা চালু করতে চাইলেন। কিন্তু মুশকিল হল বিষ্ণুর অকৃত্রিম মূর্তি পাওয়া। এক রাত্রে রাজা নীলমাধবকে স্বপ্নে দেখলেন। তারপর নারদ মুনির আদেশে মালবরাজা নীলমাধবের খোঁজে চারদিকে লোক পাঠালেন। নীলমাধকে তাঁর চাই-ই। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ভেক ধরে একজন নীলমাধবের খোঁজে বেরোলেন। তখনতো আর জরা শবর বেঁচে নেই, নীলমাধব তখন অন্য আর এক শবর সর্দারের হাতে। ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণ (পাঠান্তরে বিদ্যাপতি) সেই শবর সর্দারের বাড়িতে উপস্থিত হলেন। সেই শবরের বাড়িতেই ব্রাহ্মণ থাকতে শুরু করলেন। শবর সর্দারের এক সুন্দরী মেয়ে ছিল, নাম তার ললিতা। শবর সর্দার প্রতিদিন গোপনে জঙ্গলে যান নীলমাধবের পুজো করতে। ব্রাহ্মণ কোনোভাবেই জানতে পারেন না, কোথায় থাকেন নীলমাধব। শবর সর্দারের বাড়িতে থাকতে থাকতেই ললিতার সঙ্গে ছদ্মবেশী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের প্রেম হয়।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের পরামর্শে ললিতা পিতার কাছে ব্রাহ্মণকে নীলমাধব দেখানোর জন্য আকুতি প্রকাশ করতে থাকেন। শবর সর্দার রাজী হন, একটা শর্তে। নীলমাধবের কাছে পৌঁছানোর জন্য যে রাস্তায় ব্রাহ্মণকে নিয়ে যাওয়া হবে, সেই রাস্তায় তাঁর চোখ বাঁধা থাকবে। ব্রাহ্মণ রাজী হলেও কী ভেবে হতাশ হন। কারণ নীলমাধবকে দেখার চেয়েও তাঁর কাছে যাওয়ার রাস্তাটা জানা তাঁর জরুরী—সেটাই এখনও অজানা। ব্রাহ্মণকে শবর কন্যা ললিতা বুদ্ধি দিলেন চোখ বাঁধা অবস্থায় নীলমাধবের মূর্তির কাছে যাওয়ার সময় ব্রাহ্মণ যেন জঙ্গলের মধ্যে সর্ষের দানা ফেলতে ফেলতে যান। ব্রাহ্মণ তাই

করলেন। নীলমাধবকে দেখে আবার ফিরে আসেন শবর সর্দারের বাড়িতে। ব্রাহ্মণ অপেক্ষা করতে থাকেন, কবে ফেলে-আসা সর্ষের দানাগুলি থেকে গাছ জন্মায়। বর্ষার পরে সর্ষের বীজগুলি থেকে গাছ হল। ব্রাহ্মণ ললিতাকে সঙ্গে নিয়ে সর্ষের গাছ অনুসরণ করতে করতে এগোতে থাকেন। একসময় নীলমাধবের মূর্তির সামনে হাজির হন তাঁরা। ওখানেই ব্রাহ্মণ নীলমাধবকে সাক্ষী রেখে ললিতাকে বিয়ে করে (পাঠান্তরে জানা যায় ললিতাকে ব্রাহ্মণ আগেই বিয়ে করেছিলেন।) নীলমাধবকে নিয়ে রাজার কাছে পালিয়ে যান। শবর সর্দার একথা জানতে পেরে হাহাকার করে ওঠেন। চিৎকার করে কাঁদতে থাকেন।

নীলমাধব বিচলিত হলেন। উধাও হয়ে গেলেন ব্রাহ্মণের হাত থেকে। নীলমাধব ব্রাহ্মণকে স্বপ্নাদেশ দিলেন, সাগরের ওপর মন্দির বানাতে। রাজা স্বপ্নে জানতে পারলেন নীলমাধব গাছের গুঁড়ি হয়ে ভেসে আসবেন সমুদ্রের জলে। সেই গাছের গুঁড়ি জল থেকে তোলার জন্য হাতি, ঘোড়া, লোক-লস্কর সব ব্যর্থ হল। স্বপ্নে নীলমাধব আবার সেই শবর সর্দার আর সেই ব্রাহ্মণকে ডাকার জন্য বললেন। সেই মত কাজ হল। শবর সর্দার বসু শবর এবং ব্রাহ্মণ বিদ্যা এসে হাত লাগাতে কাঠের গুঁড়ি ডাঙ্গায় তোলা গেল। কাঠের গুঁড়ি থেকে মূর্তি তৈরির জন্য রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন অনেক শিল্পীকে ডাকলেন। কিন্তু দক্ষ সূত্রধররাও কাঠটিকে কাটতে পারলেন না। শেষমেশ বিশ্বকর্মা অনন্ত মহারাণা নাম নিয়ে ছদ্মবেশে রাজাকে বললেন—একুশ দিনের মধ্যে মূর্তি তৈরি করে দেবেন। তবে এই একুশ দিন দরজা বন্ধ থাকবে। একুশ দিনের আগে দরজা খুললে বিপদ হবে। দরজা বন্ধ করে কাজ শুরু হল। কয়েকদিন হয়ে যাওয়ার পর রাণি গুণ্ডিচা চিন্তিত হলেন। তিনি বললেন, বৃদ্ধ সূত্রধর হয়তো মারা গেছেন ভেতরে। তখন মাত্র পনের দিন হয়েছে। রাণিকে চিন্তামুক্ত করতে মন্ত্রীদের বারণ সত্ত্বেও রাজা দরজা খুলে ফেললেন। দেখলেন মূর্তি অসম্পূর্ণ। বলরাম, জগন্নাথ, সুভদ্রার হাত-পা হীন মূর্তি তৈরি হয়েছে। এই মূর্তি দেখে মালবরাজা দুঃখে কাতর হলেন। তিনি অনুশোচনা করলেন—তাঁর ভুলেই এই ঘটনা ঘটেছে। তিনি শর্ত না মানায় এই বিপদ। তাঁর দুঃখে আবার দৈববাণী হল। তা থেকে জানা গেল কলি যুগে এটাই তাঁর রূপ হবে। এই রূপেই তিনি ফল ফুল নেবেন। জগন্নাথ আরো বললেন, জরা শবরদের এবং বিদ্যা ব্রাহ্মণের বংশধরদের মন্দিরের কাজে রাখতে হবে। শবররা হবে জগন্নাথের সেবক। জানালেন বছরে একমাস তাঁদের হাতে জগন্নাথ সেবা নেবেন। বিদ্যা ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানরা হবে তাঁর অর্চক। বিদ্যা ব্রাহ্মণ এবং শবর কন্যা ললিতার গর্ভজাত সন্তানরা হবেন জগন্নাথের প্রতিদিন ভোগ রন্ধনের পাচক।

নারদের উপদেশে মন্দির শুদ্ধিকরণ এবং উদ্বোধন করবার জন্য রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মার কাছে পৌঁছালেন। ব্রহ্মা তখন ধ্যানমগ্ন। ইন্দ্রদ্যুম্ন ন'য় যুগ অপেক্ষা করার পর

ব্রহ্মার ধ্যান ভেঙেছিল। ততদিনে মন্দির বালির মধ্যে ঢুকে গেছে। ওড়িশায় তখন রাজা গালমাধব। গালমাধব একদিন ঘোড়ায় চেপে বালুচরের ওপর দিয়ে যাচ্ছেন, সেই সময় তাঁর ঘোড়ার পা আটকে গেল বালিতে। কিছুতেই তুলতে পারল না ঘোড়ার পা। রাজা দেখলেন, ঘোড়ার পা শক্ত কিছুতে আটকে গেছে। সেই শক্ত জিনিসটি একটি ত্রিশূল। আরও বালি খুঁড়ে দেখা গেল বালির তলায় একটি মন্দির। গালমাধব মন্দিরটি সংস্কার করলেন। মন্দির সংস্কার করার পর যখন মূর্তি প্রতিষ্ঠার কথা ভাবছেন, তখন ওখানে এসে উপস্থিত হলেন রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন এবং ব্রহ্মা। ইন্দ্রদ্যুম্ন এবং গালমাধবের বাদানুবাদ শুরু হল। ব্রহ্মা মধ্যস্থতা করলেন। ইন্দ্রদ্যুম্নের পক্ষে মন্দিরের পাশের গাছে যুগ-যুগ বসবাসকারী ভূশণ্ডি কাক এবং ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরের কূর্মরা সাক্ষ্য দিল। ইন্দ্রদ্যুম্নকে ব্রহ্মা মন্দির শুদ্ধিকরণের আদেশ দিলেন। মন্দিরে জগন্নাথের মূর্তির প্রতিষ্ঠা হল। শবরদের হত্যা করেছিলেন বলে জগন্নাথ রাজা গালমাধবকে নির্বংশ হবার অভিশাপ দিলেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন জগন্নাথের কাছে প্রার্থনা করেন যেন তাঁর কোনো বংশধর না থাকে। শোনা যায়—ভবিষ্যতে জগন্নাথ পূজায় কোনোরকম ভুল না করে যাতে তাঁর বংশধররা অভিশপ্ত না হন, তার জন্য এই কামনা করেছিলেন।

পাঠান্তরে শোনা যায় নীলমাধবকে দেখার পর ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণ শবর স্ত্রী ললিতার কাছে বিদায় নিয়ে হাজির হন রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের সভায়। পুরো ঘটনা শুনে রাজা দেরী না করে সৈন্যবাহিনী সহ শবরদের দেশে এসে উপস্থিত হন। কিন্তু নির্দিষ্ট স্থানে এসে নীলমাধবকে দেখতে না পেয়ে শবর পল্লী ঘিরে ফেলেন এবং বসু শবরকে গ্রেপ্তার করেন। এরপর ইন্দ্রদ্যুম্ন শবরকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য দৈববাণী শুনতে পান।

নীলমাধবের লোককাহিনীটি শবর সমাজে বেশি প্রচলিত। নীলমাধবের কারণে ওড়িশার শবররা আদিবাসী কিংবা অ-আদিবাসী সমাজে সম্মানিত। ওড়িশায় শবরদের মধ্যে ক্ষেত্রানুসন্ধানে দেখেছি তাঁদের প্রবল আত্মবিশ্বাস। গলায় তাঁরা পৈতে পরেন। অর্থাৎ নিজেদের উচ্চজাতি হিসাবে তুলে ধরেন। মাথা উঁচু করেই বাঁচেন। পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষিতে শবর সমাজে এগুলি বেশ বেমানান।

এই লোককথাটি কিন্তু সার্বিকভাবে শবরদের গুরুত্ব বাড়ায় সমাজে। এখানে ব্রাহ্মণ-শবর বিবাহ হয়েছে, যা সম্প্রীতির একটা নজির তৈরি করে। লোককথায় যা সম্ভব হয়েছে বাস্তবে কিন্তু আমরা তা করে উঠতে পারিনি। তাই পশ্চিম মেদিনীপুরের আমলাশোল গ্রামের মালতী শবর যখন আকাশ মুণ্ডাকে বিয়ে করল মুণ্ডা সমাজ তখন মালতী এবং আকাশকে সমাজচ্যুত করে দিল। সমাজপতিদের কথায় এরা 'পতিত' হল সমাজ থেকে। অথচ ব্রাহ্মণ বিদ্যাপতি শবর কন্যা ললিতাকে বিয়ে করলেন সসম্মানে। শুধু তাই নয়, শবর কন্যা ললিতা ব্রাহ্মণ বিদ্যাপতিকে বুদ্ধি দিলেন, চোখ বাঁধা অবস্থায় সর্ষের দানা ফেলার জন্য। শবর কন্যার দেওয়া বুদ্ধি অনুযায়ী চলে ব্রাহ্মণ সফলও হয়েছে। জগন্নাথ যে—স্বপ্নাদেশ দিয়েছেন, তাতে ব্রাহ্মণ এবং শবর উভয়কেই সম্মান

দিয়েছেন। তাঁর সেবায় সব সমাজকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। লোককথাটিতে দেখা যায় ক্ষুদ্র জাতপাত, ভেদাভেদ সব মুছে গেছে। এই লোককথার অভিপ্রায় হল অস্বাভাবিক ঘটনার সমাবেশ (Extra ordinary occurrences F 900)।

অন্য আর একটি লোককথা অনুযায়ী ভগবান পৃথিবী তৈরি করলেন। তৈরির পর ভগবান শিবকে এই পৃথিবীকে রক্ষা করতে বললেন। শিব ঠিক করলেন, এই পৃথিবীতে চাষ করবেন। এর জন্য লাঙ্গল, জোয়াল, হাল তৈরি করলেন। শুধুতো লাঙ্গল, জোয়াল, হাল হলে চলবে না, এর জন্যতো গরু চাই। শিব নিজের সহচরদের দুটি বলদ করে মর্তে পাঠালেন। সমস্যা দেখা দিল জমি নিয়ে। কারণ তখন চারদিকে শুধু জঙ্গল আর জঙ্গল। চাষের জন্য এই জঙ্গল পরিষ্কার করতে হবে। জঙ্গল সাফ করার জন্য শিব মানুষ তৈরি করলেন। এই মানুষদের নাম হল শবর। শবরদের হাতে কুঠার দিয়ে শিব গাছপালা কেটে চাষের জমি তৈরির নির্দেশ দিলেন।

শবর শিবের আদেশমত লেগে গেলেন চাষের জমি তৈরিতে। গাছ কাটতে কাটতে শবর ক্ষুধা এবং তৃষ্ণায় ক্লান্ত হলেন। কিন্তু খাবার নেই। এই অবস্থায় হঠাৎ শবরের খেয়াল হল লাঙ্গল করার জন্য দুটি বলদ বাঁধা আছে। ক্ষুধার তাড়নায় শবর বলদ দুটিকে কেটে বড় বড় সেগুন পাতায় নিয়ে খেলেন (এখনো অনেকে বলেন সেগুন পাতা থেকে যে লাল রস পড়ে আসলে সেটা সেই গরুদের রক্ত)। খাওয়ার পর ক্লান্ত শরীর নিয়ে শবর ওখানেই ঘুমিয়ে পড়লেন। অনেকক্ষণ অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর শিব লাঙ্গল করার জন্য ওখানে এসে হাজির হলেন। এসে দেখলেন অনেকটা জায়গা পরিষ্কার হয়েছে। খুব খুশি হলেন শবরের কাজে। কিন্তু তাঁর বলদ দুটি কোথায় তা খুঁজতে লাগলেন। এদিক-ওদিক খোঁজার পর দেখতে পেলেন বলদ দুটির হাড়গুলি পড়ে আছে। শিব মন্ত্রপূত জল ছিটিয়ে বলদগুলির প্রাণ ফিরিয়ে দিলেন। প্রাণ ফিরে পেয়ে বলদগুলি শিবকে সব কথা বলল। শিব শবরের ওপর রুষ্ট হলেন। অভিশাপ দিলেন শবরকে, তুই এবং তোর বংশধররা বনেই থাকবি আর সারাজীবন তোদের দুঃখে, কষ্টে কাটবে।

গল্পটিতে একটি অভিপ্রায় হল জল সিঞ্চনে পুনর্জীবন লাভ। স্টিথ টমসনের ভাষায়, 'Most popular of all in folk tales is revival through the water of life [E 80]'. আগের একটি লোককথার মতন এখানেও শিব প্রথম মানুষ হিসাবে তৈরি করলেন শবরকে। শবরই জঙ্গল কেটে এই পৃথিবীকে মানুষের বসবাস উপযোগী করে তোলেন। তবে শিব যে অভিশাপ দিয়েছিলেন, তা কিন্তু শবরদের জীবনে পুরোপুরি লেগে গেছে। সারা জীবন শবরদের দুঃখে-কষ্টে এবং জঙ্গলেই কাটে। এখনো শবরদেরকে আমরা সমাজের মূল অংশের সঙ্গে মেলাতে পারিনি। শবরদেরকে নানারকম অপবাদ (চোর, মাতাল, নোংরা, অচ্ছুৎ কিংবা অপরাধপ্রবণ জাতি বা Criminal tribe) দিয়ে কাছে ঘেঁষতে দিই না। শিবের এইরকম অভিশাপ দান আমরা

পটুয়াদের ক্ষেত্রেও দেখেছি। সেখানেও শিব পটুয়াদের সারা জীবন দুঃখে থাকার অভিশাপ দিয়েছেন। অভিশাপের কথা জানতে পারি 'ঐতরেয়' ব্রাহ্মণ গ্রন্থ থেকেও। এখানে বলা হয়েছে শবররা ঋষি বিশ্বামিত্রের বংশধর। ঋষি বিশ্বামিত্র এক ব্রাহ্মণ বালককে পোষ্য নিয়েছিলেন। এতে তাঁর ছেলেরা ক্ষুব্ধ হন। তাঁর ছেলেরা ঝগড়া করেন। ক্রুদ্ধ হন বিশ্বামিত্র। ছেলেদের অভিশাপ দেন তাদের বংশধররা সমাজে পতিত হবে।

কালকেতু-ফুল্লরার কাহিনীতেও অভিশাপ পেয়েছেন শবররা। দরিদ্র শবর কালকেতু-ফুল্লরা খুব কষ্টে দিনযাপন করতেন। জঙ্গলে শিকার করাই কালকেতুর জীবিকা ছিল। একদিন কালকেতু জঙ্গল থেকে একটি স্বর্ণগোধিকা শিকার করে আনেন। স্বর্ণগোধিকা শিকার করে এনে বাড়িতে রেখে কালকেতু স্নান করতে গেলেন। সেইসময় কালকেতুর স্ত্রী ফুল্লরা বাড়িতে ছিলেন না। ফুল্লরা বাড়িতে ফিরে দেখলেন, এক সুন্দরী নারী তার বাড়ির উঠোনে বসে আছেন। ফুল্লরা সেই নারীকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোথাথেকে এলে? নারী বললেন, তোমার স্বামী আমাকে নিয়ে এসেছে। আসলে স্বর্ণগোধিকা সুন্দরী নারীতে রূপান্তরিত হয়েছিলেন। ফুল্লরা সেই সুন্দরী নারীকে তাদের সারাবছরের দুঃখ-দুর্দশার কথা বোঝানো শুরু করলেন, যাতে সেই নারী ওদের বাড়িতে না থাকেন। কিন্তু এই বোঝানোতেও সুন্দরী নারী কালকেতুর বাড়ি থেকে যেতে চাইলেন না। বললেন, তোমার স্বামীইতো আমাকে ভালবাসে। ফুল্লরা আরো চটে গেলেন। অগত্যা বাড়ি থেকে বার করার জন্য ফুল্লরা রেগে সুন্দরী নারীকে টানাহ্যাঁচড়া শুরু করলেন। ক্ষতবিক্ষত হলেন সেই নারী, তাঁর কাপড় ছিঁড়ল। সুন্দরী সেই নারী অভিশাপ দিলেন, শবর নারীদের এইভাবে ছেঁড়া কাপড় পরে জীবন কাটাতে হবে। লোককথা অনুযায়ী এই সুন্দরী ছিলেন দেবী চণ্ডী। তিনি কালকেতুকে দিয়ে মর্ত্যে তাঁর মাহাত্ম্য প্রচার করতে চেয়েছিলেন। এই লোককথাটির নানারকম পাঠান্তর পাওয়া যায়। কোনোটিতে দেখা যায় কালকেতু দেবীর আশীর্বাদে রাজা হয়েছিলেন, পরে নিজের ভুলে আবার গরীব হন।

স্বামী হারানোর ভয়ে ফুল্লরা যেমন আতঙ্কিত, তেমনি এক শবর পুরুষ তাঁর স্ত্রীকে হারাতে চান না। স্ত্রীর ওপর পূর্ণ অধিকার কায়েম রাখার জন্য স্ত্রীর প্রেমিককে হত্যা করতেও পিছ-পা হননি শবর স্বামী।

অনেককাল আগে এক শবর-শবরী জঙ্গলের মধ্যে বসবাস করতেন। শবর পুরুষটি সারাদিন জঙ্গলে ঘুরে যা শিকার করেন, তাই দিয়ে ওদের সংসার চলে। অভাব থাকলেও ওদের মনে শান্তি ছিল। কিন্তু কিছুদিন ধরে শবর পুরুষটি খেয়াল করলেন শবর নারীটির সংসারে মন নেই। অকারণে ছোট ছোট বিষয় নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে গোলমাল হয়। একদিন শবর পুরুষটি জঙ্গলে শিকারের জন্য গেলেন, কিন্তু শরীর ভাল না লাগায় তাড়াতাড়ি দুপুরের মধ্যে ফিরে এলেন। অন্যান্য দিন সন্ধ্যার আগে আগে

ফিরতেন। ফিরে দেখলেন, দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। পুরুষটি দরজার ছোট গর্ত দিয়ে দেখলেন, ভেতরে তার স্ত্রী এবং এক বীর বানর বসে আছে। শবর পুরুষটি বাড়িতে ঢুকলেন না। অন্যান্য দিনের মতন সন্ধ্যার আগে ফিরলেন। তিনি খোঁজনিয়ে জানলেন, বানরটি তার স্ত্রীর প্রেমিক। মনে মনে ঠিক করলেন স্ত্রীকে উচিত শিক্ষা দেবেন। একদিন শরীর খারাপের অছিলায় তিনি জঙ্গলে যাবেন না বললেন। আর বললেন, এক আত্মীয় এসে তার স্ত্রীকে অন্যত্র নিয়ে যাবে। সেইদিন বাড়িতে থাকলেন শবর পুরুষটি। বানর এলেন, ঘরে ঢুকলেন। শবর পুরুষটি তাকে মেরে কেটে ফেললেন। রাত্রে তাঁর স্ত্রী ফিরলে তাঁকে বানরের মাংস খাওয়ালেন। নারীটি কিছু বুঝতে পারলেন না। বুঝলেন, পরের দিন যখন শবর নারীটি ঘর সংসারের কাজ করতে গিয়ে কলসীর মধ্যে বানরের কাটা মাথাটি দেখতে পেলেন।

অন্য আর একটি লোককথা থেকে আমরা জানতে পারি একদিন ভগবান তাঁর শরীরের অংশ থেকে তৈরি করলেন এক রূপসী কন্যাকে। সেই কন্যাকে অন্য কোথাও না রেখে রাখলেন জঙ্গলে। সেই কন্যার নাম দিলেন বনদুর্গা। এরপর সেই বনের রাজা জরাশবরকে বললেন, প্রতিদিন বনদুর্গার পুজো করতে। এদিকে সেই রাজ্যে তখন গমহাসুর নামে এক অসুরের খুব উৎপাত শুরু হয়েছে। জরাশবর কিছুতেই এই অসুরকে শায়েস্তা করতে পারছেন না। নিরুপায় হয়ে তিনি ভগবানের কাছে হাজির হলেন। ভগবান বললেন, কোনো চিন্তা করতে হবে না। যে তোদের বাঁচাবে সে বনেই আছে। তার আরাধনা কর, তোরা এই অত্যাচার থেকে মুক্তি পাবি। জরাশবরের আরাধনায় দেবী খুশি হলেন। শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমায় মোহিনী ভৈরবীর রূপ ধরে গমহাসুরকে বধ করলেন দেবী। তাই এই দিনটা গমহা পূর্ণিমা নামে পরিচিত।

এই লোককথা অনুযায়ী জরাশবর বনদুর্গার পুজোর প্রচলন ঘটান পৃথিবীতে। আর শবররা যে দায়িত্ব সহকারে রাজ্য পরিচালনা করতেন তার ইঙ্গিতও মেলে। নইলে রাজ্যবাসীর বিপদে জরাশবর ভগবানকে কেন ডাকতে যাবেন? এই লোককথার অভিপ্রায় হল দেবসেবার পুরস্কারলাভ।

একটি লোককথায় বলা হয়েছে জঙ্গলের মধ্যে একটা ডুংরিতে এক লোধা শবর বাস করতেন। সকলের সঙ্গে তিনি শিকার সংগ্রহে যেতেন। একদিন তিনি জঙ্গলের মধ্যে হারিয়ে গেলেন। সঙ্গী সাথীদের হারিয়ে মনের দুঃখে, চিন্তায় ক্লান্ত হয়ে তিনি গাছের তলায় ঘুমিয়ে পড়লেন। এমন সময় ওখানে এসে হাজির হল একটি ছোট্ট মেয়ে। ছোট মেয়েটি শবর লোকটিকে ঘুম থেকে তুলল। তুলে বলল, তোর কাজ নেই! কাজ নেইতো আমার উকুন বেছে দে। শবর লোকটি বললেন, কোথাকার কে রে তুই! আমি তোর উকুন বাছব! একথা বললেও শবর লোকটি মেয়েটিকে কাছে ডাকলেন। মাথায় হাত দিয়ে দেখলেন, এতো উকুন নয়, মাথা ভর্তি চোখ। শবর লোকটি এই দৃশ্য দেখে অবাক হয়ে গেলেন! ভাবলেন, এ নিশ্চয় কোনো সাধারণ মানুষ নয়, দেবীই হবেন। পায়ে পড়ে গেলেন ছোট্ট মেয়েটির। মেয়েটি বললেন, আমি

বড়াম দেবী। গাঁয়ে আমার পুজো ভালভাবে হয়নি, তাই গাঁয়ে ফিরে গিয়ে আমার পুজো ভালভাবে করতে বল। আর আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল একথা যেন কেউ না জানে। শবর লোকটি গ্রামে ফিরে দেবীর কথা সকলকে বলে দেন। বলার কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়। শুধু তাঁর মৃত্যু নয়, এরপর গ্রামে অনেকেই মহামারীতে মরেন। গ্রামের লোকেরা এবার ভাবতে থাকে বড়াম দেবী রেগে যাবার কারণে এই বিপদ। তাই গ্রামবাসীরা ঠিক করেন বড়াম দেবীর পুজো ভালভাবে করতে হবে। তখন থেকেই বড়াম দেবীর পুজো মহা ধূমধাম করে হয়।

এখানে অভিপ্রায়টি হল নিষেধভঙ্গজনিত মৃত্যু। [সি ৯২০]। নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে অভিধানে যা লেখা হয়েছে তা হল : The basic motif of countless folk-tales occuring every where in the world, in which the life, happiness, success, failure of the character depends upon the observation or violation of some tabu... There are numerous stories also involving eating and drinking tabus, looking, touching, speaking, saying tabus, boasting laughting etc. অর্থাৎ শবর লোকটি যে মারা গেলেন তার কারণ দেবীর বারণ না শোনা। দেবী বলেছিলেন, তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা কেউ যেন না জানতে পারে। শবর সেই কথা মানেননি। ফলে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

একটি লোককথা এইরকম : এক গ্রামে এক চাষীর বাড়িতে এক শবর ছেলে থাকত। এই ছেলেটি চাষীর বাড়ির সব কাজ করত। ঘর গেরস্থালী, চাষের কাজ, গরু চরানো সবই তাকে করতে হত। গরু নিয়ে ঘুবতে-ঘুরতে সে তার কাঁড়বাঁশ নিয়ে শিকার করত। একদিন চাষীর ঘরে উৎসব। অনেক লোক খাওয়া দাওয়া করবে। শবর ছেলেটি বঁটি দিয়ে মাছ কাটছে। মাছ কাটতে কাটতে ছেলেটি একটি মাছের পেটের মধ্যে লোহার জালকাঁঠি দেখতে পেল। ছেলেটি লোহার জাল কাঁঠিটা লুকিয়ে রাখল নিজের কাছে। ওটা দিয়ে কী করবে ভাবতে-ভাবতে শবর ছেলেটি ওটা দিয়ে তীরের ফলা বানাল।

সেই তীর দিয়ে ছেলেটি প্রচুর শিকার করে বেড়াত সারাদিন। একদিন শিকারে বেরিয়ে ছেলেটি সারাদিন ঘুরেও কোনো শিকার পেল না। মনের দুঃখে সে গাছের তলায় শুয়ে পড়ল। শুয়ে পড়তেই দেখতে পেল একটা রাঙা পাখির পিছনের অংশটা। পাখির দিকে তাক করে তীর ছুঁড়ল। নিশানা ব্যর্থ হল না, তীর গিয়ে বিঁধল। কিন্তু এ কী, এতো পাখি নয়, স্বয়ং ভগবানের শরীর লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। শবর ছেলেটি ভগবানকে মেরে ফেলার অপরাধে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল। ভগবান বললেন, কাঁদিস না, তোর হাতেই আমার মরণ ছিল। ভগবানের সান্ত্বনাতেও ছেলেটি শান্ত হয় না। অবশেষে সে সিদ্ধান্ত নিল, আর কোনো দিন শিকার করবে না। সেই অনুযায়ী ছেলেটি তার কাঁড়বাঁশটি আর কাঁড়টি আগুনে পুড়িয়ে দিল। লোককথা অনুযায়ী আমরা আকাশে যে রামধনু দেখি সেটি হল এই ছেলেটির কাঁড়বাঁশ, আর কাঁড়টা হল বিজলী।

এই লোককথা অনুযায়ী আমরা জানতে পারি কৃষকের বাড়িতে শবর ছেলে

সবরকম কাজের সুযোগ পেতেন। অর্থাৎ জাতপাত কিংবা ছোঁয়াছুঁয়ি নিয়ে কোনো বিধিনিষেধ ছিল না। শবর ছেলেটি রান্নার জন্য মাছও কাটত। লোককথায় যা সম্ভব ছিল বাস্তবে এখনকার দিনে শবরদের ভাগ্যে অশবর গৃহে তা অধরা থেকে গেছে। বর্তমান সমাজে শবররা কোনো কোনো ক্ষেত্রে এতটাই অস্পৃশ্য যে শবর শিশুরা বিদ্যালয়ে যাওয়ার সুযোগ পায় না। বিদ্যালয়গুলিতে দুপুরের খাবার চালু হবার পর এই অস্পৃশ্যতা আরো বেশি করে চোখে পড়ছে, যেহেতু খাবারের সময় ছোঁয়াছুঁয়িটা বেশি করে মানার হিড়িক সমাজে।

একটি লোককথা অনুযায়ী এক লোধা শবর জঙ্গলে মকাই চাষ করেছিলেন। শেয়াল, কাক ছাড়াও অন্যান্য পশু-পাখি মকাই খেয়ে ফেলে। তাই লোধা শবর লোকটি তাঁর ক্ষেতের পাশে একটা গাছে 'টোঙ' বানিয়ে থাকেন। তাঁর বুড়ো মা বাড়িতে থাকেন। এক রাত্রে লোকটি দেখেন দূরে একটা আলো জ্বলেই দপ করে নিভে গেল। পরের দিন আলোটা আরো কাছে এল। তৃতীয় দিনে আলোটা আরো কাছে এল। চতুর্থ দিন লোধা লোকটি দেখলেন টোঙ যে গাছে আছে আলোটা সেই গাছের তলাতেই জ্বলছে। আলোর সঙ্গে দেখলেন এক সুন্দরী মহিলাকে। লোধা লোকটি তুকতাক জানতেন। আস্তে করে সেই মহিলার লম্বা চুল থেকে কিছু চুল কেটে নিলেন। মহিলারূপী চিড়কিন ভূত আটকা পড়লেন লোধা মানুষটির কাছে। তখন থেকে এঁরা স্বামী-স্ত্রীর মতন 'টোঙ'-এ থাকতে লাগলেন।

এদিকে লোকটি রাত্রে আর বাড়িতে বসে খান না। ব্যাপারটি হল বুড়ী মা রান্না করেন, পরিমাণে বেশি খাবার নিয়ে এসে চিড়কিন ভূত আর লোধা লোকটি 'টোঙ'-এ বসে খান। বাড়িতে কেন খায় না, এ বিষয়ে লোধা মায়ের খুব সন্দেহ বাড়তে থাকে। লুকিয়ে এসে বৃদ্ধা দেখেন ছেলের সঙ্গে এক সুন্দরী নারী। হাতেনাতে ধরে ফেলে বৃদ্ধা খুব চিৎকার করতে থাকেন। চিড়কিন ভূত বলে, আমার কোনো দোষ নেই। তোর বেটাইতো আমাকে আটকেছে। লোধা লোকটি ভয়ে আর কিছু বলতে পারেন না। তবে বৃদ্ধা বলেন, বিয়ে যখন করেছিস তবে ঘরে নিয়ে চল বউকে। বউ তার লোধা স্বামীকে বলে, ঘরে নিয়ে যাচ্ছ ভাল, কিন্তু ঝাঁটা যেন আমার গায়ে না লাগে। কোনো কারণে যদি আমার গায়ে ঝাঁটা লাগে তবে কিন্তু আমি আর থাকব না।

এখানেও শবরকে কৃষিজীবী হিসাবে দেখানো হয়েছে। অন্তত শবর যত্ন সহকারে মকাই চাষ করছেন। বাস্তবে কিছুকাল আগেও শবররা চাষের বিষয়ে খুব উদাসীন ছিলেন। এখন ধীরে ধীরে এই বিষয়ে তাঁদের আগ্রহ জন্মাচ্ছে। ঝাঁটা গায়ে লাগলে বউ বাড়িতে আর থাকবে না বলেছে, বিষয়টা প্রতীকী। লোকবিশ্বাস অনুযায়ী ভূতেরা ঝাঁটাকে ভয় পায়, তাই বউ রূপী ভূত একথা শবর লোকটাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। অন্যভাবে আমরা ভাবতে পারি, প্রতিবাদী শবর স্ত্রী স্বামীকে মনে করিয়ে দিয়েছে যেন তার গায়ে কোনোভাবেই ঝাঁটা না লাগে। অর্থাৎ তার ওপর যেন কোনোভাবেই অত্যাচার না হয়। অত্যাচার হলেই কিন্তু সে আর বাড়িতে থাকবে না বলে দিয়েছে।

এখানে অভিপ্রায়টি হল অস্বাভাবিক ঘটনার সমাবেশ (Extra ordinary occurences F 900)।

উপসংহারে এসে বলতে পারি, বেশিরভাগ প্রাচীন লোককথায় শবর চরিত্রগুলি খুবই গুরুত্ব দিয়ে চিত্রিত হয়েছে। দারিদ্র্য, বঞ্চনা, অত্যাচার প্রভৃতি লোকসমাজের সর্বক্ষণের সঙ্গী। নানারকম রূপকে সেই জীবনযন্ত্রণা চিত্রিত হয়েছে। লোককথাগুলির কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে নিশ্চয়, কিন্তু সেটা গবেষণার বিষয়। তবে একটি জাতিকে শুধুই হতদরিদ্র রূপে চিত্রিত না করে তার গৌরবের দিক তুলে ধরলে, সেই জাতির মানুষের মাথা উঁচু করে বাঁচতে অনেক সুবিধা হয়। বাস্তবে সে—সুবিধা পশ্চিমবঙ্গের সমাজে শবররা পান না। পরাধীন ভারতে ব্রিটিশরা এই জাতিকে 'অপরাধপ্রবণ জাতি' আখ্যা দিল। স্বাধীন ভারত সরকার 'বিমুক্ত জাতি' হিসাবে ঘোষণা করল। এর ফলে শবর জাতিটার কলঙ্ক থেকেই গেল। এই কলঙ্ক মোচনের প্রয়াস সমাজকর্মীরা এবং কোনো কোনো মরমী লেখক করেছেন। প্রখ্যাত সাহিত্যিক মহাশ্বেতাদেবীর বিখ্যাত উপন্যাস 'কবি বন্দ্যঘটী গাঞিঁর জীবন ও মৃত্যু'র নায়ক চরিত্র শবর কবি বন্দ্যঘটী। বইটিতে শবর নায়কের জেগে ওঠার কাহিনী অগাধ মায়া মমতায় বর্ণনা করেছেন লেখিকা। নীলমাধবের কাহিনীতে জগন্নাথদেব শবর জাতিকে অনেক প্রেরণা, অনেক সম্মান দিয়েছেন। যে সম্মানের কথা আমলাশোলের ইন্দ্র শবর, বনমালী শবররা চিৎকার করে বলতে থাকেন—'আমরা ব্রাহ্মণের চেয়েও বড়। ব্রাহ্মণরা আমাদের জামাই' আবার আবেগ কিংবা স্বপ্নের ঘোর কাটার সঙ্গে সঙ্গে এই শবররা ঘোরতর বাস্তবের সওয়ার হন। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় দেখেছি, শবররা অ-শবর গৃহে (আদিবাসী সমাজেও) হন না আপ্যায়িত, পংক্তিভোজন থেকে হন বিতাড়িত। শবর নারী কোকিলা শবরের হাত থেকে মুণ্ডা পুরুষরা প্রতিযোগিতায় জেতা পুরস্কার পর্যন্ত নেন না, কুরমী (মাহাত) সম্প্রদায়ের শিশুদের সঙ্গে শবর শিশু খেলার সুযোগ পায় না। যুগ যুগ ধরে চলছে এঁদের প্রতি বঞ্চনা আর অবজ্ঞা। কিন্তু আশার কথা কিছুক্ষণের জন্য হলেও এইসব লোককথা একটা জাতিকে মুক্তি দেয়, অন্তত যেখানে শবররা অনেক শক্তিশালী রূপে চিত্রিত। যেমন নীলমাধবকে জল থেকে তোলার জন্য শবরকে ডাকা, জঙ্গল পরিষ্কার করার কাজে শিবের শবর তৈরি, জরাশবরের গমহাসুরকে হত্যা প্রভৃতি ঘটনাগুলি একালের শবরদের আত্মবিশ্বাস বাড়াতে সাহায্য করবে। অন্য জনজাতি কিংবা সমাজের অন্যান্য মানুষের মনেও শবরদের প্রতি এই লোককথাগুলি শ্রদ্ধা বাড়াতে পারে। কোনো কোনো লোককথায় শবর নারীদের ক্ষমতা হরণ করা হয়েছে অত্যন্ত সুকৌশলে। কাহিনীগুলিতে দেখা যাচ্ছে শবর নারীরা তাঁদের ভুলের জন্যই সব কিছু হারাচ্ছেন। যেমন নীলমাধবের কাহিনীতে ললিতা তাঁর বাবাকে বাধ্য করেছেন বিদ্যা ব্রাহ্মণকে গোপন স্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্য। এর ফলে নীলমাধব চুরি গেছেন। ফুল্লরার ভুলে দেবী অভিশাপ দিয়েছেন শবর সমাজকে। ছদ্মবেশী দেবী কালকেতুর বাড়িতে থাকতে চেয়েছিলেন।

অবশ্য স্বামীর প্রেমিকাকে কোনো নারীর পক্ষে মানা কি সম্ভব? ছদ্মবেশী দেবীকে ফুল্লরা বুঝবেন কী করে? একই সঙ্গে এই কাহিনীতে কালকেতুর প্রতি ফুল্লরার যে তীব্র প্রেম তাও চিত্রিত। শবরদের প্রেমও লোককথাগুলিতে রোমান্টিকতার আবহ এনেছে। একটি লোককথায় ভূতের সঙ্গে শবর চাষী প্রেম করছেন গাছের ওপর 'টোঙ'-এ বসে। সেই ভূত বাড়িতে সংসার করতেও যাচ্ছে। শবর নারী বানরের সঙ্গে প্রেম করছেন, যদিও শবর নারীকে প্রেম থেকে বিরত করার জন্য শবর পুরুষের বানর-হত্যার মাধ্যমে একটি ভয়ঙ্কর নৃশংসতা ফুটে উঠেছে। আজকের নিরীহ শবরদের দেখে এই নৃশংশতা খুব বেমানান লাগে। যাইহোক লোককথাগুলি বিশ্লেষণ করে আমরা একটি সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে শবররা প্রাচীন এবং একটি গৌরবময় জাতি। ইতিহাসের ধারায় শবররা আজ অবহেলিত হচ্ছেন। ধারাবাহিক শিক্ষা পেয়ে এবং সংগঠিত হয়ে, সেই অবহেলার বিরুদ্ধে শবররা আবার জেগে উঠবেন একদিন।

সহায়ক গ্রন্থ :

১. বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস : ড: বরুণকুমার চক্রবর্তী, পুস্তকবিপণি, এপ্রিল, ১৯৯০
২. শবর নারী : প্রহ্লাদকুমার ভক্তা, বহুকৌণিক দৃষ্টিপাতে পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী নারী (সম্পাদনা : রত্না গুপ্ত), কালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ১৯৯০
৩. লোধাদের নীলমাধব : শ্রীমন্ত ভক্তা, বর্তিকা (সম্পাদক : মহাশ্বেতা দেবী), এপ্রিল-জুন, ১৯৯৮
৪. পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ : ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে, সুবর্ণরেখা, সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯
৫. লোধাশবর লোককথা : নলিনী বেরা, বিজয়ন প্রকাশনী, নভেম্বর, ২০০২
৬. শবর . অনিল চৌধুরী. পুরুলিয়ার শবর এবং গোপীবল্লভ সিংদেও, অনৃজু প্রকাশনী, বসন্ত উৎসব, ২০০৫

টোটোদের লোককথা

দিলীপ কুমার রায়

পশ্চিমবঙ্গের উত্তরপ্রান্তের সীমান্ত ছুঁয়ে শেষ জেলা জলপাইগুড়ি জেলা। সীমানা ছুঁয়ে আছে দুটি রাষ্ট্র, একটি রাজ্য আর দুটি জেলা। ১৮৬৯ এর জানুয়ারির প্রথম দিন এই জেলার জন্ম। তবে এই এলাকাটির গুরুত্ব দীর্ঘকালের। উত্তরবঙ্গের নানা অংশের ওপর দিয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নানা জাতি-জনজাতির প্রবাহ বয়ে গেছে। তাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব এখানকার জনসমাজে সংস্কৃতিতে কিছু কিছু থেকে গেছে। জলপাইগুড়ি এমন একটি জেলা যেখানে জীবন ও জীবিকার সূত্রে আগত দ্রাবিড়, অস্ট্রিক, (ভোট-চীনীয়) ভারতীয় আর্য গোষ্ঠীর একশো একটি শ্রেণীনির্নীত ভাষা যেমন আছে তেমনি আছে বহুসংখ্যক উপভাষা-বিভাষার অস্তিত্ব। এই কারণেই জলপাইগুড়ি জেলা এবং বিশেষভাবে ডুয়ার্স এলাকা বহু ভাষাভাষী অঞ্চল। স্থানীয় লোকজনের মতে 'ডুয়ার্স' (Dooars) সমভূমি থেকে ভুটানের ভেতরে যাতায়াতের পথ। ১৮৬৬তে সার্জন রেনি, এম. ডি. Bhotan And the Story of Dooar War বইয়ে ১৮টি দুয়ারের কথা বলেছেন। তখন সাতটি ছিল আসামে, বাকি বঙ্গপ্রদেশে। টোটোদের কথা বলতে গেলে এই বিষয়গুলোও জানা দরকার।

টোটো সম্প্রদায় পশ্চিমবঙ্গের ক্ষুদ্রতম জনজাতি বা উপজাতি, পশ্চিমবঙ্গে আদিম উপজাতি (Primitive Tribe community [PTC]) হিসেবে চিহ্নিত এবং এই সঙ্গে আছে অন্য দুটি উপজাতি সম্প্রদায়— পুরুলিয়ার বিরহড় আর মেদনীপুরে লোধা সম্প্রদায়। নৃ-তাত্ত্বিক দিক থেকে টোটোদের গুরুত্ব সর্বাধিক।

টোটোরা ভোট-চীনীয় নৃ-গোষ্ঠীর অন্তর্গত। টোটোদের নিজস্ব ভাষা আছে, বিখ্যাত ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, টোটোদের ভাষা ইন্দো-মঙ্গোলয়েড ভাষাগোষ্ঠীর উপহিমালয় বর্গের মধ্যে পড়ে। তবে বর্তমানে টোটোদের পঠনপাঠনে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যভাষা বাংলার ব্যবহার চলছে। টোটোদের শারীরিক গঠনে বৃহৎ মঙ্গোলীয় লয়েড গোষ্ঠীর বিশিষ্ট লক্ষণ নাক-চোখ-মুখের গঠনে স্পষ্ট। এক সময়ে টোটোরা হিমালয় অঞ্চলের শেরপাদের মতো ভারবাহী জনজাতি হিসেবে ভুটানের রাজ কর্মচারীদের কাজ করতেন, প্রায় বিনা পারিশ্রমিকের দাস প্রজা হিসেবে। বর্তমান টোটোপাড়া ভুটান-ইংরেজ যুদ্ধের আগে পর্যন্ত ভুটানের অধীনে ছিল। ১৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দের ১১ নভেম্বর সিঞ্চুলা চুক্তির পর সমগ্র ডুয়ার্স এল ইংরেজদের অধীনে।

টোটোরা বর্তমান টোটোপাড়ায় কয়েকশো বছর আছেন, কিন্তু সময়কাল বলা যায় না। তবে ভুটান থেকেই তারা আসেন এখানে।

বর্তমানে টোটোদের বাসস্থান টোটোপাড়া। আলিপুরদুয়ার মহকুমার মাদারিহাট থানার অন্তর্গত। টোটোপাড়া ছোট পাহাড়ের ওপর গ্রাম, যার উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠেব ৭৫০ থেকে ১৫০০ ফুট পর্যন্ত। জায়গাটা মাদারিহাট থেকে ২৫ কি.মি.; শিলিগুড়ি থেকে প্রায় ১৫০ কি.মি., ভুটানের ফুট্সলিং থেকে মাত্র ১১ কি.মি.। 'Account of Bootan' নামে বাবুকৃষ্ণকান্ত বসুর একটি লেখায় (১৮১৫ খ্রি.) প্রথম টোটোদের কথা পাওয়া যায়। পরবর্তী পর্বে অনেকেই টোটোদের নিয়ে গবেষণা করেছেন। ড. চারুচন্দ্র সান্যালের 'The Meches And the Totos two Sub-Himalayan Tribes of North Bengal' বড় মাপের কাজ। পরে একাধিক গবেষক টোটোদের নিয়ে কাজ করেছেন। ড. বিমলেন্দু মজুমদারের পরেও কাজ করছেন অনেকেই। ডি.এইচ.ই সাণ্ডার সাহেবের প্রতিবেদনে (১৮৯৫) টোটোদের কথা তো অনেকের আগেই ছিল।

টোটোদের জনসংখ্যা ১৯০১ খ্রিষ্টাব্দে ছিল মাত্র ১৭১ জন, বর্তমানে জনসংখ্যা প্রায় ১৩৫০ এর বেশি। তবে কয়েক বছর ধরে নেপালি সম্প্রদায়ের ব্যাপক অনুপ্রবেশের ফলে নেপালিরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে পড়ায় টোটোদের অতি সংরক্ষণশীল সমাজ ও সংস্কৃতি অনেকটা বিপন্ন। তাছাড়া অর্থনৈতিক দিক থেকে টোটোরা অনেক পিছিয়ে পড়েছেন। টোটো পাড়া গ্রামটির চারপাশেই নানা গাছপালা। সুপুরি এবং কমলালেবু এখানকার বড় সম্পদ। টোটোদের প্রিয় খাদ্য ভাত এবং মাংস। মাংস ভুটিয়াদের মতো শুকিয়ে রাখাও হয়। রান্নায় মশলার ব্যবহার সীমিত। ঘরে তৈরি মদ 'ইউ' যা তৈরি হয় কাউন বা মারুয়া থেকে। পান-সুপুরি তাদের সর্বক্ষণের সঙ্গী। টোটোরা একান্তভাবেই নিজস্ব গ্রামকেন্দ্রিক জনজাতি।

টোটোদের মধ্যে বর্তমানে ১৩টি গোত্র আছে। তবে সমাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে পাঁচটি পদ আছে— ১) কাইজি (পুরোহিত) ২) গাপ্পু (মোড়ল) ৩) পঞ্চায়েত ৪) পাও (ওঝা) ৫) নানপন (লোকজন জড় করার পদ)।

টোটো জনগোষ্ঠীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এবং সংস্কৃতি আধুনিক সভ্যতার অভিঘাতে কিছুটা পরিবর্তিত হতে চলেছে' সাংস্কৃতিক বিবর্তন ও পরিবর্তন সত্ত্বেও এই ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর নিজস্ব সাংস্কৃতিক চেতনার প্রতিফলন আছে তাদের লোকসংগীত নৃত্য এবং সামান্য কিছু লোকসাহিত্যে। প্রসঙ্গত আমাদের আলোচনা লোক কথা নিয়ে। টোটো লোককথার সংখ্যা অত্যন্ত সীমিত। সামান্য কিছু লোককথা মৌখিক সাহিত্য হিসেবে পাওয়া যায়।

টোটোদের সঙ্গে উত্তরবঙ্গের অন্যান্য সংখ্যাগরিষ্ঠ জনজাতি গোষ্ঠীগুলোর একটি মৌলিক পার্থক্য আছে। অন্যান্য জনজাতি, যেমন মেচ, রাভা, সাঁওতাল প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মানুষ জীবিকার প্রয়োজনে দেশবিদেশে ছড়িয়ে পড়েছে, অনেকেই

বহুস্তরের উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে নানা জীবিকা গ্রহণ করছেন। টোটোরা তাদের নিজস্ব বৃত্ত টোটো পাড়া ছেড়ে কদাচিৎ অন্যত্র যেতে রাজি হয়। সম্প্রতি তরুণ সমাজ লেখাপড়া শিখতে আরম্ভ করেছেন, স্কুল-কলেজেও যাচ্ছেন কেউ কেউ, একজন স্নাতক হয়ে চাকরি করছেন অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ বিভাগে। স্বাভাবিকভাবে সংস্কৃতির বিবর্তন, পুরনো লোকসংস্কৃতির পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে উঠছে। অনেকেই টোটো সমাজের অতি প্রাচীন সংস্কৃতি চর্চার ধারাগুলি ভুলতে বসেছেন। প্রকৃতি পূজারী টোটোরা নদী, জঙ্গল, পাহাড়, পুরাতন বৃক্ষ, পাথর, মাটি ইত্যাদির উপাসনা করেন। ছিল অনেক দুর্বোধ্য মন্ত্র, ধর্মীয় সংগীত, লোককথা ইত্যাদি বিষয়। সবই লুপ্তপ্রায়।

সম্প্রতি (২০১১) ক্ষেত্র সমীক্ষক প্রমোদ নাথ, তাঁর একান্ত পরিচিত ধনীরাম টোটো, যিনি উক্ত সমাজেরই একজন, তাঁর সহায়তায় কয়েকটি লোককথা সংগ্রহ করেছেন। ক্ষেত্রবন্ধু হিসেবে ধনীরাম টোটোর অমূল্য সহযোগিতা ছাড়া একাজ সম্পন্ন হতো না। আমাদের আলোচনায় ছ'টি লোককথার সংক্ষিপ্ত রূপরেখা তৈরি করা হয়েছে। এখানেই উল্লেখ করা যায়, টোটোদের ভাষা সহজবোধ্য নয়, তবে তাঁরা বাংলা লিপি ব্যবহার করেন। এখানে লোককথা বাংলায় লিখিত, এগুলো একান্তভাবেই মৌখিক সাহিত্য। ছাপার আসরে এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

লোককথা বা লোককাহিনী অতিপ্রাচীন জনসমাজের মৌখিক ঐতিহ্যের ধারা বহন করে, টোটোদের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। তবে লোককথা বা লোককাহিনীর সুনির্দিষ্ট একটি সংজ্ঞা ড. বরুণকুমার চক্রবর্তী, ডি.লিট্ সম্পাদিত 'বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ' থেকে উদ্ধৃত করা যাক।

'পুরুষ পরম্পরায় মুখে মুখে প্রচলিত ও গদ্যে বর্ণিত জনশ্রুতিমূলক গল্পকে লোককথা বা লোককাহিনী (Folktale) বলা হয়। ছোট হোক, বড় হোক গল্পটি হবে পূর্ণাঙ্গ।'— (ড. ওয়াকিল আহমেদ)

'লোকসংস্কৃতি ও নৃ-বিদ্যার অভিধান' ড. বরুণকুমার চক্রবর্তী সম্পাদিত, যার সহযোগী সম্পাদক ড. সুমহান বন্দ্যোপাধ্যায়। উক্ত গ্রন্থে লেখেন ড. বরুণকুমার চক্রবর্তী : 'Folk Culture-এর বাংলা অর্থ লোকসংস্কৃতি হতে বাধা নেই। আমরা কিন্তু Folk Culture বাংলায় লোককৃষ্টি করার পক্ষপাতী। এবারে এমনটা করার কারণ বলা যাক। .....কৃষ্টি হল একটি জাতি বা গোষ্ঠীর দীর্ঘদিনের অনুসৃত, পরম্পরা স্বীকৃত ঐতিহ্যাশ্রিত জীবনচর্চা। ......লোকসমাজের সার্বিক পরিচয় লাভ করা যায় যা থেকে তাই হল লোককৃষ্টি।'

লোককথার আলোচনায় সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য বিভাগ ১) রূপকথা, ২) ব্রতকথা, ৩) রোমাঞ্চকর গল্প, ৪) বীরকাহিনী, ৫) সন্ত কাহিনী, ৬) পুরাকাহিনী, ৭) লোকপুরাণ, ৮) পশুকথা/উপকথা, ৯) নীতিকথা, ১০) হাসি ও ব্যঙ্গ গল্প, ১১) ব্যাখ্যাদানকারী গল্প। এই সব বিষয়গুলি বাংলা বা অন্যান্য সমৃদ্ধ ভাষায় থাকলেও

টোটো লোককথায় সবগুলি বিষয় নেই। চিন্তার সীমাবদ্ধতা ও সংখ্যাল্পতাও প্রধান দুটি কারণ বলে ধরা যায়।

লোককথা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে চিন্তাভাবনা করছেন এবং কয়েকটি গ্রন্থরচনাও করেছেন দিব্যজোতি মজুমদার। Type-Motif Index (টাইপ-মোটিফ ইনডেক্স) প্রসঙ্গে তিনি বেশকিছু আলোচনা করেছেন। "লোকসংস্কৃতি ও নৃ-বিদ্যার অভিধান' (সম্পাদক ড. বরুণকুমার চক্রবর্তী) গ্রন্থে দিব্যজ্যোতি মজুমদার লিখেছেন :

'লোককথার অনুষঙ্গে যুগ্ম এই পদ্ধতির কথা আলোচিত হয়। এই পদ্ধতি প্রথম গড়ে ওঠে ফিনল্যাণ্ডে।'

লোককথার মেজাজ ও চারিত্র বিচার করলে দেখা যাবে যে, এক-একটি লোককথা এক-একটি টাইপ বা বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত। সরল কিংবা জটিল লোককথা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে একটি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ মেজাজ— এটাই টাইপ। আর কাহিনী অংশ বা কাহিনী অংশসমূহ যা লোককথাকে অখণ্ড সূত্রে বেঁধে রাখে তাই মোটিফ।

পদ্ধতি আলোচনায় টাইপ-মোটিফ একই সূত্রে গ্রথিত। এই দুই পদ্ধতির সূচী নির্ধারণ করে পৃথিবীর লোককথার পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করা হয়।'

দিব্যজ্যোতি মজুমদার 'বাংলা লোককথার টাইপ ও মোটিফ ইনডেক্স' ছাড়াও সম্প্রতি 'লোককথার লিখিত ঐতিহ্য' (২০০৯) বইটিতে উক্ত পদ্ধতি বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি আরব্যরজনীর কয়েকশো কাহিনীতে এক হাজারের বেশি মোটিফ খুঁজে পেয়েছেন, যা অন্য লিখিত লোককথায় বিরল। তাছাড়া লোককথা এক দেশ থেকে অন্য দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। সেখানে একটি কারণ মাইগ্রেশান অর্থাৎ কোন অজানা সূত্র ধরে বণিকের মাধ্যমে বা ভ্রমণকারীদের জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে এক দেশের লোককথার সাদৃশ্যে অন্য দেশের লোককথা গড়ে ওঠে মানুষের মুখে মুখে। আবার প্রাগৈতিহাসিক পৃথিবীতে দুটি ভিন্ন দেশের লোকসমাজে সমচিন্তা দেখা দিতে পারে। ঈশপের গল্পের সঙ্গে পঞ্চতন্ত্রের গল্পের সাদৃশ্য (দুটি প্রায় সমকালের সৃষ্টি ধরে নেন গবেষকরা) মাইগ্রেশান বা পরিযায়ী মনোভাবের ফল অথবা সমচিন্তার ফল বলে ধরা যেতে পারে। টোটোদের লোককথার মধ্যেও এই দুটি কারণ থাকতে পারে। অবশ্য তা অনুসন্ধানের বিষয়।

টাইপ-ইনডেক্স পদ্ধতিটির প্রথম আবিষ্কারক অ্যান্টি আর্নে (জন্ম ১৮৬৭)। অ্যান্টি আর্নে প্রচলিত তত্ত্বকে সুনির্দিষ্ট পরিণতি দেন স্টিথ টমসন। সম্পূর্ণ কাজ স্টিথ টমসন ছয় খণ্ডে শেষ করেন ১৯৫৮তে।

টাইপ-ইনডেক্স সম্পর্কে স্টিথ টমসন মন্তব্য করেছেন : 'A motif is the small est element in a tale having a power to persist in tradition. In order to have this power it must have. something unusual and striking about it.

লোককথায় যে অভিপ্রায়টি থাকে তার মধ্যেই একটা বিশ্বজনীনতা আছে। মোটিফ হিসেবে একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা তৈরি করেছিলেন আর্নে-টমসন। ইংরেজি বর্ণমালার ২৩টি বর্ণ নিলেন। কিন্তু বাদ 'ও-আই-ওয়াই'।

A- পৌরাণিক, B- জীবজন্তু, C- ট্যাবু বা নিষেধাজ্ঞা, D-ঐন্দ্রজালিকতা বা জাদু, E- মৃত্যুবিষয়ক, F- অসাধ্যসাধন বা বিস্ময়কর বিষয়, G- দৈত্য, H- পরীক্ষা, J- চালাক-বোকা, K- প্রতারণা, L- ভাগ্যচক্র, M- ভাগ্য বা নিয়তিকে বশে আনা, N- অদৃষ্ট বা সুযোগ, P- সমাজ, Q-পুরস্কার, R- বন্দী, S-অস্বাভাবিক নিষ্ঠুরতা, T- যৌনবিষয়ক, U- ধর্মবিষয়ক W- চারিত্রিক গুণ বা বৈশিষ্ট্য, X- হাস্যরসাত্মক, Z- বিভিন্ন— এভাবেই ২৩টি বর্ণনির্ভর মোটিফ দ্বারা বিশ্বের যাবতীয় লোককথার অভিপ্রায় সন্ধান করা যেতে পারে। টাইপ ইনডেক্স বা লোককথার মেজাজ ও চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের কথা আগেই আলোচিত হয়েছে।

১) টোটো লোককথা : সংক্ষিপ্ত রূপরেখা

পাতালপুরীতে মৌরিয়া

দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে বৃষ্টির অভাবে। বনবাসীদের জঙ্গলে খাবার নেই। চারিদিকে হাহাকার। মৌরিয়ার বাবা তার বড় ও মেজ ছেলেকে পরিস্থিতি বুঝিয়ে বলে। দুই ভাই বিদেশে রওনা হয়। তাদের সঙ্গে ছোট ছেলে মৌরিয়া, যে সৎমায়ের ছেলে সে-ও বায়না ধরে যাওয়ার জন্যে। বাপের আদরের ছেলে মৌরিয়া। আবার তার মা মারা গেছে দু'বছর বয়সে।

তিন ভাই এক মাস ধরে হেঁটে সমুদ্রের ধারে পৌঁছে যায়। মৌরিয়া দাদাদের জংলি গাছের দড়ি (ঝুরি) বেয়ে নীচে নামতে বলে। জলের গভীরে রাজপ্রাসাদের গল্প শুনেছিল মৌরিয়া বাবার কাছে।

যাইহোক, অনিচ্ছা সত্ত্বেও জংলি দড়ি বেয়ে নীচে নেমে রাজপ্রাসাদ ও পাতালপুরীর লোকজনেব আন্তরিক আতিথ্য ও প্রচুর বাজকীয় খাবারদাবার পায়। পাতালপুরীর লোকজন তাদের কাছে অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষের কথা জানতে পেরে দুই ভাইকে জলকন্যা বিয়ে করতে বলে। তাহলে তাদের দেশে অনাবৃষ্টি থাকবে না।

বড় মেজ দুইভাই দুই বৌ নিয়ে মৌরিয়াকে পাতালে ফেলে মর্ত্যে চলে যায়, দড়িটাও কেটে দেয়। মৌরিয়া পড়ে থাকে। পরে অবশ্য কুনো ব্যাঙ তাকে পিঠে করে তাকে তার দেশে পৌঁছে দেয়। কুনো ব্যাঙের শর্ত ছিল, মৌরিয়াকে একটা পুরস্কার দিতে হবে। মৌরিয়ার দেবার মতো কিছু ছিল না। তবে মৌরিয়া তাকে মর্ত্যালোকে সর্বগ্রাসী হওয়ার কথা বলেছিল পুরস্কার হিসেবে। তখন থেকে কুনো ব্যাঙ মর্ত্যালোকের বাসিন্দা।

প্রত্যেকটা লোককথার শেষে আছে— লা-পান-লেজে = টোটো ভাষায় গল্পটি

ফুরলো। এখানে অন্য পাঁচটি লোককথায় এই উক্তিটি আর ব্যবহার করার প্রয়োজন দেখি না।

(২) মানব ও মানবী সৃষ্টি

প্রাচীন টোটো লোকগল্পে সাংজা দেবতার মানব সৃষ্টির কথা আছে। মানবের নাম তনলোলু। পরে অনেক ভেবে মানবী সৃষ্টি করলেন, তার নাম নাজমা। সৃষ্টিকর্তার খেয়ালে মানবী প্রবল শক্তিশালিনী ও অহংকারী হয়ে উঠল। অবশ্য পুরুষ তনলোলুও শক্তিশালী ছিল, জন্তুজানোয়ার মেরে মাংস এনে খুশি করতো মানবী তনলোলুকে। তনলোলু অবশ্য তার স্বামীর ভুল ধরতে চাইতো, শক্তিতে তাকে হারাতে চাইতো।

এরপরে নাজমার গর্ভে ক্রমে এক পুত্র এবং কন্যার জন্ম। পুত্রের নাম হল সারানু, কন্যার নাম সেইমা। নাজমার মধ্যে মাঝেমধ্যে দানবী শক্তি জেগে উঠত, সে সন্তানদের খেয়ে ফেলতে চাইতো। স্বামী তনলোলুর ভয়ে তা করতে পারতো না। ক্রমে ভাইবোন বড় হয়ে উঠল, এদিকে তনলোলুর পরিপূর্ণ জীবনে দেবতার ডাকে সে চলে গেল অন্যলোকে।

এবার নাজমা তাদের মাংস খেতে চাইল। সারানু-সেইমা ভয়ে অস্থির! দুটি দিন সময় দিল নাজমা। ভাইবোন অনেক ভাবল— কে আগে মরবে! দুজনেই আগে মরতে চায়। সারানু সেইমাকে বলেছিল— তোমার অনেক সন্তান হবে। তোমার বাঁচা দরকার। পরে দুজনেই বুঝতে পারে— সন্তানের জন্য নারী ও পুরুষ দুজনেরই দরকার।

অনেক ভেবেচিন্তে রাতে তারা সেই বন ছেড়ে শত ক্রোশ দূরের জঙ্গলে পালিয়ে গিয়ে সংসার পাতে। তাদের অনেক সন্তান হয়। এভাবেই টোটোদের সংসার ও বংশবিস্তার শুরু হয়।

(৩) মৌরিয়া ও সারানু

দুই ভাই মৌরিয়া আর সারানু থাকতো এক গ্রামে। মৌরিয়া তার ছোট ভাইকে খুব ভালবাসতো। মৌরিয়া জঙ্গলে শিকারে গেলে তার ভাইকে নিতে চাইতো না। জঙ্গলে নানা বিপদ। সেবার নিরুপায় মৌরিয়া তার ভাইকে সঙ্গে নিয়ে গেল। সারা দিনেও কোন শিকার পেল না। আবার কারা যেন সারানুর কানে পাতা গুঁজে দিচ্ছে বারবার।

মৌরিয়ার খুব চিন্তা হলো ভাইয়ের জন্যে। শিকার না করে সে ফিরবে না। নদীর ওপর টং-এ মাচান তৈরি হল। ভাইকে মাচানে বসিয়ে ভাইয়ের সমান মাপের কলা গাছ কেটে রাখল আর ভাইকে শুইয়ে দিল। ভাইকে বলেছিল— রাতে কেউ তোমার নাম ধরে ডাকলে সাড়া দেবে না।

এদিকে জঙ্গলে রাতের রাক্ষুসী নাজমা তার অনুচর কালপেঁচাকে পাঠাল। যাও, কার মৃত্যু, তার নাক ধরে ডাকো।' সারানুর নাম ধরে কালপেঁচা ডাকতে লাগল। সারানু দাদার নিষেধ ভুলে ডাকে সাড়া দিল। রাক্ষুসী এসে সারানুর পা ধরে টানতে লাগল আর মৌরিয়া ভাইয়ের মাথা ধরে রইল। টানাটানিতে সারানুর দেহ দু'টুকরো হয়ে গেল। রাক্ষুসী দেহ নিয়ে গেল, কিন্তু মাথাটা রইল মৌরিয়ার কোলে। মৌরিয়া ভাইয়ের গালে বারবার চুমু খেল। সারানু বলে— এটাই ছিল তার ভাগ্যে।

মৌরিয়া তাকে আশীর্বাদ করে বলল— ভাই আজ থেকে তুমি হবে রাতের বাজপাখি। একথা বলামাত্র সারানুর মাথা বাজপাখি হয়ে উড়ে গেল। আজও টোটোপাড়ার জঙ্গলে সেই বাজপাশি শোঁ শোঁ শব্দে উড়ে বেড়ায়।

(৪) মৌরিয়া ও রাক্ষুসী সৎমা

মৌরিয়া আর তার বাবা সুখেই ছিল। মৌরিয়ার মা মারা যাওয়ার পরেও সংসারে অভাব ছিল না। বছর তিনেক পরে অন্যদেশের এক মহিলা এল গ্রামে। তার বাবার সংসারে প্রবল অভাব-অনটন। তাই দুঃখে সে ঘরছাড়া। সেই মেয়েটির দুঃখের কথা শুনে গ্রামবাসী তাকে আশ্রয় দিতে চাইল। শেষ পর্যন্ত মৌরিয়ার বাবার সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে গেল।

সেই ভিনদেশী মহিলা ছিল রাক্ষুসী। মৌরিয়া নতুন মায়ের কাছে স্নেহযত্ন পেল না। বছর দশেক পরে তার এক ভাই জন্মাল, তার নাম হল চিচরাং। চিচরাং যখন চার বছরের, তখন মৌরিয়ার বাবা মারা গেল।

এবার রাক্ষুসী সৎমা মানুষের ক্ষতি করার সুযোগ খুঁজতে লাগল। তবে মৌরিয়া আর চিচরাং— দুই ভাইয়ের খুব মিল। একদিন ভাইয়ের আবদারে তাকে শিকারে নিয়ে গেল মৌরিয়া। প্রবল গরমে ভাই অজ্ঞান হয়ে গেল। মৌরিয়া বহু দূরের পাহাড়ের ঢাল থেকে জল আনল নিজের পাটাং (পোটান্ অর্থাৎ দা) দিয়ে বাঁশ কেটে। ভাইকে নিয়ে ফিরে এল। তবে সৎমায়ের অত্যাচারে মৌরিয়া মনের দুঃখে বনে গেল গান গাইতে গাইতে। বনের পশুপাখি তার গান শুনে মুগ্ধ হয়ে জানায়— তার সৎ মা, আসলে রাক্ষুসী। সুযোগ পেলেই তাকে মেরে ফেলবে। তবে তার ভাই চিচরাং রাক্ষস নয়। তাকে যেন মৌরিয়া যত্নে রাখে। বনের পশুপাখিরা সৎ মাকে কী ভাবে মারা যায় সেই বুদ্ধিও দেয়।

মৌরিয়া বাড়ি ফিরে লাক্ষা দিয়ে ঘর করে সৎমাকে থাকতে দেয়। পরে আগুন দিয়ে দেয়। রাক্ষুসী সৎ মা সাপ, পাখি, মশা, মাছি ইত্যাদি রূপ ধারণ করেও বাঁচতে পারেনি। মৌরিয়া তার ভাইকে নিয়ে নিজেদের ঘরে শুয়েছিল সে রাতে। বেঁচে গেল দুই ভাই।

(৫) ভূতের দেশে মৌরিয়া

গ্রামের সুখী পরিবারে কর্তার মৃত্যুর পর দেখা দিল অভাব দারিদ্র্য। পুত্র মৌরিয়া হঠাৎ এক রাতে মৃত বাবার ডাক শুনে বাইরে এসে বাবাকে সশরীরে দেখে অবাক হয়। মৌরিয়ার কাছে তাদের দুঃখকষ্টের কথা শুনে বাবা তার ছেলে মৌরিয়া আর মাকে বহু দূরের দেশে নিয়ে যায়। সেখানে সব আছে— ঘর-জমি-জায়গা।

মৌরিয়া আর তার মা ভূতের দেশে আসে। দেশটা মাটির নীচে। একটা লতার সিঁড়ি বেয়ে নামতে হয়। টোটো ভাষায় লতার নাম 'নোকাইদি'— স্থানীয় ভাষায় 'নগিবেলি', সাপের মতো দেখতে। সেই সিঁড়ি বেয়ে তারা এসেছিল ভূতের দেশে।

যথারীতি মৌরিয়ার মা সাংসারিক কাজ করে, বাবা কাজে যায়। মৌরিয়া সঙ্গীহীন দিন কাটে না। তার কাজ ইঁদুরের দেখশোনা করা। ভূতের দেশে ইঁদুর মানে— মোরগ-মুরগী। মৌরিয়ার বাবা রোজ ইঁদুর গুণে রাখে। মৌরিয়া রেগে দু'একটা মেরে দেয়। বাবা এবং প্রতিবেশীরা তাকেই সন্দেহ করে। তাকে ভূতের দেশে রাখতে চায় না।

এদিকে মৌরিয়া ব্যাকুল হয়ে দেশে ফিরতে চায়। ভূতের দেশের নিয়মশৃঙ্খলা তার পছন্দ হয় না। অবশেষে অনেক খুঁজে সে নোকাইদি লতার সিঁড়ি খুঁজে পায়। তখন তারাতাড়ি বাড়ি ফিরে সব ইঁদুর মেরে একটা দা কোমরে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসে নিজের দেশে। তারপর দা দিয়ে নামার সিঁড়িটা কেটে দেয়। বাবা মা আর আসতে পারবে না। সেদিন থেকে মানুষের জগতের সঙ্গে ভূতের দেশের যোগাযোগ ছিন্ন হল।

লা-পান-লেজে (টোটো ভাষায় গল্পটি ফুরলো)।

(৬) বনমুরগী, বানর এবং বাঘ

বহু বছর আগে এক বনে এক বনমুরগী আর এক বানর বন্ধু হিসেবে কাছাকাছি বসবাস করতো। তারা পরস্পরকে জমির কাজে চাষে সহায়তা করতো। একদিন বনমুরগী বানরকে খাওয়ার নিমন্ত্রণ করে ডিম পেড়ে রান্না করে খাওয়াতে বানর খুব খুশি হল। বানর প্রতিদান হিসেবে বনমুরগীর জমিতে অনেক কাজ করে দিল।

এবার বানর বনমুরগীকে তার বাড়ি খাওয়ার নিমন্ত্রণ করল। বানর ভেবেছিল, সে-ও ডিম খাইয়ে অবাক করে দেবে। ফলমূলসংগ্রহ করলেও বানর ডিম খুঁজে পেল না। শেষ পর্যন্ত বনমুরগীকে ডিমের খোজ করতেই বন মুরগী বানরকে বলল— উনুনে কড়াই বসিয়ে দাও। কড়াই লাল হলে সেই কড়াইয়ে গিয়ে বসলেই ডিম বেরিয়ে আসবে।

বানর বনমুরগীর পরামর্শ মতো করতে গিয়ে পোড়ার যন্ত্রণায় অস্থির হলে

বনমুরগী তাকে জলে ঝাঁপ দিতে বলে। কিন্তু বানর সাঁতার না জানায় ক্রমে ডুবে যেতে থাকে। বনমুরগী বাঁচাতে আসে না।

সেই সময় এক বাঘ আসে শিকারের খোঁজে। ক্ষুধার্ত বাঘ তাকে বাঁচায়, জলে নেমে উদ্ধার করে, কিন্তু শর্ত ছিল সে বানরকে খাবে। বানর বলে— আমি ভিজে গেছি, শুকিয়ে নিই নিজেকে। তারপর খেয়ো আমাকে। এই বলে বানর গাছে উঠে যায়। বাঘ অপেক্ষা করে। তার অপেক্ষা বৃথায় যায়। বানর ক্রমে গাছের ওপরে উঠতে থাকে।

বানরের বুদ্ধির কাছে বাঘ হেরে যায়।

টোটোদের লোককথা পর্যালোচনা :

১) 'পাতালপুরীতে মৌরিয়া' ও লোককথাটি টাইপ হিসেবে অনেকটা রূপকথা নির্ভর। ছোট ছেলে মৌরিয়া দুর্ভিক্ষের জন্য দেশ ত্যাগ করে সমুদ্রের পাতালপুরীতে নামে জংলি দড়ি বেয়ে। এখানে ঐন্দ্রজালিকতা বা জাদুর বিষয়টি আছে (D)। দুর্ভিক্ষ দেখা দেওয়া ভাগ্য বিড়ম্বনার ব্যাপার (L)। জলকন্যাকে দুই ভাইয়ের বিয়ে করা অদৃষ্ট বা কপাল (M)। মৌরিয়াকে ফেলে যাওয়া প্রতারণার (K) মোটিফ। আবার কুনো ব্যাঙের সাহায্যে মৌরিয়ার প্রত্যাবর্তন, অর্থাৎ পলায়ন (R) অন্য একটি অভিপ্রায়। লোকপুরাণের বিষয়টিও আছে পাতালপুরীর কথায় (A)। সেই সঙ্গে আছে অলৌকিকতা (D)। কুনো ব্যাঙের উপস্থিতি (D) লক্ষণীয়।

২) 'মানব ও মানবী সৃষ্টি' লোককথার কাহিনীটিতে লোকপুরাণের বিষয়টি (A) আছে। আছে সৃষ্টিতত্ত্বের কথা। এই কাহিনীতে বাইবেল কাহিনীর আভাস দেখা যায়। নাজমার দানবী শক্তি সমাজের পক্ষে গ্রহণযোগ্য নয়। সন্তানদের মাংস খাওয়ার বাসনা আদিম জাতির নরমাংস ভক্ষণের ইঙ্গিতবহ (G)। আবার ভাইবোনের পালিয়ে যাওয়া (R) এবং দুজনের অনেক সন্তানলাভ 'কিউ' (Q) অর্থাৎ পুরস্কার পাওয়া এবং ভাগ্যকে বশে আনার (M) মোটিফ কাজ করে।

৩) 'মৌরিয়া ও সারানু' আর একটি টোটো লোককথা। এটি কিছুটা রূপকথাধর্মী। এখানে অভিপ্রায় বা মোটিফ হিসেবে ঐন্দ্রজালিকতা (D) আছে। সারানুর দু'টুকরো দেহের মাথা বাজ পাখি হয়ে উড়ে যায়। জঙ্গলের শিকার আদিম জীবনের অঙ্গ। রাক্ষুসীর দ্বারা সারানুর মুণ্ডহীন দেহ নিয়ে যাওয়া (G) ভৌতিক ব্যাপার। আবার ভাগ্যচক্রের (L) কথাও আছে মোটিফ হিসেবে। আবার সারানু নিষেধ (C) অমান্য করে বিপদে পড়ে।

৪) 'মৌরিয়া ও রাক্ষুসী সৎমা' এমন একটি লোককথা যা টোটো সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐন্দ্রজালিকতা (D) ও জাদুতে আস্থার পরিচায়ক। রাক্ষুসী মানবী রূপধারণ করে। তবে রাক্ষুসী মায়ের সন্তান মানুষই হয়, রাক্ষস নয়। বনের পশুপাখির মাধ্যমে সৎমাকে

মারার বুদ্ধিলাভ করে মৌরিয়া (B) , অর্থাৎ জীবজন্তু কথা বলে। রাক্ষুসীকে লাক্ষার ঘরে পুড়িয়ে মারা এক জাতীয় শাস্তিদানের অভিপ্রায় (Q), যা নিষ্ঠুরতার শাস্তি। জতুগৃহের পরোক্ষ প্রতিফলন এখানে লক্ষণীয়।

৫) 'ভূতের দেশে মৌরিয়া' টোটোদের লোককথার একটি সার্থক নিদর্শন। লোককাহিনীর মধ্যে টাইপ হিসেবে রূপকথা, পুরাকাহিনী এবং রোমাঞ্চকর কাহিনীধারার চরিত্র আছে, যা লোককথার বিশেষ মেজাজটিকে ফুটিয়ে তোলে। মৌরিয়ার বাবার মৃত্যু এবং আবার ফিরে আসার ব্যাপারটি মৃতের পুনর্জীবন লাভ (E) বলে মনে হবে। তবে মা ও ছেলেকে ভূতের দেশে নিয়ে যাওয়া ঐন্দ্রজালিকতা ও জাদুর (D) অভিপ্রায় বোঝায়। আবার ভূতের দেশে অভাব অনটন নেই, এটাও স্বপ্নপূরণ। তবে মৌরিয়ার জীবন অসহ্য হওয়ায় সে ইঁদুর অর্থাৎ মুরগী মেরে পালিয়ে আসে। বন্দীত্ব থেকে মুক্তিলাভ (R) মৌরিয়া ভূতের দেশে সুখী ছিল না। নোকাইদি লতার সিঁড়ি অর্থাৎ গাছের লতা বা ঝুরির সিঁড়ি বহু প্রাচীনকালে টোটোদের মাটি থেকে অনেক উঁচু ঘরে ওঠার বিষয়টি লোককথায় অবচেতনভাবে কাজ করে। এই কাহিনীতে অনেকগুলি মোটিফ বা অভিপ্রায় কাজ করে একসঙ্গে।

৬) 'বনমুরগী, বানর এবং বাঘ' শীর্ষক টোটো লোককথাটি টাইপ হিসেবে পশুকথা যেখানে তিনটি ভিন্ন জাতের প্রাণী কথা বলে মানুষের মতো। মোটিফ বা অভিপ্রায় সর্বজনীন। এমন গল্প পৃথিবীর নানা দেশেই সন্ধান পাওয়া যায়। ভূগোল, রাজনীতি বা ধর্মের সীমানা ছাড়িয়ে জীবজন্তু নির্ভর লোককথা বিশেষ (B) অর্থাৎ মানুষের ভূমিকায় থাকে জীবজন্তু। বানরকে ডিম খাওয়ায় বনমুরগী, কিন্তু বানর তাকে ডিম খাওয়াতে চাইলে মুরগী তার সঙ্গে প্রতারণা (K) করে। বানর যন্ত্রণায় জলে ঝাঁপ দেয় মুরগীর কু-পরামর্শে। তবে বাঘ বানরকে বাঁচায়। আবার বানর বুদ্ধির কৌশলে চালাকি করে বাঘকে বোকা বানিয়ে গাছে উঠে যায় (G)। পৃথিবীর বহু দেশের লোককথায় পশুপাখি, জীবজন্তুতে মানবিকতা আরোপ করে লোককথা রচনা করা হয়! টোটোদের মধ্যেও এই জাতীয় লোককথা রয়েছে। টোটোদের মধ্যেও এই জাতীয় প্রবণতা দেখা যাওয়া স্বাভাবিক। দীর্ঘকাল ধরেই বনজঙ্গল ও জীবজন্তুদের সঙ্গে টোটোদের সম্পর্ক। একটা সময়ে শিকার ছিল তাদের জীবনযাপনের অঙ্গ।

কয়েকশো বছর ধরে একটি অতি ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী আধুনিক সভ্যতার স্পর্শ থেকে বেশ কিছুটা দূরত্বে একটি ছোট গ্রামে তাদের নিজস্ব সীমার মধ্যে বসবাস করছে। উন্নত সভ্যতার প্রবাহ থেকে দূরে থাকাটাই ছিল ওদের একান্ত লক্ষ্য। তবে ১৯০১ খ্রিষ্টাব্দে মাত্র ১৭১ জনের জনসমষ্টি এই একুশ শতকে মাত্র ১৩৫০ এর কিছু কম বেশি! এখন অবশ্য বিশ্বায়ন এবং বাজার অর্থনীতির প্রভাবে টোটো সমাজে পরিবর্তন দেখা দিচ্ছে। তবু এইসব পরিস্থিতির মধ্যেও ওদের লোককথাগুলি আমাদের দেশের অন্যান্য জাতি-জনজাতির লোককথার তুলনায় আদৌ উপেক্ষার বিষয় নয়। তবে এই জাতীয়

লুপ্তপ্রায় মৌখিত সাহিত্যকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এগুলির সংরক্ষণ জরুরী। লোকসংস্কৃতির অন্তর্গত এই লোককথাগুলি এখন টোটো লোক সমাজের সামগ্রিক সৃষ্টি হলেও একদা এইগুলি ব্যক্তিবিশেষের চিন্তাভাবনার প্রভাবেই সম্ভবত রচিত। শেষ পর্যন্ত অন্যান্য স্তরের লোকসাহিত্যের মতো এগুলো হয়ে উঠেছে সংহত টোটো সমাজেরই নিজস্ব সৃষ্টি। নৃ-তাত্ত্বিক দিক গিয়ে টোটো জনজাতি আমাদের পশ্চিমবঙ্গের একটা অহঙ্কার। তাদের লুপ্তপ্রায় লোকসংস্কৃতি এবং বিশেষভাবে এই লোককথাগুলিও আধুনিক মুদ্রণ ব্যবস্থার সহায়তায় সংরক্ষণ করা জরুরি বিষয় বলে মনে করি। জীবন ও জীবিকার পরিবর্তনের অমোঘ নিয়মে সাংস্কৃতিক অভিযোজনের (Cultural adoptation) ভেতর দিয়ে টোটো সমাজও এগিয়ে যাচ্ছে তাতে সন্দেহ নেই। লুপ্তপ্রায় সংস্কৃতিকে হয়ত আবার গতিশীল করা যায় না, কিন্তু তাকে সংরক্ষণ করা যায় একটি জনজাতির বিরল সৃষ্টি হিসেবে।

টোটোদের নিয়ে সাধারণভাবে সরকারি এবং বেসরকারি ক্ষেত্রে নানা গবেষণা ও সমীক্ষায় বিপুল উৎসাহ ও উদ্যম থাকলেও তাদের সমাজব্যবস্থার প্রকৃত উন্নয়ন প্রয়াস এখন পর্যন্ত তেমনভাবে নজরে পড়ে না।

এখানে যে ছ'টি লোককথার সংক্ষিপ্ত রূপরেখা দেওয়া হয়েছে, সেগুলি সংগ্রহ করেছেন ক্ষেত্রসমীক্ষক প্রমোদনাথ, তাঁর ক্ষেত্রবন্ধু টোটো সমাজেরই একজন গবেষক ধনীরাম টোটো। তাঁদের দুজনকেই আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

ওরাওঁ জনজাতি ও তাদের লোককথা

মাসুদ শামস্ আল্‌দীন সুমন

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের জেলাসমূহকে উত্তরবঙ্গ নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। অবিভক্ত বঙ্গে এর পরিধি ছিল অধিকতর বিস্তৃত এলাকা নিয়ে। তৎকালীন রাজশাহী বিভাগ এবং কুচবিহার রাজ্য ছিল উত্তরবঙ্গের অন্তর্গত। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের মালদহ, পশ্চিম-দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, কুচবিহার এবং দার্জিলিং জেলা ভারতে উত্তরবঙ্গ নামে পরিচিত।

নৃতাত্ত্বিকদের মতে নিষাদ, শবর, পুলিন্দ প্রভৃতি জাতি ছিল উত্তরবঙ্গের আদিম বাসিন্দা। ইতিহাসে এরাই অনার্য নামে পরিচিত। অনার্য অধ্যুষিত এই উত্তরবঙ্গেই সর্বপ্রথম আর্যদের আগমন ঘটে। আর্যদেরও অনেক পূর্বে আসে অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, মঙ্গোলীয় এবং আলপানীয় জনগোষ্ঠীর মানুষ। অষ্টম শতাব্দী থেকে শুরু হয় সেমিটিকদের আগমন। ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে মুসলিম শাসকদের ছত্রছায়ায় এই ধারা ক্রমবর্ধিত হতে থাকে।

পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে ধর্ম প্রচারক, পরিব্রাজক এবং বণিক বেশে আগমন শুরু হয় খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী ইউরোপীয়দের। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বেই পদ্মা-তিস্তা-করতোয়া-ব্রহ্মপুত্র-যমুনা বিধৌত উত্তরবঙ্গের বাণিজ্য প্রধান এলাকায় আনাগোনা ঘটে পর্তুগীজ, ইংরেজ, দিনেমার, ফরাসী এবং আর্মেনীয়দের। এইভাবে এতদঞ্চলের মানুষের সঙ্গে নানা জাতি-উপজাতি, ধর্ম-বর্ণের মানুষের মিশ্রণ ঘটে। উত্তরবঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ধর্মের দিক থেকে মুসলমান। অতঃপর স্থান হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের। আদিবাসীদের মধ্যে সাঁওতালদের স্থান শীর্ষে। অতঃপর স্থান ওরাওঁদের। এছাড়া রয়েছে মাহাতো, মাহালী, মুণ্ডারী, পাহাড়িয়া, পাহান, শিং, রাজোয়াড় লহাড়, তুবি মুরারী, কোর প্রভৃতি জনগোষ্ঠী। ওরাওঁদের নিবাস প্রধানত উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোর মধ্যেই সীমিত।

ওরাওঁদের নিবাস গড়ে উঠেছে মূলত দলবদ্ধ ভাবে। কর্মব্যপদেশে সাময়িক কোথাও অবস্থান করলেও তারা অচিরেই প্রত্যাবর্তন করেছে মূল জনগোষ্ঠীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ওরাওঁরা বাংলাদেশের ভূমিজ সন্তান নয়। গবেষকদের ধারণা, এদের আদিবাস ছিল উড়িষ্যা, ছোটনাগপুর ও রাজমহল অঞ্চলের পার্বত্য এলাকায়। কখন এরা বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে প্রবেশ করে, তা নিয়ে নৃতাত্ত্বিকদের মধ্য মতান্তর রয়েছে। অনেকেরই ধারণা তারা মুঘল আমলে মুসলমান

কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। সেই সময় কিছুসংখ্যক ওরাওঁ উত্তরবঙ্গেও প্রবেশ করে স্থানীয়ভাবে নিবাস গড়ে তোলে। ওরাওঁদের উত্তরবঙ্গে আগমনের আরও একটি কারণ অনুমান করা যেতে পারে। কারণটি হলো, এতদঞ্চলের জমিদারদের প্রলোভন। ইতিহাস থেকে জানা যায়, সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে উত্তরবঙ্গের অধিকাংশ এলাকা ছিল জঙ্গলাকীর্ণ। এছাড়া জনসংখ্যার তুলনায় অনাবাদী জমি ছিল প্রচুর। অনাবাদী জমি আবাদ করা এবং জঙ্গল পরিষ্কার করে নতুন আবাদী জমি তৈরি করার জন্য তাই এক শ্রেণীর জমিদার অন্যান্য এলাকা থেকে রাজস্ব মওকুফের লোভ দেখিয়ে বহু কৃষক প্রজাকে এতদঞ্চলে নিয়ে আসেন।

নৃতত্ত্ববিদদের ধারণা ওরাওঁরা প্রাক-দ্রাবিড়ীয় গোষ্ঠীর লোক। এদের দৈহিক গঠন তার যথার্থ প্রমাণ। সাধারণ ওরাওঁদের গায়ের রং কালো, নাক চ্যাপটা, ঠোঁট মোটা, মাথার খুলি গোলাকৃতি, চুল প্রায় কোঁকড়ানো, দেহের উচ্চতা মাঝারি ধরনের। তবে একথাও অনস্বীকার্য যে, উত্তরবঙ্গের হিন্দু সম্প্রদায়ের নমঃশূদ্র, জেলে, মালী, হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল, আর মুসলিম সম্প্রদায়ের কৃষকদের সঙ্গে তাদের চেহারার তেমন কোনো পার্থক্য নেই।

কোনো কোনো নৃতাত্ত্বিক সাঁওতাল, মালপাহাড়ীয়া ও ওরাওঁদের আদি-অস্ট্রেলীয় জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করেন। তাঁদের মতে এই শ্রেণীর মানবগোষ্ঠী অস্ট্রেলিয়া থেকে এক সময় পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল। উত্তরবঙ্গের ওরাওঁ জনগোষ্ঠী আজ আর অবিমিশ্র নেই। কারণ তাদের অনেকের চেহারাই অতি সুন্দর, গায়ের রং ফর্সা, গঠনের দিক থেকেও লম্বাকৃতির। এ থেকে বর্তমান ওরাওঁদের জাতিসত্তা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে নতুন করে নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে।

ওরাওঁরা 'কুড়ুখ' ভাষায় কথা বলে থাকে। ভাষাতাত্ত্বিক সূত্রে এটি দ্রাবিড় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া কথোপকথনে তারা আরো একটি ভাষার ব্যবহার করে থাকে, যাকে বলা হয় 'শাদরী'। প্রথমটি আদি ও অবিমিশ্র; দ্বিতীয়টি কুড়ুখ, ওড়িয়া, উর্দু, হিন্দী, ফারসী ও বাংলা ভাষা মিশ্রিত। ওরাওঁদের সঙ্গে অন্য অঞ্চলের ওরাঁওদের কথোপকথনে কোনো সমস্যা হয় না। এমনকি বৈবাহিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও কোনো বিঘ্ন ঘটে না।

ওরাওঁ সমাজ নানা গোত্রে বা টোটেমে বিভক্ত। উত্তরবঙ্গের ওরাওঁদের মধ্যে রয়েছে প্রায় ২০টির মতো গোত্র পরিচয়। যথা— বেক, বাকলা, বাড়া বা বাড়োয়া, এক্কা, কেরকেটা, কুজুর, ক্ষেস, খালকো, খাঁখাঁ, কিস্‌পট্টা,, লাকড়া বা লিগুয়া, মিনজী, পান্না, তিগগ্যা, টপ্য, তিরকী, কিণ্ডো বা বিণ্ডো, ওর্মা প্রভৃতি। প্রতিটি গোত্রের নামকরণ হয়েছে পশু, পাখি, মাছ, গ্লাছপালা অথবা কোনো বস্তুর নামানুসারে।

ওরাওঁ সমাজে গোত্র বিভাগ আছে, কিন্তু শ্রেষ্ঠত্বের গৌরব নিয়ে পরস্পরের মধ্যে তেমন কোনো কলহ নেই। তবে বিবাহাদির ক্ষেত্রে পরিচয় অত্যাবশ্যক হয়ে দেখা

দেয়। কারণ সগোত্রের মধ্যে কখনো বিবাহ হয় না। রক্ত সম্পর্কিত ব্যক্তিদের মধ্যে তো নয়ই।

খাদ্যঃ আরণ্য পরিবেশে পরিবর্ধিত জনজীবনে খাদ্যাভাব কখনো তীব্রতর ছিল না। ভাত ওরাওঁদের প্রধান খাদ্য। বনের পশু, বনের বিচিত্র প্রকারের ফল-মূল, আর খাল-বিল-পুকুর-নদীর নানা প্রকারের মাছ ওরাওঁদের প্রিয় খাদ্য হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে চিরদিন। তারা আদিতে ছিল মাংসাহারী। এখনো তাদের খাদ্য তালিকায় মাংসের স্থান শীর্ষে। গৃহপালিত পশু, যথা- গরু, মোষ, ছাগল, ভেড়া, শূকর, হাঁস-মুরগী, বন্য প্রাণী- খরগোস, গুঁইসাপ, বেজি, নেউল, সজারু, কাঠবিড়াল; জলজ প্রাণী-কচ্ছপ, কুচে, বাইম, কাঁকড়া, ঝিনুক, শামুক এবং প্রাণী জগতের মধ্যে কাক ছাড়া প্রায় সবরকম পাখির মাংস তারা ভক্ষণ করে। তবে কোনো কোনো অঞ্চলের হিন্দু মনোভাবাপন্ন ওরাওঁ সমাজ গোমাংস ভক্ষণ করে না।

তারা পশু পালন করে; দুগ্ধজাত দ্রব্য সেবন-ভক্ষণেও অভ্যস্ত সকলে। ঘি তারা প্রস্তুত করা জানে না এবং খেতেও চায় না। তবে ছানা, মাখন, দুধ, দধি সেবনে তাদের রসনা তৃপ্ত হয়। চিঁড়া, মুড়ি, খই, তারা নিজেরাই প্রস্তুত করে এবং সবাই খায়। চিঁড়া, মুড়ির সঙ্গে গুড় মিশ্রিত করে মোয়া, মুড়কি, তাদের রমণীরা তৈরি করতে সিদ্ধ হস্ত।

বিচিত্র প্রকারের পিঠা-পুলি তৈরির ক্ষেত্রেও ওরাওঁ রমণীরা অতি দক্ষ। পাকানো পিঠা, সাজি পিঠা, পুলি পিঠা, ভাজা পিঠা, তেলের পিঠা, চিতা পিঠা, তাল পিঠা, পাটি সাপটাসহ আরো বিচিত্র প্রকারের পিঠা তৈরিতে তারা অভিজ্ঞ। পৌষ সংক্রান্তি এবং ভাদ্র মাসের তেরো তারিখে শুধু পিঠা তৈরি ও খাওয়ার জন্যেই বিশেষ অনুষ্ঠান পালন করা হয়ে থাকে। কোর্মা, পোলাও, বিরিয়ানি তারা গৃহে প্রস্তুত করে না; তবে এ সমস্ত উপাদেয় খাদ্য খেতে সমাজের অনেকেই আজ অভ্যস্ত। খিচুড়ি ওরাওঁদের খাদ্য তালিকায় সর্বদাই উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে। আর কর্মজীবী নারী-পুরুষদের গ্রীষ্মকালীন খাদ্য হিসেবে পান্তা ভাত চিরদিন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

নেশাজাতীয় খাদ্য ঃ আদিবাসী সমাজের অতিথি আপ্যায়নে, বিশেষ বিশেষ উৎসব-অনুষ্ঠানের খাদ্য তালিকায় প্রথম গুরুত্ব পায় পচানী বা হাড়িয়া। এগুলো তারা নিজেরাই প্রস্তুত করে। আর্থিক সামর্থ অনুসারে কেউ কেউ বিদেশী মদও পান করে থাকে। এছাড়া নেশা জাতীয় দ্রব্যের তালিকায় রয়েছে গাঁজা, ভাঙ, তাড়ি, হুক্কা, বিড়ি, সিগারেট, চুরুট প্রভৃতি। সাধারণত পুরুষ সমাজই শেষোক্ত শ্রেণীর নেশা দ্রব্য সেবনে অভ্যস্ত।

পোশাক ঃ পরিবর্তনশীল সমাজ জীবনের পরিবর্তনের তরঙ্গ ওরাওঁ সমাজ-মানসকেও স্পর্শ করেছে। উত্তরবঙ্গের ওরাওঁ জনগোষ্ঠীর পোশাক-পরিচ্ছদে এ পরিবর্তন শুধু লক্ষণীয় নয়-যুগান্তকারী। কিছুদিন পূর্বেও পুরুষেরা পরিধান করতো নেংটি আর রমণীরা পরিধান করতো ফতা নামক দুখণ্ড বস্ত্র। এক খণ্ড বস্ত্র পরতো

নিম্নাঙ্গে, যা হাঁটুর নিচ পর্যন্ত ঢেকে থাকতো, আরেক খণ্ড পরতো উর্ধাঙ্গে। সাধারণত বক্ষদেশ আবৃত করে স্কন্ধ পেরিয়ে তা পৃষ্ঠ বরাবর ঝুলে থাকতো। বর্তমানে নেংটি কিংবা ফতা চোখে পড়ে না। অতি দরিদ্র এবং বয়োবৃদ্ধ দু'একজন পুরুষকে নেংটি পরতে দেখা যায়। তবে দু'খণ্ড ক্ষুদ্র বস্ত্রে আবৃত কোনো ওরাওঁ রমণী উত্তরবঙ্গে আর চোখে পড়ে না।

পুরুষেরা কেউ কেউ এখনো ধুতি পরে। অধিকাংশ পুরুষ পরিধান করে লুঙ্গি। হিন্দু-মুসলিম সমাজের পুরুষদের পোশাকের অনুরূপ ওরাওঁ সমাজের পুরুষেরাও জামা পাঞ্জাবি পরিধান করে থাকে।

অলঙ্কার ঃ ওরাওঁ রমণীরা সাধারণত সৌন্দর্যপ্রিয়। তারা যে কোনো উৎসব-অনুষ্ঠানে যোগদানের উদ্দেশ্যে নিজেদের সৌন্দর্যমণ্ডিত করতে ভালবাসে। অলঙ্কার নারীর সৌন্দর্য-বৃদ্ধি করার অন্যতম উপাদান। বাঙালি সমাজের বিত্তবান ঘরের রমণীরা পদনখ থেকে শুরু করে মস্তকের কেশাগ্রভাগ পর্যন্ত অলঙ্কার সজ্জিত করে। আদিবাসী ওরাওঁ সমাজ সাধারণত গরীব। ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও স্বর্ণালঙ্কার পরিধানের সৌভাগ্য খুব কম রমণীর ভাগ্যেই ঘটে থাকে। অধিকাংশ মেয়েই পরিধান করে রৌপ্যালঙ্কার। তারা নাকে পরে নাক-ফুল (কারমা শিকড়ি); পায়ে পায়ড়া, পদনখে মুদদী, চুলের খোঁপায় রূপোর কাঁটা (খংশ) প্রভৃতি অলঙ্কার। উৎসব-অনুষ্ঠানে পুষ্পাভরণে সজ্জিত হয় অনেকেই। এছাড়া কপালে টিপ, ওষ্ঠে লিপষ্টিক পরে কেউ কেউ। চোখে কাজল এবং সুরমা ব্যবহারের রীতি ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। চুলের খোঁপা বন্ধনের জন্য রঙিন ফিতার প্রচলন হয়েছে অনেক পূর্ব থেকেই। দেহকে সুবাসিত করার জন্য কারখানায় প্রস্তুত সাবানের সঙ্গে মহুয়ার তেল ব্যবহারে অভ্যস্ত কেউ কেউ।

গৃহ ও গৃহস্থালী দ্রব্যাদি ঃ আদিবাসী ওরাওঁ সমাজের নিজস্ব পরিচয় লক্ষ্য করা যায় তাদের ঘর গৃহস্থালীর স্বাতন্ত্র্যে। উত্তরবঙ্গের প্রায় প্রতিটি ওরাওঁ পরিবারের গৃহের ছাউনি শন ও খড়ের, দেওয়াল মাটির। টিনের ঘর ও পাকা বাড়ি নির্মাণের দৃষ্টান্ত অতি বিরল। ঘরগুলো হয় চাবচালা বিশিষ্ট। দোচালা ঘর নেই বললেই চলে। চারচালা ঘরের চারপাশে থাকে বারান্দা। বাইরে থেকে মনে হবে আট চালার ঘর।

সৌখিন পরিবারের লোকেরা তাদের মাটির ঘরগুলোকে মাঝে দেয়াল দিয়ে অধিক কক্ষ বিশিষ্ট করে থাকে।

শিক্ষিত পরিবারে চেয়ার-টেবিলের ব্যবহার দেখা যায়। সাধারণ পরিবারে টুল এবং পিঁড়ির ব্যবহার রয়েছে। তাদের থালা-বাসন প্রায় সবই কাঁসার অথবা এ্যালুমিনিয়ামের। মাটির থালা বাসনের ব্যবহার এখন আর নেই বললেই চলে। মসলা তৈরির জন্য শীলপাটার ব্যবহার দেখা যায় অনেক পরিবারেই। তবে ওরাওঁ পরিবারের গৃহের অভ্যন্তরে কোথাও সিকার ব্যবহার চোখে পড়ে না। সম্ভবত তারা সিকা তৈরি

করা জানে না।

দৈনন্দিন জীবনে ধান-চাউল এবং শস্যাদি পরিষ্কারের জন্য ও সেগুলো স্থানান্তরের জন্য বাঁশের তৈরি টুকরি, ঝাঁটা, ডালা, কুলো, চালুন, ঝাঁকা সব পরিবারেই দেখা যায়। উত্তরবঙ্গের হিন্দু-মুসলিম কৃষক পরিবারের মতো ওরাওঁ সমাজের চাষের উপকরণ লাঙ্গল, জোয়াল, ফাল, কোদাল, মই প্রায় অভিন্ন প্রকারের।

একদা শিকার ছিল তাদের জীবন-জীবিকার প্রধান অবলম্বন। এখন উত্তরবঙ্গে বনাঞ্চল আর নেই বললেই চলে। তবুও প্রতিটি পরিবারের রয়েছে শিকারের জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্রাদি। তীর-ধনুক ও টৌকা প্রায় ওরাওঁ পরিবারেই সযত্নে রক্ষা হয়ে থাকে। নৃত্য-গীত-পাগল ওরাওঁ সমাজের অনেক পরিবারেই দেখা যায় বাদ্য-বাজনার প্রয়োজনীয় উপকরণাদির রক্ষণাবেক্ষণ। তাদের বাদ্য-যন্ত্রগুলো নিজেদের হাতে তৈরি, বৈচিত্র্যও কম। তবুও নৃত্য-গীতে ব্যবহৃত হয় ঢোল, মাদল, বাঁশী, তাল, নাগারা, খঞ্জনী, ঘুঙুর। অতি সম্প্রতি স্থান বিশেষে হারমোনিয়ামের ব্যবহারও শুরু হয়েছে।

প্রকৃতির উদ্দাম কোলে পরিবর্ধিত ওরাওঁ সমাজের শিশু-কিশোররা দৈনন্দিন জীবনে নানা প্রকার খেলার মধ্য দিয়ে সময় অতিবাহিত করে। এখনও ওরাওঁ সমাজে দাড়িয়াবান্দা, বৌচি, দাগন, হাডুডু, আমকো-জামকো শ্রেণীর শিশু ক্রীড়ার প্রচলন রয়েছে।

ওরাওঁ সমাজের মানুষ সহজ-সরল, সৎ ও কর্মনিষ্ঠ। নৃত্য-গীত-উৎসবপ্রিয় এই জনগোষ্ঠী অবসর-অবকাশে সৃষ্টি করে কল্পকথা, লোককথা, ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ প্রবচনের মতো বিচিত্র রসধারা। সাহিত্যের এই মৌখিক ধারার নামই লোকসাহিত্য। উত্তরবঙ্গের ওরাওঁ লোকসমাজ আধুনিক সাহিত্য-ভাণ্ডারের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেনি। কিন্তু লোকসাহিত্যের বিচিত্র সম্ভারে বিশ্বসাহিত্যের সমান্তরালে অবস্থানের গৌরব অর্জন করেছে। এ সাফল্য শুধু অতুলনীয় নয়-অভাবনীয়।

এবারে আমরা কয়েকটি ওরাওঁ লোককথার উল্লেখ করব। প্রথম গল্পটির নাম 'বোন খেকো ভাই।'

ক. বোন খেকো ভাই

এক গাঁয়ে ছিল এক বুড়ো। তার সাতটি ছেলে আর একটি মাত্র মেয়ে। মেয়েটি সকলের ছোট। ভায়েরা বোনকে খুব ভালবাসত। একদিন বুড়ো মারা গেল। ভায়েদের বোনের প্রতি ভালবাসা আরও বেড়ে গেল। ভায়েরা বড় হল। একে একে সবাই বিয়ে করল। বিয়ের পর থেকেই পরিস্থিতিটা পাল্টে গেল। ভায়েদের বউয়ের কেউই ছোট বোনটাকে সহ্য করতে পারত না। স্বামীদের কাছে তার নামে নানা অভিযোগ করত। শুধু ছোট ভাই বোনকে আগের মতই ভালবাসত।

একদিন বড় ভাইয়েরা ঠিক করল দূরে শিকার করতে যাবে। আরও ঠিক করল

সঙ্গে বোনকে নেবে। ছোটভাইও সঙ্গে গেল। অনেক দুরে যাওয়ার পর একটা গাছের নীচে পৌঁছে বড় ভাই বোনকে বললে সেখানে বড় ভালুকের ভয়। তাই সে যেন প্রাণ বাঁচাতে গাছে চড়ে বসে। বোন বড় ভাইয়ের কথা মত গাছে চড়ে বসল।

এরপর বড় ভাই প্রস্তাব দিল তারা সকলেই গাছে চড়ে বসা বোনকে তীর মারবে। যে তীর বিদ্ধ করবে সেই বিবেচিত হবে ওস্তাদ বলে। ছোটভাই এ প্রস্তাবে রাজি হল না। কিন্তু অন্য দাদাদের চাপে সেও শেষ পর্যন্ত বোনকে তীরবিদ্ধ করার প্রস্তাবে রাজি হল। কী আশ্চর্য আর কোন ভাই বোনকে তীরবিদ্ধ করতে পারল না, ছোট ভাইয়ের তীরেই বোনের মৃত্যু হল। তার দেহ গাছ থেকে মাটিতে পড়ল।

বড় ভাই এরপর প্রস্তাব করল মৃত বোনের দেহের মাংস তারা খাবে। ছোট ভাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও বোনের দেহের মাংস কেটে রান্না করল। সকলে খেতে বসল। ছোট ভাই নদী থেকে হাত মুখ ধুয়ে আসার নাম করে সরে পড়ল। নদীতে কিছু মাছ, কাঁকড়া ধরল। সেগুলি রেঁধে নিয়েএসে দাদাদের সঙ্গে খেতে বসল। কারণ ছোটভাই দাদাদের অগোচরে বোনের গায়ের চামড়া, হাড়, নাড়িভুঁড়ি সব মাটির নীচে পুঁতে দিল। সেই জায়গায় একটা বাকলা বাঁশ চারাও পুঁতে দিল। বাঁশটি বাড়তে থাকল।

এক ভিখারির নজরে পড়ল বাঁশটি। সে সেটিকে কেটে তার থেকে একটা বাঁশি তৈরি করল। সেই বাঁশি বাজিয়ে সে ভিক্ষা করতে লাগল। বড় ভায়ের বাড়িতে এসে ভিখারি বাঁশি বাজালে তা থেকে করুণ সুর বেরিয়ে এল। কিন্তু ছোট ভায়ের বাড়ি ভিখারি সেই বাঁশি বাজালেও করুণ সুর শোনা গেল না। বড় ভাই অবাক হয়ে এর কারণ জানতে চাইল ছোট ভাইয়ের কাছে। ছোট ভাই জানাল, সে বোনের মাংস খায়নি। শুধু তাই নয়, সে তার দেহের হাড়, চামড়া নাড়িভুঁড়ি পুঁতে রাখার কথাও জানাল, জানাল সেই জায়গায় মাকাল বাঁশের চারা পোঁতার কথাও। ভিখারি সেই মাকাল বাঁশ থেকেই বাঁশিটা তৈরি করেছে তা থেকেই বাজছে করুণ সুর। হতভাগিনী বোনের জীবনের করুণ কথা।

(বিশ্বাসঘাতক ভাইয়েরা কে ২২১১; সঙ্কেত সংখ্যা : সাত ভাই এক বোন জেড ৭১.৫.১)

খ. বুদ্ধিমান শেয়ালের দৌলতে সওদাগরের রেহাই

এক সওদাগর চলেছে বাণিজ্যে। পথে তার সঙ্গে এক শেয়ালের দেখা। জানতে চাইল সে, সওদাগর চলেছে কোথায়। সওদাগর জানাল। সওদাগর হন হন করে চলেছে। শেয়াল ক্ষুব্ধ হয়ে বললে তাকে সেলাম না করে সওদাগর চলতে শুরু করল। সেলাম জানালে সওদাগরেরই ভাল হত। যাইহোক, মনে মনে শেয়াল ভাবল, দেখি ভবিষ্যতে আমার কাছে আসতে হয় কিনা।

সওদাগর অনেক পথ পেরলো। সন্ধ্যা হয় হয়। তার একটা আশ্রয়ের দরকার।

একটা গ্রামে এক গৃহস্থের কাছে গিয়ে সে আশ্রয় প্রার্থনা করল। গৃহস্থ জানাল তাদের অতিরিক্ত কোন ঘর নেই যেখানে সওদাগরকে রাখতে পারে। তবে বাড়ির সামনে তাদের গাছটি রয়েছে ইচ্ছা করলে তার তলায় সে শুতে পারে। সওদাগর অগত্যা গাছে তার ঘোড়াটি বেঁধে ঘুমতে লাগল।

সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখলে ঘোড়ার একটা বাচ্চা হয়েছে। ঘোড়াটা ছিল মাদী এবং গর্ভিণী। সওদাগর মহা খুশী। বুঝল, রাতেই ঘোড়াটার বাচ্চা হয়েছে। এদিকে গৃহস্থের ঘোড়ার বাচ্চাটা দেখে লোভ হল। সে দাবী করল বাচ্চাটা তার। সওদাগর বলল তাদের ত কোনো ঘোড়া নেই, তাহলে বাচ্চাটা এল কোথা থেকে। গৃহস্থ বললে গাছটি বাচ্চা পেড়েছে।

গ্রামের লোকজন এল। তারা বলল সওদাগর যদি প্রমাণ দিতে পারে বাচ্চাটা তার তাহলে সেই সেটা পাবে। সওদাগর ছুটল শেয়ালের কাছে। শেয়ালত প্রথমে রাজি হচ্ছিল না, অনেক কষ্টে তাকে সওদাগর রাজি করাল। সওদাগর ফিরে এল। অনেক পরে হাজির হল শেয়াল। সকলে জানতে চাইল শেয়ালের দেরীর কারণ। শেয়াল জানাল পথে আসতে আসতে একাটা বিচিত্র জিনিষ তার চোখে পড়েছে। একটা পুকুরের জলে আগুন লেগেছে। বহু লোক চেষ্টা করেও আগুন নেভাতে পারছে না।

সকলে অবিশ্বাস করল শেয়ালের কথা। শেষে সকলে পুকুরের কাছে গেল কী ব্যাপার দেখতে। দেখল, কুয়াশার কারণে জল থেকে ধোঁয়ার মত উঠছে দেখা যাচ্ছে। তারা বলল শেয়ালের হয়েছেটা কী? জলে কখনও আগুন লাগে? শেয়াল বললে কেন লাগবে না, গাছ যদি ঘোড়ার বাচ্চার জন্ম দেয়, তাহলে পুকুরের জলেও আগুন লাগতে পারে। সকলে বুঝলে সওদাগরই ঘোড়ার বাচ্চার মালিক। ঘোড়া ও তার বাচ্চা নিয়ে সওদাগর রওনা দিল।

(বুদ্ধিমান শেযাল বি.১২০.২; কথা বলা পশু বি ২১০)

গ. রাজকন্যা জয়ী হল

এক ছিল বুড়ি। সে থাকত জঙ্গলে। তার কাজ ছিল জঙ্গলে ফল মূল খোঁজা। এসব খেয়েই তার দিন কাটত। একদিন জঙ্গলে সে কিছু শাক পেল। একটা হাঁড়িতে সেগুলি রেখে দিল। ঠিক করল পরদিন খাবে। পরদিন হাঁড়ির ঢাকা খুলে দেখে হাঁড়িতে শাক নেই, পরিবর্তে একটা ফুটফুটে ছেলে বসে রয়েছে। বুড়ি খুব খুশী। ছোট ছেলেটাকে সে আদর যত্নে মানুষ করে তুলতে লাগল। ক্রমে ছেলে বড় হয়ে উঠল। বুড়ি আগে একটা ছিল, এখন ছেলেকে নিয়ে তারা দুজন। তাই তাদের খাই-খরচ বেড়ে গেছিল। বুড়ি তাই জঙ্গল থেকে ফুল তুলে এনে মালা গেঁথে রাজকন্যার কাছে বিক্রি করত।

একদিন ছেলেটা বলল সে মালা গাঁথবে। কেননা তার গাঁথা মালায় রাজকন্যা বেশি খুশী হবে, বুড়ি বেশি টাকা পাবে। ছেলের গাঁথা মালা নিয়ে বুড়ি হাজির হল রাজবাড়ি।

রাজকন্যা মালা দেখে ভারী খুশী। জানতে চাইল মালাটা গেঁথেছে কে? বুড়ি মিথ্যা করে বলল, সেই গেঁথেছে। রাজকন্যার বিশ্বাস হল না। সে তার পোষা কাককে বুড়ির পেছনে লাগাল তার কথা সত্যি কিনা যাচাই করতে। কাক এসে রাজকন্যাকে খবর দিল সুন্দর একটি ছেলে আছে বুড়ির ঘরে, মালা তারই গাঁথা। কাকের মুখে ছেলেটির সৌন্দর্যের কথা শুনে রাজকন্যা তার জন্যে পাগল হয়ে উঠল, সে তাকেই বিয়ে করবে। রাজার কানে খবর গেল। তিনি জানালেন এ বিয়ে তিনি হতে দেবেন না। অগত্যা রাজকন্যা তার ঘরে খিল দিল। খাওয়া বন্ধ করল সে। নিরুপায় রাজা শেষে রাজি হলেন বিয়ে দিতে।

বুড়িকে রাজা ডেকে পাঠলেন। বিয়ের কথা বলতেই বুড়ি এককথায় খারিজ করল। সে কি কবে হয়। রাজকন্যার সঙ্গে তার মত গরীবের ঘরের ছেলের বিয়ে! রাজা তখন প্রস্তাব দিলেন, বুড়ির ঘরের ছেলের ওজনের সমান টাকা বুড়িকে দেবেন। অগত্যা বুড়ি রাজি হল। বিয়ে হয়ে গেল বুড়ির মানুষ করা ছেলের সঙ্গে রাজকন্যার।

একদিন রাজা শিকারে বের হলেন। সঙ্গে নিলেন জামাইকে। পশুর সন্ধানে নানা জায়গায় ঘোরাঘুরি করতে করতে সকলে তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়ল। কিন্তু কোথাও জল মিলল না। যে জলাশয়েই তারা যায় গিয়ে দেখে তা জলশূন্য। শেষে একটা বিরাট সরোবরের সামনে গিয়ে সেটিরও জলশূন্য অবস্থা দেখে রাজা জামাইকে বললেন, জলাশয়ে গিয়ে অনুসন্ধান করতে কেন জল মিলছে না। জামাই জলাশয়ে নামা মাত্র জল উঠতে শুরু করল। সে উঠে আসার আগেই জলে ভরে গেল জলাশয়। রাজা তার উদ্ধারের কোনো চেষ্টা না করেই ফিরে এলেন।

রাজকন্যা সবাইয়ের কাছে জানতে চাইল তার স্বামীর কথা। কেউ কিছুই বলে না। শেষে সে তার বড়ভাইয়ের কাছে সব জানতে পারল। ছুটল রাজকন্যা স্বামীকে উদ্ধার করার জন্য। একটা সুন্দরী মেয়ে মাটির কলসী নিয়ে জল ভরতে এসে কলসীটা ইচ্ছা করে ভেঙে ফেলল। মেয়েটি রাক্ষসের বাড়ি কাজ করত। রাক্ষস তাকে মুক্তি দেয় না, রাক্ষস তাকে বিয়ে দেয় না। তাই তার রাগ রাক্ষসের ওপরে। সে কারণেই কলসী ভাঙা। রাক্ষস যখন জানল যে মেয়েটি জল আনতে পারেনি, কলসী ভেঙ্গে ফেলেছে, তখন সে তাকে পেতলের কলসী দিল। মেয়েটি সেটিও ভেঙ্গে ফেলল। তখন রাক্ষস তাকে একটা চামড়ার থলি দিল। মেয়েটি সেটিও ছিঁড়ে ফেলল। তার রকম সকম দেখে গাছে চড়া মেয়েটা হেসে ফেলল। হাসির শব্দে পকুর পাড়ে থাকা মেয়েটির দৃষ্টি গেল গাছের দিকে। গাছ থেকে মেয়েটিকে নেমে আসতে বলল সে। তাকে সঙ্গে নিয়ে রাক্ষসের বাড়ি গেল এবং তার সঙ্গিনী পেয়েছে বলে জানাল। রাক্ষস মেয়েটির পরিচয় জানতে চাইল। সে বলল, রাজার মেয়ে সে, পুকুরে তার ভাই হারিয়ে গেছে তাই তাকে খুঁজতে এসেছে।

রাক্ষস জানতে চাইল, যে হারিয়েছে সে মেয়েটির ভাই না স্বামী? মেয়েটি আবারও

জানাল তার ভাই। রাক্ষস তখন তাকে পরীক্ষা করবে বলল। বলল, সে জাউ রান্না করবে। সেই জাউ ঢালবে কলাপাতায়। যদি কলাপাতা না পোড়ে তাহলে প্রমাণিত হবে মেয়েটির ভাই হারিয়েছে, আর যদি কলাপাতা পোড়ে তবে মেয়েটির বক্তব্য মিথ্যা বলে প্রমাণিত হবে।

রাক্ষস রাঁধতে বলল। দুই মেয়ে গেল কলাপাতার সন্ধানে। জঙ্গলে ঢুকে দুজনে গন্ধে এত বিভোর হয়ে পড়ল যে রাক্ষসের জাউ রান্নার কথা তাদের আর মনেই রইল না। অনেক পরে যখন মনে পড়ল তখন দুজনে কলাপাতা নিয়ে ছুটে চলল রাক্ষসপুরী। ততক্ষণে জাউ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। তাই কলাপাতায় তা ঢাললে কলাপাতা পুড়ল না মোটেই। রাজকন্যা সত্যবাদী বলেই প্রমাণিত হল। খুশী হয়ে রাক্ষস রাজকন্যাকে তার স্বামীকে ফেরৎ দিল।

(রাক্ষসের দ্বারা অপহরণ আর ১১; নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর সন্ধানে এইচ ১৩৮৫.৪; টাইপ : ৪২৫ নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর খোঁজে)।

ঘ. বোকা কুমীরের গল্প

এক নদীর ধারে ছিল একটি জাম গাছ। সেই গাছে থাকত একটা বানর। সে গাছে বসে বসে পাকা জাম খেত আর কিছু কিছু জাম মাটিতে ফেলে দিত। নদীতে ছিল একটা কুমীর। সে সেই জাম খেত। দুজনে ভারী ভাব।

কুমীর ভাবল বানরের দেওয়া জাম যখন এত মিষ্টি, না জানি তার কলজেটা তাহলে কত মিষ্টি। একদিন কুমীর বানরকে তার বাড়ি নিমন্ত্রণ জানাল। বানর বলল, আমি ত সাঁতার জানি না। কুমীর বলল, ভাবনা কী? আমার পিঠে করে তোমায় বাড়ি নিয়ে যাব। বানর চড়ে বসল কুমীরের পিঠেতে। কুমীরের উদ্দেশ্য তার অজানা। মাঝ নদী বরাবর গিয়ে কুমীর বলল, বল তো কেন তোমাকে বাড়ি নিযে যাচ্ছি? বানর বলল, আমাকে নেমন্তন্ন খাওয়াবার জন্য। কুমীর বলল, দূর বোকা, তোর মিঠে কলজে খাবার সাধ তাই নিয়ে যাচ্ছি। চালাক বানর কুমীরের উদ্দেশ্য বুঝতে পারল। বলল এই কথা তো আগে থেকে বলবে।

কুমীর জানতে চাইল কেন? বানর বলল, আমার কলজেটা ত জাম গাছে রেখে এসেছি। তাহলে চল ফিরে গিয়ে নিয়ে আসি। কুমীর ফিরে চলল। নদীর ধারে জাম গাছের কাছে পৌছলে বানর এক লাফে ডাঙ্গায় উঠে পড়ল, তারপরে বলল, বোকা, কলজে আবার গাছে থাকে নাকি?

(বুদ্ধিমান পশু বি ১২০; উপকারী বানর বি ৪৪১.১;)

সহায়ক-গ্রন্থ

১। আবদুস সাত্তার : আরণ্য জনপদে।

২। গৌতম ভদ্র : মুঘল যুগে কৃষি অর্থনীতি ও কৃষক বিদ্রোহ, কলিকাতা— ১৯৮৩

৩। অরুণ খালকো : ওরাওঁদের আদি ইতিহাস, বলদীপুকার, রংপুর—১৯৮৫

৪। মুহম্মদ আবদুল জলিল . বাংলাদেশের সাঁওতাল : সমাজ ও সংস্কৃতি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা— ১৯৯১

৫। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, প্রথম খণ্ড, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ কলিকাতা, ৪র্থ সংস্করণ।

৬। নীহাররঞ্জন রায়: বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা— ১৯৯৩

৭। মোহিতলাল মজুমদার : বাঙলা ও বাঙালী, কমলা বুক ডিপো, কলিকাতা—১৩৫৮

৮। রমেশচন্দ্র মজুমদার : বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পঞ্চম সংস্করণ, জেনারেল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ কলিকাতা—১৩৭৭

৯। ড. মুহম্মদ আবদুল জলিল : উত্তরবঙ্গের আদিবাসী, লোকজীবন ও লোকসাহিত্য, ওরাওঁ। বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা দ্বিতীয় মুদ্রণ, মে, ২০০১।

ত্রিপুরার আদিবাসী লোককথা

স্বপন শর্মা

লোককথা বা লোককাহিনি আদি মানুষের সংস্কৃতির তথা লৌকিক ঐতিহ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। এর মধ্যে বিধৃত থাকে সংশ্লিষ্ট জাতির জীবন-সংগ্রাম, সামাজিক রীতি-নীতি, বিশ্বাস ও সংস্কার এবং সর্বোপরি তাদের গোষ্ঠীগত সমাজমননের প্রতিচ্ছবি। ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত ক্ষুদ্র রাজ্য ত্রিপুরার আদিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত লোককথাগুলিও তাদের জীবন ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পরিচায়ক। ত্রিপুরায় ছোট বড় মোট উনিশটি আদিবাসী সম্প্রদায় আছে। তাদের প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে অসংখ্য লোককথা প্রচলিত রয়েছে। এই সব লোককথা পল্লি অঞ্চলে কিংবা পাহাড়ি জনপদে মুখে মুখে প্রচলিত হয়ে নিরক্ষর সমাজের মানুষের রসপিপাসা চরিতার্থ করে আসছে। সম্প্রতি আদিবাসী সমাজে প্রচলিত এই মৌখিক ধারার সংগ্রহ ও তার মুদ্রিত রূপদানে অনেকেই প্রয়াসী হয়েছেন। সরকারি, বেসরকারি কিংবা ব্যক্তিগত ভাবেও এই উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায়। যে সমস্ত সহৃদয় লোকসংস্কৃতিপ্রেমী এই সংগ্রহ, সংকলন ও প্রকাশের কাজে হাত বাড়িয়েছেন তাঁদের অগ্রগণ্য হলেন নিরঞ্জন চাকমা, রঘুনাথ সরকার, প্রভাংশু ত্রিপুরা, শ্রীশান্তিময় চক্রবর্তী, D. K. Tyagi প্রমুখ। এছাড়াও উল্লেখ করতে হয় ডঃ অরুন্ধতী রায়, রবীন্দ্রকিশোর দেববর্মা, ক্রাইরী মগচৌধুরী, সমর চক্রবর্তী, সুনীল দেববর্মা, কৃষ্ণাদাস, ডঃ রবীন্দ্রকুমার দত্ত, ডঃ রমেন্দ্রনারায়ণ সেন প্রমুখের নাম।

অন্যান্য দেশ বা জাতির লোককথার মত ত্রিপুরার আদিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত লোককথাগুলিরও একটা প্রধান বিশেষত্ব এর বিশ্বজনীন রূপ যার উপর ভিত্তি করে সহজেই এগুলিকে টাইপ ও মোটিফ ইনডেক্স এর তালিকাভুক্ত করা যায়। এর সার্বজনীনতা-ই বিশ্বের সকল প্রান্তের সকল অংশের মানুষকে একসূত্রে আবদ্ধ করবে। বিশ্বজনীন আবেদনের অস্তিত্ব ছাড়াও প্রতিটি জাতির লোককথা তার সংশ্লিষ্ট জাতির লৌকিক ঐতিহ্য ও তার আঞ্চলিক বৈশিষ্টকে তুলে ধরে। ত্রিপুরার আদিবাসী লোককথা সমূহও অনুরূপ বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ।

বিশ্বের ও দেশের লোকসাহিত্যের গবেষকগণ বিষয়, অর্থ ও রূপ অনুযায়ী লোককাহিনির নানা শ্রেণীকরণ করেছেন— রূপকথা, অলৌকিক কথা, নীতিকথা, ভূতপ্রেতের কথা, দৈবকথা, নিষ্ঠুরতার কথা, নির্বুদ্ধিতার কথা, চতুরতার কথা, লোভীর কথা, ভাই-ভগিনীর কথা, বন্ধুদের কথা, বীবকাহিনি, হাস্য-ব্যঙ্গের গল্প, বিবিধ কথা প্রভৃতি। ত্রিপুরার আদিবাসীদের মধ্যেও প্রায় সব শ্রেণির লোককথা রয়েছে। এসমস্ত

লোককথাকে বিশ্লেষণ করলে ত্রিপুরার আদিবাসী জনজাতির বৈচিত্র্যময় জীবন ও সংস্কৃতির সামগ্রিক দিক পরিস্ফুট হয়।

ত্রিপুরা ক্ষুদ্র পাহাড়ী রাজ্য। আদিবাসীরাও এই পাহাড়ি অঞ্চলের বাসিন্দা। পাহাড় বন জঙ্গল বন্য পশুপাখিকে কেন্দ্র করেই তাদের জীবন যাত্রা আবর্তিত। ফলে লোককথাগুলির আর্থ সামাজিক পঠভূমিও সহজেই অনুমেয়। বন্য পশুপক্ষীকে কেন্দ্র করে আদিবাসী সমাজে বহু লোককথার উদ্ভব ঘটেছে। পশুপক্ষীরা মানবভাষায় কথা বলে উঠেছে। এ লোককথাগুলি লোকসমাজের চিত্তবিনোদন করে। আবার সকলের মধ্যে চেতনা বৃদ্ধিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। এ প্রসঙ্গে ত্রিপুরার প্রধান আদিবাসী সম্প্রদায় 'ত্রিপুরী'দের মধ্যে প্রচলিত **'ঠাট্টা তামাসার ফল'** লোককথাটি উল্লেখনীয়। এর অভিপ্রায় কৌতুকরস। অনাবিল হাস্যরসের প্রবাহ-ই এতে বর্তমান।

এই ঠাট্টা তামাসার গল্পে তামাসা করে এক চিংড়ি মাছ এক জুমিয়ার পাছায় কামড় দেয়। এতে ভয়ে ও রাগে দিশেহারা হয়ে জুমিয়া নদী তীরবর্তী এক বাঁশকে কোপ দিয়ে কেটে ফেলে। বাঁশটির তীক্ষ্ণ আগা গিয়ে লাগে এক কাঠবিড়ালের গায়ে। যন্ত্রণায় ইতস্তত ছুটতে ছুটতে সে গাছের এক বড় ফলে কামড় দেয। ফল গিয়ে পড়ে হরিণের উপর। আতঙ্কিত হরিণ দৌড় দিলে হরিণের পায়ের আঘাতে পিঁপড়ের বাসা যায় ভেঙ্গে। ক্রুদ্ধ পিঁপড়ে বাদুড়কে কামড দেয়। ভীত বাদুড় গিয়ে ঢোকে হাতিরকানে। অসহ্য ব্যথায় হাতি এক পাথরে মারে লাথি। পাথর গড়াতে গড়াতে এক বিধবার কুঁড়েঘরে ধাক্কা মারে। ভয়ে সন্ত্রস্ত বিধবা নদীর উজানে গিয়ে পায়খানা করে ফেলে। জল হয় দূষিত। পাড়ার লোকজন বিধবার বিরুদ্ধে গাঁও বুড়আর কাছে নালিশ দায়ের করে। বিচারে শেষপর্যন্ত চিংড়ি মাছ দোষী সাব্যস্ত হল। ঠিক হল অপরাধী বিধবার পায়খানা ধুয়ে মুছে দেবে। এটিই চিংড়ির 'ঠাট্টা তামাসার ফল'— এ শুধু তামাসা-ই। এর লক্ষ্য কাউকে আঘাত দেওয়া নয়। শুধু আনন্দ দানের জন্যই এর সৃষ্টি। সবশেষে পায়খানা ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করার মধ্য দিয়ে পরিবেশকে দূষণ মুক্ত রাখাব যে মানসিকতা দেখা যায় তাও প্রশংসনীয়। ঠিক একইরকম লোককথা প্রচলিত আছে মগদের মধ্যেও। গল্পের নাম **'ব্যাঙের শহর দর্শন'**। উদ্দেশ্য সেই হাস্যরস পরিবেশন-ই। এ লোককথায় দেখা যায় তীর্থভ্রমণে যাওয়ার আগে বাড়ীর বুড়ো বুড়ীরা জ্যোতিষীর পঞ্জিকা দেখে যাত্রার শুভ দিন ঠিক করে। এই তীর্থভ্রমণের ফলেই কুনো ব্যাঙের শহর দর্শনের সৌভাগ্য লাভ হয়। ব্যাঙ শহর দর্শন থেকে ফিরে এসে টুনটুনির কাছে মহাপ্রলয়ের গুজব ছড়ায়। ফলে টুনটুনি, হাড়গিলা, বানর, হরিণী, অজগর সাপ, বনমুরগী. পিঁপড়ে, শূকর প্রত্যেকে অতিষ্ঠ হয়ে তুমুল পরিবেশ সৃষ্টি করে। সমাজপতিকে কেন্দ্র করে গাঁও পঞ্চায়েতের বৈঠক বসে। সমাজপতি বুঝতে পারে, যত নষ্টের গোড়া হল ঐ কুনো ব্যাঙের গুজব ছড়ানো। শাস্তির বিধান ঠিক হয়। অপরাধীর শরীরে লবণ ও লঙ্কা মাখিয়ে কাঁঠাল গাছে বেঁধে রাখা হবে। বিধান অনুযায়ী ব্যবস্থা হয়। জ্বালা পোড়ায় ব্যাঙ কাঁঠাল গাছে গা ঘসলে কাঁঠাল গাছের আঠা বেরিয়ে

ব্যাঙের শরীর চাকা চাকা হয়ে যায়। তাই আজও কুনো ব্যাঙের শরীর এমন। এ ঘটনার আগে কুনো ব্যাঙের শরীর মসৃণ ছিল। আসলে এটি লোক পুরাণের দৃষ্টান্ত, উদ্দেশ্য ব্যাঙের শরীরে চাকা চাকা দাগ থাকার কারণ নির্দেশ।

উপরিউক্ত দুটি লোককথাতেই অপরাধীর যথাযোগ্য শাস্তি দেওয়া হয়েছে। বিচারে গ্রামপঞ্চায়েত এবং সমাজপতির ভূমিকা থেকে আমরা আদিবাসী সমাজ ব্যবস্থায় গ্রামপঞ্চায়েত ও সমাজপতির গুরুত্ব অনুভব করতে পারি। লোককথাগুলিতে একানকার ভূ-প্রকৃতির স্পষ্ট চিত্রও পরিস্ফুট। এর জীববৈচিত্র্যও মনোমুগ্ধকর। কাঠবিড়াল, হরিণ-হরিণী, হাতি, বানর, শূকর, পিঁপড়ে, বাদুড়, বনমুরগী, টুনটুনি, হাড় গিলা, চিংড়ি, কুনো ব্যাঙ, অজগর সাপ প্রভৃতি পশুপক্ষী জলজপ্রাণীর উল্লেখে পাহাড়ি ত্রিপুরার বন্যপ্রাণীর সামগ্রিক পরিচয় চিত্রিত। তাছাড়া তীর্থভ্রমণে যাওয়ার আগে পঞ্জিকা দেখে শুভদিন ঠিক করা— আদিবাসী লোকবিশ্বাসের পরিচায়ক।

ত্রিপুরার আদিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত বহু লোককথায় সাপের দেখা পাওয়া যায়। সাপকে কেন্দ্র করে ত্রিপুরীদের মধ্যে প্রচলিত উল্লেখযোগ্য লোককথা '**গুণবতী কন্যা**'। এর মধ্য দিয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছে তাদের বিশ্বাস, সংস্কার, অর্থনীতি, পারিবারিক দ্বন্দ্ব, জীবন সংগ্রাম প্রভৃতি। আলোচ্য লোককথায় এক বিপত্নীক ও এক বিধবার বিবাহ ঘটে। উভয়েরই আগের সংসারের একটি করে কন্যা আছে। বিয়ের পরেই বিপত্নীকের সৎসুন্দরী মেয়ের উপর শুরু হয় সৎমায়ের অত্যাচার। অল্প তুলো বিক্রি করে বিপত্নীকের গুণবতী কন্যাকে পিঁয়াজ, রসুন, শুটকী, লবণ, সরিষা ও কেরোসিন তেল, কিনে আনতে বলা হয়। সঙ্কটে পড়ে গুণবতী কন্যা। মনে মনে ত্রিপুরী সুন্দরী মাকে ডাকে এবং ভাবে একাজে যদি কোন পুরুষ এগিয়ে আসে তবে তাকে সে স্বামীত্বে বরণ করবে। ক্রমেই এক যুবকের আগমন, আলাপ ও সাহায্যদান। সাপ সেজে বিপত্নীকের কন্যার বাড়িতে গমন। কন্যার প্রতি মা-বাবার ভালবাসার পরীক্ষা করার জন্য রাত্রে সাপ সেজে মেয়ের সঙ্গে শয়ন। মেয়ের চিৎকার শুনেও মা-বাবার মেয়ের প্রতি অবজ্ঞা ও অবহেলা। তারপর যুবকের সঙ্গে গুণবতীর বিবাহ ঘটে। ঈর্ষা পরায়ণ সৎ মা এবার জঙ্গল থেকে এক ঘুমন্ত পানক সাপকে এনে নিজ কন্যার সঙ্গে ঘুমোতে দেয়। এবার সত্যি সত্যি সাপ মেয়েকে খেয়ে চলে যায়। এই খবর শুনে পাড়ার সমবেত লোকজন সাপকে মারতে উদ্যত হলে গুণবতীর স্বামী সাপকে মারতে বারণ করে। তারপর সাপের পেট চিরে মেয়েকে বের করে দেয়। কিন্তু ততক্ষণে মেয়েটি মারা যায়। শেষে গুণবতীর স্বামী সাপের পেটসেলাই করে ছেড়ে দেয় আর মহাদেবের নামে জলপড়া দিয়ে মেয়েকে বাঁচিয়ে তোলে। এ হল মূল ঘটনা। এ ঘটনায় সৎমাতার নিষ্ঠুরতার প্রকাশ ঘটেছে। পাশাপাশি পিঁয়াজ, রসুন, লবণ, সরিষা ও কেরোসিন তেল, চিতার রাব প্রভৃতি দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর সাথে আদিবাসীদের প্রিয় খাদ্য শুঁটকীর সঙ্গে আমরা এখানে পরিচিত হই। মনের বিশেষ কামনা পূরণ হওয়ার জন্য ত্রিপুরী সুন্দরী মায়ের প্রার্থনার মধ্য দিয়ে হিন্দু ধর্মের প্রতি আদিবাসীদের আস্থার

মনোভাব প্রকাশিত হয়। এর সঙ্গে জলপড়া, তেলপড়া প্রভৃতি সামাজিক বিশ্বাসগুলিও এখানে রূপায়িত।

আদিবাসী ত্রিপুরীদের মধ্যে প্রচলিত আর একটি উল্লেখযোগ্য লোককাহিনি **'ছাতিম গাছ'**। বক্তব্য বিষয় নিষিদ্ধ প্রেম। স্নানের সময় নির্বস্ত্র বোনকে দেখে ভাইয়ের মনে জেগে ওঠে আদিম প্রবৃত্তি। সে বোনকে বিয়ে করতে চায়। ক্ষোভে ও দুঃখে বোন আত্মহত্যার জন্য ছাতিম গাছের উপরে ওঠে। সবাই নিষেধ করলে সে ভাইয়ের বলি চায়। অবশেষে তাই করা হল। নিহত ভাই রক্তচোষা কাঁকলাসে রূপান্তরিত হল। বোনকে ধরার জন্য গাছে চড়তে লাগল। বোনের কাতর আবেদনে দয়ালু গাছ দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হল। বোন গাছের সাহায্যে স্বর্গে ওঠে গেল। আর যাবার সময় গাছের মাথা ভেঙ্গে দিল। সেই থেকে ছাতিম গাছের মাথা ভাঙ্গা। ভাই তাই মানুষ দেখলে রাগে লাল হয়ে যায়। এদিকে স্বর্গ বাসিনী বোন মহাশূন্যে ঘুরে বেড়ায়। আকাশের বিদ্যুৎ চমক আর কিছুই নয়, যুবতীরই কাপড় বদলানোর দৃশ্য। আর ঠিক তখনই কামোন্মাদ যুবক তীর ছুঁড়ে মারে। আর মেঘ গর্জন হল আসলে সেই শরাহতা যুবতীর করুণ আর্তনাদ এবং বৃষ্টি হল তার অশ্রু। স্পষ্টতই এ-লোককথায় মানুষের আদিম প্রবৃত্তির জাগরণ ও তার পরিণতির চিত্র রূপায়িত। পাশাপাশি সৃষ্টির বহু রহস্যও এখানে উদ্‌ঘাটিত। ছাতিম গাছের মাথা ভাঙ্গার রহস্য, বিদ্যুৎ চমক, মেঘগর্জন এবং বৃষ্টির সৃষ্টি বিষয়ক বিশ্বাসে এ-লোককাহিনি উজ্জ্বল। ত্রিপুরার অন্যান্য আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যেও সৃষ্টি বিষয়ক লোক কাহিনি প্রচলিত আছে। যেমন **'সাদা কাক কালো হল কেন?'** (চাকমা), **'পাখির চিকিৎসক কোকিল'** (মগ) প্রভৃতি বহু সৃষ্টির রহস্য উদঘাটন বিষয়ক কাহিনিতে ত্রিপুরার লোককথা সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে।

প্রত্যেক জাতির মধ্যে বীর চরিত্রকে কেন্দ্র করে বহু কাহিনি প্রচলিত আছে। ত্রিপুরার আদিবাসী লোককথাতেও বীরচরিত্রের কৃতকার্যের প্রতি সম্মান দেখানো হয়েছে; তাদেরকে পুরস্কৃত করা হয়েছে। ত্রিপুরীদের মধ্যে প্রচলিত এরকমই একটি লোককথা **'দিগ্বিজয়ী বীর'**। পাঁচ বীরপুরুষ বন্ধুর কথা আছে এখানে। আছে তাদের বীরত্ব ও সহানুভূতির কথা। কিভাবে বিচুকা নামে বীরপুরুষ তার বীরত্বের কথা ঘোষণা করে চার বীর বন্ধু জোগাড় করল তার কথা। ক্রমে তাদের বীরত্ব গ্রামে গ্রামে প্রচারিত হল। গ্রামবাসীদের অনুরোধে তারা একে একে ভালুক, বাঘ, হাতির হাত থেকে তিনটি গ্রামকে পর পর রক্ষা করল। বিপন্মুক্ত এলাকাবাসী কৃতজ্ঞতা ও আনন্দের প্রকাশ হিসাবে এক বিরাট ভোজের আয়োজন করল। মাছ, মাংস, মদ খাওয়া হল প্রচুর। নাচ গান হল। পাঁচজন সুন্দরী যুবতীর সঙ্গে পাঁচ বন্ধুর বিয়ে হল। দিগ্বিজয়ী বিচুকার পরামর্শে পাঁচ বন্ধু সস্ত্রীক সানন্দে যে যার বাড়ি ফিরে সুখে ঘর সংসার করতে লাগল। এই কাহিনি থেকে আমরা অনুমান করতে পারি বীর চরিত্রের প্রতি আদিবাসী সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধা সুলভ মনোভাবকে। লক্ষণীয় আনন্দ-অনুষ্ঠানের ভোজনে মাছ মাংসের পাশাপাশি মদ্য সেবন এবং নাচ গান পরিবেশন। বীরদের সুন্দরী যুবতী দিয়ে

বরণ করার রীতি আমাদেরকে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির কথা মনে করিয়ে দেয়।

বীর চরিত্র ও সৎ কার্যের প্রতি যেমন সম্মান দেখানো হয় তেমনি দুশ্চরিত্র ও দুষ্কর্মের প্রতি উপযুক্ত শাস্তির বিধানও প্রচলিত আছে ত্রিপুরার আদিবাসী সমাজে। রিয়াং সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত **'পাঁচ বন্ধুর গল্প'** নামক লোককথাটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখনীয়। গরীব জুম চাষীর বীর, বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ পুত্র সুলং জাব্রীহা পিতামাতা হারিয়ে পাঁচ বলশালী যুবকের সঙ্গে সখ্যতা স্থাপন করে। তারা এক রাক্ষসীর নজরে আসে। রাক্ষসী তাদের ভক্ষণ করার জন্য ফাঁদ পাতে। ব্যর্থ হয়। ক্রমে এক সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে সুলং জাব্রীহার বিবাহ সম্পন্ন হয়। সবার মুখে মুখে ছড়ায় এই মনোমোহিনীর সংবাদ। সেখানকার কামাতুর রাজা ওই সুন্দরীকে আকাঙ্ক্ষা করে। তাকে লাভ করার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করে। প্রতিহিংসা পরায়ণ রাক্ষসী পাহাড়ী যুবতীর ছদ্মবেশে সখ্যতা স্থাপন করে সুলং জাব্রীহার স্ত্রীর সঙ্গে। জেনে নেয় সুলং জাব্রীহার হত্যা-রহস্য। বন্ধুদের প্রচেষ্টায় তার পুনর্জীবন লাভ ঘটে। ক্রমে সুলং জাব্রীহা রাক্ষসী ও কামাতুর রাজাকে বধ করে। প্রজাদের অনুরোধে দেশের শাসন কার্যের দায়িত্ব নেয়। বলাবাহুল্য এ গল্প রূপকথাকেন্দ্রিক গল্প। তবে প্রচলিত বাংলার রূপকথায় নায়ক রাক্ষস বা রাক্ষসীর হত্যার রহস্য জেনে তাকে বধ করে। আর এখানে রাক্ষসী নায়কের হত্যার রহস্য জেনেছে। কিন্তু প্রাচ্য ঐতিহ্য অনুসারেই গল্পের মিলনাত্মক পরিণতি ঘটেছে। ধর্মের জয় অধর্মের পরাজয় হয়েছে।

বাংলার লোককথায় শৃগাল-কাক চতুর প্রাণী, কুমীর-বাঘ বোকা, বক ও মেষ নিরীহ প্রকৃতির জীব। ত্রিপুরার আদিবাসী লোককথায়ও প্রায় অনুরূপ বিশ্বাস প্রচলিত। উদাহরণস্বরূপ চাকমাদের মধ্যে প্রচলিত দুটি লোককথার উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথমটি **'শিয়ালনীর উপস্থিত বুদ্ধি'**। শিয়াল আহারের সন্ধানে চলে গেলে সদ্য প্রসবিনী শিয়ালনী তার উপস্থিত বুদ্ধির জোরে কিভাবে নিজ সন্তানদের এবং নিজেকে ডোরাকাটা বাঘের হাত থেকে রক্ষা করে—তারই কাহিনি নিয়ে রচিত এ লোককথাটি। দূরে বাঘকে দেখেও শিয়ালনী না দেখার ভান করে আপন মনে বিড় বিড় করতে থাকে— "সন্তান বিয়োবার পর আমার এমনই ক্ষিদে পেয়েছে যে, এখন সামনে যাকে পাই তাকে খাই। আর নিকম্মার ঢেঁকি শিয়ালটার কথা তো বলে লাভ নেই। তাকে কখন যে পাঠালাম আস্ত একটা জ্যান্ত বাঘ ধরে আনবে বলে, তারও দেখা নেই। আহা! এই মুহূর্তে যদি একটি জ্যান্ত বাঘের কলজে খেতে পেতাম; তাহলে কতোই না মজা হতো।" শিয়ালনীর এই কথা শোনামাত্রই বাঘের পিলে গেল চম্‌কে। বাঘ দৌড়ে পালিয়ে গেল। অনুরূপ একটি চাকমা লোককথা **'বাঘ ও শামুকের দৌড় প্রতিযোগিতা'**, যে দৌড় প্রতিযোগিতায় বুদ্ধির জোরেই শামুক বাঘকে বোকা বানিয়ে পরাজিত করে। দুটি লোককথাতেই শক্তি ও বুদ্ধির লড়াইয়ে বুদ্ধির জয় হয়েছে। ত্রিপুরার আদিবাসীরা ঘন বন জঙ্গলে বসবাস করে। সেখানে প্রায়শই হিংস্র বন্যপ্রাণীদের সঙ্গে মোকাবিলা করে বেঁচে থাকতে হয়। এ মোকাবিলায় শুধু শক্তি নয়,

প্রয়োজন উপস্থিত বুদ্ধিরও। হিংস্র বাঘের ভয়কে দূরে সরিয়ে নিজেদের সমাজের মানুষের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলার লক্ষ্যে লোক কথাগুলির প্রচলন হয়ে থাকতে পারে।

লোককথা এক অর্থে লোকশিক্ষা। এর মধ্যে নিহিত থাকে নীতি শিক্ষার প্রচুর উপাদান। ত্রিপুরার আদবাসী লোককথাও এর ব্যতিক্রম নয়। নৈতিক শিক্ষাদান ত্রিপুরার আদিবাসীদের লোককথার এক প্রধান বৈশিষ্ট্য। দৃষ্টান্ত হিসাবে মগদের মধ্যে প্রচলিত **'সাদা টিয়া পাখির দেশ'** লোককথাটি বিশ্লেষণ সাপেক্ষ। 'লোভে পাপ পাপে মৃত্যু'— এই নীতিকথাটিই এতে ব্যক্ত। মংগ্রী নামে এক গরীব দুঃখী চাষী ও তার ছেলে স্বপ্ন দেখে জুমচাষকরে ধনী হওয়ার। ঘটনাক্রমে এক টিয়াপাখির উপদেশমত বহু কষ্টে ছেলেটি সাদা টিয়া পাখির দেশে পৌঁছায়। তাকে সেখানে সোনা, রূপা ও মাটির নির্মিত তিনটি থালায় খাবার দেওয়া হয়। কিন্তু নির্লোভ ছেলেটির সহিষ্ণুতা ও নির্লোভপনা দেখে টিয়া পাখির দলনেতা ছেলেটিকে এক ঘড়া সোনার মোহর উপহার দেয়। তাদের দুঃখ দারিদ্র্যের অবসান ঘটে। এই মোহর লাভের বৃত্তান্ত জানতে পেরে তাদের এক প্রতিবেশি লোভের বশে সাদা টিয়া পাখির দেশের সন্ধানে তাদের ছেলেকে পাঠিয়ে দেয়। ফলে তাদের ক্ষেত্রে টিয়া পাখির দেওয়া কলসীর ভেতর থেকে মোহর নয়, বেরিয়ে আসে এক বিশাল সাপ। তিনজনেই সেই সাপের দ্বারা আক্রান্ত হয়। লোভে পাপ পাপে মৃত্যু হয়। এটাই এ গল্পের নীতি শিক্ষা।

আসা যাক, অভিশাপ-অভিশপ্ত জীবন-জন্মান্তরবাদ প্রসঙ্গে। যে প্রসঙ্গ নিয়ে রচিত কাহিনিতে বাংলার লোককথা সমৃদ্ধ। আদিবাসী সমাজও একই বিশ্বাসের অনুসারী। তাদের সমাজে প্রচলিত বহু লোককথা তার প্রামাণ্য দলিল। এ দলিলে 'The Horn Bill' নামক লোককাহিনিটি উপস্থাপনযোগ্য। কচক ন'খ নামে এক অলস জুমিয়া এবং তার সুন্দরী ও কর্মঠ স্ত্রী সম্পারির জীবনকথা নিয়ে রচিত হয়েছে এই লোককথা। অলস প্রকৃতির কচক সারাদিন বাঁশি বাজিয়ে সময় কাটায় আর সম্পারি জুমে কাজ করে সংসার চালায়। কিছুদিন পর তাদের একটি সন্তান হয়। সম্পারি সন্তানের দেখাশোনার দায়িত্ব স্বামীকে দিয়ে জুম ক্ষেতে চলে যায়। কিন্তু স্বামীর গাফিলতিতে তাদের সন্তানকে এক ভাল্লুকে নিয়ে যায়। শোকে ও রাগে সম্পারি স্বামীকে অভিশাপ দেয়। সে আগামী জন্মে পাখি হয়ে জন্মাবে এবং শিশু পাখি বড় না হওয়া পর্যন্ত সে স্ত্রী ও শিশুপাখির জন্য খাদ্য আনবে। সেই থেকে স্ত্রী হর্নবিল ডিম পাড়ে ও ডিমে তা দেয় এবং যতদিন পর্যন্ত তার বাচ্চারা উড়ার উপযোগী না হয় পুরুষ হর্নবিল একাই তাদের জন্য খাদ্য সংগ্রহ করে। বিস্তারিত বিশ্লেষণে না গিয়ে বলা যায়, এ কাহিনি এ বিশ্বাস প্রাচ্য সংস্কৃতি থেকে এতটুকু বিচ্ছিন্ন নয়।

সার্বিক বিবেচনায় ত্রিপুরার আদিবাসী লোক কথায় ফুটে উঠেছে ১. সৃষ্টির রহস্য কেন্দ্রিক বিষয়, ২. পশুকথার প্রাধান্য, ৩. পশু পাখির আচরণ ও আকৃতি সম্পর্কিত জিজ্ঞাসার উত্তর. ৪. পুনর্জীবন লাভ ও জমান্তরবাদ, ৫. বীরকাহিনি, ৬. কৌতুক রস,

৭. নৈতিক শিক্ষা, ৮. অলৌকিকতা, ৯. লৌকিক বিশ্বাস, ১০. রূপকথা, ১১. হিন্দু ও ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের প্রভাব, ১২. সর্পকথা, ১৩. জুম চাষ ভিত্তিক জীবন। জুম চাষকে কেন্দ্র করেই আদিবাসীদের সামগ্রিক জীবন পরিচালিত। প্রচলিত লোককথার চরিত্রগুলিও প্রায় প্রত্যেকেই জুমচাষী। রাজা-রাজড়ার কাহিনি তুলনামূলকভাবে কম, যারা আছে তারা সাধারণ গৃহস্থ। ১৪. ত্রিপুরার আদিবাসীরা সহজ-সরল প্রকৃতির। সরল তাদের জীবনযাত্রা। প্রচলিত লোককথাতেও তার ছাপ সুস্পষ্ট। কাহিনি ও কথনভঙ্গি দু'ক্ষেত্রেই এই সারল্য লক্ষণীয়। ১৫. লোককথা চিরদিনই সাধারণের মুখে মুখে বেঁচে থাকে। তাই অনেক সময় একই লোককথা স্থান-কাল-পাত্র ভেদে সামান্য পরিবর্তিত হয়ে পরিবেশিত হয়। ত্রিপুরার লোককথাও একই বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত। সর্বোপরি, ১৬. ত্রিপুরার আদিবাসী লোককথায় কোন বিশেষ ধর্মীয় আদর্শ বা সামাজিক নীতি প্রচারিত হয়নি, এখানে যে নীতি প্রকাশ পেয়েছে তা ধর্ম ও সম্প্রদায় নিরপেক্ষ মানবিক নীতি।

মোটকথা, ত্রিপুরার আদিবাসী লোককথায় উঠে এসেছে তাদের সামগ্রিক জীবন দর্শন ও জীবন পদ্ধতি। এ জীবন দর্শন ও পদ্ধতিতে নিহিত রয়েছে আদিবাসীদের বৈচিত্র্যময় জীবন ও সংস্কৃতি, জীবনের চাওয়া-পাওয়া, সুখ-দুঃখ, মূল্যবোধ, সামাজিক রীতি-নীতি, বিশ্বাস ও সংস্কার। আছে লোকশিক্ষার প্রচুর উপাদান। তাই সকলের মধ্যে চেতনা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এগুলির গুরুত্ব অপরিসীম।

সহায়ক গ্রন্থ :

১. ত্রিপুরার আদিবাসী লোককথা, সম্পাদনা-নিরঞ্জন চাকমা রঘুনাথ সরকার, ত্রিপুরা বাণী প্রকাশনী

২. ত্রিপুরা লোক কাহিনী, প্রভাংশু ত্রিপুরা, অক্ষর

৩. চাকমা প্রবাদ, নিরঞ্জন চাকমা, উপজাতি গবেষণাকেন্দ্র

৪. ত্রিপুরার রূপকথা, উপজাতি গবেষণা কেন্দ্র

৫. আদিবাসী ত্রিপুরার লোককথা, লোকগীতি, প্রবাদ প্রবচন ও ধাঁধা, কৃষ্ণদাস, উপজাতি গবেষণা কেন্দ্র

৬. Tribal Folk Tales of Tripura, D.K. Tyagi, Tripura State Tribal Cultural Research Institute and Museum.

৭. বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ— সম্পাদনা ড. বরুণকুমার চক্রবর্তী, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স।

হিমাচল প্রদেশের লোককথা

ব্যাসদেব ঘোষ

হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত এক অতীব সুন্দর পাহাড়ী রাজ্য হিমাচল প্রদেশ। অত্যন্ত ঠাণ্ডার দেশ এই হিমাচল। এখানে বছরের প্রায় বেশ কিছুটা সময় ঢাকা পড়ে থাকে বরফে। কিরাত এবং অন্যান্য নানা উপজাতির মানুষের বসবাস এই হিমাচলে। এই হিমাচলের মানুষ গল্প শুনতে এবং বলতে অত্যন্ত উন্মুখ। আসলে পথ পরিশ্রম এবং লম্বা হাড় কাঁপানি শীতকে অতিক্রম করতে বেছে নিত আরামদায়ক উপাদান হিসাবে এই গল্পবলাকে। যার মধ্য দিয়ে কেটে যেত সময়ের পর সময়। যদিও হিমাচল প্রদেশের মানুষ চাষী সম্প্রদায়ের, কিন্তু তবু প্রকৃতির ব্যবহারে বছরের দুই তিনমাস এদের থাকতে হয় বদ্ধঘরে। তখন এরা নিজেদের জীবনীশক্তির রসদ হিসাবে গ্রহণ করে পুরানো গল্পকথাকে। আর এই গল্পকথায় এরা আপন খেয়ালে ও মনের আনন্দে প্রবেশ করিয়ে দেয় আরো নানা সাহিত্যিক উপাদানকে যেমন—প্রাচীন বেদ, পৌরাণিক সাহিত্য, পঞ্চতন্ত্র এবং হিতোপদেশের মত আরো নানা প্রাচীন সাহিত্যকে। শুধু তাই নয় নানা লৌকিক বিশ্বাস সংস্কার ও প্রথার দ্বারা রঞ্জিত করে গল্পের বিষয়বস্তুকে ও যার প্রভাবে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে এই লোককথার ভাণ্ডার।

এখন আমরা হিমাচল প্রদেশে পাওয়া কিছু লোককথা নিয়ে আলোচনায় তৎপর হব।

১। রাজকুমারী ও তোতাকাহিনীর সংক্ষিপ্ত রূপ—

সাংসারিক ঝামেলায় একজন চাষী ও একজন সাধারণ লোক বীতশ্রদ্ধ হয়ে ঘর ছেড়ে পথে নামে। তাদের দুঃখের কাহিনী আলোচনা কালে একটি রাজার সঙ্গে দেখা হয় এবং তখন রাজা তার জীবনের কাহিনী বলতে শুরু করে। সে একজন সাধারণ লোক ছিল, স্ত্রী ও শাশুড়ির সঙ্গে বাস করত। তার স্ত্রী ও শাশুড়ি তাকে লুকিয়ে সাতসমুদ্র পারের রাজকুমারীর বিয়ের নিমন্ত্রণে 'সামবল' গাছে চড়ে সেখানে যাচ্ছিল। কিন্তু সেও লুকিয়ে তাদের সঙ্গে চলে যায়। সেখানে বর দেখতে কুৎসিত ও বোকা হওয়ায় বরযাত্রীরা তাকে পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে রাজকুমারীকে বিবাহ করতে বলে এবং সেও তাই করে। পরে বাড়ি ফিরে এলে তাকে সেখানে দেখেছে বলে সন্দেহ করে স্ত্রী ও শাশুড়ি তাকে একটি তোতা বানিয়ে দেয়। বিভিন্ন ঘটনায় তোতা সেই রাজকুমারীর কাছে কেনা পাখি হিসাবে পৌঁছায়। সেখানে রাজকুমারীর দুঃখ দেখে সে অশ্রুবর্ষণ করলে রাজকুমারী তার বিয়েতে বাঁধা কিছু নিশানা সেটা তখনও তার কাছে রয়ে গেছিল তা দেখে চিনতে পারে ও মাথায় হাত বুলিয়ে দেওয়া মাত্র যাদু মুক্ত হয়।

এবং সেখানের রাজা হয়ে রাজকুমারীকে নিয়ে সংসার শুরু করে। রাজা তার নিজের এ গল্প বলে লোকদুটিকে বাড়ি ফিরে যেতে বলে এবং আশা রাখতে বলে।

উপরোক্ত কাহিনীর বিভিন্ন মটিফ ও স্টিথথমসন কৃত ইনডেক্স অনুযায়ী তার বিভাগ নিম্নে দেওয়া হল—

(i) উড়তে সক্ষম সামবল গাছ— যাদু অলৌকিকতা (D)

(ii) রাজকুমারীকে বিয়ে— যৌনতা (T)

(iii) লোকটিকে তোতা করে দেয়— যাদু ও অলৌকিকতা (D)

(iv) রাজকুমারীর চিনতে পারা— সনাক্ত করণে চিনতে পারা (H)

(v) রাজা পরিশেষে লোকদুটিকে উপদেশ দেয়— উপদেশ (U)

গল্পটি মূলত পঞ্চতন্ত্রের গল্পের মত নৈতিক শিক্ষামূলক। এ গল্পে রাজকুমারীর বিবাহের পর নিঃসঙ্গ একাকী জীবনের চিত্র কীটস্ এর 'ওড টু, এ নাইটেঙ্গেল' এ গড়ে ওঠা নিঃসঙ্গতার চিত্রের মত।

২। ডোলমা ও টঙ্কুর গল্পের সংক্ষিপ্ত রূপ ঃ-

কিনার উপত্যকার একটি চার্চে অপূর্ব সুন্দরী ডোলমা বাস করত। সে ছিল বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনী। একদিন কাসাং উপত্যকায় একটি মেলায় টঙ্কু নামক একটি ছেলের সঙ্গে তার দেখা হয় এবং পরস্পর পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়। পরে টঙ্কু তাকে বিবাহ করার প্রস্তাব দিলে, সে ভীত হয় সামাজিক প্রথা ডাঙার ভয়ে। তবু তারা গন্ধর্ব মতে বিবাহ করে। বিবাহ করে ডোলমা নিজগৃহে ফিরে আসে। আবার একবছর পরে একই স্থানে মেলায় দুজনের দেখা হয় ও তারা আবার বিবাহ করে এবং একসঙ্গে থাকার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু ডোলমার পরিবার বর্গ তাদের বিবাহকে বেআইনি ও অসবর্ণ বলে জোর করে ডোলমাকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যায়। পথে যেতে যেতে ডোলমা একটি ব্রিজের উপর থেকে দুরন্ত গতিশীল নদীতে লাফিয়ে আত্মহত্যা করে। টঙ্কুকেও আর খুঁজে পাওয়া যায় না। যে স্থানে ডোলমা আত্মহত্যা করেছিল সে স্থান আজও সত্য প্রেমের নিদর্শন হিসাবে পরিচিত হয়ে আছে। জনসাধারণ আজও দাবী করে যে ঐ স্থানে ডোলমা তার প্রেমের দাবী নিয়ে এখনও ঘুরে বেড়ায়।

গল্পটি মূলত কিংবদন্তীমূলক, বেদনাহত এক প্রেমের কাহিনী। জোমস্ জয়েস এর 'পোটট্রেট অব দ্য আর্টিস্ট এজ্ এ ইয়ং ম্যান' এর কেন্দ্রীয় চরিত্র স্টিফেন যেমন উপলব্ধি করেছিলেন যাজক জীবন হচ্ছে আলোর দিকে পিছন ফিরে থেকে জীবনকে অস্বীকার করা তেমনিই ডোলমা একসময় উপলব্ধি করেছিল। এছাড়া অসীম রায় এর 'ডনাপলা' গল্পটিও এমনই। তার এক প্রেমের কাহিনী স্বরূপ এটি যেখানে পর্তুগীজ গভর্নরের মেয়ে ডনা স্থানীয় জেলেবস্তির তরুণ ছেলের প্রেমে পড়ে ছিল কিন্তু তা সামাজিক চাপে সার্থকতা না পাওয়ায় ডনা শেষ পর্যন্ত পাহাড়ের চূড়া থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রেমকে অমর করেছিল এবং স্থানটি আজও প্রেমের পীঠস্থান হিসাবে পরিচিত হয়ে আছে।

৩। ভাইবোনের গল্পের সংক্ষিপ্ত রূপ ঃ-

একশবছর আগে একটি দরিদ্রচাষী, স্ত্রী ও পুত্র কন্যার সঙ্গে সুখে বসবাস করত। গ্রামে হঠাৎ মহামারী এলে তার স্ত্রী মারা যায়। সে অপর একজনকে বিবাহ করে কিন্তু সে সতীনের ছেলে মেয়ে দুটিকে অত্যাচার করত। চাষীটিও তার হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছিল। একদিন চরাতে যাওয়া পশুর মধ্যে বাড়ি ফিরে একটিকে দেখতে না পেলে সন্ধ্যার সময় দুই ভাইবোনকে পুনরায় খুঁজতে পাঠায়। কিন্তু অত্যধিক শীতের রাত্রিতে ভাইটি বনে মারা যায় আর বোনটি মুমূর্ষু অবস্থায় পড়ে থাকে। পরে তার চিকিৎসা করে একটি বুড়োর সঙ্গে বিবাহের ঠিক করে। মেয়েটি রাজি হয় এই শর্তে যে তার পাল্কিটি যেন তার ভাই যেখানে মারা গিয়েছিল সেখান দিয়ে নিয়ে যায়। পরে পাল্কি তার কথামত ঐ রাস্তা দিয়ে গিয়ে যখন শ্বশুর বাড়ি পৌঁছায় তখন কনের মুখ দেখতে গিয়ে দেখে সে মারা গেছে।

গল্পটিতে গার্হস্থ্য জীবন কাহিনী উঠে এসেছে। বিমাতার পূর্বপক্ষের ছেলেমেয়েদের অত্যাচারের কাহিনী অবিরল নয়। এ গল্পে সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন কুমারী বিবাহের প্রসঙ্গটিও তুলে ধরা হয়েছে। নতুন বিয়ে করা স্ত্রীর কথায় চলার ব্যাপারটিও অপূর্বভাবে ধরা পড়েছে। তাই বোঝা যায় গল্পের মধ্যে নানান সামাজিক অসঙ্গতিক নিপুণ তুলিকায় অঙ্কন করা হয়েছে।

৪। এক রাজার পাঁচটি ছেল ছিল। তাদের মধ্যে একজন খুব অলস ছিল। তাই রাজা তাকে তার অংশের সম্পত্তি দিয়ে তাড়িয়ে দেয়। সে কিছু খাবারের জিনিস নিয়ে পথে বেরিয়ে পড়ে। জঙ্গলে সে খাবার জন্য তৈরি করা সাতটি রুটি খাবার আগে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলে আমি কি সাতটিই একেবারে খেয়ে নেব। যে স্থানে রাজকুমার কথাগুলি বলে সেখানে পাথরের নিচে একটি মেয়ে দৈত্য ছিল। তার সাতটি সন্তান নিয়ে সে বাস করত। সে ভাবল তার সন্তানদের খাবার কথা বলছে। তখন সে নিজের সন্তানদের খেতে বারণ করে এবং তাকে একটি পাত্র দেয় এবং বলে পাত্রটির থেকে যা খাবার চাওয়া হবে তাই পাবে। তখন রাজকুমার চলে যায় ও রাত্রে এক বৃদ্ধার বাড়ি আশ্রয় নেয় কিন্তু বৃদ্ধাটি পাত্রের গুণ দেখে সেটি চুরি করে। পরদিন সকালে একই উপায়ে রাজকুমারটি একটি দুধ দেওয়া ছাগল আনে। সেটিও বৃদ্ধাটি চুরি করে। তখন সে ব্যাপারটি বুঝতে পারে। কিন্তু তাহলেও পর দিন আবার দৈত্যের কাছে একই ভাবে চাইলে দৈত্য এবারে তাকে একটি দড়ি ও লাঠি দেয় আর বলে এটি যেন সে পায়ের সঙ্গে রাত্রে বেঁধে শোয়। আর যখন কারো থেকে কিছু নিতে মন হবে তখন যেন বলে 'দড়ি তুমি বাঁধ, লাঠি তুমি আঘাত করো'। দৈত্যের নির্দেশ মতো একথা বলে সে বৃদ্ধার কাছ থেকে সমস্ত কিছু ফিরে পায় ও অপর এক দৈত্যকে দাস বানিয়ে একটি অপূর্ব রাজপ্রাসাদ নির্মাণ কবে সুখে দিন যাপন করতে থাকে।

উপরোক্ত গল্পে মটিফ ও স্টিথথমসন কৃত মটিফ ইনডেক্স অনুযায়ী বিভাগ নিম্নরূপ —

(i) অলস রাজকুমার— চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য (W)

(ii) রাজা কর্তৃক তাকে তাড়িয়ে দেওয়া— ভাগ্যবিপর্যয় (L)

(iii) মেয়ে দৈত্য কর্তৃক পাত্র, ছাগল ও দড়ি এবং লাঠি পাওয়া— যাদু সংক্রান্ত (D)

(iv) বৃদ্ধাকে শাস্তি দান— শাস্তি বিষয়ক (Q)

গল্পটি মানুষ ও দৈত্যের। মানুষ তার বুদ্ধিবলে দৈত্যের কাছ থেকে লাভ করে **অপরিসীম সম্পদ**। এ গল্পটি তারই নিদর্শন।

এ গল্পে যাদুর সাহায্যে রাজকুমারের ঐশ্বর্যলাভের সঙ্গে শেক্সপীয়ারের 'টেমপেস্ট' নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র প্রসপেরোর যাদুর সাহায্যে নিজের রাজত্ব ফিরে পাওয়া অনেকাংশে তুলনীয়।

৫। যাদু হ্রদ গল্পের সংক্ষিপ্ত রূপ—

এক ধনী শেঠের সাতটি অবিবাহিত ছেলে ছিল। সাতটি অবিবাহিত সহোদরা কনের খোঁজে তারা নাপিত ও পুরোহিতকে পাঠায়। বহু চেষ্টায় তারা খোঁজ পায় ও বিবাহ ঠিক করে আসে। বিবাহের দিন শেঠের একপুত্র নিজে না গিয়ে তার প্রতিনিধি স্বরূপ একটি তলোয়ার পাঠায় এবং তার বাবাকে বলে কনের বাড়ি যেতে একটি হ্রদ পড়বে সেখানে যেন বিশ্রাম না করে। কিন্তু বিবাহ সম্পন্ন হলে ফেরার পথে ভুলবশত ঐ হ্রদের ধারেই বিশ্রাম করে। তখন ঐ হ্রদের জলরাশি তাদের ঘিরে ফেলে এবং একটি বাণী তাদের কাছে আসে। তাদেরকে সেই বাণী জানায় এ হ্রদে একটি পাল্কি সহ কনে নিক্ষেপ করতে নচেৎ সবার মৃত্যু হবে। অন্যউপায় না দেখে তারা অনুপস্থিত ছেলের বউকে পাল্কিসহ সেখানে নিক্ষেপ করে। পরে সেই ছেলেটি তার স্ত্রীকে উদ্ধার করতে এলে একটি বাসন জানায় ঐ হ্রদে একটি দৈত্য বাস করে আর তার প্রাণ আছে সাতসমুদ্র পারের ওপারে একটি গাছের উপরে খাঁচার তোতার মধ্যে। তোতাটিকে মারলে তবেই সে স্ত্রীকে ফিরে পাবে। তখন সে একটি সাধুর সেবা করে একটি যাদুদণ্ড পায়। সেই যাদুদণ্ডের সাহায্যে পাখিটিকে হত্যা করে ও নিজ স্ত্রীকে ফিরে পায়।

রূপকথাশ্রেণীর উপরোক্ত কাহিনীতে উপস্থিত বিভিন্ন মটিফ ও স্টিথথমসন কৃত মটিফ ইনডেক্স অনুযায়ী বিভাগ নিম্নরূপ—

(i) হ্রদের বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা ভুলে সেখানে বিশ্রাম— নিষেধ সম্পর্কিত (C)

(ii) হ্রদে দৈত্য বাস করে— ভয়ংকর বিষয়ক (G)

(iii) যাদদণ্ড লাভ— যাদুসংক্রান্ত (D)

(iv) শেষে স্ত্রীকে ফিরে পাওয়া — যৌনসংক্রান্ত (T)

(v) তোতায় দৈত্যের মৃত্যু লুকানো—মৃত্যু সম্পর্কিত (E)

ঝাড়খণ্ডের কিছু লোককথা

সুব্রত কুমার পাল

ঝাড়খণ্ডের লোকায়ত মানুষ পূজা পার্বণে যে সব কাহিনী বলে বা শোনে সেগুলি ব্রতকথা বলে অভিহিত। অপরদিকে নিছক মনোরঞ্জনের জন্য যে সব কাহিনী বলা হয়ে থাকে সেগুলি লোকগাথা রূপে পরিচিত। এর মধ্যে রূপকথা অর্থাৎ অলৌকিক কাহিনী যেমন আছে তেমনি রাইত কথা বা রাইত কহনি (রাত্রিকালে বলা কাহিনী) গুলিও আছে। রাত্রিবেলায় যে সব কাহিনী বলা হয় তার অধিকাংশই রূপ কথার পর্যায়ে পড়ে। স্থূল বিচারে এখানের মানুষের পুরুষানুক্রমে বলা এবং শোনা সব কাহিনীকেই লোকগাথারূপে অভিহিত করা যেতেই পারে।

ঝাড়খণ্ডের ব্রতকথাগুলিও লোককথা পর্যায়েই পড়ে। তবে ক্ষেত্রবিশেষে দেখা যায় যে প্রায় সব ব্রতকথাই লোককথা হলেও লোককথা মাত্রেই কিন্তু ব্রতকথা নয়। ব্রতকথার সঙ্গে পূজাপার্বণের শুধু যে যোগ আছে তাই নয়, সেই পূজা উপলক্ষ্যে এগুলির বর্ণনাও অত্যাবশ্যক। অর্থাৎ সেই ব্রতকথাটির বর্ণনা ব্যতিরেকে পূজা অনুষ্ঠানটি অসম্পূর্ণ। করম পূজায় করম কথার বর্ণনা অনিবার্য ও অত্যাবশ্যক। কাজেই করম কাথা বা করম কথা একই সঙ্গে ব্রতকথা এবং লোককথা বা লোকগাথা। অপরদিকে গোহাল পূজার অর্থাৎ বাঁদনা পরবের নেপথ্য কাহিনীটি সেই পূজা উপলক্ষ্যে বর্ণনা করার প্রয়োজন হয় না। এক্ষেত্রে বাঁদনা বা গো-পূজা সম্পর্কিত কাহিনীটি লোককথা হলেও ব্রতকথা নয়। কাহিনীটি বাঁদনা পরবে বর্ণনা করা হয় না। এটা সম্পূর্ণ রূপেই একটি লোককথা যা এখানের মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয় বহন করে। কাহিনীটি এই রূপ। ঝাড়খণ্ডের লোকায়ত মানুষ সম্পূর্ণরূপেই কৃষিনির্ভর। চাষবাস করেই তাদের দিন কাটে। এই প্রসঙ্গে চাষবাষ কথাটিও লক্ষণীয়। যেখানে চাষ সেখানেই বাস। এখানের লোকায়ত প্রবাদে শুনেছি 'অন্নের সুখে অরণ্যে বাস'। এখানে কঠিন মাটির বুক থেকে সেই অন্ন উৎপাদন করে তারা কঠোর পরিশ্রম করে। আর এই কর্মে তাদের প্রধান সহায়ক হল গোরু, কাড়া। গোরু লাঙল টানে গাড়ি টানে। কৃষিকর্মে তারা কৃষকের অত্যাবশ্যক এবং অপরিহার্য সঙ্গী। গোরু উদয়াস্ত পরিশ্রম করে মানুষের সেবা করে কিন্তু বিনিময়ে মানুষের কাছ থেকে তারা যথেষ্ট সেবা সমাদর পায় না। যে গোহালে তাদের রাখা হয় তা হতশ্রী এবং খানা ডোবায় ভরা। যে খাবার তাদের দেওয়া হয় তাও যথেষ্ট নয়। যে সব গোরু বুড়ো হয়ে যায়, মানুষের

কোনো কাজে লাগে না তাদের অবস্থা আরো করুণ। যাই হোক বছরের একটা নির্দিষ্ট দিনে গোহাল পরিষ্কার করা হয়, গোহাল পূজাও করা হয় এবং গোরুর মাথায় তেল সিঁদুর মাখিয়ে ধানের মউড় (মুকুট) পরিয়ে তাদের ভালো মন্দ খাওয়ানো হয়। সেটাই বাঁদনা বা বাঁধনা। লোককথাটি এই বাঁদনা পরব সম্পর্কিত। মানুষের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে গোরুর পাল ভগবানের কাছে (মহাদেবের কাছে)[১] মানুষের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। ভগবানের কিছুই অজানা নেই। গোরু ছাড়া মানুষের জীবিকা অচল। মানুষের জন্য গোরু অকথ্য পরিশ্রম করলেও তারা যে তাদের কাছ থেকে উপযুক্ত সমাদর পায় না তাও তিনি জানেন। কাজেই গোরুদের অভিযোগ উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তাদের অভিযোগ প্রশমিত করার জন্য তিনি তাদের জানালেন যে কার্তিক অমাবস্যার রাত্রে (অর্থাৎ বাঁদনায়) তিনি স্বয়ং মর্তভূমে যাবেন এবং গোরুদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখে তিনি উপযুক্ত বিহিত বা প্রতিবিধান করবেন। কিন্তু কার্তিক অমাবস্যার রাত্রিটাতো গোরুদের সুখের দিন, স্বস্তির দিন। গোহালঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, গোরুদের সেবাযত্ন অর্থাৎ অঢেল সুখ। ভগবান এই সব দেখে গোরুদের অভিযোগ উড়িয়ে দিলেন। জানালেন মানুষ তাদের যথেষ্ট যত্ন করছে। সুতরাং তাদের অভিযোগ অমূলক এবং ভিত্তিহীন। কাহিনীটি শুনে স্বীকার করতেই হয় যে ভগবানের বুদ্ধি থাক বা নাই থাক এখানের লোকায়ত মানুষের বুদ্ধির অভাব নেই। তবে সেই সঙ্গে একথাও স্বীকার্য যে নিজেদের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে গিয়ে তারা যে ভগবান বা মহাদেবকেও তাদের স্বার্থসিদ্ধির ষড়যন্ত্রে শরিক করে তুলেছেন সে কথাটা বোধহয় তাঁরা ভেবে দেখেননি। বাঁদনা সম্পর্কিত উপরোক্ত লোক কথাটির সঙ্গে গো-বন্দনার কোনো আনুষ্ঠানিক সম্বন্ধ নেই। কিন্তু করম কথা অর্থাৎ করম কথার সঙ্গে করম পূজার সম্পর্ক গভীর ও নিবিড়। এই কথাটি করম পূজার অত্যাবশ্যক অঙ্গ। অনেকটা শাস্ত্র সম্মত দেব-দেবী পূজার মন্ত্রোচ্চারণের মতো। বারতি বা ব্রতীরা এই করম কথা বর্ণনার মাঝে মাঝেই করম ডালে ফল ফুল জল ঢালে। করম ঠাকুর শুধু যে দেবতা তাই নয় তিনি অসীম সম্পদশালী। করম কথায় মাঝে মাঝেই করম রাজা কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে। তাঁকে পূজা করলে সবকিছু পাওয়া যায় কিন্তু অবহেলা করলে চরম সর্বনাশ হয়। মঙ্গল কাব্যের দেব-দেবীদের সঙ্গে এব্যাপারে করম ঠাকুরের মিল। তিনি প্রীত হলে সুখ এবং সম্পদের সীমা থাকে না আর রুষ্ট হলে দুঃখ এবং দুর্দশার সীমা পরিসীমা থাকে না। কাহিনীতে বলা হয়েছে যে বহুকাল পূর্বে কোনো এক গ্রামে করম আর ধরম নামে দুই ভাই বাস করতো। তাদের সুখ সম্পদের সীমা পরিসীমা ছিল না। আর এই সুখ সম্পদের কারণ ছিল তাদের করম পূজা। করম পূজার রাত্রে তারা নেশা করে এবং ঢাক ঢোল বাজিয়ে নৃত্য গীত করতো আর রাত শেষে করম ঠাকুরকে সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে পৌঁছে দিত অর্থাৎ বিসর্জন দিত। তার পরদিন সকালে স্নান করে বাসী ভাত এবং তেল নুন হলুদ ছাড়া সেদ্ধ করা বাসী ডাল কচু পাতায় খেয়ে পারণ

করতো। এটা করম পূজার অত্যাবশ্যক অঙ্গ। একবার করম বাসী ভাতের পরিবর্তে গরম ভাত খেয়ে পারণ করল। ফলে করম ঠাকুরের গাত্রদাহ হল এবং অমৃত কুণ্ডে ডুব দিয়েও তাঁর গাত্রদাহ শীতল হল না। স্বাভাবিক কারণে করম রাজা ক্রুদ্ধ হলেন এবং সেই ক্রোধের কারণে করম ও ধরম'র সংসারে সর্বনাশের শুরু হল। দুই ভাই-য়ের মধ্যে বিবাদ হল। তারা পৃথক হয়ে গেল। ধরমুর সংসারে সুখ সম্পদ বজায় থাকল কিন্তু করমুর সংসারে দুঃখ, দারিদ্র্য ও যন্ত্রণার শেষ থাকল না। করমু এবং তার বৌ ধরমুর দিন মজুরে পরিণত হল। পরিশ্রম করার পরেও ধরমু তাদের খেতে ডাকল না, পারিশ্রমিকও দিল না। ফলে রাগে করমু ধরমুর জমির আল কাটতে গেল। সেই আল কাটার সময় কেউ তাকে বলল যে আলকেটে কোনো লাভ হবে না। করম রাজা রাগ করে চলে গিয়েছেন। তোর পাপেই এই শাস্তি। সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার থেকে করম রাজাকে ফিরিয়ে না আনলে তোর দুঃখ দূর হবে না। তুই করম রাজাকে ফিরিয়ে নিয়ে আয় তাহলেই সব কিছু পাবি। এই কথা শুনে করমু তার বৌ-কে নিয়ে করম রাজার সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল। দীর্ঘ পথ এবং সেই পথে অসংখ্য ভোগান্তি এবং অদ্ভুত সব ঘটনা। পথে বিশ্রাম নেবার জন্য করমু যখন এক গাছের ছায়ার নীচে বসল তখন সেই ছায়াটা তার কাছ থেকে সরে গেল। অবাক করমুকে সেই ছায়া মানুষের ভাষায় জানতে চাইল সে কোথায় যাচ্ছে? বিস্মিত করমু তাকিয়ে দেখল যে খড়ের বোঝা মাথায় নিয়ে যে লোকটা হেঁটে চলেছে তারই ছায়ায় সে বসেছিল। করমু তার কপাল ফেরানোর জন্য করম ঠাকুরকে আনতে যাচ্ছে শুনে সেই লোকটি অনুরোধ করল সে যেন করম ঠাকুরকে তারকথাও বলে এবং জেনে আসে যে কেন ক্রমাগত বারো বছর ধরে হেঁটে চলেছে এবং কেন সে মাথার ঘাড়ের বোঝা নামাতে পারছে না? করমু পুকুরে জল খেতে গিয়ে দেখল জল পোকায় ভরা। পুকুর যখন জানল যে করমু, করম রাজার কাছে যাচ্ছে তখন পুকুর তার দুঃখের কারণটাও করম রাজার কাছ থেকে জেনে আসতে বলল। তার দুঃখ এই যে তার জল পোকায় ভরা এবং সে জল কেউ খায় না। ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর করমু, যখন ডুমুর গাছের ফল খেতে গেল সেখানেও দেখল ফল পোকায় ভরা। করমুর গন্তব্যস্থান জেনে ডুমুর গাছও তাকে সেই পুকুরটির মতো অনুরোধ করল। তার ফলে এত পোকা কেন সেটা করম রাজার কাছ থেকে জেনে আসতে। পথে করমু আরো কিছু অদ্ভুত ঘটনার সম্মুখীন হল। এক বুড়ি তার দুটি পা উনুনে ঢুকিয়ে দিয়ে চিংড়ি মাছ বেছে চলেছে। উনুনে আগুন জ্বলছে কিন্তু বুড়ির পা পুড়ছে না, বুড়ির চিংড়ি মাছ বাছাও থামছে না। সেই বুড়িও করমুকে অনুরোধ করল করম রাজার কাছ থেকে তার এই অপরিসীম দুঃখের কারণটা জেনে আসতে। পথে একপাল ঘোড়া দেখে করমু ভেবেছিল যে সে ঘোড়ায় চেপে কিছুটা রাস্তা এগিয়ে যাবে কিন্তু ঘোড়ারা রাজী হল না উল্টে তারা করমুকে অনুরোধ করল সে যেন করম রাজার কাছ থেকে জেনে আসে কেন তাদের গলা-গুঁসাই নেই? সন্ধ্যার

বুকে করমু গিয়ে পৌঁছল যেখানে সেখানে চতুর্দিকে জল। সেই জলের বুকে ভাসছে এক হাঙর। সেই হাঙর করমুকে পিঠে নিয়েকরম রাজার দেশে পৌঁছে দেবে বলে আশ্বস্ত করল। সেই সঙ্গে অনুরোধ করল কেন সে বারো বছর ধরে জল ডুবতে পারছে না শুধু ভেসে বেড়াচ্ছে, তা করম রাজার কাছে জানতে। সেই হাঙরের পিঠে চড়ে করম রাজার কাছে পৌঁছাল। করমু দেখল করম রাজা গায়ের জ্বালা মেটাতে বারবার অমৃতকুণ্ডে ডুব দিচ্ছেন। করমুকে দেখে প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হলেন করম রাজা কেননা তার দোষেই তাঁর এই গাত্রদাহ। শেষ পর্যন্ত অনেক কাকুতি মিনতি করে করম ঠাকুরের কৃপা লাভ করল করমু। করম ঠাকুর তার সঙ্গে এলেন না কিন্তু বরাভয় দিয়ে বললেন যে নিষ্ঠাভরে তাঁর পুজো করলে তার সম্পদের সীমা পরিসীমা থাকবে না। নির্দেশ দিলেন তিনি যে গাছের নীচে বসে করমুর সঙ্গে কথা বলছেন সেই গাছটির নাম হবে করম গাছ এবং সেদিনের সেই তিথি অর্থাৎ ভাদ্রমাসের একাদশী তিথিতে এই গাছের ডাল আঙিনায় পুঁতে মদ হাড়িয়া খেয়ে পুজো করতে এবং পরদিন বাসী ভাতে পারণ করতে। করম রাজার কাছ থেকে পথে যারা যারা তাকে যে সব অনুরোধ করেছিল সেগুলিও জেনে নিল করমু।

ফেরার পথে একের পর এক সম্পদ লাভ হল করমুর। হাঙর একদা এক রাজকন্যাকে গিলে খেয়েছিল। সেই রাজকন্যার গলায় একটি সাতনরী হার ছিল। সেই হারটা হাঙরের পেটে এখনো আছে। হাঙর যদি ঐ হারটা উগরে ফেলে বামুন বোষ্টমকে দান করে তাহলে সে আবার জলে ডুবতে পারবে এবং সবকিছু খেতে পারবে। হাঙর সব শুনে করমুকে বলল যে এখানে বামুন বোষ্টম সে কোথায় পাবে? করমুই তার কাছে বামুন বোষ্টম। সে তাকেই সেই হারটি নিতে বলল। করমু সেই হারটি নিয়ে এগিয়ে চলল। পথে ঘোড়াদের দলপতি তাকে দেখতে পেয়ে তার কাছে ছুটে এল এবং করমু তাদের করম ঠাকুরের নির্দেশ মতো জানাল যে তাদের বাথানের উত্তর কোণে অজস্র রত্ন পোঁতা আছে। সেগুলিকোনো বামুন বোষ্টমকে দান করলে তারা গলা গুঁসাই পাবে এবং আশ্রয়ও জুটবে। হাঙরের মতো ঘোড়াদের দলপতিও বামুন বোষ্টম দুর্লভ বলে করমুকেই সেই সমস্ত রত্নরাজি দান করল। অত রত্নরাজি বহন করে নিয়ে যাওয়া কঠিন তাই ঘোড়াদের দলপতি করমুকেই তাদের গলা গুঁসাই বলে মেনে নিয়ে সেগুলি অন্য ঘোড়াদের পিঠে চড়িয়ে নিজের পিঠে করমুকে নিয়ে তার সঙ্গে এগিয়ে গেল। এরপর করমুর দেখা হল সেই বুড়ির সঙ্গে যে উনুনে পা ঢুকিয়ে বসে আছে। বুড়িকে সে জানাল যে তার উনুনের নীচে তার পূর্বপুরুষের বহু ধনসম্পত্তি পোঁতা আছে। সেগুলি বামুন বোষ্টমকে দান করলেই তার দুঃখ দূর হবে। বুড়িও সেই হাঙর ও ঘোড়াদের দলপতির মতো করমুকেই বামুন বোষ্টম মেনে নিয়ে সেই ধনরত্ন দান করল। বলা বাহুল্য যে দান করার সঙ্গে সঙ্গে বুড়ির পা উনুন থেকে বেরিয়ে এল, ধান সেদ্ধ হল এবং তার চিংড়ি মাছ বাছাও শেষ হল। প্রচুর ধন সম্পত্তি

নিয়ে ঘোড়ায় চলে করমু পৌঁছাল সেই ডুমুর গাছের কাছে। গাছটিকে সে জানাল যে তাদের পুরানো গাছের তলায় বেশ কিছু ধন রত্ন পোঁতা আছে। সেগুলি বামুন বোষ্টমকে দান করলেই তার কষ্ট দূর হবে। ডুমুরগাছও সেই একই যুক্তি দেখিয়ে করমুকে সেই ধন সম্পত্তি নিতে বলল এবং তারপরেই করমু ডুমুর ফল ভেঙে দেখল যে তাতে আর পোকা নেই। এবার করমু গিয়ে পৌঁছল সেই পুকুরের কাছে এবং তাকে জানাল যে তার ঘাটের বড় পাথরের তলায় একটা মাণিক্য আছে। সেই মাণিক্যটি সে বামুন বোষ্টমকে দান করলেই তার জল পোকা মুক্ত হবে। পুকুরও সেই মাণিক্যটি করমুকেই দান করল। করমু এবং ঘোড়ার পাল পোকা মুক্ত সেই পুকুরের জলপান করে আবার ঘরের দিকে এগিয়ে চলল। এবার তার সঙ্গে দেখা হল সেই লোকটির যে মাথায় খড়ের বোঝা নিয়ে চলেছে। করমু তাকে জানাল যে সে কোনো লোকের মাথায় খড়ের কুটো দেখেও তাকে সে কথা বলে দেয়নি। লোকটি তার অপরাধ স্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গে তার মাথা থেকে খড়ের বোঝা নেমে গেল। কারোর মাথায় খড়ের কুটো দেখলে বলে দিতে হয়। না বললে অপরাধ হয়। এটা ঝাড়খণ্ডের লোকায়ত বিশ্বাস, করমু যখন গ্রামে গিয়ে পৌঁছল তখন তার গরু ঘোড়ার বহর এবং ধনসম্পত্তি দেখে সকলে আশ্চর্যচকিত হল। করমু তাদের জানাল এসবই করম ঠাকুরের আশীর্বাদ। ভক্তি সহকারে যথা নিয়মে যারাই তার পূজা করবে তারাই এই রকম ধন সম্পত্তির অধিকারী হবে। করম গাথার মূল লক্ষ্য করম ঠাকুরের প্রভাব প্রতিপত্তির বর্ণনা এবং সুখ সম্পদের জন্য তার প্রীতি উৎপাদন এবং পূজা করার জন্য মানুষের মনে আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি করা। বলা বাহুল্য লোকগাথার যে অংশটি ব্রতকথা তার মূল লক্ষ্য এটাই। এবং এখানেই অন্যান্য লোকগাথার সঙ্গে ব্রতকথার মৌলিক পার্থক্য। কিন্তু তাহলেও ব্রতকথাও যে লোকগাথারই অঙ্গ সেকথাও স্বীকার্য।

ঝাড়খণ্ডের লোকায়ত মানুষের ভাণ্ডারে লোকগাথা অজস্র। এখানের এক একটি বয়স্ক মানুষ লোকগাথার জীবন্ত কোষগ্রন্থ। বেশ কিছু লোকগাথা লিপিবদ্ধ হলেও এখনো বহু লোকগাথা লিপিবদ্ধ হওয়ার প্রত্যাশায় আছে। আমরা এখানে কয়েকটি লোকগাথা তুলে ধরছি লোকায়ত মানুষের স্বভাব বৈচিত্র্য, আশা আকাঙ্ক্ষা, বিশ্বাস অবিশ্বাস ইত্যাদি সম্পর্কে কিছু পরিচয় জানার জন্য। তারপূর্বে বলে রাখা প্রয়োজন যে প্রধানত আনন্দ লাভের প্রয়োজনেই লোকগাথাগুলি বলা এবং শোনা হয়ে থাকে। তবে সেগুলির মধ্যে শিক্ষণীয় বস্তুও বেশ কিছু আছে। আর সেই শিক্ষার মূল যে জীবনের পাঠশালায় সেকথাও বলা বাহুল্য।

একটি লোকগাথায় শুনি এক সাধু গাধার পিঠে চড়ে গাঁয়ে গাঁয়ে ভিক্ষা করে বেড়াত। একদিন ভিক্ষা করতে গিয়ে বনের মধ্যে সন্ধ্যে হয়ে গেল। সাধু দেখল পথে দুটো বাঘের বাচ্চা বসে আছে। সাধু বুদ্ধি করে তাদের বলল যে সে তাদের ঠাকুরদাদার পূজারী ছিল। অনেকদিন পরে সে তাদের ঘরে এসেছে। বাচ্চা দুটো বলল যে তারা

তো চিনতে পারছে না। তাদের মা-বাবা এলে তারা হয়তো চিনতে পারবে। সাধু বলল যে তারাও চিনতে পারবে না। তখন বাঘের বাচ্চারা তাকে লুকিয়ে থাকতে বলল। কিছুক্ষণ পর বাঘ-বাঘিনী যখন ফিরে এল তখন বাচ্চারা সাধুর কথা তাদের বলে সাধুকে ডাকল। সাধু বাঘ-বাঘিনীকে (এ অঞ্চলের ভাষায় বাঘ-বাঘান) জানাল যে সে তাদের বাপের আমলের পূজারী ছিল। তখন বাঘ-বাঘিনী সাধুকে তাদের কাছে থাকতে বলল। রাতের বেলা সাধু শুনল যে বাঘেরা বলাবলি করছে যে দুদিন তাদের আর খাবার খুঁজতে হবে না। পরদিন সকালে তারা গাধাকে মারল। সাধু ভাবল এবার তারা তাকে মারবে। তাব চেয়ে তার আগুনে পুড়ে মরাই ভাল। এই ভেবে সে গাঁজা খেতে বসল। তারপর গাধাকে পোড়াবে বলে কাঠ পালা কুড়িয়ে জড়ো করল। একাজে বাঘরাও তাকে সাহায্য করল। গাধার যেটুকু অংশ তখনও বাঘরা খেয়ে শেষ করতে পারেনি সেটুকু আগুনে দিয়ে সাধু নিজেও আগুনে ঝাঁপ দিল। বাঘ-বাঘিনী তাকে খাবে বলে তারাও আগুনে ঝাঁপ দিল এবং সবাই একসঙ্গে পুড়ে মরল।

তার বেশ কিছুদিন পরে বর্ষা হল। বর্ষার জলে মাটি ভিজে সেখানে মহুল গাছের জন্ম হল। সেই গাছের ফুল থেকে মানুষ মদ বানাতে শিখল। তা সেই মদ খেয়ে যখন মানুষ তার পাশের লোককে বলে একটু খা বাবা তখন সে সাধু নেশা। যখন বলে মার শালাকে কাট শালাকে তখন সে বাঘ নেশা। আর যখন সংজ্ঞাহীন হয়ে মাটিতে শুয়ে থাকে তখন সে গাধা নেশা।

এবার একটি অদ্ভুত প্রতিযোগিতার কথা বলি। প্রতিযোগিতাটি বুদ্ধির নয় বোকামির। তিনজন লোক ছিল। সনাতন, পচা আর দাঁতলা। ক্ষেত্রবিশেষে এবং কথক বিশেষে এদের নাম ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। যাই হোক এই সনাতন, পচা আর দাঁতলাব কাছে একজন বৃদ্ধ এসে পথের হদিস জানতে চাইল। তারা পথ বলে দিলে বৃদ্ধ তাদের আশীর্বাদ করল। তিনজনের মধ্যে কাকে সেই বৃদ্ধ আশীর্বাদ করল সেকথা তারা বুঝতে না পেরে কিছুটা দূর এগিয়ে যাওয়া বৃদ্ধের কাছে গিয়ে তারা জানতে চাইল তিনি তাদের মধ্যে কাকে আশীর্বাদ করেছেন। বৃদ্ধ তাদের জানালেন যে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বোকা যে তাকে তিনি আশীর্বাদ করেছেন।

এবার তাদের মধ্যে কে বেশি বোকা এই নিয়ে ঝগড়া শুরু হল এবং শেষ পর্যন্ত তা মারামারিতে গড়াল। শেষ পর্যন্ত তারা মোড়লের কাছে গেল তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বোকা কে এই তথ্যটি জানার জন্য। মোড়ল তাদের পরদিন আসতে বললেন। পরদিন তারা মোড়লের কাছে যেতে মোড়ল সনাতনকে জিজ্ঞাসা করলেন যে সকালে সে কী করেছে? সনাতন জানাল যে সকালে সে পুকুর ঘাটে দেখেছে যে একটা বারো সের রুই মাছ লাফাচ্ছে। তার বৌ বলল যে আটসের নেবে। তাই শুনে সে বৌ-কে খুব মেরেছে। এবার মোড়ল পচার কাছে জানতে চাইল সে কী করেছে? সে জানাল যে নূতন বৌ ঘরে এনেছে আর রাত্রে খুব বৃষ্টি হয়েছে। তাই বৌ-এর পায়ের আলতা

ধুয়ে যাবে বলে সে বৌ-কে রান্না ঘর থেকে কাঁধে করে বড় ঘরে নিয়ে এসেছে। আর দাঁতলা জানাল যে তাদের ঘরে তারা স্বামী-স্ত্রী দু'জনে আর একটা ছোট ছেলে। তা এই ছোট ছেলেটাকে মা-বাবা বলতে কে শেখাবে? সেজন্য আমি বৌকে মা বলি আর বৌ আমাকে বাবা বলে। মোড়ল অনেক ভেবে বলল যে পুকুরে মাছ দেখে ভাগের জন্য বৌকে মারে সে সবচেয়ে বোকা।

লোকগাথার বুকে আঞ্চলিকতার অনস্বীকার্য ছাপ থাকলেও প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে তার মৌল ধারণাটি সারা বিশ্বের আদিম মানুষের মর্মে বাসা বেঁধে আছে রূপে না হোক স্বরূপে। শুধু তাই নয় অনেক সময় শিষ্ট সাহিত্যের মধ্যেও লোককথা বিশেষের ছাঁচ বা আদলের স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ঝাড়খণ্ডের যে লোকগাথাটি দিয়ে আমরা প্রবন্ধ শেষ করছি তার কাহিনীটা এই রকম—

এক রাজার তিন মেয়ে (এখানের ভাষায় মেয়া, বিটি) ছিল। একদিন রাজা প্রকাশ্য সভায় সেই তিন মেয়ের কাছে জানতে চাইল তারা কার ভাগ্যে খায়। বড় মেয়ে দুটি বলল— আমরা আপনার ভাগ্যে রাজভোগ খাই। ছোট মেয়ে পুষ্পবতী বলল যে তার কথা শুনে তার বাবা দুঃখ পাবেন কিন্তু সে তার নিজের ভাগ্যে খায়। ছোট মেয়ের কথা শুনে রাজা খুব রেগে গেল এবং তাকে ঘর থেকে দূর করার জন্য প্রতিজ্ঞা করল পরদিন সকালে উঠে সে যার মুখ দেখবে তার সঙ্গেই মেয়েটির বিয়ে দেবে এবং সে কার ভাগ্যে রাজভোগ খায় সেটার পরীক্ষা হবে। রাজার প্রতিজ্ঞা শুনে রানী চিন্তায় পড়ে শহরে ঢাঁড়রা পিটিয়ে দিল যে পরদিন কোনো পুরুষ যেন বেলা না হলে বিছানা ছেড়ে না ওঠে। যে উঠবে তার বারো বৎসর কারাদণ্ড। এদিকে এক পাগল বামুনের ছেলে রাত থেকেই রাজার বাগানে পড়ে আছে। সকালে চাকরেরা তাকেই ধরে আনল এবং রানীর বাধা সত্ত্বেও রাজা সেই ক্ষ্যাপা বামুনের ছেলেটির সঙ্গে পুষ্পবতীর বিয়ে দিল। পুষ্পবতী মা-কে সান্ত্বনা দিয়ে বলল যে তার ভাগ্যে যদি থাকে তাহলে সে অবশ্যই রাজভোগ খাবে। স্বামীর সঙ্গে বেরিয়ে যাবার সময় পুষ্পবতী মা-বাবাকে বলল যে কোনো সাজসজ্জা নেবে না শুধু মাত্র একটা ধুতি পরে খেপার সঙ্গে বেরিয়ে গেল। রাজা ভাবল যাচ্ছে যাক দেখব কেমন রাজভোগ খায়।

এদিকে খেপার মন বৃন্দাবন। যেদিকে তার মন চাইছে সেদিকেই সে যাচ্ছে। পুষ্পবতীও তার সঙ্গে যাচ্ছে। বনের ওপারে একটি গাঁ-য়ের মাথায় একটা কুঁড়ে ঘর যেখানে খেপার মা ভিক্ষাবৃত্তি করে জীবন যাপন করে। পুষ্পবতী দেখল খেপা সেই ঘরে ঢুকে মায়ের দেওয়া খুদ কুঁড়ো খেয়ে মায়ের নিষেধ না মেনে আবার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। পুষ্পবতী ব্যাপারটা জেনে খেপার মায়ের কাছে আশ্রয় চাইল। কুঁড়ে ঘর, ছেলে খেপা, ক্ষ্যাপার মা তাই রাজকন্যার মতো রূপবতী পুষ্পবতীকে সেখানে থাকতে দিতে রাজি হচ্ছিল না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পুষ্পবতীর পীড়াপীড়িতে রাজি হল। সেই কুঁড়ে ঘরে পুষ্পবতী লক্ষ্মীপূজা করে এবং মালক্ষ্মীকে বলে সে বারো বৎসর ধরে

তাঁর পুজো করে তার ভাগ্য এমন কেন? মা লক্ষ্মী দেখা দিলে সে প্রার্থনা করে তার যেন রাজার মতো দিন কাটে। মা লক্ষ্মী তাকে সেই বর দিলেন। সে হঠাৎ একতাল সোনা পেয়ে গেল। সেই সোনা বিক্রি করে সে জিনিষপত্র আনাল, ঘরবাড়ি তৈরী করল এবং খেপার মা-কে দিয়ে ডাক্তারকে ডেকে পাঠাল। ডাক্তার মাথার ছিট ভালো করতে পারে জেনে লোক জন ডেকে খেপাকে খুঁজে আনাল এবং চিকিৎসা করিয়ে তার পাগলামি সারাল। তারপর একদিন তার কাছে নিজের পরিচয় দিয়ে সে তাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিল যে সে যা বলবে তাই তাকে শুনতে হবে। সে রাজি হল। এদিকে মা-লক্ষ্মীর কৃপায় পুষ্পবতীর ধনসম্পদ দিন দিন বাড়তে লাগল। সে একটি ঘোড়া কিনে স্বামীকে বলল সদর দরজায় প্রণাম করে আসতে। স্বামীটি তাই করল। কিছুদিনের মধ্যেই ঘোড়ায় চেপে গড়ের চারপাশে ঘোরা এবং সদর দরজায় প্রণাম করার খবরটি রাজার কানে গেল। রাজা তাকে ডেকে পাঠাল এবং তার এই ঘোরার উদ্দেশ্য জানতে চাইল। সে জানাল সে গরীব ভিখারির ছেলে রাজার কাছে চাকরি পাবার জন্যেই এমন করছে। রাজার দুর্মতি ধরল এবং বলল যে কাছারির সময় আসবি। একটা কথা বললে একশো টাকা পাবি। ছেলেটি এসে পুষ্পবতীকে সব কথা জানাল। পুষ্পবতী মনে মনে বলল যে সে এবার দেখবে যে রাজা কেমন বাবা এবং সে কেমন ঝি।

এদিকে খেপাকে (তখন অবশ্য সে আর ক্ষ্যাপা নয়) প্রতিদিন একশো টাকা দিতে গিয়ে রাজার ফতুর হবার যোগাড়। রাজা ভাবতে লাগল কিভাবে তার চাকরী শেষ করা যায়। মরুভূমিতে শিকারে যাবার বুদ্ধি যোগাল মন্ত্রী। সেখানে একে জল আনতে বলা হবে। আনতে না পারলে গুলি করে মেরে ফেলা হবে। বাড়িতে গিয়ে পুষ্পবতীকে এই সংবাদ দেওয়ার পর পুষ্পবতী ঠিকই বুঝতে পারল যে রাজা তার স্বামীকে মেরে ফেলতে চায়। সে স্বামীকে দুটি মিষ্টি ও দুটি পান তৈরী করে দিল এবং বলল রাজা জল আনতে বললে তুমি একটি মিষ্টি ও পান রাজাকে খেতে দেবে আর একটা নিজে খাবে। রাজা সেই পান মিষ্টি খাবার সঙ্গে সঙ্গে তার ক্ষুধাতৃষ্ণা সব দূর হয়ে গেল। রাজা জানতে চাইল এগুলি কে বানিয়েছে? খেপা জানাল যে এগুলি তার স্ত্রীর হাতের তৈরি। শুনে রাজার মধ্যে আবার পাপবুদ্ধি দেখা দিল। ভাবল এমন গুণবতী যে নারী সে নিশ্চয়ই রূপবতীও হবে। যদি তাই হয় তবে সে তাকে ধরে নিয়ে আসবে। রাজা ছেলেটিকে বলল যে সে তার বৌ-কে দেখতে যাবে। ছেলেটি বাড়িতে এসে বৌ-কে এই কথা বলতে সে বলল যে একা রাজা এসে তাকে কি দেখবে। রাজা তার লোক লস্কর নিয়ে আসুন আর সব দেখে যান। ছেলেটি রাজার কাছে গিয়ে বলল যেদিন ইচ্ছা সেদিনই আপনি লোক লস্কর নিয়ে আমার বাড়িতে আসুন। আমি নিজে এসে আপনাকে নিয়ে যাব। রাজা তাকে বলল সে যদি রাজ সম্মান রক্ষা করতে না পারে তাহলে গুলি খেয়ে মরবে।

পুষ্পবতী মা লক্ষ্মীর শরণাপন্ন হল এবং তাঁর কৃপায় রাজার উপযুক্ত অভ্যর্থনার আয়োজন করল। রাজা এসে দেখল সে কী রাজা। এরা তো রাজার রাজা। পুষ্পবতী শুধুমাত্র সায়াটি পরে আলুলায়িত কেশে রাজার কাছে খাবার নিয়ে এল। রাজা তাকে দেখে অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত (এখানের ভাষায় আচাকা) হল। পুষ্পবতী বলল রাজা বাহাদুর আপনি আমাকে দেখতে এসেছেন। আমি যা তাই দেখুন। আমার লুকোবার কিছু নেই। রাজা কেঁদে বলল, মা তুমি যেই হও তোমার মতো আমার একটি মেয়ে ছিল। সে চলে যাবার পর তার আর কোনো খোঁজ খবর পাইনি। তখন পুষ্পবতী নিজের পরিচয় দিয়ে জানাল যে সে সেই কন্যা। তার ভাগ্যে ছিল রাজভোগ। তাই সে পাচ্ছে এবং খাচ্ছে। রাজা তখন জামাই-এর পরিচয় জিজ্ঞাসা করল। পুষ্পবতী জানাল সেই চাকর যাকে রাজা গুলির অর্ডার দিয়েছেন। সকলের মিলনের মধ্যে দিয়ে কাহিনীটি শেষ হচ্ছে। মনস্ক পাঠক কাহিনীটির সঙ্গে শেক্সপীয়রের কিং লীয়র নাটকের একটা সাদৃশ্য পেলেও পেতে পারেন।

তথ্যসূত্র ঃ-

১। চিত্তরঞ্জন লাহা তাঁর 'ধলভূমের লোককথা' প্রথম পর্বে বলেছেন— গরুর পাল অভিযোগ জানাতে গিয়েছিল ভগবানের কাছে। বঙ্কিম মাহাতো তাঁর 'ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্য' গ্রন্থে বলেছেন তারা গিয়েছিল মহাদেবের কাছে। লোকায়ত সংস্কার সংস্কৃতির কথা স্মরণ রাখলে বঙ্কিম বাবুর কথাই ঠিক মনে হয়। গরু তো মহাদেবেরই বাহন। তিনি বৃষভবাহন।

২। করম ঠাকুরের ক্রুদ্ধ হওয়ার আরেকটি কারণের কথাও এই ব্রতকথায় শোনা যায়। করমু এবং ধরমু দুই ভাই একসঙ্গে থেকে চাষ আবাদ করে সুখে বসবাস করতো। একবার ধরমু যখন মদ হাড়িয়া খেয়ে রাতভোর করম পুজার নাচে বিভোর তখন করমু বাইরে থেকে এসে এইসব দেখে প্রচণ্ড রেগে গিয়ে করম ঠাকুরকে লাথি মেরে দূরে ফেলে দিল। সে কারণেই করম ঠাকুর করমুর প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ এবং ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। করম গাথার এই পাঠান্তরটি আমাদের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কথা স্মরণ করায়। ধনপতি সদাগর লাথিমেরে চণ্ডীর ঘট ভেঙে দিয়ে চরম বিপত্তির সম্মুখীন হয়েছিল।

বিহারের লোককথার স্বরূপ সন্ধানে

শর্মিলা বাগচী

লোকসাহিত্য চর্চা বিহারের সম্প্রতিকালের ফসল। অথচ পত্র-পত্রিকায়, গেজেটিয়ারে (বেশীরভাগই বিদেশী প্রয়াসে) নানা তথ্য, বিবরণ এবং কাহিনী প্রায় একশো বছর ধরেই ছাপা হয়েছে। হিন্দীর পাশাপাশি ভোজপুরী, মৈথিলী, অঙ্গিকা (ভাগলপুর অঞ্চলের লোকভাষা) এবং ঝাড়খণ্ডীতে বহু গল্প স্মৃতির সরণী ধরে দীর্ঘকাল থেকেই চলে আসছে। বলাই বাহুল্য অন্য প্রদেশের তুলনায় এরা কম সুখশ্রাব্য নয়।

তথ্যের সঙ্গে তত্ত্বের সংযোজনে এরা মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের অমূল্য দলিল। নৃতত্ত্ববিদ্যার অনন্ত ভাণ্ডার! হিন্দী এবং ইংরেজীতে তিন-চারটি গল্প সংগ্রহের খোঁজ পেয়েছি। এর অধিকাংশ কাহিনী ছোটনাগপুর এবং সাঁওতাল পরগণার প্রচলিত লোকপরম্পরা সূত্রের উপর আধারিত। রেভারেণ্ড পি. ও. বোডিং সাঁওতাল সমাজে অনেক ঘোরাঘুরি করে বেশ কয়েকটি গল্প সংগ্রহ করেন। এই বিদেশী মহানুভবের কাছে আমাদের ঋণ আজও অপরিশোধ্য।

তারই ফলশ্রুতিতে ১৯১৫ সালে অস্‌লো থেকে প্রকাশ পায় সাঁওতালী গল্পের তিন খণ্ডের গ্রন্থ। ১৯২৫ মে 'Studies in Santhal Medicine and connected folklore'—প্রকাশক এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল। একই সময়ে ফাদার হান তাঁর প্রবাস বাসের অক্ষয় সঞ্চয় আমাদের হাতে তুলে দেন। যাতে আছে ছোটনাগপুরের এক বিশেষ জনজাতির অতীতাশ্রয়ী জীবন কথা। মূল গ্রন্থটি অবশ্য দুষ্প্রাপ্য। তবে তার পরবর্তী সংস্করণ ফাদার এ. গ্রিগনাভ এবং আরও অনেকের প্রচেষ্টায় দিবালোকের মুখ দেখে ১৯৩১ নাগাদ।

খোঁজ নিয়ে জেনেছি কথা-কাহিনী প্রায় ষাট বছর আগেই প্রকাশিত হয়। ধর্মযাজক সম্প্রদায়ের ব্যাপক কৌতূহল এবং অনুসন্ধানের তারা সন্তান। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে প্রথম সন্ধান পাই এদেরই, দক্ষিণ বিহারের ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে। ফ্যান্টাসীর পাখায় ভর দিয়ে Utopia-র রাজ্যে মানুষের অবাধ গমনাগমন এবং অকৃতকার্য জীবনের মনোবাসনার সার্থক প্রতিরূপ আছে এইসব গল্পে। ছড়া, গীত, নানা প্রথার বর্ণনায় সমৃদ্ধ। দুঃখের বিষয় আজ তারা ব্রাত্য—অপাংক্তেয়। বর্তমান প্রজন্মের কাছে মূল্যহীন! অথচ বিবর্তনের প্রকৃত ইতিবৃত্ত তারাই! প্রয়োজন আছে তাদের পুনরাবিষ্কারের, মূল্যায়নের।

গাঁওবুড়োরা সেকালে বট/অশ্বত্থের ছায়ায় দণ্ড হাতে ছেলেমেয়েদের যেসব গল্প শোনাতেন, তাদের মধ্যেই লুকিয়ে আছে ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস। মহেঞ্জদরোর পতনের পর City of Skulls -এর বেঁচে বর্তে থাকা মানুষগুলির কথা ইতিহাস ভুলে গেছে। কিন্তু গল্পগুলির সূত্র ধরে তাদের খোঁজ মিলতেও পারে পাহাড়-বনানী ঘেরা লোকচক্ষুর প্রায় অন্তরালে সদা গুঞ্জিত গল্প রাজ্যে!

"টুডু রাজা, সোরেন সেনাপতি।"

—এরা কারা? সাঁওতাল সমাজের পুরোহিত যখন বিবাহ বা অন্য মাঙ্গলিক ক্রিয়াকর্মে নিজেরও পক্ষে দুর্বোধ্য মন্ত্রোচ্চারণ করেন, তার আগে যে সব গীতের মধ্যে অতীত জীবনের জয়গাথা উচ্চারিত তাদের সব কিছুর মধ্যেই আছে বিস্মৃত সমৃদ্ধশালী এক জনপদ এবং তাদের পুণ্যশ্লোক রাজার কথা। যিনি অমিত বীর্য, দুর্ধর্ষ বীর। কিন্তু কে তিনি? সেই জায়গাটাই বা কোথায়?

পুরোহিত অপারগ। কারণ "সে ভাষা গিয়াছি ভুলিয়া।" শুধু কান্না হয়ে ঝরে পড়ে এক নাম না জানা বেদনা।

তবুও অতীতের কোলে আজও বেঁচে থাকে মানুষের অজানা স্মৃতি। ডব্লু. আর. গোলে দীনেশচন্দ্র সেনের 'Folk literature of Bengal' সম্পর্কে বলেছিলেন, একথাই সত্য যে ভারতবর্ষের সহস্র বর্ষ প্রাচীন গণজীবন খুব অল্পই বদলেছে। কথাটির সত্যতা অন্তত বিহার প্রসঙ্গে অগ্রাহ্য করা যায় না।

তবে খুব কাছ থেকে বিহারের জনজীবন বা গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থাকে যারা দেখেছেন, তারা বলেন ১৯২০ সালের পর এখানকার জীবনের অনড় চাকায় অবশ্যই লেগেছে গতির জোয়ার। যেমন পুরাণ অথবা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে যদি দেখি, তা হলে দেখব বৌদ্ধযুগের প্রচলিত, যব মণ্ডের পিষ্টক যেমন বর্তমানে 'ঠেকুয়া'র রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে, তেমনি প্রায় কম-বেশী কাহিনীতেই পাটুলীপুত্রের প্রাধান্য। এখানকার বিষ্ণুশর্মা নামক ব্যক্তি যেসব নীতিশিক্ষার গল্প বলতেন, সেগুলি পরবর্তীকালে ফারসী, আরবী, হিব্রু, গ্রীক এবং সিরিয়ার গল্পে পরিবর্তিত পটভূমি এবং ভূমিকায় পরিবেশিত হয়েছে।

গল্পগুলি পশুপক্ষী ও মানুষকে নীতিশিক্ষা দেয়। বয়সে তারা ঈশপের অগ্রজ সম্মানীয়। মগধ, গুপ্তকালের গৌরব সূর্য অস্ত গেলে পূর্বাচলে উদিত হয় পাল বংশের জয়গাথা। কিন্তু এরই ফলে বিহারের মাটিতে জন্মগ্রহণ করে মিলিত সংস্কৃতি। বাংলার মনসা এবং বেহুলা স্থান বদল করে ভাগলপুরের চম্পানগরবাসী হন। বিহারী মেয়ের মেটে সিঁদুরে সিঁথি রাঙিয়ে লখীন্দর পরিচিত হন 'বালা' নামে।

গোমুখের উৎস ছেড়ে উপলব্যথিত গতিতে অবশেষে নদীর ঠাঁই হয় সাগরে। সুতরাং অতীত অস্পৃশ্য নয়। মানুষের অস্তিত্বের মূলেই আছে সে। সুতরাং কোন স্পর্ধায় তাকে অস্বীকার করবে আধুনিক মানুষ! এদের মধ্যে আছে গুহাবাস ছেড়ে

আদি মানুষের গোষ্ঠীগত জীবনে প্রবেশ, পশুপক্ষী আর মানুষের অনৈসর্গিক সম্পর্ক। অর্থাৎ সংক্ষেপে যাযাবর বৃত্তি ছেড়ে কৃষিধর্মী জীবনে অভ্যস্ত হবার গল্প। দৈব নিগ্রহের আওতায় তাদের জীবনের ছোট ছোট সুখ-দুঃখের গল্প।

সারঙ্গ-সদাব্রজের গল্প

এক রাজার একটিই ছেলে। নাম সদাব্রজ। এক ছিল বেনে। তার একটি মাত্র কন্যা, সারঙ্গী। সারঙ্গী সদাব্রজের ছোটবেলার মিতেনী। একজন আর একজনকে ছেড়ে থাকতেই পারত না। শৈশবের ভালবাসা যৌবনে প্রেমে হল পরিণত। কিন্তু মানুষ তা মানবে কেন? হাজার হোক সদাব্রজ তো রাজার ছেলে। কথায় বলে না, "কাঁহা রাজা ভোজ আউর কাঁহা ভোজবা তেলী"!

দু'জনে এতদিন একই পাঠশালায় পড়ত। কিন্তু রাজার কানে কথাটা ওই পণ্ডিতমশাই তুলে দিল। রাজা তক্ষুনি পড়া দিলেন ছাড়িয়ে। আর বেনেও ভয়ে ভয়ে সারঙ্গীর অবিলম্বে স্বজাতির মধ্যে বিয়ে দেবার চেষ্টা শুরু করল।

মেয়ের চোখে জল, মন অন্যমনস্ক। বাপ শুধোয় একা একা কোথায় ঘুরিস? মেয়ে ভয়-ডর ঝেড়ে বলে, সে সদাব্রজকেই বিয়ে করবে।

ভয়ে বেনের মুখ এতটুকু হয়। যদি রাজার কানে ওঠে। তখন তো শূল ছাড়া গতি নেই। তাই মেয়ের বিয়ে হয় অনেক দূরের গ্রামে। মনের কষ্ট মনে চেপে পালকী চেপে সারঙ্গী রওনা দেয়। রাস্তায় একটা মন্দিরের সামনে বাহকদের থামতে বলে। সে এই মন্দিরে ভগবতীর পুজো দেবে। মেয়েটি ভেবেছিল হয়ত সদাব্রজ এখানে আসে, তাই দেখা হতেও পারে। সদাব্রজের দেখা না পেয়ে আঙুল চিরে রক্ত বার করে লেখে—

ওগো জেনে রেখো
ধগরা নামে নগরে
আমার শ্বশুরের বাস
এখন থেকে আমারও বাস।

কিছুকাল পরে সদাব্রজ সেই মন্দিরে আসে, দেবীর প্রসাদে সারঙ্গীর চিঠিও পায়। সব শুনে নিজে আত্মঘাতী হতে গেলে দেবীর দৈববাণী ভেসে আসে—'নিরাশ হয়ো না, তোমার চিঠিতে যা লেখা আছে মন দিয়ে পড়।' সদাব্রজ কাগজের লিখন পড়ে খুঁজতে খুঁজতে সারঙ্গীর গ্রামে আসে।

গ্রামের বাইরে অশ্বত্থ গাছের নীচে বিশ্রাম নিয়ে সাধুর বেশে গ্রামে প্রবেশ করে গান ধরে—

অনেক দূর থেকে তোমাদের গাঁয়ে এসেছি যোগী।
সদালাল ব্রিজলাল
তোরি জন্য ওরে ও কেনে
আজ আমার এই হাল।

সারঙ্গী গান শুনেই সব বুঝে ফেলে। অনেক ভেবেচিন্তে, ঘুরে ঘুরে সদাব্রজের দেখা পায়। তারপর তাকে বলে, একটা সাপ মেরে আমার ঘরে ফেলে দাও। আমি অজ্ঞান হবার ওষুধ খাচ্ছি। তাই হল। সারঙ্গীর এক ননদ সকালে উঠে দেখে সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। তার হাহাকার শুনে গ্রামের সব মানুষ ছুটে আসে। কিছুতেই আর তার সংজ্ঞা ফেরে না।

তখন সাধুবেশধারী সদাব্রজ এসে বলল, সে পারে। কিন্তু পথ খুব কঠিন। পাঁচদিন ধরে মন্ত্র জপতে হবে। এবং সেই পাঁচদিন মেয়েটিকে জঙ্গলে ছেড়ে আসতে হবে। সবাই অগত্যা সাধুর কথা মেনে নেয়। সারঙ্গীর সঙ্গে খাবারদাবার দিয়ে জঙ্গলে ফেলে আসে। সারঙ্গীরও খুব তাড়াতাড়ি হুঁশ ফেরে। তারা অতি দ্রুত পাঁচদিনের মধ্যে অনেক দূরে চলে যায়। এবং তারপর পরমসুখে দিন কাটাতে থাকে।

বেহুলা

অঙ্গপ্রদেশের গোঠ বৈশ্য জাতির পরম প্রতাপশালী চান্দ বনিয়া (বেনে)। মনসাকে তার ভাল লাগত না। কিছুতেই তার বশ্যতা স্বীকার করে পূজা দেবে না। তাই তো তার সাত ছেলেকেই মরতে হল সর্প-দংশনে। অষ্টম সন্তান জন্মালে নাম রাখেন 'বালা'।

শিবভক্ত চান্দ তাঁর ছেলের বিবাহ স্থির করেন চম্পানগরেরই এক বেনের পরিবারে। এদিকে মনসাও বসে নেই। লখীন্দরকে বিবাহের রাতেই দংশন করবেন স্থির করেন। তাই সওদাগরও এক ছিদ্রহীন লোহার কক্ষ গড়ান।

যে সাপটিকে এই উদ্দেশ্যে মনসা পাঠালেন সে বেহুলার নবীন বয়স দেখে দুঃখিত হয়। এদিকে আগেই মনসা এক কর্মকারকে ভয় দেখিয়ে লৌহবাসরে অতি সূক্ষ্ম ছিদ্র করিয়েছেন। সাপটি লখীন্দরকে কামড়াতে অস্বীকার করলে মনসা তাকে অভিশাপ দেবেন বলেন। অগত্যা সাপটি বেহুলার স্বামীকে কামড়ায় এবং সে মারা যায়।

বেহুলা কিছুতেই তার পতিকে সৎকারের জন্য নিয়ে যেতে দেবে না। অগত্যা কলার ভেলায় করে গঙ্গায় তাদের উভয়কেই ভাসানো হয়। সুন্দরী বেহুলা কলার মান্দাসে ভেসে যায়। পথে অনেকে তাকে বিরক্ত করে। কিন্তু সে নির্বিকার। স্বামীর পচাগলা শরীর নিয়ে সতী বেহুলার এই যাত্রায় এক সময় দেবতাদের মনও হয় দ্রবিত। তারাই অনুরোধ জানান মনসার কাছে, লখীন্দরের প্রাণ ফিরিয়ে দিতে। মনসাও রাজি হন। চান্দ সওদাগর মনসার কাছে কৃতজ্ঞ হন এবং তাঁর পূজায় মুক্ত মনে যোগ দেন।

[বিহারে নাগপূজার প্রচলন বহুদিন থেকে চলে আসছে। বিশেষ করে ভাগলপুর, পূর্ণিয়া, চম্পারণ ইত্যাদি স্থানে। অনেক প্রাচীন ধ্বংসস্তূপে সর্প মূর্তি পাওয়া গেছে। নালন্দায় প্রাপ্ত চতুর্ভুজ নারীমূর্তি পঞ্চসর্পের মণ্ডপে অবস্থিত। ভাগলপুরে স্বতন্ত্রধর্মী চিত্র শিল্পকলা 'মঞ্জুষা'র উৎসও বেহুলার লোককথা।]

নদীর সাপ

বহুকাল আগে জনৈকা স্ত্রীলোক পদব্রজে অনেক দূরের এক গ্রামে যাচ্ছিল। পথে এক নদীর পাড়ে বসে তার চিন্তা হয়, কিভাবে নদী পার হবে। কারণ নদী জলে টইটুম্বুর। এদিকে একটি নৌকাও নেই। বেচারী বড় চিন্তায় পড়ে।

এমন সময় এক বিশাল সাপ নদী থেকে বার হয় আর বলে—'মা আমি যদি তোমায় নদী পার করে দি তবে কী দেবে? যদি না দাও তাহলে পার করব না।'

নারীটি গর্ভিনী ছিল। তাই বিপদ দেখে কিছু না ভেবেই বলে, 'যদি আমার মেয়ে হয় তবে তোমার সঙ্গে বিয়ে দেব। ছেলে হলে সে তোমার মিতা হবে।' সাপ এই শুনে খুশী হয়ে তাকে পিঠে চড়িয়ে নদী পার করায়।

কিছুদিন পর একটি মেয়ে হলেও সে সব কথা ভুলে যায়। আর কেটেও যায় বহুবছর। একদিন সে গেছে নদীতে জল তুলতে এমন সময় ভুউশ করে সাপ ভেসে উঠে বলে, 'ওমা আমার কনে কই?' স্ত্রীলোকটির সব কথা মনে পড়ে যায় আর তখুনি বাড়ি গিয়ে মেয়েকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে। সাপ তাকে নিয়ে নদীর তলায় যায়। ক্রমে ক্রমে তাদের চারটি সন্তান জন্মায়।

সময় বয়ে যায়। একদিন মেয়ের বড় মন কেমন করে বাপের বাড়ির জন্য। এদিকে তার মা সকলকে বলেছিল সে নাকি নদীতে ডুবে গেছে। এতদিন পর জীবন্ত অবস্থায় তাকে দেখে সকলেই হতবাক। সে তখন সবাইকে বুঝিয়ে বলে, আমি ডুবিনি। জলের তলায় সংসার করছিলাম। আমার চারটি সন্তানও আছে। ভাইরা কিন্তু এসব শুনে মোটেও খুশী হল না। আমাদের বোন কিনা শেষে সাপ হবে?

বোনকে বলে সাপকে তারা দেখতে চায়। সে বলে, নদীর ধারে যাও, ডাক পাড়ো; সে অমনি উঠে আসবে। তাই হল। সাপ এল। ভাইরা তাকে নিয়ে বাড়ি এল। তারপর বড় হাঁড়িতে খাতির করে মদ দিল। সাপ তা পান করেই অচেতন হয়ে গেল। তখন সব ভাইরা একসঙ্গে তার গলায় মারল কোপ। সাপও মরল আর বোনটিও তার ভাইদের সংসারে সুখে বাস করতে লাগল।

রাজকুমার ও নাপিত মিতে

সে অনেকদিন আগের কথা। এক রাজপুত্রের সঙ্গে নাপিতের ছেলের ছিল প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। এদিকে রাজার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী, সতীন তাকে দু'চক্ষে দেখতে পেত না। রোজ তার নামে রাজার কাছে নালিশ করত। অতিষ্ঠ হয়ে রাজা একদিন ছেলেকে নির্বাসন দণ্ড দিলেন। রাজপুত্র পিতৃআজ্ঞা মেনে নাপিত বন্ধুকে নিয়ে দেশান্তরী হল। নাপিত ক্ষৌরকর্ম করে আর রাজার ছেলে এক মহাজনের কাছে চাকরী নিয়ে কোনোক্রমে দিন চালাতে লাগল। বেজায় কষ্টে তাদের দিন কাটে। মহাজনের অদ্ভুত শর্ত। প্রথমত রাজপুত্র সারাদিন অক্লান্ত খেটে দিনান্তে একমুঠো ভাত পাবে। দ্বিতীয়ত কোনো কারণে

চাকরী ছাড়লে তার শরীর থেকে আধুলির মাপে চামড়া কেটে নেবে।

আর সহ্য করতে না পেরে একদিন সে চাকরী ছেড়ে দেবার মনস্থ করে। কিন্তু শর্তও যে কঠিন। তবুও তো সে রাজার ছেলে। তাই বন্ধুকে বলে, যাও গিয়ে মহাজনকে বল যেন আমার আধুলি সমান চামড়া কেটে নেয়।

নাপিতের ছেলে বন্ধুর দুঃখে কাতর হয়ে ভাবে দুষ্ট মহাজনকে সে-ও দেখে নেবে। এই ভেবে সে ছদ্ম পরিচয়ে মহাজনের কাছে চাকরী নেয়। তার সঙ্গেও সেই একই শর্ত হয়। এদিকে মহাজনই তাকে তাড়িয়ে দেয়। তখন শর্ত অনুযায়ী নাপিত মহাজনের চামড়া কেটে নেয়। তার প্রতিহিংসা পূর্ণ হয়।

এরপর দুই বন্ধু শৃগালদের দেশে আসে। সেখানকার রাজা তখন গুহায় ছিল ঘুমিয়ে। নাপিত করল কি, সেই অবস্থাতেই তার মাথা দিল মুড়িয়ে। আর নিজেরা অন্য একটা গুহায় লুকিয়ে থেকে লক্ষ্য করতে লাগল রাজা কী করে।

ঘুম ভেঙে উঠে শেয়াল তো ভীষণ ভয় পেল। এটা অপদেবতার কাণ্ড নয় তো? এমনও ভাবল। বেচারা ভাবতে ভাবতে পথ চলছে। এমন সময় এক ভাল্লুকের সঙ্গে দেখা। রাজা তাকে সব কথা খুলে বলল। শুনে-টুনে ভাল্লুক বলে, না ভায়া এমনটা তো মনে হয় না। নিশ্চয় এ অন্য কারুর কাজ। আবার তারা সেইখানে গেল। নাপিত বুদ্ধি করে একটা খালি গরুর গাড়ি সেখানে রেখে এসেছিল। ভালুক তো সে গাড়ি লাফিয়ে পার হতে গেল। কিন্তু তার আগেই নাপিত তার লেজ চেপে ধরে, আর রাজপুত্রও বেশ করে তলোয়ার দিয়ে তাকে ক্ষতবিক্ষত করে। শেয়াল-রাজা ভাবে বাপরে বাপ। ভালই হল। ভূতের হাত থেকে শেষে কিনা ভালুকের হাতে পড়ছিলাম। এইসব সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে বাড়ির পথ ধরে' পথে আবার এক বাঘের সঙ্গে দেখা।

বাঘকেও সে সব কথা খুলে বলল। তারপর তাকে নিয়ে ঠিক ভালুকের মতই নিজের গুহার সামনে এল। বাঘ ও ভাল্লুকের মত যেই গাড়িতে চড়েছে অমনি রাজকুমার তাকে ও শৃগালকে তরবারির আঘাতে ছিন্নভিন্ন করে দিল। তারপর মহাজনের দ্বারা ছিন্ন চামড়ার জায়গায় নাপিত শেয়ালের চামড়া রাজপুত্রের গায়ে প্রতিস্থাপন করে দিল।

[এই গল্পে জনজাতি সম্প্রদায়ের অপদেবতা সংক্রান্ত চিন্তাভাবনার প্রভাব আছে। সাঁওতাল পরগণার মানুষজন 'সিংবোঙ্গা'-কে অত্যন্ত সমীহ করে]

বুদ্ধিমতী বৌ

একজনের ছিল সাত ছেলে। তারা বড় হলে গৃহস্থ মানুষটি তাদের বিয়ে দিলেন। সব চেয়ে ছোট বৌ ছিল সাত বৌয়ের মধ্যে সবথেকে চতুর। একদিন সে তার শ্বশুর, ভাশুর, জা, শাশুড়ি সকলকে ডেকে বলল, এই গ্রামে এত বড় পরিবারের ভরণ-

পোষণ অত্যন্ত কঠিন। তাই অন্য গাঁয়ে যাওয়াই ভালো। তার কথা শুনে সকলেই জিনিসপত্র নিয়ে অন্য গাঁয়ে এল। কিন্তু সেখানে ভারী গণ্ডগোল চলছিল। ব্যাপারটা হলো কি, সে দেশের রাণীর একখানা গলার হার গেছিল চুরি। রাণী স্নানের সময় গলার হারখানা কুয়োর ধারে খুলে রেখেছিলেন। এমন সময় একটা চিল ছোঁ মেরে সেখানি নিয়ে এমন জায়গায় ফেলল যেখানে সাত ছেলে, বৌ আর তাদের বাপ শুয়েছিল। একমাত্র ছোট বৌ তা দেখল আর সঙ্গে সঙ্গে সেখানা সরিয়ে ফেলল।

এদিকে রাণীর কান্না থামে না। না জানি কি অনিষ্ট হবে এইভেবে। উতলা রাজা তখুনি হুকুম দিলেন ঢোল পিটিয়ে হুকুম দিতে যে এই হার যে এনে দেবে তাকে তিনি জমিদারী দেবেন। ছোট বৌ ঘোষণা শুনেই রাজার কাছে গিয়ে হারছড়া তাঁকে দিল। রাজা অবাক হয়ে শুধোলেন 'মা এই হার তুমি কোথায় পেলে? যদি জায়গাটা দেখাতে পার তবে তোমাকে আরও পাঁচখানি জমিদারী দেব।'

ছোট বৌ করজোড়ে উত্তর দিল—'রাজামশাই আমার পাঁচখানা জমিদারী চাইনা। শুধু আপনার কাছে একটি মিনতি আছে।' রাজা বললেন নির্ভয়ে বলো। মেয়েটি বলে, কথা দিন পূর্ণিমার রাতে আর কোথাও দীপ জ্বলবে না শুধু আমাদের বাড়ি ছাড়া।

রাজা হেসে বললেন, এ আর এমন কি প্রার্থনা। অবশ্যই মঞ্জুর হবে। এদিকে তার নির্বুদ্ধিতার জন্য শ্বশুরবাড়ির সকলেই তাকে বকাবকি করতে লাগল। বৌ শুধু মুচকি হাসল। এক সপ্তাহ পরে এল সেই রাত। স্বর্গের দেবী কোথাও আলো দেখতে না পেয়ে জন্তু জানোয়ারের পাল নিয়ে বৌ-এর বাড়ি এলেন। তার ফলে ধনসম্পদ গবাদি পশুতে ভরে উঠল তাদের ঘর। বৌ জিজ্ঞাসা করল, 'বল তো ঠিক করেছি কি না?'

[সাঁওতালদের উপকথায় আছে দেব-দেবীরা উপযুক্ত মানুষকে উপহার দেবার জন্য পূর্ণিমার রাতে পশু-পাখী নিয়ে ঘুরে বেড়ান]

সৃষ্টির সূত্রপাত

[ছোটনাগপুরের লোকবিশ্বাসে এখানে একসময় প্রাক অস্ট্রেলিক জনজাতি মুণ্ডাদের আধিপত্য ছিল।]

প্রথমে কোনো মানুষ ছিল না। ছিল শুধু জঙ্গল আর জল। অবশেষে মহাদেবের ইচ্ছেয় এখানে জীবজন্তু দেখা দিল। পার্বতীর সঙ্গে পরামর্শ করে শিব স্থির করলেন তিনি নিজের প্রতিরূপ মানুষ সৃষ্টি করবেন।

যাক প্রথমে অশ্বের সৃষ্টি করলেন। তবে প্রাণদান করলেন আঠারো মাস পর। এই কারণেই অশ্ব শিশু আঠারো মাস পরে ভূমিষ্ঠ হয়। এরপর মানুষের মূর্তি গড়লেন। কিন্তু মানুষ পাছে ঘোড়াকে পদানত করে তার পিঠে চড়ে ঘোরে, তাই ইচ্ছা করেই ঘোড়া দিল তাকে গুঁড়িয়ে। ঈশ্বর সব দেখে সৃষ্টি করলেন এক কুকুর। মানুষের মূর্তিটিকে পাহারা দিতে।

কুকুর নির্মাণে আবার ঠিক দু-মাস লাগল। এই কারণেই কুকুরের বাচ্চা হতে সময় নেয় আড়াইটি মাস। শেষে নয় মাস ধরে গড়লেন মানুষের পূর্ণ মূর্তি। এরপর সৃষ্টি করলেন নারী। তখন এরা দু'জনে মিলে অনেক শিশুর জন্ম দিল। ক্রমশ সংখ্যায় তারা এত বৃদ্ধি পেল, যে নিজেদের মধ্যে মারামারি শুরু করল।

মহাদেবের কানে যেমনি এই কথা গেল, তিনি ভীষণ রেগে গেলেন। ফলে পৃথিবীতে অগ্নিবৃষ্টি শুরু হল। সবাই প্রায় পুড়ে ছাই হল। তারপর শিব-পার্বতী পৃথিবীতে এসে খুঁজতে লাগলেন, কেউ কোথাও বেঁচে আছে কিনা। অনেক খোঁজাখুঁজির পর ঝোপঝাড়ের মধ্যে একটি গর্তে ভাই ও বোনকে আবিষ্কার করলেন। তারা নিজেদের সম্পর্ক ভুলে গেল। এরাই হল পৃথিবীর প্রথম মানব-মানবী।

সহায়ক গ্রন্থ

১। Hinak—Studies in Santhal Medicine and connected Folklore

২। Folklore of Bihar—P C. Roychowdhury

৩। পরী কথা—T. Benfal.

উত্তর-পূর্ব ভারতের লোক ঐতিহ্যে বাঘ ও লোককথায় বাঘ-মানব ও বাঘ-মানবী প্রসঙ্গ

সুধীর কর

উত্তর-পূর্ব ভারতের তিব্বত-বর্মী উপজাতি বা আদিবাসীরা মূলত ইন্দো-মঙ্গোলয়েড জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন শাখা প্রশাখার উত্তর পুরুষ। খাসিরা জাতিগত পরিচয়ে ইন্দো-মঙ্গোলয়েড হলেও ভাষিক পরিচয়ে মন্‌খেমর (অস্ট্রিক বা অস্ট্রো-এশিয়াটিক)। সার্বিক ভাবেই এই ভূখণ্ডের আদিবাসীদের লোক-জীবন ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রটি মিশ্র উপাদানে সমৃদ্ধ হলেও তাদের মধ্যে অন্তর্লীন এক যোগসূত্র রয়েছে। উনিশ শতকে কোম্পানী আমলের শাসন কাল থেকে ক্রমে খৃষ্টধর্ম প্রচারের ফলে তাদের জীবনধারা ও সংস্কৃতির মধ্যে পরিবর্তন ঘটতে থাকলেও কিছু কিছু জনগোষ্ঠী তাদের আদিম বিশ্বাস, লোকাচার ও সংস্কার নিয়ে আজও চলমান।

তাদের ধর্ম, অনুশাসন, রীতিনীতি ও বিশ্বাস এবং এ ক্ষেত্রে তাদের সামগ্রিক অবস্থান নিয়ে পর্যালোচনা করে E.A Gait জানান যে, "The religious beliefs of the hill tribes of this frontier is the extraordinary uniformity of principle which underlies them all, and which they share in common not only each other and with the north Turanian tribes, but also with the Dravidians of southern India. There can be greater mistake than to assume that each tribe has its own individual beliefs, differing widely from those of others and circumscribed by the narrow tribal limits. The facts are quite the reverse, and the religion of these tribes— Shamanism, Animism, Nat worship, or whatever name may be applied to it- is everywhere practically the same. There are differences, it is true, but there are differences of practice or detail rather than of fundamental principles, and are far less important than those divide the Saktas from the Vaishnavas, or Unitarians from the members of the Salvation Army....

The Animist population of Assam is 969,765, or 17.70 percent of the total number on inhabitations.. The largest portion of NAT worshippers in North Lushai and the Naga Hills, where it amounts to over 95 percent of the total population. The Khasi and Haintia Hills (percent Meghalaya) follow closely with 93 percent. Next come

North Cachar, where the conversion of Kacharies to Hinduism has brought the number of Animistics down to 56 percent. In the plain districts, the proportion is highest in Nowgong, also considerable in Darrang, Gopalpara, and Kamrup. In the other districts the numbers are very small... the spread of education and the influence of Hinduism is Yearly reducing the number of persons who still cling to the superstitions of their forefathers, and it seems probable that in time demon worship as a form of religion will disappear from the province." (The Nagas in the Nineteenth Century : Elwin, p. 510-11)

উত্তরপূর্ব ভারতের এই আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে পরম্পরাগতভাবে প্রচলিত মৌখিক ঐতিহ্যবাহী লোককথা কিংবা লোকধর্ম ও সংস্কৃতির বৈভব বৈচিত্র্যগুলি সময়ের স্বাভাবিক নিয়মে বা প্রযোজনে পরিবর্তিত বা রূপান্তরিত হয়ে ক্রমে তা স্মৃতি থেকে হারিয়ে গেছে। এগুলি সংগ্রহের ক্ষেত্রে বাধা যেমন দুস্তর,তার অবশেষ যেখানে ক্ষীণ আশ্রয়ে ম্রিয়মান, সে অঞ্চলও দুরধিগম্য। ব্রিটিশ উপনিবেশিক আমলে গ্রীয়র্সন, জি.এইচ. দামান্ত, ডালটন, এলুইন গডউইন অস্টিন, এ. ডব্লিউ, ডেভিস এ, জে মোফাট মিল, ই.এ. গ্যাট প্রমুখ ইউরোপীয় প্রশাসক এবং নৃতত্ত্ববিদদের প্রচেষ্টায় উত্তর-পূর্বের উপজাতি বা আদিবাসীদের লোকজীবন ও সংস্কৃতির সঙ্গে ভারত সহ বিশ্বের পরিচয় ঘটে। স্বাধীনোত্তরকালে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর জাতিসত্তার নির্মাণ, আত্মনিয়ন্ত্রণ ও স্বাধিকারের প্রশ্নে সমগ্র অঞ্চলজুড়ে গরিমাময় অতীত ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধার ও তার ব্যাপক চর্চা দেখা যায়। এরই সূত্র ধরে লোককথার বৈচিত্র্যময় ভাণ্ডারটির কিছু কিছু সম্পদ আহরণ ও সংরক্ষণের উদ্যোগ গড়ে ওঠে এবং প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে গবেষণার কাজও শুরু হয়। এ সব নিয়ে যা কিছু আলোচনা বা প্রকাশনা তা প্রধানত ইংরেজিকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে। সাম্প্রতিককালে হিন্দি ভাষায়ও প্রচুর লেখালেখি চলছে। কিন্তু কেবলমাত্র ত্রিপুরা ছাড়া বাংলায় তেমন কিছু উল্লেখযোগ্য গবেষণার কাজ চোখে পড়ে নি।

আচার্য সুনীতিকুমার চ্যাটার্জি মিকির (কার্বি), কাছাড়ি, গারো, নাগা প্রভৃতি কোন কোন কিরাত জনগোষ্ঠীর লোককথার 'মোটিফ' প্রসঙ্গে তুলনামূলক আলোচনায় তাৎপর্যপূর্ণভাবে মন্তব্য করে লেখেন,— "There are some motifs which we find in common with Aryan folk-lore, and Austric folk-lore also" এই আলোচনায় তিনি কার্বি লোককথা 'হারতা-কুনয়ার', কাছাড়ি 'বণিক শিশু', গারো কাহিনী 'গুণঅই ও তার স্ত্রী', পক্ষি-কুমারী সিঙ্গুইল', আঙ্গামি নাগাদের লোক কথা—'জেশু কি ভাবে তার স্ত্রীর জন্য দেবি লাভ করেছিল' এগুলির মোটিফ নিয়ে বিচার করে এই বলে পরামর্শ দেন যে,—The study of Kerata myth and legend and folk-lore and folk-tales as well as poetry on the lines of

Verrier Elwin's study of Central Indian (Dravidian and Kol) myth and legend, cults and tales should be continued, for the indo-Mongoloid speeches and peoples, to find their proper place in the evolutions of Hindu myth, legend and cults." (Suniti Kumar Chatterjii : Kiratajana Kriti, p.180-182) লোক ঐতিহ্যে বাঘ ও লোককথায় বাঘ-মানব ও বাঘ-মানবী প্রসঙ্গে এই ইন্দো-মঙ্গোলয়েড জনগোষ্ঠীর মধ্যে এই আদি-মঙ্গোলীয় বিশ্বাস ও সংস্কারের বিবর্তিত নানা রূপের সন্ধান লাভ করা যেতে পারে।

এ প্রসঙ্গে মিজোদের প্রচলিত 'চাং-শিলি ও রুলপুই'র কথাটি উল্লেখ করা যেতে পারে। এই লোককথায় মহাভারতে বর্ণিত ভীমের বক রাক্ষস বধ কাহিনীর সাদৃশ্য রয়েছে। গ্রাম্য মেয়ে চাং-শিলি এক সাপের প্রেমে পড়ে গর্ভবতী হয়ে পড়ে। ক্রুদ্ধ পিতা তাকে হত্যা করার সময় তার বাচ্চাগুলি কিলবিল করে মাটিতে ছড়িয়ে পড়লে সবগুলিকে যখন হত্যা করা হয় তখন পালিয়ে গিয়ে একটি সাপ ক্রমে দানব হয়ে ওঠে এবং গ্রামবাসীকে তার আহার যোগাতে বাধ্য করে। তখন এক চিন-হিলের এক ভিনদেশি ওই গ্রামে অতিথি হয়ে আসে। একদিন যখন এক গৃহস্থের শিশুসন্তানকে সাপ-দানবের কাছে উৎসর্গ করার পালা এল তখন আগন্তুক অতিথি একটি ছাগল মেরে নিজের হাতের অগ্রভাগটিকে মাংস দিয়ে ঢেকে মুঠোয় একটি দা নিয়ে সাপের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। দানবটি যখন হাতসুদ্ধ মাংস মুখে পুরে নিল তখন দ্রুত হাতটি মোচড়ে টেনে বের করে সাপটিকে হত্যা করে গ্রামবাসীকে বিপদমুক্ত করল। এই অঞ্চলের বেইতে সম্প্রদায় এই বলে দাবি করে যে তাদের পূর্বপুরুষেরা এই সাপ-দানবের আহার যোগাত।

দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব চিনের লোকজীবন ও সংস্কৃতিতে বাঘের মর্যাদা সুপ্রাচীনকাল থেকেই নানা দ্যুতিময় স্বরূপে উদ্ভাসিত। লোকবিশ্বাস যে, সাদা বাঘ পশ্চিম দেশের শাসক। শরৎ কালে যে যখন পাহাড় ছেড়ে সমতলে নামে তখন তাকে নক্ষত্রপুঞ্জে কালপুরুষের প্রতিনিধিরূপে দেখা যায়। এ ভাবে বাঘ হয়ে যায় শরতের প্রতীক। চিন দেশের জ্যোতিষ শাস্ত্রে রহস্যময় আকাশের ভালুকরূপী নক্ষত্রপঞ্জী হল প্রথম বাঘের জন্মদাতা। তার শিকারের ভঙ্গি ও ছন্দ, ভয়ঙ্কর-সৌন্দর্য ও বাঘিনীর সঙ্গে রমণক্রীড়া-কুশলতা নিয়ে এক বিস্ময়কর সৃষ্টিরূপেই সে মানবের সম্মোহিত দৃষ্টি আকর্ষণ করে সে দেবতা কিংবা পশুদের রাজা বলে সম্মানিত আসনে অধিষ্ঠিত।"—all tigers bear the chinese character for king in the tripes on their brow. This look like and "H" turned of its side with extra line through the middle.....(they) imbue the tiger with all sorts of fantastical magical powers, particularly in the realm of Traditional Chinese Medicine (TCM)."

চিনীয় সংস্কৃতিতে বাঘের অধিষ্ঠান প্রায় ৭০০০ বছর কাল আগের। সবচেয়ে

পুরনো যে বাঘের মূর্তিটি সে দেশে আবিষ্কৃত হয়েছে তা নিয়োলিথিক যুগের। চিনের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে নানা প্রতীকে এই বাঘ চিত্রিত। সাদাবাঘ হল দক্ষিণের দেবতা, পৃথিবী ও মৃত্যুপরবর্তী জীবনের প্রতীক। নীল বাঘ পূবের দেবতা ও উর্বরা শক্তির প্রতীক। লাল বর্ণের বাঘ হল অগ্নি ও দক্ষিণের প্রতীক। কালো বাঘ শীত ও উত্তরের, হলুদ বাঘ পৃথিবীর কেন্দ্র ও সূর্যের প্রতীক। দেবাত চাং তাও-লিং-এর বাহন হল বাঘ। তিনি সম্পদ ও জুয়াড়ির কল্যাণ সাধক। ব্যাঘ্র হলেন বায়ুর দেবি। রাজকন্যা মিয়াও-শান্ শহিদত্ব বরণ করে বাঘের পিঠে চড়ে স্বর্গারোহণ করেছিলেন। The Gods of Northern Buddism (Alice Gatty) গ্রন্থে এই লোককাহিনীর বর্ণনা রয়েছে।

পুনর্জন্মের পর মিয়াও-শান্ কুয়াও-ইং রূপে জন্ম নেয়। খৃঃ পূর্ব ২৫৮৭ সালের ঐতিহ্যবাহী সুবর্বর্ণযুগের একাদশ বর্ষে মিথাও-তুহাং ছিলেন রাজা। তাঁর তিন কন্যার মধ্যে সবচেয়ে ছোট ছিল মিয়াও-শাং। রাজার কোন পুত্র সন্তান না থাকায় তিনি তাঁর উত্তরাধিকারী ঠিক করতে মেয়েদের বিয়ের উদ্যোগ নেন। মিয়াও তার বিয়ের প্রস্তাব বাতিল করে দিয়ে নির্জনে আত্মশুদ্ধির পথে বোধিত্ব লাভের বাসনায় ঘর পরিত্যাগ করে 'সাদা চড়ুইর মঠ'-এ গিয়ে সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করেন। রাজা তাকে সস্নেহে এই সাধনার পথ থেকে ফেরাতে ব্যর্থ হয়ে ক্রোধে ভয়ঙ্করভাবে নির্যাতন শুরু করেন এমন কি বৌদ্ধমঠেও আগুন ধরিয়ে দেন। এরপরও মেয়েকে বশে আনতে না পেরে তার শিরশ্ছেদের আদেশ দেন। যখন রাজাদেশ পালনের জন্য ঘাতক তাকে হত্যায় উদ্যত হয় সেই মুহূর্তে নেমে আসে প্রলয়ংকরী ঝড় আর আকাশের বজ্রালোক তার চারপাশে গড়ে তোলে নিরাপত্তার বলয়। সে সময় পাহাড় থেকে নেমে আসে এক বাঘ আর মিয়াওকে পিঠে নিয়ে সে উধাও হয়ে যায়। চেতনা ফিরলে পর সে নিজেকে আবিষ্কার করল যমপুরীর নরকে। মুহূর্তে নিজেকে যাদুবলে মুক্ত করে সে ফিরে আসে। যমলোক থেকে ফেরার পথে আকাশে মেঘের কোলে আবির্ভূত হয়ে ভগবান বুদ্ধ তাকে আদেশ দিলেন যে, সে স্থান থেকে তিনহাজার মাইল দূরবর্তী পু-তো নামক দ্বীপে যেয়ে সাধন করতে। পুনরায় বাঘ-দেবতা তাকে বহন করে সেই দ্বীপে নিয়ে যান। অন্য এক কাহিনীতে বলা হয়েছে জলে ভাসমান পদ্মের উপর আসীন হয়ে মিয়াওশাং সেখানে উপনীত হয়েছিলেন।

প্রায় ন'বছর কঠোর তপস্যা করে তিনি তাঁর প্রাথমিক সিদ্ধিলাভ করেন। সে সময় সাগরের ড্রাগন রাজার তৃতীয় পুত্র আনমনে একটি মাছের রূপ ধারণ করে ঢেউয়ের মাঝে খেলা করে চলেছিল। এক জেলে হঠাৎ তাকে জালে পুরে বাজারে নিয়ে এল বিক্রি করতে। মিয়াও-সাং তাঁর দিব্য দৃষ্টি দিয়ে রাজপুত্রের এই দুর্দশা প্রত্যক্ষ করে তাকে উদ্ধার করেন। ড্রাগন-রাজ করুণাময়ী সাধিকার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তার পৌত্রী লুং-নুকে দিয়ে একটি মুক্তা পাঠিয়ে দিলেন যাতে তার আলোয় মিয়াও-শাং

রাতের অন্ধকারে বৌদ্ধ-সূত্র পাঠ করতে পারেন। মিয়াও-এর সংস্পর্শে এসে লুং-নু এতই অভিভূত হয়ে পড়ে যে সে দীক্ষা গ্রহণ করে সন্ন্যাসিনী হয়ে যায়। ক্রমে লুং-নুর মা বাবা মিয়াও-এর নিকট আশ্রয় গ্রহণ করে মানবজাতির ত্রাতারূপে কাঙ্ক্ষিত অমিতাভ স্বর্গ লাভ করে ধন্য হন।

হ্যারাল ও ইয়াংজিয়াং-এর বিবরণী থেকে জানা যায় যে, চিনের কানমিং-এর প্রত্যন্ত অঞ্চলে বাঘ পূজার প্রচলন আজও বর্তমান। ই-য়েই, চু-জিয়াং প্রভৃতি স্থানে একটি বিশেষ পূজাস্থলে পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিয়ে যাওয়া হয় যেখানে প্রায় পাঁচ মিটার উচ্চতার সুপ্রাচীন একটি সৌরগণনার বর্গক্ষেত্র রয়েছে যার কেন্দ্রে মুখ ব্যাদান করে বসে অছে এক বিশাল বাঘের মূর্তি। তাছাড়া 'A tiger totem is presented for tourists; the totem portrays the Yi belief of the tiger setting the entire world in motion.' (Harrell and Yongxiang 2003,p. 380) । চারদিকে ছড়িয়ে থাকা অজস্র খণ্ড বিখণ্ড মূর্তির টুকরো তুলে নিয়েলোকেরা তা গায়ের অলঙ্কার করে পরে থাকে এই বিশ্বাসে যে পূজ্য বাঘের আশীর্বাদে তার সুরক্ষা ও কল্যাণ সাধিত হবে এবং তার মত বীর্যবান হবে। পশ্চিমের ই-সি ওয়াং মু অঞ্চলে রাজমাতাদেবীর মূর্তিটির আকৃতি ব্যাখ্যা করা হয়। হাজার হাজার বছর ধরে বাঘ, ড্রাগন, পৌরাণিক পাখি (ফিনিসক্স) ও ব্যাঙ এই চার প্রাণী চিন দেশের সংস্কৃতিতে প্রবহমান। তাদের লোককথায় বর্ণিত বিশ্বাস যে, বাঘ-বছরে জন্ম হলে সন্তান সাহসী, বলবান, ধৈর্যশীল ও দয়াবান হয়। বাঘ সদয় হলে আগুন, চোর ও প্রেত এই তিনের ভয় ও বিপদ থেকে মুক্তি লাভ ঘটে। প্রবাদ, প্রবচন ও গীতগুলিতে বলা হয় যে,— বাঘের গর্জন আর ড্রাগনের গান পৃথিবীতে শান্তি আনে। পাহাড় ও উপত্যকা থেকে যখন মানুষের আহ্বান বা কণ্ঠস্বরের উত্তর আসে তখন দেশ শক্তিশালী হয় ও জনজীবনে সমৃদ্ধি নেমে আসে।

কোরীয় সভ্যতায় ডান্‌গুন্ সিহুয়ারযুগ থেকে বাঘ সে দেশের লোকসংস্কৃতিতে এক বিশেষ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। এই বাঘ ক্ষমতা ও ঐশ্বর্যের প্রতীক— Guardian spirit । সৃষ্টির সঙ্গে বাঘের সম্পর্ক নিয়ে অসংখ্য মিথ সে দেশেও প্রচলিত রয়েছে। কোরিয়ার পশ্চিমাঞ্চলের লোককথায় সাদাবাঘ পবিত্র দেবতার বেশে সীমান্তের প্রহরীরূপে কল্পিত। এই দেবতাই তার অ-লৌকিক ক্ষমতার বলে পৃথিবীর রঙকে সাদা করে দিয়েছেন। এই বাঘ-দেবতা কল্যাণময় কিন্তু যদি কোন শাসক কিংবা কোন ব্যক্তি অবিচার ও অন্যায় করে তাহলেই তার ভয়ঙ্কর রুদ্র-রোষ নেমে আসে। কোরিয়ায় প্রচলিত প্রবচনে আছে—ক্ষমতাবান বিনয়ী ও সম্পদশালী হয়। ধনী যখন দয়াবান হয় তখনই সাদাবাঘের দর্শন মিলে। চিনের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্ত, আসামের উত্তর-পূর্ব আর মায়নামারের উত্তরাঞ্চলের কিছুটা পূর্বদিকে কোচিন প্রদেশ। মায়নামার আর আসামের সীমান্তবর্তী এই গিরিপথ দিয়েই বার্মিজরা আসাম আক্রমণ করে আহোম রাজাকে

বিতাড়িত করেছিল। আসাম, প্রাচীন ব্রহ্মদেশ ও চিন এই তিন দেশের সীমান্ত সংযোগস্থল দিয়েই ছিল প্রাচীন ব্যবসা বাণিজ্যের পথ। এই পথ ধরেই বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মের বিস্তার ঘটেছিল। কাচিন প্রদেশেই উত্তর-পূর্বভারতের কোন কোন জঙ্গীদলের অন্যতম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও আবাস স্থল গড়ে উঠেছিল। প্রচলিত জনশ্রুতি ও লোককথা মতে এই অঞ্চলের চিন-পর্বত থেকে ইরাবতী নদি হয়ে মহেগালীয় জনগোষ্ঠীর এক শাখার প্রাচীন ব্রহ্মদেশের দক্ষিণে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তার ঘটেছিল। প্রচলিত জনশ্রুতি ও লোককথা মতে এই অঞ্চলের চিন-পর্বত থেকে তাদের এক শাখা সমুদ্র পাড়ি দিয়ে দক্ষিণ এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। একদল উপকূলের ধার ধরে পাবর্ত্য চট্টগ্রাম হয়ে সুন্দরবন পর্যন্ত বসতি বিস্তার করে। অপর যে প্রধান গোষ্ঠী তারা বিভিন্ন পর্যায়ে কাছাড়ের পূর্ব সীমান্তের বড়াইল পাহাড় হয়ে ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ পারের পর্বতে ছড়িয়ে পড়ে। এই মঙ্গোলীয়রাই পর পর তাদের প্রব্রজনের ধারায় নাগা, কুকি ও মণিপুরি এই তিন প্রধান আদিবাসী জনগোষ্ঠী নামে পরিচিতি লাভ করে। তাদের আদি উৎস-ভূমি থেকে যে লোক ঐতিহ্য ও জীবন ধারা বয়ে নিয়ে চলেছিল তা নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়েও তার স্মৃতি অবশেষকে ধারণ করে আজও চলমান। তাদের লোককথা সংস্কার, বিশ্বাস আর সংস্কৃতির বৈভব আদি ইতিহাসের পরম্পরা সূত্রকেই বার বার স্মরণ করিয়ে দেয়।

কাচিনদের সৃষ্টিমূলক আখ্যান মহান 'না-ট'দের (পরমাত্মা) নবম আত্মা হলেন লান্ খেন মাদই যিনি চৈনিক, শান ও কালাদের জন্য আয়োজিত ভোজে নেতৃত্ব দেন। 'কালা' শব্দের অর্থ হল বিদেশি। মণিপুরিরাও বহিরাগত বিদেশিদের 'কালা-ছইয়া' নামে অভিহিত করে থাকে। তাদের প্রথাগত লোক বিশ্বাস যে চিতা বাঘের বাস ছিল স্বর্গে আর বজ্রের ছিল মর্ত্যে। ফলে পৃথিবীতে কোন প্রাণের সৃষ্টি সম্ভবপর ছিল না। বজ্র-বিদ্যুতের তাপে বীজ অংকুরিত হত না এমনকি ঢাক বাজাবার জন্যও কোন প্রাণী ছিল না। বজ্র একদিন চিতা বাঘকে বলল, চল আমরা স্থান বদল করি। বাঘ নেমে এল মাটিতে আর বজ্র চলে গেল আকাশে। বাঘের তীব্র নখরাঘাতে মাটি চিরে ক্ষেত্র হল প্রস্তুত আর বজ্র নিয়ে এল মেঘ। ফসলের প্রাচুর্যে ভরে উঠল পৃথিবী। বজ্র শক্তির নিয়ন্ত্রক না-ট হলেন লা-ন্ তু-মুশেং বা মাকামওয়া নিংশাং। তার আদেশেই মেঘের সৃষ্টি, বর্ষণ, বাতাস, বিদ্যুৎ ও বজ্রপাত ঘটে। তাকে তুষ্ট করতে কাচিনরা হাঁস, মুরগি, মিথুন বলি দিয়ে উৎসবে মেতে ওঠে।

দেখা যায় যে উনিশ শতকের শেষের দিকেও উত্তর-পূর্বের পার্বত্যজাতিদের মধ্যে-মানবের অস্তিত্বের প্রতি লোক মানসে গভীর বিশ্বাস ছিল। এ সম্পর্কে A.W. Davis এর প্রদত্ত তথ্য উল্লেখ করে Verrier Elwin of these, two of the most curious are (1) the belief in the existence of 'Tiger Men', i.e, men with power of turning themselves into tigers; and (2) the belief in the

existence of a village inhabited only by women. Tiger-men are well known, and I have the pleasure of the acquintance of one. This gentleman is a Sema cheif of a small village in the Tizu valley. He himself disclaims the power, but that he has it is implicitely believed by the whole of the Sema and Angmi tribes. A whole village of tiger-men is said to exist in the far north-east. It is in this direction, too, that there lies the happy village peopled entirely by women. The population of this village is kept up by its inhabitants being visited by traders from the surrounding tribes."

(A.W. Davis, in Census of India, 1891, Assam, Vol.I.pp. 250-1.- The NAGAS in the Nineteenth Century : VERRIER ELWIN, Oxford University Press,1969;p.622)

লোককথায় বাঘ রূপ বদল করে মানব হয় আবার মানব-মানবী বাঘ-বাঘিনী হয়। বাঘ-মানব গ্রাম-প্রধান হয়, জুম ক্ষেতে চাষ করে, মাছ ধরে, রাজকুমার হয় মানব স্বভাবের যা কিছু প্রবৃত্তি ও সাধারণ গুণ সবই তার থাকে। বাঘ হয়েও মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব অটুট রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করে যায়। ওরা ঐন্দ্রজালিক বিদ্যায় পারদর্শি হয় এবং এর শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে রীতিমত লড়াইও বাঁধে। পরাজিত জনতার মৃত্যুর পর কাটা মুণ্ডটি লোকসমক্ষে ঘরের বারান্দায় বিজয়ীর গৌরবের স্মারক হয়ে মিথুন উৎসর্গ করে— 'লা' অনুষ্ঠানের দিনে যাতে অপমানিত হতে না হয় তার জন্যও বিনয়ী হয়ে ওঠে। মানব সন্তান নারা তার অজান্তেই বাওরি নামে এক বাঘ-মানবীকে বিয়ে করে ভয়াবহ সংকটে পড়েও স্ত্রীকে সে নিজ হাতে হত্যা করতে দ্বিধাবোধ করে। অবশেষে বাওরির মৃত্যুর পর সেও আত্মহননের পথ বেছে নেয়। ক্রুদ্ধ ও আতঙ্কিত গ্রামবাসী নিরাপত্তার জন্য দল বেধে এসে বাঘ-মানব মানবীদের পরিবারকে হত্যা করে তাদের ঘর বাড়ি পুড়িয়ে ছাই করে দেয়। এই বাঘ পূজ্য দেবতাও হয়। বাংলার দক্ষিণ রায় এমনি এক পূজিত দেবতা। উত্তর পূর্ব ভারতের বাঙালির লোক-জীবন সংস্কৃতিতে আজও বাঘ পূজা এক জনপ্রিয় অনুষ্ঠান। সুরমা-বরাক উপত্যকার বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে বাঘের নামে ছড়া, পাঁচালি লোক মুখে ফিরে। বাঘের বেশে বাঘ-নাচেরও প্রচলন রয়েছে।

এই ভূ-খণ্ডের বৈচিত্র্যময় লোককথাগুলির মধ্যে রয়েছে যেমন—

মিজো লোককথা ঃ ভালুক পিতা ও প্রভু বানর, ভালুক বাঘ ও একটি বানর, সবুতা এবং দড়ি, পেহ্মুয়াকি ও তার গান, বিনীত রাজা লেরসিয়া, হারানো বোন তৈলংগী, রাজকন্যা ও একটি সাপ, আকাশ কুমারী ও টিলুমটয়া, এক চোরা ও একটি বিষণ্ণতার গান, বাঘ ও ব্যাঙের কথা, বীর হেইচুক্কা, রিমীনহুয়ি বা লাল ফুল, যাদু পাথর, রুংগিনু ও থিয়ালটিয়া, চালা ও থাংগি, দুহ্মংগা ও দরদিনী, সাজল্তে পা ও বাকবাওম্তে পু, এংগাইতেইর কথা, চেপাহ্খতার গল্প, রাল্দাওয়ানা ও তুমচিংগি, চ্ছাওরতুইনেইহ্লালা

ও তুয়াংপ্চিরকাহিনী, বোনের বিয়েতে পণ প্রার্থী ভাই, তুইচুং নদির উৎস কথা, চ্ছাওং-সিলি ও রালপুই।

লাখের লোককথা ঃ এক চাষীর কথা- (লেয়ু আরেপেনাই ফোপা), মানুষ ও এক বানর-(আইও ফোপা, দুই ভাইয়ের কথা— (উনাও পানেপেনাও ফোপা), লিয়াসিয়াস্রিনোর কেইনেইপা হয়ে ওঠার কাহিনী-(লিয়াসিয়াস্রিনো ফোপা বা সাইরামৈনো ফোপা), শ্রেষ্ঠ মানব থিলাইনিহ্রার কথা—(থিলাইনিহ্রা ফোপা), চেইপার কথা, অন্ধ দুই ভাই— (উমউ পনো মোচপা ফোপা), লাইনো-(মারদের এক গোষ্ঠীর গল্প-নাইনো ফোপা, পিতা ও এক সন্তানের কথা)—(ডাওনাতো সাও ফোপা), একটি ব্যাঙ ও বাঘের গল্প, একটি বাঘ ও হরিণের গল্প, এক স্ত্রী ও একটি বানর, বন্য বিড়াল, মুরগি ও ডিম, একটি ককুর ও ছাগল, কচ্ছপ ও ক'টি বানরের গল্প, এক বিধবা নারীর পুত্র সন্তান, শজারু ও এক নেকড়ে বাঘ, তিলাউয়ার কথা, নারার কাহিনী, একটি মেয়ে যে এক বানরকে বিয়ে করেছিল, পালা তি-পাং-এর কথা, তিলেউলিয়ামং নাতা তি-সির কথা, কুয়াশা বিহীন তি-সি নদি, সাকু গ্রামের কথা, কোরাবাইবুর কাহিনী, মুনিয়া ও ঘুঘুর কথা, লাখের রাজা ও তার স্ত্রী কথা।

পাবই লোক কথাঃ একটি মেয়ের বাঘিনীতে রূপান্তরিত হওয়ার কাহিনী, চিয়াসুং ও মনঘান কথা, কাউর ডুমবেল, জাওলপল ও তু-য়ালেরং, দুই যুবক ও এক তরুণী, কাঁকড়া শিকারীর দল, লিয়াঙো ও তার ভাই, বাঘ-মানব ও তার প্রেয়সীর গল্প, শয়তানচোখী মানুষ, এক বাঘ-মানব ও তার কন্যা, তুল-উম-এর গল্প, পশুর অলৌকিক কথা, এক পরী কাহিনী, বাইনগম নামের একটি লোকের কাহিনী, হনংগন ও তার ছেলেরা।

লালরুয়াংগা ও কেইচালার কথা, শিশুদের অলৌকিক শক্তি, এক রাজকন্যার কাহিনী।

মিকির বা কারবি লোককথা ঃ এক অনাথ শিশু ও দৈত্যের কথা, অনাথ শিশু ও এক দয়ালু রাজার গল্প, স্বর্গের ব্যবসায়ী ও এক মর্তের ব্যবসায়ীর কাহিনী, তারকপিং রেচো কংস রেচো ও বোংশো বেচো, কোরহন জুংরেচো, এক ব্যাঙের কথা, এক অনাথ শিশু ও তার মামারা, হারাতা কুনওয়ারের গল্প, সৃষ্টি কাহিনী।

খাসি ও জয়ন্তিয়া লোককথাঃ পাহাড় চূড়ায় গুলিবিদ্ধ হরিণকে মাড়িয়ে চলা এক লোকের কথা— (কা রিয়াট ইয়ম সিয়ের), কা ডু, কা টাং, বাদ মা রেম, রাণী জলাপাং-এর কাহিনী-— কা সিয়েম জলাপাং ক্রেম লামেট ক্রেম লাটং, মারি উপর ভাসমান লাংগওয়ারকু, উ মানিক রাইটং, কা লিকাইর জলপ্রপাত, ডিংগিয়েই পাহানের কথা, শিলং-এর সিয়েমদের আদি কথা উ লোহ্ র‍্যাণ্ডি বাদ কা লিহ্ দোহ্ খা, ক্যালিয়াং ও স্যাম্পের, মৌস্মাই-এর সিয়েম প্রতারক পাথরের কথা, চাঁদে কলঙ্ক কেন, সোপেট ব্যাইনেংগ পাহাড়ের কথা, কুকুর কিভাবে মানুষের সাথী হলো তার কথা, থেল্ন-এর

কথা, দুয়ারার রূপে- দেল্‌লি নদির কথা, কপিলি নদির কথা, মাওপুংকাইরটিয়াং গ্রামের কথা, মালিনিয়াং-এর সিয়েম (রাণী) কাহিনী

ডিমাসা কাছাড়ি লোককথা : একটি বানর ও হরিণের কাহিনী, বদমেজাজী লোকের কিচ্ছা, বাগদা চিংড়ি ও তার ছানার কথা, বাহুহীন দানবের গল্প, বাঘ ও একটি শামুকের কাহিনী, ছাগলের দুর্বল হবার কাহিনী, সুন্দরের আড়ালে শয়তানের মুখ, বানর, বাঘ ও জোনাকী পোকার গল্প, বানর ও কচ্ছপের কথা, দিসরুর কথা, পাম্ব্রাওরাজার কথা।

থাডৌ-কুকিদের লোককথা : প্রেত ও মানব, চামড়ার রূপান্তর, দা বা কুঠার শাণানো খুতসিবি।

জেমি নাগাদের লোককথা : একটি বাঘ ও এক জংগলী বিড়ালের গল্প, বি-মাতা কাহিনী, আসা ও মুনসেরুং।।

গারো লোককথা : রাজা আবং নগা ও তার রাণী, রাজা গাংবো নক্‌মা ও চিপো, চে-লা আসন্‌পা ও ব্রারা, দেলং কথা, দারাং ও অস্পরা কাহিনী, মিথুদেইবেসা ও জিন্নী কথা দাম্‌-পো সাওরা, স্‌পোরা ও রাণী মারমেইদ, দুই ভাই ও দুই ঘুঘুর গল্প, রেশমী কাপড়ের যাদু।

ডিমাসাদের মধ্যে প্রচলিত নিজেদের সৃষ্টিমূলক লোককথা বা মিথ :

ডিমাসাদের বিশ্বাস যে পৃথিবীতে মানুষের বসবাসের আগে সমগ্র পৃথিবী ছিল নানা আকারের নদী, পাহাড়, বৃক্ষ-- লতার সমাবেশে এক বিশাল জগৎ। সর্বত্র এক বিস্ময়কর অপার্থিব নীরবতা ছিল বিরাজমান। কোন এক সময়ে এক দৈব নারী ও পুরুষ সমস্ত নির্জনতা ভেঙ্গে আবির্ভূতা হল। এই পুরুষের নাম ছিল বাংলা রাজা। তিনি ভূমিকম্পেরও দেবতা। আর এই নারী হলেন এক বিশালাকার পাখি, নাম তার আরিখিডিমা। ওদের পরস্পর ভালোবাসার ফলে গর্ভবতী আরিখিডিমার ডিম প্রসব কালে উপযুক্ত জায়গার সন্ধান করতে করতে তারা এসে পৌঁছালো ডিলাও সাংগী নদীর সঙ্গমে যেখানে বিশাল বিশাল বট গাছকে কেন্দ্র করে সোনা ঝরানো বালি আর নানা রঙের অজস্র প্রস্ফুটিত কুসুমের সম্ভার নিয়ে জেগে রয়েছে ডিলাওব্রা-সাংগীওব্রা নামে মনোরম স্থানটি। আরিখিডিমা এমনি এক গাছের শাখায় নীড় বেধে একে একে প্রসব করলেন অলৌকিক সাতটি ডিম। তারা বাংলা রাজা ও মহান স্বর্গীয় পাখি আরিখিডিমার বংশধর। পর পর নর বেশে জন্ম নিলেন দেবতা শিবরাই, ডু-রাজা, নাইখু রাজা, ওয়া রাজা, গঞ্জু ব্রাইজুং এবং হামিয়াদা ও এই ছয়জন দেবতা। কিন্তু সাত নম্বর ডিমটি দীর্ঘকাল ধরে অনড় থাকায় গভীর উদ্বেগে আরিখিডিমা তাঁর সন্তানদের ডেকে ওটি ভেঙে দেখার নির্দেশ দিলে ভয়ে কেউ এগিয়ে আসেনি। অবশেষে বেপরোয়া ও দুঃসাহসী হামিয়াদাও খুব জোরে এক লাথি মারলে পর ডিম ভেঙে জন্ম

নিল এক কিম্ভূতকিমাকার অশুভ অপদেবতা। প্রাকৃতিক কিংবা দৈহিক সমস্ত আধিব্যাধির মূলে রয়েছে এই অপদেবতা। সমগ্র পৃথিবীকে এই অপদেবতার গ্রাস থেকে রক্ষা করতে সবাই তৎপর হয়ে উঠলে শিবরাই তাদের নিরস্ত করে প্রত্যেকের নিজস্ব বাসস্থান নির্দেশ করে দিলেন। ডিমাসা-কাছাড়িরা নিজেদের বাংলা রাজা ও আরিখিডিমার প্রথম ছয় সন্তানকে তাঁদের পূর্বপুরুষ বলে দাবি করেন। এই পূর্বপুরুষেরাই হলেন তাঁদের উপাস্য দেবতা। এদের 'মাদাই' বলেও অভিহিত করা হয়।

বি.এন.বরদলৈর মতে ডিমাসা শব্দের উৎপত্তি জননী আরিখিডিমা থেকে (অরিখিডিমা-সা)। 'সা'-এর অর্থ সন্তান) (Bordoloi, D.N : The Dimasa Kacharis of Assam, Tribal Research Institute, Assam, Guwahati, 1976,p.10)

বাঘ-মানব ও বাঘ-মানবী নিয়ে মিজো, লাখের, পাবি, খাসিদের মধ্যে প্রচলিত ক'টি লোককথা পাঠকদের কৌতূহল মেটানোর জন্য তুলে ধরা হল ঃ-

লাখেরদের লোককথা : নারা

মিরাখা নামে এক যুবকের বিয়ের পরই জানা গেল যে, তার স্ত্রী গর্ভবতী। এ অবস্থায় সে প্রতিদিন ক্ষেতে কাজ করতে যায়। হঠাৎ একদিন কাজে যাবার সময় সে শুনতে পেল পেটের শিশু চিৎকার করে কেঁদে বলছে— মা আজ বৃষ্টি হবে, তুমি পাম্ গাছের পাতা তুলে নাও শরীর বাঁচাবে। মা বলল, তুমি এখনো পেটে. তোমার পক্ষে বৃষ্টি বিষয়ে কিছুই জানার কথা নয়— এ কথা বলে সে মাঠে চলে গেল এবং প্রচণ্ড বৃষ্টিতে নাকানি চোবানি খেল। পরদিন শিশু বলল— আজ খুব গরম পড়বে সঙ্গে কিছু জল নিয়ে যেও। সে দিনও মা তার ভবিষ্যৎ বাণী অসম্ভব ভেবে বেরিয়ে গেল কিন্তু প্রচণ্ড গরমে টিকতে না পেরে ঘরে ফিরে এল। কিছুক্ষণ পরই জন্ম হল সন্তানের। নাম রাখা হল নারা। সময়টা ছিল চাষ-বাসের। মা বাবা শিশুটিকে নিয়েই মাঠে যায় এবং এক ছোট ছাউনীর বারান্দায় রেখে তারা কাজ করে। নারা শুয়ে শুয়ে দেখল আকাশে একটি চিল পাখি চিৎকার করে কাঁদছে। সে তার কান্নার কারণ জানতে চাইল— সে কি আজ বৃষ্টি অথবা প্রচণ্ড গরম কিছু একটা হবে ভেবে কাঁদছে? কিছুটা দূর থেকে তার মায়ের মনে হল ঘরে কোন লোক এসে জোরে কথাবার্তা বলছে, তাই ওদের উদ্দেশ করে বলল, তোমরা কথা বল না, ছেলেটির ঘুম ভেঙে যাবে। কিন্তু শিশুটি পাখির উদ্দেশে আবারও কথাবার্তা বলতে লাগল। এ শুনে নারার বাবা রাগ করে ওদের চুপ করতে উচ্চৈ স্বরে ধমক দিল এবং দ্রুত শিশুটির কাছে গিয়ে সেখানে অন্য কোন লোক না দেখে ভাবল বোধ হয় সে ব্যক্তি পালিয়ে গেছে। পরদিন যখন একই ধরনের জোরে জোরে কথা বলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল তখন চুপচাপ পা টিপে ঘরের কাছে এসে

দেখল যে শিশুটি একা একা কথা বলছে। এতে তার মন খুব বিষণ্ণ হয়ে পড়ল। কারণ, সে ছিল যাদুবিদ্যায় পারদর্শী, সে বুঝতে পারল এই ছেলেটির মধ্যে অলৌকিক ক্ষমতা রয়েছে যা ভবিষ্যতে একদিন তার দক্ষতাকে কেড়ে নেবে। এই ভয়ে সে শিশু সন্তানের জিহ্বার এক অংশ কেটে ফেলল।

বারো বছর বয়সে দক্ষ শিকারি নারা যখন বনের পথ ধরে যায় তখন একটি কিশোরী একা.একা বসে কাপড় বুনছিল। তাকে দেখে নারা কৌতুকভরে টিটকিরি দেয়। ছিনিয়ে নেয় তার হাতের মাকু। মেয়েটি বলে তুমি যদি চুপ করে বস তাহলে তোমার দুর্গতির কথা আমি বলতে পারি। এরপরই নারা তার বাবার হিংস্রতার কথা জানতে পারে। ঘরে ফিরে সে শরীর খারাপের ভান করে বেশ ক'দিন বিছানায় শুয়ে থাকলে চিন্তিত বাবাকে সে বলল তাকে কাঁধে নিয়ে বাইরে বেড়িয়ে আসার জন্য। কাঁধে চড়ে নারার কথামত বাবা তাকে একবার মাথার উপর একবার ঘাড়ে নানাভাবে ইচ্ছেমত তুলে ধরলেও ছেলের হাতে যাদুশক্তি হারানোর একটা ভীতিও তার মধ্যে ছিল। সুযোগ বুঝে ছেলে তার বাবার পিঠের ফোঁড়াটি যেটি কিনা ছিল তার যাদুশক্তির আধার ওটা কামড়ে গিলে নিল। ক্রমে নারা বড় হল এবং তার বাসনা জাগল যাদুবিদ্যার দক্ষতাকে যাচাই করে নেওয়ার। সে বাবাকে জিজ্ঞেস করল,— বলো দেখিনি শূকর না চাল, কোনটা অধিক দামি। বাবা বলল— শূকর। ছেলে প্রমাণ করতে চাইল শূকর থেকে চালই দামি তাই সে চাল নিয়ে এল। বাবা আনল এক শূকর। শূকর ছিল সহজলভ্য, তাই পথে সবাই নারার কাছে চাল চেয়ে নিল। নারা প্রশ্ন করল এখন বলো আমি সত্য না তুমি সত্য। বাবা বলল তুমিই সত্য, তুমি হলে Fausaw মাতৃগর্ভে থাকতেই তুমি এ বিদ্যায় পারদর্শী। নারা পুনরায় প্রশ্ন করল— আচ্ছা বলোতো রাস্তায় যদি লোকে এক সঙ্গে একটি হরিণ ও ইঁদুরকে আসতে দেখে তাহলে তারা কোনটিকে প্রথম তাড়া করবে। বাবা বলল নিশ্চয়ই হরিণ। এর পর নারা নিজে একটি ইঁদুর আর তার বাবা একটি হরিণ পথে ছেড়ে দিল। দেখা গেল সবার নজরে আসার আগেই হরিণ গেল পালিয়ে আর ইঁদুরকে দেখে সবাই তাড়া করে মেরে ফেলল। এভাবে বাবা ছেলের কাছে ভ্রান্ত প্রমাণিত হল। ক্রমে নারা দুঃসাহসী বীর ও কুশলী যাদুকর হয়ে উঠল।

একদিন নারার বাবা নাসাইপু গ্রামের প্রধানের সঙ্গে দেখা করতে গেল। এই লোকটি ছিল বিখ্যাত ঐন্দ্রজালিক। তাকে দেখেই গ্রাম প্রধান জিজ্ঞেস করল তুমি নিশ্চয়ই মৃত্যু নদী পথ হয়ে এখানে এসেছ। উত্তরে সে বলে হ্যাঁ। এরপরই মদ তৈরি হলে দু'জনে মিলে ভোজ খেল, আর মৃত্যু ঘটল নারার বাবার। খবর পেয়ে ক্রুদ্ধ নারা প্রতিশোধ নিতে এলে নাসাইপু তার বাড়ির চারদিকে যাদুজাল বিস্তার করে সুরক্ষার বন্ধন গড়ে তুলল। দূর থেকে নারা তার যাদুশক্তি দিয়ে সবই দেখতে পায় এবং সে এক ইঁদুরের বেশে ঘরে ঢুকে পড়ে। বিস্মিত নাসাইপু নারাকে দেখতে পেয়ে প্রশ্ন

করল তুমি কি মৃত্যু নদি পথ ধরে এখানে এলে উত্তরে সে বলে না জীবন নদী পথ ধরে এসেছি তোমার ভাত আর মাংস খেতে। পরদিন সকালে নাসাইপু এক ভোজের আয়োজন করে মদের মধ্যে একটি সাপ লুকিয়ে রেখে তা পরিবেশন করলে নারা তা আগাম টের পেয়ে যায় এবং সামনের দুই পাহাড়ের লড়াইয়ের দৃশ্য দেখতে বলে নাসাইপুকে কিছু মুহূর্তের জন্য এড়িয়ে সে ঈগল হয়ে সাপটিকে মেরে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পাত্র থেকে মদটুকু খেয়ে নেয় এবং চকিতে নাসাইপুর পাত্রে বিষমন্ত্র ছড়িয়ে দেয়। সেই মদ পান করার বেতের নলে ঠোঁট চোবানো মাত্রই সেটি পুরো গলায় আটকে গেল এবং মৃত্যুর কোলে ঢোলে পড়ে। এরপর নারা নাসাইপুর সব সম্পদ, ক্রিতদাস ও মিতুনতগুলি নিয়ে বাড়ি ফিরে আসে।

একদিন মাছ ধরার সময় তার উজানবাহী জাল এক বাঘ-মানবের নামনিবাহী জালের সঙ্গে জড়িয়ে যায়। এ নিয়ে প্রচণ্ড ঝগড়ার পর মাছ বিনিময়ের মধ্য দিয়ে দু'জনের বন্ধুত্ব হয়। বাঘ মানবের এই সর্দারের নাম ছিল কিয়াথিউর। সেও ছিল এক যাদুকর, মজার ব্যাপার হল কিয়াথিউর মাছগুলির কোন মাথা ছিল না কারণ ধরার সময়ই সে সবগুলির মাথা খেয়ে ফেলেছিল। কিন্তু এ ঘটনাটি সে তার মার কাছে যখন গোপন করে বলল সে নিজেই এ কাণ্ড করেছে, তখন কিয়াথিউ বিশ্বস্ত বন্ধুর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাকে আতিথ্য গ্রহণ করতে গ্রামে আমন্ত্রণ জানায়। নির্ধারিত দিনে কিয়াথিউ সব গ্রামবাসীদের ডেকে বলল যে ক'দিন বন্ধু নারা থাকবে সবাই যেন মানুষের বেশে থাকে। নারা উপস্থিত হয়েই কিয়াথিউর মা-বাবার সঙ্গে দেখা করতে চাইল। প্রথমে সে আপত্তি করলেও পরে একটি ঝাঁপি দেখিয়ে বলল ওখানে ওরা রয়েছে। নারা যেই ঢাকনা খুলে দেখতে গেল অমনি তারা তাকে গ্রাস করতে উদ্যত হল। সঙ্গে সঙ্গে নারা তাদের রূপ ও গুণের প্রশংসা করতে লাগলে প্রসন্ন হয়ে বাঘ ও বাঘিনী মানুষের রূপে শান্ত হয়ে তার পাশে বসে। নারা তাদের এক প্রস্থ পোষাক উপঢৌকন দিলে বিনিময়ে নারার সম্মানে একটি শূকর বধ করে ভোজের আয়োজন করা হয়।

কিয়াথিউর বাড়িতে একটি আশ্চর্য গাছ ছিল যাতে সবধরনের ফল ও শস্যের বীজ ধরত কিন্তু ফল হত না। নারা অজস্র বীজকে মন্ত্রসিক্ত করে সামান্য কটি বীজে পরিণত করে তার তামাকের কৌটায় ভরে নেয়। পাঁচদিন সেখানে বাস করার পর সে ঘরে ফিরে চলে। বাড়ি পৌঁছতে লাগত পাঁচদিন।পথে যাতে বাঘেরা কোন বিপদ ঘটাতে না পারে সে জন্য কিয়াথিউর তাকে এই বলে সতর্ক করে দিল যে নারা যেন ভুলেও কোথাও কালক্ষেপ না করে এমন কি মল-বিষ্ঠা ত্যাগ করলে তার উপর মদের গাঁজলা বা খামি ঢেলে দেয় তাহলে কেউ গন্ধ শুঁকে তাকে অনুসরণ করতে অসমর্থ হবে। নারা গ্রাম ছাড়ার প্রাক মুহূর্তে কিয়াথিউর ঘোষণা করে দিল যে মাননীয় অতিথি গ্রামে পাঁচদিন বাস করবেন এবং এই ক'দিন সর্দারের বাড়িতে ঢাক বাজবে।

পাঁচদিন পর গ্রামের বাঘ-মানবরা জানাল যে নারা চলে গেছে এবং তাকে ধরতে সবাই দ্রুত ছুটতে লাগল। কিয়াথিউর নিশ্চিত ধারণা ছিল যে ইতিমধ্যে তার অতিথি নিজের দেশে হয়ত পৌঁছে গেছে। সে বন্ধুর নিরাপত্তার কথা ভাবে। নারা পথে একদিন দেরি করার ফলে মহা সংকট দেখা দিল। যাদু বলে সে বাঘ-মানবদের উপস্থিতি টের পেয়ে দ্রুত শুকনো পাতা, বন্য ভালুকের শুকনো বিষ্ঠার ঢিবির নীচে আশ্রয় নিল।

ভ্রান্ত কিয়াথিউর এসে এই ঢিবির উপর বসে সঙ্গীদের প্রশ্ন করে জানত চায় যে সবাই সবচেয়ে বেশি ভয় পায় কোন বিষয়ে। উত্তরে তারা বলে, প্রভু যাকে ভয় করেন। সর্দার বলে সবচেয়ে ভয় হল যদি আমাদের পরিবেষ্টন করে ভীষণ কালো মেঘের ঘন অন্ধকার আর তার মধ্যে আমি যে ঢিবিতে উপবিষ্ট সেই স্তূপের অভ্যন্তর থেকে উঠে আসে ভয়াল কণ্ঠস্বর। ঘাপটি মেরে বসে থাকা নারা সব শুনতে পেয়ে যাদু বলে ডেকে আনে কৃষ্ণ মেঘ এবং সে তীব্র স্বরে চীৎকার দিতে থাকে। মুহূর্তে বাঘ-মানবের দল আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে পালাতে থাকে। শুধু কিয়াথিউর থাকে অনড় হয়ে বসে। সে নারাকে তার বোকামির জন্য ভর্ৎসনা করে চলে যায়। নারাও ফিরে আসে বাড়িতে। তার সঙ্গের বীজগুলিকে লক্ষ লক্ষ বীজে পরিণত করে সবার কাছে তা বিলিয়ে দেয়। শস্য শ্যামলা ও সুফলা হয়ে ওঠে তার গ্রাম।

হিংসা ও লোভের বশে নারার বড়ভাই কিয়াথিউর গ্রামে ছুটে গেলে বাঘেরা তাকে গিলে ফেলে। বন্ধু নারার কথা ভেবে সর্দারের আদেশে সবাই তার দেহের অংশ উগরে দেয়। মন্ত্র বলে তার দেহাংশগুলি জুড়ে দিয়ে হতভাগ্যের প্রাণ ফিরিয়ে দিলেও তার বাহুর তলদেশ অসম্পূর্ণ থেকে এক গর্ত হয়ে যায়। কারণ ছিল এই যে এক বুড়ো বাঘের দাঁতের ফাঁকে মাংসের অংশ আটকে থাকায় ওটা বের হয়ে আসেনি। সর্দার এই গর্তটিকে গাছের মোম দিয়ে ভরাট করে দেয়। ওখান থেকে গাছের অনেক বীজ সংগ্রহ করে সেও বাড়ি ফিরে নারার সামনে বড়াই করে বলে, দেখ, আমিও কেমন করে সম্ভার নিয়ে জীবিতভাবে ফিরে এসেছি। নারা যাদুবলে সব খবরই জানে তাই বলল, তুমি নও তোমার মৃতদেহ কি নিয়ে এসেছ, তোমার হাতের নীচেকার মোমের অংশ খুলে দেখ। বড়ভাই আশ্চর্য হয়ে সেটা বের করতেই সে মারা পড়ল। ভাইয়ের মৃত্যুতে ক্রুদ্ধ হয়ে নারা ছুটে যায় বাঘ মানবের গ্রামে। বন্ধু কিয়াথিউর নিকট এই হত্যার কৈফিয়ত চেয়ে সে যুদ্ধ ঘোষণা করে। কিয়াথিউর ঘটনার আনুপূর্বিক বৃত্তান্ত জানিয়ে তাকে শান্ত করার প্রচেষ্টা করে। এই দুঃখজনক ঘটনার জন্য যে বড়ভাইই সর্বাংশে দায়ি একথা জানিয়ে বলে যে এরপরও যদি নারা প্রতিশোধ নিতে চায় তাহলে লড়াইতে সেও প্রস্তুত আছে। তবে একটি শর্ত রাখতে হবে যে মৃতদেহকে নিয়ে বিজয়োৎসব 'লা' নিশ্চিতই পালিত হবে কিন্তু অন্যান্য বিজয় স্মারকের সঙ্গে বিজিতের মুণ্ড ঘরের বারান্দায় লোক চক্ষুর সামনে টাঙিয়ে রাখা যাবে না। দু'জনই বাতাসে

অদৃশ্য হয়ে গিয়ে শুরু করল তুমুল লড়াই। ইন্দ্রজাল বিস্তার করে নারা মোম দিয়ে তার এক প্রতিমূর্তি স্থাপন করল ক্ষেত-বাড়ির ভিতর। কিয়াথিউর তাকে অনুসরণ করে এসে ভ্রমে প্রতিমূর্তিটিকে সজোরে জাপটে ধরে যখন গ্রাস করতে গেল তখন নারা তাকে তীর বিদ্ধ করে। মৃত্যুর আগে নারাকে সে বলে, প্রিয় বন্ধু তুমি আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ বীর, আমি পরাজিত। এরপর গ্রামে ফিরে একটি মিথুন হত্যা করে কিয়াথিউর কাটা মুণ্ড হাতে নিয়ে প্রথামত শবদেহকে ঘিরে 'লা' অনুষ্ঠান পালন করে কিন্তু প্রতিশ্রুতিমত বিজয়-স্মরণ রূপে মুণ্ডটি বারান্দায় ঝুলিয়ে রাখেনি। এই ঘটনার পর তারা বাঘ কিংবা মানুষ কোন প্রাণীকেই হত্যার পর তার মুণ্ডকে বারান্দায় শৌর্যের প্রতীক রূপে টাঙিয়ে রাখে না।

ক'দিন পর নারা অজান্তে বাউরি নামে এক বাঘ-মানবীকে বিয়ে করে। স্বামীর অনুপস্থিতির সুযোগে প্রায়ই বাউরি নারার বন্ধুদের খেয়ে ফেলত। বন্ধুরা এই সর্বনাশ থেকে বাঁচতে নারার কাছে নালিশ জানায় এবং স্ত্রীকে হত্যা করার পরামর্শ দেয়। কিন্তু নিজ হাতে তাকে হত্যা করতে তার বাধে। সে তাকে মেরে ফেলার এক কৌশল অবলম্বন করল। সে একটা মোটা নল বাঁশের টুকরোর নীচের দিকে ছিদ্র করে সেটি মন্ত্রপূত করে স্ত্রীকে বলল ঝর্না থেকে জল তুলে আনতে। বাউরির কাছে এ চাতুরি অদৃশ্য থেকে গেল। সে ঝর্নাতলায় অনবরত বাঁশের চোঙটিতে জল ভরে তবু তা অপূর্ণ থেকে যায়। তার মধ্যেই তীব্র ও গভীর জলস্রোত পাহাড় থেকে নেমে আসে। ছলছল চোখে তাকিয়ে থাকে নারা। বাউরির প্রশ্নে নারা বলে ও কিছু নয় বৃষ্টির জলে চোখ ভিজে গেছে তাই। এরপরই যাদুজাল বিস্তার করে নারা নামিয়ে আনে প্রবল ঝড় ও বৃষ্টি। জলের তোড়ে ভেসে যায় বাঘ-মানবীর মৃতদেহ। গভীর বিপন্নতা নিয়ে নারা ফিরে এল ঘরে। নিঃসঙ্গতা ও বিবেকের দংশন তাকে ক্রমে পীড়িত করে তুলে। আত্মীয় স্বজনেরা তার এই অবস্থা দেখে তাকে বাউরির মৃতদেহের কাছে গিয়ে মৃত্যু বরণ করতে উপদেশ দেয়। মহা আনন্দে হাতে একটি লাউয়ের খোল আর সূতা কাটার টেকো নিয়ে নদীর পাড়ে এসে সে দাঁড়ায়। লাউ আর টেকোটি জলে ভাসিয়ে সে বলল-তোমরা ভেসে গিয়ে বাউরির মৃতদেহের কাছে গিয়ে পৌঁছাও আমি তোমাদের অনুসরণ করছি। এভাবে ভাসতে ভাসতে তারা এসে পৌঁছালো সমুদ্রের মোহনায় যেখানে বিলীন হয়ে গেছে বাউরি। সমুদ্রে ঝাঁপ দেবার আগের মুহূর্তে নারা দেখতে পেল মাথায় ছোট ছোট চুল একদল সৈন্য দাঁড়িয়ে আছে তীরে। জলে সে অস্ত্র ছুঁড়ে ফেলার আগে তাদের উদ্দেশ করে বলল, হে বিদেশি সৈনিক তোমরা তা গ্রহণ করতে পার। সঙ্গে সঙ্গে হাতের ছোঁড়া খড়গ তারা লুফে নিয়ে নারাকে উদ্দেশ করে বলে,— হে মহান লিথেয়ার সন্তান তোমার শক্তি বজ্রের মতো দীপ্তিময়। তোমার অস্ত্র ধারণ করে আমরা ধন্য। এরপর নারার যা কিছু বিদ্যা ও জ্ঞান সবই সে তাদের উদ্দেশে দান করে সমুদ্রে হারিয়ে গেল। এই আদিবাসীদের মধ্যে বিশ্বাস যে নারার বীরত্ব, ঐশ্বর্য,

যাদু শক্তি সম্পদ এমন কি লিপিকুশলতাও তারা সবাই তাদের বন্ধনী বা পাগড়ীর মধ্যে ধারণ করে চলেছে।

এক বাঘ-মানব ও তার মেয়ে : পাবি (Pawi) লোককথা ঃ-

বাঘ-মানব আর তার মেয়ে জুম ক্ষেতে কাজ করত। দুপুরের আহারের সময় এলেই কোন না কোন অছিলায় খাবার না খেয়ে মেয়েকে রেখে বাবা বেরিয়ে গিয়ে বেশ কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে কাজে যোগ দিত। একদিন যখন দুপুরের খাবার তৈরি হচ্ছিল তখন বাইরে এক হরিণ ক্ষেতের পাশে ডেকে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে বাবা পেটের ব্যথার কথা বলে জল আনতে বেরিয়ে যায় আর মেয়েকে খেয়ে নিতে বলে। ঘর থেকে বেরিয়েই সে বাঘের আকৃতি ধারণ করে হরিণটিকে খাবার পর মেয়ে ফিরে এলে বাবার পেটে ও মুখে রক্তের দাগ দেখে মেয়েটি ভীষণ ভয় পেয়ে যায়। সে বুঝতে পারে যে, তার বাবা আসলে এক বাঘ-মানব। সেও পেটের হজমের গোলমালের কথা বলে বাবাকে ছেড়ে দ্রুত এক যুবকের কাছে এসে আশ্রয় নেয়। বিয়ে করে তাকে নিয়ে জুম ক্ষেতে তার মা-বাবার কাছে নিয়ে যেতে সে অনুরোধ জানালে ছেলেটি রাজি হয়। এরপর সে তার ঘরে ফিরে যাবার পথে রাস্তায় চারটি তীর ফলাকে গুচ্ছ করে বেঁধে মাটিতে পুঁতে দাঁড় করিয়ে রাখে। বাবার মনে মেয়েটির হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ার কথায় কেমন খটকা বাধে। সে দ্রুত ঝর্নার সামনে গিয়ে মেয়েকে খুঁজতে জলের মধ্যে রক্তমাখা মুখের প্রতিচ্ছবি দেখতে পেয়ে বুঝতে পারল যে সন্তানের কাছে সে তার প্রকৃত পরিচয় গোপন রাখতে পারে নি। গ্রামবাসীর কাছে সে মেয়েকে হত্যা করার সংকল্প নিল। ভয়ংকর বার্তাটি পৌঁছনোর আগে বাঘের আকৃতি নিয়ে সে ছুটল ঘরের দিকে। পথের মধ্যে ঢাকা তীর গুচ্ছকে মেয়ে ভেবে এক লাফে সে তাকে গ্রাস করল। কিন্তু সব তীর তাকে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিল। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে কিছু দূর যাবার পরই তার মৃত্যু ঘটল। সন্ধ্যা বেলা বাঘের গর্জনে শংকিত লোকজন ছুটে এসে রাস্তার পাশে তাকে দেখতে পেল। তারা সবাই মিলে তাকে এনে উঠোনে কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখল। ক্রমে তার মানব রূপ ফিরে আসে। বাবার এই মৃত্যুর জন্যে সবাই মেয়েকেই দায়ি করে বিচার বসাল। মেয়েটি তার সঙ্গের কুকুরটি নিয়ে তখন বাড়ি ফিরে গ্রামবাসীদের অভিযোগে পাত্তা না দিয়ে কুকুরটিকে বলল চল, আমরা হত্যাকারীর বাড়ি ছেড়ে চলে যাই। মুহূর্তে কুকুরটি লাফিয়ে পড়ল শবদেহের উপর আর নিমেষে সবাই দেখতে পেল প্রাণহীন দেহটি ক্রমে এক ডোরাকাটা ভয়ানক বাঘের আকৃতি নিয়ে নিল। শোকাহত গ্রামবাসী আতঙ্কে চারদিকে ছুটে পালিয়ে গেল। পরদিন সমস্ত লোক মিলে বাঘ-মানব পরিবারের সবাইকে হত্যা করে তাদের ঘর-বাড়ি পুড়িয়ে ছাই করে দিল।

বাইংগামের কথা : পাবি লোককথা

শিকারি বাইংগাম উঁচু টিলা থেকে নামার পথে দেখতে পেল এক বাঘ হরিণ মেরে তার ভোজের উদ্যোগ করছে। সঙ্গে সঙ্গে হরিণটি তুলে নেবার জন্যে তাক করে ধনুক তুলতেই পশুটি তাকে হত্যা না করার অনুরোধ জানিয়ে বলল, আমি বাঘিনী আমি তোমাকে বিয়ে করে সুখি করব। বিয়ে করার পর স্বামী যাতে রাতের অন্ধকারেও সব উজ্জ্বল দেখতে পায় তাই বাইংগামের দুটো চোখ খুলে নিয়ে সেখানে বাঘের চোখ লাগিয়ে দিল। বাঘিনী শিকার ধরে ঘরে আনে আর তৃপ্তিতে বাইংগাম তার ভোজ সারে। বাঘিনীর নিবিড় ভালোবাসার বন্ধনে বাইংগামের বছর কাটে। ইতিমধ্যে তার ঘরে দুটো ছেলে জন্মায়। দীর্ঘদিন কাটানোর পর একদিন তাদের মহান ধর্মীয় উৎসব খুয়াংচাবির সময় তার গ্রামের স্বজন ও বন্ধুদের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে এবং বাঘিনীকে মেরে পালাবার ফন্দি আঁটে। সে স্ত্রীকে বলল এখনকার গ্রাম প্রধানের বাড়িতে উৎসবের জন্য যে পবিত্র মিথুনটিকে গাছে বেঁধে রাখা হয়েছে তার কলিজা এনে দিতে। বাঘ-রমণী জানে এই অনুরোধ পালন করতে গেলে মৃত্যু অনিবার্য তবু তার প্রাণ রক্ষাকারী ভালোবাসার স্বামীকে দেওয়া প্রতিশ্রুতির প্রতি সে যে দায়বদ্ধ। যাবার আগে সে তার কাছে রক্ষিত বাইংগামের দুটি চোখ তুলে দিয়ে সন্তান দুটিকে জন্ম মৃত্যুর কথা জানিয়ে বলল যে তার অনিবার্য দুটি চোখ যেন তাকে ফিরিয়ে দেয় এবং সে যেন তার গ্রামে ফিরে যায়। সন্তান দুটি যেন স্বামীর পশু ও তার পরবর্তী বাচ্চাদের কোন ক্ষতি না করে এবং তারাও যেন ছেলেদের সুরক্ষা দেয় ও গৃহস্থের কোন ক্ষতি সাধন না করে। তাছাড়া তোমাদের মৃত্যুর পর তারাও যেন তোমাদের মৃত্যুতে কোন অনুষ্ঠান বা উৎসবাদি পালন না করে। এরপর বাঘ রমণী দ্রুত ছুটে গিয়ে মিতুনটিকে মেরে তার কলিজা এনে দিল স্বামীর হাতে। মহানন্দে সবাই যোগ দিল ভোজে। আর তারপরেই গ্রামবাসীর হাতে দারুণভাবে প্রহৃত হয়ে এই রমণী মারা গেল। বাইংগাম গ্রামে ফিরে গিয়ে নতুন করে ঘর বাঁধল। সন্তান সন্ততিতে ভরে উঠল তার ঘর। তাদের উত্তরপুরুষরাই বর্তমানে মুয়ালহ লুনস নামে পরিচিত।

পাবি ঃ একটি মেয়ের বাঘিনীতে রূপান্তরিত হবার কাহিনী। কোনও কালে এক বীর শিকারি তার গ্রামেরই অপরূপা এক কুমারীর প্রেমে পড়লে আত্মীয় জনেরা তাদের বিয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করে। দিনক্ষণ স্থির হবার পর উভয়ে মিলে প্রথাগতভাবে পারস্পরিক সহযোগিতার নিদর্শন রূপে জুম ক্ষেতে চাষের কাজে হাত লাগায়। ক্ষেতটি ছিল গ্রাম থেকে বেশ দূরে। সেদিন প্রচণ্ড গরমে ক্লান্ত ও তৃষ্ণার্ত মেয়েটি পাশের এক ঝর্নায় যাবার অনুমতি চাইতেই যুবকটি তাকে সেখানে যেতে নিষেধ করে। সেখানে পর পর দুটি ঝর্না ছিল। প্রথমটি জল স্পর্শ করলেই ভয়ংকর পরিণতি দেখা

দেয়। তাই মেয়েটিকে সে পরের ঝর্নার দিকে যাবার কথা বলে কিন্তু জল তেষ্টায় মেয়েটির প্রাণ এতই কাতর হয়ে পড়েছিল যে সে আর দ্বিতীয়টির দিকে ছুটে যেতে পারে নি। কাছের ঝর্নায় পিপাশা মিটিয়ে সে দ্রুত জুম ক্ষেতে ফিরে আসে। এর কিছুক্ষণ পরই মেয়েটির মধ্যে অস্বাভাবিক আচরণ দেখা দেয় এবং ক্রমে এক বাঘিনীর লক্ষণ জেগে উঠল। সে অসহায়ভাবে নিজের এই পরিবর্তন অনুভব করে বুঝতে পারল যে মানুষের মধ্যে ঘর করা তার পক্ষে অসম্ভব। সে চোখের জলে প্রেমিককে ছেড়ে জঙ্গলে চলে গেল। বিষণ্ন মনে গ্রামে ফিরে যুবকটি এই খবর দিলে সবাই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। এরপর থেকে গ্রামবাসীরা বাঘিনীর আহার যোগাতে থাকে। কিন্তু ক্রমে এই বাঘ-মানবীর ক্ষুধার গ্রাসে পাশের গ্রামগুলির গরু মোষ শূকর সব উজাড় হতে লাগল। এদিকে তার খাদ্যের যোগান দিতে নিজ গ্রামবাসীরাও অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিল। এই সংকট থেকে উদ্ধার পেতে বসল গ্রামসভা। গ্রামপ্রধান এই বাঘিনীকে হত্যার আদেশ জারি করল আর এই কাজে নেতৃত্ব দিতে নির্বাচিত হল একমাত্র দক্ষ শিকারি—বাঘ-মানবীর প্রেমিক যুবকটি। এই সিদ্ধান্তকে ফিরিয়ে নিতে সে কান্নায় লুটিয়ে পড়ল। কিন্তু গ্রাম প্রধানের অমোঘ নির্দেশ কার্যকরী করতে সে যে বাধ্য। শেষ পর্যন্ত হৃদয়ের সমস্ত বেদনা নিয়েই সে তার প্রেয়সীকে হত্যা করে ঘরে ফেরে আর তাকে ঘিরে সমগ্র গ্রাম জুড়ে চলে বিজয়োৎসব।

পাবি ঃ বাঘ-মানব ও তার প্রেয়সীর কথা—

কোন কালে স্বামী-স্ত্রীর এক সংসার, তাদের খুব সুন্দরী এক মেয়ে নিয়ে সুখে ছিল। একদিন গভীর রাতে তাদের চাংঘরের নীচে পোষা হৃষ্টপুষ্ট শূকরটিকে ধরতে এক বাঘ-মানব ঢুকে পড়ে। শূকর চীৎকার চেঁচামেচি শুরু করলে বাড়ির মালিক তাকে সম্বোধন করে বলল চুপ করতে নইলে তার মেয়ের বিয়ের-ভোজের জন্য তাকে হত্যা করে ফেলবে। একথা শুনতে পেয়ে বাঘ-মানব গ্রামে ফিরে গেল। কিছুদিন পর এই বাঘ-মানব যে ছিল তার গ্রামের প্রধান সে মানব বেশে দলবল নিয়ে এসে মেয়েটিকে বিয়ে দেবার অনুরোধ জানায়। তার রাজকীয় সাজপোষাক আর সুন্দর সুঠাম দেহ দেখে তারা এ প্রস্তাবে রাজী হয়ে যায়। মহা উল্লাসে মদ-মাংস দিয়ে বিয়ের ভোজ প্রস্তুত হল। কিন্তু যখন খাবার জন্যে বর আর বরযাত্রীদের আমন্ত্রণ করা হল তখন তারা পেটের ব্যথার অজুহাত দেখিয়ে সবিনয়ে তা প্রত্যাখ্যান করল। গভীর রাতে সবাই যখন ঘুমে তখন তাদের খুব ক্ষিদে পেল এবং তারা তাদের ঘরে নিয়ে যাবার জন্য রাখা কাঁচা মাংসগুলি খেয়ে চারদিকে কিছু টুকরো ছড়িয়ে রাখল যাতে ঘুম ভেঙে এসব দেখলে সবাই ভাবে যে বিড়াল এসব কাণ্ড করেছে। কিন্তু সে সময় জেগে থাকা কনের বান্ধবীর নজরে সব ঘটনা পড়ে যায় এবং ভীষণ আতঙ্কে সে সারারাত কাটায়। পরদিন ভোরে সে বান্ধবীর কাছে সব প্রকাশ করে দিলে ক্রমে সব জানাজানি হয়ে যায়। ক্রুদ্ধ

হয়ে বাবা মেয়ের বদলে দাসীকে দিতে চাইলে সে ভয়ংকর হয়ে ওঠে ও গ্রামে ফিরে যায়। এদিকে গ্রামবাসীরা তাদের পালিত পশুগুলির উপর বাঘের হামলার ভয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ে। এবং বাঘ-মানবটিকে ফিরিয়ে এনে এই মেয়েটির সঙ্গেই বিয়ে দিতে তার বাবাকে বাধ্য করে। অনিচ্ছায় মেয়েটি স্বামীর অনুগমন করলেও সে গর্বে মেয়েটিকে অস্বীকার করে। নিরুপায় হয়ে মেয়েটি মাঝ পথ থেকে বাড়ি ফিরে এল। কিছুদিন পর অপর এক গ্রাম প্রধানের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। বরের ঘরে আসার পথে পড়ে বাঘ-মানবের গ্রাম। সেই পথ পার হবার সময় তার ঘরে কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম নেবার জন্যে মিনতি জানালে নববধূ তার পূর্ব স্বামীর আহ্বানকে উপেক্ষা করতে না পেরে ভয়ে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়। বাঘ-মানবটি মেয়েটিকে কাতর মিনতি জানিয়ে বলে তার চুল দিয়ে ঝুঁটি বেঁধে দিতে। এবং এই বলে প্রতিশ্রুতি দেয় যে আমৃত্যু সে এই ভালোবাসার স্মৃতিটি বহন করে যাবে। চতুর বধূটি বাঘ-মানবের ঝুঁটির মধ্যে অজ্ঞাতে একটি সাপের ডিম রেখে দিয়ে তার ঘর ছেড়ে স্বামীর বাড়ির পথে চলে যায়। এদিকে, সময় হলে তার মাথায় ডিম পেড়ে সাপের বাচ্চা হয় এবং সে এক বিশাল আকৃতি নিয়ে দেখা যায়। পর মুহূর্তেই সে জলাশয়ের দিকে দ্রুত ছুটতে থাকে এবং বাঘ-মানব তার টানের দ্রুততায় সেই জলাধারে আছড়ে পড়ে প্রাণ হারায়।

খাসিয়াদের মধ্যে প্রচলিত লোককথা ঃ ডিংগিয়েই পাহাড়-এ নাম হল পৃথিবীতে আলোর প্রবেশ পথে প্রতিবন্ধক। এককালে বর্তমানে শিসং পিক্ থেকে উত্তরে দূরে সর্বোচ্চ শৃঙ্গ নিয়ে ডিংগিয়ে পাহাড়ে এক বিশাল বৃক্ষ ছিল। অধিবাসীদের বিশ্বাস ছিল চারপাশে ছায়া ঘেরা অন্ধকার আড়াল করে রেখেছে আলোর প্রকাশ। এটিকে উচ্ছেদ করতে পারলেই ফসলে ভরে উঠবে ক্ষেত। দেখা দেবে প্রাণের প্রাচুর্য। গ্রামবাসীরা মিলে প্রতিদিনই গাছটির কিছু অংশ কেটে ঘরে ফিরে আর পরদিন গিয়ে দেখা যায় কে বা কারা যেন সেই কাটা অংশ জুড়ে দেয়। বিস্মিত অধিবাসীরা এর কোন কারণ খুঁজে পেতে ব্যর্থ হয়ে এই দৈবি ঘটনায় বিমূঢ় হয়ে পড়ে। এভাবে একদিন তারা যখন নিজেদের মধ্যে এ নিয়ে কথা বলছিল তখন সব শুনে একটি ছোট পাখি কা-ফ্রেইড (Ka Phreid) জানায় যে প্রতিদিন রাতে একটি বাঘ এসে গাছের গুড়ির কাটা অংশ জুড়ে দিয়ে যায়। পরদিন সবাই মিলে সারাদিন গাছের কিছু অংশ কেটে দেবার সময় ধারালো কুড়ালের অগ্রভাগ ও ছুরির ফলা তার মধ্যে কষে বেঁধে ঘরে ফিরে। গভীর রাতে যথারীতি বাঘ এসে গর্তে মুখ দিতেই তার জিহ্বা কেটে যায় ও ক্ষত বিক্ষত যন্ত্রণায় সে গভীর অরণ্যে পালিয়ে যায়। এরপর মহা উৎসবে তারা এই গাছটির (কা-ডিংগেই) উৎপাদন ঘটায় এবং এর ফলে পৃথিবীতে নেমে আসে সূর্য কিরণ আর চাঁদের আলো, মাঠে মাঠে জেগে ওঠে শস্যের সম্ভার। এই বৃক্ষের কোন বীজ আর কোথাও অংকুরিত হয়নি।

মাও নাগা মিথ ঃ বাঘ অশরীরী আত্মা ও মানবের জন্ম— মাও নাগা মিথ অনুযায়ী, বাঘ, অশরীরী আত্মা এবং মানব আকৃতির জীব এই তিনজন ছিল ভাই। এদেরই, অলৌকিক মিলনের ফলে আদি মানবী এবং আকাশ ও মেঘের মিলনে বৃষ্টির জন্ম হয়। এই আদি মানবী হল প্রাকৃতিক শক্তি, তার নাম ছিল জিলিম ও শিরিও এটার অর্থ হল পবিত্র স্বচ্ছ জল। একদিন সে মাখেল নামের এক জায়গায় বিশাল এক গাছের নীচে তার দীর্ঘ দুটি পা ছড়িয়ে বসে ছিল। এই জায়গাটিকেই তেংগিমি এবং তাদের সহযোগী অন্যান্য নাগা জনগোষ্ঠীর প্রব্রজনের শেষ স্থান হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। হঠাৎ একদল মেঘ তার উপর দিয়ে ক'ফোঁটা বৃষ্টি ঝরিয়ে চলে যায়। এই বৃষ্টির ফোঁটা থেকেই জন্ম হয় বাঘ, অশরীরী আত্মা এবং মানুষের।

আদি জননী বৃদ্ধ হলে পর তিনভাই মায়ের যত্ন ও শুশ্রূষা করতে থাকে। বাঘ যখন মায়ের কোলে থাকে তখন তার শরীরে উদ্বেগ ও যন্ত্রণা বাড়তে থাকে। কারণ ছেলেটি মার মৃত্যুর পর তার শরীরের হাড় মাংসগুলি মহানন্দে খেতে পারবে এই লোভে বাঘের চোখ চিক্ চিক্ করতে থাকে। অশরীরী আত্মা যখন শুশ্রূষায় এগিয়ে আসে তখন মার মাথার যন্ত্রণা বেড়ে যায়, শ্বাস কষ্ট শুরু হতে থাকে। কেবল তখনই মা স্বস্তিতে থাকে যখন মানবসন্তানটি পরম যত্ন নিয়ে নিঃস্বার্থভাবে সেবায় নিয়োজিত হয়। এর মধ্যে মার মৃত্যুর পর অধিকৃত জমির উত্তরাধিকার কে পাবে এ নিয়ে তিন ভাইতে ঝগড়া বেঁধে যায়। পরিস্থিতি যখন জটিল ও সংঘাতময় হয়ে উঠে তখন এর মীমাংসার জন্য তিনভাইকে শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিযোগিতায় পরীক্ষা দিতে আহ্বান জানায়। বাঘের মত বস্তু দিয়ে একটি বল বানিয়ে ওটাকে দূরে ছুঁড়ে দিয়ে মা বলল ওটাকে যে প্রথম ছুঁতে পারবে সেই তার জমি অধিকার করতে সক্ষম হবে। যেহেতু মানব সন্তানটি ছিল সব থেকে ছোট এবং গুণ সম্পন্ন তাছাড়া তার পক্ষে দৌড়ে বড় ভাইদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেরে ওঠাও অসম্ভব তাই তাকে একটি তীর ধনুক বানিয়ে এনে একটি বল লক্ষ্য করে তীর বিদ্ধ করার আহ্বান জানায়। স্বাভাবিকভাবেই এই প্রতিযোগিতায় মানব-সন্তানের জয় হয়। ক্ষুব্ধ ও হতাশ হয়ে বাঘ চলে গেল জঙ্গলে আর অশরীরী আত্মা দূর দক্ষিণ পথ কাশিপির দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল। এই মিথটি আঙ্গামি ও চাকে নাগাদের মধ্যেও প্রচলিত রয়েছে। প্রকৃত অর্থে বাঘ ও মানুষ প্রতিনিধিত্ব করে পশু জগতের এবং আত্মা অলৌকিক জগতের কিন্তু উভয়েরই জন্ম একই মায়ের গর্ভে। আর এই মা আকাশ দেবতা, আর ধরিত্রী সম্মিলনে আদি মানব ও মানবীকেন্দ্রিক শক্তির আধার ও পুনর্জন্ম বা রূপান্তরের প্রতীক।

এই কাহিনীর মধ্যে চৈনিক ইয়েন ও ইয়ানদের মধ্যে প্রচলিত সৃষ্টিতত্ত্ব বা ভারতীয় পুরুষ-প্রকৃতি তত্ত্বের গূঢ় কথাটির সাদৃশ্য রয়েছে।

বাঘ নিয়ে সংস্কার, তার উদ্দেশে অর্ঘ্য নিবেদন, টোটেম বিশ্বাস, ছড়া, প্রবচন ইত্যাদির ব্যাপক বিস্তার এশিয়ার প্রায় সর্বত্রই রয়েছে। ভারতের পুরাণ, উপপুরাণেও

তার নানা প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। দেখা যায় যে, সাঁওতালদের মত সিরগুজা, যশপুর, পালামৌ এবং লোহারডাঙ্গা জেলার কিছু অংশের নাগেশর আদিবাসীদের মধ্যেও বাঘ পূজার প্রচলন ছিল। এই বাঘ বনের রাজা কিংবা জঙ্গলের দেবতা রূপে পূজিত হত। তাদের মধ্যে 'শিকারী দেওতা' নামে এক অশরীরী আত্মার সন্তুষ্টি বিধানের জন্য ছাগ বলি দিত। হো-জাতীয়দের মধ্যে বাঘ পূজার প্রচলন না থাকলেও তারা বাঘের নামে শপথ নিয়ে ত্রাণের পথ খুঁজত। কোন কোন আদিবাসীদের মধ্যে বাঘের ছাল স্পর্শ করেও শপথ গ্রহণের রীতি ছিল। এই অঞ্চলের ভূঁইহাররা অবশ্য এই প্রাণীটিকে হিংস্র বলেই জ্ঞান করত এবং দেখা মাত্রই তাকে হত্যা করতে ছুটে যেত। (Descriptive Ethnology of Bengal : E.T. Dalton)

জানা যায়, থাইল্যাণ্ডে বেশ ক'বছর আগেও যখন একই অপরাধের দায়ে অনেক লোককে অভিযুক্ত করা হত তখন তাদের বাঘের আস্তানায় নিক্ষেপ করা হত। যে ব্যক্তিটিকে বাঘ প্রথম মেরে ফেলত তাকেই মূল অপরাধী রূপে সাব্যস্ত করা হত। জাপানীদের বিশ্বাস যে বাঘের আয়ু হল হাজার হাজার তাই সামুরাইদের প্রতীকী চিহ্ন হল বাঘ। মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার লোককথায় বাঘ হল মানবের বন্ধু।

আমাদের দেশে বাঘ শুধু পূজ্যই নয়, এক ব্রাহ্মণ কন্যার সঙ্গে বাঘের বিয়ের প্রসঙ্গে লোককথাও রয়েছে।

বাঘ-মানব ও বাঘ-মানবী প্রসঙ্গে একটি কথা অনুসন্ধিৎসু আলোচক ও গবেষকদের কাছে নিবেদন করতে চাই যে, বাংলার সুন্দরবনের বাঘ-দেবতা দক্ষিণ রায় উত্তর-পূর্বের আদিবাসীদের ধারণায় উদ্ভাসিত এমন কোন 'বাঘ-মানব' ছিলেন কি না এই সম্ভাবনাটিকে বিচার করে দেখার জন্যে।

অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসী, তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতির অনুষঙ্গে লোককথা

রত্না রশীদ

অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের আদিবাসী জনগণদের বলা হয় এ্যাবোরিজিন্‌স্। আফ্রিকা ও দক্ষিণ এশিয়ার কালো মানুষেরা তৎকালীন জলযানে অস্ট্রেলিয়ায় পৌঁছয়, বসবাস শুরু করে। তারপর সমুদ্রের জলস্তর ভীষণরকমভাবে বেড়ে গেলে আর প্রত্যাবর্তন সম্ভবপর হয়নি। 'এসার প্রক্রিয়া চলেছিল বহুবছর ধরে। হাজার হাজার বছর আগে, আলাদা আলাদা প্রায় চার শতাধিক দলে অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে এই এ্যাবোরিজিন্‌স্‌রা বসবাস শুরু করে। এদের মধ্যে বেশ কিছু দল উপযুক্ত স্থান বেছে নিয়ে চাষবাস শুরু করে, বেশ কিছু দল বছরের নির্দিষ্ট সময় চাষ-পশুপালন ও অন্যান্য সময় নির্দিষ্ট অঞ্চলের মরসুম অনুযায়ী স্থানান্তরিত হয়ে গোষ্ঠী সংস্কৃতি গড়ে তোলে। আবার বেশ কিছু দল কেবলই শিকার ও খাদ্য সংগ্রহ করার জন্য নিজেদের জন্য নির্দিষ্ট এলাকায় যাযাবর জীবন যাপন করতে থাকে।

Robert Hillman তাঁর 'Aboriginal Australia' বইতে লিখেছেন "Indigenous Australians' and 'Aboriginal people are terms refer to the original inhabitants of Australia and their decendants." যাই হোক, এই বিশেষ শব্দগুলো বৃটিশ ক্যাপটেন আর্থার ফিলিপ এর, ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে অস্ট্রেলিয়ার পোর্ট জ্যাকসনে উপস্থিত হবার পর নিউসাউথ ওয়েলস্-এ বৃটিশ কলোনী স্থাপন করার আগে কখনই ব্যবহৃত হয়নি। তার আগে বৃহৎ অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসী কালোমানুষেরা নিজেদের একজাতি হিসেবে ভাবত না,— উল্টে বরং নিজেদের গণ্য করতো বিভিন্ন ট্রাইব দলের কোন একটি দলের সদস্য হিসাবে। কারণ, গোটা মহাদেশে ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন ট্রাইবাল দলগুলোর মধ্যে প্রায়শই কোন যোগাযোগ থাকতো না। এক -একটি দল পরিচালিত হতো তাদের স্বাধীন দলনেতার দ্বারা। এই এ্যাবোরিজিন্যাল মানুষেরা বৃটিশদের অস্ট্রেলিয়া দখলের প্রায় ষাট হাজার বছর আগে অস্ট্রেলিয়ায় আসে, এবং সেখানকার মাটি-জল-হাওয়ার সঙ্গে যথাযথভাবে অভিযোজন ঘটিয়ে হাজার-হাজার বছর স্বাধীনভাবে বেঁচে থেকেছে কোন তথাকথিত সভ্য বিদেশি দেশের ভণ্ড সহায়তা ছাড়াই, এবং গড়ে তুলেছে এক অত্যন্ত সমৃদ্ধ সভ্যতা-সংস্কৃতি। একথা তো সবার জানা যে, সমগ্র পৃথিবীতে 'সভ্যতা' স্থাপনের জন্য,.পৃথিবীর মানুষকে 'উন্নত-সভ্য' করার ঠিকেদারী সংস্থা বৃটিশ সরকার তাবৎ পৃথিবীটাকে তার কলোনীতে পরিণত

করেছিল, গর্বের সঙ্গে তারা আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদী আস্ফালনে উচ্চারণ করতো,— ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সূর্য কখনো অস্ত যায় না। আমাদের দেশ ভারতবর্ষ তার আগ্রাসী থাবার নীচে আটকে ছিল আড়াইশো বছর।

যাইহোক, ব্রিটেনে শিল্প বিপ্লবের পরে ধনবণ্টনের অসাম্যজনিত কারণে দ্রব্যমূল্যের অভাবিত বৃদ্ধি ঘটায় নিম্নবিত্ত মানুষের নাভিশ্বাস উঠেছিল। নিছক ক্ষুন্নিবৃত্তির কারণে ছোটখাটো চুরি— রুটিচুরি, ফলচুরি,—ইত্যাদির জন্যেও কঠোর বৃটিশ আইন নাগরিকদের জেলে পুরতে লাগল। ফলত: অত্যধিক পরিমাণে জেলবন্দীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় কারাগারে স্থান সঙ্কুলান এবং খাদ্যজোগান ব্রিটিশ সরকারের সমস্যা হয়ে মাথাচাড়া দিল। রথদেখা ও কলাবেচা দুইয়ের উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সরকার সুচতুরভাবে জাহাজভর্তি করে জেল বন্দীদের অস্ট্রেলিয়া মহাদেশে চালান করতে লাগল,— সঙ্গে দুবছরের খাবার দিয়ে দিল, — যেভাবে খুশি অস্ট্রেলিয়া মহাদেশে আবাদ করো— বাঁচো— ইউনিয়ন জ্যাক পুঁতে দাও সেখানকার সর্বত্র, —অথবা মরো। যা ইচ্ছে তাই করো, কিন্তু ব্রিটেনে আর স্থান নেই তোমাদের। এই অর্থে, এই চালান আসা বৃটিশ জেলবন্দীদের কাছে অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসী ভূমিপুত্রদের (এ্যাবোরিজিন্যাল পিপ্‌ল) কাছ থেকে ভূমি কেড়ে নেওয়ার সংগ্রাম তাদেরও জীবন সংগ্রামই ছিল। ব্রিটেনের মত এক অত্যাধুনিক দেশে বসবাসে অভ্যস্ত মানুষেরা সম্পূর্ণ ভিন্ন জলবায়ু, পাথর কাঁকর ও বালুকাময় মরুভূমি, নয়তো মাইলের পর মাইল জঙ্গলে আবৃত অনুন্নত অস্ট্রেলিয়া মহাদেশে সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্মী জীবন যাপনে বাধ্য হয়েছিল। এবং এ্যাবোরিজিন্যালরা বিনা অপরাধে ব্রিটিশ অপরাধীদের সঙ্গে অসম যুদ্ধে (লাঠি-সড়কির সঙ্গে আগ্নেয়াস্ত্র বন্দুক) নিজেদের মাতৃভূমি রক্ষার জন্যে হাজারে হাজারে প্রাণ দিল। গুটিকয় যে কজন প্রাণে বাঁচল নিজেদের বাসস্থান থেকে উৎখাত হয়ে, ভূমি নির্ভর প্রকৃতি নির্ভর জীবনযাপন থেকে উৎপাটিত হয়ে ব্রিটিশ সেট্‌লারদের ক্রীতদাসে পরিণত হল। নিজেদের ভাষা— সংস্কৃতি-জীবনাচরণ— ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে খ্রীষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত হল শুধু ক্ষুন্নিবৃত্তি আর আশ্রয়ের অসহায়তায়। শক্তিশালী সংস্কৃতি দুর্বলকে গ্রাস করল নির্মমতায়।

ব্রিটিশদের অস্ট্রেলিয়া আগ্রাসনের আগে এ্যাবোরিজিন্‌দের বিভিন্ন গোষ্ঠীর প্রায় পাঁচশতাধিক দল ছিল। প্রত্যেকের ছিল নিজস্ব গোষ্ঠীগত ভাষা, গোষ্ঠীগত সংস্কৃতি। এই পাঁচশতাধিক এ্যাবোরিজিন গোষ্ঠীর ভিন্ন ভাষা ভিন্ন সংস্কৃতি থাকলেও এদের মধ্যে কিন্তু একটা অদ্ভুত সাদৃশ্যও লক্ষ্য করেছেন গবেষকরা। দেখা গেছে উত্তরের গুলবার্ণ আইল্যাণ্ড-এর এ্যাবোরিজিন জনগণ অর্থাৎ মঙ্‌ (Maung) উপজাতির জনগণের থেকে বহু- বহুদূরে অবস্থিত দক্ষিণের নিউসাউথ ওয়েল্‌স্-এর জিলামাটাং (Djilamatang) উপজাতিদের সঙ্গে কস্মিনকালেও দেখা-সাক্ষাৎ না হলেও কিছু কিছু বিশ্বাস ও আচরণে অদ্ভুত মিল পাওয়া গেছে। উভয় দলের উপজাতিই কক্ষনো তাদের টোটেমপ্রাণীর হত্যা করতো না যতই কেন ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর থাকুক না কেন, উভয়

দলই মৃত ব্যক্তির আত্মাকে সম্ভ্রম মিশ্রিত ভয় করতো—প্রয়োজনেও তাদের নাম উচ্চারণ করতো না, উভয় দলই একটা বিশেষ বয়সের পর তাদের দলীয় আইন প্রকরণে দীক্ষিত করতো নারী-পুরুষকে, ইত্যাদি।

সেট্‌লার ব্রিটিশরা এ্যবোরিজিন জনজাতিকে 'অশিক্ষিত বর্বর' হিসাবে গণ্যও করলেও, পরবর্তী কালের গবেষণা প্রমাণ করেছে যে, তারা এক অত্যন্ত সমৃদ্ধ সভ্যতা- সংস্কৃতির ধারক— বাহক ছিল। মৌখিক পরম্পরায় সুরক্ষিত তাদের নিজস্ব সামাজিক আইন কানুন ছিল, বেড়া বা পাঁচিল দিয়ে না ঘিরেও তারা নিজস্ব অঞ্চল চিহ্নিত রাখতো। ব্রিটিশরা ভেবেছিল এরা তাদের নিজস্ব টেরিটরি চিহ্নিত করতে পারতোনা না, আসল সত্য এই যে, এ্যবোরিজিন সভ্যতায় বেড়া— পাঁচিল-এর কোন প্রয়োজনই থাকতো না (এর চেয়ে বড়ো সভ্যতার নিদর্শন আর কী-ই বা হতে পারে।) ভূমি-জঙ্গল জলাশয় রক্ষা করে চলা নিজেদের জীবনযাপনের উপযোগী অত্যন্ত উন্নত বুদ্ধিমত্তা ছিল। এমন নয় যে তাদের মধ্যে, কোন গোষ্ঠীগত লড়াই হতো না, কিন্তু তাদের আইনটাই এমনভাবে সুবিন্যস্ত ছিল যে, সেই লড়াই চারপাশের পরিবেশ ও প্রতিবেশকে সহজে আঘাত করতো না, বরং সংরক্ষণ করতো। তাদের ধর্মবিশ্বাস এমনভাবে গড়ে উঠেছিল যে জমি-জল-জঙ্গল পাহাড়-পর্বত জীব-জন্তু-সরীসৃপ-এর এক অভিন্ন বলয়ে মানুষ এক শরিকমাত্র। স-ব যেন একসূত্রে গাঁথা। প্রত্যেকেরই নিজস্ব সত্তা আছে। সব কিছুর মধ্যে তারা এক অভিন্ন সত্তার শক্তি অনুভব করতো। একটার থেকে অন্যটাকে বিচ্ছিন্ন করাকে তারা মহাপাপ বলে গণ্য করতো। তাদের মধ্যে প্রচলিত মিথ্‌-লেজেণ্ড ও ফেব্‌ল্‌ গুলো এই বিশ্বাসেরই সাক্ষ্যবাহী। যেমন **'এমু, গেকো, এবং বালকের কাহিনী'** : এমু এমন এক পাখীর নাম যা কেবল অস্ট্রেলিয়া মহাদেশেই পাওয়া যায়। 'গেকো'— বৃহৎ আকৃতির টিকটিকি বিশেষ। এবং বালক,— মনুষ্যশাবক। গল্পটা এরকম ঃ- বহু-বহুদিন আগে একটা ছোট ছেলে বাবা-মায়ের সঙ্গে জঙ্গলে বেড়াতে বেড়াতে বাবা-মায়ের হাত ছেড়ে হারিয়ে যায়। এক এমু পাখী তাকে দেখতে পায়, এবং আদর করে নিজের বাড়িতে নিয়ে যায় এবং মায়ের মতন খুবই যত্ন-আত্তি করে। অল্প সময়ের মধ্যেই এমুর ঐ বালকটিকে নিজের সন্তানের মতন মনে হতে থাকে, এবং সে তার অন্তর থেকে চাইতে থাকে যেন বালকটি তারই সন্তান হয়ে যায়। গেকো তখন এমুকে জোরে বকুনি দেয়।— "ভালোবেসেছো- বেশ করেছো। ওতো ভালবাসার যোগ্য ছেলেই বটে। কিন্তু সত্যি যদি তোমার ভালবাসা খাঁটি হয়, তোমার উচিত ওকে ওর নিজের বাবা-মায়ের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া।" এমু এই সদুপদেশ মেনে নিতে পারে না, কারণ সুন্দর-নিষ্পাপ বালকটি তার সমগ্র মাতৃসত্তাকে অধিকার করে বসে আছে। তখন গেকো নিজেই সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল যে, যেভাবেই হোক বালকটিকে তার বাবা-মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে। কিন্তু ভাবা, আর কাজটি করতে পেরে ওঠা, তো এক জিনিষ নয়। গেকো ভাবল সে নিজে যদি বালকটিকে তার বাবা-মায়ের কাছে ফেরত দিতে নিয়ে যায়, তাহলে তার গমন পথ অনুসরণ করে

শিকারীরা তাকে মেরে ফেলতে পারে। তার চেয়ে বরং এক বুদ্ধি করা যাক। গেকো গভীর জঙ্গলে গেল এবং একটা গাছ থেকে কালো লম্বা আঁশ সংগ্রহ করল। ঐ ব্লাক ফাইবারগুলো থেকে সে মস্ত লম্বা মোটা দড়ি বুনে ফেলল। তারপর সে দড়িটির একটি প্রান্ত ছেলেটির হাতে দিল, এবং অন্যপ্রান্ত নিজে ধরে রাখল, এরপর ছেলেটিকে বলল— "শোন বাবা, তুমি এই দড়ি ধরে ধরে চতুর্দিকে তোমার নিজের দল ও বাবা-মাকে খুঁজে দ্যাখো। যদি তাদের দেখা পেয়ে যাও, তাহলে তোমার হাতে থাকা দড়ির এই প্রান্তটিতে একটা মৃদু ঝাঁকুনি দেবে, আমি ওটিকে রোল করে এখান থেকেই গুটিয়ে নেবো। আর যদি তাঁদের সন্ধান না পাও, এই দড়িটা অনুসরণ করে আবার আমার কাছে ফিরে এসো। আমি তোমাকে আমার আর এমুর বাড়ীতে আবার ফিরিয়ে নিয়ে যাবো।" সৌভাগ্যের বিষয়, একদিনে না হলেও, বেশ কয়েক দিনের বারংবার চেষ্টায়, বালকটি তার বাবা-মাকে খুঁজে পায়, এবং পুনর্মিলিত হয়।

এই গল্পটির মধ্যে পাখী, সরীসৃপ, স্তন্যপায়ী মানুষ এবং প্রকৃতির মধ্যে এক গভীর আত্মীয়তাবোধের কথা প্রকাশিত হয়েছে। পাখী মনুষ্য শাবককে আশ্রয় ও ভালবাসা দিয়েছে, সরীসৃপ তার প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করেছে, এমনকি বৃক্ষ তার ফাইবার জুগিয়ে বালকটিকে তার বাবা-মার সঙ্গে পুনর্মিলিত হতে সাহায্য করেছে।

প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় যোগসূত্রকে মান্য করেই গড়ে উঠেছিল এবোরিজিন সভ্যতা ও সংস্কৃতি। ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানগুলোও গড়ে উঠেছিল প্রকৃতিকে সম্মাননা জানানোকে কেন্দ্র করে। ভূমিকে— বনাঞ্চলকে জলসম্পদকে সম্মাননা জানানোই ধর্ম। তারা বিশ্বাস করতো, সামান্য অসম্মান প্রদর্শিত হলে ধ্বংস হয়ে যাবে চারিপাশের প্রকৃতি। এবং পরিণামে সদলবলে তারা নিজেরা। জমি নির্ভর জীবন ছিল তাদের, তা সে চাষবাস, কি ফলমূল সংগ্রহ, কি পশু শিকার,— সবটাই তো ভূমিকে ভিত্তি করেই। কিন্তু এই ভূমি বা জমি দখলে রাখার কথা কেউ ভাবতেও পারতো না। ভূমি বা জমিকে তারা সম্পদ হিসেবে গণ্যও করতো না, 'মা' হিসেবে মান্য করতো,— পূজা করতো। ভূমি এদের প্রয়োজন ছিল ঠিকই, প্রত্যেক গোষ্ঠী বা উপজাতিদলের নিজস্ব চিহ্নিত অঞ্চল ছিল (Territory) এটাও ঠিক, কিন্তু তার কোন ব্যক্তিগত মালিকানা ছিল না। অন্যদলের বিপদে বা প্রযোজনে নিজেদের এলাকায় আমন্ত্রণ জানাতো তারা বিপদ সামলে নেবার জন্যে। যেমন, খরা বন্যা বা দাবানলের সময়। প্রত্যেক গোষ্ঠী বা উপজাতি দলের নিজস্ব চিহ্নিত এলাকা থাকলেও তার সীমা নিয়ন্ত্রিত হতো গোষ্ঠীর আয়তন এবং এলাকায় খাদ্য জলের সহজলভ্যতা বা অপ্রাপ্যতার ওপর নির্ভর করে। কোন সুজলা-সুফলা-উর্বর জায়গায় কোনো গোষ্ঠীর পাঁচশো স্কোয়্যার কিলোমিটার হলেই চলে যেত। উল্টো দিকে অনুর্বর মরু এলাকায় কোনো গোষ্ঠীর একলক্ষ স্কোয়্যার কিলোমিটার বা তার চেয়েও বেশি জায়গার প্রয়োজন হতো। গোষ্ঠীর প্রয়োজন মাফিক তাদের Territory নির্ধারিত হতো। প্রয়োজনের অতিরিক্ত জমি এলাকাভুক্ত করে রাখার কথা কেউ ভাবতেও পারতো না। অতি সম্প্রতি কয়েকজন

এ্যাবোরিজিন মানুষের সঙ্গে এব্যাপারে সরাসরি কথা বলার সুযোগ হয়েছিল। তাঁদের সঙ্গে কথা বলে একই রকম উত্তর পেয়েছি— "জমি আমরা দখল করিনা, কেনা বেচার কথা তো ভাবতেও পারিনা। কারণ এটা আমাদের ধ্যান-ধারণা সভ্যতা-সংস্কৃতিতে নেই। জমিকে আমরা 'মা' বলে মনে করি, তার কোলে জন্মাই, বেড়ে উঠি, তার মমতাময় আঁচলে সঁপে দিই নিজেদের তার একনিষ্ঠ সেবক হিসেবে। 'জমি-মা'-এর আমরা সেবা করি, যত্ন করি, পূজা করি আজীবন। কী করে তাকে পয়সা দিয়ে কেনাবেচা করতে হয়, নিজের মা-এর কী করে মালিক হয়ে উঠতে হয়, —এ আমাদের চিন্তারও বাইরে।"

প্রত্যেক গোষ্ঠীর মানুষ তাদের নিজস্ব এলাকাকে, নিজেদের 'মা'-টিকে, হাতের তালুর মতো চিনতো। কোথায়-কখন- কোন্ ফসলটা ফলবে, কোথায় মিষ্টি জলের উৎস আছে, কোথায় বছরের কোন্ সময়ে শিকার সহজলভ্য হবে—স-ব বংশ পরম্পরায় ছিল তাদের নখদর্পণে। কঠোর আইন প্রবর্তিত ছিল তাদের মধ্যে,— কতটা বড়ো হলে তবে কোন্ জন্তুকে শিকার করা যাবে, বছরের কোন্ সময় কোন্ এলাকায় কতখানি ফসল সংগ্রহ করা যাবে, কেমনভাবে মিষ্টি জলের উৎসকে সংরক্ষণ করতে হবে, কেমন করে আগুনের সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার করতে হবে,— সব ব্যাপারে তাদের নিজস্ব ধর্মীয় আইন ছিল। প্রকৃতিকে নিঃশেষ করে উদরপূর্তি ঘটাতোনা তারা। প্রকৃতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে জীবন যাপন করতো। উর্বর জমি এলাকার জনজাতিরা চাষবাসে সুদক্ষ ছিল, উপকূলবর্তী এলাকার জনজাতিরা ছিল দক্ষ মাঝি-জেলে-নাবিক, মরুবাসীরাও তাদের এলাকার মধ্যে উপযুক্ত খাদ্য-পানীয় খুঁজে নিতে পারতো, যদিও অন্যেরা (বিদেশীরা) সেই স্থানকে মনে করতো অনুর্বর, খাদ্যপানীয়হীন এলাকা বলে। ভূমি-বনাঞ্চল-জলসম্পদের কোনরকম ক্ষতি না করে, তাকে যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ করে, পরিবেশকে জীবনের উপযোগী করে রেখে বসবাস করতো তারা। আমার পরিচিত এ্যাবোরিজিন কয়েকজন আক্ষেপ করছিলেন, "তথাকথিত আধুনিক বিজ্ঞানচর্চা করা ইউরোপীয়ানরা মাত্র এই কয়েকশো বছরে এলাকা দখল করার ফলে তাদের অবিমৃষ্যকারিতায় হারিয়ে গেছে হাজার হাজার প্রাচীন প্রাণী, সরীসৃপ, পাখী ও গাছপালা। অথচ আমরা সত্তর হাজার বছর ধরে এদেশটায় বসবাস করছি— ব্রিটিশরা আসার আগে তো কই এ জিনিস ঘটেনি।"

এ্যাবোরিজিনদের নিজস্ব চিকিৎসা পদ্ধতিও ছিল। এমনিতে খাদ্য-পানীয়-শরীরচর্চায়-ধর্মীয় আইন অনুযায়ী চলায় অসুখ-বিসুখ কম হতো। কিন্তু অসুখ বিসুখ হলে, গাছের ছাল-ফল-ফুল বীজ- প্রাণীর চর্বি ইত্যাদি দিয়ে তারা তাদের রোগ অসুখ ক্ষতের চিকিৎসা করতো। এদের বেশ কিছু ওষুধ বর্তমানের সভ্য ইউরোপীয় সমাজ গ্রহণ করেছে। যেমন 'পিট্‌জুরি' বা পিটুরি (Pityuri) বলে একটা গাছ ছিল যাকে শুকিয়ে ছোট ছোট চিপ্‌স্ করে চিবিয়ে খাওয়া হতো কোনো লম্বা জার্নির প্রাক্কালে। এটা মানুষের শারীরিক শক্তিবর্ধক ও ব্যথা নিরাময়ের ওষুধ হিসেবে খুবই কার্যকরী

ছিল। সমগ্র অস্ট্রেলিয়া জুড়ে এই পিটুরির ওষুধ হিসেবে ব্যাপক বাণিজ্যিক চাহিদা ছিল। সেরকমই এক বুনো লিজার্ড গোয়ানা'-র চর্বি ব্যবহৃত হতো ক্ষত নিরাময় ও যন্ত্রণা উপশমের এক অব্যর্থ মলম হিসেবে। ব্রিটিশরা এদের অনুসরণ করে ব্যাপারটি জেনে নিয়ে ব্যাপকভাবে গোয়ানার চর্বি সংগ্রহ করে। ফ্যাকট্রিতে তাকে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করে পৃথিবীতে বাণিজ্য করেছে এই সেদিন পর্যন্ত। 'ইগুয়ানা' ব্রাণ্ডেড নাম দিয়ে এর ব্যাপক রপ্তানী হতো পৃথিবীময়। এটা অত্যন্ত কার্যকরী ছিল বন্দুকের তেল হিসাবেও (excellent for Gun oiling) । এই লিজার্ড গোয়ানা ছিল নিউ সাউথ ওয়েল্স্-এ বসবাসকারী বুনজালাং (Bunjalang) গোষ্ঠীর এ্যবোরিজিনদের টোটেম। ব্যাপকভাবে নিঃশেষ হচ্ছিল বলে কুইন্সল্যাণ্ড গভর্ণমেণ্ট গোয়ানাকে সংরক্ষিত স্পিশিশ হিসাবে ঘোষণা করলেও, গোয়ানা তেল উৎপাদন বন্ধ করা যায়নি। ব্যাপারটা অমর হয়ে বেঁচে আছে একটা ছোটদের রাইমে ঃ-

Old Marconi's dead,
Knocked on the head.
Goanas are glad,
Childrens are sad.
Old Marconi's dead.

যোশেফ মার্কনী ছিলেন গোয়ানা তেল প্রস্তুতকারক। তাঁকে স্মরণে রেখে কুইন্সল্যাণ্ডের শিশুরা এই ছড়া সুর করে গায়, —মার্কনীর মৃত্যু শিশুদের কাছে দুঃখের হলেও, গোয়ানারা যে এতে খুব খুশী হবে, সেটা শিশুরাও বুঝতে পেরেছে।

আরও কয়েকটা ব্যাপারে বর্তমান অস্ট্রেলিয়া সরকার এ্যবোরজিন টেকনিকের সাহায্য নিয়েছে,— এর একটা হল বর্তমান অস্ট্রেলিয়ার সবচেয়ে বড় সমস্যা 'দাবানল'-এর সুনিয়ন্ত্রণ। সম্পূর্ণ এক ভিন্ন পদ্ধতিতে, প্রয়োজনীয় স্থানে আংশিকভাবে নিজে থেকেই বনে আগুন লাগিয়ে, তারা বনাঞ্চলকে ছোট ছোট টুকরোয় বিচ্ছিন্ন করে রাখতো। বছরের কোন্ সময়ে কোন্ দিক থেকে কেমন জোরে বায়ু বয়, এ হিসাব ছিল তাদের নখদর্পণে। সেটা পরিমাপ করে তারা বনের এমন জায়গায় আগুন লাগিয়ে দিতো, যাতে আগুন বহুদূর ছড়াতে না পেরে নিজে থেকে নিভে যায়, যাতে ঐ জঙ্গলের পশু-পাখী খুব ক্ষতিগ্রস্ত না হয়— পাশের জঙ্গলে আশ্রয় নিতে পারে, যাতে জঙ্গলের অপ্রয়োজনীয় অংশ পুড়ে সাফ হয়ে গিয়ে পরবর্তী মরসুমে উর্বরা হয়ে উঠতে পারে। সাম্প্রতিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, কোন কোন ইউক্যালিপটাস গাছের বীজ দশকের পর দশক মাটির ওপর প্রতীক্ষায় পড়ে থাকে, কবে জঙ্গলে আগুন লাগবে আর তারা অঙ্কুরিত হয়ে সজীব হয়ে উঠবে। বৃষ্টির জল এদের অঙ্কুরোদগম ঘটাতে পারে না, প্রয়োজন আগুনের উত্তাপ। দাবানল তাই প্রকৃতিরই প্রয়োজন। কিন্তু তা যাতে মানুষ ও জীবজগতের ক্ষতি করতে না পারে, বরং উপকারে লাগে, সেরকম সুনিয়ন্ত্রণের টেকনিক আধুনিক বিজ্ঞানের উন্নত শিক্ষায় নেই। তাই এইমাত্র বছর দুয়েক আগে অস্ট্রেলিয়ার রাজধানী ক্যানবেরার পাশের বিশাল এলাকা জোড়া বনাঞ্চলে

একুশ দিন ধরে দাবানল জ্বলেছে হু-হু করে। সে-এক দিবারাত্রির অগ্ন্যুৎসব। হাজারে হাজারে পশুপাখী পুড়ে মরেছে, যথাসম্ভব চেষ্টায় মানুষজনকে দ্রুত সরিয়ে নেবার চেষ্টা হলেও মনুষ্যপ্রাণহানি এড়ানো যায় নি, নিঃশেষে পুড়ে খাক্ হয়ে গেছে ওকানকার স্পেশ্ রিসার্চ সেণ্টার সমেত অন্যান্যা অনেক মূল্যবান সরকারী দপ্তর। কোটি কোটি ডলার খরচ করার পরেও এখনো পর্যন্ত ক্ষতি পূরণ করা সম্ভবপর হয়নি। দাবানল ওখানকার মানুষের এক আতঙ্ক বিশেষ। অথচ এ্যাবোরিজিনদের কাছে এর সুনিয়ন্ত্রণের টেকনিক ছিল। তাই বর্তমান অস্ট্রেলিয়া সরকার তাদের দাবানল রোধ কমিটিতে এ্যাবোরিজিন পিপ্‌ল্‌দের প্রতিনিধিত্ব আমন্ত্রণ করেছে।

বর্তমান অস্ট্রেলিয়ার আর এক জ্বলন্ত সমস্যা-জল। দীর্ঘ ন' বছর পর ২০১১ সালে ওখানে বৃষ্টিপাত হয়। স্বভাবতই ওখানে ভীষণ জলসঙ্কট। দীর্ঘ বাইশ বছর পর 'লেক আয়ার' এর সত্তর শতাংশ পূর্ণ হয়েছে ২০১১ তে, তাই দেখতে কাতারে কাতারে লোক ছোট ছোট প্লেন ভাড়া করে 'উইলপিনা পাউণ্ড' থেকে ওখানে উড়ে যাচ্ছে— আহা। কী অভাবিত দৃশ্য! আমরা আগেই জেনেছি ব্রিটিশরা এসে কলোনী বিস্তারের কারণে উৎখাত হয়ে গেছে এ্যাবোরিজিনরা,— যাদের নিজস্ব অদ্ভুত এক পদ্ধতিতে জল-জঙ্গল প্রকৃতিতে যে সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা কায়েম থাকতো, এ্যাবোরিজিনদের উৎখাতের কারণে তা ছারখার হয়ে যায়। প্রকৃতি তার চণ্ডমূর্তি ধারণ করে। এই সমস্যা সমাধানের জন্যেও বর্তমান অস্ট্রেলিয়া সরকার এ্যাবোরিজিনদের সাহায্য গ্রহণ করছে। সেই কোন্ ১৮৪১-এই জর্জ গ্রে গবেষণা করে প্রমাণ করেছিলেন যে, এ্যাবোরিজিনরা পেয় জলের উৎস খুঁজে বার করতে পারতো মাটির নীচ থেকে বা গাছের কাণ্ড থেকে। বৃষ্টি জল ধরে রাখার জন্য খাল-কুয়ো খনন করে রাখতো,— বর্তমানে আমরা যেটাকে বলছি রেন্-হার্ভেস্টিং— সেটা এই প্রাচীন এ্যাবোরিজিনদেরই টেক্‌নিক।

এই এ্যাবোরিজিন পিপ্‌ল্-দের জীবন যাপনের সঙ্গে যে তাদের ধর্মবিশ্বাস এবং সেই বিশ্বাস উদ্ভূত সামাজিক অনুশাসন কঠোরভাবে জড়িয়ে থাকতো, একথা আমরা আগেই জেনেছি। তাই তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে তাদের ধর্মবিশ্বাসের কথা অতি আবশ্যিকভাবে আসবেই আসবে। কিভাবে এই জগৎ-জীবন- চারপাশের ভূপ্রকৃতি আকাশ-বাতাসের সৃষ্টি হল, তার চারপাশের প্রকৃতির মাঝে মানুষই-বা এল কিভাবে,— এই প্রশ্নগুলির উত্তর সম্বলিত এ্যাবোরিজিন্‌স্-দের নিজস্ব বিশাল পৌরাণিক কাহিনীর ভাণ্ডার রয়েছে। মিথ-লেজেণ্ড- ফেব্‌ল সম্বলিত এই পৌরাণিক কাহিনীগুলি এই বিশাল পরিব্যাপ্ত জগৎ ও জীবনের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কী হবে,— হওয়া উচিত, তার বিশদ ব্যাখ্যা দেয়। এ্যাবোরিজিনদের ভাবনায় সৃষ্টির প্রথমকাল সম্পর্কিত ভাবনাকে ইংরাজীতে 'Dream Time' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। সৃষ্টির আদিতে এ পৃথিবী তো ছিলই, কিন্তু ছিল না কোন গাছ-পাহাড়- জলাশয় পশু-পাখী বা মানুষ, —এমনটাই বিশ্বাস এ্যাবোরিজিনদের। পৃথিবী ছিল মহাশূন্যে ভাসমান। তারপর ক্রমে ক্রমে পৃথিবীর নীচ

থেকে জন্ম নিল বিভিন্ন পৌরাণিক জীব। তারা দলবদ্ধ হয়ে বাস করতো প্রায় মানুষেরই মতো। তারপর একসময় 'Dreamtime' শেষ হলো, ঐসব পৌরাণিক জীবেরাও অদৃশ্য হয়ে গেল। কিন্তু তারা যে এককালে ছিল, সেই অস্তিত্বের প্রমাণ বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে, বিভিন্ন জীবজন্তুর আচরণের মধ্যে প্রকাশ পায়,— এমনই বিশ্বাস এ্যাবরিজিনদের। তারা মনে করে, অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন জীব-জন্তু-পাখী- সরীসৃপদের এক-একজন ওই পৌরাণিক আদি জীবেদের এক একজনের সরাসরি প্রতিনিধি। পৃথিবীর ভালমন্দ তাদের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। আজও এ্যাবোরিজিনরা সেই সব আদি স্রষ্টা আত্মাদের তুষ্টির উদ্দেশ্যে বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে নৃত্য-গীত ও ধর্মাচরণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করে থাকে। এ্যাবওরিজিনরা মনে করে যে উলুরু বা Ayers Rock থেকেই পৃথিবীর শুরু হয়েছে (beginning of the Earth)। এই স্থানটি সমস্ত এ্যাবোরিজিনদের কাছে মহাপবিত্র ধর্মস্থান বলে গণ্য হয়।

সমগ্র অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের প্রায় সবটা জুড়ে বিভিন্ন জাতি-উপজাতিদের মধ্যে একটা বিশ্বাস অভিন্ন ছিল যে এই সমগ্র সৃষ্টির একজন মহান স্রষ্টা আছেন (Supreme Creator) । বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁকে বিভিন্ন নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। তবে, সম্ভবত : সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় নামগুলি হ'ল 'বিয়ামী' (Byamee) , ওয়ান্দজিনা (Wandjina), এবং নারগাকর্ক (Nargacork)। আর্নহেমল্যাণ্ডের জনজাতিরা বিশ্বাস করতো সূর্য নাম্নী নারী হচ্ছেন জগৎ এবং জীবনের স্রষ্টা এবং রক্ষাকর্ত্রী। অন্যদিকে মধ্য অস্ট্রেলিয়ার কোন কোন জাতি মনে করতো যে 'রামধনু সর্প' (Rainbow Serpent) -ই হচ্ছে জগতের মহান স্রষ্টা। অন্য আরেকটি লেজেণ্ডে,— যেটি নিউ সাউথ ওয়েল্‌স্‌-এ বর্তমান ব্রিওয়ারিনা (Brewarrina) নামক স্থানে বসবাসকারী, উইরাজুরি (Wiradjuri) জাতির মধ্যে প্রচলিত, বলা হচ্ছে 'বিয়ামী- (মহানস্রষ্টা) মানুষের ছদ্মবেশে বিভিন্ন সাহায্যকারী আত্মাকে পাঠিয়েছেন মনুষ্যজাতিকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে সঠিক প্রশিক্ষণ দেবার জন্যে। কোন কোন লেজেণ্ডে বলা হয়েছে ক্যাঙ্গারু, কোথাও কোথাও বা বলা হয়েছে পেঁচা, কোথাও বলা হয়েছে এক বৃহৎ ডানাওয়ালা পাখী ভূমিকা নিয়েছিল মহান স্রষ্টার।

স্বভাবতঃই প্রত্যেক জাতির ছিল নিজস্ব টোটেম। প্রত্যেক এ্যাবোরিজিন, এমনকি বর্তমানেও, নিজ জাতির জন্য নির্দিষ্ট টোটেম-এর প্রতি অটুট ভক্তি শ্রদ্ধা পোষণ করে। তাদের সামাজিক- সাংস্কৃতিক প্রতিটি কাজে এই টোটেম প্রতীক স্পষ্টভাবে বিদ্যমান থাকে। কারুরই নিজের টোটেম নিজের বেছে নেবার বা বদলাবার কোন ক্ষমতা নেই। জন্মসূত্রে নিজের পূর্বপুরুষদের থেকে এটা ইনহেরিট করতে হয়। সৃষ্টির শুরু থেকেই এই এ্যাবোরিজিনদের এই টোটেমগুলো অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে অজস্র লোককথা— গল্পকথা। মৌখিক পরম্পরায় এই লেজেণ্ডগুলো হয়ে উঠেছিল এ্যাবোরিজিন জনগণের জীবনশৈলীর এক বিশ্বস্ত দলিল। প্রতিটি গোষ্ঠির ছিল স্বতন্ত্র লেজেণ্ড-এর সমৃদ্ধ ভাণ্ডার। Gean A. Ellis তাঁর 'Australia's Aboriginal

Heritage' গ্রন্থে লিখেছেন, "The legends from the Dreaming, when combined, make a powerful and complex collection that remains unequalled anywhere in the world...... The substance of each and every legend was interwoven with the local history of the totem of sacred enblem of each individual group plus the general life style and personality of those people" (page 9)

এই স্বতন্ত্র টোটেমের মান্যতার কারণেই প্রত্যেক জাতির (clan) দীক্ষিত করণের (initiation) যেমন নিজস্ব স্বতন্ত্র পদ্ধতি ছিল, মৃতদেহের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াতেও ছিল কিছু ভিন্নতা। অন্যান্য ধর্মীয় ও সামাজিক ক্রিয়াকর্মেও ছিল স্বাভাবিক স্বতন্ত্রতা। একই সূত্র ধরে এক এক বিশেষ গোষ্ঠীর কাছে এক এক রঙ,— ডিজাইন পবিত্র ও বিশেষ বলে গণ্য হতো। মধ্য অস্ট্রেলিয়ার কিছু এ্যাবোরিজিনদের কাছে লাল রঙ্ খুব পবিত্র বলে গণ্য হয় এবং তাদের ধর্মীয় সামাজিক অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত পাত্র-অস্ত্র-বাদ্য অঙ্কন ও ভূমি আলপনা ইত্যাদির মধ্যে লালরঙের ব্যবহারই সর্বাধিক থাকতো। প্রায়শই এই বিশ্বাস ও তার ব্যবহারিক প্রয়োগের পেছনে প্রচলিত Dreaming legend রয়েছে। যেমন এক জায়েন্ট লিজার্ড একসময় মানুষদের খুব ক্ষতি করতো। তাকে কিছুতেই মানুষেরা নিবৃত্ত করতে পারছিল না। তখন তাদের বন্ধু আত্মা মারিণ্ডি (ইংরাজী অনুবাদে ডিংগো, একজাতের বুনো কুকুর) সেই লিজার্ডকে হত্যা করে মানুষদের বিপদমুক্ত করল। এই লিজার্ডের রক্ত সমগ্র ভূমিকে লাল করে তুলেছিল, যে লাল রঙ তাদের বিপন্মুক্তির প্রতীক। তারা এরপর থেকে ঐ ঘটনার সকৃতজ্ঞ স্মরণে সমস্ত অনুষ্ঠানে লাল রঙের ব্যাপক প্রয়োগ ঘটিয়ে তাদের সৃষ্টিকর্তা ও বন্ধু আত্মার প্রতি সম্মাননা ও কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করে আসছে।

মধ্য অস্ট্রেলিয়ার মানুষজনের কাছে যেমন লাল রঙ পবিত্রতার প্রতীক, নিউ সাউথ ওয়েল্‌স্-এর এ্যাবোরিজনিদের কাছে তেমনি সাদা রঙ অত্যন্ত পবিত্র বলে গণ্য হয়। এর পেছনেও একটা Dreaming legend রয়েছে। একবার এক জায়েন্ট ক্যাঙারু তাদের ভীষণ ভয় দেখাচ্ছিল, ক্ষতি করছিল। তাদের মধ্যে যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী মানুষ উইরুয়া (Wirroowa) যখন তাকে দমন করতে পারল না, তখন সবাই প্রমাদ গুণল। উইরুয়া তখন তাদের মহান স্রষ্টা বিয়ামীর সাহায্য প্রার্থনা করল। বিয়ামী সবশুনে তাকে সাদা মাটি সর্ব অঙ্গে লেপে আসতে বলল। কিন্তু সাদামাটির অঞ্চলেই তো দাপিয়ে বেড়াচ্ছে সেই দৈত্যকার ক্যাঙারু। অগত্যা গোয়ানা ফ্যাট-এর আস্তরণ মেখে তার সঙ্গে মাটি মিশিয়ে গায়ে সাদা রঙ করল সে। এবং দেখল বিয়ামী সন্তুষ্ট হয়ে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে দৈত্য ক্যাঙারুর জঙ্গলে। অতঃপর সেই দৈত্য-ক্যাঙারু অন্য বনে পালিয়ে গেল,— রক্ষা পেল উইরুয়ার স্বজাতি উইরাজুরি গোত্রের (Wiiadjuri) মানুষজন। তারা যে শুধু দৈত্য ক্যাঙারুর হাত থেকেই রক্ষা পেল

এইমাত্র নয়, তারা অভাবিত উপহার হিসেবে পেল আগুন। এর আগে উইরাজুরি মানুষেরা আগুন কাকে বলে জানতো না! সেই থেকে প্রতি অনুষ্ঠানে নিজেদের অঙ্গসজ্জা, বাদ্যযন্ত্রে অঙ্কন, ভূমির উপর শুভচিহ্ন চিত্রিত করণ, প্রভৃতি বিভিন্ন কাজে এরা ব্যাপকভাবে সাদা রঙের ব্যবহার করে স্মরণ করে মহান স্রষ্টা বিয়ামীকে এবং তার অভাবিত কৃপা ও করুণাকে।

এই এ্যাবোরিজিন মানুষদের প্রায় প্রত্যেকের মধ্যে এক দুর্লভ শিল্প প্রতিভা লক্ষ্য করা গেছে। সমগ্র অস্ট্রেলিয়া জুড়ে গুহা, পর্বতগাত্র, ভূমি গাছ, তাদের বিশেষ বাদ্যযন্ত্র— ডিজিরিডু (Didgeridoo) এবং ড্রাম এসব বিচিত্র সব অঙ্কনকলায় সমৃদ্ধ হয়ে আছে। প্রত্যেক গোষ্ঠীর নিজস্ব টোটেম অনুযায়ী নিজস্ব অঙ্কনশৈলী আছে, কক্ষনো কেউ অন্যের টোটেম অনুসারী অঙ্কনশেলী নিজের শিল্পকর্মে আনে না। এটা প্রায় ধর্মলঙ্ঘনের পর্যায়ে পড়ে। এদের ধর্মবিশ্বাসই এমন ছিল যে, যেন আঁকার জন্য খোদাই-এর জন্য, নিজের টোটেম অনুসারী নিজের শিল্প-চেতনাকে ব্যক্ত করার জন্যই তারা এই পৃথিবীতে এসেছে। বর্তমানে এ্যাবোরিজিন্যাল পেন্টিং বিশ্বের শিল্পরসিকদের কাছে এক অতি সম্মান ও মর্যাদার আসন লাভ করেছে। নিজস্ব টোটেম অনুসারী হওয়ার কারণে শিল্পগুলি প্রতীকী (Symbolical art)। আর একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য, এরা কোন জীবজন্তু আঁকতে গেলে তার বহিরঙ্গ যেমন আঁকতো, ভিতরের চিত্রকেও সেভাবে এঁকে দেখাতো। যেমন, হয়তো কেউ একটা মাছ আঁকবে। যেমন বহিরঙ্গের আউট লাইন এঁকে দেবে, সঙ্গে সঙ্গে ভেতরের শিরদাঁড়া- ফুলকো এসবও একই সঙ্গে চিত্রিত করবে। এই বিশেষ অঙ্কন শৈলী বিশ্বের দরবারে 'এক্সরে- আর্ট', হিসেবে মর্যাদা পেয়েছে। ঠিক তেমনিভাবে মিমি আর্ট, ডট, পেন্টিংস ইত্যাদিও বর্তমান বিশ্বে এ্যবোরিজিন্যাল আর্ট ফর্ম্ হিসেবে তাবৎ বিশ্বের সম্ভ্রম আদায় করে নিয়েছে।

এ্যবোরিজিন্যাল সভ্যতা, তার শিল্প-সংস্কৃতি ভাষা- সাহিত্য, —এসব নিয়ে হাজার হাজার গবেষক প্রচুর তথ্যসমৃদ্ধ বই লিখেছেন। এ্যাবোরিজন্যাল কালচার সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে অবশ্যই সেগুলির তন্নিষ্ঠ অধ্যয়ন প্রয়োজন। সঙ্গে আবশ্যিকভাবে চাই সমগ্র অস্ট্রেলিয়া জুড়ে বসবাসকারী বর্তমান এ্যবোরিজিন্যাল জনগণের চলমান জীবনযাপন- ভাষা-সাহিত্য-শিল্পচর্চা সম্বন্ধে নিবিড় ক্ষেত্রসমীক্ষা। অন্যথায় আলোচনা যে কাঙ্ক্ষিত মাত্রা পেতে পারে না, এটা বলাই বাহুল্য। তবু, বিন্দুতে সিন্ধু দেখার দুঃসাহসে ভর করে আমি কয়েকটা কথা বলে ফেললাম।

পরিশেষে এ্যবোরজিন্যাল হেরিটেজের সুবিপুল মিথ্-লেজেণ্ড-ফেবেল্স্-এর অতুলনীয় ভাণ্ডার থেকে মাত্র একটি করে উদাহরণ তুলে ধরে এই লেখায় যবনিকা টানব।

বৃহৎ দৈত্য-সর্পের মৃত্যু (লেজেণ্ড্)

এই রোম্যান্টিক লোকগাথায় নর-নারী ও এক দৈত্য-সর্পের বর্ণনা আছে।

এক যুবক ও এক যুবতী পরস্পরকে বিয়ে করতে চায়, কারণ তারা পরস্পরকে ভালবাসে। বিয়েতে বাধাও কিছু নেই, কারণ কঠোর নিয়মানুষ্ঠানের মাধ্যমে তাদের দীক্ষিতকরণ (initiation) হয়ে গেছে। ছেলেটি খুবই কর্মঠ। প্রচুর শিকার করে নিয়ে এসে তার শ্রেষ্ঠভাগ মেয়েটির পিতামাতাকে দিয়ে তাদের সন্তুষ্টও করেছে। অতএব বিয়েতে কোন বাধা রইল না।

একদিন ছেলেটি গেছে শিকারে, আর মেয়েটি মধুসংগ্রহের জন্য অন্য একটি জঙ্গলে গেল। ক্রমে গভীর জঙ্গলে ঢুকে পড়ে সে এক বিরাট পাথরের পাশে জ্বলজ্বলে একগুচ্ছ সুন্দর ডিম দেখল। এগুলি সংগ্রহ করা মাত্র এক বৃহৎ দৈত্য-সর্প তাকে হুংকার দিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে হাড়গোড় ভেঙ্গে মেরে ফেলল।

দুদিন পর যখন আত্মীয়রা তার দেহ আবিষ্কার করল, কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল তার মা, — "এত বড় হল মেয়ে, অথচ কি বোকা,—দৈত্য-সাপের ডিমে হাত দিতে গেছে।"

যুবক শিকার থেকে ফিরে এসে সব দেখে-শুনে বলল—"আমি ওর সঙ্গে পরলোকে মিলিত হব।" তখন সবাই তাকে বলল— "সেটাও সম্ভব নয়। কারণ মৃত্যুর পর ওর আত্মা চলে গেছে মহিলাদের পরজগতে, আর ছেলেদের আত্মা যায় ছেলেদের জন্য নির্দিষ্ট পরজগতে। তার চেয়ে বরং শনচুলোধাত্রীর কাছে প্রার্থনা করা হোক, যেন তিনি মেয়েটির আত্মাকে ফিরিয়ে দিয়ে পুনর্জীবন দান করেন। কিন্তু সেক্ষেত্রে মুস্কিল হল এই যে, ঐ দৈত্য-সাপ বেঁচে থাকা কালীন কখনোই মেয়েটির আত্মাকে ফিরিয়ে আনা সম্ভবপর হবে না। অতএব আগে তুমি ওকে ধ্বংস কর।'

পরমসাহসী যুবক একদিন সকাল বেলায় কয়েকজন সঙ্গী সমেত জঙ্গলের উদ্দেশে রওনা হল। পথে সে চিটোলো বিফউড, গাছের আঠা প্রচুর পরিমাণে সংগ্রাহ করে নিল। তারপর সেই অসম্ভব চট্‌চটে আঠার বড় বড় গোলাকার তাল বানিয়ে নিল এবং পাহাড়-জঙ্গল ঘেরা দৈত্য-সাপের উপত্যকায় গিয়ে একটা গাছের ওপর উঠে সাপের প্রতীক্ষায় বসল। সঙ্গীদের বলল খুব জোরে জোরে চিৎকার করতে। অত মানুষের চিৎকার শুনে দৈত্য-সাপ তার দলবল নিয়ে ছুটে এল ওদের গিলে খেতে। গাছের ওপর থেকে আগে ভাগে তা দেখতে পেয়ে যুবকটি নেমে এসে তার সঙ্গীদের নিয়ে চটপট প্রস্তুত হয়ে নিল, তারপর ঐ বড় বড় আঠার গোলা সজোরে ছুঁড়ে দিতে লাগল দৈত্য-সর্প ও তার সঙ্গীদের তেড়ে আসা মুখের ভিতরে। তাদের চোয়াল আটকে গেল, এবং আর তাদের কোন ক্ষমতা রইল না মানুষের কোন ক্ষতিসাধন করার।

এবার সহজেই যুবকটি ও তার সঙ্গীসাথীরা দৈত্য-সর্প তার দলবল ও ছানাপোনাদের মেরে ফেলল। এখন আর শনচুলীবুড়ীর আর কোন অসুবিধা হল না

যুবকটির প্রেমিকার আত্মাকে নতুন করে সঞ্জীবিত করতে। তারা উভয়ে তখন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সুখে জীবনযাপন করতে লাগল।

বিয়ামি এবং পৃথিবীর প্রথম নর-নারী (মিথ্)

এবং আবার ঈশ্বরের মতো বিয়ামী তার সৃষ্ট জগতে গাছপালা, পশুপাখী এবং নরনারীকে সৃষ্টি করলেন তাদের ওপর শাসন কায়েম করবার জন্য, এবং বললেন— "দেখো, এই সমস্ত ফলমূল শস্যাদি তোমরা আনন্দের সঙ্গে ভক্ষণ করো, কিন্তু আমার সৃষ্ট জীবহত্যা কোরো না।" এই বলে পরমপিতা অদৃশ্য হলেন।

প্রথম নর ও নারী— এই বিশাল পৃথিবীর ফল-ফুল-শস্যে মহানন্দে জীবনধারণ করে বংশপরম্পরায় নিজেদের সংখ্যা বাড়িয়ে চলল। তারা কৃতজ্ঞ চিত্তে বিয়ামীর প্রশংসা ও উপাসনা করতে লাগল এমন অপার সম্পদ তাদের দান করার জন্য।

কিন্তু অনেকবছর পর একবার পৃথিবীতে বৃষ্টি পড়া বন্ধ হয়ে গেল। জলের উৎসগুলি শুকিয়ে গেল, শুকিয়ে গেল পৃথিবীর মাটি। গাছের পাতা হলুদ হয়ে ঝরে গেল, শাখা-শিকড় শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। সারা পৃথিবী জুড়ে শুরু হল খাদ্যের জন্য হাহাকার। নরনারী এবং তাদের সন্তান সন্ততিদের কাছে এই অভিজ্ঞতা একেবারে নতুন, কারণ এর আগে কখনো তাদের খাদ্যাভাব ঘটেনি।

এমন অসহনীয় পরিস্থিতিতে খিদের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে একজন পুরুষ বিয়ামীর দ্বারা নিষিদ্ধ ইঁদুর-ক্যাঙারু হত্যা করে তার মাংসে ক্ষুন্নিবৃত্তির চেষ্টা করল। দলের সাবইকে সেই মাংসের ভাগ দেওয়া হল, কিন্তু একজন সেই নিষিদ্ধ মাংস নিতে অস্বীকার করল। খিদের জ্বালায় ক্রমশ তার শরীর অবশ হতে শুরু করল। প্রলোভনের মাংসের দিকে পিছন ফিরে সে ধীরে ধীরে ওই এলাকা ছেড়ে চলে গেল।

এরপর বেশকিছু পশু-প্রাণী শিকার করেই স্বচ্ছন্দে তাদের দিন কাটতে লাগল। বেশ কিছুদিন পর হঠাৎ আবার তাদের সেই লোকটির কথা মনে পড়ল শত প্রলোভনেও যে নিষিদ্ধ মাংস ভক্ষণ করেনি। তার খোঁজে বেরিয়ে বহুদূর গিয়ে তারা দেখল সেই অর্ধমৃত মানুষটি নদী পেরিয়ে দূরে কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেল। পরক্ষণেই তারা আবার দেখল লোকটি একটু দূরে গামগাছের নীচে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এরপরএকটা বাঁকের মুখে এসে তারা দেখল যে একটা কয়লার মতো মিশকালো মানুষ,— আকৃতিতে অর্ধ পশু অর্ধমানব— মৃতপ্রায় মানুষটির কাছে একটা গাছ থেকে লাফিয়ে নামল এবং মৃতপ্রায় মানুষটিকে কাঁধে তুলে নিয়ে আবার গাছের ওপর উঠে অদৃশ্য হয়ে গেল। তারপর ঘটতে লাগল একটার পর একটা অঘটন। গাছেদের কোটর থেকে কালো ধোঁয়া বেরোতে শুরু করল, বিকট শব্দে বৃহৎ বৃক্ষেরা বারংবার মাটিতে আছাড় খেয়ে সটাং উপরে উঠে যেতে লাগল। চতুষ্পার্শ্ব বিকট শব্দে ছেয়ে গেল। অজস্র গাছ গোড়া সমেত উৎপাটিত হয়ে নদীর জলে গিয়ে পড়তে লাগল। এই

ভয়াবহ পরিবেশের ঘনান্ধকারে হঠাৎই জ্বলজ্বল করে জ্বলে উঠল একজোড়া ভয়াল চোখের চাহনী, দুটি সাদা কাকাতুয়া ভয়ে বিহ্বল হয়ে ডানা ঝাপটাতে শুরু করল যাতে তারা উড়ন্ত-ছুটন্ত বৃক্ষসমূহে ধাবমান তাদের নিজের বাসাটি খুঁজে আশ্রয় নিতে পারে। কিছু সময়ের মধ্যেই উড়ন্ত বৃক্ষসমূহ, সাদাকাকাতুয়া জোড়া, ভয়াবহ জ্বলন্ত জোড়া চোখের চাহনি সমেত সমগ্র পরিবেশটাই দূরে দক্ষিণের দিকে মিলিয়ে গেল। এবং এই প্রথম সৃষ্টির পর্বে আবির্ভূত হল 'মৃত্যু'। এটা স্রষ্টা বিয়ামী নিজে ঘটালেন। আর গাছের ডালে বসা ঘোরকালো মৃত্যু-আত্মা 'ইয়োহি' এই প্রথম কোন জীবিত মানুষকে মৃত্যু রাজ্যে নিয়ে যেতে পারল। তার গোষ্ঠীর লোকেরা বিয়ামীর নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ইঁদুর-ক্যাঙারু হত্যা করেছিল বলে ধর্মপ্রাণ মানুষটি প্রাণ দিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত করলেও, এই জগতে 'মৃত্যু-আত্মা' তার প্রবেশাধিকার পেয়েই গেল। ঐ ওক গাছ দীর্ঘশ্বাস ফেলছে, ঐ গাম গাছ বিলাপ করছে জগতের এই প্রথম মানুষের মৃত্যুতে, তাদের চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে লালরক্ত আঠা হয়ে। তবে ধর্মপ্রাণ মানুষটির আত্মা মৃত্যুর পর পরমপিতা বিয়ামীর মৃত্যু উত্তীর্ণ গৃহে এক নতুন জগতে আশ্রয় পেল।

বর্তমানের সাদার্নক্রশ, যা এ্যাবোরিজিনদের ভাষায় 'ইয়ারানডু' (Yarrandoo) নামে পরিচিত ছিল, সেখানেই ছিল ঐ বিশেষ সাদা গাম গাছ এবং 'মৌয়ি' (Mouyi) নামে সাদা কাকাতুয়াদের অবস্থান, বিশ্বাস এ্যাবোরিজিনদের।

কামিলোরি উপজাতিদের কাছ থেকে এই মিথটি রোনাল্ড রবিনসন সংগ্রহ করেন, সেখানে এক দুঃখগাথার মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে পৃথিবীতে রক্তপাতহীন শান্তির নীতিকথা, যেখানে আরও বলা হয়েছে পরমপিতার আদেশ যে শ্রদ্ধার সঙ্গে মান্য করে চলবে তার স্থান হবে মৃত্যুর পরে স্বয়ং পরমপিতার আনন্দ নিকেতনে।

প্রাণের দ্বার (ফেবল্স্)

বায়ু ছিল ছ'জন। তাদের তিনজন পুরুষ তিনজন মহিলা। পশ্চিমের ঠাণ্ডা বায়ুর নাম ঘিগের ঘিগের (Gheger Gheger) । সেরকমই দক্ষিণ বায়ু এবং দক্ষিণ পশ্চিম বায়ু— মানুষের ক্ষতি ছাড়া উপকার করত না এই তিন নারী।

অন্যদিকে পূর্ব-দক্ষিণা বাতাস, উত্তুরে বাতাস আর পূর্ব বাতাস, তিনজনই ছিল পুরুষ। পূর্ব-দক্ষিণা বাতাস, যার নাম ইরাগে, সে যখন বুথা, বিবিল আর বাম্বল গাছেদের সঙ্গে ভালবাসায় মত্ত হতো, — ফলে ফুলে পরিপূর্ণ হয়ে উঠত তারা। সবাই দেখতে পেতো যে বসন্ত এসে গেছে।

উত্তুরে হাওয়াও এক মহান প্রেমিক। তার চুম্বন থেকেই কুলা, নুন্‌গা আর কুরাজাং গাছেরাও পুষ্পসম্ভারে সেজে উঠতো।

পুবের বাতাস গানিয়ামুও গাছে গাছে ফল-ফুল আনতো। বছরে দুবার বৃহত্তম উৎসব 'করোবরি'-র সময় বাধ্যতামূলক ভাবে সববায়ুকে,— নারী-পুরুষ নির্বিশেষে,

হাজিরা দিতে হতো। ফলত: জংলী মেজাজ সম্পন্না নারী বায়ু সুযোগ পেতো ফলে-ফুলে সুসজ্জিত গাছপালাকে ভেঙ্গে তছ্নছ্ করে দেবার। আসলে এই গাছেদের ওপর, তাদের সন্তান সন্ততি ফুল-ফলেদের ওপর, উগ্রচণ্ডী মেজাজের নারী বায়ুদের রাগের সীমা-পরিসীমা ছিল না। কারণ তাদের নিজস্ব পুরুষদের প্রলোভিত করে তারা কেড়ে নিতো, ফল-ফুল-পত্র ফলাবার কাজে লাগাতো। কোনকালে কোন মেয়ে নিজের দাম্পত্য অধিকার অন্য কাউকে ছেড়ে দিতে পারে? আক্রোশ হবে না? উল্টো দিকে, পুরুষ বায়ুরাই বা কাঁহাতক বন্ধ্যা স্ত্রী বায়ুদের মিলনে ফুল-ফলহীন অনর্থক প্রেমক্রীড়ায় কালক্ষয় করে যেতে পারে? সেটাই কী খুব সঙ্গত কথা? এই পৃথিবীকে তো ফলে-ফুলে সুসজ্জিত, কচি কিশলয়ে সবুজে সবুজ করে রাখতেই হবে। নিজেদের ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থের কথা এখানে একেবারেই অর্থহীন। সৃষ্টিকে তো রক্ষা করতেই হবে। সে তো প্রাণের দায়, ধর্মের দায়।

গ্রন্থঋণ :

১। এ্যাবোরিজিন্যাল মিথস্, লেজেণ্ডস্ এণ্ড ফেব্লস্— লেখক : এ. ডব্লু. রিড্
২। অস্ট্রেলিয়া'স এ্যাবোরিজিন্যাল হেরিটেজ-- লেখক : জিন. এ. এলিস্
৩। এ্যাবোরিজিন্যাল অস্ট্রেলিয়া— লেখক : হিল্ম্যান

স্পেনীয় লোককথা

সুশান্ত কুমার মহাপাত্র

অনেকদিন ইউরোপে থাকলে ওদের প্রাচুর্যে একটা ক্লান্তি আসে। বিশেষ করে ভারতীয়দের। যারা কিনা নানান বৈচিত্র্যের মিশেলে থাকতে অভ্যস্ত। আমাদের সমাজে পুরোনো ও নতুন গা ঘেঁসাঘেঁসি করে চলে। সহজেই বোঝাযায়, কেমন করে এ দেশে উন্নয়নের হাওয়ায় পরিবর্তন ধরেছে। পুরনো বলে কোন কিছুকে বাতিল করতে আমাদের বড্ড গায়ে লাগে। ওদের স্বভাবটা ঠিক উল্টো। পরিবর্তন আর কেবল প্রতিযোগিতা। নতুন কিছু হয়েছে তার আনন্দে বেশিক্ষণ মশগুল থাকা ওদের বোধহয় আসেনা। ক্রমাগত পরিবর্তনে বোঝা দায় হয় কী থেকে ওরা কী হয়েছে। তখনই মনে ইচ্ছে ধরে একটু তলিয়ে দেখতে, ওদের শুরুর দিকের ইতিহাস-ভাবনা-চিন্তা, জীবনযাত্রা।

স্পেন মানে এফ সি বার্সেলোনা— রিয়েল মাদ্রিদ সি এফ, প্রচণ্ড উত্তেজনাপূর্ণ ফুটবল খেলার তুখোড় সব ফুটবলার; কিংবা উত্তাল সমুদ্রে শক্ত হাতের দুর্দ্ধর্ষ নাবিক। এমন একটা চিত্র বোধহয় সবমানুষের মনেই আঁকা হয়ে যায়। তার আকর্ষণও কম নয়। পৌরুষ-সাহসের এমন মিশেল যেখানে, সেখানে যেতে, থাকতে কার না মন চায়! স্পেনীয়ার্ডদের সঙ্গে মেলামেশার কালে ওদের মতো পেশীবহুল শরীরের আকাঙ্ক্ষা খুব মনে জাগে। আর মনের ইচ্ছাইতো সব কিনা! মন লাগে শরীর গড়তে। কিন্তু সেক্ষেত্রে মোকাবিলার প্রয়োজন হয় স্পেনের ক্লান্তিহীন দীর্ঘমেয়াদী বৃষ্টির। বৃষ্টির দিনে আমাদের মন চায় অন্যকিছু। আলস্য তখন আমাদের ঘরকুনো করে। সঙ্গে যদি রূপকথার গল্প বই থাকে! চারদিকে আকাশ কালো মেঘে। ঝিরঝিরে বৃষ্টি! আমাদের সুখের মুহূর্ত; ছোটবেলাকার সময় মনে করায় মা-ঠাকুমার মুখে শোনা গল্পগুলো। জানতে ইচ্ছে করে স্পেনের অধিবাসীরাও তেমনি মা-ঠাকুমার কাছে গল্প শুনতে অভ্যস্ত কিনা! কেমন ধারার সেই সব গল্প, যাকে আমরা বলি লোককথা!

শিক্ষা বিজ্ঞানেও লোককথার বিশেষ গুরুত্ব। লোককথার আকর্ষণ কে কাজে লাগিয়ে শিক্ষাকে অনেক বেশি আনন্দময় ও জনপ্রিয় করে তোলা সম্ভব একথা প্রমাণিত সত্য। সাহিত্যের উপাদান হিসেবে লোককথা একটি স্বতন্ত্র শাখাতে পরিণত হয়েছে বহুদিন আগেই। সময় কাল হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে ১৬৯৪-৯৭ সাল। ফ্রান্সের চার্লস পেরাউল্ট প্রথম প্রকাশ করলেন তাঁর লোককথার সংগ্রহ Contes en vers (Verse Tales)[i]। তারপর থেকে পাঠক, লেখক, গবেষক কেউই লোককথার আকর্ষণ উপেক্ষা করতে পারেনি।

প্রেক্ষাপট বা গুরুত্ব যাই হোক স্পেনীয় লোককথা নিয়ে অনুসন্ধিৎসু গবেষকদের সংখ্যা কিন্তু কম নয়। আর তার কারণ হল স্পেনীয় লোককথা প্রাপ্তির অপ্রতুলতা। প্রকৃতপক্ষে বহুদিন পর্যন্ত স্পেনের লোককথা খুব কমই সংকলিত প্রকাশনা আকারে পাওয়া যেত। এমনও মনে করা হতো স্পেনে বোধ হয় লোককথার অস্তিত্বই নেই। এই না পাওয়া কে নৈর্ব্যক্তিক ভাবে না নিয়ে বহু গবেষকই এই সমৃদ্ধ জাতির সুপ্রাচীন কাল্পনিকতার অবয়ব উদ্ধারে এগিয়ে আসেন। এঁদের একজন হলেন W. J. Thomas নামের এক ইংরেজ। ১৮৩৪ সালে প্রকাশিত তাঁর গ্রন্থ 'Lays and Legends of Spain' এর মুখবন্ধে লিখলেন "........one part of the task which we have proposed to ourselves........ is to gather together such legendary tales of spanish origin as now lie scattered and far apart.......the popular tales in Spain have never yet been collected.......our ignorance of the existence of legendary tales of Spain must not be considered a proof of their non-existence তাগিদে অনেকেই অনুপ্রাণিত হলেন। ক্রমশই লেখার ভাষায় প্রকাশ পেতে থাকল স্পেনীয় কথ-কথার অস্তিত্ব। সুদীর্ঘ কালের একটি ভুল ধারণা, স্পেনে বোধহয় লোককথার অস্তিত্ব নেই, তা ক্রমশই ফিকে হয়ে এলো। এই ধারণার মূলে বলিষ্ঠ আঘাত হানলেন ১৮৮৭ সনের প্রথম দিকে হার্নাণ্ডেজ ডি মরেনো। হার্নাণ্ডেজ ডি মরেনো'র কথা পরে আমরা বিশদে আলোচনা করব।

স্পেনের লোককথা স্পেনের ঔপনিবেশিকতার মতোই বিশ্বব্যাপ্ত। কাজেই তার ব্যাপকতা এবং স্থান-কাল অনুযায়ী ক্রমবিবর্তন স্পেনের ভৌগোলিক সীমানায় আটকে থাকল না। এমনও বলা হয় যে স্পেনের আদি লোককথা ঔপনিবেশিকতায় চুরি হয়ে গেছে। কারণ কালে কালে স্পেনীয় উপনিবেশগুলি থেকে অনেক বেশি সংকলিত লোককথা প্রকাশিত হয়ে বিশ্বের নজর কেড়েছে, যা মূলগত ভাবে স্পেনের। স্পেনীয়রা তো আর শুধু উপনিবেশ অধিগ্রহণই করেনি, ঔপনিবেশিক শাসন কায়েমের সঙ্গে সঙ্গে তাদের সংস্কৃতি-ভাষা ও জীবনশৈলীকেও প্রাধান্য দিয়েছে। বিশ্বময় স্পেনীশ ভাষার অস্তিত্বতো একথাই প্রমাণ করে।

আগের এই কথাগুলোতে কিন্তু একটা বিতর্কের সূত্র থেকে যাচ্ছে। সেটি হল; স্পেনীয় লোককথা বলতে আমরা তবে কী বুঝব? স্পেনীয় ভাষার কথ্য উপাদান নাকি স্পেনের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যেকার কথ্য উপাদান! যদি প্রথমটিকে ধরি স্পেনীয় লোককথার শর্ত হিসেবে, তবে তার ব্যাপকতায় স্পেন খুব ছোট্ট একটা জায়গা পায়। আগেই বলা হয়েছে স্পেনীশ ভাষা মানেই স্পেন নয়। আবার দ্বিতীয় শর্তটিকে যদি গুরুত্ব দেওয়া হয় তবে দেখি স্পেনের ভৌগোলিক সীমানায় কেবলমাত্র স্পেনীশ ভাষাই নয় আরও অনেক ভাষার ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। সেক্ষেত্রে স্পেনীশ লোককথার একটি সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা নির্দ্ধারণের বিশেষ প্রয়োজন হয়। এই প্রসঙ্গে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে স্পেনের ভৌগোলিক সাংস্কৃতিক বিষয়ে একটু আলোকপাতের। যার দ্বারা স্পষ্ট হয়ে উঠবে স্পেন এবং স্পেনীশ ভাষার অবয়ব, এর অতীত ও বর্তমান।

বৈচিত্র্যময় স্পেন :

স্পেনের বৈচিত্র্য স্পেনের ভৌগোলিক-ঐতিহাসিক-সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের অনুষঙ্গে রূপ পেয়েছে। স্পেন হল ইউরোপের পশ্চিম প্রান্তসীমায় অবস্থিত দেশ। ১৪৯২ সাল পর্যন্ত স্পেনকে মনে করা হত এখানেই বোধহয় জানা পৃথিবীর শেষ হল বা fines terrac. কিংবদন্তি আনুসারে হারকিউলিস জিব্রালটার এবং ceuta তে স্তম্ভ স্থাপন করেছিলেন। এই স্তম্ভ নির্দেশ করত 'nonplus ultra' বা যে বিন্দুর পরে আর কিছুই নেই। # ২ উপদ্বীপ হিসেবে স্পেনের সীমান্ত যেন প্রকৃতি চিহ্নিত করে রেখেছে। পূর্ব দিকে ভূমধ্যসাগর; পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর; উত্তরে পাইরিন পর্বতমালা ও কান্টাব্রিয়ান সাগর। সুইজারল্যাণ্ড এর পরেই স্পেন হল ইউরোপের সবচেয়ে পর্বতসংকুল দেশ। পাইরিন পর্বতমালা ছাড়াও মানবদেহের শিরা ধমনির মতো স্পেনের বুকে ছড়িয়ে রয়েছে কর্দিলেরা কান্টাব্রিকা, সিস্টেমা ইবেরিকা, সিস্টেমা সেণ্ট্রাল, সিয়েরা মরেনা প্রভৃতি পর্বতমালা। এছাড়াও রয়েছে বেশ কিছু মালভূমি যা 'মেসেটা' নামে পরিচিত। মধ্যস্থলে ছড়িয়ে থাকা মেসেটাগুলি প্রায়শই সমুদ্রতল থেকে ৬০০ মিটারের বেশি উচ্চতা সম্পন্ন। একটি দেশের মধ্যে বিস্তৃত এই পর্বতগুলো স্পেনকে নানান উপ-আঞ্চলিকতায় বিভাজিত করেছে। যাদের ভাষা ও সংস্কৃতিগত তারতম্য বিশেষ লক্ষণীয়।

স্পেনের বৈচিত্র্যময় ভৌগোলিক সীমানা আরও সমৃদ্ধ হয়েছে বেশ কয়েকটি দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্ভুক্তিতে। যেমন ভূমধ্যসাগরে রয়েছে বেলেরিকস-ভ্যালেন্সিয়া উপকূলের বিপরীতে, এবং ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জ আটলান্টিক সাগরে আফ্রিকার উপকূল বরাবর।

বিস্তির্ণ-বিচ্ছিন্ন-বিচিত্র ভৌগোলিকতা স্পেনের জলবায়ু এবং প্রকৃতিতে রঙ্গময় প্রভেদ ও অনুষঙ্গ প্রকট করেছে। ভারতের মতো স্পেনকেও তাই উপমহাদেশ হিসেবে অনেকেই মনে করেন।

স্বাভাবিক ভাবেই স্পেনের ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক বর্ণময়তা প্রতিফলিত হয়েছে এখানকার মানুষের সমাজ ও সংস্কৃতিতে। সেই অর্থে সংগঠিত স্পেন মানে বহু স্বশাসিত অঞ্চলের সমন্বয় #৩ এই স্বশাসিত অঞ্চলগুলি প্রকৃত অর্থেই একে অন্যের থেকে পৃথক। শুধু ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতাই নয় তাদের পূর্বানুসৃত ভাষা ও সাংস্কৃতিক অনন্যতায়ও।

স্পেনের সংবিধান 'স্পেনীশ' বা কাস্টিলানো (Castellano) কে সরকারী ভাষা হিসেবে উল্লেখ রেখেছে। তা হলেও প্রতিটি স্বশাসিত অঞ্চল তাদের আঞ্চলিক ভাষাকে স্পেনীশ ভাষার সঙ্গে একত্রে সরকারী ভাষা হিসেবে ব্যাবহার করে। আঞ্চলিক ভাষা প্রভেদ জন্ম দিয়েছে নানান রোমক ভাষা বা Romance language. যেমন গ্যালিগো (gallego) এবং পর্তুগীজ ভাষার প্রণয়ে তৈরি হয়েছে গ্যালিসিয়ান ভাষা। এমনি ভাবেই ক্যাটালান (Catalan) ভ্যালেনসিয়ানো (Valenciano) এবং

বেলের (Belear). আবার এরই মধ্যে অনন্য এবং স্বতন্ত্র থেকে গেছে বাস্ক (Basque) ভাষা, যা ইউস্কেরা (Euskera) নামে পরিচিত। Pais Vasco পরিবৃত পর্বতমালা ডিঙিয়ে যেমন কোন রোমান প্রভাব এসে পড়েনি এর উপর, তেমনি রহস্যময় থেকে গেছে এই ভাষার উৎসমূলের সন্ধান।

স্পেনের বৈচিত্র্যে অবদান রয়েছে বহিরাগতদের আক্রমণ। বর্তমানকালে স্পেনীয়ার্ডদের পরিচিতিতে যে দুর্দ্ধর্ষতা এবং তেজস্বীতার বৈশিষ্ট্য লক্ষ করি আমরা, তার উৎসও কিন্তু বহিরাগতরাই। প্রাক রোমান যুগে, আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ষোল শতকে ইবেরিয়ান নামে এক উপজাতি আফ্রিকার উত্তরাঞ্চল থেকে স্পেনের পূর্বভাগে প্রবেশ করে এবং ক্রমশ উত্তর ও মধ্য স্পেনের দিকে অগ্রসর হয়। গ্রীক ভৌগোলিক স্ট্রাবো (Strabo)র বর্ণনায় এদের উল্লেখ পাওয়া যায়। মূলত এরা ছিল অত্যন্ত দুর্দ্ধর্ষ। তাদের উত্তরসূরী হিসেবে স্পেনীয়ার্ডরা ওদের চরিত্রে দুর্দ্ধর্ষতাকে পরিচায়ক লক্ষণ হিসেবে সযত্নে লালন করে থাকে। এইভাবে আনুমানিক ৬০০ খ্রী.পূ. থেকে গ্রীকদের দ্বারা এলাকাটি ইবেরিয়ান উপদ্বীপ হিসেবে পরিচিত হয়ে আসছে।

স্পেনের দক্ষিণ ও পূর্ব ভাগে যখন ক্রমশ ইবেরিয়ান সংস্কৃতির বিকাশ ঘটছে তখন পশ্চিমাঞ্চল এবং মধ্যভাগের মালভূমি অঞ্চলে বিকাশ লাভ করছে কেল্টিক সংস্কৃতি। ১০০০ খ্রী.পূ. নাগাদ কেল্টিকরা দক্ষিণ ও পূর্বভাগের দিকে অগ্রসর হয়ে ক্রমশ ইবেরিয়ান সংস্কৃতির সঙ্গে মিশে একটি মিশ্র সংস্কৃতির রূপদান করে। এই মিশ্র সংস্কৃতি কেল্টিবেরো (Celtibero) নামে পরিচিত। শীঘ্রই ফিনিসিয় (Phoenicians) এবং গ্রীকদের কাছে ইবেরিয়ান উপদ্বীপ আকর্ষণীয় হয়ে উঠল এর প্রাকৃতিক সম্পদ বিশেষত টিন (estano)এর জন্য। উপদ্বীপ অঞ্চলে এরাও প্রবেশ করল, কিন্তু যুদ্ধ বিগ্রহ না করে। শান্তিপূর্ণ ভাবে মেলামেশা শুরু করল। ফিনিসিয় এবং গ্রীক নাবিকদের লিখিত এবং মৌখিক বর্ণনায় ধীরে ধীরে এই উপদ্বীপ অঞ্চল প্রাচীন বিশ্বের কাছে রোমাঞ্চকর ও স্বর্ণ-রৌপ্যের প্রাচুর্যে সমৃদ্ধ এক স্বপ্ন উপত্যকা হিসেবে পরিগণিত হতে থাকল।

সম্ভবত এই সমৃদ্ধির কাহিনী রোমানদের কাছেও পৌঁছে থাকবে। ২১৮ খ্রী. পূ. দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধের কালে রোমানরা স্পেন আক্রমণ করল। ধ্বংস করল ফিনিসিয় উপনিবেশ কার্থাজিনিয়ানস (Carthaginians) এবং শুরু হল ছয় শতাব্দী ব্যাপী রোমান শাসন। ১৩৩ খ্রী.পূ. নাগাদ তাঁরা নুমানশিয়া (Numantia) অধিকারের মাধ্যমে প্রায় সমগ্র স্পেন তাদের শাসনে এনে ফেলল। এদের দ্বারাই ক্রমশ বিলুপ্ত হয়ে গেল প্রাচীন স্পেনের সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক-ধর্মীয় ও ভাষাগত পরিচিতি। তাঁরা নতুন ভাবে ইবেরিয়ান উপদ্বীপের নামকরণ করল হিস্পেনিয়া (Hispania).

বিক্ষিপ্ত রোমান শাসকদের দুর্বলতাকে একদম নড়বড়ে করে দিল স্যুভি (Suevi). ভ্যাণ্ডাল (Vandals), আলানি (Alani) প্রভৃতি বর্বর উপজাতিদের আক্রমণ। ৪১৫ খ্রী: ভিসিগথ (Visigoth) রা স্পেন অধিকার করল। ভিসিগথরা ক্রমশ ততদিনে

রোমান হয়ে উঠলেও তাদের শাসন ব্যবস্থায় ছিল জার্মান প্রভাব। অন্যদিকে সাংস্কৃতিক ভাবে হিস্পানো-রোমান প্রভাবের প্রাধান্য অব্যাহত ছিল।

রোমানদের দ্বারাই খ্রীষ্টধর্ম এসেছিল স্পেনে। ভিসিগথরা ক্যাথলিক খ্রীষ্টধর্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্মে পরিণত করল। অন্যদিকে মুসলিম ধর্মের অনুপ্রেরণা আরবদের উৎসাহিত করেছিল সম্রাজ্য বিস্তারে। ৭১১ খ্রী: আরবের মুর (Moors) উপজাতি ভিসিগথদের রাজা রোডেরিক (Roderick) কে পরাজিত করে স্পেন অধিকার করল। ৮০০ বছর স্পেন ছিল মূরদের শাসনে। এরা ইবেরিয়ান উপদ্বীপের নামকরণ করল আল-আন্দালুস (Al-Andalus). স্পেনের সংস্কৃতিতে আরবীয় সংস্কৃতি প্রবেশ করল আর স্পেনীয়রা মুসলীম ধর্মে রূপান্তরিত হল। ১৪৯২ খ্রী: পরাজিত ভিসিগথরা শক্তি সঞ্চয় করে খ্রীষ্টধর্ম যুদ্ধের অনুপ্রেরণায় স্পেন পুনরুদ্ধার করল আরব ও জিউসদের বিতাড়িত করে। স্পেনের অতীত পরিচিত ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে পুন:প্রতিষ্ঠা করার আগ্রহ প্রকট হল এবং ফিরে এল খ্রীষ্ট ধর্মও।

ঐতিহাসিক বা ভৌগোলিক বর্ণনা এই লেখার প্রতিপাদ্য নয়। কিন্তু যেই না পেছন ফিরে তাকাব লোককথা কে বুঝতে এবং চিনতে অমনি কখনো দেখব ইবেরিয়ান, কখনোবা হিস্পেনিক নয়তোবা আন্দালুসিয়ান সময়কালের লোককথা। যার প্রতিটিই তৎকালীন শাসক সংস্কৃতির নিজভূমি থেকে আমদানী করা লোককথা। তাহলে স্পেনের লোককথা আর কী? বহু ভাষা, ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা নানান সংস্কৃতির মিশেলে স্পেনের লোককথা সমূহ ভাষা-স্থান-সংস্কৃতি প্রভৃতি নির্দ্ধারকের দ্বারা স্বতন্ত্র! কাজেই জটিল হয়ে দাঁড়াল স্পেনীয় লোককথার সংজ্ঞা নিরূপণ।

এই রকমই একটা পরিস্থিতিতে পড়েছিলেন Ralph Steel Boggs নামে চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষক। তাঁর প্রয়াস ছিল স্পেনীয় লোককথার একটা সূচী তৈরি করা। সেই সূচী ১৯৩০ সালের আগষ্ট মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের রোমক ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ (Department of Romance Languages and Literatures) থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। Ralph সেখানে লিখেছিলেন, 'The science of folklore is not yet far enough advanced to define what is fokloristically Spanish'. Ralph হোঁচট খেয়েছিলেন, কিন্তু থামলেন না। তিনি ভাষা গত ভাবেই লোককথাকে দেখলেন, রাজনৈতিক সীমানাগত ভাবে নয়, 'Obviously, political boundaries are very little related to folkloristic boundaries. But a science which has fairly definite limits established and which is closely related to folklore is linguistics.' ভাষা বিজ্ঞানের নিরিখে স্পেনে চারটি ভাষা বিভাগ রয়েছে। পর্তুগীজ-গ্যালিসিয়ান, স্পেনীয়, বাস্ক এবং ক্যাটালান-ভ্যালেনসিয়ান। Ralph ভাষা বিজ্ঞানের মাপকাঠিতে 'স্পেনীয়' শব্দটিকে আঁটোসাঁটো করে বাঁধলেন। সুতরাং তাঁর স্পেনীয় লোককথার সূচী ছিল স্পেনের সীমানার মধ্যে স্পেনীশ ভাষী অঞ্চল থেকে সংগৃহীত লোককথা।

স্পেন কে বোঝা সত্যিই দুরূহ। স্পেনের এক অঞ্চল থেকে আর এক অঞ্চলে গেলে চোখে পড়ার মতো তফাৎ বেশ গোলমেলে লাগে। এই তফাৎ তো আর

একদিনের নয়। সময়ের প্রবাহে এই তফাৎ ফিকে কিংবা গাঢ় যাই হোক না কেন, তফাতের কারণগুলি জানা প্রাসঙ্গিক। নইলে আর স্পেনের লোককথা বলব কাকে? গন্ধমাদন মানে তো আর বিশল্যকরণী নয়!

Ralph Boggs এর সংগ্রহে ছিল ৮৬৩ টি স্পেনীয় লোককথার বিবরণ। Ralph এর আগেও যিনি স্পেনীয় লোককথা সংগ্রহে নামেন তিনি হলেন অঁরেলিও এস্পিনোসা (Aurelio M Espinosa). অঁরেলিও (১৮৮০-১৯৫৮) এসেছিলেন নিউ মেক্সিকো ও সাউদার্ন কলোরাডোর প্রথম দিকের হিস্পেনিক উপনিবেশ অঞ্চল থেকে। অঁরেলিওর আগ্রহ ও গবেষণার বিষয় ছিল হিস্পেনিক ও তুলনামূলক হিস্পেনিক লোককথা। ১৯১০ থেকে ১৯৪৭ সাল সর্যন্ত স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের রোমক ভাষা বিভাগের (Department of Romance Language) প্রধান ছিলেন তিনি। নিউ মেক্সিকো এবং কলোরাডো'র লোককথার সঙ্গে স্পেনীয় লোককথার সম্পর্ক সূত্র স্থাপনের আগ্রহ থাকলেও অঁরেলিও কোন রকম স্পেনীয় লোককথার প্রকাশনা না পাওয়ায় ১৯২০ সালে আমেরিকান ফোকলোর সোসাইটির আর্থিক আনুকূল্যে স্পেন যান লোককথা সংগ্রহের কাজে এবং ২৮০ টি লোকথার বিবরণ সংগ্রহ করেছিলেন। ১৯৩৬ সালে অঁরেলিও'র ছেলে জুনিয়র অঁরেলিও শুধু মাত্র স্পেনের ক্যাস্টাইল অঞ্চল থেকে ৫১১টি বিবরণ পেয়েছিলেন। এইভাবে ১৯৫১ সাল নাগাদ প্রায় ১৮০০টি স্পেনীয় লোককথার বিবরণ সংগৃহীত হয়েছিল যা কিনা স্পেনের স্পেনীশ ভাষী এলাকার লোককথার চবিত্র বুঝবার প্রামাণ্য উপাদান।

স্পেনিস ভাষায় গল্পকে বলে 'কুয়েন্টো' (Cuento). এর মানে আবার 'বলা' ও হয়। যেমন কোনতার উন কুয়েন্টো (Contar un cuento) মানে হল 'একটা গল্প বল', আবার কুয়েন্টো দি হাদাস (cuento de hadas) অর্থাৎ রূপকথার গল্প, কুয়েন্টো দি ফিনতাসমাস (Cuento de fantasmas) হল 'ভূতের গল্প' ইত্যাদি।

আমার আগ্রহ লৌকিক গল্পে। লোককথার গভীর বিশ্লেষণে নয়। কিন্তু চাইলেই তো আর আমার সেই আশ মিটছে না। উত্তর স্পেনের বিলবাঁও নামক শহরে আমার অতি পরিচিতও তেমন কেউ নেই যে কিনা আমায় গল্প শোনাবে। অসুবিধা আরও একটা আছে। তা হল শোনা ও শোনানোর মধ্যে ভাষাগত ব্যবধান। স্পেনীয়ার্ডদের ইংরেজী বলায় রীতিমতো সংকোচ, হয়তোবা জাত্যভিমান। আমি আবার স্পেনীশ ভাষা খুব কম বুঝি, আমার সুবিধে ইংরেজীতে বললে। নইলে গল্প পেতে আর অসুবিধে কোথায়?

ডিজনী ওয়ারল্ড এর কথাই বলা যেতে পারে। এদের উদ্ভাবনী চিন্তায় এবং অ্যানিমেশনের প্রয়োগে মুখে মুখে চলে আসা গল্পগুলো সবাক চরিত্রের চলচ্চিত্র রূপ নিয়ে বাজারী পণ্য হিসেবে কোটী কোটী টাকার শিল্প হয়ে উঠেছে। লোককথা এইভাবে অভিনব এবং সহজতর যান্ত্রিক উপায়ে পৌছে যাচ্ছে বর্তমান প্রজন্মের কাছে। জানিনা এসবের দ্বারা ওদের কল্পনাশক্তির বিকাশ বাধা পাচ্ছে কিনা। কিন্তু, আমার অভিজ্ঞতা;

কিংবা যারা যন্ত্র সভ্যতার উপযোগিতা একদম ছেলেবেলায় না পেয়েছেন, তাঁরা বোধহয় একমত হবেন, সারাদিনের ভাল ব্যবহার আর পড়াশুনোর পুরস্কার স্বরূপ রাতের বেলা ঘুমোতে যাওয়ার আগে কিংবা ভরদুপুরে টো-টো করে ঘুরে বেড়ানো আটকাতে মা-ঠাকুমার আদর মাখা গল্প শুনতে শুনতে গাছ-পালা, পশু-পাখীদের নিবিড় আত্মীয়তায় মনোজগতে যে রূপকথার জগৎ তৈরি হতো, তা জন্ম দিত আরও নতুন গল্পের, আমাদের ঘুমের গভীরে, স্বপ্নের ঘেরাটোপে। যে শক্তি হৃদয়ে গাঁথা হয়ে অবচেতনেও কল্পনার জন্ম দেয়, চেতনে তার প্রভাব অস্বীকার করি কী করে? স্বপ্নে দেখা গল্পগুলোর বেশির ভাগেরই কেন্দ্র বিন্দুতে থেকে যেতাম নিজেই। দেখতাম; পরিবেশের যারাই ভাল, পাখি-বাঘ-সিংহ-হরিণ-প্রজাপতি গাছ এরা সবাই আমার বন্ধু। দুষ্টু; বদগুলোর সঙ্গ থেকে আমরা অনেক দূরে। আমাদের আনন্দ, ওদের ঈর্ষা। ঘুম ভাঙলে যেই পাখির ডাক আসত কানে; মনে হত এতক্ষণ এরাই ছিল পাশে। কথা বলছিল মানুষের ভাষায়। সারাদিনে বনে বাদাড়ে ঝোপে ঘুরে চলত তাদের অনুসন্ধান। মাঝে মাঝে বিশাল বপুর হেলে পড়া গাছের অদ্ভুত রকম বেঁকানো ডাল দেখে মনে হতো ঐখানে হয়তো ভূতেরা দোল খায়। তৈরি হতো নতুন কল্পনা, নতুন গল্প। বাস্তব আর কল্পনার মেলামেশাতে থেকে যেত মনের সুকুমারতা, সুকোমলতা।

স্পেন আমার কাছে নতুন অভিজ্ঞতা। চারিদিকে অচেনা মানুষ। কেউবা পেশীবহুল দীর্ঘদেহী, দৃঢ় চিবুক, আর কেউ বাস্তবের কষাঘাতে ভুক্তভোগী কর্মের অনুগত ব্যস্ত বিবশ নাগরিক। প্রথম দর্শনেই যে ভাব জমানোর মতো গ্রাম্য সুকুমারতা বা সুকোমলতা খুঁজে পাব তা একান্তই অনিশ্চিত। কাজেই দানা বাঁধে বিরাগ আর সংশয়। তখনই পীড়াদায়ক হয়ে ওঠে জীবন। আশ-পাশের প্রকৃতিও এখানে হারিয়েছে তার সুকুমারতা। শুধু পেয়েছে মাত্রাতিরিক্ত সৌন্দর্য। সেই সৌন্দর্য মানুষের বিচক্ষণতার, তার উদ্ভাবনের অহঙ্কার। দূর পাহাড়ের গায়ে দেখতাম অতি সবুজ ঘাসের খাড়া ঢাল। ইচ্ছে হতো একবার গিয়ে ওই ঘাসের উপর দিয়ে গড়িয়ে নামি। কাছে গিয়ে দেখি এতো ঘাস নয়! কৃত্রিম গালিচার উপর বসানো প্লাস্টিকের তৈরি ঘাস। কাছ থেকে দেখলেও ভ্রম হয়। বৃষ্টির জল অনায়াসে গড়িয়ে নেমে যেতে পারে এর উপর দিয়ে। নীচের মাটি আলগা হয়ে ধস নামার ভয় নেই। সে না হয় হল। কিন্তু ওখানে সত্যি সত্যি কোন ঘাস মাথা তুলবে না, ফুল ফুটবে না, ঝোপ হবে না? সেখানে কি একটা ইঁদুরও গর্ত করে বাঁসা বাধতে পারে না? হতে পারে পাহাড়টাও কৃত্রিম!

আমরা গ্রামের ছেলে। কৃষি ভিত্তিক সভ্যতায় লালিত পালিত হয়েছি। ইউরোপ শিল্প সভ্যতা পেরিয়ে জ্ঞান ভিত্তিক সভ্যতার পথে চলেছে। সেখানে এসে গ্রাম্য সুকুমারতা খোঁজা যে বোকামি, তা আমি বুঝিনি। একদিন আমার অল্প পরিচিতা এক মহিলা তাঁর এক বান্ধবীকে আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে বলল 'মুই সিম্পাটিকা' (Muy Simpatica) । মানে দারুণ ভদ্র। পরে জেনেছিলাম একথার মানে। আলাপ গড়াতে ওদের কাছে গল্পের প্রসঙ্গ তুলতে ওরা সহজেই 'কোয়ান্টো' বুঝেছিল। হেসে

বলেছিল, ওরা জানে যে ভারতীয়রা ভীষণ গল্প ভালোবাসে। ওরাও ভালোবাসে। তাছাড়া ওরা নাকি ছোটবেলা থেকে জেনেছে সমস্ত গল্পই এসেছে ভারত থেকে। শুনেতো আমি হাঁ। কীভাবে জানল ওরা। তা বলতে পারল না। তবে এমন একটা ধারণা ওদের সকলেরই। ক্রমশ বিষয়টিতে রহস্য দেখতে পেলাম। আর অমনি আমি ঢুকে পড়লাম লোককথার গোলকধাঁধাতে। অনেকদিন পরে ওদের কথার সত্যতা বোঝা গেল যখন লোককথার গবেষক, যিনি লোককথা সমুহের শ্রেণীসূচী তৈরি করেছিলেন, এণ্টি আর্ণে (Anti Aarne)র কথা জানলাম। আর্ণে ছিলেন একজন ফিনিশ গবেষক। লোককথা সংক্রান্ত অনুসন্ধানে প্রায়শঃই তাঁর সিদ্ধান্ত হত, লোককথাটির উৎস ছিল ভারতবর্ষ।

স্পেনের স্পেনীশ ভাষী এলাকার লোককথা ঃ

স্পেনের লোককথা আর্ণে-থমসন প্রবর্তিত লোককথার শ্রেণীসূচীতে ইউরোপীয় লোককথা বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। ইউরোপীয় লোককথা সাধারণ বৈশিষ্ট্যের আঙ্গিকে স্বতন্ত্র। তাসত্ত্বেও স্পেনের সামগ্রিক এবং আঞ্চলিক, বিশেষত স্পেনের স্পনীশ ভাষী এলাকার লোককথার নিজস্বতা ও স্বাতন্ত্র্য লক্ষণীয়। স্বতন্ত্র সংস্কৃতির এই প্রবাহ স্পেন থেকে স্পেনের উপনিবেশগুলিতে দেখা গেছে।

স্পেনীশ লোককথার বিষয়-ভাব ও চরিত্রগত মিল স্পেনের উপন্যাস ও নাটকে দেখা গেছে। স্পেনীশ ভাষী এলাকার সবচেয়ে প্রাচীন লোককথার সংকলন হল লিব্রো ডি লস গাটোস (Libro de los Gatos) বা বেড়ালের বই (Book of cats). বইটির পাণ্ডুলিপি বহুদিন অলক্ষে পড়ে ছিল মাদ্রিদের গ্রন্থাগারে (Bibliotica National de Madrid). কিন্তু অজানা থেকে গেছে বইটির লেখকের নাম। ছেষট্টিটি গল্পের সংগ্রহ রয়েছে বইটিতে। লেখার ভাষা ছিল ১৩৫০-১৪০০ শতকের মধ্যবর্তী সময়ের। গবেষকদের মধ্যে মতান্তর রয়েছে গল্পগুলির উৎস সম্পর্কে। কারণ এই গল্পগুলিরই ইংরেজ সন্ন্যাসী Odo of Cheriton এর ল্যাটিন ভাষায় লেখা পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে। লিব্রো-ডি-লস্-গাটোস বইটিতে একটি দুই বন্ধুর গল্প ছিল। লোককথার শ্রেণীসূচীতে এই ধরনের গল্প 'The Two Travellers' (ATU 613) বিভাগের মধ্যে পড়ে। এই গল্পের প্রাচীনতম এবং ব্যাপক ভৌগোলিক বিস্তারে এর উপস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে অনুমান করা হয় ১৩০০ শতকের শেষের দিকে হয়তো গল্পটি স্পেনীয় লোককথায় প্রবেশ করে থাকবে। স্টিথ থমসন (Stith Thomson) এর মতে, গল্পটির উৎপত্তি স্থল এশিয়া। ক্রমশ এটি মধ্য প্রাচ্য হয়ে ইউরোপীয় লোককথার মধ্যে আসে। থমসন দেখেছিলেন এই একই গল্প বৌদ্ধ, হিন্দু, জৈন, হিব্রু লেখায়, আরব্য রজনীতে, এমনকি Gaimbattista Basile's Lo Cunto de li Cunti (The Tale of Tales, 1634-36), এবং জেকব এণ্ড উইলহেল্ম গ্রিম (Jaccob and Wilhelm Grimm) এর Kinder and Hausmarchen (Children's and Household tales, 1812-

15) প্রভৃতিতে পাওয়া গেছে। **'দুই সহচর'** এর গল্পে সাধারণত দুই ভাই, এক জন ভাল ও এক জন খারাপ, এই ধরনের হয়ে থাকে। লিব্রো ডি-লস গাটোস এ এক ধরনের ধূসর বেড়ালের মতো প্রাণীর অস্তিত্ব পাওয়া যায়। এছাড়া রয়েছে একজন নির্বাসিত উদার ভাইয়ের কথা। পরবর্তীকালে ধূসর প্রাণীটির অস্তিত্ব লোককথা থেকে বিলোপ পেতে থাকে। লোককথাটি ক্রমশ একটি নীতি গল্পের রূপ নেয়।

গল্পে একজন ধনী চতুর ভাই তার সরল অপর ভাইটিকে চালাকি করে অনেক দূরে পাঠিয়ে দেয়, হয়তো বা বনে। ধনী পরশ্রীকাতর ভাইটি একদিন জানতে পারে যে তার বোকা ভাইটি প্রচুর সম্পদের মালিক হয়েছে। সব ধন সে পেয়েছে পুরস্কার হিসেবে। কারণ সে এক দুষ্ট দৈত্যের মহামারী ঘটানোর পরিকল্পনা, একটি শহরের জল সরবরাহ ব্যবস্থা নষ্ট করার পরিকল্পনা এবং এক সুখী দম্পতির বিচ্ছেদ ঘটানোর পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দিয়েছিল। হিংসুক ভাইটি ভাবল, সেও একইভাবে প্রচুর সম্পদের অধিকারী হতে পারে। কিন্তু ওই একই পথে এগোতে গিয়ে দৈত্য তাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলেছিল। গল্পটির ভাবে অনেকটাই আমাদের কাঠুরিয়া ও জলদেবতা কিংবা আরব্য রজনীর চিচিং ফাঁক গল্পের মিল লক্ষ্য করা যায়।

স্পেনীয়ার্ডরা খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে ইউরিপিদিস এর লেখা নাটক জেসন (Jason) ও মেদিয়া (Medea) কে নিয়ে লোককথার গল্প বানিয়েছিল। নাম দিয়েছিল ব্লাঙ্কাফ্লোর (Blanca flor) বা **সাদা ফুল**। স্পেনীশ ভাষায় ব্লাঙ্কা শব্দের অর্থ সাদা।

জেসন মেদিয়ার সঙ্গে প্রণয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। মেদিয়া বাড়ি ছেড়ে জেসনের সঙ্গে পালানোর জন্য তার ভাইকে হত্যা করেছিল, সাহায্য করেছিল ভেড়ার সোনালী লোম পেতে, আর জেসনকে দিয়েছিল দুটি ফুটফুটে সন্তান। জেসনের কৃতঘ্নতায় মেদিয়া তার দুই ছেলেকে মেরে ফেলেছিল। লোককথার গবেষক Grace Knopp মনে করতেন স্পেনীয় গল্পকাররা সম্ভবত গল্পটি রোমানদের কাছ থেকে নিয়ে থাকবে। আগেই বলা হয়েছে রোমানরা তৎকালীন ইবেরিয়ান পেনিনসুলা নামক স্পেনে প্রবেশ করেছিল। স্পেনীয়ার্ডরা গল্পটির সঙ্গে যোগ করে ('The Forgotten Fiancee' গল্পের একটি অংশ, যাতে গল্পটি একটি মধুর সমাপ্তি পেয়েছিল। সাদা ফুলের ছিল আশ্চর্য ক্ষমতা। প্রেমিক যখন অন্য কারুকে বিয়ে করার কথা ভাবত তখন সাদা ফুল মনে করিয়ে দিত তার পুরনো প্রেমিকার স্মৃতি।

অজানা স্পেনীয় লোককথা ক্রমশ যতই জানার আলোকে প্রকট হতে থাকে ততই আশ্চর্য হতে হয় এই ভেবে যে, যখন দুটি পৃথক সংস্কৃতি; পৃথক ভাষা কাছাকাছি আসে তা সে আগ্রাসন কিংবা বন্ধুত্ব যে কারণেই হোক, তারাও বিক্রিয়ায় অংশ নেয়, সে বিক্রিয়া ঘটে চলে মানব চক্ষুর তাৎক্ষণিক উপলব্ধির আড়ালে, সময়ের অনুঘটকে-- ভাব মিলনের তাড়নায়, রেখাপাত করে মানুষের ঐতিহাসিক মননশীলতায়, ধীরে ধীরে জুড়তে থাকে একে একে অপরের কল্পনা। লোককথায় সংযুক্ত হয় নতুন বৈচিত্র্য। প্রশ্ন হল এই বিক্রিয়ার পেছনে কোনটি বেশি সক্রিয়, বৈচিত্র্যের অনুসন্ধান নাকি মিলনের

অভীপ্সা? স্পেনের লোককথা এই দুটো সক্রিয়কের অনুপ্রেরণাতেই সমৃদ্ধ হয়েছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এক সংস্কৃতির সঙ্গে আর এক সংস্কৃতির মিশেলে স্পেনের রূপান্তরণ একথাই মনে করায়। প্রমাণ করে এর নমনীয়তা ও অভিযোজনীয়তা।

হিস্পেনিক লোককথার গবেষণা বহুলাংশেই লোককথার এই সাধারণ প্রবণতাকে এড়িয়ে কেবলমাত্র জাতীয়তা ও আঞ্চলিকতাবাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিচালিত হয়েছে। Ruth House Webber বলেছেন— ' Studies of the Hispanic folktales have often been carried out for nationalistic (or regionalistic) reasons or have been identified exclusively with folklore research and thus have not found a place within the frame work of Spanish oral literature studies.'

এসবের কারণ আমাদের কাছে এখন আর খুব একটা অস্পষ্ট নয়। বিচ্ছিন্ন-বিচিত্র, বহু বিভক্ত ভৌগোলিক স্পেন এবং পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা স্পেনের উপনিবেশগুলিকে এক সুতোয় বাঁধার প্রচেষ্টা যে এর পেছনে কাজ করেছে তা বলা বাহুল্য। বিশেষতঃ স্পেনীয় লোককথা সমূহের প্রকাশনার সময়কাল লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, স্পেনীয়ার্ডরা জাতীয়তাবাদের স্বার্থেই লোককথাকে উপাদান হিসেবে নিয়েছিল। অনামী লেখকের লেখা লিব্রো-ডি-লস-গাটোস কে বাদ দিলে, Ralph Boggs তিনটি সময়কাল চিহ্নিত করেছিলেন স্পেনের লোককথার মুদ্রিত প্রকাশনের। প্রথম সময়কালটি ছিল ১৮০০ শতকের মাঝামাঝি, যখন Fernan Caballero (ছদ্মনাম Cecilia Bohl de Feber) এবং অন্যান্য গবেষকরা লোকের মুখে শোনা গল্প লিখেছিলেন, দ্বিতীয় সময়কালটি ছিল ১৯২০ সাল, যখন কিনা Constantino Cabal এবং Aurelio de Liano Roza de Ampudia তাঁদের লোককথার সংগ্রহ Asturias থেকে প্রকাশ করলেন। ইউরোপের ইতিহাসে এই তিনটি সময়কালই ছিল জাতীয়তাবাদের। আর স্পেনীয়ার্ডদের ক্ষেত্রে তখন একদা আমেরিকা থেকে ফিলিপিন্স পর্যন্ত বিস্তির্ণ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য ভাঙতে ভাঙতে অন্তিমতায় এসে ঠেকেছে। এমতাবস্থায় স্পেনীয়ার্ডরা বাধ্য হয়েছিল তাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির আত্মার আবিষ্কারের জন্য লোককথায় মনোনিবেশ করতে।

[1]Luethi Max (1909), The European Folktale : Form and Nature.

Donald Hasses (eds) (2008), The Greenwood encyclopedia of folktales and fairy tales, Vol.1 P..739.

#২ William M. Clements (eds), (2006), The Greenwod Encyclopedia of World Folklore and Folklife. Vol-3, Europe, p. 177, Greenwoo.

#৩ Andalucia, Aragon, Canary Island, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilly Leon, Cataluna, the Comnidad Balear, the Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, La Rioja, Comunidad Autonomia de Madrid, Comunidad Foral De Navarra, Pais Vasco, and Principado de Asturias Y Region de Murcia, ibid-p.178.

বাংলাদেশের প্রান্তিক নৃগোষ্ঠীর লোককথা ঃ সমাজতাত্ত্বিক সমীক্ষা

আবু দায়েন

আধুনিককালে সাহিত্যশিল্প যে রূপতাত্ত্বিক অবয়ব ও ব্যক্তিক... সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত নিয়ে প্রতিষ্ঠিত, তার পেছনে রয়েছে জানা অজানা সুদীর্ঘ ইতিহাস। ষড়ঙ্গ শিল্পের উপচার হিসেবে সাহিত্যাঙ্গিকের উৎপাদনের প্রক্রিয়া বিবেচনায় একে মূলত দুটো ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমত, লিখিত ধারার সচেতন সাহিত্য এবং দ্বিতীয়ত, মৌখিক ধারার অলিখিত সাহিত্য। দুটো ধারা নিয়ে পণ্ডিতি ও হৃদয়সংবেদি আলাপ আলোচনা, তর্ক কূটাভ্যাসের শেষ নেই। শেষোক্ত ধারার বহুরকম সংজ্ঞায়ন-ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ চিহ্নায়নপ্রক্রিয়া সত্ত্বেও একান্ত আত্মগত বোঝাপড়ায় একে বলা যায়, যাপিত জীবনের সরল রূপভাষ্য। অবশ্য উক্ত কথনে বিষয়টির তাৎপর্য প্রতিষ্ঠা পায় না।'সাহিত্য' নামক অভিধা শিল্পের পর্যায়ভুক্ত হলে বলতে হবে, জীবনোপকরণের প্রয়োজনাতিরিক্ত আনন্দময় ও রসমূলক অভিব্যক্তি এর মূলধর্ম। আধুনিককালের সাহিত্যতাত্ত্বিক টেরি ঈগলটন সাহিত্যকে বলেছেন, অব্যবহারবাদী বাচনক্রিয়া (Non-pragmatic discourse)[১] সাহিত্যের নিজস্ব সৌন্দর্যের অভিব্যক্তি ও জীবনমুখিতার বহুপুরনো বিপরীতার্থক উপযোগ নির্ভর তর্ক সামনে রেখে বলা যায়, মৌখিক ধারার অলিখিত সাহিত্য নিশ্চিতভাবেই জীবনবাদী। প্রাত্যহিক জীবনের নানাবিধ কর্মকাণ্ডে বিজড়িত থেকেই মানুষের নিজস্ব সৃষ্টিশীলতার মৌখিক প্রকাশ ঘটে এ-আঙ্গিকের সাহিত্যে। বহুকাল ধরে চলমান নাগরিক সংস্কৃতির অগ্রবর্তী এ -ধারার সাহিত্যের সঙ্গে, বিবিধ বিতর্ক সত্ত্বেও, 'লৌকিক ' আখ্যা জুড়ে চিহ্নায়নের চেষ্টা বিদ্যমান। ইংরেজি 'ফোকলোর' এর বাংলা প্রতিশব্দ নির্মাণজনিত এ জটিলতা সত্ত্বেও জনপ্রিয় সংস্কৃতির অগ্রবর্তী ও তুলনামূলকভাবে অধিক জীবনঘনিষ্ঠ ধারার অন্তর্গত বিষয়গুলো নানা উপশিরোনামে চিহ্নিত হয়েছে। প্রবাদ-প্রবচন , ছড়া, কিস্‌সা-কাহিনি, লোকনাট্য, লোকসঙ্গীত ইত্যাদি বিষয়ের সমান্তরালে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রকরণ লোককথা (folktale)। এই লোককথা প্রকৃতপক্ষে দেশ-কাল পাত্রভেদে মানুষের আদিম পূর্বপুরুষের অভিজ্ঞতার ফসিল ধারণ করে আছে, যা কার্ল গুস্তাভ ইয়ং এর ভাষায় 'আর্কেটাইপ।'[২]

মানুষের গল্পশোনার প্রবণতা আদিম। কর্মক্লান্ত দিনের অবসরে মানুষ বিনোদন খোঁজে। তেমন বিনোদনের প্রয়োজনে, শিশুর মনোরঞ্জনে, প্রকৃতির অপার বিস্ময়

নিয়ে আত্মগত ব্যাখ্যায়, জগৎ ও জীবনের বহু অমীমাংসিত প্রশ্নের সৃষ্টিশীল মানুষ মনগড়া গল্প তৈরি করে। এসব গল্পে মিশে থাকে তার রূপ রুচি, কালজ্ঞান-অভিজ্ঞতা, সমাজঅভিজ্ঞতা, সমাজ-অভিজ্ঞানসহ ব্যক্তি ও সমষ্টিগত সংস্কৃতির নানা উপাদান। সময় বদলায়, মানুষের মুখে মুখে সেসব গল্পে আসে পরিবর্তন। অনেকক্ষেত্রে দেখা গেছে, প্রায় একই গল্প সাগর-মহাসাগর-দেশ মহাদেশ পাড়ি দিয়ে পৃথিবীর নানাপ্রান্তে প্রায় অভিন্ন রূপে পাওয়া গেছে। আবার কখনো দেখা গেছে, রূপে ভিন্ন হলেও গল্পের কাঠানো একই রয়ে গেছে। কখনো আবার সবকিছুর বদলের মধ্যেও উপাদানগত অনেক ঐক্য লক্ষ্য করা গেছে নানান দেশ-ভাষা ও সংস্কৃতির লৌকিক গল্প বা কিসসা-কাহিনীতে। এসব গল্প প্রকৃতপক্ষে লোককথা। আর নানামাত্রিক মিলের যে ব্যাপার দেখা গেল, তা হচ্ছে মানুষের অভ্যাস-আচরণ ও গল্পের ছাঁচগত বিশ্বজনীনতা। এসব গল্প মানুষ মুখে মুখে সৃষ্টি করে, সেভাবেই ছড়িয়ে পড়ে দেশ-দেশান্তরে; আবার কখনো হারিয়ে যায় স্মৃতিনির্ভরতার দুর্বল অবলম্বন থেকে। প্রাথমিক ভাবে সৃষ্ট এসব লোককথা সময়ের পরিক্রমায় তার রূপ ও প্রকরণে বদলাতে থাকে। এসব গল্প কখনো ব্যক্তিনির্ভর আনন্দময়তা থেকে সামষ্টিক চৈতন্যের আধারে পরিণত হয়। কখনো গোষ্ঠীগত জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সূচকে পরিণত হয়; কখনো তা ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক অভিপ্রায়ের অঙ্গ হয়ে ওঠে। কালের বদলে তার প্রকরণ ও বিষয় বদলে যায় বলেই লোককথার নানারকম রূপ রূপান্তর ঘটে। দীর্ঘ সময়ের আবর্তে সাধারণ লোককথা বা কিসসা তার অন্তর্গত গুণে ইতিকথা, পুরাকথা, কিংবদন্তি, লোকপুরাণ বা পুরাণে রূপান্তরিত হয়। আজকের দিনে পৃথিবীর দেশে দেশে অতিপবিত্র জ্ঞানে ধর্মীয় অঙ্গীভূত পুরাণ বা আখ্যানও এককালে স্রেফ লোককথার সাধারণ আঙ্গিকে কোনো ব্যক্তির কল্পনাকে আশ্রয় করে সৃষ্ট।

দেশ কালভেদে বিশ্বজনীন অনেক সাধারণ গুণাবলী ধারণ করলেও বিভিন্ন মাত্রাভেদে জাতি গোষ্ঠীর আলাদা আলাদ লোককথা রচিত হয়। বাংলাদেশ সাধারণ বিবেচনায় একক ভাষা সংস্কৃতির দেশ হলেও এর অন্তরে বহু ভিন্ন নৃতাত্ত্বিক মানুষের বসবাস। ভিন্ন তাদের আচার-আচরণ, ধর্ম, ভাষা, সংস্কৃতির বহু কিছু। জাতিগত একক বিবেচনার মধ্যে বাংলাদেশের সমতল ও পাহাড়ে নৃতাত্ত্বিক বৈচিত্র্যের ভিন্নতর জাতিসত্তা লক্ষণীয়। চাকমা, মারমা বম, তঞ্চঙ্গা , টিপরা , কুকি, মণিপুরি, গারো, সাঁওতাল , রাখাইন, রাজবংশী, কোল, ভিল, মুণ্ডা, খাসিয়া প্রভৃতি প্রায় ৫৪টি জাতিসত্তার প্রান্তিক মানুষ বাংলাদেশে বসবাস করে। তাদের কেউ আদিবাসী -কেউ অভিবাসী; তবে সবাই সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালির নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের তুলনায় ভিন্নতর। জাতিগত ভিন্নতার কারণে অনেকক্ষেত্রেই তাদের ভাব-ভাষা, সংস্কৃতি প্রতিবেশীর কাছে বিস্ময়ের। এ বিস্ময় অনেকটা অজ্ঞতাপ্রসূত হলেও তাদের মানবীয় বৈশিষ্ট্য ও সংস্কৃতি বাঙালির দেশে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। যেমন ভিন্ন তাদের সংস্কৃতি,

তেমনি সংস্কৃতির নানা অনুষঙ্গ। উল্লেখ্য, প্রতিটি নৃতাত্ত্বিক প্রান্তিক গোষ্ঠীর ভাষা আলাদা। ফলে বাহন হিসেবে ভাষাকে অবলম্বন করে, এমন প্রতিটি ক্ষেত্র বা সংস্কৃতির প্রতিটি প্রান্ত মূলধারা থেকে বিচিত্র। তাঁদের সবারই সচেতন সাহিত্যিক প্রয়াস আছে। আছে লোকসংস্কৃতির নিজস্ব ভাণ্ডার। সেখানে লোককথাও সংস্কৃতির ভিন্নতা-দ্যোতক। বর্তমান রচনায় মূলধারার চারটি প্রান্তিক নৃগোষ্ঠীর লোককথার সমাজতাত্ত্বিক সমীক্ষার আয়োজন করা হয়েছে। নৃগোষ্ঠীগুলো হচ্ছেঃ চাকমা, মণিপুরী, গারো ও সাঁওতাল। দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীর পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি এলাকায় চাকমাদের বসবাস। সংখ্যাতাত্ত্বিক বিবেচনায় এরাই সর্ববৃহৎ প্রান্তিক গোষ্ঠী। আধা পাহাড়ি অঞ্চল সিলেটে মণিপুরিদের বসবাস। ভারতীয় পার্বত্য অঞ্চল মেঘালয়ের বাংলাদেশি পাদদেশে এবং অনেকটা সমতলীয় অরণ্যের অধিবাসী গারো এবং রাজশাহির সমতলের সাঁওতাল।এই চার নৃগোষ্ঠীর লোককাহিনি, পুরাকাহিনী বা সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কীয় লোককথার পাঠ নিম্নরূপ ঃ

চাকমা লোককথা

১. জামাই মারনি

এক ছিল রাজা। তাঁর ছিল এক সুন্দরী কন্যা। কন্যার সৌন্দর্যের সংবাদ দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়লো। তাকে বিয়ে করবার জন্য বিভিন্ন রাজপুত্রদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হলো। পরে রাজা ঠিক করে দিলেন, একটি উঁচু পাহাড়ের মাথা থেকে ঝাঁপ দিয়ে নদীতে পড়ে সাঁতার কেটে যে নদী পার হয়ে অপর পারে উঠতে পারবে তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবেন। অনেকেই ঝাঁপ দিয়ে মরলো। পরে খুব সুন্দর এক রাজপুত্র রাজকন্যাকে পাবার জন্য ঝাঁপ দিতে এলো। রাজা তাকে দেখে ঝাঁপ দিতে নিষেধ করলেন। পরের দিন ঝাঁপ দেওয়ার কথা হলো। রাতে রাজা স্বপ্নে দেখলেন, এক বুড়ি তাঁকে বুদ্ধি শিখিয়ে দিচ্ছে 'বুকে পিঠে ও দু'বগলে তুলার বালিশ ও হাতে একটি ছাতা ধরে সেই রাজপুত্রকে ঝাঁপ দিতে বলো।' এই বলে বুড়ি অদৃশ্য হলো। সকালে ঘুম থেকে উঠে রাজপুত্র রাজার কথামতো ঝাঁপ দিল। ঝাঁপ দিয়ে সে নদীতে পড়ে সাঁতার কেটে ওপারে উঠলো। পরে রাজপুত্র রাজকন্যাকে বিয়ে করলো।[৩]

পর্যবেক্ষণ ঃ উদ্ধৃত গল্পটি চাকমা সমাজের নিজস্ব ভৌগোলিক জীবন ও সংস্কৃতির পরিচয়বাহী। রাজা রাজত্ব রাজতন্ত্র পৃথিবীর দেশে দেশে রূপকথার সাধারণ বাস্তবতা। লোককথার তত্ত্বীয় পরিপ্রেক্ষিত বলে, এসব গল্প সুদীর্ঘ কালের পুরনো। দেশে দেশে শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের হাওয়া লাগলেও সামন্ত বা রাজতন্ত্র পৃথিবীর প্রাচীন ব্যবস্থা। আধুনিক যুগে স্থানীয় শাসনতান্ত্রিক কাঠামো অনেকটা ভেঙে গিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। চাকমা সমাজে স্থানীয়ভাবে এখনও রাজার শাসন বিদ্যমান।

সাধারণ মানুষের কল্পনা জুড়ে রাজা রাজড়ার জীবন বিচিত্র আলেখ্যে রূপায়িত। যদিও সে জীবন তাদের ভাবনার সঙ্গে খুব একটা সামাঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কিন্তু কল্প কথায়

রাজার উপস্থিতি চাই। গরীব মানুষ গল্প শুনতে গিয়ে রাজার জীবনের আলেখ্যে নিজের তাৎক্ষণিকতাকে রাঙিয়ে নিতে চায়। কিন্তু রাজারা সাধারণত নির্মম। রাজকন্যার পাণিগ্রাহী হয়ে আসা যুবকদের জীবনের মূল্য নেই তার কাছে। বরং নিজের কন্যার আভিজাত্য রক্ষা করা চাই। সেজন্য রাজা তার রূপসী কন্যাকে রক্ষার জন্য ভয়ঙ্কর উপায় উদ্ভাবন করে।

চাকমারা পাহাড়ি মানুষ। পাহাড়ে তাদের বসবাস, পাহাড়ই জীবনযাপনের সামগ্রিক আশ্রয়। তাই তাদের মানসিক ভূগোল নির্ধারণেও পাহাড়ের উপস্থিতি থাকা চাই। জীবনযাপনের ভূগোল যে-পাহাড় জুড়ে থাকে, তা-ছাড়া লৌকিক কল্পকথাও যেন নির্মিত হয় না। সেজন্য আমরা দেখি, উঁচু-এমনকি সবচেয়ে উঁচু পাহাড়ের উপস্থিতি। সঙ্গে থাকে নদী -ঝর্ণা। মোটকথা, উদ্ধৃত লোককথাটিতে বাস্তবিক চাকমা-জীবন ও সমাজই উঠে এসেছে লোকমানসের কল্পনায়।

২. গোমতি নদীর কথা

এক ছিলো বুড়ো। সে এত অলস ছিলো যে কলার খোসা পর্যন্ত ছাড়িয়ে কলা খেত না। তার ছিল দু'মেয়ে। বুড়ো তাদের কাছে জুমের ভার দিয়ে নিজে কিছুই করত না। একবার বৈশাখ মাসে যখন দু'বোন জুম চাষ করতে গেল, বেলা কিছু হতে না হতেই আকাশ ছেয়ে গেল। চারদিক থেকে বাতাস বইতে লাগল। কোনো আশ্রয় না পেয়ে দু'বোন কপালে করাঘাত করে কাঁদতে লাগল। বড়জন বলল, সাপ, ব্যাঙ, দেবতা , দানব ভূত, প্রেত, রাজা বা প্রজা যেই হোক, যে আমাকে এখানে একটি ঘর তুলে দেবে আমি তাকে বিয়ে করবো। একথা শুনে বিরাট সাপ বাঁশ বহন করে এনে ঘর তুলে দিল। বড় বোনটি সাপকে বিয়ে করল। তার পিতা এ কথা শুনে সাপটিকে মেরে ফেলল। এই দুঃখে বড় মেয়েটি দুচোখ পানিতে ভরে ফেলল। তার চোখের পানি থেকে সৃষ্ট নদীতে সে ডুবে মরল। এই নদীই গোমতি নদী।[৪]

পর্যবেক্ষণ ঃ উদ্ধৃত লোককথাটি রূপকথাধর্মী। এতে চাকমা সমাজবাস্তবতা উঠে এসেছে সুন্দরভাবে। আগের গল্পটির মতো এটি অভিজাত জীবনতাড়িত নয়। বরং এটা দরিদ্র জীবনসত্য- ব্যাখ্যানমূলক। পিতার আলস্যের মধ্য দিয়ে যেমন পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্যের চিত্র সুস্পষ্ট, তেমনি ঝুমচাষে মেয়েদের অংশগ্রহণে কৃষিকাজে নারীর অবদানের কথা উঠে এসেছে। একই সঙ্গে নারীর জীবনের অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তাহীনতাও গল্পের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সর্বদেশে -কাল-সমাজে নারীর অনিশ্চিত জীবন ধ্রুব সত্য। সে সত্য চাকমা রূপকথায় বেদনা ভারাতুর রূপ নিয়েছে। সাপের সঙ্গে মানুষের বিয়ে বাস্তবসম্মত নয়। কিন্তু রূপকথা জীবনের বাস্তবতাকে ভিন্নতর রূপকের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করে। স্বামী অনেক ক্ষেত্রেই নারী জীবনের ভয়ঙ্কর সাপ বা রাক্ষসের প্রতিভূ। কিন্তু তাকে ভালবেসেই নারী জীবন পার করে। স্বামী ভালো-মন্দ যা-ই হোক না কেন, তাকে ছাড়া তার গতি নেই। তাই তার অনুপস্থিতি

নারীর অন্তহীন কান্নার নাম। সে কান্না এতই পরিব্যাপ্ত যে, নদী-সমুদ্রের জলের ব্যাপকতার সঙ্গেই তা তুলনীয়।

সাঁওতাল সৃষ্টিতত্ত্ব [৫]

সৃষ্টির আদিতে পৃথিবী বলে কিছু ছিল না— ছিল শুধু পানি আর পানি। একদিন চন্দ্রের কন্যা স্নান করতে এসে তার শরীরের ময়লা দিয়ে দুটো পাখি তৈরি করল। পাখি দুটোর নাম হলো হাঁস ও হাঁসিল। তারা পানিতে ভাসতে লাগল। অনেকদিন ভেসে থাকার পর তারা একদিন ঠাকুরজিউ অর্থাৎ ঈশ্বরের কাছে খাবার চাইল। ঠাকুরজিউ অতঃপর পৃথিবী সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। কিন্তু পৃথিবী সৃষ্টির জন্য তো প্রয়োজন মাটির। মাটি আনতে হবে গভীর সমুদ্রের নিচ থেকে। তাই ঠাকুর প্রথম ডাকলেন রাঘব বোয়ালকে। বোয়াল তার দাঁতে করে মাটি আনার চেষ্টা করল। কিন্তু জলের ওপর আসতে আসতে মাটি পানিতে গলে গেল। অতঃপর আদেশ করা হল কাঁকড়াকে। কিন্তু তার চেষ্টাও সফল হল না। ঠাকুর সর্বশেষে মাটি আনতে আদেশ করলেন কচ্ছপকে। কিন্তু তার চেষ্টাও সফল হল না। ঠাকুর সর্বশেষ মাটি আনতে আদেশ করলেন কেঁচোকে। কেঁচো মাটি আনতে রাজি হল ঠিকই, তবে ঈশ্বরকে বলল, "আমি মাটি আনবো ঠিকই কিন্তু এ জন্য কচ্ছপকে পানির ওপর ভেসে থাকতে হবে।" ঠাকুরের নির্দেশে কচ্ছপ পানির ওপর ভেসে থাকতে রাজি হলো। কেঁচো অতঃপর তার লেজ কচ্ছপের পিঠের ওপর রেখে মুখ দিয়ে মাটি খেতে শুরু করল এবং লেজ দিয়ে তা বের করে দিতে লাগল। এভাবে কচ্ছপের পিঠের ওপর মাটি সরের মতো জমতে জমতে পৃথিবী সৃষ্টি হয়ে গেল। কিন্তু পৃথিবীর মাটি প্রথমে শক্ত ছিল না। মাটি শক্ত করার জন্য ঠাকুর পৃথিবীর ওপর প্রথমে ঘাস অতঃপর শাল, মহুয়া সহ আরো নানারূপ বৃক্ষ রোপণ করলেন।

কিছুদিন পর মেয়ে পাখিটা দুটো ডিম দিয়ে তা দিতে থাকল। পুরুষ পাখিটা খাদ্যের অন্বেষণে বেরিয়ে পড়ল। নয় মাস পাঁচ দিন পর ডিম নড়তে শুরু করল এবং নয়মাস দশদিন পর ডিম থেকে একজন নারী এবং একজন পুরুষ বেরিয়ে এল। এদের নাম হল পিলচু হাড়াম ও পিলচু বুড়ি। এরাই হল পৃথিবীর আদি নর-নারী।

ধীরে ধীরে আদি এই দুই নর-নারী বড় হতে লাগল এবং হিহিড়ি-পিহিড়ি নামক স্থানে বসতি শুরু করল। ঠাকুরজিউ প্রায়ই এদের কাছে এসে শুভাশুভ খবর নিতেন। কিছুদিন যেতে না যেতে ঠাকুর অনুভব করলেন পৃথিবীতে আরো মানুষ প্রয়োজন। এ কারণে ঠাকুর একদিন পিলচু হাড়াম ও পিলচু বুড়ির কাছে এসে আমোদ-প্রমোদের জন্য নেশা দ্রব্য তৈরি এবং তা পান করার নিয়ম শিখিয়ে দিলেন। তারা নেশা দ্রব্য তৈরি করে সেবন করল এবং নেশাগ্রস্ত হয়ে পরস্পর দৈহিকভাবে মিলিত হল। ঠাকুর পরের দিন তাদের খবর নিতে এলেন। কিন্তু তারা ঠাকুরের সামনে আসতে চাইল না। কারণ তখনও তারা নেশাগ্রস্ত ও উলঙ্গ ছিল। ঠাকুর অতঃপর তাদের লজ্জা নিবারণের

জন্য বটবৃক্ষের পাতা এনে দিলেন। তারা সে পাতা পরিধান করে ঠাকুরের সামনে উপস্থিত হল। পিলচু হাড়াম ও পিলচু বুড়ির দৈহিক মিলনের ফলে মানুষের বংশ-বৃদ্ধির প্রক্রিয়া শুরু হল। অচিরেই তাদের সাতটি পুত্র ও আটটি কন্যা জন্মগ্রহণ করল। ধীরে ধীরে তাদের সন্তানরা সাবালক হয়ে উঠল। তাদের এখন কী ব্যবস্থা হবে তা জানার জন্য পিলচু হাড়াম ও পিলচু বুড়ি ঠাকুরজিউকে স্মরণ করল। ঠাকুর এসে পিলচু হাড়ামকে বললে, 'তুমি ছেলেদের নিয়ে সিংবিরে যাও' আর পিলচু বুড়িকে বললেন, 'তুমি মেয়েদের নিয়ে মান্‌বিরে যাও।' ঠাকুরের নির্দেশ অনুসারে তারা স্ব স্ব এলাকায় চলে গেল। পিলচু হাড়াম তার ছেলেদের সব দিকে শিকারে যেতে বলল, কেবল মানবির ছাড়া। অনুরূপভাবে পিলচু বুড়িও তার মেয়েদের সবদিকে যাওয়ার অনুমতি দিল, কেবল সিংবির ছাড়া। কিন্তু ছেলেরা একদিন শিকার থেকে ফেরার সময় পথ ভুল করে মানবিরে চলে গেল। তারা দেখল, একটা বিলের ধারে আটটি মেয়ে শাক তুলছে। মেয়েদের দেখে ছেলেরা ভীষণ খুশি। মেয়েদের সঙ্গে কথা বলার জন্য ছেলেদের মন উশখুশ করতে লাগল। কিন্তু সেদিন আর কথা বলা হল না। পরদিন তারা মেয়েগুলোকে দেখার জন্য পুনরায় সেই বিলের ধারে গেল। সেদিনও তারা দেখল,মেয়েরা শাক তুলছে তাদের দেখে দুটো ছেলে গানের মাধ্যমে জিজ্ঞেস করলঃ

নই গাডা ডোডি দা আ-বেন্‌
লোলো কানা কুড়িকিন্‌
নাবেন রে আ জোতিপোতি দো
চিলি তাবেন কুড়া কিন।

(ভাবার্থঃ ঝর্ণা থেকে মেয়েদের জল তুলতে দেখে দুটো ছেলে জিজ্ঞেস করল, 'তোমাদের পিতৃ-পরিচয় কী?)

উত্তরে দুজন মেয়ে বললঃ

আলিং রেআ জোতি পোতি বেনঞিঁঞাম্‌
কানেয়া কুড়িকিন
নালিং রেআ জোতি পোতি দো
রিয়ার কণ্ড পিতর কোনহুম
জোতি তোলিং দো কুড়াকিন।

(ভাবার্থ ঃ আমাদের পিতৃ পরিচয় জানতে চাচ্ছো? আমাদের পিতৃ পরিচয় হচ্ছে ঠাণ্ডা কলসী আর পিতলের বেড়ী।

অতঃপর ছেলেদের উদ্দেশ করে মেয়ে দুটো জিজ্ঞাসা করলো ঃ

তাহান ধুরি বেন কানিয়া কুড়াকিন্‌
নাবেন রেআ জোতি পোতি চিলি
আবেন -এ আ কুড়াকিন

নালিং রেআ জোতি তোলিং
দো কুড়াকিন।

(ভাবার্থঃ তোমরা যে হালচাষ কর, তা তোমাদের পিতৃপরিচয় কী? ছেলেরা বলল, 'আমাদের পিতৃ পরিচয় হচ্ছে হালের গুঁটি'।

অতঃপর ছেলেরা মেয়েদের বলল, 'কাল তোমরা কোথায় থাকবে? ' মেয়েরা উত্তর দিল, 'কাল আমরা বটতলায় থাকব।' পরদিন ছেলেরা শিকারে যাওয়ার পরিবর্তে সেই বটতলার গিয়ে হাজির হল। মেয়েরা ছেলেদের আসার অনেক আগেই এসে বটগাছের ঝুল ধরে দোলনা খেতে লাগল । পূর্বদিনের সূত্র ধরে অতঃপর ছেলেমেয়েরা বাক্যালাপ শুরু করল। তারা আলাপ করতে করতে পরস্পর এমন অন্তরঙ্গ হয়ে উঠল যে, একসময় ছেলেরা বটের পাতা দিয়ে মাদলের ন্যায় বাজনা বাজাতে লাগল। আর মেয়েরা তার সঙ্গে নৃত্য শুরু করে দিল। এরপর বড়র বড় ছোটর ছোট এমনিভাবেই সাতভাই সাতবোনকে বিয়ে করে ফেলল। বিয়ে হল না শুধু ছোট বোনের।

সাত ভাইয়ের নাম অনুসারে সাতটি বংশের নাম হল- হাঁসদা, মুর্মু, কিস্কু, হেমব্রম, মারাণ্ডি, সোরেন এবং টুডু। এইভাবে গোত্র প্রথার উদ্ভব হল, সঙ্গে সঙ্গে নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হল বিয়ের। একই গোত্রের ছেলে মেয়েদের মধ্যে বিয়ের রীতি প্রতিষ্ঠিত হল। বিয়েপ্রথা চালু হলে মানুষের বংশ বৃদ্ধি হতে লাগল। অতঃপর তারা খোজ কামান দেশে চলে গেল। সেখানে যাওয়ার পর তাদের নৈতিক অধঃপতন সূচিত হল। তারা মনুষ্যত্ব হারিয়ে ধীরে ধীরে হিংস্র হয়ে উঠল, পরস্পরের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ ছড়িয়ে আত্মঘাতী সংগ্রামে লিপ্ত হল। এতে ঠাকুরজিউ ভীষণ রুষ্ট হলেন। তিনি একদিন তাদের তাঁর কাছে ডাকলেন। কিন্তু ঠাকুরের ডাকে কেউ সাড়া দিল না। ঠাকুর বাধ্য হয়ে পিলচু হাড়াম ও পিলচু বুড়িকে ডেকে বললেন, 'তোমার সন্তানরা যেহেতু আমার কথা শুনছে না, আমি তাদের ধ্বংস করে দেব। তোমরা দু'জন হারাতা পর্বতের গুহায় লুকিয়ে থাক।' ঠাকুরের নির্দেশ অনুসারে পিলচু হাড়াম ও পিলচু বুড়ি পর্বতের গুহায় গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করল। এদিকে ঠাকুর সাত দিন সাত রাত অবিরাম অগ্নিবৃষ্টি দিয়ে তাদের সন্তানদের ধ্বংস করে দিলেন। এরপর মানুষের বংশবৃদ্ধির জন্য ঠাকুর আবার পিলচু বুড়িকে আশীর্বাদ করলেন। তারা পুনরায় আরো অনেক সন্তানাদির পিতা-মাতা হল।

কিছুদিন পর তারা হারাত পর্বত ছেড়ে সাসাংবেদা চলে গেল। সেখানে কাটলো দীর্ঘদিন। অতঃপর নান স্থান ঘুরে ফিরে চলে গেল চায়চাম্পাতে। সেখানে থাকাকালেই তারা 'মোরে ইকো,', 'তুরো ইকো' এবং সূর্যদেবের পূজা শুরু করল।

পর্যবেক্ষণ ঃ উদ্ধৃত কাহিনিটি সাঁওতাল সৃষ্টিতত্ত্ব তথা পুরাকাহিনি (myth)। এ ধরনের কাহিনি সাধারণত সুদীর্ঘকাল ধরে রচিত হয়। লোককথা সাধারণত মানুষের

যে-রূপ পার্থিব জীবন -সংক্রান্ত বিষয়ে হয়, তা থেকে এ-কাহিনি আলাদা। তবে পুরাকাহিনীর তত্ত্বীয় পরিপ্রেক্ষিত অনুযায়ী, এ ধরনের কাহিনি প্রথমত, মানুষের আধ্যাত্মিক কল্পনা দ্বারা সৃষ্টি হয়; দ্বিতীয়ত, লৌকিক জীবনের গল্পও ধীরে ধীরে পুরাকাহিনীতে রূপ নিতে পারে। সে-হিসেবে, এ কাহিনিতে অতি লৌকিক প্রসঙ্গের উপস্থিতি থাকলেও উপাদানগত বিবেচনায় তা জীবনরস-সম্পৃক্ত। তবে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হচ্ছে, কোরআন ও বাইবেলে মানবসৃষ্টির যে— কাহিনি বর্ণিত হয়েছে; অর্থাৎ আদি মানব-মানবী আদম ও হাওয়া বা অ্যাডাম ও ঈভের কাহিনির সঙ্গে এর যথেষ্ট মিল আছে। সাঁওতাল পুরাতত্ত্ব ও সেমেটিক ধর্মীয় সৃষ্টিতত্ত্বের কোনটা অগ্রবর্তী তা বলা মুশকিল হলেও পৃথিবী ও মানবসৃষ্টির উভয় আখ্যান থেকে মনে হয়, একটি আরেকটির ছায়া অবলম্বনে তৈরি হয়ে থাকতে পারে। জাগতিক মানুষের সুখ-দুঃখ, কামনা-বাসনার সবই এ কাহিনীতে উপস্থিত। সে-ক্ষেত্রে বলা অসঙ্গত নয় যে, যাপিত জীবনের নানা নিয়ামক দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সমাজস্থ মানুষের প্রতিদিনের অভিজ্ঞতার নির্যাসই হচ্ছে এ-কাহিনী। এতে সংস্কৃতির রূপ রূপান্তর ও ভিন্নতর সাংস্কৃতিক উপাদান পুরোমাত্রয় উপস্থিত আছে।

তামাক পাতার জন্ম বিষয়ে সাঁওতালী লোকপুরাণ ঃ এক কদাকার -কুৎসিত সাঁওতাল মেয়ের বিয়ে হচ্ছিল না। তার স্বজনরা বহু চেষ্টা করে বিফল হল। মেয়েটির মনে অনেক দুঃখ। জীবন-যৌবনের অজানা সব সুখের জন্য তার আফশোস। কোনো ছেলে ভালবাসার দৃষ্টি দিয়ে তার দিকে তাকিয়ে পর্যন্ত দেখল না। মেয়েটি মনে মনে ঠাকুরজিউর কৃপা চায় আর চোখের জল ফেলে। একদিন ঠাকুরজিউ তার কষ্টে ব্যথিত হলেন এবং সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "আমি এমন কিছু করছি যাতে তোর দিকে থেকে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেওয়া সব যুবকরা তোকে আদরে চুমো খেতে বাধ্য হয়।" কিছুদিন পর মেয়েটির মৃত্যু হল। ঠাকুরের ইচ্ছে অনুযায়ী তার সমাধিস্থ দেহভস্ম থেকে গজিয়ে উঠল এক গাছ। সে এক গাছ ও তার বীজ থেকে আরো বহু গাছ। একদিন ঘটনাক্রমে কিছু শুকনো গাছে আগুন লাগল। পোড়া গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। সে গন্ধের মাদকতায় আবাল-বৃদ্ধ সব বয়সীর পুরুষেরা সমবেত হয়ে আনন্দে নিঃশ্বাস নিতে থাকল। সেই থেকে ওই গাছ বা তামাক ও তজ্জাত উপাদান সব পুরুষের অতি প্রিয় মাদক হয়ে উঠল।

পর্যবেক্ষণ ঃ যে কোনো জাতি-গোষ্ঠীর জীবন থেকে এরকম বিমূর্ত রঙের আস্বাদ পাওয়া যায়। এ রঙ ব্যক্তি-জাতি ও পরিবেশভেদে বিচিত্র। যার রঙ এবং যে অনুভব করবে তার উভয়বিধ বিষয়ই আপেক্ষিক। বাংলাদেশের সাঁওতাল জীবনধারা চূড়ান্তভাবে প্রান্তিক। তারা বাংলাদেশের মূলস্রোতের মানুষের তুলনায় সংখ্যা তাত্ত্বিকভাবে খুবই নগণ্য। শিক্ষা সভ্যতার যাবতীয় বিষয়েও তারা চূড়ান্ত রকম প্রান্তিক। এই প্রেক্ষাপটে তামাকপাতার রঙ যেন সাঁওতাল জীবনের ধূসরতারই প্রতীক।

একটি মেয়ের জীবনের দুঃখজনক পরিণতির মধ্য দিয়ে পুরো সাঁওতাল জীবনচৈতন্যের ছবি উঠে এসেছে কাহিনিটিতে। মেয়েটি যেন অবসাদ ও অবদমনের প্রতীক, তামাকপাতা ও সাঁওতাল জীবনও তেমনি একার্থবোধক নেতিবাচকতায় উপস্থাপিত। সে কারণেই বলা হয়, লোককথা প্রকৃতপক্ষে জাতীয় মনন ও চেতনারই প্রতিরূপ।

গারো সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কিত উপাখ্যান ঃ "সৃষ্টির আদি অবস্থায় বিশ্বজগৎ বলতে কিছুই ছিল না। এই পৃথিবীর চারদিক তখন নিঃসীম কালো ঘোর- অন্ধকার ও অসীম জলরাশিতে পরিপূর্ণ ছিল। চারিদিকে কেবল পানি আর পানি ছাড়া কোথাও আলো, ভূমি, প্রাণী বা গাছপালার কোনো অস্তিত্ব ছিল না। এই অবস্থায় তাতারা রাবুগা পৃথিবী সৃষ্টি করার কথা চিন্তা করলেন। তার এই জাগ্রত ইচ্ছাকে বাস্তব রূপ দেওয়ার জন্য তিনি তার সহকারী দেবতা নস্তু-নপান্তুকে মনোনীত করলেন। নস্তু-নপান্তু একজন স্ত্রীলোকের বেশে তার সহকর্মী মাচির সহায়তায় পৃথিবী সৃষ্টির কাজে মনোনিবেশ করলেন । নস্তু-নপান্তু প্রথমে পানির ওপর বিছান মাকড়সার জালে আশ্রয় নিলেন। তাতারা-রাবুগা পৃথিবী সৃষ্টির জন্যতার হাতে একমুঠো বালি দিয়েছিলেন। নস্তু-নপান্তু সেই একমুঠো বালি দিয়ে পৃথিবীর আকার দেওয়ার চেষ্টা করলেন। কিন্তু কোনোমতেই তিনি তা করতে পারলেন না। উক্ত কাজে তাকে সাহায্য করার জন্য কর্কটাকৃতি অতিকায় এক প্রাণীকে তিনি গভীর পানির তলদেশ থেকে কিছু কাদামাটি নিয়ে আসার জন্য প্রেরণ করলেন। কিন্তু পানির গভীরতা বেশি থাকায় তার পক্ষে মাটি নিয়ে আসা সম্ভব হল না। কাজেই সে ব্যর্থ মনোরথে ফিরে এল। এরপর নস্তু-নপান্তু চিচিং বারচিং নামক ছোট এক প্রাণীকে এ কাজে নিযুক্ত করলেন। চিচিং বারচিং গভীর পানির তলদেশে প্রবেশ করে কিছু কাদামাটি নিয়ে ফিরে এল। আর সেই কাদামাটির সাহায্যে নস্তু-নপান্তু তখন এই পৃথিবী সৃষ্টি করলেন।

নস্তু নপান্তু পৃথিবী সৃষ্টি করে এর নাম দিলেন মানেপিল্টো। পৃথিবীর বড় আকৃতির 'মজার' আর ছোট আকৃতির পাথর 'ডিনজার' ছাড়াও পৃথিবীর উপরিভাগ তখনো খুবই নরম ছিল। এর ওপর দিয়ে হাঁটা ছিল তখন অসম্ভব। এই ব্যাপারে তাকে সাহায্য করার জন্য নস্তু নপান্তু তাতারা রাবুগাকে অনুরোধ করলেন। তাতারা রাবুগা নস্তু-নপান্তুর প্রার্থনা শুনে আকাশে সূর্য ও চাঁদ দিলেন এবং মর্ত্যে দিলেন বাতাস। সূর্যের আলো, চন্দ্রকিরণ এবং মর্ত্যের বাতাসে পৃথিবীর উপরিভাগ ধীরে ধীরে শক্ত ও কঠিন হয়ে উঠল।

তাতাধা রাবুগা পৃথিবীকে একটি 'রিকিং' বা অন্তর্বাস দিলেন। তিনি মেঘের তৈরি একটি পাগড়িও তার মাথায় দিলেন। মাথায় চুলের শোভা বৃদ্ধির জন্য তিনি 'আমফাং', 'রিসক' 'প্রাপ', 'বললং' বৃক্ষের মুলের ন্যায় তার মাথায় চুলও দান করলেন।

প্রাণীদের মধ্যে তাতারা রাবুগা প্রথমে লেজবিহীন বানর জাতীয় একটি প্রাণী সৃষ্টি করলেন। এই প্রাণীর কাজ ছিল তার বিকট আওয়াজ দ্বারা পৃথিবীকে সচল ও সজাগ

করে রাখা। বিশ্বপ্রকৃতি যেন ক্লান্তিতে অবসাদগ্রস্ত হয়ে ঝিমিয়ে না পড়ে তার যাবতীয় দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল সেই প্রাণীকে। এরপর তিনি হনুমান ও বাদামি রঙের বানর জাতীয় প্রাণীগুলো সৃষ্টি করেন। পরে অন্যান্য প্রাণীদেরও সৃষ্টি করেন।

জলচর প্রাণীদের মধ্যে তিনি প্রথমে একটি বৃহদাকৃতির কদাকার ব্যাঙ সৃষ্টি করেন। এই ব্যাঙের কাজ ছিল তার বিকট আওয়াজ দ্বারা অন্যান্য জলচর প্রাণীদের নিকট আকাশে মেঘের আগমনবার্তা ঘোষণা করা। ব্যাঙসৃষ্টির পর তিনি গভীর জলের অন্যান্য মাছগুলো সৃষ্টি করেন।

পৃথিবী সৃষ্টির পর তাতারা রাবুগা দেখলেন, মাটির নিচে অনেক পানি আছে। কিন্তু পৃথিবীর উপরিভাগে কোথাও একফোঁটা পানি নেই। তখন তিনি পৃথিবীর বুকে নদী প্রবাহিত করলেন। কঠিন এই ধরার বুকে বারিধারা সিঞ্চনের জন্য তিনি আকশে 'নরে -চিরে -কিম্‌রে-বক্‌রে' নাম্নী বৃষ্টিদেবীকে প্রেরণ করলেন। আকাশে বৃষ্টির আগমন-বার্তা ঘোষণা করার জন্য তিনি গোয়েরা (বজ্র) কেও পাঠালেন। তাতারা রাবুগা পৃথিবীর সবকিছু সৃষ্টিরপর মানুষ সৃষ্টি করলেন। আদি গারোধর্মে বিশ্বাসীদের মতে, প্রথম মানব-মানবীর নাম হল 'শানি' ও 'মুনি'। তাতারা রাবুগার আদেশ নস্তু-নপাস্তু প্রাচ্যের 'আমিতিং আফিলজাং' নামক কোনো একস্থানে গারোদের আদি পিতা-মাতা ও প্রথম নারী-পুরষ এই 'শানি' ও 'মুনি' কে সৃষ্টি করেন। তাদের সন্তানদের নাম হল 'গানচেং' আর 'দুজং'। এই 'গানচেং' আর 'দুজং'-ই হল বর্তমান গারোজাতির পূর্বপুরষ।

পর্যবেক্ষণ ঃ উদ্ধৃত পুরাকথাটি পূর্বোদ্ধৃত সাঁওতাল সৃষ্টিতত্ত্বের অনুরূপ ও সমান্তরাল। সাঁওতাল সৃষ্টিতত্ত্বে ঈশ্বর হচ্ছেন ঠাকুরজিউ, গারোদের তাতারা রাবুগা। পৃথিবীর সৃষ্টিপ্রক্রিয়া প্রায় একই। মানুষের জন্মবৃত্তান্তও প্রায় একইরকম। সাঁওতাল সৃষ্টিতত্ত্বে পিলচু হাড়াম আর পিলচু বুড়ি সেমেটিক অ্যাডাম -ঈভের প্রতিরূপ, গারোদের শানি-মুনি। আদি সাঁওতাল অধিক পরিমাণে ভারতীয় সনাতনী ধর্মবিশ্বাসের কাছাকাছি । আর গারোরা সনাতনী হলেও সেমেটিক বিশ্বাসের সঙ্গে তাদের অধিকতর মিল। নস্তু-নপাস্তুর ধারণার মধ্যে ঈশ্বরের সহযোগী হিসেবে সনাতনী দেবদেবী বা সেমেটিক দেবদূত বা ফেরেস্তার অস্তিত্বের মিল পাওয়া যায়। লোককথার আদলে সৃষ্ট এসব ধর্মবিশ্বাস বা সৃষ্টিতত্ত্ব থেকে বোঝা যায়, মানুষ যে জীবন যাপন করে তার প্রতিরূপই গড়ে তোলে তার নির্মিত ধর্মব্যাখ্যানে। অতিলৌকিক বা পারলৌকিক অনেক ধরনের বিশ্বাস মানুষ লালন করে। কিন্তু সে বিশ্বাস তার কল্পিত জীবন-বিবিক্ত কোনো অবয়ব নির্মাণ করে না। এতে সর্বতোভাবে সামাজিক মানুষের পার্থিব জীবনমুখিতার প্রমাণ মেলে। মানুষের যাপিত জীবনই তার পরমকল্প। এর বাইরে মানুষ কিছু ভাবতে পারে না।

মণিপুরি পুরাকথা

মণিপুরিদের উদ্ভব বিষয়ে তাদের সমাজে যে মিথ প্রচলিত তা নিম্নরূপঃ প্রেমরস মত্ত রাধা-কৃষ্ণ নির্জন রাতে বৃন্দাবনে রাসনৃত্যে বিভোর হলে উক্ত গীত ও বাদ্যযন্ত্রের সুরে মুগ্ধ দেবরাজ তা প্রত্যক্ষ করতে আগ্রহী হন। কৃষ্ণ তাতে সম্মতি না দিলে দেবরাজ বারংবার অনুরোধ করতে থাকেন। একপর্যায়ে কৃষ্ণ তাকে মেয়েসাজে মহাকেলি আসরের দ্বাররক্ষক নিযুক্ত করেন। নিষেধাজ্ঞা ছিল যাতে ওই আসরে অন্য কেউ কোনো প্রকারে প্রবেশ করতে না পারে। ফলে ব্রজবালার ছদ্মবেশধারী শিব নর্তনধ্বনিতে মিহিসুরে উতলা হয়ে ওঠেন। ওই রস পর্যবেক্ষণ করতে না পেরে মনে প্রবল ব্যথা অনুভব করেন। এমনি এক রাসনৃত্য করতে বদ্ধপরিকর শিবপার্বতীকে নিয়ে স্থান নির্বাচনে ঘুরতে লাগলেন। পৃথিবী প্রদক্ষিণ শেষে, তারা আসামের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অষ্টশৃঙ্গবেষ্টিত কুমার পর্বতে এসে উপস্থিত হন। তার পাশেই লোকতাগ হ্রদ। সুরম্য এ স্থানটি দেখে তারা খুশি হলেন এবং সিদ্ধান্ত নিলেন এখানেই হবে তাদের রাসনৃত্য। কিন্তু অসুবিধা হল হ্রদের মধ্যেকার জল নিয়ে। শিব তার ত্রিশূলের আঘাতে পর্বতগাত্র ছিন্ন করে জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু তাতেও অসুবিধা গেল না। কারণ, জায়গাটি অসমতল। তারা সৃষ্টিকর্তার সাহায্য প্রার্থনা করলে তাৎক্ষণিকভাবে ইন্দ্রদেবগণ এসে মাটি ভরাট করে জায়গাটি সমতল করে দেয়। কিন্তু চারদিকে পর্বতবেষ্টিত স্থানটিতে সূর্যের আলো পড়ে না। অন্ধকারে তো আর নাচ হয় না। শেষপর্যন্ত গুহাবৃত অনন্তনাগকে আমন্ত্রণ জানান হল স্থানটিকে আলোকিত করতে। অনন্তনাগ তার মাথার মণির আলোয় আলোকিত করে তুলল সে স্থানটিকে। সেই থেকে স্থানটি লোকালয়ে পরিণত হল। এবার এল স্থানটির নামকরণের পালা। নানারকম চিন্তার পর অনন্তনাগের মণির আলোয় প্রথমবারের মতো আলোকিত স্থানটির নাম হল মণিপুর। রাসনৃত্য আয়োজন ও পর্যবেক্ষণের সৌভাগ্যলাভকারী লোকজন মণিপুরি নামে অভিহিত হল। ওই এলাকার লোকজন পূর্ব থেকেই বিষ্ণুভক্ত থাকায় রাজধানীর নাম হল বিষ্ণুপুর।[৭]

পর্যবেক্ষণ ঃ উদ্ধৃত পুরাকথা ভারতীয় সনাতনী ধর্মবিশ্বাস -প্রসূত। বৈদিক ধর্মমত ও রামায়ণ-মহাভারতের ছায়ায় বিকশিত সম্প্রদায়েরই একটি বিশেষ শাখা বাংলাদেশ ও ভারতের মণিপুর রাজ্যের অধিবাসী মণিপুরিগণ। ঐতিহাসিক ধারাক্রমে বৈদিক ধর্মের ভিন্নতা-সঞ্চারী এক শাখা গৌড়ীয় বৈষ্ণবমতের উপস্থিতি লক্ষ করা যায় মণিপুরি পুরাকথায়। প্রসঙ্গত, প্রাগৈতিহাসিক ভারতের আরণ্যক প্রকৃতি-প্রসূত সমাজজীবন থেকে লোকমুখে সৃষ্ট জনপ্রিয় কথামালাই রাময়ণ-মহাভারতের প্রাণস্বরূপ। শত সহস্র বছর ধরে মুনি ঋষিদের জীবনবেদ ও প্রকৃতির আন্তব শক্তিরপ্রতি ভক্তিবিনত মানুষের সৃষ্ট লোককথাই গুণি কবির হাতে মহাকাব্যের ব্যাপ্তি লাভ করেছে। সেসব লোককথাও শত সহস্র বছর মানুষের জীবনচলার পাথেয় হয়েছে। সমাজ ও জীবনের স্বাভাবিক

বিবর্তনপ্রক্রিয়ায় বদলেছে প্রায় সবকিছু। বদল ঘটেছে জাতিবোধ ও ধর্মীয় বিশ্বাসেও। ফলে এক মহাজাতি থেকে নানা ভিন্নতর জাতিসত্তার উদ্ভব ঘটেছে। আবার এক মহাধর্ম ভিন্নতর নানা ধর্মবিশ্বাসেরও সৃষ্টি করেছে মানুষের জৈবনিক বাস্তবতা আত্মীকরণ করে। সে সত্যই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে মণিপুরি পুরাকথায়।

উপসংসহার ঃ এ পর্যালোচনায় বাংলাদেশে বসবাসকারী চাকমা, সাঁওতাল, গারো ও মণিপুরি নৃগোষ্ঠীর লোককথা ও পুরাকথার ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এ-আয়োজন একটি চকিত আলোকপাত। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে মূলধারার বাঙালি জনগোষ্ঠীর বাইরে যেসব ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জাতিসত্তার মানুষ বসবাস করে, তারা নানা কারণে প্রান্তিক অবস্থানে আছে। তাদের এ প্রান্তিকতার একটি বড় কারণ, সংখ্যাগত লঘুত্ব। সংখ্যালঘু এসব প্রান্তিক মানুষ সংখ্যাগরিষ্ঠের কাছে নানারকম কল্পশৈলীর আকর। তাদের জীবন নিয়ে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর অবজ্ঞাসূচক অবধারণ যেমন বিদ্যমান, তেমনি কারো-কারো মধ্যে সংস্কৃতির ভিন্নপাঠ-জনিত বিস্ময়ও লক্ষণীয়। সংস্কৃতি অধ্যয়নের তেমন এক পরিকল্পনা থেকে প্রান্তিক নৃগোষ্ঠীর লোককথা পুরাকথার পাঠ। গ্রামীণ কিসসা-কাহিনির আদলে বর্ণিত আখ্যানগুলো ওই বিশেষ শ্রেণির মানুষের জীবনপাঠে সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। মানুষের জীবন-সমাজ ও সংস্কৃত নানরূপ উপাদানগত গ্রহণ বর্জনে স্থিত। নির্দিষ্ট শ্রেণি গোত্র বা গোষ্ঠীর মানুষ কখনো নিজস্বতার একক বয়ানে সুস্থিত নয়। বরং নিকট বা দূর প্রতিবেশীর সাংস্কৃতিক বিনিময়ের মাধ্যমে মানুষের জীবনচর্যা গড়ে ওঠে। এ প্রেক্ষাপটে বাংলা লোককথাপাঠের আয়োজন এবং তাতে প্রান্তিক নৃগোষ্ঠীর জীবনেরবেদ পর্যালোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে। উক্ত পাঠে সমাজকাঠামোর বিভিন্ন নিয়ামক সূত্র ব্যাখ্যাত হয়েছে।

রচনাসূত্র ঃ

১. টেরি ঈগলটন, ২০০৪, টেরি ঈগলটনের সাহিত্যতত্ত্ব (খোন্দাকার আশরাফ হোসেন অনূদিত), ঢাকাঃ নিউ এজ পাবলিকেশনন্স, পৃষ্ঠা ১৭।

২. C. G. Jung 1966(3rd Ed.) An Introduction to jung's Psychology by Frieda Frordham. Middlesex : Penguin Books. page 54.

৩. নন্দলাল শর্মা, ২০০৯, চাকমা লোকসাহিত্য, ঢাকাঃ সূচীপত্র, পৃষ্ঠা ৭৫।

৪. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৭৬।

৫. মুহম্মদ আবদুল জলিল, ১৯৯১, বাংলাদেশের সাঁওতালঃ সমাজ ও সংস্কৃতি, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, পৃষ্ঠা ২-৫।

৬. লুৎফর রহমান ১৯৯৫, গারো নৃ-গোষ্ঠী নাট্য, বাংলা একাডেমী, পৃষ্ঠা ৫-৭।

৭. শুভাশিস সিনহা,২০০৭, মণিপুরী সাহিত্য সংগ্রহ, ঐতিহ্য, ঢাকা , পৃষ্ঠা ১০।

লোককথা বিশ্লেষণে ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক পদ্ধতির প্রয়োগ

বিজনকুমার মণ্ডল

লোককাহিনীর রূপরেখা বিশ্লেষণের জন্য ফিনল্যাণ্ডের গবেষক জুলিয়াস ক্রন [Julius Krohn) এবং তাঁর পুত্র কার্ল ক্রন [Kearl krohn) এই পদ্ধতির আবিষ্কার করেন। লোককাহিনী বিশ্লেষণের সময় কাহিনীর মধ্যে নিহিত ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক উপাদানগুলি বিবেচনা করার পর জানা যায় কি করে একটি কাহিনি ক্রমাগত মৌখিকভাবে পরিবর্তিত হতে থাকে। এক্ষেত্রে লোককাহিনীর 'মৌল রূপ' টি— নির্ণয় করা যায়। পরিবর্তিত কাহিনির মধ্যে নানা পরিবর্তনের স্বাক্ষর কিভাবে কাহিনির মধ্যে অন্তর্নিহিত রয়েছে— তাও নির্ধারণ করা যায়। বহুল প্রচলিত রূপকথার একটি গল্পের আঙ্গিকে বিষয়টি আলোচনা করা যেতে পারে—

এক যে ছিল রাজা। রাজার ছিল সাত রানী। কিন্তু রাজার কোন সন্তান ছিল না। রাজার ভারী দুঃখ। একসময় এক সন্ন্যাসী রাজপ্রাসাদে এল। সন্ন্যাসী রাজাকে প্রসাদ দিয়ে গেল। রাজা রানীদের প্রসাদ সমান ভাবে ভাগ করে খেতে বলল। ছয় রানী সব প্রসাদ খেয়ে নিল। ছোট রানী প্রসাদের উচ্ছিষ্ট কণামাত্র খেল। যথাসময়ে ছয় রানী পুত্র সন্তান লাভ করল। ছোট রানীর এক পশু জন্মাল। ছোট রানীকে প্রাসাদ থেকে বের করে দিল। নানা কষ্টে ছোট রানী দিনযাপন করতে লাগল। ঘটনাচক্রে ছয় রানীর ছেলেদের নানা কুকর্মের খবর রাজার কানে গেল। রাজা বিরক্ত হয়ে ছয় পুত্রের প্রাণদণ্ড দিল! ছোট রানীর পুত্রের কাজে রাজা সন্তুষ্ট হল। সবশেষে দেখা গেল ছোট রানীর সন্তানটি প্রকৃত পশু নয়— এক ছদ্মবেশী রাজপুত্র। রাজপুত্রের আবির্ভাব, দুঃখী মায়ের দুঃখের অবসান ও রাজার সঙ্গে তাদের মিলনে গল্পের পরিসমাপ্তি ঘটল।

—এই গল্পের একাধিক পাঠভেদ রয়েছে। আঞ্চলিকতার নিরিখে এই পাঠভেদ লক্ষ্য করা যায়। এই কাহিনীর একাধিক পাঠভেদ সংগ্রহ করার সময় প্রতিটি ভাষ্যের নাম ও সংগ্রহের তারিখ উল্লেখ করা দরকার। বিভিন্ন পাঠভেদের মধ্যে গল্পের এককগুলির যে সব পরিবর্তন দেখা যায় তা কয়েকটি এককের দৃষ্টান্তে উল্লেখ করা যায়—

১। রানীর সংখ্যা : কোথাও দুই, সুয়োরানী ও দুয়োরানী ; কোথাও সাত। দুজন রানীর ক্ষেত্রে বড় রানী অবহেলিত ও দুঃখী। অন্য ক্ষেত্রে ছোট রানী সবচেয়ে দুঃখী ও অবহেলিত। সন্ন্যাসী প্রদত্ত প্রসাদ : প্রসাদ হিসেবে কখনো ঔষধ বা কোন ফল, কখনো বিশেষ ফল হিসেবে আম আবার কখনো গাছ-গাছড়ার শিকড় হয়ে থাকে। অবহেলিত রানী সবক্ষেত্রে উচ্ছিষ্ট অংশ খেয়ে থাকে। ফলের ক্ষেত্রে খোসা খেয়ে থাকে।

৩। রাজার সন্তান : রানীদের সংখ্যাব উপর নির্ভর করে সন্তানের সংখ্যা কখনো সন্তান সংখ্যা দুই, আবার কখনো সাত। অবহেলিত রানীর গর্ভে রাজার যে সন্তানটি জন্মায় তার রূপ কখনো বানর কিংবা পেঁচা।

৪। ছদ্মবেশী রাজপুত্রের স্বরূপ প্রকাশ : গল্পের নানা ঘটনা প্রবাহের সঙ্কে এটি যুক্ত থাকে। বিভিন্ন পাঠের ক্ষেত্রে ঘটনার পার্থক্য থাকে। মূল কাহিনীর রূপরেখা প্রায় একটি থাকে এবং শেষে ছদ্মবেশী রাজপুত্রের স্বরূপ প্রকাশ পায়।

উল্লিখিত গল্পটির এই কয়েকটি একককে চিহ্নিত করে গল্পটির মূল পাঠ নির্ধারণ করার চেষ্টা করা যায়। প্রথমত : প্রাচীনকালে পুরুষদের বহুবিবাহ রীতি প্রচলিত ছিল। সেক্ষেত্রে এক পুরুষের সাত, দশ কিংবা আরো একাধিক স্ত্রীর সন্ধান পাওয়া যায়। গল্পে যত বেশি রানীর সংখ্যা থাকে— সেই গল্প তত বেশি প্রাচীন বলে গণ্য করা যায়। রাজার দুই রানী গল্পের পাঠটি অনেক পরবর্তী কালের পাঠ বলে মনে করা হয়। গল্পের অধিকাংশ পাঠে অন্যান্য রানীদের কাছে ছোটরানীর লাঞ্ছনা অধিকতর। আসলে বড় রানী বা বয়ঃজ্যেষ্ঠ রানীরা ইতিমধ্যেই সংসারে কর্তৃত্ব স্থাপন করে ফেলেছে, তাই ছোটরানী, যে রাজার সবচেয়ে প্রিয়, তার প্রতি অন্যান্য রানীদের অসূয়া জন্মানো স্বাভাবিক, তাই তারা নানা কৌশল অবলম্বন করে রাজাকে তার প্রতি বিদ্বেষ পরায়ণ করে তোলে। এটি চিরায়ত সামাজিক রীতি। দ্বিতীয়ত সন্ন্যাসীর প্রদত্ত প্রসাদ বা অলৌকিক ওযুধের ক্ষেত্রে শিকড়জাত ওষুধ যে গল্পে উল্লেখ থাকে, সেই পাঠকে অধিকতর প্রাচীন বলে গণ্য করা হয়। ফলমূল, প্রসাদ বা অন্যকিছুর উল্লেখ থাকলে তা অধিকতর পরিমার্জিত বলে গণ্য করা হয়। প্রাচীনকালে ওষধি গুণ সম্পন্ন শিকড় বিভিন্ন রোগের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হত। কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিভিন্ন গাছের ফলও নানা শারীরিক প্রতিবন্ধকতায় ব্যবহার করা হত। সেক্ষেত্রে বন্ধ্যাত্ব দূরীকরণে অলৌকিক গুণসম্পন্ন ফলের ব্যবহার প্রক্ষিপ্ত বলে মনে হয়। তৃতীয়ত রানীর গর্ভে পশুর জন্ম— যা পরবর্তীতে রাজপুত্রে পরিণত হয়েছে। জীববিজ্ঞানের নিরিখে এই ধরনের ঘটনাকে অবাস্তব বলা যায়। রূপকথার একাধিক গল্পে রানীর গর্ভে পশুর জন্ম হিসেবে কুকুর, বিড়াল, বানর প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়। মনে হয় রূপক অর্থে বা সাংকেতিক বিষয়কে বোঝাতে ছদ্মবেশী মানব জন্মের উল্লেখ করা হয়েছে। আলোচ্য গল্পে দুঃখিনী রানীর গর্ভে কুৎসিত দর্শন অনাদরে লালিত পুত্রকে বোঝাতে হয়তো বানর বা পেঁচার উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তীকালে এই অনাদরে পালিত শিশুটি আপন ক্ষমতায় স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাই সবশেষে সেই রাজার প্রিয় পাত্র হয়ে উঠেছে। বিষয়টিকে রূপকার্থে পশু থেকে সুদর্শন রাজপুত্রের জন্ম হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। জীববিজ্ঞান অনুযায়ী বানর প্রজাতির সঙ্গে মানুষের মিল রয়েছে। সেক্ষেত্রে পশু হিসেবে উল্লিখিত বানর সংক্রান্ত গল্পগুলি অধিকতর প্রাচীন বলে গণ্য করা যায়। পেঁচা বা অন্য প্রাণীর ক্ষেত্রে তা পরবর্তীকালের গল্প বলে চিহ্নিত করা যায়।

উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে একাধিক পাঠের একই গল্পের মূল গল্পটি উদ্ভাবন করা যায়। এবং সঙ্গে সঙ্গে আঞ্চলিক পাঠগুলিও চিহ্নিত করা যায। আসলে এই পদ্ধতি

প্রয়োগ করার আগে একটি নির্দিষ্ট গল্পের বিভিন্ন ভাষ্য সংগ্রহ করতে হবে। প্রতিটি ভাষ্যকে চিহ্নিত করার পর শ্রেণীবদ্ধ করতে হবে। কাহিনীগুলি সংগ্রহের স্থান, সংবাদ দাতা প্রভৃতি প্রাসঙ্গিক তথ্যও প্রতিটি কাহিনীর সঙ্গে লিপিবদ্ধ করতে হবে। সবশেষে কাহিনীর সাহিত্যিক ভাষ্যকে কালানুক্রম অনুযায়ী সাজাতে হবে এবং যৌগিক ভাষ্যকে ভৌগোলিক পদ্ধতিতে সাজাতে হবে। এক্ষেত্রে লোককাহিনীটি সংগ্রহের স্থানগত নাম বিশেষ করে প্রতিটি দেশের একটি সংকেত চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। পরবর্তী কাহিনীর ভাষ্যের সঙ্গে গ্রন্থপঞ্জীগত তথ্যের উল্লেখ করে সেই দেশের সংকেত চিহ্ন যুক্ত করা দরকার। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত শীর্ষনাম হয় IN, যদি একই কাহিনীর পাঁচ ভাষ্য পাওয়া যায়, তবে তাকে এভাবে উল্লেখ করা যায়— IN^1, $1N^2$....IN^5. এইভাবে ভৌগোলিকভাবে চিহ্নিত করণের সময় একটি দেশ যে ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে অন্তর্গত সেই ভাষার প্রথম বর্ণ ও পরে দেশের নামের প্রথম বর্ণ তার সঙ্গে যুক্ত করা হয়। এইভাবে সকল দেশের জন্য সংক্ষিপ্ত শীর্ষনাম ব্যবহার করা যায়। লোককাহিনীর বিবিধ ভাষ্যের বিধিবদ্ধকরণের কাজ শেষ করা হয়। তবেই কাহিনীর ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক বিচার ও পর্যালোচনা সহজতর হয়। একটি বিশেষ কাহিনী ও তার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলোর বিশ্লেষণ করাই হল পরবর্তী কাজ।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই লোককথা বিশ্লেষণের জন্য নানান পাঠভেদ সংগ্রহ করা হয় এবং বহুপাঠের পারস্পরিক তুলনামূলক আলোচনার প্রবণতা প্রসার লাভ করে। এই প্রেক্ষাপটে ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক পদ্ধতির উদ্ভব। ফিনল্যাণ্ডে এই পদ্ধতির উদ্ভব হয়েছিল বলে একে 'ফিনিসিও পদ্ধতি' [Finnish Method] বলা হয়।

জুলিয়াস ক্রোণ ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক পদ্ধতিটিকে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন— (১) স্থানিক ও (২) কালিক পর্যায়ে। যে কোন পর্যায়েই বিন্যাস হোক না কেন প্রথমেই প্রয়োজন একই বিষয়ের একাধিক পাঠ সংগ্রহ করা। ক্রোণ যাকে 'Variant' নামে চিহ্নিত করেছেন। পরে প্রতিটি পাঠের সমরূপ বা প্রায় সমরূপ এককগুলির মধ্যে কিরূপ পরিবর্তন হয়েছে তা পাঠগুলির তুলনামূলক আলোচনার ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। যে পাঠের একাধিক একক অন্যান্য পাঠভেদগুলিতে বারবার পুনরাবৃত্ত হতে দেখা যায় তাকে 'মূল পাঠ' [Archetype) হিসেবে ধরা হয়। পাঠভেদ বা Variant সংগ্রহের ক্ষেত্রে এগুলির ভৌগোলিক বণ্টন-এর উপর যেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়, তেমনিই কালগত পর্যায়ে এর বিবর্তনের ধারার উপরও নির্ভর করা হয়। তাই একে ঐতিহাসিক ভৌগোলিক পদ্ধতি বা Historical-geographical Method বলা হয়।

অ্যান্টি আর্নে ঐতিহাসিক- ভৌগোলিক পদ্ধতিতে কাহিনী বিচারের ক্ষেত্রে কাহিনীর উৎপত্তিস্থল নির্ণয়ের প্রসঙ্গে বলেন যে কাহিনীর জন্ম কোন স্থানে হয়েছে, তা সব সময় নিশ্চিত করে বলা সম্ভব হয় না। তবে এই পদ্ধতিতে কাহিনীর একটা সাধারণ অঞ্চল বা দেশকে কাহিনীর জন্মস্থান বলে স্থির করা সম্ভব হয়। এক্ষেত্রে আর্নে কাহিনীর প্রাচীন সাহিত্যিক ভাষ্যের পরীক্ষা করে দেখার নির্দেশ দেন। সাহিত্যিক ভাষ্যে

কাহিনীগুলি যদি একই স্থানকে নির্দেশ করে, তবে তা কাহিনীটির উৎপত্তিস্থল নির্ণয় করতে সাহায্য করতে পারে। অবশ্য তিনি সাবধান করে দিয়ে বলেন যে কাহিনীর সাহিত্যিক ভাষ্যের নকল বিভিন্ন স্থানে হতে পারে। সুতরাং সাহিত্যিক ভাষ্যের উৎপত্তির স্থান ও নকলের স্থান আলাদা হতে বাধ্য। একটি কাহিনী একটি বিশেষ কোন স্থানে উদ্ভূত হওয়ার পর তা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। একটি বিশেষ অঞ্চলে কাহিনীর ভৌগোলিক বিস্তৃতি দেখে বোঝা যায়, কাহিনীটি সেই অঞ্চলে উদ্ভূত হয়েছে কিনা। কহিনীর ভিতরে এমন অনেক বৈশিষ্ট্য থাকে, যা বিশেষ একটি ভৌগোলিক কেন্দ্র ছাড়া অন্যত্র উদ্ভূত হতে পারে না। আর্ণে একটি উদাহরণ স্বরূপ বলেন, একটি কাহিনীতে দেখা যায় যে একটি ভালুকের লেজ বরফে জমে যাচ্ছে, এই ঘটনা গ্রীষ্মপ্রধান দেশগুলিতে হওয়া সম্ভব নয়। এই সূত্র ধরে বলা যায় কাহিনীর আসল উদ্ভূত স্থান কোনো শীতপ্রধান দেশ। একটি কাহিনীর সর্বজনগ্রাহ্য পাঠ বা আদিরূপকে বলা হয় Archetype এবং ওই কাহিনীর পরিবর্তিত পাঠ বা আঞ্চলিক রূপকে বলা হয় Oikotype, যে কাহিনী যতবেশী পরিবর্তিত তার Oikotype-এর সংখ্যা ততই অধিক হয়ে থাকে।

ঐতিহাসিক ভৌগোলিক পদ্ধতিতে লোককাহিনীর বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে নিচের বিষয়গুলো গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

ক) লোককাহিনীর ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক উপাদান সমূহ নির্ধারণ করা।

খ) লোককাহিনী পরিবর্তিত হয়— যে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা।

গ) পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে লোককাহিনী স্থান-কাল-পাত্র অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়। সেই অঞ্চলের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখা।

ঘ) গ্রহণ ও বর্জনের রীতিতে কাহিনী রূপান্তরিত হয়। রূপান্তরিত দিকগুলি চিহ্নিত করা।

ঙ) সব ধরনের পাঠান্তর সংগ্রহ করা।

চ) পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে যে রূপান্তিত হয়েছে — তা তুলনামূলক পদ্ধতিতে আলোচনা করা।

ছ) মৌখিক পাঠ ও সাহিত্যিক পাঠের সমন্বয় সাধন করা।

জ) সিনক্রনিক রীতিতে কালানুযায়ী এবং ডায়াক্রনিক রীতিতে কালানুক্রমিক পাঠ নির্ধারণ করা।

ঝ) ভাষা তত্ত্বের রূপরেখা নির্ধারণ করা

ঞ) এই সব প্রক্রিয়ার মাধ্যমে লোককাহিনীর আদি পাঠ ও উৎসস্থল নির্ণয় করা সম্ভব হয়।

এই পদ্ধতির একটি সীমাবদ্ধতা আছে, তা হল বিশেষ একটি text-এর সব ক'টি পাঠ সংগৃহীত না হলে কোন্‌টি মূল পাঠ তা জোর দিয়ে বলা যায় না। কিন্তু আদৌ বিশেষ একটি text এর কী সব রকমের পাঠ সংগ্রহ সম্ভব?

লোককথা বিশ্লেষণে জাতীয়তাবাদী পদ্ধতির ব্যবহার

অমিতা মণ্ডল

নিজস্ব জাতি, —তার ভাষা ও রীতি-নীতি প্রথা ইত্যাদি বিষয়ে অতি সচেতনতার অনিবার্য ফলশ্রুতি হল জাতীয়তাবাদের ধারণার উন্মেষ। জাতীয় মানসের ঐশ্বর্য এবং মূল সুর আবিষ্কারের তাগিদে লোককথা বা লোকসাহিত্য বিশ্লেষণ সমাদৃত হয়েছে। প্রত্যেকটি মানুষ তার নিজের দেশকে, জাতিকে, সমাজকে— তার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে ভালোবাসে। তার উন্নতির জন্য, বিবর্তনের মাধ্যমে সম্মান রক্ষার তাগিদে, গৌরবান্বিত করার মানসে নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করতে পিছপা হন না। এই স্বাজাত্যবোধ হল যথার্থ দেশপ্রেমিকের মূল সুর। যথার্থ দেশপ্রেমিক মনে করে যে নিজের দেশ জাতির সব কিছু ভালো। 'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি'— এই হল স্বাজাত্যবোধ বা জাতীয়তাবোধ। ইংরেজি শব্দ National [=জাতীয়] + ism [=মতবাদ] = Nationalism বা জাতীয়তাবাদ। পৃথিবীর অনেক দেশে আধুনিক কালে লোকসংস্কৃতিকে এক বিশেষ আদর্শের অনুকূলে ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে। তাই একে Ideological Theory হিসেবেও চিহ্নিত করা হয়ে থাকে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জাতীয়তাবোধ জাগরণের ক্ষেত্রে লোকসংস্কৃতির ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । অবশ্য এই জাতীয়তাবোধ বিকাশের উৎস হিসেবে প্রাথমিক পর্যায়ে ইউরোপ-এশিয়া -উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় লোকসংস্কৃতি বিষয়ক চর্চা ও অনুসন্ধানের উৎসাহ বিস্তারলাভ করে। সপ্তদশ অষ্টাদশ শতকে রোমান্টিসিজমের চর্চা ব্যাপকতা লাভ করেছিল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ঐতিহ্য-প্রিয়তার সঙ্গে জাতীয়তাবোধের বিকাশ লোকসংস্কৃতি চর্চার মধ্য দিয়েই সাধিত হয়। উনবিংশ ও বিংশ শতকে ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে যে জাতীয়তাবোধের আন্দোলন সংঘটিত হয় তারই প্রেক্ষাপটে লোকসংস্কৃতি চর্চা ও অনুশীলনে ব্যাপকতা প্রাধান্য লাভ করে। তাই ভারতবর্ষে এবং বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতি চর্চার বিকাশ হয়েছে মূলত জাতীয়তাবাদী মতবাদকে আবর্তিত করে— এমন কথা বলা অযৌক্তিক নয়।

জাতীয়তাবাদমূলক মতবাদের মূল কথা, যে কোনও দেশের লোকসংস্কৃতির ঐতিহ্য হল প্রাণবন্ত, শক্তিসম্পন্ন ও গতিশীল। অন্য দেশের সঙ্গে ঐতিহ্যের পার্থক্য নির্ণয় করে তৌলন পদ্ধতিতে, মূল্যায়ন সাপেক্ষে স্বদেশের গৌরব প্রতিষ্ঠা করাও এই মতবাদের অন্যতম লক্ষ্য। দেশের প্রাচীন-রীতি বা ঐতিহ্যের মধ্য দিয়ে একটি নির্দিষ্ট সত্যে

উপনীত হওয়া যায়, সে সত্য হল স্বদেশ-মহিমা। লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয় যেমন লোককাহিনী, লোকগীতি, ছড়া, প্রবাদ, ধাঁধা প্রভৃতির উৎস ও ব্যাপ্তির গতিরূপকে চিহ্নিত করা। এই চিহ্নিতকরণের মধ্য দিয়ে একটি নির্দিষ্ট জাতি ও দেশের অতীত গৌরবকে বিশ্বের কাছে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াসী হন জাতীয়তাবাদী গবেষকরা। অবশ্য জাতীয়তাবোধ সম্প্রসারণের জন্য অনেকক্ষেত্রে লোকসংস্কৃতি চর্চায় সংকীর্ণতাবোধ-বুদ্ধি এসে বাসা বাঁধে। তবুও লোকসংস্কৃতির উপাদান সংগ্রহের ক্ষেত্রে এই মতবাদের তাৎপর্য, লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানীর কাছে অপরিসীম।

জার্মানীতে জাতীয়তাবাদী সরকারের প্রচেষ্টায় এই মতবাদের সূচনা ঘটে। হিটলারের জাতীয়তাবাদী মতবাদকে জাতীয় ঐক্যের তাগিদে লোকসংস্কৃতিবিদ্‌গণ সেই সময় সমর্থন করেছিলেন। জার্মান কবি জোহান গটফ্রিড হার্ডার প্রাচীন জার্মান লোকসংস্কৃতির অনুশীলনের মধ্য দিয়ে জার্মান জাতির জাতীয়তা ও জাতীয় গৌরববোধ জাগিয়ে গিয়েছেন। হেনস্ ল্যাণ্ডমান ও হেনরী রিসলের বক্তব্যের মধ্যে এই একই সুর শোনা যায়। পরবর্তীতে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে প্রতিটি জাতি তার নিজের নিজের দেশের লোকসংস্কৃতির সন্ধান করে নানা ক্ষেত্রে গৌরব অনুভব করেছে। কোন জাতির নিজস্ব জাতীয় অস্তিত্ব, জাতির প্রাণময় ও গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যের আবিষ্কারের তাগিদেই পুরাতত্ত্ব বিষয়ে গবেষণায় অনুসারীরূপে লোকসংস্কৃতি চর্চায় ব্যাপক জোয়ার এসেছে। এইভাবেই জাতীয়তাবোধের ব্যাপ্তির মধ্যেই আঞ্চলিক উপাদানের আলোচনা প্রাধান্য লাভ করেছে— যা লোকসংস্কৃতি গবেষণার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে।

লোকসংস্কৃতিকে আশ্রয় করে পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই জাতীয়-ঐতিহ্যকেন্দ্রিক উপকরণের সংগ্রহ ও আলোচনা হয়েছে। যেমন, ইউরোপের ছোট দুটি দেশ ফিনল্যাণ্ড ও আয়ার্ল্যাণ্ড লোকসংস্কৃতির সুবিপুল উপকরণ সংগ্রহের মাধ্যমে তাদের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে। অবশ্য পরবর্তীকালে তদানীন্তন সোভিয়েত রাশিয়া লোকসংস্কৃতিকে সমাজতন্ত্র প্রচারের শক্তিশালী উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করেছে। চীনও তাদের হাজার হাজার বছরের প্রাচীন ঐতিহ্যজাত লোকসংস্কৃতির উপকরণকে বিপ্লব পরিচালনার কাজে ব্যবহার করে তার জাতীয়তাবোধকে সুস্থিত করেছে। সোভিয়েতের মতো চীনও একইভাবে লোকসংস্কৃতিকে 'সংগ্রামের হাতিয়ার' হিসেবে বিবেচনা করেছে। সংগ্রামক্ষেত্র কেবল রক্ষণশীল ও সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মধ্যে নয়। চাষী মজুর ও মেহনতী মানুষেরা যে দেশীয় সংস্কৃতির মাধ্যমে আবহমানকাল থেকে শাসক-শোষক ও পুঁজিবাদী সমাজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে আসছে, তারও উপযুক্ত যুদ্ধক্ষেত্র এই লোকসংস্কৃতি।

লোকসংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে জাতীয়তাবাদমূলক চিন্তা ধারার উদ্বোধনের ঘটনা প্রায় প্রতিটি দেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সোভিয়েত রাশিয়ায় লোকসংস্কৃতি চর্চার বিভিন্ন

ধারায় সামাজিক বৈষম্য ও অর্থনৈতিক শোষণের চিরায়ত রূপ বার বার নানাভাবে উল্লিখিত হয়েছে। আমেরিকার লৌকিক বীর চরিত্র সম্পর্কিত কিংবদন্তী সে দেশের জাতীয়তাবোধের আদর্শে গঠিত। এদের লোকবীরগণ টাইটান, হারকিউলেস, শ্যামসান প্রমুখের ন্যায় শক্তি সম্পন্ন। জাতীয় শক্তি ও ঐতিহ্যের গর্ব প্রমাণের উদ্দেশ্যে লোকবীরদের জন্ম হয়েছিল কিংবদন্তী, গীতিকা, লোকসঙ্গীতের মাধ্যমে। ঐতিহ্যগত বোধগুলিকে বর্তমান জাতীয় জীবনে জাগিয়ে তোলার লক্ষ্যে এই ধরনের অনুশীলন অব্যাহত রয়েছে। গ্রিম ভ্রাতৃদ্বয়, রিচার্ড এম. ডরসন, আরচার টেইলর, এ্যালান ডাণ্ডিজ প্রমুখ লোকসংস্কৃতিবিদ্ এই মনোভাবের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, দীনেশচন্দ্র সেন, গুরুসদয় দত্ত প্রমুখ ব্যক্তি এই একই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ছড়া, লোকসঙ্গীত, লোকশিল্প প্রভৃতির উপাদান সংগ্রহের প্রেরণা অনুভব করেছিলেন। দক্ষিণারঞ্জনের 'ঠাকুরমার ঝুলি' বাঙলার জাতীয় সম্পদ। এই রূপকথা বাঙালির মাতৃস্নেহের দ্বারা মণ্ডিত হওয়ায় এদের জনপ্রিয়তা আজও অম্লান। নরওয়ে, ফিন্‌ল্যাণ্ড, আয়ারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের লোকসংস্কৃতি চর্চার ইতিহাস এই আত্মগরিমা ও দেশ-গৌরব অনুভবেরই ইতিহাস। এক সময় ফ্যাসিবাদী জার্মানীতে হিটলার ফোকলোরকে ফ্যাসিবাদী প্রচারের অনুকূলে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। হিটলার সমগ্র জার্মান জাতিকেই বিশ্বকৃষ্টির ধারকবাহক হিসেবে প্রমাণ করতে সচেষ্ট ছিলেন। তিনি বিস্মৃত হয়েছিলেন যে জাতীয় ইচ্ছানুভূতিকে রূপদান লোকসংস্কৃতির ধর্ম, কিন্তু ধনতান্ত্রিক বিশ্বে কেবলমাত্র রাজনীতির ছত্রছায়ায় আত্মপ্রচারের বিকৃত হাতিয়ার হিসাবে বর্জনীয়। লোকসংস্কৃতি আন্তর্জাতিক, দেশে দেশে প্রাণের সঙ্গে প্রাণের শিকড়ে তার অচ্ছেদ্য বন্ধন।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মতো ভারতেও লোকসংস্কৃতির একাধিক উপাদান সংগৃহীত হয়েছে। এইসব সংগৃহীত উপাদানগুলি পর্যালোচনার ক্ষেত্রে জাতীয় ঐতিহ্য ও চেতনা প্রাধান্য লাভ করেছে। জাতীয় ঐতিহ্য অনুসন্ধানের ও ঐতিহ্যের উৎস সন্ধানের ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদমূলক চিন্তা ও চেতনার কেন্দ্রেই আবর্তিত।

ভারতবর্ষে বিদেশী প্রশাসক ও মিশনারীদের প্রচেষ্টায় লোকসংস্কৃতি চর্চার সুসংহত রূপ পরিলক্ষিত হয়। উনবিংশ ও বিংশ শতকের প্রথমার্ধে ভারতীয় লোকসংস্কৃতি চর্চায় পালা বদল ঘটল। বিদেশী ইংরেজ শাসকের শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে চারিদিকে যে আন্দোলন নানাভাবে সংঘটিত হয়েছিল তাই-ই ক্রমশ জাতীয়দাবাদী আন্দোলনে রূপান্তরিত হল। ইংরেজ বিরোধী অন্দোলনের প্রেক্ষাপটে সারা ভারতবর্ষে নিজস্ব ভাষা, ঐতিহ্যময় সংস্কৃতি সম্বন্ধে সচেতনতা জাগ্রত হয়। ক্রমশ তা জাতীয়তাবাদী সংগ্রামী চেতনার অনুষঙ্গরূপে লোকসংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রেও পরিব্যাপ্ত হয়। আসলে ভারতে বিদেশী শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে বৃহত্তর আন্দোলনের অন্যতম প্রধান দিক হল নিজেদের প্রাচীন ঐতিহ্যের অনুশীলন ও দেশজ শিল্পকলা, দেশজ সম্পদের

পুনরুজ্জীবন ও সেগুলিকে ব্যবহার করার প্রচেষ্টা। এইভাবেই ভারতে শুরু হয় জাতীয়তাবাদী ধারা— যাকে জাতীয়তাবাদী মতবাদের প্রতিভূ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। এই মতবাদের ফলিতরূপ হিসাবে কিছু উদাহরণ এখানে সংগ্রহ করা যেতে পারে। যেমন— সাহেব পটের মধ্যে ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন, বিভিন্ন ছড়ার মধ্যে শাসক শ্রেণীর শোষণের নানা খণ্ডচিত্র প্রভৃতি। লোককাহিনীর মধ্যে দেশের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের যে বর্ণনা রয়েছে— তার মধ্যে দেশীয়দের গুণবাচক আদর্শের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কখনওবা গল্পকার কাহিনীতে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্য থেকে আদর্শ চরিত্র সংগ্রহ করে আদর্শ চরিত্র নির্মাণ করে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটিয়েছেন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে। স্বদেশচেতনা সঞ্জাত প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের লোকসংস্কৃতি চর্চা,— যা স্বাধীনতা উত্তরকালে জাতীয়তাবাদী মতবাদের অন্তর্গত হয়েছে।

বাংলায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ-এর প্রতিষ্ঠা এবং এই প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে দেশীয় উপাদান সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও তার গুরুত্ব সম্পর্কে স্বদেশবাসীর মধ্যে সচেতনতা গড়ে তোলাই এই মতবাদের অন্যতম প্রায়োগিক দিক। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছড়া সংগ্রহ ও চর্চা, দীনেশচন্দ্র সেনের গীতিকা সংগ্রহ ও আলোচনা, গুরুসদয় দত্তের লোকশিল্প, লোকসঙ্গীত ও লোকনৃত্যের সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রসার ঘটানোর প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে জাতীয়তাবাদী মতবাদের অনুসৃতি ঘটেছিল। অপরদিকে, 'পটের গানে' লবণ আন্দোলন, কবিগানে স্বদেশী দ্রব্য গ্রহণ, মন্দির ফলকে দেশীয় ঐতিহ্যের দিকগুলি তুলে ধরা কিংবা বিদেশী শাসকের অত্যাচারের বর্ণনা, লোকসঙ্গীতে, ছড়ায়, প্রবাদে শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচারের খণ্ড খণ্ড চিত্র তুলে ধরার মধ্য দিয়ে দেশবাসীকে স্বাজাত্যবোধে জাগিয়ে তোলার প্রচেষ্টা লোকসংস্কৃতির অন্যতম দিক। রূপকথা, লোকগীতি, গীতিকা, লোকভাষা প্রভৃতি লোকসংস্কৃতির উপাদানের সঙ্গে জাতির যে মহত্ত্ব, বীর্য, মহিমা, আত্মত্যাগ, মনুষ্যত্ব, বীরগাথা ধরা আছে, সেই বোধগুলিকে বর্তমানে জাতীয় জীবনে জাগিয়ে তোলা, এই ধরনের অনুশীলনের পিছনে কাজ করেছে, দেশের লোকসংস্কৃতি চর্চার ইতিহাস এই আত্মগরিমা ও দেশগৌরব অনুভবেরই ইতিহাস। আসলে জাতীয় জীবনে ঐতিহ্যবোধ না জাগলে দেশে সত্যিকারের জাগরণ— এমনকি স্বাজাত্যবোধ জাগে না। পলাশির প্রান্তরে ভারতের ভাগ্য বিপর্যয়ের পর ধীরে ধীরে ইংরেজি সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পায় কিন্তু তা ছিল জাতীয় ঐতিহ্যের কেন্দ্র বিন্দু থেকে বিচ্যুতি। পরবর্তীতে অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীতে সেই পটভূমিকার পরিবর্তন ঘটল। বাঙালির আত্মসম্মান বোধের জাগরণের নিরিখে স্বাজাত্যবোধের প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ ঘটল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের এবং তার মুখপত্রের প্রথম সংখ্যাতেই প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের 'ছেলেভুলানো ছড়া' (১৩০১ বঙ্গাব্দ)।

নবজাগরণজাত সংস্কৃতি দেশের বৃহত্তর অংশের সাধারণ মানুষের সংস্কৃতির মধ্যেই নিহিত রয়েছে। কালক্রমে জাতিগত চিন্তা চেতনা এবং জাতির উৎসমুখে সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহ— এই দুটি ধারাই মিশে যায় জাতীয়তাবাদী ধারার মধ্যে। জাতীয়তাবাদী পদ্ধতির জন্ম স্বদেশ চেতনায়। শুধুমাত্র লোককথায় নয়, সমগ্র লোকসাহিত্যের আলোচনায় এবং বিশ্লেষণে এই জাতীয়তাবাদী পদ্ধতির গুরুত্ব অপরিসীম।

জাতীয়তাবাদী পদ্ধতির সাহায্যে লোকবিজ্ঞানী প্রধানত তিনটি দিক উন্মোচনে দিক নির্দেশ করেন।

প্রথমত : লোকসাহিত্য চিরায়ত সংস্কৃতির অনুশীলন জাতীয়তাবাদী পদ্ধতির লক্ষ্য। লোকসাহিত্যের আয়নায় জাতির চিৎপ্রকর্ষের যে সর্বাঙ্গীণ প্রতিফলন ঘটে, সেই জীবন ও মানসচর্চার উপকরণগুলি সুনিয়ন্ত্রিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সংগ্রহ করে এই পদ্ধতি।

দ্বিতীয়ত— জাতীয়তাবাদী পদ্ধতি জাতিবিশেষকে কেবল লোকঐতিহ্য সম্পর্কে শ্রদ্ধান্বিতই করে না, দেশাত্মবোধ জাগরণের মাধ্যমে সমগ্র জাতিকেই আত্মোপলব্ধির সোপানে উত্তীর্ণ করে।

তৃতীয়ত— জাতীয়তাবাদী পদ্ধতির মাধ্যমে জাতীয় ঐতিহ্যের এই পুনর্মূল্যায়ন জাগরণের মূল উৎসরূপে কাজ করে এবং সমগ্র বিশ্বের সামনে অপর দেশের ঐতিহ্যময় ঐশ্বর্যের সঙ্গে পার্থক্য দেখিয়ে স্বদেশের গৌরব প্রতিষ্ঠা করে।

পরাধীন— দুর্বল-হতাশাগ্রস্ত— সবদিক থেকে পিছিয়ে পড়া কোন জাতির জীবনে কখনো কখনো কিছু মানুষ আসেন যাঁরা নিজেদের ম্রিয়মান ঐতিহ্যকে, সাংস্কৃতিক উপাদানগুলিকে বিস্মৃতির অন্ধকার থেকে তুলে এনে, জাতীয় জীবনে নব-জাগরণের উন্মেষ ঘটান। তাঁদের অক্লান্ত চেষ্টায় ও মনীষার শক্তিতে স্বাজাত্যবোধের জন্ম হয়। শিল্পে-সাহিত্যে সংস্কৃতিতে নবকল্লোলের কোলাহল ওঠে। সেই সঙ্গে খুঁজে বার করা হতে থাকে তার মৃত্তিকালগ্ন সংস্কৃতিকে— দেখা যায় যে সেই জাতির হৃদয়মৃত্তিকার গহ্বরে কত না সম্পদ লুকিয়ে ছিল। তাই নবজাগরিত জাতি অচিরেই তার লোকসংস্কৃতিকে সর্বাধিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে। জাতীয়তাবোধ লোকসংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ ধাত্রী।

'জাতীয়তাবাদ' শব্দটির মধ্যে রয়েছে আত্মজাগরণ, দেশের প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ও আনুগত্য ও নিজস্ব সংস্কৃতি বিশেষ করে ঐতিহ্যের গুণগান প্রবণতাই মূল লক্ষ্য। ফিনল্যাণ্ডের গবেষকগণ এ বিষয়ে প্রথম আলোকপাত শুরু করেন। ঐতিহ্যানুযায়ী লোকসমাজের সঙ্গে গবেষক ও তথ্য সংগ্রাহকদের সম্পর্ক, সমাজ জীবনের নিজস্বতা, দেশীয় সংস্কৃতিচর্চা, সংরক্ষণ ও স্বরূপ বিশ্লেষণ প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা উৎসারিত হয়েছে জাতীয়তাবাদের সূত্র ধরেই।

লোককাহিনীর মধ্যে 'রূপকথা'র গল্পগুলি অনবদ্য। 'রূপকথা' নামের মধ্যেই নিহিত রয়েছে রহস্যঘন মাধুর্য। 'রূপকথা' শব্দটির মধ্যে নিহিত বাসনাগুলি হৃদয়

থেকে উৎসারিত হয়। দ্বিতীয়ত, জাতীয়ত্বের গোপনমন্ত্র ও মূলরহস্য অতীতের মধ্যে নিহিত রয়েছে, লোককাহিনীতে এই অতীতের সন্ধান পাওয়া যায়। তৃতীয়ত, সমাজের বহুবিবাহ প্রথা, সপত্নী পুত্রের প্রতি বিমাতার অত্যাচার, রূপসী প্রণয়িনীর মোহ এবং পরিশেষে মোহভঙ্গ, কাহিনীতে ভাষার অনবদ্য প্রয়োগ রসোত্তীর্ণ করেছে। সর্বোপরি শিশুর মতো জগতের দিকগুলি কাহিনীকে সহজ করেছে।

লোককাহিনী বিশ্লেষণে দেশীয় সংস্কৃতির নানাদিক উন্মোচিত হয় যা জাতীয় চেতনা বিকাশে সহায়তা করে। তাই বাংলার লোকসংস্কৃতির গবেষকগণ জাতীয়তাবাদী উদার মানসিকতায় ঐতিহ্যগত রীতিতে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। সুস্থ জাতীয়তাবাদী পদ্ধতিও এই আদর্শেই পরিচালিত।

গল্পের কিছু কিছু বক্তব্য তুলে জাতীয়তাবাদী পদ্ধতির রূপরেখা চিহ্নিত করা যেতে পারে—'মধুমালা' গল্পে মদনকুমার তার কথায় 'স্বপ্নে দেখেছি মধুমালা দেশে রে'—মদনকুমারের এই স্বপ্ন প্রতিটি আত্মসচেতন মানুষ সংরক্ষণ করতে চায়। দেশীয় ভাবশক্তি এই অন্বেষণই জাতীয়তাবাদী পদ্ধতির প্রাণবিন্দু। সামাজিক জীবনযাত্রায় নানা ঘাত-প্রতিঘাত রয়েছে। মানব প্রবৃত্তির এই জটিল আবর্ত সর্বদা সততার বিপরীতে চোরা স্রোতের টানে আবর্তিত। এর ফলে ঘটে অস্তিত্বের সংকট। 'নীলকমল ও লালকমল' গল্পে দলে দলে লোক পালাচ্ছে রাজ্য ছেড়ে কারণ রাক্ষসের ভয়। এই অস্তিত্বের সংকটের মধ্যে ছিন্নমূল মানুষের রয়েছে অর্থকষ্ট। ধনী রাজা মুহূর্তে দরিদ্রে পরিণত হয়েছে। ন্যায্য প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত নানা বিপর্যয়ের দিক। লোককথার 'প্রাণ ভ্রমরা' হল বাংলার জনগণ। এইভাবেই জাতীয় আবেগের সার্থক উপলব্ধিতেই রয়েছে জাতীয়তাবাদী পদ্ধতির শেকড়। বাংলা লোককথাগুলিও এই পদ্ধতির আলোকে দেশীয় সম্পদরূপে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা পেয়ে থাকে।

লোককথা বিশ্লেষণে টাইপ-মোটিফ ইনডেক্সের ভূমিকা

কোয়েল চক্রবর্তী

লোককথা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে টাইপ ও মোটিফ-ইনডেক্স খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি পদ্ধতি। লোককথার আলোচনায় এই দুটি ইনডেক্স একটি আরেকটির পরিপূরক হয়ে উঠেছে। উনিশ শতক থেকে বিশেষ করে ফিনল্যাণ্ডে দেশপ্রেমিক ছাত্র গবেষকদের অক্লান্ত পরিশ্রমে ফিনল্যাণ্ডেরই অজস্র লৌকিক উপাদান সংগৃহীত হয়। অসংখ্য লোককথার এক মূল্যবান ভাণ্ডার গড়ে ওঠে। বিপুল লোককথার এই ভাণ্ডারের শ্রেণি বিন্যাস করার প্রয়োজন অনুভব করলেন ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক পদ্ধতির জনক জুলিয়ান ক্রোনের সুযোগ্য পুত্র কার্লে ক্রোন। তিনি ছিলেন হেলসিংকি বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক লোকসংস্কৃতির অধ্যাপক। লোককথার শ্রেণিবিন্যাসে কোনো বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণের জন্য তিনি অ্যান্টি আর্নেকে ভার দিলেন। শুধু তাই নয় তিনি তাকে পরিচালনাও করতে লাগলেন। হেলসিংকির অসকার হ্যাকসান; বার্লিনের জোহানেস বোল্ট প্রমুখের সহায়তায় টাইপ ইনডেক্স-এর তালিকা প্রস্তুত হল। যৌথ উদ্যোগে অ্যান্টি আর্নে এই কাজ করলেও তিনিই হলেন এই পদ্ধতির আবিষ্কর্তা। এরপর ১৯১০ সালে তিনি প্রকাশ করলেন *ভারজেইকস্টনিসভার মারচেনটাইপেন* (এফ এফ), এতে ইউরোপীয় ঐতিহ্যের সমস্ত উল্লেখযোগ্য লোককথার শ্রেণিবিন্যাস করলেন এবং প্রতিটি লোককথার একটি টাইপ নির্ধারণ করলেন। সেক্ষেত্রে ফিনল্যাণ্ডের সমস্ত লোকথার টাইপ এফ এফ সি ৫ ও ৩৩ সংখ্যায় থাকল। আর্নে কিন্তু নিজে বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর তালিকা কখনোই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। তাঁর মৃত্যুর পর ১৯২৬ সালে কার্লে আর্নের এই কাজটিকে সম্পূর্ণতা দেবার জন্য থমসনকে দায়িত্ব দিলেন। ১৯২৮ সালে প্রকাশিত হল *দ্য টাইপস অব দ্য ফোকটেল*। আর্নে ও থমসনের যুগ্ম নামে গ্রন্থটি অমর হয়ে রইল।

১৯১৩ সালে অ্যান্টি আর্নে যখন টাইপ-ইনডেক্স তালিকাটি প্রকাশ করলেন তখনই তিনি মোটিফের বিষয়টিও উল্লেখ করেছিলেন। কেননা মোটিফের গুরুত্বও তিনি অনুভব করেছিলেন। আর্নের টাইপ-ইনডেক্সের সম্প্রসারণ ঘটাবার সময় থেকেই স্টিথ থমসন মোটিফ-ইনডেক্সের কাজ শুরু করেন। ১৯৩২ সাল থেকে ১৯৩৬ সাল অবধি থমসন প্রকাশ করতে থাকেন মোটিফ ইনডেক্সের তালিকা। পরবর্তী সময়ে বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে থাকা এইসব তালিকাকে একত্র করে ছয়টি খণ্ডে প্রকাশিত হয় বিশ্ববিখ্যাত মোটিফ-ইনডেক্স গ্রন্থ।

পাঠকের মনে সহজেই প্রশ্ন জাগবে টাইপ কাকে বলে আর মোটিফই বা কাকে বলে? আর্নে টাইপের সংজ্ঞায় বলেছেন - A type is a traditional tale that has an independent existence. It may be told as a complete narrative and does not depend for its meaning on any other tale, but the fact that it may appear alone attests its independence. It may consist of only one motif or of many. Most animal tales and jokes and. Anecdotes are types of one motif. The ordinarry Marchen are types consisting of many of them. প্রত্যেকটি লোককথারই এক একটি টাইপ বা বৈশিষ্ট্য আছে। একটি নির্দিষ্ট টাইপ বেছে নিলে সহজেই জানা যাবে সেই টাইপের লোককথাগুলি পৃথিবীর আর কোথায় কোথায় প্রচলিত আছে। টাইপের ওপর নির্ভর করে লোককথাগুলির উৎসস্থানগুলি আবিষ্কার করাও সম্ভব হবে। লোককথাগুলি কিভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে, তাও নির্ণয় করা সম্ভব হবে। টাইপের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয় লোককথার নিজস্ব মেজাজটি। জাতির চিন্তাভাবনা-আচার-পরিবেশ সর্বোপরি সামাজিক বিন্যাসকে নিয়ন্ত্রণ করে টাইপ। মোটিফের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে থমসন বলেছেন— 'A motif is the smallest element in a tale having a power to persist in tradition. In order to have this power it must have something unusual and striking about it. মোটিফ শব্দটি ফরাসি। প্রত্যেকটি লোককথার এক বা একাধিক মূল বিষয় আছে। এই মূল বিষয়কে বলে মোটিফ। অন্যভাবে বলা যায় যে কোনো একটি লোককথাকে ভেঙে তার কাহিনি ব্যবচ্ছেদ করলে তার এক বা একাধিক কাহিনি অংশ পাওয়া যাবে। সেই অংশগুলিকে থমসন মোটিফ বলেছেন। প্রতিটি লোককথারই কিছু আঞ্চলিক বা স্থানীয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে, কিন্তু সেই সব আঞ্চলিকতাকে ছাড়িয়ে লোককথাগুলির মধ্যে সার্বজনীন অভিপ্রায় থাকে, মোটিফ ইনডেক্স বিশ্লেষণ করলে সেই সার্বজনীন অভিপ্রায়টিকেই উপলব্ধি করা যাবে।

অ্যান্টি আর্নে ও স্টিথ থমসন লোককথার টাইপ-ইনডেক্স যেভাবে সাজিয়েছেন তা এই রকম—

১. পশুকথা

১-৯৯	বন্যপশু
১০০-১৪৯	বন্যপশু ও গৃহপালিত পশু
১৫০-১৯৯	মানুষ ও বন্য পশু
২০০-২১৯	গৃহপালিত পশু
২২০-২৭৯	পাখি
২৫০-২৭৪	মাছ
২৭৫-২৯৯	অন্যান্য জন্তু ও বস্তু

২. সাধারণ লোককথা।

(ক)

৩০০-৭৪৯	ঐন্দ্রজালিক কাহিনি
৩০০-৩৯৯	অলৌকিক বাধা
৪০০-৪৫৯	অলৌকিক বা মোহময় স্বামী বা স্ত্রী বা আত্মীয়
৪৬০-৪৯৯	অস্বাভাবিক বা অলৌকিক কার্য অসাধ্য সাধন
৫০০-৫৫৯	অলৌকিক সাহায্যকারী ও সাহায্যকারিণী
৫৬০-৬৪৯	যাদু বা ঐন্দ্রজালিক বস্তু
৬৫০-৬৯৯	অলৌকিক শক্তি বা জ্ঞান
৭০০-৭৪৯	অন্যান্য অলৌকিক কাহিনি

(খ)

৭৫০-৮৪৯	ধর্মীয় বা নীতিমূলক কাহিনি

(গ)

৮৫০-৯৯৯	রোমাঞ্চকর বা রোমান্টিক কাহিনি

(ঘ)

১০০০-১১৯৯	বোকা রাক্ষসের কাহিনি।

৩. হাসি ও পারিবারিক কাহিনি

১২০০-১৩৪৯	বোকার গল্প
১৩৫০-১৪৩৯	স্বামী-স্ত্রী
১৪৪০-১৫২৪	একজন নারীর (বালিকার) কাহিনি
১৫২৫-১৮৭৪	একজন পুরুষের (বালকের) কাহিনি
১৮৭৫-১৯৯৯	মিথ্যাবাদীর কাহিনি
২০০০-২৩৯৯	সূত্রমূলক কাহিনি
২৪০০-২৪৯৯	অশ্রেণীভুক্ত কাহিনি

আগেই বলা হয়েছে থমসন পরবর্তীকালে এই তালিকার সম্প্রসারণ ঘটান।

স্টিথ টমসন তাঁর *মোটিফ-ইনডেক্স অব ফোক লিটারেচার* গ্রন্থে মোটিফগুলি এইভাবে সাজিয়েছেন।

এ লোকপুরাণ

এ০ এ ৯৯	সৃষ্টিকর্তা
এ ১০০ এ ৪৯৯	দেবতা
এ ৫০০ এ ৫৯৯	উপদেবতা ও লৌকিক বীর

এ ৬০০ এ ৮৯৯	বিশ্বসৃষ্টিতত্ত্ব ও বিশ্বতত্ত্ব
এ ৯০০ এ ৯৯৯	বিশ্বের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যসমূহ
এ ১০০০ এ ১০৯৯	প্রাকৃতিক দুর্বিপাক
এ ১১০০ এ ১১৯৯	প্রাকৃতিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা
এ ১২০০ এ ১৬৯৯	মানুষের সৃষ্টি ও স্থিতি
এ ১৭০০ এ ২১৯৯	জীবজন্তুর সৃষ্টি
এ ২২০০ এ ২৫৯৯	জীবজন্তুর বৈশিষ্ট্য
এ ২৬০০ এ ২৬৯৯	গাছগাছালির সৃষ্টি
এ ২৭০০ এ ২৭৯৯	গাছগাছালির বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি

বি. জীবজন্তু

বি ০ বি ৯৯	লোক পৌরাণিক জীবজন্তু
বি ১০০ বি ১৯৯	ঐন্দ্রজালিক জীবজন্তু
বি ২০০ বি ২৯৯	মানবিক গুণসম্পন্ন জীবজন্তু
বি ৩০০ বি ৫৯৯	বন্ধুভাবাপন্ন বা উপকারী জীবজন্তু
বি ৬০০ বি ৬৯৯	মানুষের সঙ্গে জীবজন্তুর বিয়ে
বি ৭০০ বি ৭৯৯	জীবজন্তুর অত্যাশ্চর্য গুণ

সি. ট্যাবু বা বিধিনিষেধ

সি০ সি ৯৯৯	
ডি০	ঐন্দ্রজালিকতা বা যাদু
ডি০ ডি ৬৯৯	রূপান্তরকরণ বা আকৃতির পরিবর্তন
ডি ৭০০ ডি ৭৯৯	যাদুশক্তি থেকে মুক্ত হওয়া
ডি ৮০০ ডি ১৬৯৯	ঐন্দ্রজালিক বস্তু সমূহ
ডি ১৭০০ ডি ২১৯৯	যাদুশক্তি ও তার প্রকাশ

ই. মৃত

ই০ ই ১৯৯	
ই ২০০ ই ৫৯৯	ভূতপ্রেত ও অন্যান্য অশরীরী আত্মা
ই ৬০০ ই ৬৯৯	অবতারত্ব বা পুনরায় শরীরগ্রহণ
ই ৭০০ ই ৭৯৯	আত্মা

এফ. অসাধ্য সাধন

এফ০ এফ ১৯৯	অন্য বিশ্বে যাত্রা
এফ ২০০ এফ ১৯৯	বিচিত্র প্রাণী
এফ ৭০০ এফ ৮৯৯	অস্বাভাবিক স্থান ও বস্তু
এফ ৯০০ এফ ১০৯৯	অস্বাভাবিক ঘটনাসমূহ

জি. রাক্ষস-খোক্কস দৈত্য দানব ডাইনী

জি০ জি ৩৯৯	নানাবিধ দৈত্য ও ডাইনী
জি৪০০ জি ৫৯৯	পরাভূত দৈত্য দানব

এইচ. পরীক্ষা

এইচ ০ এইচ ১৯৯	সনাক্তকরণ পরীক্ষা চিনতে পারা
এইচ ২০০ এইচ ৪৯৯	বিবাহ-পরীক্ষা
এইচ ৫০০ এইচ ৮৯৯	চাতুর্যের পরীক্ষা
এইচ ৯০০ এইচ ১১৯৯	পৌরুষের পরীক্ষা : কার্যভার
এইচ ১২০০ এইচ ১৩৯৯	সাহসের পরীক্ষা : অনুশীলন
এইচ ১৪০০ এইচ ১৫৯৯	অন্যান্য পরীক্ষা

জে. চালাক ও বোকা

জে০ জে ১৯৯	জ্ঞানার্জন ও রক্ষা
জে ২০০ জে ১০৯৯	চালাক ও বোকা স্বভাব
জে ১১০০ জে ১৬৯৯	চালাকি
জে ১৭০০ জে ২৭৯৯	বোকা

কে. প্রতারণা

কে ০ কে ৯৯	প্রতারণা দ্বারা প্রতিযোগিতায় জেতা
কে ১০০ কে ২৯৯	প্রতারণা দ্বারা লাভ
কে ৩০০ কে ৪৯৯	চুরি ও প্রতারণা
কে ৫০০ কে ৬৯৯	প্রতারিত করে মুক্তি পাওয়া
কে ৭০০ কে ৭৯৯	প্রতারিত করে বন্দী করা
কে ৮০০ কে ৯৯৯	সাংঘাতিক প্রতারণা
কে ১০০০ কে ১১৯৯	নিজের ক্ষতি করেও প্রতারণা
কে ১২০০ কে ১২৯৯	অপমানিত হয়েও প্রতারণা করা

কে ১৩০০ কে ১৩৯৯	প্রতারিতের সম্পত্তি বিনষ্ট
কে ১৫০০ কে ১৫৯৯	ব্যভিচারের সঙ্গে যুক্ত প্রতারণা
কে ১৬০০ কে ১৬৯৯	প্রতারক নিজেই নিজের ফাঁদে পড়ে
কে ১৭০০ কে ১৭৯৯	মিথ্যার দ্বারা প্রতারিত করা

মোটিফ ইনডেক্সটি এখানেই সমাপ্ত নয় ভাগ্যচক্র, নিয়তিকে বশে আনা, অদৃষ্ট ও কপাল এইরকম আরও বহু বিষয় এর অর্ন্তভুক্ত হয়েছে।

এখন বিশেষ কয়েকটি লোককথাকে টাইপ ও মোটিফ ইনডেক্সের আলোয় ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

১

এক প্রধান ছিলেন। প্রজারা তাকে ভালবাসত। তারা প্রধানকে সুস্থ করে তোলার চেষ্টায় বিফল হল। কোমরে কবচ, মন্ত্রপূত পাউডার, ঐন্দ্রজালিক সঙ্গীত পরিবেশন করেও কোনো লাভ হল না। এক আগন্তুক প্রজাদের জানাল ইন্দ্রজালিক সাপ রোগ নিরাময় করতে পারে। সে থাকে পর্বতের এক গুহায়। প্রধানের ছেলে সাপটির কাছে গেল। তাকে সাহায্য করার অনুরোধ জানাল। তালগাছের মতো সাপটি রাজি হল। প্রধানের ছেলের কোমর পেঁচিয়ে গ্রামে যেতে চাইল। ছেলেটির পক্ষে সাপটিকে বর্জন করা অসম্ভব হয়ে পড়ল। সে পারল না। সাপটি রেগে গিয়ে ছেলেটিকে ভীতু বলে ছেলেটির দেহের সমস্ত পরিচ্ছদ ও অলংকার টেনে নিল। বিফল ছেলেটি গ্রামে ফিরে সব জানাল। এরপর সাপটিকে আনতে গেল এক বিখ্যাত শিকারী। সে সাপের কাছে গিয়ে অনুরোধ জানাল কিন্তু বিশাল সাপটিকে দেখে সে ভয় পেল। সাপটি যাবার জন্য শিকারীর কোমর পেঁচিয়ে ধরার আগেই সে আর্তস্বরে চিৎকার করে উঠল। সাপটি রেগে গিয়ে তাকে ভীতু বলে তার সমস্ত পোষাক ও গহনা নিয়ে নিল। তখন তৃতীয় এক যোদ্ধা গেল। সেও ভীতু। যোদ্ধা সাপটিকে দেখে পালিয়ে গেল। সাপটি তার কাছ থেকেও গহনা, জামাকাপড় নিয়ে নিল। এরপর গেল প্রধানের সুন্দরী কন্যা। সে কিন্তু সাপটিকে দেখে ভয় পেল না। সাপটি মেয়েটির দেহ পেঁচিয়ে ধরল। সাপটি বলল সে যেতে প্রস্তুত। মেয়েটি সাপটিকে নিজের বাড়িতে নিয়ে এল। সাপটি তার যাদুক্রিয়ায় সুস্থ করে তুলল প্রধানকে। মেয়েটি সাপটিকে আবার গুহায় পৌঁছে দিল। সে কৃতজ্ঞতা জানাল সাপটিকে। সাপটিও প্রধানের মেয়েকে সাহসিকতার জন্য পুরস্কৃত করল। অন্যান্যদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া মূল্যবান গহনা, পোষাক সবকিছুই মেয়েটিকে দিয়েদিল।

ক (-) টাইপ : ৫৫১ পিতার জন্য বিস্ময়কর নিরাময় খুঁজতে সন্তানদের যাত্রা

খ (-) মোটিফ

১. বি ১৭৬.১ যাদু সাপ

২. বি. ৪৯১.১ উপকারী সাপ
৩. বি. ৫৭১ মানুষের জন্য পশুকাজ করে
৪. এল. ১০ বিজয়ী কন্যা

২

রাজার একমাত্র পুত্র দেশভ্রমণে গিয়েছে। রাজপুত্র কাউকেই সঙ্গে নেয়নি। বহু নগর, বন উপবন পার হয়ে এক গভীর বনে উপস্থিত হল। নিস্তব্ধ সেই বনে পাখ পাখীর কলরব নেই। বনের মধ্যে সে দেখল বিরাট এক রাজপ্রাসাদ, যার চূড়া আকাশে ঠেকেছে। রাজপুত্র দেখল রাজপুরী যেন ঘুমে অচেতন। ফটকে কোন প্রহরী নেই। রাজপুরীর ভেতরে হাতী, ঘোড়া, সিপাই, লস্কর, সব আছে কিন্তু তারা সবই পাথরের মূর্তি হয়ে উঠেছে। নড়ে না চড়ে না। রাজপুত্র রাজকন্যার ঘরে প্রবেশ করল সেই ঘর রয়েছে এক ফুলের বনের মধ্যে। ফুলের বনে, সোনার খাটে হীরার নালে সোনার পদ্ম। সোনার পদ্মে ঘুমিয়ে আছে পরমাসুন্দরী রাজকন্যা। তার হাত পা কিছুই দেখা যায় না। বহু বছর ধরে রাজপুত্র মুগ্ধ হয়ে সেই সুন্দরীর মুখ দেখল। হঠাৎ একদিন রাজপুত্র দেখল রাজকন্যার শিয়রের একদিকে এক সোনার কাঠি আর এক দিকে এক রূপোর কাঠি রয়েছে। পুত্র কাঠিদুটি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে রাজকন্যার মাথায় ফেললে সোনার খাট নড়ে উঠল, রাজকন্যা ঘুম থেকে জেগে উঠল। তার হাত পা দেখা গেল। সমগ্র রাজপুরীর ঘুম ভেঙে গেল। লোকজনের সাড়া পড়ে গেল। সবাই দেখল রাজপুরীতে এক রাজপুত্র। দৈত্যের রূপোর কাঠির স্পর্শে রাজপুরী ঘুমে অচেতন ছিল। রাজা খুশী হয়ে রাজকন্যার সঙ্গে রাজপুত্রের বিবাহ দিল। রাজপুত্র রাজকন্যাকে নিয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করল তার মা-বাবার কাছে।

ক (-) টাইপ : ৪১০ ঘুমন্ত রূপযতী
খ (-) মোটিফ
১. ডি ১৩৯৬৪.১৮ কাঠির স্পর্শে যাদু ঘুম কাটে
২. ডি ১৯৬০ যাদুঘুম
৩. ডি ১৯৬০ .৩ ঘুমন্ত রূপবতী
৪. এফ. ৮১৪.৪.১ সোনার পদ্মফুল
৫. জি ১০০ দৈত্য

৩

এক রাজার দুই রানী। তার বিপুল ঐশ্বর্য সত্ত্বেও মনে সুখ ছিল না। দুই রানীরই কোন ছেলে নেই। যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকর্ম করেও কোন ফল হয়নি। এক দিন সকালে এক সন্ন্যাসী এসে রাজাকে ওষুধ দিল। সে জানাল ওই ওষুধ পাকা হরীতকীর সঙ্গে খেলে

ছোট রানীর পুত্র জন্মাবে। রাজা পর দিন সকাল বেলা হরীতকী আনতে নিবিড় বনে গেল। কিন্তু হরীতকী গাছ খুঁজে পেল না। ক্লান্ত হয়ে এক গাছের নীচে বিশ্রাম করতে লাগল। এক রাক্ষসী অসামান্য সুন্দরী যুবতীর বেশে রাজার সামনে এসে বলল সে তার নিজের পরিচয় নিজেই জানে না। বনে কেন আছে তাও জানে না। বোধহয় তার বাবা-মা তাকে বনবাস দিয়েছে। রাজা তাকে বলল যদি সে হরীতকী গাছ খুঁজে দেয় তবে তাকে বিয়ে করে রানী করবে। যুবতী রূপী রাক্ষসী বলল আগে তাকে বিয়ে করতে হবে। রাজা গান্ধর্ব মতে তাকে বিবাহ করলে রাক্ষসী মায়া প্রভাবে হরীতকী গাছ তৈরি করে তাকে ফল দেয়। ছোটরানী ওষুধের সঙ্গে হরিতকী খেয়ে সন্তানসম্ভবা হয়। রাক্ষসী তখন কুমতলব ভাঁজতে থাকে। সে রাজাকে জানায় যে, তাকে যদি রাজা ভালবাসে তবে দু'জন রানীকেই নির্বাসন দিতে হবে। রাজা তাই করে। রানীরা পাহাড়ের গহ্বরে আশ্রয় নেয়। ছোট রানীর সুন্দর এক ছেলে হয়। ক্রমে সে বড় হল। সে সব কথা শুনে প্রতিশোধ নিতে কৃতসংকল্প হয়। সে রাজবাড়িতে চাকরির আবেদন করলে তা মঞ্জুরও হয়। ইতিমধ্যে রাক্ষসী সবাইকে খেয়ে ফেলেছে। কেবল রাজা ও মন্ত্রী বেঁচে আছে। রাক্ষসী রাজ পুত্রকেও জব্দ করতে চাইল। একদিন অসুখের ভান করে তাকে পাঠাল বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচি আনতে। সঙ্গে দিল একটি চিঠি। সে চিঠিতে রাক্ষসী তার মাসিকে বলেছিল রাজপুত্রকে মেরে ফেলতে। রাজপুত্র বুদ্ধি করে সেই চিঠি ছিঁড়ে ফেলে তার মাসির কাছে গিয়ে জানাল মায়ের অসুখের জন্য প্রয়োজন বারো হাত-কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচির। রাক্ষসীর মাসি তা এনেও দিল। রাজপুত্র জানতে পারল রাক্ষসীর মাসির ঘরের পাখিটির মধ্যেই আছে রাক্ষসীর পরমায়ু। পাখিটি নিয়ে পালিয়ে এল রাজপুত্র। এরপর রাজার সামনে রাজপুত্র সমস্ত বৃত্তান্ত জানাল এবং পাখির সমস্ত অঙ্গ একটি একটি করে ছিন্ন করতে লাগল। রাক্ষসীও মরে গেল, রাজ্যেও শান্তি ফিরল।

ক (-) টাইপ ৩০০ রাক্ষসী- হত্যাকারী

খ (-) মোটিফ

১. ডি ৪২.২ রাক্ষসী মানবী মূর্তি ধারণ করে

২. জি ১৬২.০.২ রাক্ষসী চারপাশের সবাইকে খেয়ে ফেলে

৩. এইচ ১০৪৭ বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচি আনতে বলা

৪. এইচ ১২১২ অসুখের ভান করে কাউকে দূরে পাঠানো

৫. কে ১৫৩৮.২ প্রতারণাময় অসুস্থতা

৬. এল ১১৯.৯ দুয়োরানীর নির্বাসিত সন্তান নায়ক

এখানে টাইপ ও মোটিফ ইনডেক্স পদ্ধতির মাধ্যমে তিনটি লোককথাকে বিশ্লেষণ করা হল। আসলে লোককথাগুলির বিশেষ স্থান-কালের পরিচয়, তার সমাজ ইতিহাস,

তার পরিবর্তনের গতিপ্রকৃতির সন্ধানের জন্য টাইপ-ইনডেক্স অত্যন্ত সহায়ক। যেমন পিতার জন্য বিস্ময়কর নিরাময় খুঁজতে সন্তানদের যাত্রা কিংবা ঘুমন্ত রূপবতী রাজকন্যা অথবা রাক্ষসী হত্যাকারী এই টাইপ ধরে খুঁজলে সারা পৃথিবীতে এই রকম অজস্র লোককথার সন্ধান মিলবে। যেমন 'পিতার জন্য বিস্ময়কর নিরাময় খুঁজতে সন্তানদের যাত্রা'— এই টাইপটির মধ্যে একটি অন্তর্নিহিত তাৎপর্য আছে। মা-বাবা সন্তানকে পৃথিবীর আলো দেখায়। সন্তানদের সমস্ত দায়দায়িত্ব পালন করে। তাই সন্তানদেরও উচিত মা-বাবার সেবা করা। মা-বাবার মঙ্গলের জন্য সমস্ত প্রতিকূলতার মোকাবিলা করা। প্রয়োজন হলে বিস্ময়কর নিরাময়ের সন্ধান করতে গিয়েও সন্তান যেন পিছপা না হয়। টাইপের মধ্য দিয়ে যে অন্তর্নিহিত তাৎপর্য প্রকাশিত হয় তাকে আরো বেশি স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলে মোটিফ। টাইপ ও মোটিফ পরস্পরের পরিপূরক। এই দুইয়ের সম্মিলিত রূপটির মধ্য দিয়ে পৃথিবীর সমস্ত লোককথার সামগ্রিক দর্শনটিকে উপলব্ধি করা সম্ভব হবে। যেমন সন্তান পিতার জন্য বিস্ময়কর নিরাময়ের সন্ধান করতে গিয়ে ভয়ঙ্কর এক সাপের সম্মুখীন হয়। কিন্তু সে আবার উপকারী। যাদুসাপ একটি জনপ্রিয় মোটিফ। কিন্তু মোটিফটিকে বিশ্লেষণ করলে পাঠকের মনে হবে আমাদের চলার পথ মোটেই কুসুমাস্তীর্ণ নয়। তা কণ্টকাকীর্ণ। যেকোন কাজ করতে গেলেই নানা সমস্যা, নানা বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। নানা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয় আমাদের। কিন্তু সেই বিপদ, সেই পরীক্ষাকে ভয় পেয়ে পিছিয়ে এলে চলবে না। পরীক্ষার মোকাবিলা কিংবা বিপদের সম্মুখীন হবার মধ্যেই লুকিয়ে আছে সাফল্যের চাবিকাঠি। লোককথা লোকসাহিত্যের এমনই এক সম্ভার যেখানে বৈচিত্রের ছড়াছড়ি। নানা সূক্ষাতিসূক্ষ্ম দার্শনিক ভাবনা লোককথাগুলিকে করে তুলেছে সমৃদ্ধ। মোটিফগুলি অনুপুঙ্খভাবে সেই বৈচিত্র্য, সেই সূক্ষ্ম দার্শনিকতাকে উপলব্ধি করতে সহায়তা করে। যেমন প্রথম লোককথাটিতে নারীর জয় দেখানো হয়েছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীকে দুর্বল ভাবা হয়, কিন্তু এই লোককথাটিতে নারীর সাহসিকতাই প্রকাশিত হয়েছে। তার দুঃসাহসিকতার জন্য তাকে পুরস্কৃত করেছে যাদু সাপ। লোককথার বিভিন্ন মোটিফের মধ্য দিয়ে আপাত দুর্বল অবলা চরিত্রের জয় হয়েছে। তাদের দুঃসাহসিক প্রচেষ্টার কাছে শক্তিশালী পুরুষও পরাজিত হয়েছে। এইভাবেই 'কৃপণের সম্পদচুরি যাওয়া,' 'আঙুর ফল টক', 'লোভীচাষীর বৌ', 'ফের শাস্তি' মোটিফগুলি হয়ে উঠেছে আন্তর্জাতিক সার্বজনীন। কেননা টাইপ মোটিফ মিলিতভাবে লোকসমাজের মনের গহনের হদিস দিয়ে চলেছে। লোকসমাজের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ধর্মীয় অভিপ্রায়ের সন্ধান পাওয়া যায় এই সমন্বিত পদ্ধতির বিশ্লেষণে। নিরক্ষর, স্বল্প শিক্ষিত লোকসমাজ যে তাগিদেই লোককথাগুলি সৃষ্টি করে থাকুক না কেন, তাদের কোনো ভাবনাই সমাজ-নিরপেক্ষ বা সমাজ বিরুদ্ধ নয়—এই সার সত্যটি প্রকাশ করে টাইপ ও মোটিফ ইনডেক্স। টুনটুনি, ধূর্ত শিয়াল এই সব

মোটিফগুলি মানুষের সঙ্গে পশুর স্বাভাবিক সহাবস্থান ও মিথস্ক্রিয়ার প্রয়োজনীয়তাকে যেমন প্রকাশ করে, তেমনই প্রকাশ করে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বিষয়টিকেও। শুধু তাই নয় লোককথার অজস্র টাইপ ও মোটিফের মধ্যে লুকিয়ে আছে সামাজিক বৈষম্য, অর্থনৈতিক সম্পর্কের প্রসঙ্গ। সমাজ বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হয়ে উঠতে পারে টাইপ ও মোটিফ ইনডেক্স্ পদ্ধতি।

টাইপ ও মোটিফ ইনডেক্স্ পদ্ধতিরও কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। টাইপ ও মোটিফ ইনডেক্সের সম্পূর্ণ তালিকা প্রকাশ করা অসম্ভব। তা যেন মহাকাশে তারা গোনার মতোই। পৃথিবীতে অজস্র দেশ রয়েছে। শুধু তাই নয় দুর্গম এলাকার বহু অখ্যাত, অপরিচিত জনগোষ্ঠী রয়েছে যাদের লোকসাহিত্যের কোনো সংগ্রহই এখনও প্রকাশিত হয়নি। পৃথিবীর প্রতিটি জনগোষ্ঠীর লোককথা যতদিন না সংগৃহীত হবে ততদিন টাইপ ও মোটিফ ইনডেক্স তালিকাও সম্পূর্ণ হবে না। তাই নতুন নতুন টাইপ ও মোটিফ আবিষ্কার করতে হবে। তাই টাইপ ও মোটিফ ইনডেক্স পদ্ধতিটিকে অসম্পূর্ণই বলতে হবে।

দ্বিতীয়ত, লোককথাগুলি হল মৌখিক ঐতিহ্য নির্ভর। লোককথাগুলি যেহেতু মৌখিক ভাবে গড়ে ওঠে তাই লোককথার এক একটি ভাগের সঙ্গে এক একটি ভাগ যুক্ত হয়ে পড়ে চেতনে, অবচেতনে। যেমন রূপকথার বহু টাইপ, মোটিফ পশুকথায় পাওয়া যাবে আবার পশুকথার বহু মোটিফ রূপকথায় মিলবে। আবার বিশেষ কোন লোককথা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে পাঠক নতুন কোনো মোটিফের সন্ধানও পেতে পারেন। তাতে একটা সংশয় তৈরি হয়ে যায়। যেমন মধ্যযুগীয় বাংলাসাহিত্যে বিশেষ করে মঙ্গলকাব্যে, অনুবাদ সাহিত্যে পশুকথা, গীতিকা, রূপকথার বহু মোটিফ মিলেমিশে গেছে। সেক্ষেত্রে মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যকে টাইপ মোটিফ ইনডেক্স পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করতে গেলে কিছুটা সমস্যার সম্মুখীন হতে হবেই। কিন্তু এইসব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এই পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা থাকবেই। লোককথার বৈচিত্র্য, মনুষ্যত্ব সর্বোপরি দর্শনকে সহজে প্রকাশ করে টাইপ ও মোটিফ ইনডেক্স পদ্ধতি। লোককথার রসোপলব্ধি ও অন্তর্নিহিত ভাবের পরিচয় পেতে হলে এই পদ্ধতিকে অবলম্বন করতেই হবে। সবশেষে বলা প্রয়োজন অ্যান্টি আর্নে ও স্টিথ থমসনের এই টাইপ ও মোটিফ ইনডেক্স পদ্ধতিটিকে বাংলাভাষায় সহজবোধ্য করে প্রকাশ করেন প্রখ্যাত লোকসংস্কৃতিবিদ ড. দিব্যজ্যোতি মজুমদার। তাঁর রচিত *বাংলা লোককথার টাইপ ও মোটিফ ইনডেক্স্* লোকসাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি গ্রন্থ। তাঁর পথ অনুসরণ করে যদি আরও নতুন লোককথার টাইপ ও মোটিফ ইনডেক্স বাংলায় প্রকাশিত হয় তবে বাংলা লোক সাহিত্যের আলোচনা ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এক নতুন মাত্রা যুক্ত হতে পারে।

লোককথা : চিরজীবিতের জয়

শতঞ্জীব রাহা

সাধারণভাবে লোককথাকে মানুষের গাল্পিক ঐতিহ্য বলে মনে করার মধ্যে ভ্রান্তিবীজ সংগুপ্ত হয়ে নেই। কিন্তু লোককথা যে নিছক গল্প নয় তা লোককথার *উপভোক্তা* মাত্রেই বুঝতে পারেন। *উপভোক্তা*-শব্দটিকে আমরা সচেতনভাবে প্রয়োগ করতে চাই। আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে—লোককথার ক্ষেত্রে শব্দটিকে আমরা একটি বিশেষ 'টার্ম' হিসেবে ব্যবহার করতে পারি। কেননা, লোককথার উপভোক্তারা ছড়িয়ে আছেন দেশ - কাল - জাতি - ভূগোল - ভাষাবৈভিন্ন - বয়স - শিক্ষা - সামাজিক অবস্থান- গণনীয় সংখ্যা ইত্যাদি যাবতীয় সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে ব্যাপ্ত-বিস্তীর্ণ পটে। লোককথার উপভোক্তারা একদিকে মানুষের বোধ্য-মনীষার সমান বয়স অর্জন করেছেন, আবার অন্যদিকে তাঁরা রয়ে গিয়েছেন চির কিশোর, চির-কৌতূহলী, অসম সাহস আর গোপন ভীরুতায় আচ্ছন্ন, সরলতা আর কুটিলতা, ভালো আর মন্দের মধ্যে চির-দোলায়মান ঔচিত্যের বিচারক।

মজুমদার, অপরাপর আলোচক ও পণ্ডিতদের অনুসরণে লোককথার বিষয়বস্তুকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে দেখিয়েছেন : পৌরাণিক কাহিনী বা মিথ (ইং), যথা বিশ্বসৃষ্টি বা দেবদেবীর উৎপত্তি, মনুষ্যজাতির উৎপত্তি ইত্যাদি কাহিনী; জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা কাহিনী ও কিংবদন্তী; রূপকথা; বীরকাহিনী; ভূত-প্রেত-পরী, উপ-দেবতার কাহিনী; পশু পাখিদেব সম্বন্ধে প্রচলিত গল্প; লোকসংগীত; লোক সাধারণের মধ্যে প্রচলিত নানা বিশ্বাস, সংস্কার ইত্যাদি; প্রবাদ; বচন-প্রবচন ইত্যাদি। (*মজুমদার : ১৯৮৬*) মজুমদার তাঁর সংক্ষিপ্ত আলোচনায় দেখিয়েছেন যে, লোককথার এ-যাবৎকালের আলোচনায় মত ও পথের কী বিপুল এবং পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ামূলক প্রকল্পনা তৈরি হয়েছে।

তাত্ত্বিক দিকটিকে সম্পূর্ণ পরিহার করে লোককথার আলোচনা প্রায় অসম্ভব, সন্দেহ নেই। ভাষা কিংবা ভাষার গঠনশিল্প, নৃতত্ত্ব, ইতিহাস, মনস্তাত্ত্বিক কিংবা শরীরী-মনস্তত্ত্বের দিক দিয়েও লোককথাকে পর্যবেক্ষণের চেষ্টা কম হয় নি।

লোককথায় একটি জাতির প্রাচীন জীবনের অনেক কথা বিজড়িত থাকে। তার সংস্কার, তার স্বপ্নৈষণা, তার ফেলে আসা গঠনোন্মুখ জীবনের সংগ্রামের স্মৃতি, তার অতীতচারণার—সবকিছুর পরিচয়। এইসব কারণে লোককাহিনীকে একটি জাতির সম্পদ বলে বিবেচনা করা 'হয় বলেই এক ধরনের আলোচনায় স্বভাবতই প্রাধান্য

পেয়েছে একটি জাতির ঐতিহ্যের অধ্যয়ন, তার জাতীয় গর্ববোধ। এরই সূত্রে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে হিটলারের জার্মানীতে দেখা যায় জাতীয়তাবাদী মতবাদ। জার্মান আর্যামির সপক্ষে ও হিটলার বন্দনায় সে-সময় লোককথাকেও কাজে লাগানো হয়। জাতীয় ঐতিহ্যের উগ্র ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রচারের সেই ধূলিসঙ্কুল অধ্যায়টিকে বাদ দিলেও একথা স্বীকার্য যে, লোককথার কাহিনীবলয়ে সমাজমানবের অন্তর্লীন জীবনকথা প্রায়শই জাতি-গোষ্ঠীগত সম্মিলিত যাপনের গৌরববহ হয়ে ওঠায় ধর্মীয় কথা ও পুরাণকাহিনী লোককথার আলোচনায় তার প্রাপ্য বিস্তার অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

যাঁরা লোককথাকে নেহাৎই কল্পকথা বলে মনে না করে এইসব কাহিনীর মধ্যে 'হার্ড ফ্যাক্ট'-এর সন্ধান করেছেন (যেমন : মারিয়া টাটার : ১৯৮৭) তাঁরা 'ফ্যাক্ট ও ফ্যাণ্টাসি'র মধ্যে পারস্পরিক ফারাক ও নৈকট্যের উপাদান খুঁজে পেয়েছেন। ফ্যাণ্টাসিকে তাঁরা 'মোর দ্যান ফ্যাক্ট' বলে মনে করেছেন। রূপকথার মতোই বাস্তবজীবনে *সিণ্ডেরেলার* মতো সর্বগুণান্বিতারা সৎ মা ও সৎ বোনদের দ্বারা অত্যাচারিত হয়, সেরা সুন্দরী বউ সাত সতীনের পাল্লায় পড়ে হয় জেরবার (*চিলের মেয়ে : অসমীয়া লোককথা*), নিদারুণ দজ্জাল শাশুড়ি আর অবিবেচক ও মায়ের আঁচল-ধরা স্বামীর হাতে নিত্যি লাঞ্ছিত হয় পুত্রবধূ (*চালাক পুত্রবধূ : কন্নড় লোককথা*), মায়ের এবং ভায়েদের কাছ থেকে অনাদর জোটে কন্যা সন্তানের (*দি হ্যাণ্ড উইথ দি নাইফ*), সবচেয়ে সুন্দরী অথচ অনাথিনী বোপোলুচিরা অযোগ্য (চোর/ডাকাত) স্বামীর দ্বারা প্রতারিত হয় (*বোপোলুচি : পাঞ্জাবী লোককথা*), কিংবা স্বার্থধর্মপ্রহারিত সংসারে-সমাজে-কর্মক্ষেত্রে সুয়োরানী আর দুয়োরানীর গল্পটা চলতেই থাকে। লোককথায় প্যাসিভ ভিক্‌টিমের সংখ্যাও অগণন। এসব কাহিনীর কথক যেমন সকল গল্প স্রষ্টার মতোই জাগতিক অভিজ্ঞতার অভিঘাত থেকে আত্মরক্ষার ও উত্তরণের জন্য স্বয়ংক্রিয়-সমান্তরাল এক মানসজগতে ইচ্ছাপূরণের জয়বিন্দুটিকে ছুঁতে চান, তেমনই এর শ্রোতা ও পাঠকও কাহিনী-কাঠামো ও তার মর্মবস্তুর পুনরাবর্তন সত্ত্বেও গল্পগুলিকে উপভোগই শুধু করেন না, এগুলি তার যাপিত অভিজ্ঞতা বা সমাজ-সংসারের বোধের সঙ্গে মিলে যেতে থাকে। এই মিলে যাওয়াটা প্রায়শ ঘটলেও বাস্তবের সামনে দাঁড়িয়ে ঘটনা থেকে ঘটনায়, সময়ের ও জীবনের প্রহার অথবা ঔজ্জ্বল্য বিচারের সময় লোককথার হার্ড ফ্যাক্টটি মানদণ্ড হিসেবে কাজ করে। বস্তুত, লোককথার মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা যাঁরা হাজির করেন (অর্থাৎ যে-সমস্ত তাত্ত্বিক লোককথাকে মানবমনের বিশেষ অবস্থার জন্মলব্ধ কিংবা স্বপ্নাবেশে মরীচিকাদর্শন বলে মনে করেন) তাঁরা বিষয়টিকে বিপরীত দিক থেকে দেখলেই লোককথার রহস্য ও মায়ার জগৎটির সন্ধান পেতেন বলে মনে হয়। কেননা, মানবমনে স্বতঃই কিছু জন্ম নেয় না, বিপরীতে মানব মনটিই তৈরি হয় তার জীবনধারা থেকে। এ-বিষয়ে কার্ল মার্কসের সুপরিচিত ও বহু ব্যবহৃত ভাষ্যটিকে মনে রাখাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট হবে :

ইট ইজ নট দি কনশাস্‌নেস অব মেন দ্যাট ডিটারমাইনস্‌ দেয়ার বিইং, বাট, অন দি কণ্ট্রারি, দেয়ার সোসাল বিইং ডিটারমাইনস্‌, দেয়ার কনশাস্‌নেস। (মার্কস : ১৮৫৯)

মার্কস তাঁর রচনায় যেমন ধ্রুপদী সাহিত্যের ব্যবহার করেছেন, তেমনি লোককথা ও পুরাণের অনুষঙ্গও তাঁর রচনার অন্যতম উপজীব্য হয়ে উঠেছে। গ্রীক পুরাণ আর বাইবেলের চরিত্রসমূহের উল্লেখে তো মার্কস রীতিমতো অক্লান্ত! *একিলিস* (গ্রীক পুরাণকথায় ট্রয় অবরোধকারী অন্যতম বীর) এবং তাঁর মা সমুদ্রের দেবী *থেটিস্*, এইয়া দ্বীপের মনোমুগ্ধকারিণী *সার্সি*, গ্রীক অতিকথার প্রতিহিংসার দেবী মেগারা, বীরকীর্তির প্রসিদ্ধ নায়ক *হারকিউলিস*, ত্রিমুণ্ডা ও ত্রিদেহী জ্যোৎস্নার এবং পাতালরাজ্যের পিশাচ-অপচ্ছায়ার অধিষ্ঠাত্রী দেবী *হেকাটা*, প্রাচীন গ্রীক উপকথা অনুসারে সিরাকুজের স্বৈরাচারী শাসক *ডায়োনিসিয়াস* ও তাঁর একদা অনুচর *ডামোক্লিস*, গ্রীক দেবরাজ *জিউস* ও *ডানির* পুত্র কীর্তিমান বীর *পার্সিয়ুস*, দানবী *মেড্যুসা*; বাইবেলের *আদম* এবং তাঁর দুই পুত্র—*এবেল* ও *কেইন*, বিনয় ও নিরীহতার জন্য বহুদুঃখভোগী *জোব*, পবিত্র শিঙার ধ্বনি ও নিজের যোদ্ধাদের উদ্বুদ্ধ করে জেরিকো শহরের দেওয়াল চূর্ণকারী *যিসুস নাভিন*, বাইবেল কথার প্রাচীন ইহুদি পয়গম্বর *স্যামুয়েল*, পয়গম্বর *হ্যাবেকুক*, বাইবেলের কথা অনুসারে *যীশুর* অন্যতম অ্যাপস্‌ল্‌ (ধর্মপ্রচারার্থে প্রেরিত ব্যক্তি, বিশেষত যীশুর দ্বাদশ প্রধান শিষ্যের মধ্যে একজন) *পল* প্রমুখ; প্রাচীন ফিনিসিয়ান উপকথার সূর্যদেব *মোলখ*, প্রাচীন রোমানদের মত ও ফূর্তির দেবতা *ব্যাকেস্*, ইংরেজদের লোককথার পরোপকারী চরিত্র *রবিন গুডফেলো*—ইত্যাদি চরিত্রের উল্লেখই শুধু নয় মার্কসের রচনায় এইসব চরিত্রের ব্যবহার ও উদাহৃতি লক্ষ্য করলে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি যে, নিজস্ব রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-রাষ্ট্রনৈতিক বীক্ষা হাজির করতে গিয়ে তিনি কেন পুরাণ লোককথা উপকথার সহায়তা গ্রহণ করেছেন।

মার্কসের এই জাতীয় ব্যবহারের দু-একটি প্রসঙ্গ-কথা আমরা পরীক্ষা করে দেখতে পারি। যেমন : 'লুই বোনাপার্টের আঠারোই ব্রুমেয়ার' (১৮৫২) রচনায় গ্রীক পুরাণ-কথার চরিত্র *ডামোক্লিসের* নামের ব্যবহার। খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতকের স্বৈরাচারী শাসক *ডায়ানিসিয়াসের* একদা অনুচর *ডামোক্লিস ডায়োনিসিয়াসের* কাছে ভোজনের নিমন্ত্রণে এসে ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়লে মানব-সম্বলের অস্থায়িত্ব বোঝাবার জন্য *ডায়ানিসিয়াস ডামোক্লিসকে* নিজের সিংহাসনে বসিয়ে তাঁর মাথার উপর ঘোড়ায় চুলে বাঁধা একটি তরবারি ঝুলিয়ে দেন। মার্কস এই কাহিনীকে ফ্রান্সের তৃতীয় লুই নেপোলিয়নের (১৮০৮-১৮৭৩) রাজত্বকালে বুর্জোয়া ভণ্ডামির প্রসঙ্গে ব্যবহার করেছেন :

...বুর্জোয়া শ্রেণী স্বীকার করছে যে, নিজেদের স্বার্থের খাতিরেই তাদের **নিজেদের শাসনের** বিপদ থেকে অব্যাহতি চাই; দেশে শান্তি ফিরিয়ে আনতে হলে সর্বপ্রথমেই দেশের বুর্জোয়া পার্লামেন্টকে চিরশান্তি দিতে হবে; সেটার সামাজিক ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যে সেটার রাজনৈতিক ক্ষমতা ভেঙে দেওয়া চাই; বুর্জোয়ারা ব্যক্তি হিসেবে

অন্যান্য শ্রেণীকে শোষণ করে চলতে এবং নিরুপদ্রবে সম্পত্তি, পরিবার, ধর্ম, শৃঙ্খলা উপভোগ করতে পারে একমাত্র এই শর্তে যে, অন্যান্য শ্রেণীর সঙ্গে তাদের শ্রেণীকেও সমানই নাস্তিত্বে পর্যবসিত হতে হবে; বুর্জোয়াদের তহবিলটা বাঁচাতে হলে রাজমুকুটের অধিকার খোয়াতে হবে, আর যে তরবারি তাদের নিরাপদে রাখবে সেটাকে সঙ্গে সঙ্গে ডমোক্লিসের খড়্গের মতো নিজেদেরই মাথার উপর ঝুলিয়ে রাখতে হবে। (মার্কস : ১৮৬৯)।

বলাই বাহুল্য, মার্কসের কলমে এই ঔপকথ্য উদাহরণটি এসেছে *ডামোক্লিসের তলোয়ার*—নিরন্তর, নিকট এবং ভয়ঙ্কর বিপদের প্রতিশব্দ হিসেবে।

মার্কসের অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস মার্কসেরই লেখা 'ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ' গ্রন্থের (১৮৭১) দ্বিতীয় সংস্করণের (১৮৯১) ভূমিকা লিখতে গিয়ে ভিন্ন প্রসঙ্গে *ডামোক্লিসের* এই ব্যবহারকে সমর্থন করেছেন এবং মার্কসের ভবিষ্যৎ-দৃষ্টির প্রশংসা করেছেন এই বলে :

পুরো বিশ বছর ধরে বিসমার্ক কি জারের কৃপাদৃষ্টিলাভের জন্য বৃথাই তাঁর তোষণ করেন নি...? তাছাড়া, অবিরাম কি আমাদের মাথার উপর ঝুলে থাকছে না যুদ্ধরূপ ডামোক্লিসের খড়্গ...?

প্রাচীন ফিনিসিয়ান উপকথার সূর্যদেব *মোলখের* অনুষঙ্গকে মার্কস একইভাবে ব্যবহার করেন। *মোলখের* পূজায় নরবলি দেওয়ার প্রথা চালু ছিল, ক্রমেই *মলোখ* নামটা 'সর্বগ্রাসী রুদ্র শক্তির প্রতিমূর্তি' রূপে দেখা দেয়। ১৮৬৪ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর লণ্ডনে 'শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির উদ্বোধনী ভাষণে' মার্কস ব্রিটিশ শিল্পে শ্রমিকদের জন্য শ্রমঘণ্টা বেঁধে দেবার সপক্ষে বলেন :

ডাঃ উর, অধ্যাপক সিনিয়র ও এই জাতের অন্যান্য মহাপণ্ডিতদের মতো তাদের বিজ্ঞানের অতি কুখ্যাত মুখপাত্রদের মাধ্যমে বুর্জোয়া শ্রেণী এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল এবং প্রাণভরে প্রমাণ করেছিল যে, শ্রমের ঘণ্টা যদি আইনগতভাবে সীমাবদ্ধ হয়, তাহলে তাতে ব্রিটিশ শিল্পের মৃত্যু পরোয়ানাই জারি করা হবে; এ শিল্প বাঁচাতে পারে কেবল পিশাচের মতো রক্ত চুষে, তদুপরি শিশুর রক্ত চুষেই। পুরাকালে শিশুহত্যা ছিল মোলখ [Moloch] পূজার্চনার এক রহস্যময় অনুষ্ঠান কিন্তু সে অনুষ্ঠান পালন করা হত শুধুমাত্র অতি গাম্ভীর্যপূর্ণ উপলক্ষে, বৎসরে হয়ত বা একবার, এবং তা ছাড়া, শুধুমাত্র গরিব শিশুদের ওপরেই একমাত্র পক্ষপাত মোলখের ছিল না। মার্কসের রচনায় পুরাণকথার এই ব্যবহার থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে, এইসব কাহিনী আদৌ ইতিহাস না হলেও প্রখরভাবে ইতিহাস-সচেতন মার্কস পুরাণ ও উপকথার প্রতিতুলনা যথার্থ অর্থে খুঁজে পেয়েছিলেন সমকালীন ইতিহাসের মধ্যে। পল লাফার্গ (১৮৪১-১৯১১) কীভাবে লোককথার ইতিহাসকে মানবসমাজের বিকাশের সাধারণ নিয়ম ও তার ঐতিহাসিক তাৎপর্যের সঙ্গে মিলিয়ে অধ্যয়নের চেষ্টা করেছেন মজুমদার তাঁর আলোচনায় তা উল্লেখ করেছেন। (মজুমদার : ১৯৮৬)। এটা ঠিকই যে,

প্রকৃতপ্রস্তাবে লোককথা ও ইতিহাস সমার্থক তো নয়ই বহুক্ষেত্রে ইতিহাসের আলোচনায় লোককথার তাথ্যিক উপস্থাপন নির্ভরযোগ্যও নয়। তবু সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশের পটভূমিতে লোককথাকে অনুধাবনের চেষ্টা করলে ইতিহাস অধ্যয়নের পক্ষে তা সহায়ক হয়ে উঠতে পারে—লাফার্গের এই নির্ণয়কে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কার্ল মার্কসের লোককথা অধ্যয়নের পরিধি ও তাঁর রচনায় সেসবের ব্যবহারের তাৎপর্য লাফার্গের আলোচনায় আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

মাও-ৎসে-তুঙের কাছে অবশ্য লোককথার কাল্পনিক দিকটি যথাযথ গুরুত্ব পেয়েছে। পুরাণকে ও পুরাণে বর্ণিত অসংখ্য রূপান্তরকরণকে তাঁর 'অতিকথা' বলে মনে হয়েছে, যেমন · ক' উয়াফুর সূর্যের সঙ্গে দৌড় প্রতিযোগিতা (খ্রীস্টপূর্ব ৪০৩-২২১-র এই লোককথায় ক' উয়াফুকে অতিমানব হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে তিনি সূর্যের সঙ্গে দৌড় প্রতিযোগিতায় রত হয়ে জয়লাভ করেন এবং সূর্যের পিঠে চেপে ভ্রমণ করেন ও পরিশেষে তৃষ্ণার্ত হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়।), ঈ-কর্তৃক নয়টি সূর্যকে তীরবিদ্ধকরণ (খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে সংগৃহীত হুয়াই নানৎসে নামক কাহিনীতে বর্ণিত আছে যে, সম্রাট ইয়াওয়ের রাজত্বকালে আকাশে দশটি সূর্য দেখা যেত। এতগুলি সূর্যের অসহ্য উত্তাপে উদ্ভিজ্জের দারুণ ক্ষতি হচ্ছিল। তা বন্ধ করার জন্য সম্রাট প্রাচীন চীনের ধনুর্বিদ্যা-বিশারদ বীর ঈ-কে আদেশ দিলেন। ঈ দশটির মধ্যে নয়টি সূর্যকে তীরবিদ্ধ করে নামিয়েছিলেন।), বানরের বাহাত্তর বার কায়া পরিবর্তন (ষোড়শ শতাব্দীতে লিখিত এই কাহিনীতে নায়ক সু উ কুঙ্ নামে এক বানর রহস্যময় দৈবী ক্ষমতাবলে খুশিমতো পাখি, গাছ, পাথর ইত্যাদি বাহাত্তর রকমের আকৃতি ধারণ করতে পারত।) ইত্যাদি। ১৯৩৮ সালের আগস্ট মাসে প্রদত্ত বক্তৃতায় মাও-ৎসে-তুঙ্ মার্কসকে উদ্ধৃত করে বলেছিলেন :

মার্কস বলেন, "কল্পনার মধ্যে ও মাধ্যমেই সমস্ত পুরাণ প্রকৃতির শক্তিসমূহকে আয়ত্ত করে, আধিপত্য করে এবং রূপ দান করে; এই কারণেই প্রকৃতির শক্তিসমূহের উপরে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা হবার সঙ্গে সঙ্গে তার অবলুপ্তি ঘটে।" পুরাণ ও শিশুকাহিনীর অন্তহীন রূপান্তরণের গল্পগুলি মানুষকে আনন্দ দেয় কারণ, সেগুলি কাল্পনিকভাবে প্রাকৃতিক শক্তির উপরে মানুষের জয়লাভকে মূর্ত করে তোলে আর তা ছাড়া, মার্কস যা বলেছেন, শ্রেষ্ঠ পৌরাণিক কাহিনীতে থাকে একটি 'শাশ্বত জাদু', কিন্তু তা হলেও পুরাণ বাস্তব দ্বন্দ্বের নির্দিষ্ট অবস্থার উপরে প্রতিষ্ঠিত নয় এবং এই কারণেই তা বাস্তবকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রতিফলিত করে না। তার মাঝে পুরাণে ও শিশুকাহিনীতে যে যে দিকগুলিকে নিয়ে দ্বন্দ্ব গঠিত হয়, সেগুলির কেবল কাল্পনিক স্বরূপই থাকে, বাস্তব স্বরূপ থাকে না।

এই বক্তৃতায় অবশ্য মাও খুব সুনির্দিষ্টভাবে যা বলে রাখেন তার অর্থ আমরা এইভাবেও করতে পারি . এই সমস্ত কাহিনীতে লীন হয়ে থাকা পরস্পরের বিপরীত যে রূপান্তরণ তা বাস্তব রূপান্তরণ না হলেও তাতে বাস্তব দ্বন্দ্বই অভিব্যক্ত হয় :

এগুলি হচ্ছে জটিল বাস্তব দ্বন্দ্বের পরস্পরের রূপান্তরণের অসংখ্য ঘটনায় মানুষের মনে যে এক ধরনের বালসুলভ কাল্পনিক, মনগড়া রূপান্তরণের ভাব উদ্রিক্ত হয়, কেবল তাই-ই।

সাধারণভাবে পুরাণকথাকে সুপ্রাচীনকালের মানুষের কল্পনার ফসল বলেই মনে করা হয়। এ-নিয়ে বরাবরই মতের ভিন্নতাও যথেষ্ট। কেউ বলেছেন :

ইন জেনারেল এ মিথ ইজ এ স্টোরি হুইচ ইজ নট 'ট্রু' অ্যাণ্ড হুইচ ইনভল্‌ভস্ (অ্যাজ এ রুল) সুপার ন্যাচারাল বিইংস্—অর অ্যাট এনি রেট সুপ্রা-হিউম্যান বিইংস্। (কুড্ডন : ১৯৯৯)

অন্য দৃষ্টিভঙ্গিতে পুরাণকথা হল :

ফ্যাণ্টাস্টিক রিফ্লেক্‌শন অব রিয়েলিটি ইন প্রিমিটিভ কনশাস্‌নেস, হুইচ ওয়াজ এমবডিড ইন ওরাল ফোকলোর ক্যারেক্টারিস্টিক অব দি অ্যান্টিক্যুইটি। মিথস্ অয়্যার ন্যারেটিভস্ বর্ণ ইন দি আর্লি স্টেজেস্ অব হিস্ট্রি, হুজ ফ্যাণ্টাস্টিক ইমেজেস্ (গডস, লিজেণ্ডারি হিরোজ, বিগ ইভেণ্টস্...) অয়্যার বাট এটেম্পট্‌স্ টু জেনারেলাইজ অ্যাণ্ড এক্সপ্লেন্ ডিফারেণ্ট ফেনোমেনা অব নেচার অ্যাণ্ড সোসাইটি। (প্রোলভ্ : ১৯৬৭)

এই দৃষ্টিতে পুরাণকথাকে প্রাচীন সমাজমানসের বিশ্বকে দেখার এক বিশেষ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গিরূপেও মনে করা হয়েছে। পুরাণকথা-উপকথা-লোককথা নিয়ে লোককথার বিস্তৃত একটি পরিসরের কথা মেনে নিলে লোককথাকে গল্পের আয়তনে বৃহত্তর সত্য, বাস্তব বা বাস্তবের প্রতিফলন বলে মনে করা ছাড়া উপায় নেই। লোককথার অলৌকিকতার দিকটি যে কল্পনা আর 'মিথ্যে'র মিশেলে তৈরি, তাতে তো অন্তত কোনো সন্দেহ করা চলে না! কিন্তু আমাদের মনে রাখা দরকার : মানবমনের ক্ষেত্রে মানুষের দ্বারা কল্পিত তথাকথিত 'মিথ্যে'ও আসলে এক ধরনের 'মানবিক সত্য'—মানুষের কল্পনা-প্রকল্পনা কিংবা যাবতীয় স্বপ্নের পেছনে দূরাগত সত্যাকাঙ্ক্ষা ক্রিয়া না করেই পারে না।

লোককথায় তাই যাঁরা 'হার্ড ফ্যাক্ট'-এর সন্ধান করেছেন তাঁদের 'ফ্যাক্ট'-এর ধারণার সঙ্গে আমাদের উপলব্ধি না-ও মিলতে পারে। আসলে পশু- পাখি - মানুষ - দেবতা-দানব - দৈত্য - ডাইনি - শাসক - শাসিত - অত্যাচারী - অত্যাচারিত - অরণ্য - জনপদ - প্রকৃতি - বিজিত - বিজয়ী - কাপুরুষ - বীর—সব সব মিলিয়ে লোককথার মধ্যে আছে এক মানবিক সত্য, 'ফ্যাক্ট'-এর থেকে বেশি আছে ট্রুথ। বাঘের গলা থেকে হাড় বের করে দেবার পর সারসটি বাঘের কাছ থেকে যেভাবে 'পুরস্কার' পায়, মাংসখণ্ড মুখে করে নদীর সাঁকো পেরোবার সময় নদীর জলে নিজের ছায়া দেখে লোভী কুকুর যেভাবে সাধের মাংসখণ্ডটি হারায়, জল ঘোলা করবার কল্পিত অভিযোগে মেষ শাবক যেভাবে নেকড়ের হাতে নিহত হয়, ভালুককে আসতে দেখে এক বন্ধুকে ছেড়ে অপর বন্ধু যেভাবে গাছে চড়ে প্রাণ বাঁচায় কিংবা অজস্র গল্পে যেভাবে এই জাতীয় কঠিন জীবনসত্যের রূপায়ণ ঘটে চলে তাতে করে আমরা

অনায়াসে লোককথাকে ছদ্ম বাস্তবের কাহিনী, অপ্রিয় সত্য ও 'হার্ড-ট্রুথে'র আকর বলতে পারি। বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন লোককথার অনুমিত স্রষ্টা ঈশপের জীবনগাথা এই 'হার্ড-ট্রুথে'র একটা পাথুরে প্রমাণ।

ঈশপ (খ্রীস্টপূর্ব ৬২০) গ্রীসের লিডিয়া রাজ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে মনে করা হয়। মানুষের প্রাত্যহিক আচার-আচরণ, সমাজজীবনের নানান অসঙ্গতি নিয়ে পশুপাখিদের রূপকাশ্রয়ে ঈশপ শিক্ষণীয় সব গল্প বানাতেন। বন্দ্যোপাধ্যায় ঈশপের গল্পের অনুবাদ করতে গিয়ে ভূমিকায় লিখেছিলেন :

ঈশপ তাঁহার উপদেশপূর্ণ কাল্পনিক গল্প দ্বারা রাজা-প্রজা সকলকেই শিক্ষা দিতে চেষ্টা করিতেন। তাঁহার তীক্ষ্ণ বাক্যশেলে আহত হইয়া গ্রীসের প্রজাবৃন্দ তাঁহার উপর বিরক্ত হইয়া উঠে...তাহারা তাঁহার গল্পের জন্যই বিরক্ত হইয়াছিল; সুতরাং আবার গল্প শুনিয়া ক্রোধে উন্মত্ত হইল এবং তাঁহাকে এক পর্বতের উপর হইতে ফেলিয়া দিয়া হত্যা করে। (বন্দ্যোপাধ্যায় : ১৯১৫)।

এই জীবনকথায় ঈশপের মৃত্যুর সব দায় জনসাধারণের উপর চাপানো হলেও রাজা বা শাসকের দায়কে আড়াল করা যায় না। কেননা, গাথা-অনুসারে ঈশপ প্রথম জীবনে ক্রীতদাস ছিলেন, এবং নিজের জ্ঞান ও কর্মপটুতার জোরেই ক্রীতদাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে রাজার প্রসাদ পর্যন্ত লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। ঈশপের নামে প্রচলিত গল্পগুলির 'হার্ড-ট্রুথ'ই তাঁর জীবনান্ত ঘটায়! জারের রাজত্বকালে এ. এস. হিলফারডিং (১৮৩১-৭২)—এর মতো পণ্ডিতদের নেতৃত্বে গবেষণায় তিনিই প্রথম কথক ও বর্ণনাকারীর জীবনী ও ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে আলোকপাতের প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকৃতি দান করেন। কারণ, যে-কোনো সৃজনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে সমসাময়িক জীবনাভিজ্ঞতার প্রক্ষেপণ প্রায় অনিবার্য বলে মনে হয়। রেভারেণ্ড লালবিহারী দে-এর অতিখ্যাত গ্রন্থ 'ফোক টেল্স অব বেঙ্গল'-এর অনুবাদ করতে গিয়ে অনুবাদিকার উপলব্ধিটি এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃতিযোগ্য :

লেখক (লালবিহারী দে—লে.) খৃশ্চান, গল্পগুলি একজন ইংরেজের অনুরোধে সংগ্রহ; লেখা বিদেশী ভাষায়, বিদেশী পাঠকদের কথা মনে করে। এসব কথা ব্যাখ্যা না থেকেই বোঝা যায়।

লেখার ধরনে কোনো মমতার পরিচয় নেই, নিরলঙ্কার ভাবে কাঠামোগুলো ধরে দিয়েছেন, কোথাও কোনো তত্ত্বকথা আরোপ করেন নি, বর্ণনার বাহুল্য নেই, সংলাপ অনেক জায়গায় অতি নীরস। আশ্চর্যের বিষয় হল তবু সেই ন্যাড়া বিবৃতির অসম্ভব, অবাস্তব, অভাবনীয় সব ঘটনার মধ্যে দিয়েও সেকালের বাঙালীর চরিত্র, তার আশা-নিরাশা সুখ-দুঃখ মেশা জীবনযাত্রা কেমন ফুটে উঠেছে। কিছু বাদ যায় নি, একদিকে সেই জাঁকজমক, অন্যদিকে সেই অভাব-অনটন, সেই চিরদিনের লোভ, হিংসা, বিফলতা, ব্যর্থতা; সেই মহত্ত্ব, সেই সার্থকতা। (লীলা : ১৯৩৫ ব.)।

সাধারণভাবে শিল্প-সাহিত্য যেভাবে শ্রোতা-পাঠকের সঙ্গে সংযোজিত হয়,

লোককথার অভিযোজন তার থেকেও দ্রুত ও সরাসরি বলে আমাদের মনে হয়। কেননা, লোককথাগুলিতে ভালো-মন্দের ন্যায়-অন্যায়ের পাপ-পুণ্যের হিসেবটা কষা থাকে বেশ মোটা দাগে—সাদাসিধে যোগ-বিয়োগের মতো। লোককথাগুলিতে রাজা -গজা, মন্ত্রী-সান্ত্রী, চালাক-বোকা, ভীরু-সাহসী, দেবতা-বিধাতা কারোরই এই 'হার্ড-ট্রুথ'টির হাত থেকে রেহাই মেলে না। আমাদের নিশ্চয়ই মনে পড়বে সেই গল্পটি যেখানে বিধাতা জন্মকালে এক বামুনের কপালে আধপেটা খাওয়া লিখে দিয়েছিলেন। ফলে, বেচারা বামুনের তো আর পেট ভরে খাওয়া জোটে না, দারিদ্র্যও ঘোচে না। একদিন রাজবাড়িতে ব্রাহ্মণ খেতে বসেছে—কপালের লেখার কারণে রাজকীয় খানার উপরে ছাতের কড়ি থেকে ঝোলানো একটা মাটির ভাঁড় তার পাতের ওপর ভেঙে পড়ল। বামুনের আর পেট ভরে তৃপ্তি করে খাওয়া হলো না। রাজা সে-কথা শুনে পরের দিন নিজে রেঁধে, দাঁড়িয়ে থেকে বামুনকে খাওয়ালেন। বামুনের খাওয়ায় বাগড়া দেবার কোনো পথ খুঁজে না পেয়ে বিধাতা স্বয়ং একটা ব্যাঙ হয়ে লাফিয়ে পড়লেন বামুনের পাতে। সামনে লোভনীয় খাবার আর রাজার আদর পেয়ে বামুনের তো অতশত খেয়াল নেই। ভাতের দলার সঙ্গে ব্যাঙটাকে ফেলেছে গিলে। তৃপ্তি করে খেয়ে নানা উপহারসামগ্রী পেয়ে বামুন ধরেছে বাড়ির পথ। কিন্তু ব্যাঙরূপী বিধাতার তো বামুনের পেটে প্রাণান্ত অবস্থা! বিধাতার কাকুতি-মিনতিকে বামুন গ্রাহ্যই করল না। এদিকে বিধাতার অনুপস্থিতিতে ত্রিভুবন বুঝি লোপ পায়। বিধাতাকে ছেড়ে দেওয়ার আর্জি জানাতে এসে স্বয়ং লক্ষ্মী ও সরস্বতী বামুনের মারমুখী মূর্তি দেখে পালাবার পথ পান না। শেষ পর্যন্ত মহাদেবকে স্বয়ং আসতে হলো বামুনের কাছে। বামুন নিজে শৈব, তাই মহাদেবের অনুরোধে সে বিধাতাকে ছেড়ে দিতে রাজি হলো। পুরস্কারস্বরূপ মহাদেব বামুন আর বামনিকে সশরীরে স্বর্গে নিয়ে গেলেন। (*যে বামুন এক দেবতাকে খেয়েছিল : বাংলার উপকথা*)

এই সঙ্গে এই তামিল লোককথাটিও উল্লেখ্য : ব্রহ্মা এক মুনির পুত্রসন্তানের জন্মমুহূর্তে তার কপালে লিখেছিলেন যে, পূর্বজন্মের কর্মফলে ছেলেটির জীবন খুব দুঃখ-কষ্টের হবে—ছেলেটি সাকুল্যে এক বস্তা চাল ও একটি মোষ পাবে। তিন বছর পরে মুনির একটি মেয়ে জন্মাল। এবার ব্রহ্মা মেয়েটির কপালে লিখলেন যে, মেয়েটিকে বারবণিতার পেশা নিয়ে জীবন কাটাতে হবে। মুনির এই ছেলে ও শিষ্য দু-বারই ব্রহ্মাকে ধরে এই বিধিলিপি জেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু কাউকে সে-কথা ফাঁস করলে তো তাঁর জীবনান্ত হবে। মুনি তীর্থ থেকে ফিরে এলে শিষ্য গুরুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বিশ বছর ধরে নানা দেশ পরিভ্রমণ করলেন।—ফিরে এসে দেখেন যথাকালে মুনি ও মুনিপত্নী মারা গিয়েছেন এবং ব্রহ্মার লিখে দেওয়া ললাটলিপি মিলে গিয়েছে। গুরুপুত্র একবস্তা চাল ও একটি মোষের সহায়তায় অতি দরিদ্র জীবনযাপন করছে। শিষ্য ছেলেটিকে পরামর্শ দিলেন : মোষটা আর একবস্তা চাল বেচে দিয়ে নিজেরা খেয়ে বাকি পয়সায় কাঙালীভোজন করাতে. আগামীকালের জন্য একপয়সাও

সঞ্চয় না রাখতে। গুরুপুত্র তাই-ই করল। পরদিন দেখে তার গোয়ালে একটা মোষ বাঁধা, পাশে এক বস্তা চাল। এই হলো শুরু। নিজের লেখা ভাগ্যলিপি ঠিক রাখতে প্রতি রাতে ব্রহ্মাকে ছেলেটির গোয়ালে একটি মোষ আর এক বস্তা চাল রেখে আসতে হয়। গুরুপুত্র প্রতিদিন সব বেচে দিয়ে সেই পয়সায় নিজেরা খায়, বামুন-কাঙাল ভোজন করায়, কোনো সঞ্চয় রাখে না। শিষ্য একইভাবে গেলেন মুনি-কন্যার কাছে। মেয়েটি তখন বারবণিতার জীবনযাপন করছে। তিনি তাকে পরামর্শ দিলেন : যে-লোক তাকে এক ঝাঁপি স্ফটিকের মতো মুক্তো দিতে পারবে তাকেই শুধুমাত্র সে যেন দরজা খুলে দেয়। সে রাতে এক অসামান্য পুরুষ তার কাছে ঘরে এলো এক ঝাঁপি মুক্তো নিয়ে। শিষ্যের পরামর্শ মতো মেয়েটি সকালে সমস্ত মুক্তো বেচে দিয়ে ব্রাহ্মণ ও কাঙালী ভোজন করালো—এতটুকু সঞ্চয় রাখল না। এক্ষেত্রেও নিজের লেখা লিপিনির্দেশ বজায় রাখতে বিধাতাকে প্রতি রাত্রে এক ঝাঁপি উৎকৃষ্ট মুক্তো নিয়ে হাজিরা দিতে হয় মুনি-কন্যার ঘরে। সব ব্যবস্থা করে শিষ্য আবার চললেন তীর্থে। রাত্রি থাকতেই তিনি রওনা দিলেন। পথে এক রূপবান যুবকের সঙ্গে দেখা। যুবকটি এক বস্তা চাল ও এক পোঁটলা মুক্তো কাঁধে করে একটা মোষের দড়ি টানতে টানতে যাচ্ছেন। এই যুবকটিই ব্রহ্মা। শিষ্যের সঙ্গে দেখা হতে তো ব্রহ্মা ভেউ ভেউ করে কাঁদতে লাগলেন। শিষ্যের বুদ্ধিতেই তো তাঁকে প্রতি রাতে এই কম্ম করতে হচ্ছে। ব্রহ্মা শেষ পর্যন্ত মুনির পুত্র-কন্যার ললাটলিপি বদল করে তবে এই কাজ থেকে মুক্তি পেলেন। (*ভাগ্যের উপর টেক্কা : তামিল লোককথা*)

উপভোক্তা-হিসেবে আমরা যে-কোনো শিল্পের কাছেই সাধারণভাবে প্রত্যাশা করি : মানুষের জয়, নির্যাতিত মানুষের উজ্জ্বল-উদ্ধার—লোককথার কাছেও। লালকমল-নীলকমলের কাছে রাক্ষসেরা হেরে গেলে, ছোট্ট মেয়েটি নেকড়ে বাঘের ছলনা বুঝতে পেরে তাকে মেরে ফেললে, রাক্ষসের খপ্পর থেকে রাজকন্যাকে সোনার কাঠি রূপার কাঠির মায়া থেকে ছিনিয়ে আনা বীরকে আমরা অভিনন্দন না জানিয়ে পারি না। হিংসুটে দৈত্যের বাগানে বাচ্চাদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বসন্তের আবির্ভাব ঘটলে, সে ভেতর থেকে বদলে গেলে আমরা যেমন স্বস্তি পাই, তেমনই বেদনাহত হই তার নিষ্ক্রমণে। রাজপুত্র-মন্ত্রীপুত্রের ঝগড়া মিটে গেলে আমরা খুশি হয়ে বাঁচি।

মনে হতে পারে—নীতিতত্ত্বের পূর্বনির্ধারিত শর্তের প্রেক্ষিতে বিচার করলে ভালোর প্রতি, ন্যায়ের প্রতি, সত্যের প্রতি, পাপ-পুণ্যের চিরাচরিত মাপকাঠির প্রতি মানুষের সাধারণ পক্ষপাতের কারণে এই সব গল্পের পরিণতি মানুষকে আনন্দ দেয়। কিন্তু সত্যি কথা বলতে গেলে আনন্দের অন্য-নিরপেক্ষ কোনো নিছক নান্দনিক সংজ্ঞাও তো হয় বলে মনে হয় না।

সেটা বোঝা যায়, যখন সাধারণ মানুষের হাতে শাসকেরা লাঞ্ছিত হলে বা বোকা বনলেও লোককথার শ্রোতারা খুশি হয়ে ওঠে। জমিদার গরিব প্রজার কাছে জব্দ হলে, বনদেবতার কাছ থেকে জাদুবাটি পেয়ে (দরিদ্রের থেকেও দরিদ্র লোকটি তার

পোঁটলার মধ্যে দুটি বাসি ভাত রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিল গাছের তলায়। বনদেবতারা তার ভাতক'টি খেয়ে নিয়েছিলেন। তার বদলে তাকে দিয়েছিলেন জাদু বাটি। জাদু বাটি অনিঃশেষ খাবার সরবরাহ করতে পারত) বাটির কল্যাণে দরিদ্র লোকটির অবস্থা ফিরে যাওয়ায় গ্রামের হিংসুটে ধনী লোকটি জাদু বাটি পাওয়ার রহস্যটি জেনে নিয়ে নিজে জাদু বাটি সংগ্রহ করে গ্রামের লোকের কাছে কেরামতি দেখাতে গেল। এবার জাদু বাটি থেকে বের হলো যণ্ডাগণ্ডা কিছু লোক। তারা নিমন্ত্রিত লোকদের ধরে ধরে দিল মাথা কামিয়ে। হিংসুটে ধনী লোকটির আর মুখ দেখানোর উপায় থাকল না। (জাদু বাটি : তামিল উপকথা)

এমন-কী, বীরবলের কাছে আকবরের পৌনপুনিক পরাজয়, বুদ্ধির খেলায় হেরে গোপাল ভাঁড়ের কাছে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের বার বার আত্মসমর্পণ কিংবা তামিল, তেলেগু বা কন্নড় উপকথার চরিত্র বিদূষক তেনালিরামের কাছে বিজয়নগরের রাজার বোকা বনাটা যেন *উপভোক্তা*দেরই জয় সূচিত করে। গোপাল তো তারা গোনার অসম্ভব খেলায় বাংলার নবাবকে পর্যন্ত বোকা বানিয়ে প্রভু কৃষ্ণচন্দ্রকে রক্ষা করে।—গোপালের কৃতিত্বকে শ্রোতা-পাঠক স্বীকার করে নেয়। লোককথার চরিত্রগুলির সঙ্গে শ্রোতাদের একাত্মীকরণের বিষয়টি লোককথার আলোচনায় নতুন কিছু নয়। ভারতের লোককথার সংকলক রামানুজ কিংবা আমেবিকান পুরাণতাত্ত্বিক ও লেখক যোসেফ ক্যাম্পবেল (ক্যাম্‌বেল—সেনগুপ্ত এই উচ্চারণ লিখেছেন : ১৯৯৫)-সহ অনেকেই লোককথার একাত্মীকরণ ও নিরাত্মীকরণ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। লোককথার জগৎটি শিশুদের কাছে কতখানি সত্য ও বাস্তব বলে মনে হতে পারে তা ক্যাম্পবেলের লেখার সূত্রটিকে প্রায় অনুবাদ করে সেনগুপ্ত তাঁর লেখায় ব্যবহার করেছেন। ক্যাম্পবেলের লেখায় (মাস্কস্ অব গড, ভল্যুম-১ : প্রিমিটিভ মাইথোলজি, ভূমিকা। প্রথম ভাইকিং পেঙ্গুইন সংস্করণ ১৯৫৯, পরিবর্ধিত সংস্করণ ১৯৬৯) আমরা দেখেছি :

এক অধ্যাপক বাবার পড়ার ঘরে ঢুকে তাঁর চার বছরের শিশু কন্যাটি নানাভাবে বাবাকে বিরক্ত করছিল। অধ্যাপক মেয়েকে ব্যস্ত করে ভুলিয়ে রাখবার মানসে তাকে খেলবার জন্য দেশলাইয়ের তিনটি পোড়া কাঠি দিলেন। মেয়েটি তৎক্ষণাৎ বাবাকে বিরক্ত করা ছেড়ে মেঝের উপর খেলতে বসে গেল। তিনটি পোড়া কাঠির দুটি হলো মেয়েটির শোনা রূপকথার দুই ভাই-বোন হ্যানসেল ও গ্রেটেল এবং সবচেয়ে পোড়া কাঠিটি হলো ডাইনি। কিছুক্ষণ ভালোই খেলা চলল। কিন্তু অধ্যাপক যখন নিশ্চিন্তমনে তাঁর কাজে সবে মনোনিবেশ করেছেন, তখনই ছোট্ট মেয়েটি আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল। অধ্যাপক বাবা মেয়ের চিৎকার শুনে প্রায় লাফিয়ে উঠলেন, 'কী হলো? কী হয়েছে? মেয়েটি তাঁর কাছে দৌড়ে এলো, চোখে-মুখে তার প্রচণ্ড আতঙ্কের ছাপ, 'বাবা, বাবা', সে কাঁদছিল, 'ডাইনিটাকে সরিয়ে নাও, আমি ডাইনিটাকে ছুঁতে পারছি না।'

অধ্যাপকের ছোট্ট মেয়েটি আসলে গ্রীম ভাইদের রূপকথার হ্যানসেল আর গ্রেটেলের গল্পটিকে নকল করে খেলতে বসেছিল। এই গল্পটি সৎমায়ের নিষ্ঠুর প্ররোচনা ও শিশুদের কষ্ট পাওয়ার গল্প—যেখানে সৎমায়ের কুমন্ত্রণায় ভুলে নিজের অনিচ্ছা ও ছেলে-মেয়ের প্রতি অগাধ ভালোবাসা সত্ত্বেও ভারাক্রান্ত হৃদয়ে অসহায় পিতা তাদের (ছেলে হ্যানসেল আর মেয়ে গ্রেটেলকে) বনের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে এসেছিল। ক্ষুধার্ত ও অসহায় ভাই-বোন লোভে পড়ে কেক-চকোলেটের তৈরি বাড়ি দেখে তার ভিতরে ঢুকে পড়েছিল এক ডাইনির খপ্পরে। অধ্যাপক-কন্যার কাছে সবচেয়ে পোড়া কাঠিটা সত্যিকারের ডাইনি হয়ে দেখা দিয়েছিল বলে সে ভয় পেয়ে কেঁদে উঠেছিল।

শিশুর মনে লোককথার এই একাত্মীকরণের সঙ্গে সঙ্গে এই গল্পের মর্মে আরও কিছু বাস্তবতার নিষ্ঠুর কার্কশ্য থেকে যায়। হ্যানসেল আর গ্রেটেলের বাবা নিতান্ত গরিব এক কাঠুরিয়া। দারিদ্র্য এমনই যা শেষ পর্যন্ত স্নেহ-মায়া-অপত্যকে ভুলিয়ে দেয়। সংসারযাত্রা নির্বাহে নিতান্ত বিপন্ন কাঠুরিয়া দুঃখিত অন্তরে স্ত্রী সন্তানত্যাগের প্ররোচনা যখন মেনে নেয় তখন তার ঘরে একবেলারও খাবার নেই। বাচ্চাদের জন্য বরাদ্দ রুটির টুকরো ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হচ্ছে!

আমাদের মনে হয় না যে, অধ্যাপকের ছোট্ট মেয়েটি শুধুমাত্র দুষ্টু ডাইনির জন্য ভয় পেয়েছিল। জঙ্গলের ডাইনি আর হ্যানসেল গ্রেটেলের বিমাতা এখানে আলাদা তো কিছু নয়। হ্যানসেল ও গ্রেটেলের জঙ্গলের মধ্যে হারিয়ে ক্ষুধাক্লান্ত যাত্রা অধ্যাপক-বালাকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে রেখেইছিল, আর তারই সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ডাইনির অনুষঙ্গ। বিমাতা তাদের খেতে দেয় নি, বাড়ি থেকে দূর করে দিতে চেয়েছিল; আর ডাইনি তাদের খাইয়ে-দাইয়ে মোটা করে নিজেই খেতে চায়। এতটা নৈরাজ-নিষ্ঠুরতা সহ্য করা চার বছরের এক বালিকার পক্ষে কঠিন বটে। তারও ওপর হ্যানসেল-গ্রেটেল তাদের বাবার কাছ থেকে স্নেহ পেলেও পুরোপুরি সহায়তা পায় নি; সন্তানদের প্রতি স্নেহ-ভালোবাসা থাকা সত্ত্বেও কাঠুরিয়া অতি দুর্বল এবং বিমাতার দ্বারা পরিচালিত। অধ্যাপক-কন্যার জীবনে মায়ের প্রশ্রয় নিশ্চয়ই কম ছিল। না-হলে সে পড়াশোনায় ব্যস্ত পিতাকে বিরক্ত করতে তাঁর লাইব্রেরি পর্যন্ত ধাওয়া করবে কেন? গল্পে হ্যানসেল গ্রেটেলের বাবা তাদের বিমাতার ক্রোধ ও ঈর্ষার হাত থেকে রক্ষা করে নির্ভয় আশ্রয় হয়ে উঠতে না পারলেও ভাই-বোন পিতার স্নেহার্দ্র হৃদয়টিকে শুধু উপলব্ধিই করে নি, বিমাতার পরামর্শ ও প্ররোচনার কালে পিতার ভালোবাসা ও সন্তানদের রক্ষা করার চেষ্টাও দেখেছে তারা (ক্ষুধার জ্বালায় জেগে থাকার ফলে তারা দু-বারই সৎ-মায়ের প্ররোচনা ও বাবার অসহায় আবেদন শুনেছে)। তাই সমস্ত বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা পেয়ে হ্যানসেন-গ্রেটেল যখন নিজেদের বাড়িতে ফিরে এসেছে তখন—

অ্যাণ্ড অ্যাট লেন্থ্ দে ' ফ্রম আফ্টার দেয়ার ফাদার'স হাউজ। দেন দে বিগ্যান টু

রাণ, রাশ্‌ড্‌ ইনটু দি পার্লার, অ্যাণ্ড থ্রিউ দেমসেল্‌ভ্‌স রাউণ্ড দেয়ার ফাদার'স্‌ নেক। দি ম্যান হ্যাড নট নোন্‌ ওয়ান হ্যাপি আওয়ার সিন্‌স্‌ হি হ্যাড লেফ্‌ট দি চিলড্রেন ইন দি ফরেস্টস দি উইম্যান হাউএভার, ওয়াজ ডেড।

গ্রীমভাইদের গল্প-সমাপ্তির এই বিবরণের সঙ্গে ক্যাম্পবেল বর্ণিত অধ্যাপক-বালার আচরণের মিল রয়েছে (দি লিট্‌ল্‌ গার্ল কামস্‌ রাণিং টু হিম (টু হার ফাদার)....)। বাচ্চা মেয়েটিও তাই ভয় পেয়ে পিতার কাছেই বরাভয় বা আশ্রয় চেয়েছে। সুতরাং লোককথা পাঠের উদ্দেশ্য, পদ্ধতি ও বিধেয়ের পরিবর্তন ঘটালে রূপকথার মধ্যেও নিহিত জায়মান বাস্তবতার, কঠিন সত্যের অন্তঃস্বরটি আবিষ্কার করা আদৌ দুরূহ নয়।

২.

মাটি-ছোঁয়া জীবনের হাসি-কান্নার সঙ্গে লীন হয়ে থাকা লোককথার রূপাবয়ব প্রায় একরৈখিক হলেও তার বিষয়বৈচিত্র্য অমেয়। লোককথার আগ্রাসনক্ষমতাও বিস্ময়কর। প্রকৃতি ও প্রাণীবিশ্বের রহস্যময়তার সামনে দাঁড়িয়ে মানুষের অতিপ্রাকৃতিক কল্পনা, ধর্ম ও জাদুবিশ্বাস, বেঁচে থাকার সংগ্রাম ও আনন্দ, স্বপ্ন ও কল্পনা, মানুষের স্মৃতি ও সত্তা—সবই লোককথার উপজীব্য হয়ে ওঠে। ভাষাবিদ্যার ডক্টর হয়েও ভ. বইকো লোককথার বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিতে গিয়ে তাত্ত্বিকতাকে পরিহার করে সাদা-সরলভাবে বলতে পারেন :

অতি প্রাচীন কাল থেকে পুরুষানুক্রমে লোকের মুখে মুখে চলে এসেছে নানা ধরনের লৌকিক কাহিনী, মায়াময় এক জগৎ আর তার নায়কদের নিয়ে গল্প, তাতে ঝলক দিয়েছে রসবোধ, বুদ্ধির চমক, জনসাধারণের প্রজ্ঞা। বহু যুগ ধরে কথন ছিল তার অবলম্বন, কথক এককালে তা নিজে শুনে আবার অন্যদের শোনাত। এই 'কথন' থেকেই এগুলির নাম হয়েছে কাহিনী...(বইকো : ১৯৮৮)

এর পাশাপাশি সরল সত্য হিসেবেই বইকো খুবই অতীতকালের বা তুলনামূলকভাবে অর্বাচীনকালের লোককাহিনীতে মজার মজার নানান ঘটনা, মানুষ ও পশুপাখির ভালো-মন্দ উজ্জ্বল সব চরিত্র, কাব্যমণ্ডিত নানা ছবির মধ্যেও দেখতে পেয়েছেন সাধারণ লোকের মধ্যেকার সৎসাহসী মানুষদের। *ইউক্রেনের লোককথা* সম্পাদনা করতে গিয়ে বইকো দেখেছেন যে, ভালো আর মন্দের 'সুকঠিন দ্বন্দ্বে ফুটে ওঠে সহজ মানুষ, সাধারণ মেহনতির বীরত্বব্যঞ্জক চরিত্র।' তিনি লক্ষ্য করেন : 'রূপকথার নায়কেরা এসেছে জনগণের মধ্যে থেকে'। মন্দকে শায়েস্তা করতে, বিপন্নকে বাঁচাতে, ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে লড়তে হয় নায়কদের। বইকোর নির্ণয়ে আমরাও দেখি যে, লোককথাগুলিতে লোককল্পনায় বীরেরা যে শক্তি অর্জন করে তার মধ্যে রূপ পায় অসহায়-নির্যাতিত-বঞ্চিত মানুষের সামর্থ্য বৃদ্ধির জন্য 'গ্রামীণ মেহনতির স্বপ্ন।'

আরও সহজ করে লোককথার জগৎকে দেখলেও তার মধ্যে সকল-আস্তিক্যের

একটা বোধ ফুটে ওঠে। চক্রবর্তী ভারতের লোককথার শিশুপাঠ্য সংকলন প্রকাশ করতে গিয়ে লক্ষ্য করেন :

লোককথা সর্বমানুষকে সর্বযুগে কল্যাণে উদ্বুদ্ধ করে। সে গল্পের চরিত্র মানুষই হোক বা পশুপাখিই হোক। ধর্মের জয় ও পুরস্কার, অপরাধের পরাজয় ও তিরস্কার। হাসি, নির্দোষ রঙ্গ-ব্যঙ্গ, কটাক্ষের মধ্যে দিয়ে শুভবোধ করার প্রয়াস। (চক্রবর্তী : ১৯৮৩) এ-প্রসঙ্গে ভারতীয় সংকলকের কথার সঙ্গে বইকোর নির্ণয় মিলে যায় :

অকারণে বলা হয় না যে জীবজন্তু নিয়ে গল্পের 'একটা চোখ থাকে মানুষের দিকে।' একই কথা বলা হয় তুলনাগুলিতেও। 'শেয়ালের মতো সেয়ানা', 'নেকড়ের মতো ভক্ষক'। তবে গল্পগুলির স্রষ্টা লোকসাধারণ সর্বদাই লোকসাধারণের পক্ষে সহানুভূতি দেখায়, তাদের বিপদে আপদে ভালোবাসে তাদের ভালোমানুষি দরদ, বিশ্বস্ততার জন্য।

বিশ্বের লোককথার জগৎটির ভ্রামণিকতার প্রকৃত কারণটি সম্ভবত এই সারল্য ও দরদ। মজুমদার দেখিয়েছেন যে, ১৮৫০ সালের কাছাকাছি সময় থেকে লোককথা অধ্যয়নে রোমান্টিক ও রহস্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গির বদলে বস্তুনিষ্ঠা এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিচার-বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা প্রাধান্য পেতে থাকে। বিভিন্ন মহাদেশের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি পাওয়ার এই কালে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের লোককথাগুলির মধ্যে অদ্ভুত সাদৃশ্য লক্ষ্য করা গেল। ভৌগোলিক দূরত্ব, আমূল সংযোগ-ছিন্নতা, সামাজিক পরিবেশ ও লোকজীবনের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের বিপুল ভিন্নতা সত্ত্বেও বিভিন্ন দেশের লোককথার মধ্যে সাদৃশ্যের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে কেউ খুঁজে পান এক জনসমষ্টির কাছে অন্য জনসমষ্টির ঋণগ্রহণের তত্ত্ব, কেউ খাড়া করেন লোককথার ভ্রামাণিকতার তত্ত্ব। যেসব জনসমষ্টির মধ্যে পারস্পরিক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগাযোগের কোনো তথ্য পাওয়া যায় না, অথচ লোককথায় পাওয়া যায় সুপ্রচুর সমোচ্চারণ—সেখানে ভ্রাম্যমাণতার তত্ত্ব কাজে আসে না। প্রকৃতপক্ষে ভ্রাম্যমাণতা বা ঋণের তত্ত্ব দিয়ে নানা দেশের লোককথার মধ্যে সাদৃশ্যের কারণ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। আসলে 'স্মরণাতীত কাল থেকে বিভিন্ন জনসমষ্টির মধ্যে আদানপ্রদান ও সংযোগের ফলে অনেক ক্ষেত্রে এক দেশের লোককাহিনী অন্য দেশে বা দেশান্তরে সঞ্চারিত হয়েছে ঠিকই। (মজুমদার : ঐ) কিন্তু আবার দেখা যায় যে *অনুরূপ পরিবেশে মানবমন অনুরূপভাবে চিন্তা করে এবং সেই কারণেও অনেকক্ষেত্রে সাদৃশ্য রেখে যায়।* বস্তুত, সবদেশে, সবকালেই মানবমন মানবের কল্যাণচিন্তা করে এসেছে। এর ব্যত্যয় ঘটলে তখন তাকে আমরা বলে এসেছি 'অমানবিক' কিংবা 'পাশবিক'। ভারতবর্ষ ও গ্রীস—দুটি সুপ্রাচীন সভ্যতার চারটি জাতিপরিচায়ক মহাকাব্য : রামায়ণ ও মহাভারত এবং ইলিয়াড ও ওডিসি। কাব্যগুলির ভিত্তিগত প্রতিপাদ্য তো আর কিছু নয়—পুণ্যের জয় আর পাপের পরাজয়, পুণ্যবানের জয় আর পাপীর পরাজয়। যুগে যুগে পাপ-পুণ্যের ধারণায় বিপুল পরিবর্তন সত্ত্বেও শেক্সপীয়ারের পক্ষে বীর ওথেলোকে বা শাইলককে জয়ী করে

দেখানো মুস্কিল; যেমন মুস্কিল হয় আধুনিক সময়ে দাঁড়িয়ে মধুসূদনের পক্ষে 'গ্র্যাণ্ড ফেলো' রাবণকে বা 'ফেভারিট' ইন্দ্রজিৎকে জয়ী করে তোলা। লোককথা সাদাসাপটা সরাসরি ন্যায্যতাকে, দুর্বলকে, দরিদ্রকে, বীরকে সমর্থন করে—এমন-কী, লক্ষণীয় মাত্রায় লোককথায় পাওয়া যাবে বুদ্ধির জয়, সংসারজীবনে বাস্তব-বুদ্ধির প্রয়োগ, নীতিকথা থাকলেও নীতি নিয়ে যাজকসুলভ নৈতিকতার বাড়াবাড়ির অনুপস্থিতি। দুষ্টের দমনের জন্য লোককথায় যে-সমস্ত পদ্ধতির প্রয়োগ দেখা যায় তাকে সর্বদা জীবনবোধের সাধুরীতি বলা না গেলেও তা যে দৈনন্দিনের বাস্তবতায় মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে, তা বলা বাহুল্য মাত্র। দেশ-কাল-সময় ভেদে এগুলির সাধারণধর্মের অপরিবর্তনীয়তাই হয়তো পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের লোককথার মধ্যে সাদৃশ্যের কারণ হয়ে ওঠে। এবং লোককথার জগৎটি অধিকতর বাস্তবানুষঙ্গে মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়।

লোককথার আলোচনায় বস্তুতান্ত্রিক নিরিখটি ব্যবহারের বিস্তারটিকে গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন লোকতাত্ত্বিক ইসলাম ও মজুমদার। রাশিয়ায় অক্টোবর বিপ্লবোত্তর যুগে শুধু লোককথা নয়, লোকায়ত সংস্কৃতিকে ঐতিহাসিক ও দ্বন্দ্বমূলক দৃষ্টিতে বিচার করার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। সোভিয়েত যুগে সোভিয়েত রাশিয়ার ফোকলোর-তাত্ত্বিকেরা এ-কথা উল্লেখ করতে কখনও ক্লান্তি বোধ করেন নি যে, লেনিন লোককথা সম্পর্কে বলেছিলেন : 'সমস্ত লোককথার মধ্যেই বাস্তবের উপকরণ নিহিত আছে'। টাটার লেনিনের এই কথা প্রসঙ্গে বলেছেন :

বাট ইট উড নাঈভ টু বিলিভ (অ্যাণ্ড লেনিন এভিডেন্টলি আণ্ডারস্টুড দিস্) দ্যাট ফোকটেল মিরব দি সোসাল কণ্ডিশনস্ অব অ্যান আর্লিয়ার এজ। (টাটার : প্রাগুক্ত)।

লোককথা অধ্যয়নে সোভিয়েত সমর্থন রাশিয়ায় লোককথা অধ্যয়নে বিশ্বদৃষ্টির প্রয়োগকে সম্ভব করে তোলে। মজুমদার এ-বিষয়ে অত্যন্ত জরুরি সংকেত দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, মার্কসীয় গবেষকরা পূর্বসূরীদের কৃতিত্বকে উপেক্ষা করেনই নি 'বরং তাকে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের কষ্টিপাথরে যাচাই করেছেন।' অর্থাৎ পূর্বসূরীদের লোককথা-আলোচনায় কাহিনীগুলির বাস্তব তৎপর্যকে চেনার যে সব সম্ভাবনাময় দিক উঠে এসেছিল সেগুলিকে নতুন যুগের আলোচকেরা গ্রহণ করেছেন এবং অনুধাবনের সত্যপথটি ঘুলিয়ে দেয় এমন আলোচনাকে বর্জন করেছেন, সমালোচনাও করেছেন :

জ্ঞান ও বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মতো লোককথা অধ্যয়নের ক্ষেত্রেও অগ্রগতি হয়েছে বহু আপেক্ষিক ভুল ও আপেক্ষিক সত্যকে জানার মধ্য দিয়ে। সেই প্রক্রিয়াটিকে জানার গুরুত্বটিকে মার্কসবাদীরা ছোট করে দেখেননি। মার্কসীয় দৃষ্টিতে গবেষণার কাজে সাধারণভাবে মার্কসীয় পদ্ধতির প্রয়োগ ছাড়াও গবেষকেরা মার্কস, এঙ্গেলস্, লাফার্গ এবং লেনিনের রচনাবলীতে অনেক ইঙ্গিত ও নির্দেশ খুঁজে পেয়েছেন। (মজুমদার : ১৯৮৬)।

ম্যাক্সিম গোর্কি সোভিয়েত লেখক সংঘের অধিবেশনে (আগস্ট ১৯৩৪) লোককথা

চর্চার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সঠিকভাবেই তাঁর মনে হয়েছিল আদিমসমাজের সংঘবদ্ধ জীবনের সঙ্গে, মানুষের সমবেত কল্পনার সঙ্গে, সংগ্রাম, ইচ্ছা ও স্বপ্নের সঙ্গে পুরাণকথা ও লোকগাথার অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ আছে। গোর্কি প্রাচীন কথা-কাহিনীকে সামাজিক উৎপাদনে অংশগ্রহণকারী মানুষের স্মৃতি-সত্তার প্রতিভাস বলে মনে করেছেন :

দি হিস্টোরিয়ানস্ অব প্রিমিটিভ কালচার হ্যাভ কমপ্লিটলি ওয়েভড্ দি ক্লিয়ার এভিডেন্ট অব মেটিরিয়ালিস্ট থট্, টু হুইচ দি প্রসেস অব লেবার অ্যাণ্ড দি সাম টোটাল অব ফেনোমেনা ইন দি সোসাল লাইফ অব এন্শিয়েন্ট ম্যান ইনেভিটেব্লি গেভ রাইজ। এভিডেন্সেসেস্ হ্যাভ কাম ডাউন টু আস ইন দি শেপ অব ফেব্ল্ অ্যাণ্ড মিথ্স্ ইন হুইচ উই হিয়ার দি ইকো অব ওয়ার্ক ডান ইন দি টেমিং অব অ্যানিম্যালস্, ইন দি ডিসকভারি অব হিলিং হার্বস, ইন দি ইনভেনশন অব ইনপ্লিমেণ্টস্ অব লেবার। ইভ্ন্ ইন রিমোট অ্যান্টিক্যুইটি মেন ড্রিমড্ অব বিইং এব্ল্ টু ফ্লাই ইন দি এয়ার,...ফ্রম দি ফেব্ল্ অব দি "ম্যাজিক কার্পেট"। মেন ড্রিমড্ অব স্পিডিয়ার মুভমেন্ট ওভার দি আর্থ—হেন্স্ দি ফেব্ল্ অব দি "সেভেন লীগ বুটস্"। দে লার্ণড টু রাইড দি হর্স। দি ডেজায়ার টু নেভিগেট রিভারস্ ফাস্টার...মেন কনসিভ্ড্ দি পসিবিলিটি অব স্পিনিং অ্যাণ্ড উইভিং এ ভাস্ট্ অ্যামাউন্ট অব ফেব্রিক ইন দি ওয়ান নাইট, অব বিল্ডিং ওভারনাইট এ গুড ডোয়েলিং, ইভ্ন্ এ "ক্যাস্ল্"...।

গোর্কি দেখেছিলেন লোককথার চরিত্রগুলি বাধা-বিপত্তি বা অত্যাচারের সামনে সহজে বা বিনা প্রতিবাদে মাথা নত করে নি। তাঁর মতে মানুষের সামাজিক সংগ্রাম, অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের সংকল্প (যেমন : মধ্যযুগে বিভিন্ন দেশের কৃষক অভ্যুত্থান) এ-সবেরই কথা ধরা পড়েছে লোককথার শরীরে। গোর্কি এই সূত্রে লোককথার ভাঁড় চরিত্রের গুরুত্বের কথাও উল্লেখ করেছেন। তিনি স্পষ্ট বলেছেন :

আই ডু নট ডাউট দ্যাট ইউ আর ফ্যামিলিয়ার উইথ এন্শিয়েন্ট লিজেণ্ডস্, টেল্স্ অ্যাণ্ড মিথস্, বাট আই শুড লাইক দেয়ার ফাণ্ডামেন্টাল মিনিং টু বি মোর ডিপলি কমপ্রিহেন্ডেড্। অ্যাণ্ড দেয়ার মিনিং ইজ দি অ্যাসপিরেশন অফ এন্শিয়েন্ট ওয়ার্কিং পিপ্ল টু লাইটেন্ দেয়ার টোল্, ইনক্রিজ ইটস্ প্রোডাক্টিভনেস, টু আর্ম এগেন্স্ট ফোর-ফুটেড অ্যাণ্ড টু-ফুটেড ফোস্, অ্যাণ্ড অলসো বাই দি পাওয়ার অব ওয়ার্ডস, বাই দি ডিভাইস অব 'এক্সর্সিজ্ম্' অ্যাণ্ড 'ইন্ক্যান্টেশন্' টু গেন্ অ্যান ইনফ্লুয়েন্স ওভার দি এলিমেন্টাল ফেনোমেনা অব নেচার, হুইচ আর হোস্টাইল টু মেন। (গোর্কি : ১৯৩৪)।

লোককথা অধ্যয়নের ক্ষেত্রে বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তার কথাই গোর্কি শুধুমাত্র বললেন না, তিনি এই কাজের একটি 'সামগ্রিক রূপরেখা' হাজির করলেন।

এ-প্রসঙ্গে ইসলাম লিখেছেন যে, গোর্কি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছিলেন—

পরিশ্রমী মানুষের ক্রন্দনে সব দেশের ফোকলোর চিরদিন মুখর। (ইসলাম : ১৯৭৪) এই বক্তৃতায় আমরা দেখি যে, গ্রীক লোককথার নায়ক হারকিউলিসকে গোর্কি 'হিরো অব লেবার' বা 'শ্রমবীর' আখ্যায় ভূষিত করেছেন। তিনি প্রমিথিউস, মিকুলা সেলিয়ানিনোভিচ্ (কিংবদন্তী-কাহিনীর স্লাভ কৃষক ও সংগ্রামী বীর) প্রমুখের উদাহরণ দিয়ে এঁদের প্রতিবাদের মূর্ত প্রতীক হিসেবে সম্মানিত করলেন।

সোভিয়েত লেখকদের প্রতি গোর্কির পরামর্শ ছিল এই যে, জনসাধারণের সংগ্রামের সমর্থনে লোককথার নির্যাসটুকুকে ব্যবহার করতে হবে। কেন না, লোককথার শক্তিশালী গমন-ক্ষমতা জনগণের সংগ্রামী চেতনাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পক্ষে সহায়ক।

গোর্কির এই ভাষণের পর থেকেই (১৯৩৬ সাল নাগাদ) তদানীন্তন সোভিয়েত রাশিয়ায় লোককথাকে দেখার সাবেককালের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটল বলা যায়। পণ্ডিতেরা স্বাভাবিকভাবেই দেখতে পেলেন যে, লোককথায় রাজারাজড়া ও শাসকদের কথা প্রভূত পরিমাণে থাকলেও তা নিছক গল্প নয়। অত্যাচারী ও অত্যাচারিতের সম্পর্ক নির্ণয়ে, শাসক ও শাসিতের টানাপোড়েনের স্বরূপ নির্ধারণে, শোষিতের সংগ্রামী প্রত্যয়ের চিহ্নিতকরণে লোককথাগুলি বেশ কাজে আসে। লোককথার বীরগাথাসমূহের মধ্যে যেমন আবহমান মানুষের স্বপ্নাকাঙ্ক্ষা রূপ পেয়েছে তেমনই রূপ পেয়েছে সমকালীন সমাজমানস। এই সূত্রেই ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে স্বল্প-সংখ্যক গবেষক-পণ্ডিত সমাজ বাস্তবতার দৃষ্টিতে লোকসংস্কৃতির বিচার করেছিলেন তাঁরা নতুন করে স্বীকৃতি পান।

গোর্কির এই ঐতিহাসিক ভাষণের পর সাবেক সোভিয়েতে, এবং সেই সূত্রে অন্যান্য দেশে যে বস্তুতান্ত্রিক পদ্ধতিতে লোককথা চর্চায় যে ধরনের অধ্যয়ন শুরু হয় মজুমদার তার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছেন। এই চেষ্টা ইসলামও করেছেন। আমরা তাঁদের অনুসরণ করে এবং প্রয়োজনীয় মাত্রাভেদ ঘটিয়ে এ-বিষয়ে একটি সূত্রপঞ্জী প্রণয়ন করতে পারি :

এক. লোককথা অতীতের গল্প, তেমনি তা অতীতে ঘটে যাওয়া সত্যের এক-ধরনের পরিচয় (হার্ড-ফ্যাক্ট ও হার্ড-ট্রুথ) বহনকারী। এবং সেই অর্থে তা বর্তমানেরও কণ্ঠস্বর।

দুই. লোককথাকে দেখতে হবে চিরকালের সামাজিক উৎপাদনকর্মে, বিশেষ করে শারীরিক শ্রমকর্মে অংশগ্রহণকারী মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা-স্বপ্ন-সংগ্রামের, পেরে-ওঠা ও না-পারার অভিব্যক্তি হিসেবে। সুতরাং এই অর্থে লোককথা শ্রেণীচৈতন্যের নিরিখে মানুষের সংগ্রামক্ষেত্র হিসেবে বিচার্য।

তিন. লোককথার গল্পগুলির মধ্যে 'একটা সশস্ত্র হুঁশিয়ারি আছে' (রামানুজন : ১৯৯৮), আছে বিরোধ-সংকুল এক দ্বান্দ্বিক বিকাশের আয়তন। বিভিন্ন যুগের লোকগাথায় যুগধর্মের এই দ্বান্দ্বিক বিকাশের দিকটি ধরা পড়তে বাধ্য। সেদিকে লক্ষ্য

রেখে লোককথাগুলিকে পাঠ করতে পারলে নিছক গল্পের বাইরেও তার মধ্যে যুগবিধৃত মানবচরিত্র ও মানবসমাজকে পাওয়া যেতে পারে। লোককথার জনপ্রিয়তা, বিস্তৃতি এবং কালজয়ী আন্তরশক্তির বিকাশ বস্তুত তার এই সমাজবাস্তবতার দ্বিতীয় স্বরটিকে ধরে রাখার ক্ষমতার জন্যই ঘটে—লোককথা নিজেই হয়ে ওঠে এক 'প্রমুক্ত প্রমেথিউস।'

সাবেক সোভিয়েত রাশিয়ার অধ্যাপক য়ুরি. এম. সকোলভের বিখ্যাত গ্রন্থ 'রাশিয়ান ফোকলোর' সোভিয়েত বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য হিসেবে ১৯৩৮ সালে আত্মপ্রকাশ করে। সকোলভ এই গ্রন্থে দেখান : 'ফোকলোর অতীতে এবং বর্তমানে শ্রেণী সংগ্রামের ছায়ায় পুষ্ট এবং চিরদিন ফোকলোর শ্রেণী সংগ্রামের একটি বিশিষ্ট হাতিয়ার হিসেবে বিচার্য।' লোকতাত্ত্বিক ইসলাম উল্লেখ করেছেন যে, সকোলভ মার্কস-এঙ্গেলস্, লেনিন-স্ট্যালিনের বহু উদ্ধৃতি দিয়ে 'জনসাধারণের সাহিত্য-সংস্কৃতির ও প্রলেতারিয়েতদের চিন্তাপুষ্ট ফোকলোরের প্রতি নবার্জিত বিশ্বস্ততা প্রমাণ করেছেন।

লোককথাকে দেখার দ্বান্দ্বিক বা বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে নিছক রাজনৈতিক প্রচারণা বা প্রোপাগাণ্ডা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কেননা, লোককথায় নিহিত 'হার্ড-ট্রুথ'টি নিস্তাত্ত্বিকভাবেও *উপভোক্তার* চিন্তন-পদ্ধতির মধ্যে জড়িয়ে যায়। মধ্যযুগীয় ভারতীয় বা চৈনিক লোককথা পাঠ করলে যেমন ভারতীয় উপমহাদেশের রাজতন্ত্র-সামন্ততন্ত্র সমাজটিকে চেনা যায়, তেমনি রাশিয়ার বা মধ্যপ্রাচ্যের লোককথায় ধরা পড়ে সেই দেশের রাষ্ট্রনৈতিক-অর্থনৈতিক চেহারাটা। রাজাদের রানীর সংখ্যা কিংবা সুলতানের হারেম-ভর্তি বেগমদের ভিড়, সাত রানী থাকতেও নিঃসন্তান রাজার অষ্টমবার বিবাহ করা—এসবই সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার ইঙ্গিতবহ হয়ে ওঠে। স্বামী-শাশুড়ি মিলে বৌ-এর উপর অত্যাচার, কন্যাসন্তানের অনাদর, মাতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার স্মৃতির মধ্যেই বেড়ে চলা পুরুষতন্ত্রের দাপট, অদৃষ্টবাদিতা, দেবতা ও ধর্মের প্রতি পক্ষপাতমূলক দুর্বলতা, ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতি সংস্কার, ব্রাহ্মণ্য-সংস্কারের ক্ষয়, ভূস্বামীর অত্যাচার, রাজা-রাজড়ার খুশিমতো বিচার ও কথায় কথায় প্রাণদণ্ডের আদেশ, ব্যক্তিত্বের অবলোপ, কৃষিকাজ ও পশুপালনের স্মৃতির বিজারণ, গ্রামীণ কারিগর কিংবা নগরের ব্যবসাজীবীর যাপনকথা, রাজার সভা কিংবা জমিদারের কাছে আশ্রয়প্রাপ্ত মধ্য ও উপস্বত্বভোগী মানুষের দল—এই সবই রাষ্ট্র আর সমাজের একটি বিশেষ ব্যবস্থার বাস্তবতাকে চিহ্নিত করে। হিব্রু লোকপুরাণে জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাওয়ার অপরাধে ইভকে ক্রুদ্ধ ঈশ্বর অভিশাপ দিয়েছিলেন : 'পুরুষ হবে তোমার প্রভু!'—এই অভিশাপ প্রাথমিকভাবে শারীরিক দিক দিয়ে নারীর পুরুষের থেকে দুর্বল হওয়াকে ইঙ্গিত করলেও এই অভিশাপে নারীর অবরোধের মধ্য দিয়ে আদিম সামন্ততন্ত্রের একটা চেহারাও ফুটে ওঠে বলে মনে হয়। লোককথার মধ্যে ফুটে ওঠা এই চিহ্নগুলিকে বিশ্লেষণ করে এ-গুলির উদ্ভবের সমাজ-পর্যায় নিরূপণের চেষ্টাও হয়েছে। সেনগুপ্ত

লোককথার মধ্যে শ্রেণীচেতনার বিবর্তন লক্ষ্য করেছেন, তিনি মধ্যপ্রাচ্যের সিন্ধবাদ নাবিক কিংবা আরব্যরজনীর গল্পগুলিকে সুস্পষ্টভাবে শ্রেণীবিভাজিত সমাজের ফসল বলে মনে করেছেন। (সেনগুপ্ত : পূর্বোক্ত)

লোককথার পশু-পাখি-জীবজন্তুর চরিত্র তো আর কিছু নয়, সকলেই একমত হয়েছেন, এগুলো মানুষের জীবনের মানবসমাজের দৈনন্দিনের প্রতিরূপ। দুর্বল আর সবল, অত্যাচারী ও অত্যাচারিতের সম্পর্কের হার্ড-ট্রুথটি গল্পচ্ছলে বলবার অপরাধেই যে ঈশপের প্রাণান্ত হয়েছিল, এটা সুবিখ্যাত বাঘ ও মেষশাবকের গল্পটির নীতিবাক্যটি পাঠ করলেই বোঝা যায়। নিরপরাধ মেষশাবককে বধ করার জন্য বাঘটি প্রথমে জল ঘোলা করার দায় মেষশাবকের উপর চাপাতে চেয়েছিল। সে-অভিযোগ ধোপে না-টেঁকায় একবছর আগের গালাগালির অভিযোগ উত্থাপন করেছে বাঘ; একবছর আগে মেষশাবকটির জন্ম না-হওয়ায় বাঘ মেষশাবকের বাপের উপর দোষ চাপিয়ে তাকে বধ করেছে। গল্পের শেষে নীতিবাক্যটি মারাত্মক :

যাহারা শুধু আপনার নির্দোষতা দেখাইয়া যুক্তি দ্বারা অত্যাচার প্রতিরোধ করিতে চায়, তাহাদের সাফল্যের প্রত্যাশা অতি অল্প। *নির্বিচার অত্যাচারীর অত্যাচার শুধু বলের দ্বারাই নিবারণ করিতে পারা যায়।* (বন্দ্যোপাধ্যায়কৃত অনুবাদ : ১৯১৫)

প্রসঙ্গত ঈশ্বরের কাছে ব্যাঙেদের রাজা চাওয়ার গল্পটিরও উল্লেখ করা যায় : এক বিলের ভেকেদের কোনো রাজা ছিল না। ঈশ্বরের কাছে তারা একজন রাজা চাইল। তাদের প্রার্থনায় বিরক্ত হয়ে ঈশ্বর একটি কাঠের গুঁড়ি জলে ফেলে দিলেন। ব্যাঙেরা নির্জীব রাজায় সন্তুষ্ট না হয়ে একটি সজীব রাজা চাইল। তখন ঈশ্বর একটি কুচে মাছ পাঠিয়ে দিলেন। এমন নিরীহ রাজায় ভেকেরা সন্তুষ্ট হলো না। তখন ঈশ্বর পাঠালেন একটি সারসকে। সারস-রাজা এসেই ব্যাঙেদের ধরে ধরে খেতে লাগল। এই অত্যাচারী রাজার হাত থেকে উদ্ধারের জন্য ভেকদের আবেদনে এবার আর ঈশ্বর কর্ণপাত করলেন না। এই গল্পের নীতিকথাটিও কম মারাত্মক নয়।

বেটার নো রুল-দ্যান ক্রুয়েল রুল। (গুটেনবার্গ : ২০০২)

বাংলায় নীতিবাক্যটি দেওয়া হয়েছে এইভাবে :

অত্যাচারী রাজার চেয়ে অলস, নিরীহ, নিষ্ক্রিয় রাজাও অনেক ভালো। (বন্দ্যোপাধ্যায় : পূর্বোক্ত)

এদিক থেকে 'সিংহ ও শশকের গল্প'টিও কম যায় না : বনের রাজা হিসেবে সিংহ প্রতিদিন একটি করে পশুর ভেট চায়। যে-দিন ছোট্ট খরগোশ ইঁদারার জলে সিংহকে তারই ছায়া দেখিয়ে ডুবিয়ে মারে ও বনের পশুদের অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই দেয়, তখন পাঠক-শ্রোতার আনন্দের সীমা থাকে না। বাহুবলে বলীয়ান অত্যাচারীর বিরুদ্ধে তা নির্যাতিত মানুষের জয় বলেই পরিগণিত হয়। কন্নড় লোককথার কাকটি যেভাবে বন্ধু শিয়ালের পরামর্শে কালো সাপটির বিরুদ্ধে বারবার তার বাচ্চা খেয়ে

নেওয়ার প্রতিশোধ নেয় তা সমাজের সাধারণ শ্রেণীর মানসিক অবস্থানের বা মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতার এক-ধরনের সূচক হয়ে উঠতে চায়।

ক্ষমতাবানের প্রভুত্বের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ ও উদ্যত পরিহাসের আরও ভালো উদাহরণ 'টুনটুনির গল্প'। গল্পটিকে সেনগুপ্ত শ্রেণীবিরোধের একটি উদাহরণ হিসেবে দেখতে চেয়েছেন। রাজার অগাধ টাকা। অব্যবহৃত জমানো টাকা শুকোতে দিতে হয়। আর তার থেকেই টুনটুনি একটি টাকা নিয়ে পালায়। টাকা পেয়ে টুনির উল্লাস, সেই টাকাটি উদ্ধারের জন্য রাজার আকুতি, পরিণামে 'রাজা-রাণী, পাত্র-মিত্রদের যৎপরোনাস্তি' লাঞ্ছনা..., সাতরাণী এবং রাজার নাককাটা যাওয়া...।' —বলাই বাহুল্য, এই ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ -পরিহাস একইসঙ্গে বঞ্চিতের বেদনা ও গ্লানি থেকে মানুষের পরিচয়ে স্থিত থাকার জন্য আত্মরক্ষার বর্ম ও প্রবলের উদ্ধত অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রত্যাঘাতের অস্ত্রবিশেষ।

শিশুদের জন্য আনন্দপ্রদায়ক, নীতিশিক্ষার উপকরণের সঙ্গে বিভাজিত শ্রেণীসমাজের হার্ড-ট্রুথটির বিরোধসংকুল এই অবস্থান শুধু লোককথা-উপকথা-লোকপুরাণের ক্ষেত্রেই নয়, মানুষের যাবতীয় সৃষ্টির ক্ষেত্রেই এর উপস্থিতি অনিবার্য—এও এক হার্ড-ট্রুথ। চিরকালই বিশেষ শ্রেণীর একচ্ছত্র অধিকার থেকে আগুনের অধিকার, আলোর অধিকার, জীবনরূপী উত্তাপের অধিকার ছিনিয়ে আনার জন্য প্রমেথিউসদের অসম্ভব সংগ্রাম, কিংবা সমুদ্রমন্থনের পর অমৃতের অধিকার নিয়ে দেবতা-দানবের লড়াই—এ সবই সমাজবিকাশের নানাস্তরে ঘটে যাওয়া শ্রেণী-দৃষ্টিভঙ্গির বহুস্তরিক চেহারাটি দেখিয়ে দেয়। লোককথা বা পুরাণের ব্যবহারের স্তরান্তরণের দিকটি বোঝা যায় 'রথের রশি' নাটকে রথের রশির সঙ্গে নাগরাজ বাসুকির তুলনায়। রবীন্দ্রনাথ এখানে রথের রশিটির রূপকার্থ যেটুকু মোচন করেন তার সঙ্গে বাসুকির তুলনাকালে সেটুকুকেও দ্বিতীয় স্বর হিসেবে সংগুপ্ত রাখেন। পৌরাণিক কাহিনী অনুযায়ী নাগরাজ বাসুকি নিজের মস্তকের উপর পৃথিবীটাকে ধারণ করে আছেন এবং বাসুকিকেই সমুদ্র-মন্থনের সময় মন্থন-রজ্জু হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল। চূড়ান্ত ক্ষয়ের যুগে পৌঁছে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা ব্যর্থ গাঁটছড়া বেঁধেছে ধনিক-বণিকদের সঙ্গে। মানব-সম্বন্ধই চিরকাল সমাজটাকে চালিয়ে নিয়ে এসেছে। আজকের ধনতন্ত্রের কাছে সেই মানবসম্বন্ধের কোনো মূল্যই নেই। রাজা অনড় রথটিকে চালাবার ভার ধনিকদের অর্থবান হাতের উপর দিলেও মানব-সম্বন্ধের প্রতীক রথের রশিটাকে ধনিকেরা প্রথমে দেখতেই পায় নি, হোঁচট খেয়েছে রশিটিতে। তাদের কাছে রশিটিকে মরা বাসুকির মতো বলে মনে হয়েছে।—অমানবিকতায় ধনতন্ত্র এতটাই নিঃসংকোচ!

লোককথায় ময়না পাখির ঘাড় মটকে দিয়ে রাজপুত্র রাক্ষসী রানীকে বধ করলে, ভ্রমরের মৃত্যুতে ভয়ঙ্কর রাক্ষসের বিনাশ হলে তার মধ্যে মানুষের বেঁচে থাকার প্রবল অভীপ্সাসমূহের ইতিবাচক রূপায়ণই দেখতে পাই আমরা। এইভাবে দেখলে লোককথাকে আর নিছক গল্প বলে মনে করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। লোককথার অসম্ভব

সব কাল্পনিকতার মধ্যে প্রায় তাই প্রকাশ্য-উজ্জ্বলতায় বিরাজ করে চির-নিকষিত বেদনাবহ সাধারণের জীবনের সংগ্রামী ঐতিহ্য। স্ফিংসের ডানায় ভর দিয়ে তাই লোককথায় জেগে থাকে চিরজীবিতের জয়।

সহায়কপঞ্জী

সত্যেন্দ্রনাথ মজুদার : মার্কসীয় দৃষ্টিতে লোকসংস্কৃতি, ১৯৮৬, মনীষা, কলকাতা।

মযহারুল ইসলাম : ফোকলোর পরিচিতি এবং লোকসাহিত্যের পঠনপাঠন, ১৯৭৪, বাংলা একাডেমী ঢাকা।

মারিয়া টাটার . দি হার্ড ফ্যাক্টস্ অব দি গ্রীমস' ফেয়ারি টেল্স্, ২০০৩, প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি প্রেস, ইউ. কে.।

দি ক্লাসিক ফেয়ারি টেল্স্. ১৯৯৯ ডব্ল্যু. ডব্ল্যু. নর্টন অ্যাণ্ড কোম্পানি, নিউ ইয়র্ক ও লণ্ডন।

পল্লব সেনগুপ্ত : লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ, ১৯৯৫, পুস্তক বিপণি, কলকাতা।

(সম্পা.) লোকপুরাণ ও সংস্কৃতি, ১৯৯৫, পুস্তক বিপণি, কলকাতা।

যোসেফ ক্যাম্পবেল . মাস্কস্ অব গড, ভল্যুম-১ : প্রিমিটিভ্ মাইথোলজি, ভূমিকা। প্রথম ভাইকিং পেঙ্গুইন সংস্করণ ১৯৫৯, পরিবর্ধিত সংস্করণ ১৯৬৯।

কার্ল মার্কস ও ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস . নির্বাচিত রচনাবলী, ১৯৭৯, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো।

মাও সে তুঙ্ : শিল্প ও সাহিত্য প্রসঙ্গে, ১৯৬৮, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা।

ম্যাক্সিম গোর্কি : সোভিয়েত লেখক কংগ্রেসে প্রদত্ত বক্তৃতা, ১৯৩৪, প্রথম প্রকাশ · ১৯৩৫।

আই. ফ্রোলভ্ : ডিক্শনারি অব ফিলোজফি, ১৯৬৭, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো।

জে. এ. কুড্ডন . ডিক্শনারি অব লিটারারি টার্মস্ অ্যাণ্ড লিটারারি থিয়োরি, :১৯৯৮, পেঙ্গুইন বুকস্, লণ্ডন।

ওযাই. এম. সকোলভ : রাশিয়ান ফোকলোর, (ইং অনু. ক্যাথরিন রুথ স্মিথ), ১৯৫০, ম্যাকমিলান কোম্পানি, নিউ ইয়র্ক (বি. ডি. শিমকিনের আলোচনা)।

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (অনু.) · ঈশপের গল্প, ১৯১৫, ২য় সং ১৯৯৬, ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, কলকাতা। ঈশপস' ফেবল্স্. ২০০২, গুটেনবার্গ।

এ. কে রামানুজন (সংকলন ও সম্পা., অনু. মহাশ্বেতা দেবী) : ভারতের লোককথা, ২০০১, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, দিল্লি।

ভ. বইকো (অনু. ননী ভৌমিক) : ইউক্রেনের লোককথা, ১৯৮৮, রাদুগা, মস্কো।

শৈল চক্রবর্তী : ভারতের লোককথা, ১৯৮৩, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা।

রেভারেণ্ড লালবিহারী দে (অনু. লীলা মজুমদার) : বাংলার উপকথা (অনুবাদকের নিবেদন), ১৩৯৫ ব., অন্নপূর্ণা প্রকাশনী, কলকাতা। এবং অন্যান্য লোককথা-উপকথার গ্রন্থ।

মনোবিকলন তত্ত্বের নিরিখে লোককথা

অনির্বান মান্না

।। ১ ।।

মানুষ জন্মেই ভাষা শেখেনি। সুদীর্ঘকাল ইশারা-ইঙ্গিত-অঙ্গভঙ্গী এবং বিচ্ছিন্ন রবের সাহায্যে মনের ভাব বিনিময় করেছে। এই বিস্তৃত সময় ভয় বিস্ময়, অজ্ঞতা, কৌতূহল নিয়ে পৃথিবীকে পর্যবেক্ষণ করেছে আদিম মানুষ। প্রাকৃতিক-পারিবেশিক কার্যকলাপের কার্য-কারণ সম্পর্কিত ধারণা এবং তার থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায়গুলিকে তারা নিজের মত নির্মাণ ও ব্যাখ্যা করেছে। যাতে নিজেদের অস্তিত্বের সংকট না ঘটে। জন্ম নিয়েছে নানান বিশ্বাস-সংস্কার ও কল্পনা। বিভিন্ন আচার -অনুষ্ঠান পালনের মাধ্যমে সেই বিশ্বাস-সংস্কারকে সফল করার চেষ্টা চলেছে নিরন্তর।

আদিম মানুষ গুহায় যখন কোন ছবি আঁকল তখন সে কিছু বলতে চেয়েছিল। যখন সে কোন আচার পালন করল তখনও তার বিশ্বাস থেকে সে কিছু প্রত্যাশা করে। যখন কথা বলতে শিখল সেই ভাবনাগুলোই ভাষারূপ নিয়ে কথা হল। তখন কোন একটি ঘটনা, যা হয়তো একটি ব্যক্তির সামনে ঘটেছে, সে ওই ঘটনাটির বর্ণনা দিল গোষ্ঠীর কাছে। সেই বর্ণনায় ছিল হয়তো ঘটনার প্রত্যক্ষ ভয়, বিস্ময়বোধ, সেই সঙ্গে মিশেছে নিজের বিশ্বাসভাবনা। যারা শুনল তারাও একইভাব প্রকাশ করল। বর্ণনাটি এভাবে ছড়িয়ে পড়ল গোষ্ঠীর মধ্যে, ক্রমে বংশ পবম্পরায। সৃষ্টি হল লোককথার।

লোককথা বলার প্রাথমিক পর্যায়ে হয়তো উত্তরাধিকারীকে প্রকৃতি-পরিবেশ ও মানুষ সম্পর্কে জানানো বা সচেতন করা মূল উদ্দেশ্য ছিল। পরবর্তীকালে তা বিনোদনের রূপ নেয়। এই বৈশিষ্ট্য সকল লোকসৃষ্টির প্রাথমিক অভিপ্রায়।

বর্তমান কালের কথাসাহিত্য লোককথারই বিবর্তিত রূপ। কথাসাহিত্যের মূল উপাদান সমাজ-প্রকৃতি ও মানুষ. লোককথাতেও সমাজ। তবে লোককথায় মানুষের প্রাকৃতিক জগৎ তা সে জীব কিংবা জড় হোক— সকলেই মানবিক। ফলে লোককথায় মানবিক সত্তার পরিসর অনেক বিস্তৃত। কথাসাহিত্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ এবং ব্যক্তিমনের জটিলতাকে সাহিত্যিক নিপুণ দক্ষতায় ফুটিয়ে তোলেন। লোককথায় একটি জাতি, গোষ্ঠী কিংবা সমাজের যৌথ মনোভাবের (Collective emotion) প্রতিফলন ঘটে।

লোককথা বিচার করলে আপাতভাবে মনে হতে পারে লোককথা কতকগুলি

অসংলগ্ন, অবিশ্বাস্য ঘটনা বা ভাবনার বহিঃপ্রকাশ ছাড়া কিছু নয়। প্রকৃতপক্ষে এগুলির কোনটিই পারম্পর্যহীন, অসম্ভব ঘটনা বা ভাবনার সন্নিবেশ নয়। এগুলি লোকমানস সংগঠনেরই প্রতিফলন মাত্র। লোককথা শুধু গল্প বলা নয়, এগুলি দীর্ঘকালের সঞ্চিত লোকমানসের বিশ্বাস ও ভাবনার প্রতিরূপ। লোককথা ব্যক্তি দ্বারা প্রাথমিক অবস্থায় সৃষ্টি হতেই পারে। কিন্তু সেখানে তিনি যৌথমানসিকতারই প্রতিনিধিত্ব করেন। লোককথার চরিত্রগুলির মানসিকতা লোক সমাজের যৌথ-মানসিকতারই অনুরূপ। তাই লোককথার বিশ্লেষণে আমরা লোকসাধারণের মনের গহন প্রদেশের সাক্ষাৎ পাই। সেক্ষেত্রে লোক মানস-সংগঠনটি সম্পর্কে সম্যক ধারণা না থাকলে লোককথার বিশ্লেষণ-অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তাই লোককথায় লোকমনের হদিশ পেতে গেলে মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতিতে লোককথার বিচার অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে।

।। ২ ।।

লোকসংস্কৃতিকে যদি লোকজীবন চর্যা ও চর্চার সম্মিলিত ফসল মনে করি তবে লোসমানসের অনুকণাগুলি প্রকট বা প্রচ্ছন্নভাবে লোকসংস্কৃতির মধ্যে মিশে আছে। মনোবিজ্ঞানী সিগমুণ্ড ফ্রয়েড (১৮৫৬-১৯৩৯) প্রবর্তিত মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতি অবলম্বন করে লোকমানসের সেই গহীন দেশের খোঁজ পাওয়া সম্ভব। ফ্রয়েড ১৯০০ সালে প্রকাশিত 'The interpretation of dreams' গ্রন্থে গ্রীক পুরাণ কথা 'ইডিপাস'কে মনোবিজ্ঞানের সহায়তায় বিশ্লেষণ করলেন। সাহিত্য বিশ্লেষণে মনোসমীক্ষণের শুরু এখান থেকে। মজার বিষয়, মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতির প্রয়োগ প্রথম লোককথা বিশ্লেষণেই দেখা গেল। এরপর কার্ল আব্রাহাম, এরিক ফ্রম, গেজা রহিত, আরনেস্ট জোন্‌স, কার্ল গুস্তাভ য়ুং, জোসেফ ক্যাম্পবেল প্রমুখের সহায়তায় মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতির বিস্তার লাভ ঘটে।

ফ্রয়েড মানবমনকে চেতন (conscious-সুস্পষ্ট চেতনা), আসংজ্ঞান বা প্রাক-চেতন (Pre-conscious) (চেতনার বাইরে কিন্তু চেষ্টা করলেই চেতনালোকে উঠে আসতে পারে), এবং অবচেতন (unconscious) ইচ্ছামতো কখনই চেতনলোকে আনা যায় না) — এই তিনটি স্তরে বিভাজন করেছেন। মানুষের কামনা বাসনা, হিংসা, দ্বেষ, ঈর্ষা ইত্যাদি অবদমিত হয়ে অবচেতন মনে স্থান পায়। এবং সময়বিশেষে তার বিভিন্ন আচরণে কিংবা স্বপ্নের মধ্য দিয়ে নানা প্রতীকায়িত রূপে সেগুলি প্রকাশিত হয়। অবচেতন মনে ভালোবাসার এষণা (Eros) এবং মৃত্যুর বা ধ্বংসের এষণা (Thanatos) —এই দুটি পরস্পরবিরোধী উপাদানেরও উল্লেখ করেছেন ফ্রয়েড। প্রসঙ্গক্রমে তিনি মাতার প্রতি পুত্রের আকর্ষণ সম্পর্কিত ইডিপাস কমপ্লেক্স, পিতার প্রতি কন্যার আকর্ষণজনিত ইলেকট্রা কমপ্লেক্স—এগুলির উল্লেখ ও ব্যাখ্যা করেছেন। ফ্রয়েড 'Totem and Taboo' গ্রন্থে টোটেম, ট্যাবু, অজাচার ভীতি,

সর্বপ্রাণবাদ, ইন্দ্রজাল, চিন্তার সর্বশক্তিমত্তা ইত্যাদি আলোচনা করে লোকমনের অজানা দিকগুলির উল্লেখ করেছেন। কার্ল আব্রাহাম, এরিকফ্রেম কিংবা কার্ল গুস্তাভ য়ুং যৌন প্রতীকের ব্যাখ্যায় লোকমনের অজানা প্রবণতাগুলিকে আলোকিত করেছেন।

তাই লোককথায় বর্ণিত বিভিন্ন প্রতীক ও লোক আচরণ ও মনোভাবের যে পরিচয় মেলে মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতিতে তার অনেকটা গ্রহণযোগ্য বিশ্লেষণ সম্ভব। যদিও মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতিরও কিছু সীমাবদ্ধতা আছে তবুও স্বপ্নের ব্যাখ্যায় এই পদ্ধতির প্রয়োগ অনেকটাই সফল। লোককথাও এর ব্যতিক্রম নয়। কেননা, লোককথাতেও ধরা পড়ে, লোকজীবনের অতৃপ্ত কামনা বাসনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, দ্বেষ-ঈর্ষা ইত্যাদি। কেউ কেউ টাইপ ও মোটিফ ইনডেক্সের উল্লেখ করে বলে থাকেন,— "এই পদ্ধতির মাধ্যমেই কেবল লোকসমাজের মনের গহনের হদিস পাওয়া সম্ভব। এই পদ্ধতিকেই আমার সবচেয়ে মানবিক পদ্ধতি বলে মনে হয়েছে। লোক-ঐতিহ্যের মানসিক-মানবিক অভিপ্রায়ের সন্ধান মেলে এই সমন্বিত পদ্ধতির বিশ্লেষণে।" [১]

টাইপ ও মোটিফ ইনডেক্স পদ্ধতিতে, কোন্ ধরনের লোককথা এবং সেই লোককথার খণ্ড খণ্ড অনুকাহিনীগুলিকে চিহ্নিত করা হয়। ফলে মনের খণ্ড খণ্ড অভিপ্রায়গুলি আমাদের সামনে উপস্থিত হয়। লোক মনের স্পর্শ পাই সেখানে 'ঠিকই',

লোককথায় টাইপ মোটিফ ইনডেক্স পদ্ধতি লোকমনের অবচেতনের সার্বিক ব্যাখ্যা দেয় না। অবচেতন মনের সামগ্রিক ব্যাখ্যার জন্য আমাদের মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হয়। বরং মনে হয় টাইপ মোটিফ ও ইনডেক্স পদ্ধতিকে সঙ্গে নিয়ে মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতির সাহায্যে লোক কথার বিচার বিশ্লেষণ করলে লোকমনের অন্ধকার অংশটির অনেক বেশি পরিমাণে আলোকিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

।। ৩ ।।

লোক সমাজ যৌথ মানসিকতার অভিমুখী বলে লোককথায় প্রতিফলিত লোকমানস-বৈশিষ্ট্যের একটি অভিন্নতা চোখে পড়ে। সেই জন্য লোককথায় কথক বা শ্রোতা গল্প বলে বা শুনে তার মধ্যে নিজেকে আবিষ্কার করে। লোককথা শিশুর জন্য রচিত হলেও শিশুর দ্বারা নির্মিত নয়। ফলে এটি বয়স্কদেরও ইচ্ছে পূরণের আশ্রয়। শ্রোতার সমান্তরালে গল্পকথকও অতীত জীবনকে স্মরণ করে অথবা বর্তমান জীবনের প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করার কিংবা মোকাবিলা করার অবলম্বন খুঁজে পায়।

সেইজন্য লোককথায়, দুর্বলের জয় ও সবলের পরাজয় ঘটে থাকে। লোককথায় স্রষ্টা নিজে সাধারণ এবং বেশিরভাগ সংখ্যক নিরীহ মানুষের পক্ষে। অথচ সমাজে অত্যাচারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম করতে পারেন না তিনি। জঙ্গলে হিংস্র প্রাণীর দ্বারাও নিরীহ পশু অত্যাচারিত। ফলে লোককথার প্রত্যেকটি বিভাগেই সবলকে পরাজিত করে লোকমানস অবদমিত আকাঙ্ক্ষার প্রশমন ঘটাতে চায়। অত্যাচারী

সিংহকে খরগোশ কুয়োয় ফেলে হত্যা করে। রাজাকে কিংবা বিড়ালকে জব্দ করে টুনটুনি। একইভাবে নিরীহ বাবুই, ইঁদুর, প্যাঁচা, বানরের জয় হয়। পরাজিত হয় বাঘ, হাতি সিংহরা। রাজপুত্রের নিকট পরাজিত হয় রাক্ষস-রাক্ষসী। এমনকি 'ঠাকুরমা'র ঝুলি'র দেড় আঙ্গুলেও জয়ী হয়। সুয়োরানীকে পরাজিত করে দুয়োরানীর জয়লাভ ঘটে। বড় বউ- বড় ভাইদের চেয়ে ছোটবউ-ছোট ভাইয়ের সাফল্য লোককথার একটি বিশেষ অভিপ্রায়।

যেখানে বড়ভাই এবং তাদের বউয়েরা কার্যসাধনে ব্যর্থ, সেখানে ছোট-ভাই, ছোট-বউ অসাধ্য সাধন করে। অথবা লোকমানস এভাবেই দেখতে চায়।

একদিকে বাবা-মা ছোটছেলেকে একটু বেশি প্রশ্রয় দেন এবং স্নেহ করেন। বলা হয় কোলের ছেলে। পৃথিবীতে পরে আসার কারণে স্ব-প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা ছোট ছেলের কম। সেজন্য তাকে দুর্বল মনে হয়। দুর্বলের জয় অন্যতম প্রবণতা। এছাড়াও ছোট ছেলের বিবাহ পরে হয়। তার আগেই মাতা-পিতার অন্যান্য ভাই এবং বৌমাদের সম্পর্কে তিক্ত অভিজ্ঞতা ছোটভাই-বউএর প্রতি স্নেহাতিশয্যকে বাড়িয়ে দেয়। পিতা-মাতা কিংবা শ্বশুর-শাশুড়ীর এই পক্ষপাতিত্ব বড়ভাই এবং তাদের বউয়েরা ভালোভাবে মেনে নেয় না। তারা ছোটভাই এবং ছোটবউকে ঈর্ষা করে এবং চক্রান্ত করে তাদের ক্ষতিসাধন করার চেষ্টা করে। যদিও তারা শেষপর্যন্ত ব্যর্থ হয় এবং সাজা পায়।

শিষ্ট সাহিত্যেও শোষিত, অত্যাচারিত মানুষেরই জয় দেখানো হয়। প্রত্যক্ষ না হলেও পরোক্ষে। কিন্তু লোককথায় প্রত্যক্ষভাবে দুর্বলের জয়লাভ ঘটে। শিষ্ট সাহিত্যে পাঠকের ভাবনার অবকাশ থাকে, লেখক সবকিছু বলে দেন না। তাকে বাধ্যতামূলকভাবে শাস্তি দেওয়া হয় এবং তা হল মৃত্যু।

যেহেতু লোককথা লোকসমাজের যৌথমানসিকতার ফল, তাই লোকমানসে সমাজ-বিধিভাবনার বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্ব পায়। সেইজন্য ক্ষুদ্র। অন্যভাবে বলা যায় ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্য ইত্যাদি বিষয়ে লোকসমাজ একই ধারণা পোষণ করে। সেই সূত্রে এই বোধগুলি যেমন ব্যক্তি নিরপেক্ষ নয়, তেমনই এগুলি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা নিয়ে তাদের মত করে তারা বিচার করে এবং সমাজ-অনুশাসনের কথা রেখে কঠোর হয়।

স্বপ্নের মধ্যে অবদমিত আকাঙ্ক্ষা যেমন পূরিত কিংবা প্রশমিত হয়, লোককথাও তেমনই ইচ্ছেপূরণের গল্প। সেইজন্য লোককথাগুলি প্রতিক্ষেত্রে মিলনাত্মক। সিগমুণ্ড ফ্রয়েড অবচেতনের দুটি স্তর লক্ষ্য করেছিলেন, এর প্রথম স্তরে যে ভালোবাসার এষণা (Eros) থাকে তার থেকেই Creative imagination কে অবলম্বন করে ঐ কক্ষেরই দ্বিতীয় স্তরের অবদমিত আবেগের (Repressed Emotions) স্ফূরণ ঘটান লোককথাশিল্পী। যার ফলশ্রুতি লোক কথা। শিষ্ট সাহিত্যেও ইতিবাচকতাকে সাহিত্যে

প্রতিষ্ঠিত করেন সাহিত্যকার। কিন্তু কাহিনীর মিলন সেখানে একমাত্র লক্ষ্য নয়। বিচ্ছেদ কিংবা মৃত্যু দেখিয়েও সাহিত্য-সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন শিষ্ট-সাহিত্যিক। কিন্তু মৃত্যু, পরাজয়, বিচ্ছেদ দেখানো যেখানে লোককথাকারের নিষিদ্ধ তিনি সাহিত্যে তার ব্যতিক্রম ঘটান না। মৃত্যু বা বিচ্ছেদ দেখিয়ে ইতিবাচকতায় উত্তীর্ণ হওয়ার দক্ষতা হয়তো তার নাও থাকতে পারে। অন্যদিকে লোককথার শ্রোতার তা হয়তো ইচ্ছাপূরণের অন্তরায়। তাই লোককথা শিল্পীর সৃষ্টি-সত্তা লোক-মানস বৈশিষ্ট্যের অনুসারী। লোককথা সৃষ্টির পূর্বেই তাঁর মানসিক সংগঠন কাহিনীর শুরু ও মিলন বিন্দু— এই দুটি বিন্দু দিয়ে একটি সরলরৈখিক অবস্থানে বিরাজ করে। এই দুটি বিন্দুকে মেলানোর জন্য, যাবতীয় ঘাত-প্রতিঘাত, প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করা হয় কতকগুলি উপায়ে। যা লোকমানসে দীর্ঘদিন ধরে লালিত বিশ্বাস-সংস্কার। যেমন— সর্বপ্রাণবাদ, ট্যাবু, টোটেম, ইন্দ্রজাল, জাদুবোধ। এগুলি পারস্পরিক আন্ত:সম্পর্কযুক্ত। এগুলি লোকমানসে বিশ্বাস, সংস্কার, আচারপালনে যথাক্রমে সঞ্চিত ও ক্রিয়াশীল থাকে। এগুলির বিশ্লেষণে লোকমানস সংগঠনটির পরিচয় উদ্ঘাটিত হবে। যাইহোক, লোককথার স্রষ্টা, কথক ও শ্রোতা প্রত্যেকেই এটিকে মিলনাত্মক রূপেই দেখতে চায়।

।। ৪ ।।

স্বপ্নের সঙ্গে সবচেয়ে বেশি মিল লক্ষ্য করা যায় রূপকথার সঙ্গে। রূপকথাকে একধরনের স্বপ্নও বলা যায়। স্বপ্নে যেমন কতকগুলি অসংলগ্ন কাহিনীর সন্নিবেশ থাকে রূপকথাতেও তাই। স্বপ্ন এবং রূপকথা দুটি ক্ষেত্রেই অবদমিত কামনা-বাসনার প্রতিফলন চিত্রিত হয়।

বেশির ভাগ রূপকথাতে সন্তানহীনতা একটি অন্যতম অভিপ্রায়। শুধু রূপকথা নয়. বিভিন্ন লোককথাতে এই অভিপ্রায়টি লক্ষ্য করা যায়। অপত্যের মধ্য দিয়ে মানুষ নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে। তাই আপন অস্তিত্বের সংকট ভাবনা প্রকৃতপক্ষে গর্ভাধানকে সুনিশ্চিত করারই প্রয়াস বলা যায়।

রূপকথার রাজার হাতিশালে হাতি, ঘোড়াশালে ঘোড়া। কোন কিছুর অভাব নেই। রানীও অনেক। অথচ রাজার মনে সুখ নেই। কেননা, রাজা নিঃসন্তান। রাজার কোন সন্তান নেই এটা গল্পকথক বা শ্রোতার ভাবতে ভালো লাগে। রাজার ঐশ্বর্যের শেষ নেই। এই ঐশ্বর্য প্রজার থাকা সম্ভব নয়। তাই ঐশ্বর্যে, প্রজা রাজার সঙ্গে পেরে উঠবে না। অথচ প্রজার দারিদ্র্য থাকলেও ঘরে চাঁদের মত ফুটফুটে সন্তান আছে। তার সন্তান আছে অথচ রাজার তা নেই— এটা ভাবতে ভালো লাগে মানুষের। রাজা নিঃসন্তান হওয়ায় সে অসুখী— সাধারণ মানুষ তা কল্পনা করে খুশি হয়। পরক্ষণে আবার নিজের সন্তানের অমঙ্গলের কথা ভেবে রাজাব সন্তান কামনাও করে। তাই লোককথাতেও দেখা যায় কোন অলৌকিক শক্তির সাহায্যে, যেমন গাছের শিকড়, ফুল, ফল বেটে

খেয়ে কিংবা সোনার পাখির মাংস আহার করে, এমনকি সূর্যকিরণে, রানীরা গর্ভবতী হন। লোকমানসের মূল কামনা সন্তানলাভ। সন্তানহীনতা থেকে সন্তানলাভের মধ্যবর্তী পর্যায়টি লোকমানস তার লালিত বিশ্বাস দিয়ে পূরণ করে নিতে চায়। লোককথার বিজোড় সংখ্যাটি লোকমানসে বিশেষভাবে গ্রহণযোগ্য হয়েছে। বিজোড় সংখ্যার পয়মন্তরূপ লোকবিশ্বাসে এমনভাবে গৃহীত, তাদের ধারণা জোড় সংখ্যা তাদের ব্যাক্তিগত জীবনে কোন ক্ষতি করতে পারে। যেমন রাজার রানীর সংখ্যা হতে পারে তিন, পাঁচ, সাত কিংবা নয়। জোড় সংখ্যা থাকলেও শেষপর্যন্ত তার পরিণতি বিজোড়ে। যেমন সুয়োরানী ও দুয়োরানী— দুই রানী। জোড় সংখ্যা। কিন্তু লোককথাটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, দুই রানীর সহাবস্থান নেই বললেই চলে। সুয়োরানীর চক্রান্তে রাজা দুয়োরানীকে প্রাসাদ থেকে দূর করে দেন। গল্পের শেষদিকে রাজা নিজের ভুল বুঝতে পেরে দুয়োরানীকে প্রাসাদে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন এবং সুয়োরানীকে কবর দেন। অর্থাৎ রানীদের যে কোন একজন থাকেন।

একইভাবে লোককথায় সাতফলা ছুরি, সাতফণা সাপ, সাতদিন, সাতরাত সাত সমুদ্র তেরো নদী, তেরো রাত্রি, সাতডাকাত ইত্যাদির প্রসঙ্গ এসেছে। সাত ভাই চম্পার ক্ষেত্রে সন্তান সংখ্যা আট হলেও লিঙ্গগত ভেদে তারা বিজোড় সংখ্যক। অন্যদিকে 'বারোহাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচি' প্রসঙ্গে বলা যায় কাঁকুড়ের মধ্যেই বিচির অবস্থান অর্থাৎ বিচিসহ কাঁকুড়ের অস্তিত্ব। এখন বারো হাত কাঁকুড়ের থেকে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে বারো ও তেরোর যোগফল পঁচিশ, যা একটি বিজোড় সংখ্যা।

লোকমানসে এমন ভাবনা থাকা হয়তো স্বাভাবিক যে, বিজোড় সংখ্যার অধিকারীকে কোন অপশক্তি ক্ষ'ত করতে পারে না। যেহেতু দুই দ্বারা সংখ্যাটি বিভাজ্য নয় তাই সংখ্যাবাচক বস্তু বা ব্যক্তির মধ্যে সহজে প্রবেশ করা যায় না। অবশ্য রূপকথায় উপকারী পাখিগুলি কিন্তু জোড়ায় জোড়ায় উপস্থিত— ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমী, শুক-সারী, ক্ষেমা-ক্ষেমী। বোধহয় তাদের ক্ষমতা বেশি বলে তাদের বিপদের পূর্বাভাস নিয়ে লোকমানস ভাববার প্রয়োজন মনে করেনি।

একটি বিস্তৃত ভৌগোলিক পরিসরে রূপকথার কাহিনী বিন্যাস। রাজপুত্রের একস্থান থেকে অন্যস্থানে যেতে অনেক সময় লাগার কথা। ঘোড়া বাহন হিসেবে দ্রুতশীল। কিন্তু দুর্গম রাস্তা হলে ঘোড়াও যেতে পারে না। অথচ আকাশ পথ নিষ্কণ্টক। লোকমানসের কল্পনা যেমন সুদূরপ্রসারী এবং গতিশীল ঠিক তেমনি। তাই তারা ঘোড়ার পিঠে ডানা দিয়ে তৈরি করল পক্ষী যা পিঠে করে নিয়ে যায়। এইভাবে যাতায়াতের প্রতিবন্ধকতাকে লোকমানস কল্পনা দিয়ে জয় করেছে। অন্যদেশের পরীকথার মধ্যে নারীর পিঠে ডানা কল্পনায় একই মনস্তত্ত্ব কাজ করেছে। প্রাকৃতিক ও জড়জগতের সমস্ত বস্তু, প্রাণী, উদ্ভিদ, এমনকি নিসর্গ জগতের সবকিছুর উপর চেতনা ও ব্যক্তিত্ব আরোপ করে লোকমানস। একেই সর্বপ্রাণবাদ (animism) বলে।

লোকমানস বিশ্বাস করে মানুষের মধ্যে যেমন আত্মা থাকে, তেমনই, প্রাণী, উদ্ভিদ, জড়বস্তুর মধ্যেও আত্মা বর্তমান। এই আত্মা একদেহ ছেড়ে অন্যদেহে প্রবেশ করতে পারে। এর থেকেই Transformation বা রূপান্তরের ধারণাটি গড়ে উঠেছে। ফলে লোককথায় পশু, পাখি, সরীসৃপ, উদ্ভিদের রূপ ধারণ করে মানুষ, সেই ঘটনা লোকমানসের বিশ্বাসমতে অলৌকিক নয়, স্বাভাবিক। এবং এরা যে মানুষের মত কথা বলে, আচরণ করে তাও অস্বাভাবিক নয়।

আত্মা দেহ ছেড়ে অন্যত্রও থাকতে পারে। যে নিরাপদ স্থানে আত্মাকে রাখা হয় সেই স্থানটিকেও টোটেম বলে। এই বিশ্বাস আছে বলেই রূপকথাগুলিতে দেখা যায় রাক্ষসের প্রাণ অন্যত্র লুকানো থাকে। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের 'ঠাকুমার ঝুলি' গ্রন্থের 'নীলকমল আর লালকমল' গল্পের রাক্ষস ও রাক্ষসীর প্রাণ লুকানো ছিল সোনার কৌটায় কুয়োতে রাখা ভীমরুল আর ভীমরুলীর মধ্যে। কখনও ভ্রমর, শুকপাখি কিংবা সাপের মধ্যেও রাক্ষসের প্রাণ লুকানো থাকে। 'ডালিম কুমার' গল্পে ডালিমকুমারের প্রাণ লুকানো ছিল ডালিমের বীজে। সিঁড়ির মধ্যে কিংবা সোনার হারেতেও অনেক সময় নায়কের প্রাণ লুকানো থাকে।

অর্থাৎ সর্বপ্রাণবাদ হল একটি বিশ্বাস যা দীর্ঘদিন ধরে লালন করে চলেছে লোকমানস। সেই চিন্তাধারারই একটি দিক হল ম্যাজিক (Magic), যা লোকমনস্তত্ত্বেরই একটি দিক। শত্রুকে ঘায়েল করার জন্য লোককথায় হোমিওপ্যাথিক ম্যাজিকের ব্যবহার বহুবার দেখা যায়। রাক্ষসের প্রাণ ভীমরুল, ভ্রমর সিংবা সাতকন্যা সাপরূপে অন্যত্র থাকে— জীবগুলির অবয়ব রাক্ষসের অবয়বের অনুরূপ হয়ে ওঠে। ভ্রমরের ডানা আর রাক্ষসের হাত এক হয়ে যায়। ভ্রমরের ডানা কাটলে রাক্ষসের হাত কাটা পড়ে। ভ্রমরের গলা কাটলে রাক্ষসেরও গলা কাটা যায়। শুধু তাই নয়, ভ্রমরকে স্পর্শ করা মাত্র রাক্ষসের মাথা ঘুরতে থাকে। অর্থাৎ লোকবিশ্বাস শত্রুর অনুকরণে কোনকিছু সৃষ্টি করে ইচ্ছাশক্তির উপর নির্ভর করে ওই অনুকৃত বস্তুর উপর যেমন ক্রিয়া করা যায়, শত্রুর দেহেও সেই ক্রিয়ার ফল বলবৎ হয়। ভক্তি না থাকলে অবশ্য ফললাভ ঘটে না।

নায়কের সঙ্গে রাক্ষস-রাক্ষসীর প্রত্যক্ষ যুদ্ধ হয় না। লোকমানস প্রত্যক্ষ যুদ্ধে যেতেও চায় না। বাস্তবে অত্যাচারিত, শোষিতের যে ক্ষোভ, কষ্ট তা শত্রুপক্ষকে তিলে তিলে হত্যা করে প্রশমিত হতে চায়। প্রত্যক্ষ যুদ্ধে জয়লাভের নিশ্চয়তা সম্পূর্ণরূপে থাকে না এবং যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ায় শত্রুর মৃত্যুচিত্র দেখবার সুযোগও কম থাকে। তাই রাক্ষসের একে একে হাত, পা, মাথা কেটে নেওয়ার মধ্য দিয়ে এবং তা পরোক্ষভাবে— এর মধ্যে যে মজা, সেটাকে লোকমানস তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করে।

আর. ক্লেইনপল (R. kleinpaul) তাঁর 'The Living and the dead in Folk-

lore, Religion and Myth' (1898) গ্রন্থে জীবিত ও মৃতদের সম্পর্কে লিখেছেন, জীবিত মানুষের রক্ত শোষণের জন্য মৃতেরা সদাসচেষ্ট। এর থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য মানুষ মৃত ব্যক্তিকে দ্বীপে কিংবা নদীর ওপারে কবর দেয়। মাঝে আছে জলের ব্যবধান। এভাবেই 'এপার' (here) এবং 'ওপার' (beyond) -কথা দুটির উদ্ভব হয়েছে। রূপকথাতেও দেখি রাজাপুত্র, রাজকন্যাকে রাক্ষসের কবলমুক্ত করার জন্য সাতসমুদ্র তেরোনদী পেরিয়ে চলেছেন। রূপকথার রাজ্য কল্পনার, স্বপ্নের, মেনে নিযেও বলা যায় 'সাতসমুদ্র- তেরোনদী' প্রকৃতপক্ষে 'এপার' ও 'ওপারের' মধ্যবর্তী পরিসর। কেননা, দৈত্য-দানব, রাক্ষস-রাক্ষসী এখানে মৃত ব্যক্তির আত্মা ছাড়া কিছু নয়। লোকবিশ্বাস, এই মৃত ব্যক্তি জীবিতদের নিজেদের দিকে টানে। তাই যে ছিল একান্ত আপন, মৃত্যুর পর সে দানব হয়ে যায়। এবং বলে— 'হাঁও, মাঁও, খাঁও, মাঁনুষের গঁন্ধ পাঁও।' জীবিত ব্যক্তির মৃত্যুভয়, মৃত ব্যক্তির প্রতি তার ক্রুদ্ধ আবেগের সম্মিলিত রূপে গড়ে ওঠে দৈত্য বা রাক্ষস। অথবা নিজেরই অবদমিত দুষ্ট ইচ্ছেগুলো দৈত্য-দানব রূপে গড়ে ওঠে। দৈত্যের বা রাক্ষসের মৃত্যু তাই আপন মনের অবদমিত ক্রোধের প্রশমন ছাড়া কিছু নয়। তাই রূপকথাগুলি অবচেতন মনের যেমন বহিঃপ্রকাশ, তেমনই রূপকথা বলা বা শোনার মধ্য দিয়েও লোকমানস অবদমিত ভাবের মোক্ষন ঘটায়। রাজপুত্র, মন্ত্রীপুত্র, সওদাগর পুত্র ও কোটালপুত্র— এই চারবন্ধু দেশান্তরী হল। পথে রাক্ষসী রাজপুত্র ছাড়া সকলকে খেয়ে ফেলল। একটি আমগাছ রাজপুত্রকে রক্ষা করল। এক দেশের রাজা ওই সুন্দরী নারীরূপী রাক্ষসীকে বিয়ে করল। রাক্ষসী রাজপুত্রকে খেতে চায়। হাড়মুড়মুড়ী রোগ হওয়ার অভিনয় করল। ওই আমগাছের তক্তা চাইল। আমগাছ রাজপুত্রকে আম তৈরি করে পুকুরে ফেলল। সেই আম বোয়ালের পেটে গেল। বোয়াল রাজপুত্রকে বাঁচাতে শামুক করে দিল। হাসনসখীর স্পর্শে শামুক পুনরায় রাজপুত্র হল। রানীর আদেশে রাজপুত্রকে ধরে আনা হল এবং কিছু তাকে দুর্লভ জিনিস আনতে বলা হল। রাজপুত্র রূপকথার রাজ্যে গেল। রাক্ষসকে মেরে রাজকন্যাকে নিয়ে এল। রাজার কাছে ফিরে রানীর রাক্ষসীরূপ সকলকে দেখিয়ে দিল এবং তিনবন্ধুকে ফিরিয়ে রাক্ষসীকে বধ করল।

('সোনার কাটি রূপার কাটি'— ঠাকুমার ঝুলি, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ১৪১২ পৃ : ১৫৯-১৭৪)

গল্পটিতে আমগাছ, বোয়ালমাছ, শামুক এবং হাসন সখী রাজপুত্রকে সহায়তা করে। লোকবিশ্বাস অনুযায়ী আত্মা এক বস্তু থেকে অন্য বস্তুতে যেমন যেতে পারে তেমনই এর অবস্থান জল স্থল অন্তরীক্ষে। লোককথাটিতেও আমরা দেখি, প্রথমে আমগাছের গুঁড়িতে রাজপুত্রের স্থান হয় অর্থাৎ অন্তরীক্ষে। সবশেষে জলে শামুকরূপে। মূললক্ষ্য কিন্তু আত্মরক্ষা। তাকে সুনিশ্চিত করার জন্য লোকমানস তার বিশ্বাসমত লোককথার নায়ককে রক্ষা করে। টোটেম তার গোষ্ঠীকে রক্ষা করে। এখানে আমগাছ আম,

বোয়ালমাছ কিংবা শামুক কোন গোষ্ঠীর টোটেম হতে পারে। এছাড়াও লোককথাটিতে পরবর্তীকালে কোন কথকের দ্বারা অতিরিক্ত কাহিনী যুক্ত হয়ে টোটেমকে সহযোগী রূপে দেখার জন্য এর ব্যবহার ঘটালে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই।

আদিম মানুষ তাদের শত্রুদের বধ করার সময় খুব নিষ্ঠুর ব্যবহার করে এমনটাও কিন্তু সবসময় হয় না। বরং নিষ্ঠার সঙ্গে, কৃচ্ছ্রসাধনের মাধ্যমে, ট্যাবু মেনে শত্রুকে হত্যা করা হয়। এই লোককথাটিতেও দেখি— রাক্ষসকে হত্যা করার জন্য রাজপুত্র পুকুরের স্ফটিকস্তম্ভ ভেঙে সাতফণা সাপকে বুকের উপর রেখে তালপত্র খাঁড়া দিয়ে সাপের গলা কাটল। এক ফোঁটা রক্তও মাটিতে পড়ল না। এই নিষ্ঠা আসলে নিজের পাপস্খলনের উপায়। ওই অপশক্তির কোনরূপ অভিশাপ যেন বধকারীকে স্পর্শ করতে না পারে তারই এক বিশ্বাস-সঞ্জাত প্রচেষ্টা হল এই আচারপালনের অন্যতম অভিপ্রায়। লোককথার মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন হিসেবে পশুকথাকে চিহ্নিত করা হয়। টোটেম বিশ্বাসের ধারণায় লোকমানস ভাবত পশু, পাখি বা উদ্ভিদ থেকেই মানুষের জন্ম। তাই পশুর সঙ্গে সমপ্রাণতা অনুভব করা লোকমানসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সেইজন্য পশুর মধ্যে মানবিক গুণগুলি আরোপিত হওয়ায় পশু, মানুষের মত কথা বলে। অত্যাচারী মানুষকে পশুর মধ্যে আরোপ করে লোককথায় ওই পশুর পরাজয় দেখানো হয়। অন্যভাবে যে প্রাণী দ্বারা মানুষের জীবন সংশয় হয় না তার জয়লাভ দেখানো হয়। যদি এর ব্যতিক্রম ঘটে তাহলে বুঝতে হবে ওই প্রাণীটি কোন গোষ্ঠীর টোটেম রূপে বিবেচিত। অনেকসময় পশুর স্বভাববৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ করে তার মধ্যে মানবিক গুণগুলির আরোপ করা হয়। যেমন শেয়াল চতুরতার প্রতীক, কিংবা- ভালুক বোকা।

দীর্ঘদিন পর্যন্ত মানুষ বিশ্বাস করেছে, কোন পশু, পাখি, উদ্ভিদ, বস্তু বা প্রস্তর— এগুলি গর্ভে প্রবেশের ফলে মনুষ্য সৃষ্টি হয়। স্বামী-স্ত্রীর স্বাভাবিক যৌনক্রিয়ায় গর্ভাধান ঘটে এই ধারণা ছিল না। ফলে 'ঠাকুমার ঝুলি'র 'কলাবতী রাজকন্যা' গল্পে মানুষের পেটে বানর— বুদ্ধু এবং পেঁচা-ভুতুম্ জন্মালে লোক মানস তা মেনে নেয়। অথচ 'কিরণমালা' [২] গল্পে একই ভাবনায় দুই বোন, ছোট বোনের আসল সন্তানদের জলে ভাসিয়ে পরিবর্তে কুকুরের ছানা, বিড়াল ছানা আর কাঠপুতুল নিয়ে রাজাকে দেখালে রাজা তা বিশ্বাস করেন। কেননা, এই বিশ্বাস প্রচলিত। অথচ মোহরের পায়েস, মোতির পিঠা ইত্যাদি যেমন খাওয়া যায় না, তেমনই মানুষের পেটে বিড়ালছানা, কুকুরছানা, কাঠপুতুলও হয় না। এই যুক্তি খুঁজে পাই, তখন মনে হয় গল্পটি অনেক আধুনিক প্রচলিত বিশ্বাসকে যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করার লোককথা এটি।

।। ৭ ।।

টোটেম ধারণায় একই টোটেম যুক্ত নরনারী পরস্পর যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হতে পারে না। একে অজাচার বলে। আদিম জাতির মধ্যে এই অজাচার রোধ করার জন্য কঠোর নিয়ম পালন করা হয়। পুরুষতান্ত্রিক কিংবা মাতৃতান্ত্রিক যে সমাজই হোক, ভাই-বোনের টোটেম একই। ফলে তাদের পারস্পরিক যৌনাচার অজাচার সম্পর্কীয় এবং তা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। ভাই বোনোর সম্পর্কের এই যে বিধি নিষেধ তা ভাঙার মধ্যেও অদ্ভুত এক আনন্দ আছে। তাই অবচেতনে এই সুপ্ত কামনা রয়ে যায়। লোক কথায় সেই অবদমনের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। সেই রকম একটি গল্পের নাম হল 'চম্পা'।[৩] পাঁচ ভাই। এক বোন। বোনের নাম চাঁপা। শাক কাটতে কাটতে একদিন বোনের আঙুল কেটে শাকে রক্ত লেগে যায়। ভায়েদের শাক খেয়ে খুব ভালো লাগে। চাঁপার বিয়ের পর ভাইয়েরা তাকে শ্বশুরবাড়ি নিয়ে যাবার পথে মেরে ফেলে। তাকে টুকরো টুকরো করে খেয়ে ফেলে। ছোট ভাই কিন্তু বোনের মাংস না খেয়ে মাটিতে পুঁতে দেয়। সেখানে একটি পদ্মফুল হয়। শ্বশুর আসে। আসল ঘটনা জানাজানি হয়। চাঁপা প্রাণ ফিরে পায়। বাকি চারজন ভাইকে পাযাণ করে দেওয়া হয়।

গল্পটিতে স্পষ্টতই বোনের প্রতি চারভাইয়ের কামনা ও তার ক্রিয়াশীলতা প্রকাশিত হয়েছে। গল্পটি রূপকের মধ্য দিয়ে রচিত হলেও মূল অভিপ্রায়টি বুঝতে কোন অসুবিধা হয়নি। লোককথাগুলি এইভাবে অবদমিত লোকমনের জীবন্ত দলিল হয়ে উঠেছে।

অনেক লোককথায় বোকা জামাইয়ের গল্প বেশ পরিহাসমুখর হয়ে ওঠে। জামাইয়ের বোকামিকে বড় করে হাস্য-পরিহাসের মধ্যে লুকিয়ে আছে শাশুড়ী-জামাই সম্পর্কে জটিল মনস্তত্ত্ব। স্যার জে. লাবকের ব্যাখ্যায়, যতদিন পর্যন্ত পুরুষ, নারীকে হরণ করে বিবাহ করেছে ততদিন পর্যন্ত মেয়ের বাবা-মায়ের ক্রোধ প্রবল ছিল হরণকারীদের প্রতি। পরে বিষয়টি অনানুষ্ঠানিক হয়ে যাওয়ায় ক্রোধ পরিণত হয় পরিহাসে। অন্যদিকে শাশুড়ী মেয়ের অধিকার ছাড়তে চায়না, জামাইও স্ত্রীর উপর শাশুড়ীর প্রভুত্বকে স্বীকার করে না। আবার যৌবনবতী স্ত্রীর ভবিষ্যরূপ বিগত যৌবনা শাশুড়ীর মধ্যে প্রত্যক্ষ করে জামাই পীড়িত বোধ করে। অন্যদিকে পারস্পরিক অজাচারভীতি উভয়ের মধ্যে Avoidance এর সম্পর্ক গড়ে তোলে। ফলে মনস্তাত্ত্বিক কারণেই শাশুড়ী-জামাই বিষয়ক গল্পগুলি একটি নির্দিষ্ট নিয়মে বাঁধা। বোকা জামাইকে পরিহাস করে একদিন যেমন শাশুড়ীর কন্যার প্রতি অধিকারকে প্রতিষ্ঠা দেবার ইচ্ছা, অন্যদিকে অবদমিত কামনার পথ থেকে সরে আসা— এই বোধগুলি কাজ করে লোকমানসে।

।। ৮ ।।

লোককথাগুলিতে, লোকমানসে সঞ্চিত যৌন মানসিকতাগুলি বিভিন্ন প্রতীকের মাধ্যমে উদ্ভাসিত হয়েছে। প্রতীকগুলির বিশ্লেষণে লোকমনের যৌন মানসিকতার প্রবণতা সুস্পষ্ট হয়।

আশুতোষ ভট্টাচার্য সংগৃহীত লোককথাগুলির মধ্যে 'মধুমালা' [৪] গল্পের রাজা আঁটকুড়ো। তার মুখ দেখলে অযাত্রা। ঝাড়ুদারও এই কথা বলে। ছদ্মবেশী রাজার কানে একথা গেলে মনের দুঃখে রাজা কবাটে খিল দিলেন। এরপর বলা হয়েছে— "রাজ্যে রাজা থেকেও নেই। পানের বাটায় পান রইল পড়ে, সোনার গাড়ুতে জল ঝরল না....।"

এখানে পান, স্ত্রী জননাঙ্গের প্রতীক। সোনারগাড়ু—পুং জননেন্দ্রিয়ের প্রতীক। শুধু তাই নয়, সোনার উল্লেখ করে রাজাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। গাড়ুতে জল ঝরল না বলে রাজার যৌন-অপারগতার দিকটিই চিহ্নিত হয়েছে। আশুতোষ ভট্টাচার্য সংগৃহীত 'ডালিমকুমার'[৫] গল্পে নিঃসন্তান সুয়োরানীকে এক ফকির শিকড় দিলেন এবং তা ডালিম ফুলের সঙ্গে শিলে বেটে খেতে বললেন। গাছের শিকড় বা কন্দ পুংজননেন্দ্রিয়ের প্রতীকায়িত রূপ, অন্যদিকে ফুল নারীর। একইভাবে শিল-নোড়া এবং বাটা— এ সবকিছুই সঙ্গমের উপাদান ও প্রক্রিয়ারই অনুসারী।

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার সংকলিত 'ঠাকুমার ঝুলি' গ্রন্থে 'দেড় আঙ্গুলে' গল্পে এক কাঠুরিয়ার ছেলে হয় না। কাঠুরিয়ার স্ত্রী মা ষষ্ঠীর ব্রত করলেন সন্তান কামনায়। ষষ্ঠী সন্তুষ্ট হয়ে স্বপ্নে দেখা দিয়ে কাঠুরিয়ার স্ত্রীকে বললেন,

'তেল সিঁদুরে না'বি ধুবি, শশা পা'বি শশা খা'বি।
কোলে পাবি সোনার পুত্র বুক জুড়ানো মানিকটুক্।'[৬]

সিঁদুর এখানে বিবাহিত জীবনের প্রতীক। আগে বিবাহিত জীবনকে নিশ্চিত করা হয়েছে। পরে 'শশা'র উল্লেখ করা হয়েছে। যা পুরুষাঙ্গের প্রতীক। জীতাষ্টমি ব্রতকথাতেও নারীর শশা খাওয়ার চল্ আছে। অনুকরণাত্মক জাদুবিশ্বাসে এভাবেই আপন কামনাকে চরিতার্থ করতে ঠিক পরেই লোককথাকার পরের বাক্যটিতে লিখেছেন— "কাঁচা পোয়াতীর ঘুম ভাঙ্গে নাই, কাক পক্ষী মাটি ছোঁয় নাই, ভোর জোছনায়, ষষ্ঠীমা'র ঘাটে নাইয়া ধুইয়া ডুব দিয়া আসিল।" বাক্যটিতে কাঁচা পোয়াতী শব্দটির উল্লেখে কাঠুরিয়ার স্ত্রীর নিশ্চিত গর্ভাধানের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।

'ঠাকু'মার ঝুলি'র 'কিরণমালা' গল্পের ছোট রানীর তিন সন্তান— দুই পুত্র, এক কন্যা। নিজের মায়ের পেটের দুই বোনের চক্রান্তে ছোটরানীর দুইপুত্র ও এক কন্যাকে জলে ভাসিয়ে দিয়ে রাজাকে কুকুরের ছানা, বিড়ালের ছানা ও একটি কাঠের পুতুল দেখানো হয়। গল্পটিতে দুই পুত্রকে চাঁদের সঙ্গে এবং কন্যাটিকে ফুলের সঙ্গে তুলনা

করা হয়েছে। ভগ্ন চাঁদের সূচালো দিকের কথা মনে করে চাঁদকে অনেকসময় লিঙ্গের সঙ্গে সমীকৃত করা হয়। নারীর সঙ্গে ফুলের উপমা স্বাভাবিক। ফুল থেকেই ফল হয়, ফলের মধ্যে থাকে বীজ। বীজ থেকে অঙ্কুরিত হয়ে আত্মপ্রকাশ ঘটে চারাগাছের। কন্যাও মাতার ভবিষ্য গল্পটিতে আর একটি বিষয় লক্ষণীয়। কুকুরছানা, বিড়াল ছানার নারী-পুরুষভেদ বাইরে থেকে দেখে করা সম্ভব নয়। তাই দুই ছেলেকেই কুকুর ও বিড়াল ছানা করা হয়েছে। কিন্তু কন্যাকে আলাদা করে চিহ্নিত করা প্রয়োজন বলেই কাঠের মেয়ে পুতুল বানানো হয়েছে। লিঙ্গভেদের স্পষ্টতার প্রবণতাটি এখানে ভেবে দেখার।

আশুতোষ ভট্টাচার্য সংগৃহীত 'ডালিমকুমার'[৭] গল্পে, ডালিমকুমারের প্রাণটি একটি সোনার হারে নিহিত ছিল। দুয়োরানী সেই সোনার হারটি গলায় পরে নিলে ডালিম কুমারের মৃত্যু ঘটে। দুয়োরানী গলা থেকে হার খুললে ডালিমকুমার জেগে ওঠে। দুয়োরানী রাত্রিবেলা গলার হার খুলে শয়ন করে। তখন ডালিমকুমার প্রাণ ফিরে পায়। মনে হয়, এখানেও লোকমানসের যৌনচেতনা প্রতীকায়িত হয়ে উঠেছে কাহিনীবিন্যাসে। দুয়োরানী রাত্রিবেলাতেও হারটি গলায় পরে শুতে পারতেন। তিনি তা করেন না। কারণ, ওই হার ডালিমকুমারের অস্তিত্ব ছাড়া কিছুই নয়। রাত্রি, যৌনক্রিয়ার সময়, সেখানে বিমাতার অজাচারভীতি কাজ করে। অন্যদিকে দুয়োরানী গলার হার খুলে শুতে বাধ্য। কেননা, ডালিম কুমারের সঙ্গে বিধাতা-পুরুষের ভগিনীর মেয়ের বিবাহ হবে। বিবাহ হলে মিলন প্রয়োজন। রাত্রি সেই মিলনের সময় এবং তখন ডালিমকুমারকে জীবন্ত হতে হবে। তাই একদিকে বিমাতার অজাচার ভীতি, অন্যদিকে রাত্রিতে স্ত্রীর সঙ্গে মিলনের সুযোগ— এই দুটি দিককেই আলোকিত করে সোনার হারটি যা ডালিমকুমারের প্রাণস্বরূপ, আগাগোড়া যৌনতার একটি আবহ নির্মাণ করেছে।

আশুতোষ ভট্টাচার্য সংগৃহীত 'মাছের মুড়া'[৮] নামের লোককথায় নারীর অবদমিত কামনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। বিধবা মা, ছেলে-বউ শাশুড়ী বৌমাকে সে কথা জানিয়ে রাখে। একদিন বাড়িতে মাছ রান্না হলে শাশুড়ী বলে— 'বৌ- গো, তোমাকে বলিয়াছিলাম মনে আছে?' কিন্তু বৌমা শাশুড়ীকে মাছের মুড়ো দিল না। ছেলে পরে স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করল, শুনে ছেলে মাকে বনবাসে দিল। মা ছেলের মঙ্গল কামনা করল। মাকে ফিরিয়ে নিয়ে এল এবং বউকে কবর দিল। মাছ হল আমিষ। সে খাবার সধবার, বিধবার নয়। অতএব মাছের মুড়ো খাবার ইচ্ছায় শাশুড়ী যেন সধবা হতে চায়। সেক্ষেত্রে বিধবাকে বিবাহ করতে হয়। অন্যদিকে মাছ যদি লিঙ্গের অনুষঙ্গ হয় তাহলে শাশুড়ীর বিবাহ-ইচ্ছা স্বাভাবিক। ফলে মাছ বিবাহের অনুষঙ্গ না হয়ে পারে না।

লোকসমাজ সংহত সমাজ। এরা সহজ সরল, কিন্তু নানান বিশ্বাস-সংস্কার দ্বারা পরিচালিত। লোকসমাজ যৌথমানসিকতা দ্বারা চালিত হয়। সেজন্য ব্যক্তিমানস

প্রকৃতপক্ষে যৌথ মানসিকতারই গঠনগত একক। ফলে লোককথায় প্রতিফলিত লোকমানস চর্চায় সামগ্রিকভাবে অনেকটাই লোকমনের সন্ধান পাওয়া যায়। স্বাভাবিকভাবে এই মানস-বৈশিষ্ট্য চর্চা কিছুক্ষেত্রে একই রকম এবং বৈচিত্রহীন। তবুও এর মধ্যেই ধরা পড়ে লোকমনের কামনা-বাসনা, লোভ লালসা, ঈর্ষা-ক্রোধ, প্রেম যৌনতা, নানারকমের বিশ্বাসভাবনা। শাশুড়ী হয়তো বউকে দেখতে পারে না, বৌমাকে সাপ কেটে খাওয়ায়। সাপ খেতে খেতে বৌমা একদিন সাপ হয়ে যায়। ভাজ চক্রান্ত করে ননদকে জলে ডুবিয়ে দেয়। দাসী লুকিয়ে বাছুরের মাংস আহার করে। ব্রতের মাধ্যমেও হয়, লোককথা আসলে লোকমনের নির্মল দর্পণ। মানুষের মনকে দেখা যায় না। কিন্তু লোককথা এমন একটি মাধ্যম যার মধ্য দিয়ে লোকমানস তার অবদমিত ভাবনাগুলিকে অকপটভাবে প্রকাশ করেছে এর মধ্যে। বলতে দ্বিধা নেই লোককথা হল মনের প্রতিবিম্বন।

তথ্য নির্দেশ :

১। 'বাংলা লোককথার টাইপ ও মোটিফ ইনডেক্স'— দিব্যজ্যোতি মজুমদার, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০০৫, পৃ· ২১

২। 'কিরণমালা'— 'ঠাকুমার ঝুলি'— বাঙ্গালার রূপকথা' শ্রী দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ১৪১২, পৃ:৯৫-১১৬

৩। 'চম্পা'— 'বাংলার লোক-সাহিত্য' চতুর্থ খণ্ড : কথা' আশুতোষ ভট্টাচার্য, ক্যালকাটা বুক হাউস, পৃ: ৬৫৯-৬৬০

৪। ঐ, পৃ· ৬৭-৭১

৫। ঐ, পৃ ৬১-৬৫

৬। 'দেড় আঙ্গুলে' 'ঠাকু'মার ঝুলি'— শ্রী দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, পৃ. ২০৯

৭। 'ডালিমকুমার' 'বাংলার লোকসাহিত্য' চতুর্থ খণ্ড. কথা', আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃ ৬১-৬৫

৮। ঐ পৃ: ৫৬৭-৫৬৮

প্রপের রূপতাত্ত্বিক সংগঠনবাদ

নারায়ণ হালদার

সংগঠনবাদের আদি প্রবর্তন হলেন ভলাদিমির প্রপ। সংগঠনবাদ সম্পর্কে উমবার্তো একো বলেন : "Saussure + Levi-Strauss + Hjelmslev + Propp had drawn up the method, which tried to be integral one, that is known as structuralism."

সেন্ট পিটারসবার্গ জার্মান পরিবারে প্রপের জন্ম ১৭ই এপ্রিল ১৮৭৫ (মতান্তরে ২৯শে এপ্রিল)। ১৯১৪-১৯১৮ সাল পর্যন্ত তিনি পিটারসবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে রাশিয়ান ও জার্মান ভাষাতত্ত্ব পাঠ করেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়েই তাঁর কর্মজীবনের শুরু। ভাষাতত্ত্ব বিভাগের লেকচারাররূপে ১৯৩২ তাঁর কাজ শুরু। ১৯৩৮ সালে তিনি প্রফেসর হন। ১৯৬৪ সাল থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এই বিভাগের প্রধানরূপে কাজ করেন। তাঁর মূল কাজটি ইংরেজিতে ১৯৫৮ সালে অনূদিত হওয়ার আগে পর্যন্ত পশ্চিমি দুনিয়া তাঁর তত্ত্ব সম্পর্কে নীরব ছিল। ১৯৩৮ সালের পর থেকে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিকে ভাষাবিজ্ঞানের থেকে লোকসংস্কৃতির দিকে পরিবর্তিত করেন। মৃত্যু পর্যন্ত (১৯৭০ সালের ২২শে আগষ্ট) তিনি লোকসংস্কৃতি বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন। তিনিই মূলত রাশিয়ান সাংগঠনিক দৃষ্টিভঙ্গিকে (Russian Formalist approach) বর্ণনামূলক গঠনবাদের (Narrative Structure) দিকে নিয়ে যান।

প্রপ লোকসংস্কৃতি ও ব্যাখ্যানতত্ত্বের প্রাথমিক চারটি গ্রন্থ রচনা করেন : ১. Morphologya Skazki or Morphology of the Folktale (1928), ২. The Historical Roots of Fairy- Tale (1946), ৩. Russkii Geroicheskii Epos or Russian Heroic Epics (1958), এবং ৪. Russkie agrarnye prazdniki of Russian Agrarian Feast-days (1963), এছাড়াও তিনি লেখেন : ৫. Theory of Literature (1965), ৬. Theory and History of Folklore (1984)।

বিভিন্ন বিদ্যাশৃঙ্খলার সমন্বয়ে প্রপের রূপতাত্ত্বিক সংগঠনবাদটি গড়ে উঠেছে। তাঁর তত্ত্বের মূলে আছে বর্ণনামূলক ও রূপান্তরমূলক সৃজনমূলক ভাষাবিজ্ঞানের ধারণা, জীববিদ্যার বিভিন্ন এককের বিন্যাস রীতি, গণিতের সাংকেতিক সূত্রের সমন্বয়। এই তত্ত্বের মাধ্যমে তিনি সামগ্রিকের মধ্যে মূল সমধর্মিতা খুঁজেছেন।

প্রপ রাশিয়ান লোককথার আন্তঃগঠন ও বাহ্য ঘটনার সাধর্মের ভিত্তিতে তাঁর রূপতাত্ত্বিক সংগঠনবাদটি গড়ে তুলেছেন। তবে তিনি ভাষাবিজ্ঞানের নির্মোহ দৃষ্টিতে লোককথাকে বিচার করেছেন। তাই তিনি লোককথার সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও

তাৎক্ষণিক সুর, ছন্দ, তাল, কথনরীতি, অর্থতত্ত্ব, নৃতত্ত্বের গুরুত্বকে উপেক্ষা করেছেন। সমালোচকের ভাষায় বলা যায় : Propp ignores verbal aspects of folk tale, such as tone, rhythm, time and mood of narration; investigating tales he works with the texts rather than with voices, tha' is why his works were more prolific for semiology and anthropology than for phonetics.

রাসায়নিক সংগঠন বিশ্লেষণের মতো তিনি লোককথার আন্তঃগঠনকে বিশ্লেষণ করেছেন। ভাষাবিজ্ঞানে যেমন করে একটি বাক্যের বিভিন্ন এককের স্বরূপ নির্ণয়ের মধ্য দিয়ে সমগ্র বাক্যের পূর্ণাঙ্গ ধারণা গড়ে ওঠে তেমনি লোককথাগুলোরও বিভিন্ন ঘটনাংশের সমন্বয়ে গল্পটি তৈরি হয়। প্রপ বলেন উদ্ভিদবিদ্যায় যেমন করে গাছের বিভিন্ন শাখাপ্রশাখা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিশ্লেষণের মাধ্যমে সমগ্র গাছের ধারণা পাওয়া যায় তেমনি লোককথার বিভিন্ন ক্রিয়াশীলতাকে বিশ্লেষণ করে সামগ্রিক লোককথার রূপতাত্ত্বিক সংগঠনের স্বরূপ উদঘাটন করা সম্ভব। "The work 'morphology' means the study of forms. In Botany, the term 'morphology' means the study of the component parts of a plant, of their relationship to each other and to the whole-in other words, the study of a plant's structure."

প্রপের মতে একটি লোককথা বহু ঘটনাংশের সমন্বয়ে গঠিত। আর গল্পের প্রতিটি ঘটনাংশ হল এক একটি ক্রিয়াশীলতা। বিভিন্ন কথায় এই ক্রিয়াশীলতাগুলোর বাহ্যরূপের পরিবর্তন হলেও আন্তঃস্বরূপে তা অভিন্ন। প্রপ লোককথার ক্রিয়াশীলতার এই অভিন্নতাকে উদঘাটন করেছেন তাঁর রূপতাত্ত্বিক সংগঠনবাদে। তিনি রাশিয়ান লোককথাগুলো বিশ্লেষণ করে মোট ৩১টি ক্রিয়াশীলতার অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। এককগুলো প্রতিটি কথাতেই একটি নির্দিষ্টক্রমে উপস্থাপিত হয়। তিনি মনে করেন এককগুলোর উপকরণগত রূপান্তর ঘটতে পারে গল্পভেদে।

রূপতাত্ত্বিক সংগঠনবাদের আলোকে লোককথার বিচারবিশ্লেষণের সময় তিনি প্রতিটি কথার ক্রিয়াশীলতাগুলোর মধ্যে প্রতিস্থাপিত (paradigmatic) ও অন্বয়গত (syntagmatic) পাঠের গুরুত্বকে স্বীকার করেছেন। তিনি মনে করেন লোককথার প্রতিস্থাপিত উপাদানের সম্পর্কের ভিত্তিতে উল্লম্ব ও এককগুলোর পারস্পরিক বিন্যাসের শৃঙ্খলার আনুভূমিক পাঠ ক্রিয়াশীলতার স্বরূপকে চিহ্নিত করে।

প্রপ প্রতিটি লোককথার দুটি গঠনরূপকে স্বীকাব করেছেন— বহির্গঠন ও আন্তঃগঠন। বহির্গঠনে থাকে লোককথার বিভিন্ন ঘটনাংশ, যা গল্পভেদে, স্থান কাল পাত্রভেদে পাল্টে যায়। আর আন্তঃগঠনে ধরা পড়ে কথার ক্রিয়াশীলতার একমুখীনতা ও অভিন্নতা। লোককথার বিশ্লেষণে প্রপ যেমন বহিরাঙ্গিক এককের সাযুজ্য অনুসন্ধান করেছেন, তেমনি আন্তঃগঠনে মূলীভূত সাদৃশ্যকে আবিষ্কার করেছেন। তিনি বলেন লোককথার উপাদানের আপাতপ্রভেদ থাকলেও, সর্বজনীন তাৎপর্যে তারা অভিন্ন হয়ে

উঠেছে। আন্তঃগঠনের আলোকে পৃথিবীর সমস্ত লোককথাকে তিনি অভিন্ন বলে সিদ্ধান্ত টেনেছেন।

প্রপ লোককথায় দুধরনের উপাদানের কথা স্বীকার করেছন : ১ পরিবর্তনশীল (Variable) ও ২. অপরিবর্তনশীল (constant)। তিনি অপরিবর্তনশীল উপাদান বা এককের স্বরূপ ব্যাখ্যায় বলেছেন : 'The names of dramaitis personae change but neither their action nor function change. The furction as sush is a constant. আর পরিবর্তনশীল একক হল : The Functions implicate one another with logical and artistic necessity,they belong to the same axis so that any two functions ate never mutually exclusive.'

প্রপের দেওয়া উদাহরণ থেকেই আমরা লোককথার বহির্গঠন ও আন্তঃগঠন, পরিবর্তনশীল একক ও অপরিবর্তনশীল এককের স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে পারি :

১। প্রথম কাহিনীতে দেখা যায় : এক ঈগল নায়ককে অন্য রাজ্যে নিয়ে গেল।

২। দ্বিতীয় কাহিনীতে দেখা যায় : এক ঘোড়া নায়ককে অন্য রাজ্যে নিয়ে গেল।

৩। তৃতীয় কাহিনীতে দেখা যায় . একটি নৌকা নায়ককে অন্য রাজ্যে নিয়ে গেল।

৪। চতুর্থ কাহিনীতে দেখা যায় : একটি আংটি থেকে আবির্ভূত একলোক নায়ককে অন্য রাজ্যে নিয়ে গেল।

এখানে পরিবর্তনশীল এককগুলো হল : ঈগল, ঘোড়া, নৌকা, আংটি থেকে আবির্ভূত এক লোক। আর অপরিবর্তনীয় একক হল : নায়ককে অন্য রাজ্যে নিয়ে গেল। দেশকাল ও সংস্কৃতির প্রভেদে পরিবর্তনশীল এককগুলোর পরিবর্তন ঘটেছে। প্রপ এই পরিবর্তনশীল এককগুলোর মধ্যে বহিরঙ্গের আপাত পার্থক্যকে অন্তরঙ্গের সাদৃশ্যে একটি ক্রিয়াশীলতা বা একক বলে মনে করেন। তাই চারটি গল্পের বহিরঙ্গে চারটি ক্রিয়াশীলতা (ঈগল, ঘোড়া, নৌকা, আংটি থেকে আবির্ভূত এক লোক) আলাদা হলেও অন্তরঙ্গে একটি একক (অন্য রাজ্যে যাওয়ার মাধ্যম)। গল্পগুলোর বাহ্যগঠনে দেখা যাচ্ছে ক্রিয়াশীলতার এককগুলো আলাদা আলাদা,কিন্তু আন্তঃগঠনে এককগুলো অভিন্ন-- নায়কের গমনের উপায়মাত্র। তাই আপাতদৃষ্টিতে গল্পগুলোকে আলাদা আলাদা মনে হলেও প্রপের রূপতাত্ত্বিক সংগঠনবাদে তারা অভিন্ন। তিনি আসলে লোককথার এই ধ্রুবরূপটি আবিষ্কার করতে চেয়েছেন। তাঁর বিচারে পৃথিবীর সমস্ত লোককথা এক ও অভিন্ন।

বাংলায় 'নীলকমল আর লালকমল' নামক রূপকথায় দেখা যায় রাজপুত্র বেঙ্গমার পিঠে চেপে তেপান্তর পাড়ি দিয়েছে। আর 'সোনার কাঠি রূপার কাঠি' গল্পে পক্ষীরাজ ঘোড়ায় করে রাজপুত্র তেপান্তর পাড়ি দিয়েছে। দুটি গল্পেই 'রাজপুত্রের তেপান্তর পাড়ি দেওয়া' হল অপরিবর্তনশীল একক আর 'বেঙ্গমা' ও 'পক্ষীরাজ ঘোড়া' হল পরিবর্তনশীল একক। ঘটনার দিকে তাকালে মনে হতে পারে গল্প দুটোর ঘটনাংশ আলাদা আলাদা। কিন্তু ক্রিয়াশীলতার দিক দিয়ে আসলে অভিন্ন।

কথার ক্রিয়া সীমিত। নির্দিষ্ট ক্রমে ক্রিয়াগুলো আবর্তিত হয়। প্রপ ক্রিয়াকে ৩১টি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। প্রত্যেক ভাগের একাধিক উপভাগ করেছেন। প্রধান ক্রিয়াশীলতা ৭টি। এগুলো প্রতিটি কাহিনীতে থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে। তবে একই ক্রিয়াশীলতার গঠন কাহিনীর স্বরূপ অভিন্ন হবে। এদের অবস্থানের বিপর্যয়ও ঘটতে পারে।

লোককথায় প্রপ প্রাথমিক অবস্থাসহ যে ৩১টি ক্রিয়াশীলতার কথা উল্লেখ করেছেন সেগুলোকে আমরা চারটি বৃত্তে ভাগ করে আলোচনা করতে পারি।

x = Initial situation : প্রাথমিক অবস্থা :: নিরুত্তাপভাবে গল্পের সূচনা। যেমন : এক দেশে এক রাজা ছিল। .....ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্রথম বৃত্ত :: প্রস্তাবনা।

এই স্তরে প্রাথমিকভাবে অবস্থা ও গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র, দুঃসাহসিক অভিযাত্রার পরিচয় দেওয়া হয়। ১ থেকে ৭ সংখ্যক : ক্রিয়াশীলতা এই বৃত্তের অন্তর্গত।

1. B = Absentation : অনুপস্থিতি :: কোনো কিছুর অভাববোধ। যেমন : রাজার কোনো পুত্রসন্তান নেই।

2. g = Interdiction : নিষেধ:: নায়কেকে কোনো বিষয়ে আগে থেকে না করার জন্য সতর্ক করে দেওয়া।

3. d = Violation of interdiction : নিষেধ লঙ্ঘন :: পূর্বের জ্ঞাত বিধিনিষেধ উপেক্ষা

4. e = Reconnaissance : প্রাকপরীক্ষণ :: খলের কোনকিছু অনুসন্ধান।

5. z = Delivery : উদ্ধার :: খলের কোনো গোপন তথ্য প্রাপ্তি।

6. h = Trickery : ছলনা :: খলের ভুল ধারণার বশবর্তী হওয়া।

7. j = Complicity :যোগসাজশ :: অনিচ্ছাকৃতভাবে শত্রুকে সাহায্য করা।

দ্বিতীয় বৃত্ত : লোককথার মূল ঘটনা

এখানেই মূল গল্পের সূচনা হয় এবং নায়ক মূলসমস্যার সমাধানে বিদেশ যাত্রা করে। ৮ থেকে ১১ সংখ্যক একক এই বৃত্তের অন্তর্গত।

8. A = Villainy and lack : অসাধ্যসাধন :: দুষ্টু বুদ্ধির বলে অসম্ভবকে সাধনের জন্য আদেশ দান।

9. B = Mediation : যোগসূত্র :: নায়ক সবকিছু বুঝতে পারে।

10. C = Counteraction : প্রতিরোধ :: নায়কের সদর্থক পদক্ষেপ গ্রহণ।

11. ↑ = Departure : বিদেশ যাত্রা :: নায়কের নিজ পিতা, মাতা বা রাজকন্যাকে উদ্ধারের জন্য বিদেশ গমন। তৃতীয় বৃত্ত : সহযোগী দাতার পর্ব। এই অংশটি স্বতন্ত্র গল্প হতে পারে, যেখানে এক বা একাধিক মানুষ বা মনুষ্যেতর প্রাণী নায়কের অসাধ্য সাধনের জন্য কোনো দৈব উপকরণ দান করেন।

12. D = Testing : পরীক্ষণ :: এখানে নায়কোচিত গুণের পরীক্ষা হয়। অর্থাৎ তিনি অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারবেন কি না, তা যাচাই করা হয়।

13. E = Reaction প্রতিক্রিয়া :: নায়ক নিজেকে প্রমাণের জন্য তৈরি থাকে।

14. F = Acquisition : অধিকার :: নায়কের জাদুময় উপাদান লাভ।

15. G = Guidance : পথপ্রদর্শন :: নায়ক গন্তব্যে পৌঁছান।

16. H = Struggle : সংঘাত :: নায়ক ও খলনায়ক প্রত্যক্ষ সংগ্রামে লিপ্ত হয়।

17. J = Branding : Hero is branded

18. I = Victory : বিজয় :: নায়কের হাতে খলনায়কের পরাজয়।

19. K = Resolution : সমস্যার সমাধান :: প্রাথমিক সমস্যা বা দুর্ভাগ্য থেকে মুক্তি লাভ।

চতুর্থ বৃত্ত নায়কের প্রত্যাগমন।

এটি গল্পের শেষ পর্ব। এই পর্বটি কখনো কখনো নাও দেখা যেতে পারে। এখানে নায়ক নিজগৃহে ফিরে, সকলের দ্বারা উষ্ণ অভ্যর্থনা পায় ও সুখে শান্তিতে কাটায়।

20. ↓ = Raturn : প্রত্যাগমন :: নায়কের নিজ রাজ্যে প্রত্যাগমন।

22. Rs. = Rescue : পরিত্রাণ :: অভীষ্ট বস্তু লাভ।

23. O = Arrival : আগমন:: অপরিচিতভাবে বা অজ্ঞাতভাবে নায়কের নিজ রাজ্যে আগমন।

24. L = Claim : দাবি :: ছদ্ম নায়কের অস্বীকৃত দাবি।

25. M = Task : দুরূহ কার্য :: কঠিন কাজের জন্য নায়ককে আহ্বান করা।

26. N = Solution : সমাধান .: নায়কের প্রতিকূল কর্ম সম্পাদন বা সমস্যা থেকে মুক্তি।

27. Q = Recognition : স্বীকৃতি :: নায়কের নিজ পরিচয় লাভ।

28. Ex. = Exposure : ছদ্মনায়কের প্রকাশ :: ছদ্মনায়কের স্বরূপ উন্মোচন।

29. T = Transfiguration : নবরূপায়ণ ::নায়ক নতুন রূপে আবির্ভূত হয়।

30. U = Punishment : শাস্তি প্রদান :: প্রতিনায়ক সর্বদা তার কৃতকর্মের জন্য শাস্তি পায়।

31. W = Wedding : বিবাহ :: নায়কের বিবাহ ও রাজ্যাভিষেক।

প্রপ লোককথায় সমস্ত চরিত্রগুলোকে আন্তঃস্বভাবে ও ক্রিয়াশীলতার দিক থেকে মোট আটটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। তিনি মনে করেন এই চরিত্রগুলোকে আশ্রয় করেই ৩১ টি ক্রিয়াশীলতা সম্পূর্ণতা লাভ করে। তিনি বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন চরিত্রের ভূমিকা ও রূপান্তরের উপর। প্রপ বলেন প্রতিটি চরিত্রের স্বতন্ত্র ভূমিকা আছে, কোনো অবস্থাতেই চরিত্রগুলোর নিজেদের ভূমিকার পরিবর্তন হয় না। তবে কখনো কখনো দেখা যায় একই চরিত্র বিভিন্ন ক্রিয়াশীলতার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে, কখনো একাধিক চরিত্র একই ক্রিয়াশীলতায় যুক্ত হয়ে পড়ে। প্রপ মনে করেন দেশকাল

ও সংস্কৃতিভেদে চরিত্রের বহিরঙ্গের পরিবর্তন ঘটতে পারে কিন্তু আন্তঃগঠনে তারা অভিন্ন।

The villain : খল :: যে নায়কের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। নীলকমল আর লালকমল গল্পে বুড়ি রাক্ষসী ও রানীরূপী রাক্ষসী হল খলনায়িকা।

The dispatcher : বার্তাপ্রেরক :: এই চরিত্রটি নায়ককে গোপন তথ্য দিয়ে সজাগ করে দেয় এবং কর্মসাধনে বিদায় জানায়।

The (magical) hepler : দৈবসহায়ক :: নায়ককে অসম্ভব কার্য সম্পাদনের জন্য উপযুক্ত পথ দেখায় বা কোনো জাদুময় উপকরণ দেয়।

The princess or prize : রাজকন্যা :: এই চরিত্রটি খলের বেষ্টনীতে আবদ্ধ, নায়কের অভিযাত্রা শেষ হয় তাকে উদ্ধার ও বিবাহের মাধ্যমে।

her father : রাজকন্যার পিতা :: প্রপ লক্ষ করেছেন যে রাজকন্যার পিতা সর্বদা লোককথায় স্পষ্টভাবে উল্লিখিত থাকে না। তার কাজ হল নায়ককে কঠিন কার্য সম্পাদন করার আদেশ দান, ছদ্ম নায়কের স্বরূপ উদ্ঘাটন এবং রাজকন্যার সঙ্গে নায়কের বিবাহ দান।

The donor : দাতা :: নায়ককে প্রতিকূল পরিস্থিতির সঙ্গে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করে বা জাদুময় উপকরণ দেয়।

The hero or victim/ seeker hero : নায়ক :: সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, দৈব ও দাতার সাহায্যে সমস্ত সমস্যার সমাধান করে এবং রাজকন্যাকে বিবাহ করে।

False hero : ছদ্ম নায়ক :: নায়কের সদকর্মের কৃতিত্ব দাবি করে এবং রাজ কন্যার সঙ্গে বিবাহের চেষ্টা করে। একটি লোককথাকে প্রপের রূপতাত্ত্বিক সংগঠনবাদের সংকেতে উপস্থপিত করা হল :

'নীলকমল আর লালকমল' রূপকথাটির বিশ্লেষণে আসা যাক :

α = Initial situation : প্রাথমিক অবস্থা :: এক দেশে এক রাজা ছিল তার ছিল দুই রানী। তাদের দুই পত্র।

1 B = Absentation : অনুপস্থিতি :: অভাব দেখা গেল : 'হাতিশালে হাতি, ঘোড়াশালে ঘোড়া, গোয়ালে গরু মারা যেতে লাগল।

2. g = Interdiction : নিষেধ :. নায়ককে কোনো বিষয়ে আগে থেকে না করার জন্য সতর্ক করে দেওয়া। যেমন—উত্তর দিকে যাবে না।

3. d = violation of interdiciton : নিষেধ লঙ্ঘন।

4. e = Reconnaissance : প্রাকপরীক্ষণ ::

5. z = Delivery · the villain gains information

6. h = Trickery : Villain aattempts to deceive victim

7. j = Complicity : যোগসাজশ ::

8. A = Villainy and lack : অসাধ্যসাধন:

9. B = Meditaion : যোগসূত্র ::

10. C = Counteraction : প্রতিরোধ::

11. ↑ = Departure : বিদেশ যাত্রা :: নায়কের নিজ পিতা, মাতা বা রাজকন্যাকে উদ্ধারের জন্য বিদেশ গমন।

12. D = Testing :পরীক্ষণ :: রাজপুত্রকে হাসন চাঁপা নাটন কাটি, বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচি ও রানীরূপী রাক্ষসীর বাপের অনুসন্ধান করার নির্দেশ দেওয়া হল।

13. E = Reaction : প্রতিক্রিয়া:: রাজপুত্র নিজে উক্ত দ্রব্য সংগ্রহে অগ্রসর হল।

14. F = Acquisition . অধিকার :: রাজপুত্রের রাক্ষসীর মৃত্যুর কারণরূপ সাতফণা সাপ ও শুক পাখি প্রাপ্তি।

15. G = Guidance : রাজপুত্র রাক্ষসীর সামনে উপস্থিত হয়।

16. H = Struggle : সংঘাত .· রাজপুত্র ও রাক্ষসী প্রত্যক্ষ সংগ্রামে লিপ্ত হয়।

17. J = Branding : Hero is branded

18. I = Victory : বিজয় :: সাতফনা সাপেরগালি কেটে রাজপুত্র বুড়ি রাক্ষসীসহ সকলকে হত্যা করল।

19. K = Resolution : সঙ্কল্প :: বুড়ি রাক্ষসীকে হত্যা, রাজপুত্রপ্রাথমিক বিপর্যয় থেকে মুক্ত হল।

20. ↓ = Return : প্রত্যাগমন :: রাজপুত্র রাজ্যে ফিরে এল।

21. Rs. = Rescue : পরিত্রাণ :: রাজপুত্র রাজকন্যাকে রাক্ষসীর কবল থেকে উদ্ধার করল।

22. O = Arrival : প্রত্যাগমন :: তিনবন্ধু ও রাজপুত্র নিজ দেশে ফিরে এল।

23. L = Claim : দাবি :: রাক্ষসীর রানীরূপে নিজেকে দাবী করা।

24. M = Task : দুষ্কার্য :: অসাধ্য সাধনের জন্য রাজপুত্রকে আদেশ করা হয়।

25. N = Solution : সমাধান :: রাজাকে ও তার রাজ্যকে সমস্ত সমস্যা থেকে মুক্ত করল।

26. Q = Recognition : স্বীকৃতি :: নায়কের নিজ পরিচয় লাভ। যেমন রাজা তাঁর পুত্রকে চিনতে পারলেন।

27. Ex. = Exposure : ছদ্মনায়িকার প্রকাশ :: ছদ্মবেশধারী রাক্ষসীর স্বরূপ উন্মোচন করল রাজপুত্র।

28. T = Transfiguration : নবরূপায়ণ ::নায়ক নতুন রূপে আবির্ভূত হয়।

29. U = Punishment : শাস্তি প্রদান :: রাজপুত্র রাক্ষসীরূপী রানীকে হত্যা করল।

30. W = Wedding : পুরস্কার /বিবাহ :: রাজপুত্রের সঙ্গে রাজকন্যার বিবাহ হয়।

α = Initial situation : প্রাথমিক অবস্থা :: এক রাজপুত্র, এক মন্ত্রিসভা, এক সওদাগরের পুত্র আর এক কোটালের পুত্র— চার জনে খুব ভাব।'

1. B = Absentation : অনুপস্থিতি :: অভাব : চার জনের কর্মহীনতা।

2.g = Interdiction : নিষেধ :: নায়ককে কোনো বিষয়ে আগে থেকে না করার জন্য সতর্ক করে দেওয়া। যেমন : উত্তরদিকে যাবে না।

3.d.= Violation of interdiction : নিষেধ লঙ্ঘন :: সতর্ক

4. e = Reconnaissance : প্রাকপরীক্ষণ .:

5. z = Delivery : উদ্ধার

6. h = Trickery : ছলনা

7. j = Complicity : Unwitting helping of the enemy

8. A = Villainy and lack : অসাধ্যসাধন:

9. B = Mediation : যোগসূত্র ::

10. C = Counteraction : প্রতিরোধ::

11. ↑ = Departure : বিদেশ যাত্রা :: নায়কের নিজ পিতা, মাতা বা রাজকন্যাকে উদ্ধারের জন্য বিদেশ গমন।

12. D = Testing :পরীক্ষণ :: রাজপুত্রকে হাসন চাঁপা নাটন কাটি, বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচি ও রানীরূপী রাক্ষসীর বাপের অনুসন্ধান করার নির্দেশ দেওয়া হল।

13. E = Reaction : প্রতিক্রিয়া:: রাজপুত্র নিজে উক্ত দ্রব্য সংগ্রহে অগ্রসর হল।

14. F = Acquisition : অধিকার :: রাজপুত্রের রাক্ষসীর মৃত্যুর কারণরূপ সাতফণা সাপ ও শুক পাখি প্রাপ্তি।

15. G = Guidance : রাজপুত্র রাক্ষসীর সামনে উপস্থিত হয়।

16. H = Struggle : সংঘাত :: রাজপুত্র ও রাক্ষসীর প্রত্যক্ষ সংগ্রামে লিপ্ত হয়।

17. J = Branding : Hero is branded

18. I = Victory : বিজয় :: সাতফনা সাপেরগাল কেটে রাজপুত্র বুড়ি রাক্ষসীসহ সকলকে হত্যা করল।

19. K = Resolution . সঙ্কল্প :: বুড়ি রাক্ষসীকে হত্যা রাজপুত্র প্রাথমিক বিপর্যয় থেকে মুক্ত হল।

20. ↓ = Raturn . প্রত্যাগমন :: রাজপুত্র রাজ্যে ফিরে এল।

22. Rs. = Rescue : পরিত্রাণ :: রাজপুত্র রাজকন্যাকে রাক্ষসীর কবল থেকে উদ্ধার করল।

23. O = Arrival : প্রত্যাগমন :: তিনবন্ধু ও রাজপুত্র নিজ দেশে ফিরে এল।

24. L = Claim : দাবি :: রাক্ষসীর রানীরূপে নিজেকে দাবী করা।

25. M = Task : দুষ্কার্য :: অসাধ্য সাধনের জন্য রাজপুত্রকে আদেশ করা হয়।

26. N = Solution : সমাধান :: রাজাকে ও তার রাজ্যকে সমস্ত সমস্যা থেকে মুক্ত করল।

27. Q = Recognition : স্বীকৃতি :: নায়কের নিজ পরিচয় লাভ। যেমন রাজা তাঁর পুত্রকে চিনতে পারলেন।

28. Ex. = Exposure : ছদ্মনায়িকার প্রকাশ :: ছদ্মবেশধারী রাক্ষসীর স্বরূপ উন্মোচন করল রাজপুত্র।

29. T = Transfiguration : Hero is given a new appearance

30. U = Punishment : শাস্তি প্রদান :: রাজপুত্র রাক্ষসীরূপী রানীকে হত্যা করল।

31. W = Wedding : বিবাহ :: রাজপুত্রের সঙ্গে রাজকন্যার বিবাহ হয়।

গ্রন্থঋণ :

Propp V. Morphology of the Folktale. Leningrad, 1928; (English : The Hague: Mouton, 1958, Austin : UnPropp V. Theory and History of Folklore. University of Minnesota Press, 1984

Iversity of Texas Press, 1968) (French : Morphologie du conte. Paris. Seuil, 1970)

Propp V Russian Heroic Epos. Moscow, 1958

Propp V. Theory and History of Folklore. University of Minnesota Press, 1984

Propp V. Theory of Literature Moscow, 1965

Propp V.Y. "Fol'klor i deistvitel;nost" Russkaia literatura, 1963, no. 3

Propp V.Y "Morfologiia skazki, 2nd ed. (Moscow, 1969).

Propp V.Y. Morphology of the Folktale. Leningrad, 1982; English: The Hague: Mouton, 1958; Austin : University of Texas Press, 1968;

Propp V.Y Russian Heroic Epos. Moscow, 1958;

Propp V.Y Russkie agrarnye prazdniki, Leningrad, 1963.

Propp V.Y Russkii geroicheskii epos, 2nded. (Moscow, 1958).

Propp V.Y, Theory of Literature. Moscow, 1965;

Propp, Vladimir. "Introduction." Theory and History of Folklore Ed. Anatoly Liberman. Universityof Minnesota: University of Minnesota Press, 1984. pg ix

Propp, Vladimir, Morpholoty of the Folktale. 1927. Trans., Laurence Scott. 2nd ed. Austin: University of Texas Press, 1968.

Vladimir Propp, Morphology of the Folk Tale, p 25, ISBN 0-292-78376-0

ডেনমার্কীয় পণ্ডিত অ্যাক্সেল ওলরিকের 'এপিক ল্য'র নিরিখে বাংলা লোককথা

মো. জাহাঙ্গীর হোসেন

সমুদ্রের প্রবল জলোচ্ছ্বাসের মাঝে ক্ষুদ্রদেহী প্রবলকীট যেমন তার দেহাবশেষ সঞ্চিত করে সুদীর্ঘ কাল ধরে ধীরে ধীরে গড়ে তোলে প্রবালপ্রাচীর ও প্রবালদ্বীপ, যার সমুন্নত শীর্ষদেশ আমাদের বিস্মিত করে, তেমনি যুগযুগান্ত ধরে বয়ে চলা মানব সভ্যতার চলিষ্ণুধারায় লোকায়ত মানুষের জীবনের অভিজ্ঞতা ঋদ্ধ বিপুলায়তন লোককথার ভাণ্ডারও আমাদের বিস্মিত করে। প্রবল প্রতিকূল প্রকৃতির বিরুদ্ধে মানুষের সংগ্রামের ধারাবাহিক ইতিহাস বিম্বিত হয়েছে এই লোককথার মধ্যে। বহতা এই ধারার বাঁকে বাঁকে মানুষের সুখ- দুঃখ বেদনা- হাতাশা, লাঞ্ছনা-বঞ্চনার কথা ঝিকিয়ে উঠেছে। ঝংকৃত হয়েছে দানব, বৃহৎ সবল ও অত্যাচারীর বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ, দুর্বল নির্যাতিতদের বিজয় ঘোষণা।

লোকসংস্কৃতির অন্যতম জনপ্রিয় আঙ্গিক হল লোককথা। বাংলার লোককথার ভাণ্ডার অত্যন্ত সমৃদ্ধ। এদেশে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের হাতে লোককথাগুলো সমৃদ্ধ হয়েছে। কথকতার মাধ্যমে শ্রোতাদের সামনে গল্প পরিবেশনের সূত্রে মৌখিক সাহিত্যের এ শাখা লোকপ্রিয়তা অর্জন করেছে। প্রধানত পরিবারের নারীরা, শিশু কিশোরদের এসব কাহিনী শোনাতেন। গৃহকোণে, উঠোনে ও গ্রামীণ সমাবেশে লেবাককথার শ্রোতারা মুগ্ধ হয়ে কথকদের কাছ থেকে এসব কাহিনী শুনতো। এভাবে লোককথা দেশ দেশান্তরে ও প্রজন্ম প্রজন্মান্তরে ছড়িয়ে যায়। সাধারণভাবে 'পুরুষ পরম্পরায় মুখে মুখে প্রচলিত গল্পকে লোককাহিনী বলে। লোককাহিনীর ভাষা মূলত গদ্য তবে কোন কোন গল্প গান সহযোগে পরিবেশন করা হয়। এটি লোককাহিনীর স্বীকৃত বৈশিষ্ট্য ঃ A narrative form in which a story is told parly in songs.বিশেষ করে, দীর্ঘ কলেবরের কাহিনীগুলো বর্ণনায় ফাঁকে ফাঁকে গান জুড়ে দিয়ে শ্রোতার কাছে অধিক আর্কষণীয় করে তোলা হয়। এতে গল্প বলার ও শোনার একঘেয়েমিতা দুর হয়। শ্রোতারা একাধারে গল্পরস ও সংগীতরস লাভ করে তৃপ্তি ও আনন্দ উপভোগ করে। যে কেউ গল্প বলতে পারে, কিন্তু পেশাদার 'কথকে'র গল্পের আমেজ ও আকর্ষণ অতুলনীয়। বাংলার ভাষা ও ভঙ্গি দ্বারা কথক গল্পে প্রাণ সঞ্চার করে।'[১] বলা প্রয়োজন ইংরেজী 'Folktale' শব্দটির বাংলা ভাষান্তর হয়েছে লোককথা-বা কাহিনী। এ প্রসঙ্গে আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন 'গদ্যের ভিতর দিয়া যে

কাহিনীর প্রকাশ করা হয় ইংরাজীতে তাহাকেই সাধারণভাবে Folktale বলা হয়। বাংলায় লোককথা বলিলে এই কথাটির যথার্থ অনুবাদ হয়, তবে সংক্ষেপে তাহা কেবলমাত্র কথা বলিয়াও উল্লেখ করা যাইতে পারে।'[২]

ইংরেজী Folktale সম্পর্কে প্রখ্যাত গবেষক স্টীথ থম্পসন মন্তব্য করেছেন.... the term folktale' is legitimately employed in a much broader sense to include all forms of prose narrative, written or oral, which have come to be handed down through the years'[৩] অর্থাৎ গদ্যে বিবৃত লিখিত বা মৌখিক ঐতিহ্যের মাধ্যমে যুগ যুগ ধরে এক পুরুষ থেকে অন্য পুরুষে হস্তান্তরিত যে সাহিত্য সম্পদ, তাই লোককাহিনী। অবশ্য থম্পসন লিখিত ঐতিহ্য অর্থে মৌখিক গল্প গুলির সংগৃহীত লিখিত রূপ বুঝিয়েছেন, যার উদ্দেশ্য ঐতিহ্যের নিশ্চিত সংরক্ষণ।

লোককাহিনীর মৌখিক ঐতিহ্যবাহিতা স্বীকার করেছে অভিধান—Folktale is Characteristically anonymous and placeless tale circulated orally among people.'[৪]

অর্থাৎ অজ্ঞাত উৎসজাত সেই সব গল্প, যেগুলি মৌখিক ঐতিহ্যবাহী, সেইগুলিই লোককাহিনী।

লোককাহিনীর সার্বিক গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞাটি পাওয়া যায় 'Standard Dictionary of Folklore Mytholoy and Legend' গ্রন্থে

"...........a general word referring to all kind of tradition narrative. It applies to such divers forms as creative myth of primtive peoples. the elaborate frame Stories of Arabian Night, the adventures of uncle Remus Perse in Cupid and Pshyche.'[৫]

কোন কালে কোন মানব সমাজে লোককাহিনীর আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল তা আমাদের অজানা; কেননা, আজও পৃথিবীর এমন অনেক জনগোষ্ঠী রয়েছে যারা দূর এলাকায় বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করে, এমন সমাজে রয়েছে যারা এখনও পুরোপুরি শিকারজীবী, চাষ করতে জানে না, এমন সমাজ রয়েছে যারা শিকার করতে জানে না পুরোপুরি খাদ্যসংগ্রাহক গোষ্ঠী, এসব লোকসমাজেও লোককাহিনীর সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। অর্থাৎ গোষ্ঠী জীবন শুরু হওয়ার পর থেকেই লোককাহিনীর সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু মানব ইতিহাসের কোন স্তরে তা সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানীরাও বলতে পারেননি।

আবহমান কাল ধরে লোকসমাজে লোককথা সৃষ্টি হয়ে আসছে। কিন্তু সেসবের খবর গোষ্ঠীর বাইরে কেউ জানত না। অষ্ঠাদশ শতক থেকে ইউরোপের উপনিবেশবাদীরা গোটা পৃথিবীতে দেশ আবিষ্কারে নেমে পড়ল। তারা যে কোনো দেশ দখল, সে দেশের সম্পদ লুণ্ঠন এবং সেখানে তাদের উপনিবেশ স্থাপনই ছিল মূল উদ্দেশ্য। এভাবে এশিয়া, আফ্রিকা লাতিন আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়ার অসংখ্য এলাকা একদিন ইউরোপের উপনিবেশে পরিণত হল। এদের অত্যাচার- নৃশংসতার কাহিনী

ইতিহাসে রয়েছে। উপনিবেশবাদীদের সঙ্গে এল সরকারী প্রশাসক এবং খ্রিস্টীয় পুরোহিত সম্প্রদায়। কোনো দেশে নির্মম অথবা কোমল শাসন চালাতে গেলে সেই দেশের সেই দেশের ভূগোল, ভৌগোলিক এলাকার মানুষ ও তার লৌকিক সংস্কৃতিকে জানা অবশ্যম্ভাবী। এই দুই শ্রেণীর মানুষ, প্রশাসক ও পুরোহিত প্রথমত পরাভূত দেশের লৌকিক সংস্কৃতির ভাণ্ডার সংগ্রহ করতে থাকেন। এদের পরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন নৃবিজ্ঞানীরা। এই তিন শ্রেণীর মানুষের সহায়তায় অজানা লোকসংস্কৃতির অনন্য ভাণ্ডারের পরিচয় লাভ করে বিশ্ব। এভাবেই লোককাহিনীর ভাণ্ডার ধীরে ধীরে বিশ্ববাসীর সামনে উন্মোচিত হলো এবং সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানী ও লোকসংস্কৃতি প্রেমী প্রাজ্ঞ মানুষ জনের অক্লান্ত গবেষণায় লোককাহিনীর শ্রেণীবিভাগের তথ্যও আমাদের সমৃদ্ধ করল।

লোককাহিনীর শ্রেণীবিভাগে রয়েছে— ১.পশুকথা, ২.রূপকথা, ৩. পরিকথা, ৪. কিংবদন্তি, ৫. লোকপুরাণ, ৬. নীতিকথা, ৭. গীতিকার অন্তর্ভুক্ত কাহিনী এবং ৮. ব্রতকথা। এই প্রসঙ্গে একটি কথা স্মরণ করতে হবে যে, লোকসমাজের মন কোনোদিন রাজনৈতিক বিভাজন কিংবা আরোপিত ভৌগোলিক বিভাজন মেনে নেয়নি। তাই আমরা লোককাহিনীর বিস্তার দেখতে পাই পার্শ্ববর্তী এলাকায়। সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের সহজ লৌকিক মানসিকতায় একে অপরের আপনজন হয়েছেন। এমন মানবিক -মানসিক সেতুবন্ধন লোকসমাজেই সম্ভব।[৬]

ভারতীয় উপমহাদেশের সে সমস্ত লোককাহিনী সংগৃহীত হয়েছে সেগুলি অবলম্বনে মোটামুটি লোককাহিনীর শ্রেণীকরণ করা হয়েছে এভাবে। যেমন উপকথা, রূপকথা, ব্রতকথা, নীতিকথা, বীরকথা, রঙ্গকথা, রোমাঞ্চকথা প্রভৃতি। বাংলাদেশের লোককাহিনীও অনুরূপ কয়েকভাগে বিভক্ত।

আবদুল হাফিজ লোককাহিনীর অন্তর্গত উপকথাগুলো জীব-জানোয়ারের কাহিনী বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে লোককাহিনীর একটা বড় অংশই জীব-জানোয়ারের কাহিনীতে পূর্ণ। বাংলা লোকসাহিত্যে এ ধরনের কাহিনীকে 'উপকথা' বলা হয়। কিন্তু 'পশুকথা' সে জায়গায় অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে মনে করা হয়।

যুগযুগান্ত অতিক্রম করে আসা মানব সভ্যতার চলিষ্ণু ধারায় লোককাহিনী এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। লোকসংস্কৃতির নানা আঙ্গিক সঙ্গীত, ছড়া ধাঁধা, প্রবাদপ্রবচন, লোককাহিনী প্রভৃতি রয়েছে। এগুলোর মধ্যে লোককাহিনীর আবেদন সর্বাধিক। লোককাহিনী শুধু আনন্দের অভিব্যক্তি নয় এর মধ্যে লোকসমাজের বেদনাময় সংগ্রাশীল রূঢ় বাস্তবের ঐতিহাসিক দিকটি লুকানো আছে। জীবনের বাস্তব ক্ষেত্রে দৈহিক শক্তিতে প্রাণ প্রাচুর্য থেকে বঞ্চিত যে শ্রেণী চিরকাল অত্যাচারের জোয়াল বয়েছে তাদের অবদমিত ক্ষোভ লোককাহিনীতে নানা প্রতিবাদের বিচিত্র রূপে প্রকাশিত।

লোক কাহিনীর ক্ষেত্র বিচিত্র। এমন কোন বিষয় নেই যা লোককাহিনীতে স্থান পায় নি। যেমন রাজা রাণী, রাজপুত্র, রাক্ষস-খোক্কস, দৈত্য দানা, ডাইনী, পরী মানুষের মতো কথা বলা এবং কাজ করা পশু পাখি জাদু অলৌকিক ঘটনা, দেবতা এই সব নিয়েই রূপকথা উপকথা পুরাকথার যে জগৎ গড়ে উঠেছে, পৃথিবীর কোনও সংস্কৃতি বলয়েই তাদের মধ্যে সত্যিকারের বাস্তবধর্মিতা কোথাও নেই। জীবনের রূঢ়, নির্মম সত্য গুলোর উপলব্ধি, যা প্রতিনিয়তই শ্রেণী বিভাজিত সমাজের অংশীদার রূপে আমাদের হয়ে থাকে, ঐসব কল্পকথার মধ্যে সেভাবে তাদের প্রতিফলন ঘটতে দেখিনা। বহু দুঃখ কষ্ট ভোগ করে শেষ পর্যন্ত যারা সুখে দিন কাটান, তারা প্রায় ক্ষেত্রেই রাজা-রানী, কিংবা রাজার ছেলে বা মেয়ে জামাই বা পুত্রবধূ। সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ সেখানে আবির্ভূত হলে তারা নিতান্তই গৌণ পার্শ্বচরিত্র হিসেবে গুরুত্বহীন বলে অভিহিত হন। বস্তুবাদী এবং শ্রেণী সচেতন দৃষ্টিতে বিচার করলে সেক্ষেত্রেও রূপকথা, পুরাকথা ইত্যদিকে জীবন বিমুখ শিল্পধারা বলা যায় না। ঐতিহাসিক বস্তুবাদী দর্শনে সমাজ ও ইতিহাসকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মার্কস এঙ্গেলস বলেন -আজ পর্যন্ত যত সমাজ দেখা গিয়েছে তাদের সকলের ইতিহাস শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস। স্বাধীন মানুষ ও দাস, প্যাট্রিশিয়ান এবং প্লিবিয়ান, জমিদার ও ভূমিদাস, গিল্‌ডকর্তা ও কারিগর এককথায় অত্যাচারী ও অত্যাচারিত দুই শ্রেণী সর্বদাই পরস্পরের প্রতিপক্ষ হয়ে থেকেছে, অবিরাম লড়াই চালিয়েছে কখনও বা আড়ালে কখনও বা প্রকাশ্যে। সর্বক্ষেত্রে এ লড়াই শেষ হয়েছে গোটা সমাজের বিপ্লবী পুনর্গঠনে অথবা দ্বন্দ্বরত শ্রেণীগুলোর ধ্বংসপ্রাপ্তিতে। সুপ্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত ইতিহাসের ধারা আলোচনা করলে দেখা যাবে আদিম সাম্যবাদী সমাজ ছাড়া আবহমান কাল ধরে যে ঐতিহাসিক ধারা চলেছে তা শ্রেণী দ্বন্দ্ব, হানাহানি, বিদ্বেষ শোষণ ও জাতি বৈষ্যম্যের ধারা। যে লিখিত ইতিহাস আমরা পড়ি তাতে রাজা-বাদশা সামন্তপ্রভুদের খুঁটিনাটি তুচ্ছ বিষয় ও শাসনব্যবস্থার পরিচয়ই শুধু থাকে। প্রচলিত ইতিহাসে গণমানুষের ইতিহাস উপেক্ষিত। আমাদের নিজেদের অতীতকে সামাজিক রীতি-নীতি কাঠামোকে জানতে হলে, সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের সংবাদ নিতে হলে, সাধারণ খেটে খাওয়া হাটবাটের মানুষদের ঐতিহ্যকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করতে হবে।

লোককথায় মহাসূত্রাবলী

পৃথিবীর সকল দেশের লোককথার মধ্যে কিছু কিছু মিল সহজেই লক্ষ্য করা যায়, যদিও অনেক সময় তার বাইরের পরিবেশ, সংস্কৃতির প্রভাব খানিকটা আলাদা থাকে। এই মিলের কারণ হিসেবে দুটি মতবাদ তৈরি হয়েছেঃ প্রথমত বলা যায় যে, বিশেষকোনো একটি দেশ বা সভ্যতা কিংবা সংস্কৃতিতে প্রথমে গল্পগুলির উদ্ভব হয় এবং সেখান থেকেই অন্যান্য আর সব দেশ, সভ্যতা, সংস্কৃতিতে সেগুলি ছড়িয়ে পড়ে, সাংস্কৃতিক ও পারিবেশিক পরিমণ্ডলের ভিন্নতা হেতু তার বাইরের চেহারাতে কিছুটা

পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। দ্বিতীয়ত, পৃথিবীর সমস্ত প্রাচীন মানুষেরা ছিল একইরকম মনস্তত্ত্বের অধিকারী, একই নৃতাত্ত্বিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে তার অগ্রসর হবার সময় একই অভিজ্ঞতার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। ফলে গল্পের প্রতিফলনে সেগুলি এসে যাওয়ায় কাহিনীর অন্তর্লীন কাঠামো একই রকম হয়েছে।

প্রধানত আভ্যন্তরীণ আঙ্গিক বিন্যাসেই কাহিনীগত সাদৃশ্যগুলিকে খুঁজে পাওয়া যায়। যথা কাহিনীর কাঠামো, পরিণতির ইঙ্গিত ইত্যাদি। ডেনমার্কীয় পণ্ডিত অ্যাক্সেল ওলরিক মূলত ড্যানিশ সগেন অবলম্বন করে সাদৃশ্য জনিত সূত্রগুলি খুঁজে বের করেন। যেগুলি বৈচিত্র্যভেদে সকল লোককথাতেই লভ্য—

No matter what the genre-tale myth hero story ballad, or local legend there is a great stylistic resemblance in all narrative which comes out from the folk and which is carried on by word of mouth and by the power of memory that Olrik feels that certain 'epic laws' may be enunciated. This principles limit the freedom of folk narrative to an extent quite unknown in written literature.' তবে এগুলি মোটামুটি বিশ্বজনীন বলে গণ্য হতে পারার পক্ষে কোনো বাধা নেই, এগুলিই 'এপিক ল্য' বলে পরিচিত।

সূত্রগুলি নিম্নে আলোচনা করা হলো—

১. Law of opening & closing. A tale does not begin with the most of the action and it does not end abruptly. There is a leisurely introduction, and the story proceeds beyond the climax to a point of rest or ability.'

বলা যায় এটি বিশ্বের প্রায় সকল লোককথার আরম্ভ ও সমাপ্তির সূত্র। লোককথাগুলোতে দেখা যায় যে শুরুটা হয় এভাবে এক যে ছিল. . । এবং এর সমাপ্তি হয় 'এবং তারা সুখে শান্তিতে বাস করতে লাগল। ' অর্থাৎ সমস্ত রকম সমস্যার সমাধান করে কাহিনী শেষ হয় এবং লোককাহিনী কখনই ট্রাজিক হয় না। যেমন— "এক যে ছিল বোকা জোলা। তার বুদ্ধিশুদ্ধি একেবারেই ছিল না। কাস্তে গরম হলে সে ভাবে কাস্তের জ্বর হয়েছে। বুড়ি মায়ের জ্বর হলে তাকে পুকুরে ডুবিয়ে রাখে, মা মরে যায়। তার কান্না শুনে শেয়াল দুঃখ করে কেঁদো না, রাজার মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেব। শেয়াল জোলার সম্পর্কে রাজাকে মিথ্যে সব কথা বলল। বোকা জামাইয়ের কথা কাউকে বলল না।"[৯]এক নাপিত আর তার বউ। কিন্তু সুখ শান্তি নেই। বড়ো বেশি কথা বলে বউ। ঘ্যানর ঘ্যানর করে। মাঝে মধ্যে নাপিতকে মারতও। নাপিত বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। সন্ধ্যেবেলা গাছের নিচে বসে আছে। ভূত বলল, নাপিত তোর ঘাড় মটকাব।

নাপিত বলল, অনেক ভূতকে আমি ঝুলিতে পুরেছি, আজ আরও একটা বাড়বে।

আয়না বের করে সে ভূতকে দেখাল। ভূত চমকে উঠে ভয় পেল। এক হাজার সোনার মোহর পেয়ে ছাড়ল। ভূতকে বলে দিল, গোলায় ধান ভরে দিতে। ভূতের খুড়ো এসব শুনে ভূতকে বকল। ওসব বাজে কথা। খুড়ো আয়নায় তাকে দেখতে পেয়ে আরেকটা গোলা ভরে দিল। সুখে-শান্তিতে দিন কাটতে লাগল।"[১০]

২. "Law of repetition! Repetition is everywhere present not only to give a story suspense but also to fill it out and effort it body."[১১]

এটি একটি পুনরাবৃত্তির সূত্র। লোককাহিনীতে পুনারাবৃত্তি মানসিকতা একটি বিশেষ লক্ষণীয় ব্যাপার। পুনরাবৃত্তি শুধু কাহিনীর উৎকণ্ঠা বৃদ্ধিই করে না, কাহিনীর অবয়বকে তা দান করে পূর্ণায়ত দৈর্ঘ্য। অর্থাৎ লোককাহিনী উপস্থাপন করার সময় উপস্থাপনকারীকে একই ঘটনার, একই মুখে, একই শব্দের বার বার আবর্তন করতে দেখা যায়। যেমন 'বাঁদর-স্বামী' গল্পটির উল্লেখ করা যেতে পারে। 'ব্রাহ্মণের বিটিরা দিনে দিনে নদীতে সিনান করে। এক বাঁদর দেখে কাপড়গুলো নিয়ে গাছে রেখেছে। পরে ঘাটে উঠে মেয়েগুলো দেখে কাপড় নেই, বাঁদরগুলোকাপড় নিয়ে গাছে উঠেছে। তারা বলল, বাঁদর, কাপড় দাও। বাঁদর বলে, 'তোমাদের ছোটবোনের সঙ্গে আমার বিয়ে দাও, নয় তো কাপড় দিব না।' মেয়েগুলো বলল, হাঁ দিব।'

বিকেলে ব্রাহ্মণের মেয়েগুলো ঘরে আছে; এমন সময় বাঁদর এসে ঘরের চালে ঝাপর ঝুপুর করছে।

তাই দেখে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী বললে, 'তোমরা কি বাঁদরকে কিছু বলেছ?

তখন ব্রাহ্মণের মেয়েরা বললে, 'আমরা বাঁদরের সঙ্গে ছোট বোনের বিয়ে দেবার কথা বলেছি। তাই শুনে মা বাপ বললে, 'তবে তো বিয়ে দিতে হবে।'

রাত্রে বিয়ে হলো, খাওয়া -দাওয়া হলো। কিন্তু সকাল না হতেই বাঁদরটি ব্রাহ্মণের মেয়েকে নিয়ে রওনা হলো। পথে ক্লান্ত কন্যা মাঝে মাঝেই প্রশ্ন করছে.

বাঁদর যায়, মা ডালে পাতে,
আমি যাই, মা, রাস্তাতে।
সত্য করে বলরে, বাঁদর
আর কত দূর আছে?

বাঁদর বললে ঐ তো কাছে।[১২]

গল্পটিতে তিনবার ব্রাহ্মণ কন্য ঐ একই.প্রশ্ন করেছে, বাঁদর ঐ একই উত্তর দিয়েছে অবিরাম এই পুনরাবৃত্তি কাহিনীকে দীর্ঘায়িত করেছে। সেই সঙ্গে কোমল কন্যার পথশ্রমের ক্লান্তি, পথের দীর্ঘ দূরত্ব, স্বামীর স্নেহ আশ্বাস এ সব কিছু ঐ পুনরাবৃত্তির প্রতিফলন।

৩. Law of two in a scene : Generally there are but two persons in

a scene at one time. Even if there are more only two of them are active simultaneously.[১৩]

অর্থাৎ একই দৃশ্যে দুইয়ের সূত্র। একই দৃশ্যে একই সঙ্গে দুটিবস্তু, বা দুটি ঘটনার বেশি থাকতে পারে না। একে Binarism বলা হয়। দৃষ্টান্ত হিসেবে' Strike but Hear' গল্পের উল্লেখ করা যেতে পারে। গল্পের প্রথম দিকে রাজা নিজ পুত্র হত্যায় উদ্যত হন এবং পরবর্তীকালে রাজাব ভ্রান্ত ধারণা দূর হলে অবিমৃষ্যকারিতার ভয়ঙ্কর কুফল বুঝে পুত্র হত্যা থেকে বিরত হন। অনুরূপভাবে একই দৃশ্যে দুটি কাহিনীর সূত্রপাত ঘটেছে চূড়ামণির কিসসা 'সাদ ও সাইদ' নামক লোককাহিনীতে।

৪. Law of Contrast : Contrasting characters encounter each other - hero and villain, good and bad.[১৪]

অর্থাৎ পরস্পর বিরোধী গুণ, বস্তু ও ব্যক্তির সূত্র। এই সূত্রটি লোককাহিনীর ক্ষেত্রে বিস্তৃতভাবে প্রযোজ্য। ঘটনা, চরিত্র সব দিক থেকেই। লোককাহিনীতে চরিত্র পরস্পরের সম্মুখীন হয় যেমন নায়ক ও নায়কের শত্রু ভাল ও মন্দ ব্যক্তি। আবার দেখা যায়— একজন খুব নিষ্ঠুর হলে অন্যজন ঠিক ততটাই ভাল হয়; অথবা প্রথমে দুঃখ পেলে শেষে চরম সুখ লাভ করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় লোককাহিনীটি—এক দেশে ছিল এক মানুষ। তার নাম আদি। আদির বাবা মারা যাওয়ার পরে আদি টাকা পয়সা খরচ করে ফেলল, বাড়িও বিক্রি করে দিল। বউকে বাড়িতে রেখে আদি বিদেশে চাকরি খুঁজতে গেল। একজন আদির বাবার কাছে কিছু টাকা পেত। সে কোটালের কাছে নালিশ করল, টাকা যখন ফেরত পাওয়া যাবে না তখন আদির বউকে সে বিয়ে করতে চায়। কোটাল আদির বউয়ের রূপ দেখে পাগল হয়ে গেল। লোকটা নাজিরের কাছে নালিশ করল। নাজির বউকে বিয়ে করতে চাইল। লোকটা নালিশ করল উজিরের কাছে। সেও বউকে বিয়ে করতে চাইল। সবাইকে আশা দিয়ে বউ তাদের কাছ থেকে অনেক টাকা নিল, বাড়ি তৈরি করল। সবাইকে কৌশলে ঘরে আটকে রাখল। আদি ফিরে এল বিদেশ থেকে। আদির সঙ্গে বউয়ের মিলন হল।[১৫] তাহলে বোঝা যাচ্ছে পরস্পর বিরোধী একাধিক চরিত্র থাকতে পারে কিন্তু নায়িকা কূটকৌশলে নায়কের সাথে মিলিত হয়। উক্ত বিষয়টি এখানে সূত্রের মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে।

৫. Law of three.

অর্থাৎ তিনের সূত্র। লোককাহিনীর জগতে পরিমাণ প্রকাশের কারণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে লোককথায় শ্রোতার কল্পনা সম্যক স্ফূর্তি লাভ করে। সেই সীমাহীন পরিতৃপ্তিকে সোজা হিসেবের মধ্যে বাঁধতে গেলে রসভঙ্গ হবারই সম্ভাবনা এই বোধটি সম্ভবত আত্মস্থ করেছেন কথক। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়ের অমর উপন্যাস 'পথের পাঁচালী'র কথা, 'তারপর দ্রোণতো একেবারে

দশবান ছুঁড়লেন, অর্জুন করলেন কি একেবারে দুশোটা দিলেন মেরে।' (মযহারুল১৯৮৫)

৬. Law of twins : If two persons appear in the same role they are represented as small or weak, they ore often furious and when they become powerful they may become antagonists.[১৬]

অর্থাৎ যমজের সূত্র। লোককথার মধ্যে দেখা যায় যে, ঘটনাগুলোর মধ্যে যমজ সন্তানের মতো মিল থাকে। একজনের ক্ষেত্রে যা ঘটে, অন্যজনের ক্ষেত্রেও একই পরিবেশে একই রকম ঘটনা ঘটবে। যেমন 'কিরণমালা' কাহিনীটিতে অরুণ, বরুণ যখন মায়ার পাহাড় এ যায় তখন তলোয়ার ও তীরধনুকে পর্যায়ক্রমে 'মরিচা ' ও আগা খসে ধনুর ছিলা ছিঁড়ে' যাবার মধ্য দিয়ে একই পরিবেশ একই রকম ঘটনা ঘটে। আবার 'নীলকমল লালকমল' কাহিনীতে লালকমলকে রাক্ষসে এবং নীলকমলকে রাক্ষসী রানী খেয়ে ফেলে। সুতরাং দুটো কাহিনীতে যমজ সূত্রের মতো একই পরিবেশ একই রকম ঘটনার মিল পরিলক্ষিত হয়।

৭. Importance of final position

অর্থাৎ চূড়ান্ত অবস্থানের তাৎপর্য। এ সূত্রে আলোকে বাংলা 'দেড় আঙুলে ' 'ডালিম কুমার'[১৭] ও ইউরোপিয়ান' 'The Adventure of Tom Thumb' বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে কাহিনীতে প্রধান চরিত্র এবং তাৎপর্যময় ঘটনা দুই ক্ষেত্রেই নায়ক প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে সাফল্যের শিখরে আরোহণ করেছে। সে কারণে শুধু সমাপ্তিতে কেবল প্রধান দুই চরিত্র দেড় আঙুল ও Thumbএর কথায় মিল পাওয়া যায়।

৮. Law of single strand

অর্থাৎ একক উপাদানের সূত্র। কাহিনীর মধ্যে প্রধান গুচ্ছকেই প্রাধান্য দেওয়া হয় এককভাবে। যেমন; 'পাতাল কন্যা মণিমালা' কাহিনীতে রাজকন্যা মণিমালার সঙ্গে অন্যান্য রূপকাহিনীর রাজকন্যাদের পার্থক্য হচ্ছে রাজকন্যা জলের তলায় পাতাল প্রদেশে এক সাপের অধীনে বন্দিনী হয়ে বাস করত। সাপের মাথার মণির সাহায্যে পাতালের পথ চিনে রাজপুত্র মন্ত্রীপুত্র সেখানে উপস্থিত হয় এবং রাজপুত্রের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। পৃথিবী দেখার লোভের কারণে সে জলের বাইরে আসে এবং নিজের বিপদ ডেকে আনে।[১৮]

এখানে সাপ, মণি পাতালরাজ্য-ই কাহিনীর প্রধান গুচ্ছ।

৯. Law of patterning

আদর্শ গঠনের সূত্র। কাহিনীর আদর্শ নির্ভর করে তার উপমা, উৎপ্রেক্ষা ও রূপকের ওপর। 'সাত ভাই চম্পা' কাহিনীতে রূপ বর্ণিত হয়েছে এভাবে, 'অপরূপ সুন্দর সাত ভাই চম্পা চাঁদরে পুতুল, ফুলের কলি।'[১৯]এছাড়াও'শীত বসন্ত' কাহিনীর

সৌন্দর্যময় দৃশ্যাবলীর বর্ণনা প্রকাশ পেয়েছে বসন্ত পাহাড়ে উঠলেন, যেন গজমতির আলোয় ক্ষীরসাগরে হাজার চাঁদের মেলা পদ্মের বনে সোনারপাতে কিরণ খেলা। তাহলে অনুভূত হচ্ছে, কাহিনীর বর্ণনায় উপমা, রূপক, ভাষা প্রভৃতির প্রয়োগ অভিনব আকর্ষণ যোগ করেছে যা স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বাভাবিক।

১০. Use of fableaux scenes

অর্থাৎ সুসংবদ্ধ কাহিনীর দৃশ্য ও তার সূত্র। এসব দৃশ্যে কাহিনীর নায়ক-নায়িকা পরস্পরেরর সমীপবর্তী হয়। 'পাতাল কন্যা মণিমালা' কাহিনীতে ৩য় দৃশ্যে রাজপুত্র পরস্পরের সমীপবর্তী হয়।[২০] আবার 'সোনার কাটী রূপার কাটী' কাহিনীতে -রাজপুত্র, মণিমালা, মন্ত্রিপুত্র সাপের পুরীতে পরম সুখে দিন কাটায়। পরবর্তীতে পুরীতে রাজকন্যাকে সোনার কাটী রূপার কাটী দ্বারা জাগিয়ে তোলে এবং অন্যান্য রাক্ষস রাক্ষসীরা প্রতিদিন বাইরে গেলে রাজপুত্র, রাজকন্যা মণিমালা একে অপরের সন্নিকটে আসবার সুযোগ লাভ করে। কাহিনী বিশ্লেষণে অনুভূত হয়, প্রতি কাহিনী সুসংবদ্ধ এবং একে অপরের সমীপবর্তী।

১১. Logic of the sage

অর্থাৎ লোককাহিনীর যুক্তিশাস্ত্র ও তার সূত্র। এই বিশেষ সূত্র অনুসারে কিছু কিছু জিনিস একই সঙ্গে অন্য কিছু জিনিসেরও উপস্থিতি বাঞ্ছনীয়। যেমন খুব বেশি দুঃখের ছবি থাকলে সুখের ছবি থাকবেই।[২১] উদাহরণস্বরূপ 'ডালিম কুমার' কাহিনীতে 'রাণীর মূর্চ্ছা যাওয়া' 'ডালিম কুমারের অন্ধত্ব' 'রাজকন্যার ফল খাবার মধ্য দিয়ে পেটে লিখন প্রবেশ,' 'পাশাবর্তীর সাত বোন কর্তৃক সাত রাজপুত্র ও সাত পক্ষিরাজ খাবার মধ্য দিয়ে পেটে লিখন প্রবেশ', পাশাবর্তীর সাত বোন কর্তৃক সাত রাজাপুত্র ও সাত পক্ষিরাজ কুচিকুচি করে খেয়ে ফেলা' 'নগরে প্রতিদিন রাজার মৃত্যু[২২] প্রভৃতির মধ্য দিয়ে এক নাগাড়ে দুঃখের ঘটনার পর রাজা রাণী, আট রাজপুত্র, রাজকন্যা সকলের মিলনে শূন্যপুরীতে সোনার হাট মিলল[২৩]।

১২ Unity of plot: The plot is simple never complex. One story is told at a time. The carrying along of two or more subplots, is a sure sing of sophisticated literature.[২৪]

অর্থাৎ ঘটনা -সংস্থানের সূত্র ও ঐক্য। ঘটনাসংস্থানও হয় সাধারণ, সেগুলো কখনো জটিল হয় না। একই সময়ে শুধু একটি কাহিনী পরিবেশিত হয়। এক বা একাধিক উপ-কাহিনী বা ঘটনা সংস্থান থাকলে তা জটিল বা বাস্তবধর্মী সাহিত্যের প্রমাণ দেয়।

১৩. Concentration of a leading character

অর্থাৎ প্রধান চরিত্রের উপর গুরুত্ব আরোপ ও তার সূত্র।

ওলরিকের এই তেরোটি সূত্রকে বিশ্লেষণ করে স্টিথ টমসন নয়টি সূত্রে সুসংবদ্ধ করেছেন ঃ

১. লোককাহিনীর ঘটনা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য দিয়ে শুরু হয় না এবং তার সমাপ্তি অকস্মাৎ ঘটে না। তার ভূমিকাটি ধীরে সুস্থে আরম্ভ হয় এবং তা কাহিনীর চূড়ান্ত পর্যায়ের পরেও একটি স্থির বিন্দু পর্যন্ত অগ্রসর হয়।

২. পুনরাবৃত্তি সর্বত্রই উপস্থিত থাকে তা শুধু কাহিনীকে উৎকণ্ঠাপূর্ণ মুহূর্তই দেয় না, তা কাহিনীর অবয়বকে দৈর্ঘ্য দান করে।

৩. সাধারণত একই সময়ে একই দৃশ্যে দুজনের বেশি চরিত্র থাকে না। যদি দুজনের অধিক থাকেও, তাহলেও তাদের মধ্যে মাত্র দুজন একই সঙ্গে সক্রিয় থাকে।

৪. পরস্পর বিরোধী চরিত্র পরস্পরের সম্মুখীন হয়; যেমন নায়ক ও নায়কের শত্রু, ভাল এবং মন্দ ব্যক্তি।

৫. যদি একই ভূমিকায় দুজনকে দেখা যায় তবে দুজনকেই অকিঞ্চিৎকর বা দুর্বল বলে মনে হবে। অনেক সময়েই এরা হয় যমজ ভাই এবং যখন তারা শক্তিশালী হয়, তখন তারা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ায়।

৬. দলের মধ্যে যে সবচেয়ে দুর্বল বা নিকৃষ্ট। সেই শেষ পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ হয়ে দাঁড়ায়। সাধারণভাবে কনিষ্ঠভ্রাতা ও ভগ্নীই বিজয়ী বলে প্রমাণিত হয়।

৭. চরিত্রচিত্রণ খুবই সাধারণ পর্যায়ের। শুধু সেই গুণগুলির কথাই উল্লেখ করা হয়, যেগুলি কাহিনীকে সরাসরি প্রভাবিত করে।

৮. ঘটনা সংস্থান সাধারণ স্তরের; অযথা কখনো জটিলতা সৃষ্টি করা হয় না। একই সময়ে শুধু একটি কাহিনী পরিবেশিত হয়, এক বা একাধিক উপকাহিনী বা ঘটনা সংস্থান থাকলে তা জটিল বা বাস্তবধর্মী সাহিত্যের প্রমাণ দেয়।

৯. কাহিনীতে সমস্ত কিছুই পরিবেশিত হয় অত্যন্ত সাধারণভাবে। একই ধরনের বিষয়বস্তু একইভাবে পরিবেশিত হয়। অর্থাৎ কাহিনীকে বৈচিত্র্যমণ্ডিত করার কোনো প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায় না।[২৫] আলোচনার পরিসমাপ্তিতে বলা যায় আক্সেল ওলরিক এর নির্দেশিত বিষয়গুলি বজায় রেখেও বাংলা লোককাহিনী নীরস গদ্যের আবৃত্তি মাত্র হয়ে ওঠেনি একটি অপূর্ব শ্রুতি সুখকর ব্যঞ্জনার অনুভূতি, বর্ণনা কৌশলের মাধ্যমে, অভিব্যক্তির চিত্রে ও নতুনত্বে শ্রোতার মানসপট জুড়ে বিরাজ করে চিরকাল। চিরচেনা পার্থিব উপকরণগুলো সংগ্রহ করেও লোককাহিনীর জগৎ সম্ভব ও অসম্ভবের ঊর্ধ্বে রঙিন বিশ্বাসের তরঙ্গে মোড়া।

তথ্য নির্দেশ

১. ওয়াকিল আহ্মদ, লোকসংস্কৃতি , ৭ম খণ্ড, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, পৃ. ২।

২ আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোকসাহিত্য, ১মখণ্ড, ১৯৬৬,পৃ৩৯৭।

৩ Stith Thomson, The Folktale University of Calefornia Press, 1977 p. 4.

৪. Websters Seventh New Collegiate Dictionary, Indian edition,1971, p. 324.

৫. Maria Leach ed. Standard Dictionary of Folklore Mythology and Legend, 1949, p. 401

৬. চূড়ামণি হাটি, লোকসংস্কৃতির দিগদিগন্ত, গ্রন্থ বিকাশ, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা,২০০৯, পৃ ৪৫.।

৭. Thomson Stith, The Folklore, University of Caleformia Press, 1977, p 455.

৮. ঐ পৃ. ৪৫৬।

৯. দিব্যজ্যোতি মজুমদার, বাংলার লোককথার টাইপ ও মোটিফ ইনডেকস্; আদিবাসী ও লোকসংস্কৃতিচর্চা কেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০০৫, পৃ. ১২১।

১০. দিব্যজ্যোতি, ঐ পৃ. ১০৫-১০৬।

১১. Stith Thomson, p 456

১২ আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোকসাহিত্য, ১মখণ্ড, ১৯৬৬, পৃ ৭০৭।

১৩ Stith Thomson p 56

১৪. ঐ

১৫ দিব্যজ্যোতি, ঐ পৃ ১৩১-১৩২।

১৬. Stith Thomson. p. 456.

১৭. দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার পৃ. ১৬৩, ১০৭।

১৮. ডঃ দুলাল চৌধুরী (সম্পাদিত) বাংলার লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ, আকাদেমী অব ফোকলোর, কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ৫৯।

১৯. দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, ১৩৬৩, পৃ. ৩২।

২০ ড দুলাল চৌধুরী (সম্পাদিত), ঐ পৃ. ৬৫।

২১ ঐ।

২২. দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, পৃ. ১০৭, ১১৫।

২৩. ঐ পৃ. ১১৫।

২৪. অন্তবা মিত্র, জাতীয়তাবাদী পদ্ধতিতে বাংলা লোককথার বিচার বিশ্লেষণ , পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০৪, পৃ.১৪।

২৫. ড. দুলাল চৌধুরী (সম্পাদিত), ঐ পৃ. ৬৫।

একটি লোককথা : বিভিন্ন পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ

অতসী নন্দ গোস্বামী

"বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তের লোকসমাজ সেই কোন্ ভুলে যাওয়া কাল থেকে সামাজিক প্রয়োজনে, ধর্মীয় তাগিদে ও অনাবিল আনন্দে লোককথা সৃষ্টি করে চলেছেন। আজও হাজারো প্রতিকূলতার মধ্যে পারিপার্শ্বিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের মধ্যেও লোককথা সৃষ্টি হচ্ছে। লোককথার এই ব্যাপ্ত বিশাল ভাণ্ডার প্রত্যেককেই বিস্মিত করে। যদিও মৌখিক ঐতিহ্যে যা রয়েছে তার সামান্য অংশই সংগৃহীত হয়েছে। কেননা, আজও শত-সহস্র লোকসমাজের কোনো লোক কথাই প্রকাশিত হয়নি। কিন্তু প্রশ্ন জাগে কবে থেকে মানুষ এইসব লোককথা বলছেন?"

(দিব্যজ্যোতি মজুমদার : লোককথার লিখিত ঐতিহ্য : ৫৭)

এ প্রশ্ন তো সকলের। কবে থেকে মানুষ লোককথা বলছেন? তার বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য কোথায়? এই সবকিছু প্রশ্নের একটাই উত্তর লোকমননের সহজাত অভিজ্ঞতার প্রকাশ। অনেক দিনের জমে থাকা যন্ত্রণার অভিজ্ঞতার প্রকাশ পাওয়া যায় লোককথার ভেতর। রূপকের আড়ালেই তা মূর্ত হয়ে ওঠে। তবে কাহিনীর প্রেক্ষিতের মধ্যে যে বাস্তবতা তা যতোই অলীক বা রূপকাশ্রিত হোক তার বাস্তবায়িত রূপ কখনো সম্ভব নয়। অধিকাংশ লোককথার অন্তর্গত মানবেতর চরিত্রগুলি মূলত মানব চরিত্রেরই রূপক বা প্রতীকী উপস্থাপনা। কাহিনীগুলোর মধ্যে একজাতীয় সমষ্টিগত সামাজিক অভিজ্ঞতাই ক্রিয়াশীল। যদিও কল্পনা বিলাসের চরিতার্থকরণ প্রায় অসম্ভব, তবুও কোথাও কোথাও তা সামাজিক অবস্থানের সাক্ষ্যবহ হয়ে ওঠে।

একটি প্রচলিত লোককাহিনী হল 'টুনটুনির বই'-এর অন্তর্গত 'বোকা জোলা আর শিয়ালের কথা।' গল্পের মূল বিষয় হল মায়ের মৃত্যুর পর বোকা জোলাকে শিয়াল সান্ত্বনা দিয়ে বলে তার সঙ্গে রাজার মেয়ের বিয়ে দেব। অনেক বাধা পেরিয়ে শিয়াল জোলার সঙ্গে রাজার মেযের বিয়ে দেয়, পরে জোলা রাজা হয়। জোলা নিরক্ষর, গরীব, তার রাজা হওয়া এতো স্বপ্নের মতো। কিন্তু রাজা হয়ে যাওয়ার পর তার আকাঙ্ক্ষার পরিমাণ বেড়ে যায়, কারণ সব মানুষই স্বপ্ন দেখে অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য এবং সামাজিক কৌলীন্যের। জোলার জীবনের দুটি পরিবর্তন— এক, রাজা হওয়ার মধ্য দিয়ে দারিদ্র্যের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে ধন-সম্পদ ভোগ, দুই, রাজা হয়ে ক্ষমতার উচ্চে বসে তার সামাজিক সম্মান প্রতিষ্ঠার ভোগ। জোলার এই উন্নতির ইচ্ছে বা প্রাপ্তি-এ অতি স্বাভাবিক প্রবণতা। তাই জোলার এই ইচ্ছে মূলত সমষ্টিগত সামাজিক স্বপ্ন হিসেবেই চিহ্নিত হতে পারে। বাস্তবের বিচারে যদিও এটি অলীক তবুও

লোককাহিনীর মধ্যে যখন এটির বাস্তবরূপ পায় তখনই সামাজিক কল্পনার চরিতার্থকরণ হয়ে যায় অজান্তেই।

সামাজিক সম্পর্ক, অর্থনৈতিক বিপর্যয়, অন্যায় অবিচার, দুর্বলের ওপর সবলের অত্যাচার— এ সব বিষয়ে অসংখ্য লোককথা আছে। এগুলির মাধ্যমে শুধু যে বিষয়টাকেই তুলে ধরা হয় তা নয় লোকসমাজের বেদনাময় সংগ্রামশীল রূঢ় বাস্তবের ঐতিহাসিক রূপটি লুকানো রয়েছে। এই ধরনের সংগ্রামের পরিচয় পাওয়া যায় আদিবাসীদের লোককথাগুলির মধ্যে। আমাদের রাজ্যে মোট ৩৬টি আদিবাসী গোষ্ঠী আছে। অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও মোঙ্গোলীয়, সাঁওতাল, মুণ্ডা, কোড়া, লোধা, শবর, ওঁরাও, টোটো, চাক্‌মা, লেপচা, ধিমাল, ভুটিয়া প্রভৃতি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে যেমন রয়েছে ভিন্ন সংস্কৃতির ভাণ্ডার তেমনি রয়েছে অফুরন্ত লোককথা— যা তাদের নিত্যদিনের বেঁচে থাকার রসদ। এরা বিভিন্ন দিক দিয়েই বঞ্চনার শিকার। সেই বেদ মহাকাব্য পুরাণের আমল থেকে ভারতবর্ষের আদিবাসীদের অনেক লাঞ্ছনা অবমাননা সহ্য করতে হয়েছে। তবে ভারতবর্ষ যখন ঔপনিবেশিকদের কবলে তখন তো এদের অনেক অবমাননা সহ্য করতে হয়েছে তেমনি আবার এঁরাই আদিবাসীদের ভাষাকে আত্মস্থ করে বৃহৎ বঙ্গের লোককথা প্রকাশ করার কথাও ভেবেছেন। এঁরা কেউ নৃবিজ্ঞানী, কেউ প্রশাসক আবার কেউ খৃষ্টীয় পুরোহিত। উদার মানবিকতাব পরিচয় বহনকারী এই মানুষেরা। আদিবাসীরা দরিদ্র, শ্রমনির্ভর জনগোষ্ঠী। তাঁদের দিনযাপনকালে অনেক যন্ত্রণাময় পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। এই সব যন্ত্রণাময় অভিজ্ঞতার কথাই রূপকের আড়ালে মূর্ত হয়ে ওঠে তাদের লোককথায়। অনাহার, যন্ত্রণা, বলবানের অত্যাচার, লাঞ্ছনা— এসবই এদের লোককথার বিষয়বস্তু। মনুষ্যেতর প্রাণীদের দিয়ে বলানো হয়েছে মানুষের কথা। ধূর্ত, প্রতারক মানুষ কীভাবে দুর্বল মানুষকে ক্রমাগত ঠকিয়ে যেতে পারে তাও তাদের লোককথাতে বলা হয়েছে। এরকমই একটি লোককথা হল শবর জনগোষ্ঠীর লোককথা— 'চালাক শেয়াল বোকা কুমির'। শবর জনগোষ্ঠীর লোককথা এটি। গল্পটি সংক্ষেপে এইরকম:

এক ব্যক্তি অনেক দূর গ্রামে তাঁর মেয়ের বাড়ি গিয়েছিল। ফেরার সময় নদীর তীরে পৌঁছোতে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে হয়ে যায়। ওপারে যাওয়ার নৌকো নেই। খুব চিন্তায় পড়ে যায় লোকটি। এমন সময় এক কুমির তাকে বন্ধু সম্বোধন করে নদী পার করে দেওয়ার কথা বলে। বন্ধু বলায় লোকটি নির্ভয়ে কুমিরের পিঠে উঠে বসে। প্রায় কিনারায় এসে গেছে এমন সময় কুমির তাকে খেতে চায়। লোকটি তো অবাক! এই না বন্ধু বলে নিয়ে এল আর এখন খেতে চায়! কুমিরের স্পষ্ট জবাব ওসব বন্ধু বলে কিছু হয় না, সামনে খাবার পেয়েছে সে খাবে।

লোকটি-তো দিশেহারা। এমন সময় নদীর তীরে এক শিয়ালকে দেখতে পেল লোকটি। কুমিরকে বললো শেয়ালকে জিজ্ঞেস করতে সে কী করবে। শেয়াল চিরকালই ধূর্ত স্বভাবের। সে পুরো ব্যাপারটাই বুঝে গেল। লোকটিকে ইশারা করে

লাফিয়ে পালিয়ে যেতে বললো লোকটিও তাই করল। কুমির সব বুঝে শেয়ালকে শাস্তি দেওয়ার জন্য দিন গুনতে লাগল।

এরপর শুরু হল কুমিরকে একের পর এক কারণে বোকা বানানো আর শেয়ালের চালাকির পরীক্ষা। কখনো নদীতে কাঁকড়া খেতে এসে শেয়াল কুমিরকে ঠকায়, আমার কুমির বনের মধ্যে শেয়ালের গর্তে ঢুকে লুকিয়ে থাকলেও কোনো লাভ হয় না। শেয়াল সব বুঝতে পারে। বোকা কুমিরকে আগুনে পুড়ে মরতে হয়। এখানে গল্পের দুটো অংশ। প্রথম অংশে কুমির আর লোকটির কথা আর দ্বিতীয় অংশে শেয়াল আর কুমিরের কথা। তবে শেয়াল দুই অংশেই মুখ্য ভূমিকায়। পশুকেন্দ্রিক অধিকাংশ লোককথাতেই শেয়ালকে ধূর্ত প্রকৃতির বলেই বর্ণনা করা হয়। হয়তো অনেক হিংস্র জন্তুদের সঙ্গে এক জায়গায় বসবাস করার সময় চালাকি দিয়েই নিজেকে রক্ষা করতে হয়। গল্পটিকে সাংগঠনিক দিক দিয়ে বিশ্লেষণ করে দেখা যায়—

লোকসংস্কৃতিবিদ ভ্লাদিমির জে. প্রপ লোকসংস্কৃতির ইতিহাস ও বিজ্ঞান বিশ্লেষণে যথেষ্ট পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর মতে লোকসংস্কৃতির বিচিত্র উপাদানকে প্রথমে সুসংবদ্ধভাবে সাজাতে হবে, তারপর প্রয়োজনে যথার্থ শ্রেণিকরণ দরকার, তবে শ্রেণিকরণে শুধু বিষয়বস্তুর ওপর নির্ভর করলেই চলবে না, কাহিনীগুলির মৌলিক তাৎপর্য অনুধাবন করতে হবে। লোককাহিনীর অন্তর্নিহিত ও কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আরো পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করতে হবে। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ Morfologiya Skazki- প্রকাশিত হয় ১৯২৮-এ। এতে লোককাহিনীর রূপতাত্ত্বিক ও কাঠামোগত বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ আছে। ৩০ বছর পর ১৯৫৮-তে বইটির ইংরেজি অনুবাদ Morphology of Folktale প্রকাশিত হয়। ইংরেজিতে অনুবাদ করেন L.Scot, তখন থেকেই সংগঠনতত্ত্ব (structuralism) হয়ে ওঠে একটি স্বতন্ত্র পদ্ধতি।

প্রপের মতে কোনো একটি লোককথার নানা বিষয়ে অদলবদল ঘটা সম্ভব, কিন্তু তার কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য সবসময়ই একই রকম থাকবে, তাঁর মতে লোককথার কতকগুলি অংশ পরিবর্তনীয় (Variable), আর কতকগুলি অপরিবর্তনীয় (Constant), ক্রিয়াশীলতা হল এই অপরিবর্তনীয় অংশ। একেই তিনি নাম দিলেন— 'Action of Function'- The name of the dramatic Person change neither their action nor function change the function as such is a constant. [Propp : 1970]

ক্রিয়াশীলতার ভিত্তিতেই প্রপ 'Folk tale'-এর শ্রেণিকরণ হওয়া উচিত বলে মনে করেন,

'For the sake of comparison we shall separate the component of fairy tales by special methods and then, we shall make a comparison of tales according to their components. The result will be a morphology (i.e, a description of the tale according to component part and the relationship of these components to each other and to the whole.' [Propp : 1970 : 1.9]

কাহিনীর মধ্যেকার সমস্ত উপাদানের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং তার সঙ্গে সমস্ত কাহিনীর যে সম্পর্ক নির্মিত হয় সেটি হল রূপতাত্ত্বিক পরিকাঠামো। তাই পূর্বে উল্লিখিত যে অপরিবর্তনীয় ক্রিয়াশীলতা তাকেই প্রপ বলেছেন 'ফাংশান' (function)। কোনো চরিত্রের কোনো ক্রিয়া যা তার সক্রিয়তার পর্যায়ে নিহিত তাৎপর্যের সাপেক্ষে বিচার্য। সূত্রভিত্তি হিসেবে এই প্রক্রিয়ায় চারটি বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়— (১) এই প্রক্রিয়াগুলিই কোনো কাহিনীর উপাদান ভিত্তি তৈরি করে এবং বিভিন্ন চরিত্রের এই প্রক্রিয়াগুলি হল স্থির ও অপরিবর্তনীয় উপাদান। এগুলি কীভাবে ও কার দ্বারা রূপায়িত হচ্ছে তা বিবেচ্য নয়। (২) রূপকথার ক্ষেত্রে এ জাতীয় প্রক্রিয়াগুলির সংখ্যা সীমাবদ্ধ। (৩) বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় অন্তর্বর্তী অনুক্রম সবসময়ই সমজাতীয়। (৪) সামগ্রিক গঠনের সাপেক্ষে সমস্ত রূপকথাই একটি নির্দিষ্ট টাইপ। রুশ লোককথাকে ভিত্তি করে প্রপ একত্রিশটি শিরোনাম সহযোগে চরিত্র নির্দেশ করেছেন। কিন্তু রুশ লোককথার মতো আমাদের দেশের লোককাহিনীগুলোকে হয়তো উদ্দিষ্ট সবকটি শিরোনাম ভুক্ত করতে পারা যাবে না। তবুও প্রপের সূত্রানুসারে সেগুলিকে আবদ্ধ করা যেতে পারে। প্রপ নিজেই বলেছেন—

'Only some 31 functions may be noted. The action of all tales included in our material develops within the limits of these functions. They all belong to a single axis and not, as has already been mentioned, to a number of areas." [Propp : 1970 ;64]

কাহিনীর মধ্যে দুটি অংশ প্রধান— একটি বর্ণনা অংশ অন্যটি ক্রিয়া বা ঘটনার ধারা। যেখানে ঘটনার ধারা আসছে সেখানে ঘটনার ক্রমগুলি পরপর সজ্জিত থাকে। এই ঘটনার ক্রমগুলিকে প্রপ কতকগুলি function হিসেবে দেখেন। এই function-এর সমন্বয়েই হয় একটি আদ্যন্ত ঘটনা। ঘটনাগুলির ক্রমিক বিন্যাস অথবা ঘটনাগুলির বিষয় অনুযায়ী বিন্যাস নিয়ে তৈরি হয় একটি সম্পূর্ণ কাহিনী। পূর্বে আলোচিত শবর জনগোষ্ঠীর লোককথা 'চালাক শেয়াল বোকা কুমির' গল্পটি বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

শূন্য : প্রারম্ভিক অবস্থা (আলফা)

প্রত্যেক লোককাহিনীতেই প্রারম্ভিক অবস্থা বর্তমান। এখানেও আছে ঐ লোকটির কথা।

(১) পরিবারের কোনো একটি বাড়ি থেকে দূরের পথে রওনা হয় (বিটা)

লোকটির বাড়ি থেকে মেয়ের বাড়ি রওনা হওয়া। পরে মেয়ের বাড়ি থেকে বাড়ির পথে রওনা হওয়া।

(২) সতর্কবাণী উচ্চারিত হওয়া (গামা)

এটি দুভাবে হতে পারে— ১। নায়কের প্রতি নির্দিষ্ট নিষেধবাণী উচ্চারণ।
২। নিষেধের বিপরীত হিসেবে কোনো নির্দেশ বা পরামর্শ।

এখানে দ্বিতীয়টিই প্রযোজ্য। কেননা লোকটি কুমিরের পিঠে চড়ে নদী পার হওয়াতে ক্ষতি হতে পারে এমন সতর্কবার্তা সে নিজের ওপর নিজেই করে বসে।

তিন : নিষেধটি লঙ্ঘিত হয় (ডেলটা)

তিন রকম ভাবে এই লঙ্ঘন হতে পারে।— ১। যেভাবে নিষেধ করা হয়, সেইভাবেই লঙ্ঘিত হয়।

২। অনুক্ত নিষেধের ক্ষেত্রে কোনো নির্দেশ অমান্য করা হয়।

৩। নিষেধবাণী উচ্চারণ ছাড়াই নিষেধলঙ্ঘন পূর্বক কাহিনীর সূত্রপাত।

এই কারণটিই এখানে পাওয়া যায়। লোকটিকে কেউ নিষেধ করেনি। সে নিজেই কুমিরের পিঠে চড়ে নদী পার হতে যায়। এবং এখান থেকেই কাহিনীর সূত্রপাত।

৬। খলনায়ক চাতুরীর অন্য উপায় অবলম্বন করে। (প্রতারণা /ইটা)

কুমির লোকটিকে বন্ধু বলে সম্বোধন করে নদী পার করে দিতে চায়।

৭। নায়ক চাতুর্যের শিকার হয় এবং অজ্ঞাতেই নিজের শত্রুকে সাহায্য করে (দুষ্কর্মে সহযোগিতা /থিটা)

লোকটি কুমিরকে বিশ্বাস করে তার পিঠে চড়ে বসে এবং তীরে আসার আগেই লোকটিকে কুমির খেতে চায়।

৮। মানুষ খেয়ে ফেলতে পারে বলে ভয় দেখায় (খলত্ব /A)

কুমির বন্ধুবলাটা ছলনা সেটা স্বীকার করেই তাকে খেয়ে ফেলার ভয় দেখায়।

১৩। ভাবী সহায়কের কর্মপদ্ধতিতে নায়কের প্রতিক্রিয়া (নায়কের প্রতিক্রিয়া/E)

শিয়ালের সহায়তায় অর্থাৎ ইশারায় নায়কের লাফিয়ে লোকালয়ে দৌড়ে পালিয়ে যাওয়া।

এরপরে গল্পটির কিন্তু অন্য একটি অংশ। আগের অংশে লোকটি আর কুমির function ছিল এবং শেয়াল আর কুমিরের।

১৬। নায়ক এবং খলনায়ক প্রত্যক্ষ দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়(দ্বন্দ্ব/ H)

কুমির এবং শেয়াল প্রত্যক্ষ দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়। কুমিরের শিকার নষ্ট করেছে শেয়াল।

২২। নায়ক নিজেকে গিলে ফেলার সুযোগ দেয় না। (উদ্ধার/ RS)

শেয়াল নদীতে কাঁকড়া খেতে গেলে কুমির তাকে গিলতে এলে সে বুদ্ধিমত্তা দিয়ে তাকে গিলতে দেয়না।

৩০। খলনায়কের শাস্তি (শাস্তি/ U)

কুমির শেয়ালের গর্তে লুকিয়ে থাকার সময় শেয়াল বুঝতে পারে। তাই সে গর্তে আগুন লাগিয়ে দেয়। কুমির পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এভাবেই সে তার শাস্তি পায়।

প্রপের এই বিশ্লেষণ মূলত প্রক্রিয়াভিত্তিক তাই এই পদ্ধতিকে functional school বলা হয়। এছাড়াও প্রপ বিভিন্ন গতিমুখের কথা বলেছেন। যেমন খলনায়কের প্রতিটি নতুন কাজ, প্রত্যেকটি দুর্ভাগ্য বা অভাব এগুলো সবই একটি নতুন নতুন গতিমুখ সৃষ্টি করে।

প্রপের লোককাহিনীর প্রক্রিয়াভিত্তিক আলোচনার পর আর এক উল্লেখযোগ্য সংগঠনতাত্ত্বিক হলেন ক্লোদ লেভিস্ত্রোস। ১৯৫৫-তে প্রকাশিত হয় তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ 'Structural Study of Myth', এটি প্রকাশিত হয় 'Journal of American Folklore'এ। ১৯৬১ তে লিখলেন 'Structural Anthropology'-র প্রথম খণ্ড এবং ১৯৭৬-এ দ্বিতীয় খণ্ড। লোককথায় রূপতাত্ত্বিক ও কাঠামোগত আলোচনার ক্ষেত্রে লেভিস্ত্রোস নতুন এক পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। তাঁর মতে মানুষের সচেতন মনের সৃষ্টি হল লোককথা। রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের শুরুতেই তিনি জোর দিতে বলেছেন মোটিফের বৈশিষ্ট্যের ওপর। যে কোনো জনগোষ্ঠীর লোককথার বৈভব ও বৈচিত্র্য ধরা পড়ে মোটিফের মাধ্যমে। প্রত্যেকটি লোককথার এক বা একাধিক মূল বিষয় থাকে। এই মূল বিষয়ই হল মোটিফ। একটি লোককথার খণ্ড খণ্ড কাহিনী অংশ সমগ্র কাহিনীকে অখণ্ড সূত্রে গড়ে তোলে। স্টিথ টমসন-এর মতে—

'A motif is the smallest element in a tale having a power to persist in tradition. In order to have this power it must have something unusual and striking about it.'

বি. জীবজন্তু

১। বি ১২০.২ বুদ্ধিমান শেয়াল

২। বি ২১০ কথাবলা পশু

কে. প্রতারণা

৩। কে ৭৫১ মড়ার ভান করে প্রতারণা

৪। কে ৭৫১.৬ কুমির মড়ার ভান করে শেয়ালকে জব্দ করতে চায়

৫। কে ৭৫১.৭ শেয়াল কুমিরকে বারবার প্রতারণা করে।

এস. অস্বাভাবিক নিষ্ঠুরতা

৬। এস ৪০০ যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

লেভিস্ত্রোস মোটিফকে গুরুত্ব দিয়েছেন এই কারণেই কেননা তাঁর মতে কোনো একটি পদ্ধতি বা system-এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয় কাহিনীর গঠনের মধ্যে। ফলে কাহিনী যে মূল উপাদানগুলি নিয়ে তৈরি হয় সেই উপাদানগুলির বিন্যাস পরস্পর পরস্পরের ওপর নির্ভর করে থাকে। তাই মূল উপাদান বদলাতে পারে না। অন্য উপাদানগুলো বদলালে তবেই সেটা বদলায়।

গল্পটি আগেই আমরা সংক্ষেপে জেনেছি। গল্পে চরিত্রের সংখ্যা তিন, লোকটি, শেয়াল আর কুমির।

লেভি-স্ত্রোসের সূত্র অনুযায়ী এই গল্পে চরিত্রগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক হল:

A : কুমির

B : লোকটি

প্রক্রিয়াটি হল :

X : বোকা বানানো

Y : বোকা বনে যাওয়া।

প্রথম পর্যায়ে লোকটিকে কুমির বোকা বানাচ্ছে বা এই প্রতারণামূলক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করছে এবং তার ফলে লোকটি বোকা বনে গেল অর্থাৎ প্রতারিত হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে শেয়ালের উপস্থিতিতে গল্পটি অন্য দিকে চলে যায়। সেখানে কুমিরকে শেয়াল বোকা বানাচ্ছে আর কুমির ক্রমশই শেয়ালের কাছে বোকা বনে গেল। কাহিনীর ক্রিয়াশীলতার পরিসমাপ্তি ঘটছে। তাই সূত্র অনুযায়ী বলা যেতে পারে :

কুমিরের প্রতারণামূলক প্রক্রিয়া : লোকটির প্রতারিত হওয়া মূলক প্রক্রিয়া :

:: শিয়ালের প্রতারণামূলক প্রক্রিয়া : কুমিরের প্রতারিত হওয়া

কাহিনীর অন্তর্গত সংযোগ সাধন পদ্ধতি বা সংগঠন হল :

'A' চরিত্রের 'X' জাতীয় প্রক্রিয়া : 'B' চরিত্রের 'Y' জাতীয় প্রক্রিয়া

· : : 'B' চরিত্রের 'X' জাতীয় প্রক্রিয়া : 'A' চরিত্রের সুলভ প্রক্রিয়ার বিপরীত জাতীয় এবং 'Y' চরিত্র সম্পন্ন প্রক্রিয়া।

অর্থাৎ প্রথম পর্যায়ে—

কুমিরের বোকা বানানোর প্রক্রিয়া : লোকটির বোকা বনে যাওয়া

:: লোকটির কুমিরকে বোকা বানানোর প্রক্রিয়া : কুমিরের বোকা বনে যাওয়া (শেয়ালের সহযোগিতায়)

সেরকমই দ্বিতীয় পর্যায়ে একটি ভিন্ন ধরনের সংগঠন :

কুমিরের শেয়ালকে বোকা বানানোর চেষ্টা : শেয়ালের বোকা বনে না যাওয়া

: শেয়ালের কুমিরকে বোকা বানানোর চেষ্টা : কুমিরের বোকা বনে যাওয়া।

দ্বিতীয় অংশে আমরা এই তত্ত্বের একটু ব্যতিক্রম দিকই পেলাম। অর্থাৎ ধূর্ত শেয়ালকে বোকা কুমির বোকা বানানোর চেষ্টা করলেও বোকা বানাতে অক্ষম।

লেভিস্ত্রোসের পর বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সংগঠনতত্ত্বের ধারায় আর এক উল্লেখযোগ্য ধারার প্রবর্তক ই.কোঙ্গাস মারাণ্ডা এবং পি.মারাণ্ডা। লেভি-স্ত্রোস যে রূপকল্পের সাংগঠনিক বিশ্লেষণ করেছেন মারাণ্ডা দম্পতি সেই তত্ত্বকে গ্রহণ করেই তাঁদের পদ্ধতি উপস্থাপিত করেছেন। লেভিস্ত্রোসের সূত্রে কোনো নির্দিষ্ট চরিত্রের একটি বিশেষ প্রক্রিয়া fx(A) এবং অপর চরিত্রের স্বতন্ত্র কোনো প্রক্রিয়া fy(B)— মারাণ্ডা দম্পতির তত্ত্বে তা 'আপাত সমাধান' এবং 'আপাত ফল'। এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের অপর দুটি প্রক্রিয়া fx(B) এবং fA-(y) তারা হল শেষ সমাধান এবং শেষ ফল। আলোচ্য গল্পটিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে—

আপাত সমাধান — লোকটিকে কুমির প্রতারণা করার চেষ্টা করল

আপাত ফল— কুমির বাঘটিকে প্রায় প্রতারিত করে ফেলে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে—

শেষ সমাধান— শেয়ালের সহযোগিতায় কুমির লোকটিকে প্রতারিত করতে পারল না।

শেষ ফল— শেয়ালের দ্বারা কুমির প্রতারিত হল।

গল্পের নাম	আপাত সমাধান	আপাত ফল	শেষ সমাধান	শেষ ফল
চালাক শেয়াল বোকা কুমির	১। লোকটি নদী পার হতে চায় ২। কুমির বন্ধু বলে পার করে দিতে চায়।	১। প্রায় নদীর তীরের কাছে পৌঁছে কুমির লোকটিকে খেতে যায়। ২। বন্ধুত্বে বিশ্বাসঘাতকতা করে বসে কুমির। ৩। শেয়ালের সহযোগিতায় লোকটি কুমিরের হাত থেকে কোনোরকমে রক্ষে পায়।	১। শেয়ালের ওপর কুমির রেগে যায়। ২। নদীতে শেয়াল কাঁকড়া ধরতে এলে কুমির তার পায়ে কামড় দেয়। শেয়ালের বুদ্ধির জোরে বেঁচে যায়। ৩। শেয়াল গর্ত থেকে বেরিয়ে গেলে কুমির তার গর্তের মধ্যে অনেক কষ্টে ঢুকে পড়ে। ৪। শেয়াল গর্তের সামনে আঁচড় দেখে বুঝতে পারে তার গর্তে কুমির ঢুকে আছে। সে তার গর্তে ঢোকে না। ৫। শেয়াল গর্তের মুখে আগুন লাগিয়ে দেয়।	কুমির পুড়ে ছাই হয়ে যায়। বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি পায়।

বোঝাই গেল গল্পটির মধ্যে এই ধরনের প্রক্রিয়াগুলো কখনো প্রকট আবার কখনো বা প্রচ্ছন্ন। আমরা যতই গল্পের সংগঠনগত বিশ্লেষণ করি না কেন গল্পতো মানুষের সহজাত মননের সৃষ্টি এক কাহিনী। যা শুনে মনের আনন্দকে উপলব্ধি করা যায়। আর আদিবাসী জনগোষ্ঠীদের লোককথাতো তাদের সরল পবিত্র মনের পরিচয় বহন করে। আলোচনা করেছি শবর জনগোষ্ঠীর একটি প্রচলিত লোককথা, এঁরা মূলত কৃষিজীবী, এঁরা হতদরিদ্র। আবহমান কাল ধরেই প্রতিবেশীদের উপেক্ষা -অবজ্ঞা এঁদের হতমান করে রেখেছে। এঁদের ঐতিহ্য প্রাচীনকাল থেকেই মহাকাব্যের বিশ্বামিত্র, পুরাণের শিবের সঙ্গে শবরদের সম্পর্কের কথা আছে, পুরাণে বলা হয়েছে 'অভিশপ্ত' গোষ্ঠী 'অভিশপ্ত' বিষয়টি হিন্দুদের রচনা। চর্যাপদেও এঁদের পরিচয় পাই।

মানবসমাজের বিস্ময়কর সৃষ্টি লোককথা। এগুলির উৎস মৌখিক। বলা যেতে পারে একটি গোষ্ঠীর সংস্কৃতির সঙ্গে অন্য গোষ্ঠীর সংস্কৃতির বিরোধ বা বিচ্ছেদ তা যেমন বাইরের, তেমনি এর ভেতরে আছে একটি বন্ধন। এর দেখা মেলে লোককথায়, স্থানীয় পরিবেশ, ভাষা, সংস্কৃতি— সবকিছুর যোগে তৈরি হয় লোককথা। বলা যেতে পারে—

"লোককথা শুধুমাত্র আনন্দের অভিব্যক্তি নয়, এর মধ্যে লোকসমাজের বেদনায় সংগ্রামশীল রূঢ় বাস্তবের ঐতিহাসিক রূপটি লুকানো রয়েছে। দারিদ্র্য, বঞ্চনা, উৎপীড়ন, ইচ্ছা পূরণের তাগিদ ও কঠিন জীবনযুদ্ধের জ্বালা লোকসমাজের সর্বক্ষণের সঙ্গী। লোককথা সেসব বাস্তব অবস্থার সাংস্কৃতিক বহিঃপ্রকাশ, রূপকের আড়ালে জীবনের কথা। সামাজিক ও গ্রামীণ অর্থনৈতিক ইতিহাসের মৌখিক উপাদান লুকিয়ে রয়েছে লোককথার মধ্যে।"।

(মজুমদার : ১৯৯৮; ১৩)

সহায়ক গ্রন্থ

১. দিব্যজ্যোতি মজুমদার : পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী লোককথা : লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র : ২০০৬

২. " : বাংলা লোককথার টাইপ মোটিফ ইনডেক্স : ২০০৫

৬. উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরি : টুনটুনির বই : নির্মল বুক এজেন্সি :১৯৭৭

৮ Jawharlal Hando (ed) Folklore in Modern India : CIIL : 1998

৯. " Current trends in Folklore : University of Mysore, 1978

১০. Claude Levi Strauss : Anthropology and Myth : Basil Blackwell : Ltd. Oxford, 1987.

১১. V. Propp : Morphology of Folktale : University of Texas : Press, Austin and London, 1970.

১২. E.K Maranda & : P Maranda Structural Models in Folklore and Transformational essays Mauton, Hague, 1971

লোককথার ভুবনে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র

বিশ্বজিৎ রায়চৌধুরী

লোককথা বা গল্পবলার প্রবৃত্তি কবে, কোথায় এবং কিভাবে জন্ম হয়েছিল তা আজ আমাদের পক্ষে বলা সম্ভব নয়। তবে এটা অনুমান করাই যায় যে, সভ্যতার বিশেষ এক পর্বে মানুষ তার জীবনের অভিজ্ঞতাগুলিকে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে সঞ্চারিত করার জন্য গল্প-কথকের ভূমিকাকে গ্রহণ করেছিল। মানুষের বহুকল্প জীবনের অভিজ্ঞতা সঞ্জাত সূত্র থেকেই গল্পকথা বা লোককথার উদ্ভব। আর তাই লোককথাগুলির মধ্যে জীবনের নানান টানাপোড়েন, হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, জয়-পরাজয়, সততা ও শঠতা, বঞ্চনা ও অত্যাচার এবং তার থেকে মুক্তির উপায় ইত্যাকার বিষয়গুলি ঘুরে ফিরে এসেছে। এককথায় বলা যায় যে, লোককথা আসলে মানুষের জীবন দর্শনকেই প্রতিফলিত করেছে, নানান মাত্রায় নানান আঙ্গিকে।

আমরা যদি মানব ইতিহাসের আদিপর্বের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাব যে, আদিম গুহাবাসী মানুষ ঘুরে বেড়াত বনে-জঙ্গলে আপন খাদ্য আহরণের জন্য, তখন তাদের সামনে একদিকে ছিল হিংস্র পশু, অন্যদিকে প্রকৃতির ভয়ঙ্কর রূপ। হিংস্র পশু চাইত তাদের বিনাশ করতে, আর মানুষ চাইত তাদের শিকার করে ক্ষুধা নিবৃত্তি করতে। টিকে থাকার সেই সংগ্রামে মানুষই জয়ী হয়েছে বারংবার। প্রকৃতির আশ্রয়ে লালিত-পালিত এবং নিরন্তর সংগ্রামরত আদিম মানুষ ক্ষুধা নিবৃত্তির উপায় রূপ অভিজ্ঞতা ও শিকারের পদ্ধতিকে আগামী প্রজন্মের মধ্যে সঞ্চারিত করতে চেয়েছে। এর জন্য তারা প্রথমে অঙ্গভঙ্গি প্রদর্শন করে তাদের সেই লব্ধ অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করেছিল তরুণ প্রজন্মের কাছে।

কারণ, তখনও ভাষার উদ্ভব হয়নি। খুব স্বাভাবিক কারণেই ভাব-প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে তারা অঙ্গ-ভঙ্গি প্রদর্শনকেই প্রথমে হাতিয়ার করেছিল। সেই অঙ্গভঙ্গি প্রদর্শনের মধ্য দিয়েই সেদিন আধুনিক সভ্যতা সংস্কৃতির বিশেষ এক শিল্পের (অভিনয় শিল্প) আবির্ভাব ঘটেছিল অনেকটা মানুষের অজান্তেই। আবার, সেই প্রদর্শিত অঙ্গভঙ্গি বা অভিনয় সবসময় সকলের পক্ষে মনে রাখা সম্ভব না হওয়ায়, আদিম মানুষ তার অভিজ্ঞতাকে গুহার দেওয়ালে চিত্রিত করে রাখল। বিভিন্ন গুহায় প্রাপ্ত শিকারের ছবি তারই সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। মানুষের অভিজ্ঞতা সঞ্চালনের এই প্রবৃত্তি থেকে

একদিন জন্ম হল আরও একটি শিল্পের, সেটি চিত্রশিল্প। আর এই চিত্রই একদিন সভ্যতার বিশেষ পর্বে মানুষকে 'লিপি' বা 'বর্ণ' সৃষ্টি করতে সাহায্য করেছিল, তা বোঝাই যায়। কারণ, যে কোনো লিপিই চিত্রের প্রতীকী রূপ।

ভাষা সৃষ্টির পর সভ্যতার যে বিশেষ পর্বে লব্ধ অভিজ্ঞতাকে মুখে মুখে সঞ্চারিত করেছিল মানুষ, সেই পর্বেই জন্ম হয়েছিল মৌখিক সাহিত্যের—তা সহজেই অনুমেয়। লোককথার জন্ম হয়েছিল ঐ রকম এক বিশেষ পর্বে। প্রধানত, দুটি বিশেষ প্রয়োজনকে সামনে রেখে এর আবির্ভাব বা জন্ম। প্রথমত, প্রাপ্ত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাগুলিকে আগামী প্রজন্মের মধ্যে সঞ্চারিত করার মধ্য দিয়ে লব্ধ অভিজ্ঞতার স্থায়িত্ব লাভ। দ্বিতীয়ত, অবসর সময়ে গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের বিনোদনের জন্য গল্প বলা বা কাহিনী সৃষ্টির প্রয়োজন। সেই সৃষ্টির প্রয়োজনে তাদের বুদ্ধিবৃত্তি কল্পনার আশ্রয়কেই গ্রহণ করেছিল। কিন্তু যেহেতু সমস্ত কল্পনার জন্যই প্রত্যক্ষ বাস্তব কিছু সূত্র থাকা আবশ্যিক ও প্রাসঙ্গিক শর্ত, খুব স্বাভাবিক কারণেই তাদের সৃষ্ট গল্প কাহিনীতে তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। অর্থাৎ ভাষা-সৃষ্টির বিশেষ এক পর্বে মানুষ তার জীবনের অভিজ্ঞতাগুলিকে সুশৃঙ্খলভাবে পরবর্তী প্রজন্মের চিন্তা-চেতনার মধ্যে সঞ্চারিত করার উদ্যোগ গ্রহণ এবং অবসর সময়ে প্রকৃতির বর্ণময় রূপের সৌন্দর্য ও তাকে আশ্রয় করে ঘটে চলা নানান ঘটনাকে সাজিয়ে গল্প সৃষ্টির প্রবণতাই একদিন লোককথার জন্ম দিয়েছিল[১]। সেই অভিজ্ঞতাগুলি কখনো ব্যক্তি কর্তৃক লব্ধ, আবার কখনো বা তা ছিল গোষ্ঠী কর্তৃক আহরিত। অভিজ্ঞতার রসে সিঞ্চিত হয়ে লোককথাগুলি তাই অনেক সময় মূল্যবান নীতি তত্ত্বের জন্ম দেয়। যুগ যুগ ধরে মুখে মুখে চলে আসা লোককাহিনীগুলি নানান পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিবর্দ্ধন হতে হতে অনেক সময়েই তার উৎসরূপ হারায়। কিন্তু তবু তার মৌলসূত্র বা দর্শনটি অবিকৃত থাকে। অর্থাৎ, অভিজ্ঞতার যে সূত্রটিকে কথক তার কাহিনীর মধ্যে নানান বর্ণে ও অলঙ্কারে সাজিয়ে তোলেন, তার বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয় না।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের লোককথাগুলি গভীর ভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, প্রতিটি লোককথার মধ্যে দুটি প্রধান অংশ বর্তমান। ভাষাবিজ্ঞানীর সূত্রানুযায়ী তার একটি অংশকে 'অন্তর কাঠামো' (Deep Structure) আর অপর অংশটিকে 'বহির কাঠামো' (Surface Structure) বলা যায়। প্রতিটি লোককথার 'অন্তর কাঠামো'র (Deep Structure) মধ্যেই থাকে কথকের প্রধান চিন্তা ভাবনাটি, যাকে রূপ দেওয়ার জন্যই কথক লোককথাটি নির্মাণ করেন। অর্থাৎ 'অন্তর কাঠামোর' মধ্যেই থাকে লোককথাটির মৌলসূত্র বা দর্শনটি। 'বহির কাঠামোটি' (Surface Structure) প্রকৃতপক্ষে 'অন্তর কাঠামোটিকে' স্পষ্টভাবে পাঠকদের হৃদয়ে সঞ্চারিত

করার বাহক হিসেবে কাজ করে। মনে রাখতে হবে লোককথাটির অন্তর কাঠামোয় অবস্থিত 'মৌলসূত্র' বা দর্শনটি কখনোই রূপান্তরিত হয় না, রূপান্তরিত হয় লোককথার 'বহির কাঠামোর' উপাদানগুলি। দেশে দেশে অঞ্চলভেদে একই লোককথার যে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়, তা কেবলমাত্র তার 'বহির কাঠামো'র রূপান্তরকেই নির্দিষ্ট করে। অর্থাৎ, বলা যায় যে, দেশে দেশে বা অঞ্চলে অঞ্চলে কথকরা শুধুমাত্র বহির কাঠামোটিকেই পরিবর্তন করেন। কিন্তু লোককথাটি যে দর্শন বা জীবনের যে বিশেষ অভিজ্ঞতাটি সাধারণ মানুষের কাছে সঞ্চারিত করতে চান, যা প্রকৃতপক্ষে অন্তর কাঠামোর প্রাণ, তার কোনো পরিবর্তন হয় না।

অঞ্চলভেদে লোককথার পরিবর্তনের এই প্রক্রিয়াটিকে আমরা "লোককথার স্থিতিস্থাপকতা সূত্র" (Law of Elasticity of Folk-tale) হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। এক্ষেত্রে অর্থনীতির সূত্রানুযায়ী অন্তর কাঠামোটি "স্থিতিস্থাপক" (Elastic) এবং বহির কাঠামোটি "অস্থিতিস্থাপক" (No Elastic) সূত্রকে মেনে চলে। অর্থাৎ কাহিনীটি সঙ্কোচন বা প্রসারণ করার পরেও অন্তর-কাঠামোর পূর্বাবস্থা বা দর্শনটির কোনো পরিবর্তন হয় না, কিন্তু কাহিনীর 'বহির-কাঠামোটি' কাহিনী সঙ্কোচন বা প্রসারণ করার পর পূর্বাবস্থা পায় না। এই সূত্রানুসারে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে পরিচলনকালে অথবা অঞ্চল ভেদে সেই লোককথার আবির্ভাব কালে লোককথাটির মূল তত্ত্ব বা দর্শন, অর্থাৎ যে অভিজ্ঞতাটি কথক আগামী প্রজন্মের মধ্যে সঞ্চারিত করতে চান, তার কোনো পরিবর্তন হয় না। পরিবর্তিত হয় সংশ্লিষ্ট লোককথার উপাদানগুলি (বহির কাঠামোর) যা প্রকৃতপক্ষে সেই অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক, ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তবে সেক্ষেত্রে সকল সময় একটি প্রাসঙ্গিক সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য বিদ্যমান থাকে অন্তর কাঠামোটির সঙ্গে। কখনোই এমন কিছু হতে পারে না, যা অন্তর কাঠামোটির প্রাণ বা মৌলসূত্রকে ব্যাহত করে। আর তাই 'অন্তর কাঠামো' (Deep Structure) ও 'বহির কাঠামো' (Surface Structure) এই দুটির সংহত বুনোটের মধ্য দিয়ে কথক তার কাহিনীটিকে একটি প্রাসঙ্গিক পরিণতির দিকে নিয়ে যান। খুব স্বাভাবিক কারণেই একই লোককথা ভারতবর্ষে কিংবা আফ্রিকায় ভিন্নমাত্রা বা আঙ্গিকে পরিবেশিত হয়েও একই জীবনদর্শন বা অভিজ্ঞতাকে প্রতিষ্ঠিত করে। জীবনের একটি বিশেষ অভিজ্ঞতা বা জীবনদর্শন খুব সহজেই রাজা-মন্ত্রী, দাস-দাসী, রাক্ষস-খোক্কস, রাজকন্যা-রাজকুমার, কিংবা নানান পশুপাখি বা জীবজন্তুর কথার আড়ালে পৌঁছে যায় পাঠকের হৃদয়ে। এখানেই ঐশ্বর্য। এখানেই লোককথার বিশিষ্টতা। একটি চিত্রের সাহায্যে তা দেখান হল ঃ
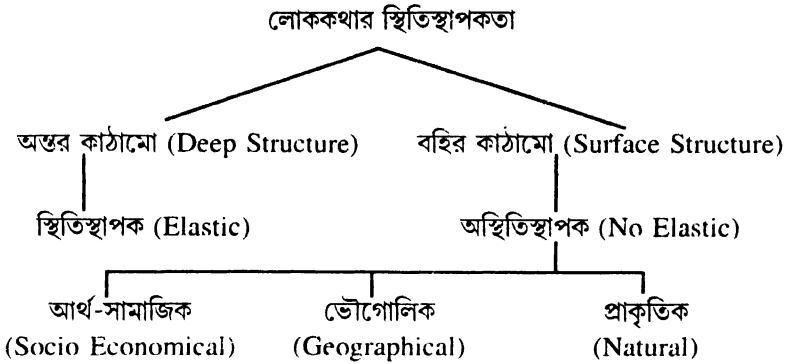
আর্থসামাজিক অবস্থানটি যেমন নির্ভর করে সমাজ-সভ্যতার পরিবর্তনের কোন স্তর বা পর্যায়ে লোককথাটি সৃষ্টি হয়েছে তার উপর, তেমনি আবার সেই অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান এবং তার প্রভাবটি প্রকটিত থাকে সংশ্লিষ্ট লোককথাটিতে। সেই সঙ্গে কোন্ বিশেষ প্রাকৃতিক পরিবেশ বা সম্পদের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল সেই সমাজ, তারও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব পরিলক্ষিত হয় সংশ্লিষ্ট লোককথার মধ্যে।

লোককথার 'অন্তর কাঠামো' (Deep Structure) ও 'বহির কাঠামো' (Surface Structure) বুঝতে আমরা আফ্রিকার দুটি গল্পের সাহায্য নিতে পারি। গল্প দুটিতে একই ভাবনা চিত্রিত হয়েও কিভাবে তার 'বহির কাঠামো' রূপান্তরিত হয়েছে। তারই পরিচয় পাওয়া যাবে। 'বনের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী চড়ুই'[২] ও 'সত্যনিষ্ঠ বিগ ক্লাব'[৩] শীর্ষক লোককথা দুটি আফ্রিকার দুটি ভিন্ন অঞ্চলের। কাহিনী দুটির মধ্যে রয়েছে, দুর্বলের প্রতি সবলের চিরাচরিত অত্যাচার এবং তার থেকে মুক্তির উপায় হিসেবে বুদ্ধির সাহায্য গ্রহণ এবং 'বুদ্ধি যেখানে, সাফল্য সেখানে' (বুদ্ধিং যস্য ফলং তস্য) এই প্রবাদটির সার্থক চিত্রণ। সেইসঙ্গে একথাও স্পষ্টভাবে ঘোষিত হয়েছে যে, দুর্বল অসহায় মানুষদের মধ্যে প্রখর বুদ্ধিমত্তা থাকা সম্ভব, যার সাহায্যে সে সমস্ত প্রতিকূল অবস্থাকে অতিক্রম করতে পারে। শুধু তাই নয়, ওরা যে সমাজেরই একজন এবং ওরাও যে সমাজের বিশেষ উপকারে লাগতে পারে, এমন ভাবনাটিও গল্প দুটির "অন্তর কাঠামো"র মধ্যে সংগুপ্ত রয়েছে। প্রথম গল্পটিতে এক চড়ুই পাখি কিভাবে অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য হাতি ও কুমিরকে বুদ্ধিবলে পরাস্ত করেছিল তার কাহিনী, আর দ্বিতীয় গল্পটিতে রয়েছে 'সত্যনিষ্ঠ বিগ্ ক্লাব' নামক এক বিকলাঙ্গ যুবকের কাহিনী। এই প্রতিবন্ধী যুবক সমস্ত প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করে বুদ্ধির সাহায্যে কুমির ও সিংহকে পরাস্ত করেছিল। তবে দ্বিতীয় কাহিনীটির আর একটি বিশেষ দিক হল, এ কাহিনীতে বিকলাঙ্গ যুবক 'সত্যনিষ্ঠ বিগ্ ক্লাব' খরার জলকষ্টে

দিশেহারা আফ্রিকার বুরুণ্ডি রাজ্যের গ্রামবাসীদের জন্য টাঙ্গানাইকার হ্রদ থেকে জল এনে দিয়েছিল।

আর তাই আমাদের আলোচ্য গল্পে দুটির মধ্যে দ্বিতীয় গল্পটিতে (সত্যনিষ্ঠ বিগ্‌ক্লাব) রয়েছে খরায় দিশেহারা মানুষের কথা, যারা সত্যনিষ্ঠ বিগ্ ক্লাবকে হত্যা করতে চেয়েছিল। কারণ সংস্কারের দ্বারা চালিত হয়ে তারা বিশ্বাস করেছিল যে, বিকলাঙ্গ যুবক সত্যনিষ্ঠ বিগ্ ক্লাবের জন্যই দেশে খরার আবির্ভাব ঘটেছে। তবে, টাঙ্গানাইকা হ্রদ থেকে সে জল এনে দেবে, এই প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় তাকে ছেড়ে দিয়েছিল তারা। সত্যনিষ্ঠ বিগ্ ক্লাব তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিল। সুতরাং, একথা সহজেই বোঝা যাচ্ছে যে, একই দর্শন বা অভিজ্ঞতার দ্বারা সম্পৃক্ত এবং গঠিত লোককথার মধ্যে অঞ্চল ভেদে নানান উপকাহিনী থাকতে পারে, কিন্তু তার মৌলিক ভাবনাটি অপরিবর্তিত থাকে।

প্রথম গল্পের চড়ুই পাখি দ্বিতীয় গল্পে রূপান্তরিত হয়েছে 'সত্যনিষ্ঠ বিগ্ ক্লাব' নামক প্রতিবন্ধী যুবকের চরিত্রে। চড়ুই পাখি যেমন পাখিদের মধ্যে খুবই দুর্বল, তেমনি আবার বিকলাঙ্গ যুবক শারীরিক ও মানসিক দিক দিয়ে অক্ষম। আবার দ্বিতীয় গল্পে প্রথম গল্পের হাতির পরিবর্তে এসেছে সিংহ। এক্ষেত্রেও ক্ষমতার দিক দিয়ে হাতি ও সিংহ উভয়েই বেশ বলবান। এ ছাড়া দ্বিতীয় কাহিনীতে আরও কয়েকটি চরিত্র সংযোজিত হয়েছে, যা কিন্তু প্রথম কাহিনীটিতে নেই। অর্থাৎ অঞ্চল-ভেদে লোককাহিনীর যে পরিবর্তন বা পরিবর্ধন ঘটছে, তা কেবলমাত্র 'বহির কাঠামোটি'র (Surface Structure) উপাদানগুলির মধ্যেই। এই পরিবর্তন বা পরিবর্ধন 'অন্তর কাঠামোর' (Deep Structure) মূলসূত্র বা অভিপ্রায়কে ব্যাহত করছে না। খুব স্বাভাবিক কারণেই অন্যান্য মৌখিক সাহিত্যের মতো কথকের মুখে মুখে ঘুরে ফেরা কাহিনীতে, কথকের আপন কল্পনার মাধুরী মিশ্রিত হয়ে অঞ্চলভেদে পরিবর্তিত বা পরিবর্ধিত হয়। সেই সঙ্গে জুড়ে থাকে সেই অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক, ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের অভিজ্ঞান—যা প্রকৃতপক্ষে সেই লোককাহিনীটির জন্মস্থানটিকে চিহ্নিত করে।

উল্লিখিত দুটি গল্পতেই 'অন্তর কাঠামোর' (Deep Structure) মধ্যে সংগুপ্ত থাকা গল্পের প্রাণটি [যাকে আমরা জীবন দর্শন, জীবন-ভাবনা, অভিজ্ঞতা, তত্ত্ব ইত্যাকারে চিহ্নিত করি] রূপান্তরিত হয়নি, রূপান্তরিত হয়েছে, 'বহির কাঠামো'র উপাদানগুলি। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, লোককথায় সবসময় 'বহির কাঠামোর' উপাদানগুলি, 'অন্তর কাঠামোর' মধ্যে অবস্থিত লোককথাটির মৌলসূত্র বা প্রাণটিকে কাহিনীর প্রাসঙ্গিক পরিণতির অভিমুখে নিয়ে যেতে সাহায্য করে মাত্র। এই প্রসঙ্গে আরও একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আমাদের মনে রাখতে হবে যে, 'অন্তর

কাঠামোটি' কখনোই বাইরে থেকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। কারণ, এটি উপলব্ধিগম্য। বোধের দ্বারা উপলব্ধি করতে হয়। গল্পটি শুনে পাঠক মনে মনে কাহিনীর মধ্যে সঞ্চারিত গল্পের মৌলসূত্র বা জীবনের অভিজ্ঞতাটিকে উল্লেখ করেন, যা প্রকৃতপক্ষে কথকের মূল অভিপ্রায়। আমাদের আলোচ্য দুটি গল্পেরই মৌলিক ভাবনা বা দর্শনটি হল, "দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার এবং পরিশেষে বুদ্ধিবলে দুর্বল-অসহায় প্রাণী বা মানুষের বিজয় ঘোষণা।"

আমরা প্রথমেই বলেছি যে, লোককথা হচ্ছে অভিজ্ঞতা সঞ্চালনের মাধ্যম। কারণ, সমাজ সভ্যতার প্রতিটি স্তর বা পর্যায়ে মানুষকে পারস্পরিক বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়েছে। অর্থাৎ, সংগ্রামই হচ্ছে মানব ইতিহাসের প্রধান সূত্র। সেই সংগ্রাম আবার নিয়ন্ত্রিত হয় যে স্তর বা পর্বে মানুষ অবস্থান করছে, তার আর্থ-সামাজিক, ভৌগোলিক, প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপর। সমাজ বিজ্ঞানী মার্কসের দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের সূত্রানুযায়ী শ্রেণীসংগ্রাম বা দ্বন্দ্বই হচ্ছে সভ্যতা বিবর্তনের প্রধান ও একমাত্র সূত্র। সেই শ্রেণী দ্বন্দ্ব [যাকে তিনি স্থিতি (Thesis) অস্থিতির (Anti thesis) দ্বন্দ্ব ও তার পরিণতিকে 'সমস্থিতি' (Synthesis) বলে চিহ্নিত করেছেন] অর্থাৎ, তাঁর 'দ্বন্দ্বমূলক-বস্তুবাদের' দুটি প্রধান অংশ। প্রথমত, সেটি দ্বন্দ্বমূলক (Dialectical); দ্বিতীয়ত, 'বস্তুবাদ' (Materialism)। অর্থাৎ "By 'the dialectical method' is meant the method of inquiry which seeks to investigate things in their movements and changes, and in their inter-relations and interactions." এবং বস্তুবাদ বলতে বুঝিয়েছেন— "By 'materialism' is meant the standpoint which seeks to explain everything within the material world, including all the phenomean of human life, from the material world itself."[8] সুতরাং মার্কসের এই 'দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ' সূত্রের প্রধান উপাদান হল বস্তু। তাঁর মতে : প্রথমত, এ জগৎ বস্তুময়। দ্বিতীয়ত, চিন্তা চেতনার উৎস হল বস্তু জগৎ। অর্থাৎ, বাস্তব জীবন দ্বারা মানুষের সবকিছুই নিয়ন্ত্রিত হয়। তৃতীয়ত, বস্তুজগৎ গতিশীল। স্থির বা অনড় নয়।

লোককথার কথকরা তাঁদের জীবনের অভিজ্ঞতা বা দর্শনকে আগামী প্রজন্মের মধ্যে সঞ্চারিত করতে চেয়েছেন—একথায় প্রায় সব পণ্ডিতরাই একমত। যদি তাই হয়, তাহলে সেই অভিজ্ঞতা বা দর্শন নিশ্চয় লোককথার মধ্যে বর্তমান আছে এবং সে কথা স্বীকার করে নিতে হবে আমাদের।

কোনো গল্প বা লোককথার বিষয় বলতে শুধুমাত্র কাহিনী বা প্লটের বর্ণনা বা চিত্রণ বোঝায় না। কাহিনী বা প্লট হচ্ছে ঘটনা প্রবাহের সুনিয়ন্ত্রিত শৃঙ্খলা, সেটি কাহিনীর বিষয়ের সম্পূর্ণতা নয়। লোককথার রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের পদ্ধতিকাররা [তাঁদের

মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়েও বলা যায়] শুধুমাত্র কাহিনী ঘটনার প্রবাহের শৃঙ্খলাকেই কাহিনীর বিষয়ের একমাত্র উপাদান বলে ভেবেছেন। এই প্রসঙ্গে মার্কসের সূত্রের আবার আমরা সাহায্য নেব। কারণ, মার্কসের মতে আমাদের চিন্তা-চেতনার উৎস হল বস্তু জগৎ। অর্থাৎ লোককথার কথকদের অভিজ্ঞতার সূত্রের চিন্তন প্রক্রিয়াটি বস্তুকে বা বস্তুজগৎকে আশ্রয় করে উদ্ভূত। অতএব, লোককথা যেহেতু কথকদের ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীবদ্ধ অভিজ্ঞতার প্রকাশ বা চিত্রায়ন, সেহেতু জীবনের অভিজ্ঞতা বা দর্শনটি লোককথার মধ্যে কোথাও না কোথাও সংগুপ্ত থাকে। সেই অভিজ্ঞতা বা দর্শনটিই গল্প বা লোককথা সৃষ্টির প্রধান কারণ। অতএব, তাকে অস্বীকার করে কোনো আলোচনাই সম্পূর্ণ হতে পারে না। কাহিনীর বিষয়টিকে নিম্নে একটি চিত্রের সাহায্যে উল্লেখ করলাম।

চিত্র নং-১
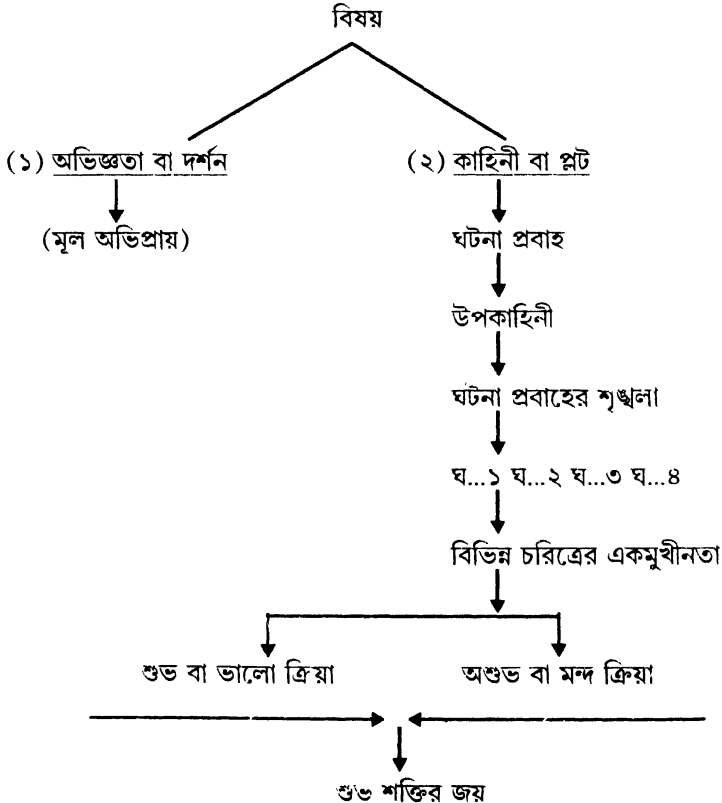
চিত্র নং-২
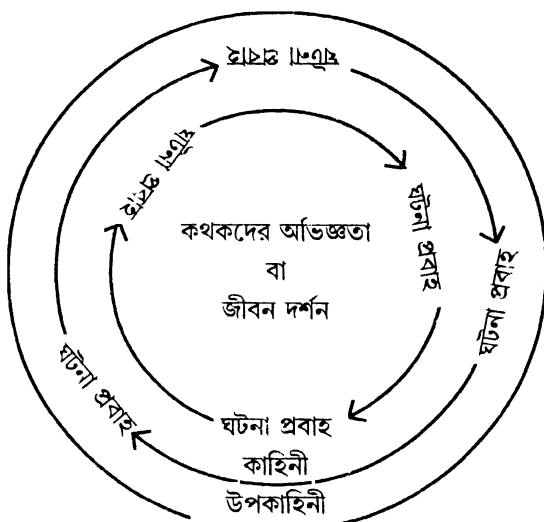
সুতরাং, আমরা বলতে পারি যে, গল্পের বিষয়ের দুটি অংশ। প্রথমত, কথকের মূল অভিপ্রায় বা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, যে অভিজ্ঞতাটি বা জীবনের দর্শনটি আগামী প্রজন্মের মধ্যে সঞ্চারিত করতে চান। দ্বিতীয়ত, কাহিনী বা প্লটের ঘটনা প্রবাহের শৃঙ্খলা। এই ঘটনা প্রবাহের শৃঙ্খলার পরিমাপ অনুযায়ী কাহিনী ও উপকাহিনী নির্ভর করে। আবার ঘটনা প্রবাহের মধ্যেই থাকে চরিত্রগুলির পারস্পরিক দ্বন্দ্ব। কারণ, কাহিনী বা উপকাহিনীতে চরিত্রগুলি বিন্যস্ত থাকে দুটি ভাগে। একটি ভাগে শুভ বা ভালো চরিত্রের ক্রিয়া, অন্যটিতে অশুভ বা মন্দ চরিত্রের ক্রিয়া। এটা ঘটে চরিত্রের একমুখী প্রবণতার জন্য। এইভাবে বিরুদ্ধ চরিত্রের পারস্পরিক দ্বন্দ্বের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার পর কাহিনীটি একটি নতুন স্বরূপ নিয়ে উপস্থিত হয়। সেটি কিন্তু গল্প সমাপ্ত হওয়ার পর আমরা উপলব্ধি করি। তাই কথকের মূল অভিপ্রায় বা অভিজ্ঞতার দর্শনটি উপলব্ধিজাত।

মানুষের ব্যক্তিজীবন, সমাজের নানান সমস্যা ও তার প্রতিকারের চেষ্টা এবং রাষ্ট্র-রাজনীতির নানান অসঙ্গতি লোককথাগুলিতে যুগ যুগ ধরে, ফল্গুধারার মতো বহমান। আমাদের মনে রাখতে হবে মানবের প্রধান উদ্দেশ্য হল উন্নত থেকে উন্নততর সমাজ সভ্যতায় উত্তরণ। তার চিন্তা-চেতনা, বুদ্ধি-বৃত্তি, সবই সেই প্রক্রিয়াকে আশ্রয় করে ছুটে চলেছে আবহমানকাল ধরে। আদিম গুহাবাসী মানুষ বহু লক্ষ

শতাব্দীর বিবর্তনের পর বর্তমান সভ্যতায় উন্নীত হয়েছে একথা সকলেরই জানা। সেই প্রবহমান বিবর্তন পর্বেই একদিন ধর্মের আবির্ভাব ঘটে সমাজ সভ্যতায়। সূর্যকেই পৃথিবীর আদিমতম দেবতা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন পণ্ডিতরা। গুহাবাসী মানুষ প্রভাতে গুহার মধ্য থেকে বেরিয়ে যখন গোলাকার রক্তিম বর্ণের সূর্যকে প্রত্যক্ষ করেছিল, তখন প্রথম প্রথম ভয়ে-শঙ্কায়-বিস্ময়ে তারা দিশেহারা। তারপর একদিন সে বুঝতে পারল যে, সেই রক্তিম বর্ণের গোলাকার বস্তুটির একদিক থেকে অন্যদিকে চলনের ফলে পৃথিবীতে আলো তাপ পাওয়া যায় (পৃথিবীর আবর্তনের কথা তখন তাদের কল্পনার মধ্যেও থাকতে পারে না)। যতক্ষণ সে (সূর্য) উপস্থিত থাকে ততক্ষণ চারিদিকের সবকিছু প্রত্যক্ষ করা যায়। প্রকৃতির বুকে ফোটে নানান বর্ণময় ফুল, গাছে গাছে ধরে ফল—যা তার বেঁচে থাকার উপকরণ। তারা এও উপলব্ধি করল যে সূর্যের উপস্থিতিতেই খাদ্য সংগ্রহ করা যায় এবং তার অনুপস্থিতিতে নেমে আসে ঘন অন্ধকার। এই বোধ জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গে আদিম মানুষের ভয় শিথিল হয়ে সূর্যের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের পথ খোঁজে। অন্যদিকে বিরূপ প্রকৃতির ভয়ংকর রূপগুলি, যেমন—ঝড়ঝঞ্ঝা, বজ্র-বিদ্যুৎ, ধেয়ে আসা সাগরের উদ্দাম ঢেউ—যা তাদের জীবনকে মাঝে মাঝেই গ্রাস করতে উদ্যত হত, তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে চাইল। প্রকৃতির রুদ্র রূপকে শান্ত করবার চেষ্টা এবং তার কল্যাণময়ী রূপকে বন্দনা করার অভিপ্রায়—এই দ্বিবিধ প্রক্রিয়া থেকেই সৃষ্টি হল নানান দেবতার। ঝড়ের দেবতা, অগ্নির দেবতা, অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টির দেবতা ইত্যাকার বিমুখ প্রকৃতির দেবমণ্ডলীর কৃপা ও প্রসাদ ভিক্ষার জন্য চলল যাগ-যজ্ঞ-হোমাদির আয়োজন। অন্যদিকে যে প্রকৃতি উষা হয়ে নেমে এসে আলো ছড়িয়ে দেয় পৃথিবীতে এবং রাতের অন্ধকারকে দূর করে জ্যোৎস্নার আলোকে ছড়িয়ে দেয় দিগন্ত থেকে দিগন্তে—তাকে করল প্রসন্ন অভ্যর্থনা। প্রকৃতির তেত্রিশ কোটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকেই এই ভাবেই একদিন কালক্রমে সৃষ্টি হল নানান দেবতার।

আর তাই সেদিন সব ভাব আর ভাবনা মিলেমিশে শুধু মাত্র বেঁচে থাকার তাগিদে জীবনের বেশির ভাগটাই কাটত যাগ-যজ্ঞ, পূজার্চনা ও নৃত্যগীত ও ধর্মোৎসবের মধ্যে। খুব স্বাভাবিক কারণেই তার কাব্য কথাও যে সেই ধর্মকে আশ্রয় করে হবে, তা নিশ্চয়ই বলার অপেক্ষা রাখে না। চীন-জাপান-গ্রীস-ভারতবর্ষ সব দেশেরই আদি সাহিত্য তাই ধর্মমুখী।[৬]

সভ্যতার প্রথম পর্বে মানুষ ধর্মকে আশ্রয় করেই বাঁচতে শিখেছে। তার যা কিছু মহৎ গুণ, যা কিছু পবিত্র সুন্দর, যা কিছু কল্পনা—সবই তখন আত্মপ্রকাশ ঘটেছে ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে আশ্রয় করেই। শিল্প-সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান সকল কিছুরই ধর্মীয় উৎসব বা অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করেই আবির্ভাব ঘটেছে তখন। আর তাই বলা হয়, এমন কোনো

ধর্ম নেই যেখানে শিল্প-সাহিত্যের স্পর্শ ঘটেনি; আবার এমন কোনো শিল্প-সাহিত্য নেই যেখানে ধর্মীয় বোধ প্রতিভাত হয় নি।[৭] বহু শতাব্দী ধরে ধর্ম ও শিল্প সাহিত্য পরস্পরের হাত ধরাধরি করে চলেছে। ধর্মীয় উৎসব ছিল তখন সৃষ্টির অনুঘটক। ধর্মকে আশ্রয় করে একদিন শিল্প-সাহিত্যের আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল। চর্যাপদ যেমন বৌদ্ধ সহজিয়া সম্প্রদায়ের সাধন-সংগীত, তেমনি বিভিন্ন দেব-দেবীকে আশ্রয় করে রচিত হয়েছে মঙ্গলকাব্য। আবার গ্রীক নাটকের উৎপত্তিও গ্রীক-দেবতা দিউনিসিসের ধর্মীয় অনুষ্ঠান থেকেই। গ্রীক ট্র্যাজেডি ও কমেডি নাটকের উৎসভূমি সেই ধর্মীয় উৎসব।[৮] আমাদের যেমন দেবতা শিব, গ্রীকদের ছিল তেমনি দিউনিসিস—একথা সাহিত্যের ছাত্র মাত্রেরই জানা।

কিন্তু সভ্যতার এক বিশেষ স্তরে এসে ধর্মকে নিয়ে শুরু হয় নানান ব্যবসা। কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষ তাকে অপব্যবহার করতে শুরু করলেন। আপন স্বার্থসিদ্ধির অবলম্বন রূপে ব্যবহৃত হতে থাকল ধর্ম। এর ফলে যা-ছিল একদিন সমাজ-সভ্যতার রক্ষক ও অগ্রগতির উপায়, তা হয়ে উঠল ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার। ধর্মের নামে নানান আজগুবি কথা প্রচার করলেন তাঁরা, যার কোনো প্রকৃত বাস্তব ভিত্তি নেই। সাধারণ গণমানসকে বিভ্রান্ত করার জন্য সেই বিড়াল-তপস্বীদের উদয় হল, আর তাদের অনুগামীরা হলেন তাদের ভাবশিষ্য। উৎপাদন সম্পর্কের সাথে তাঁদের কোনো সরাসরি যোগই রইল না। অথচ সাধারণ মেহনতি মানুষকে ধর্মের ভয় দেখিয়ে উৎপন্ন ফসলের অংশে বসাল ভাগ। সমাজ এ চিত্র প্রত্যক্ষ করেছে। আর তাই ধর্মগুরু শিষ্য প্রভৃতি বিষয়কে আশ্রয় করে লোককথার কথকরা অসংখ্য কাহিনী রচনা করলেন। ভণ্ড গুরু ও তার মূর্খ শিষ্যের কথা গভীর ব্যঞ্জনার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হতে দেখি একটি লোককথায়। 'নদী পেরোতে বিপত্তি'[৯] নামে সেই লোককথা আমাদের দেশে কন্নড়-তামিল ও তেলেগু ভাষায় বহুল প্রচলিত। গল্পটি এইরকম ঃ

"এক নিরেট গুরু তার বারোজন শিষ্যকে নিয়ে তীর্থে যাচ্ছে। পথে রয়েছে একটা নদী। তখন সন্ধ্যে। নদীর দিকে চেয়ে গুরু বলছে—'এ নদী বড়ই সর্বনেশে। অনেক মানুষ খেয়েছে ও। আমাদেরকে সাবধান হতে হবে। নদী যতক্ষণ না ঘুমোয়, আমরা পারে অপেক্ষা করে থাকব।' এরপর গুরু এক শিষ্যকে বলল, গিয়ে দেখে আসুক নদী ঘুমোচ্ছে, না জেগে আছে।

ওরা ধুনি জ্বেলেছিল। ধুনি থেকে একটা জ্বলন্ত কাঠ নিয়ে শিষ্য নদীর জলে ডোবাল। তখনি জলে ফোঁস ফোঁস শব্দ হল। শিষ্য দৌড়ে গিয়ে গুরুকে জানাল যে, 'নদী জেগেই আছে। এখন নদী পেরোনো যাবে না। কারণ, নদী রাগে ফোঁস ফোঁস শব্দ করছে'।

গুরু বলল, ঠিক আছে, নদী ঘুমোনো পর্যন্ত আমরা এই কুঞ্জবনে বিশ্রাম করি।

সকলে বিশ্রাম করছে। এক শিষ্য বলল, আমার ঠাকুরদা ছিলেন বড় ব্যবসায়ী। দুটো গাধার পিঠে লবণের বস্তা চাপিয়ে উনি একবার পেরোচ্ছিলেন। তখন গ্রীষ্মকাল। ওঁরা নদীতে নাইলেন, গাধা দুটোকেও নাওয়ালেন। ওপারে উঠে দেখেন, নদীটা সব লবণ খেয়ে নিয়েছে। বস্তার সেলাই খোলেনি, একটা ফুটোও ছিল না বস্তায়। শয়তান নদী সব লবণটাই খেয়ে ফেলেছে। আমরা এখন মাইল খানেক দূরে বসে আছি, এতে আমি ভারি নিশ্চিন্ত।

তারপর গুরু ও তার শিষ্যরা ঘুমোল, জাগল ভোরে। গুরু বলল, 'আবার দেখ তো হে, নদী ঘুমোচ্ছে কি না।'

সেই শিষ্য, আগের দিন নেভা কাঠটা নিয়েই গেছে। নদীতে ডোবাতে তো ফোঁসর ফোঁসর শব্দও নেই, ধোঁয়াও ওঠে না।

দৌড়তে দৌড়তে এসে সেই শিষ্য বলল—'এখন পার হওয়া যাবে। নদী এখন গাঢ় ঘুমে।' এরপর সকলে হাত ধরাধরি করে সন্তর্পণে ওপারে গিয়ে উঠল।

ওপারে উঠেই একজন বলল—'সকলে ঠিক মতো এসেছি তো? এ বড় বেইমান নদী। গুণে দেখা যাক, কতজন আছি।'

সে নিজেকে বাদ দিয়ে সকলকে গুণল। আর সঙ্গে সঙ্গে বিলাপ করতে সুরু করল এই বলে—"মোটে বারোজন কেন?" নদী আমাদের একজনকে খেয়েছে।'

গুরু এরপর অন্যজনকে গুণতে বলল। সেও নিজেকে বাদ দিয়ে গুণল। ফলে, সকলেই গুণে দেখল বারোজন। এরপর তারা বিলাপ করতে করতে নানান গাল ও অভিশাপ দিল নদীকে।

এই সময় এক পথিক ঐ পথ দিয়েই যাচ্ছিল। গুরু ও তার শিষ্যর মুখ থেকে সব কথা শুনল। বুঝতে পারল, গুরু ও তার শিষ্যরা আকাট মূর্খ। সঙ্গে সঙ্গে পথিক ফন্দি করল। বলল, "আমি জাদুকর, তোমাদের শিষ্যকে ফিরিয়ে দিতে পারি। তবে এর জন্য পয়সা ছাড়তে হবে।"

গুরু বলল, 'শিষ্যকে ফিরিয়ে এনে দাও, যা সম্বল আছে সব দেব।' ওরা তীর্থের সকল সম্বল বের করে দিল।

পথিক ওদের একজনকে এক ঝুড়ি গোবর আনতে বলল। সেই গোবল ভালো করে লেপে দিলে মাটিতে। তারপর, এক এক করে করে প্রত্যেককে বলল নীচু হয়ে নাক ডোবাতে। প্রত্যেকে তাই করল। এরপর নাকের ছাপগুলো গুণে দেখতে বলল পথিক।

গোবরে নাকের ছাপ তো তেরোটাই। নিরেট গুরু আর তার শিষ্যরা আনন্দে লাফাচ্ছে আর বলছে—'আবার আমরা তেরজন'। জাদুকব পথিককে ধন্যবাদ দিয়ে আবার চলল তারা।"

গোবরে নাক ডোবানো মূর্খ গুরু ও তার শিষ্যের যে পরিচয় লোককথার কথকরা ব্যঞ্জনার সঙ্গে প্রকাশ করেছিলেন, তা বোধ হয় বর্তমান কালের অনেক কাহিনীকেই পেছনে ফেলে দেবে। এমনই একটি অসমীয়া লোককথা "চোখ চালালেই মক্কা"[১০]। কিভাবে মৌলভি মোল্লা বা তথাকথিত গুরুদেবরা নানান ফন্দি ফিকির করে সাধারণ মানুষকে ভয় পাওয়ায় এবং তাদের কাছ থেকে সম্ভ্রম আদায় করতে চায় তারই এক অপূর্ব নিদর্শন ছোট্ট লোককথাটি, ধর্মপ্রাণ মানুষের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাদের প্রতিপত্তি বাড়ানোর প্রচেষ্টাকে সূক্ষ্ম শ্লেষের সঙ্গে প্রকাশ করা হয়েছে এখানে। গল্পটি এইরকম : "এক মোল্লাকে নেমন্তন্ন করেছিল এক ধর্মপ্রাণ দম্পতি। মোল্লা ঘরের চৌকাঠ পেরিয়েই হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে, "বেরো, বেরিয়ে যা", যেন কোনো পশুকে তাড়াচ্ছে।

বাড়ির কর্তা তখন তাকে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা, অমন করে চেঁচালেন কেন? মোল্লা তখন বলছে—"দেখলাম, মক্কার পবিত্র কাবায় একটা কুকুর ঢুকছে। তাই সেটাকে তাড়ালাম।"

কথাটা শুনে বাড়ির কর্তা তো তটস্থ। মোল্লার শক্তি কত! চোখ চালালেই সে হাজার হাজার মাইল দূরের মক্কা দেখতে পায়।

কিন্তু বাড়ির গিন্নির কথাটা তেমন বিশ্বাস হয় নি। মোল্লাকে খাবার পরিবেশন করার সময় গিন্নি ব্যঞ্জন তলায় রেখে ওপরে ভাত চাপা দিয়ে দিল। মোল্লা দেখছে, সকলের পাতে ব্যঞ্জন, একমাত্র তার পাতে নেই। সে তখন এদিক ওদিক চাইছে।

গিন্নি তখন বলল, "কিছু চাই আপনার? মোল্লা বলল, 'পাতে তো ব্যঞ্জন দেখি না।' সঙ্গে সঙ্গে গিন্নি বলে ওঠে—'চোখ-চালিয়ে মক্কা দেখতে পান। অথচ, ভাতের নীচে কি আছে তা দেখতে পাচ্ছেন না?"

'নদী পেরোতে বিপত্তি' কিংবা 'চোখ চালালেই মক্কা' ইত্যাদি লোককথার বিপরীতধর্মী লোককথাও আছে। যেমন, ওড়িয়া ভাষায় রচিত 'এক ধার্মিকের ধর্ম।'[১১] এ গল্পে খুঁজে পাওয়া যাবে একজন প্রকৃত ধার্মিকের স্বরূপ। আগেই বলেছি ধর্ম মানুষকে সকল সময় সঠিক পথে চালিত করতে সাহায্য করেছিল। ধর্মই মানুষকে লোভ-হিংসা, দ্বেষ-বিদ্বেষ ইত্যাকার নানান কুপ্রবৃত্তি থেকে বিরত থাকতে শিখিয়েছে একদিন। মানুষের শুভবুদ্ধি জাগ্রত করার পেছনে ধর্মকে অস্বীকার করতে পারি না আমরা। একজন প্রকৃত ধার্মিকের ধর্ম একটা গোটা-সমাজের মানুষকে রক্ষা করতে পারে। যতক্ষণ পর্যন্ত একজন অন্তত প্রকৃত পবিত্র ধার্মিক মানুষ থাকবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত সেই সমাজ বা রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ ধ্বংস সম্ভব নয়—এমনই একটি বার্তা পৌঁছে দিতে চেয়েছেন লোককথার কথকরা তাদের 'একজন ধার্মিকের ধর্ম' শীর্ষক কাহিনীতে। এই লোককথাটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল, তার প্রতীকী রূপ। রূপকের আড়ালে কথকরা মূল উদ্দেশ্যটিকে প্রতিভাত করেছেন এ গল্পে।

এ গল্পে ধর্ম মানে Religion নয়, ধর্ম মানে এখানে আদর্শ বা মতাদর্শ (Ideology) যে বাস্তব মতাদর্শ সমাজ সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যায় এবং যার অভিমুখ থাকে মানব সভ্যতাকে উন্নত থেকে উন্নততর স্তরে পৌঁছানোর দিকে। তেমনই এক আদর্শের উপর ভর করে দাঁড়িয়ে আছে একটি গ্রাম। এ গ্রামে থাকে শুধু বামুনরা। তাঁদের জীবনযাত্রা এতই পবিত্র ও মহৎ যে, প্রত্যেক ঘরে জ্বলে অনির্বাণ পবিত্র আগুন। একটু একটু করে সেই গ্রামে প্রবেশ করে নানান অপবিত্রতা। সাদাসিধে সরল-সহজ জীবনই ছিল যাদের প্রতিদিনকার জীবনের অনির্বাণ আগুনের প্রতীক, তার মধ্যে একদিন প্রবেশ করল নানান অপবিত্র অশুভ শক্তি। ফলে গ্রামের মানুষ হয়ে উঠল হিংস্র। পারস্পরিক বিবাদ-বিদ্বেষ ও সংঘর্ষ লেগেই রইল গ্রামে। আগের সেই গ্রাম এখন আর নেই। এখন সে গ্রামের লোক প্রায় প্রত্যেকে ধনী। কেবল একটিমাত্র পরিবার, সেই অপবিত্র বা অশুভ শক্তির লোভ-লালসা থেকে নিজেদেরকে পৃথক করে রাখতে সক্ষম হয়েছিল। তারা এখন থাকে গ্রামের শেষ প্রান্তে, এক কুটীরে। তাঁদের অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি। গ্রামের সকলে যখন ধনী হয়েছে, তখন শুধুমাত্র আদর্শের বড়াই করে গরিব হয়ে থাকার কোনো প্রাসঙ্গিক কারণ খুঁজে পেত না বাড়ির গিন্নি। তাই বাড়ির কর্তার সঙ্গে গিন্নির ঝগড়া হত প্রতিদিন।

একদিন সেই আদর্শবান পুরুষ গ্রাম ছেড়ে চলে যায়। এক সপ্তাহ যেতে না যেতেই গ্রামের মধ্যে শুরু হয় পারস্পরিক কলহ ও বিবাদ। "প্রত্যেকে প্রত্যেককে অভিযুক্ত করল এই বলে, যে এ-ওর, সে তার বাড়ি ও জমিজমা কিনতে চায়।" যারা লোভে অন্ধ তারা সকলে মিলে নানান অশুভ কাজ করতে থাকায় অনির্বাণ অগ্নিকুণ্ড গেল নিভে। লোভে-অন্ধে-ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে, একজন আরেকজনের বাড়িতে লাগাল আগুন। এইভাবে সেই ধার্মিক গ্রামটা একদিন ধ্বংস হয়ে গেল। আর তাই একজন ধার্মিকের ধর্ম; অর্থাৎ প্রকৃত মানুষের সৎ-মহৎ বাস্তব চিন্তার আদর্শ শুধুমাত্র নিজেকে বাঁচায় না আশেপাশের সকলকেও রক্ষা করে। আলোচ্য লোককথাতে সেই জীবন দর্শনটাই প্রতীকের আড়ালে প্রতিভাত হয়েছে। আদিম কাল থেকেই মানুষ নানান কল্পনার আশ্রয়ে সভ্যতার বিবর্তনের ধারায় আপন বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা বাস্তবের ভূমিতে নিজেকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে। প্রকৃতির নানান রূপের পেছনে দেবতা বা ঈশ্বরের মহিমা কল্পনার পেছনেও একই সূত্র বা দর্শন কাজ করেছে। যা ছিল একদিন স্বপ্ন বা কল্পনা, সেটাই পরবর্তী স্তরে নতুন স্বরূপ নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে বাস্তবতার প্রাঙ্গণে। গুহাবাসী মানুষ একদিন আশ্রয়ের জন্য তৈরি করেছে ঘর, শিকারের যুগে তৈরি করেছে নানান অস্ত্র, উদ্দাম স্রোতের মধ্যে ভেসে থাকার জন্য তৈরি করেছে ভেলা; পশু শিকার থেকে পশুপালন, পশুপালন থেকে কৃষিকার্য, যাযাবর জীবন থেকে পরিবার, পরিবার থেকে সমাজ, সমাজ থেকে রাষ্ট্র—বিবর্তনের

সকল স্তরেই বা পর্বেই মানুষের স্বপ্ন ও কল্পনা শক্তির বিশেষ ভূমিকা ছিল। যে স্বপ্ন দেখে, যার কল্পনা হয় সুসংহত—সেই পারে সভ্যতার অগ্রগতির বিজয় রথে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করতে। সমস্ত সৃষ্টিকার্যে স্বপ্ন ও কল্পনার ভূমিকা তাই মানব-ইতিহাসের অগ্রগতির অপরিহার্য শর্ত। তবে সে স্বপ্ন বা কল্পনার স্বরূপ জীর্ণ নয়, ক্লিষ্ট নয়, মলিন নয়; সে স্বপ্নকে হতে হয় ঋজু-দৃঢ়-বলিষ্ঠ ও সৃষ্টির চেতনায় উন্মুখ। শিল্প সাহিত্য এমন কি বিজ্ঞানের নব-নব আবিষ্কারের অনেকটাই জুড়ে মানুষের স্বপ্ন ও কল্পনার ভূমিকা বর্তমান রয়েছে। আর তাই, যে মানুষ তার জীবনের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার জন্য কঠিন শ্রম, নিষ্ঠা, স্থির লক্ষ্য, অধ্যবসায় ও সৎসাহসের পরিচয় রাখতে সক্ষম হয়—সেই মানুষই তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে। মানব জীবনের এই তত্ত্ব বা দর্শনকেই জাপানের একটি লোককথায় চিত্রিত হতে দেখা যায়।" "যে মানুষ একটি স্বপ্ন কিনেছিল" (The Man who bought a dream)[১২] শীর্ষক সেই লোককথাটি প্রতীকের সূক্ষ্ম ও কৌশলী প্রয়োগে আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে যায়। কাহিনীটি এইরকম :

এক দেশে দুজন ফেরিওয়ালা একই গ্রামে বাস করত। তারা দুজনেই একই সঙ্গে ফেরি করে বেড়াত। ফেরি করতে করতে একদিন তারা এসে পৌঁছল সমুদ্রের তীরের কাছে Toradomari নামে এক গ্রামে। তারা তখন খুব ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত। তাই তারা সেখানে একটু বিশ্রাম করার জন্য মনস্থির করল। দুজনের মধ্যে যে ছিল বয়সে বড় সে খুব তাড়াতাড়ি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। যুবক ফেরিওয়ালা মনে মনে ভাবল, "কেমন করে এত তাড়াতাড়ি ঘুমোয়রে বাবা!" এই কথা ভাবতে ভাবতে সে তার সঙ্গীর ঘুমন্ত মুখের দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল। হঠাৎ সে দেখতে পেল একটা ডাঁশ মাছি সঙ্গীর নাকের মধ্য থেকে বেরিয়ে এসে উড়ে গেল "সারো দ্বীপের দিকে" (Sado Island)। ঘটনাটা প্রত্যক্ষ করে যুবকটি মনে মনে বলল—'এটা তো একটা অদ্ভুত ব্যাপার।' কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই ডাঁশমাছিটা ফিরে এসে সঙ্গীর নকের মধ্যে আবার ঢুকে গেল। এদিকে ঘুম থেকে উঠেই বয়স্ক সঙ্গীটি যুবকটিকে বলে—"আমি একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম। দেখলাম "সারো দ্বীপের" মধ্যে জমিদারের বিশাল এক প্রাসাদ। প্রাসাদের বাগানে একটা সাদা ক্যামেলিয়া ফুলের গাছ। গাছের মধ্যে অসংখ্য ফুল ফুটে আছে। একটা ডাঁশ মাছি ক্যামেলিয়া গাছের গোড়া থেকে বেরিয়ে এসে আমাকে বলল, গাছের গোড়া খুঁড়তে। তার কথামতো ক্যামেলিয়া গাছের গোড়ায় আমি গর্ত করলাম। দেখি সেই গর্তের মধ্যে একটা কলসিতে অসংখ্য স্বর্ণমুদ্রা।" সঙ্গী যুবকটি এতক্ষণ কথাগুলো শুনছিল। হঠাৎ সে বলে উঠল—'আচ্ছা, তুমি কি তোমার স্বপ্নটা আমার কাছে বিক্রি করবে?' "কি বলছ কি? মানুষ কি কখনো স্বপ্ন কিনতে পারে নাকি?" অবাক বিস্ময়ে জানাল সেই বৃদ্ধ সঙ্গীটি। "তুমি যা চাইবে, তাই আমি

দিতে প্রস্তুত। দয়া করে তুমি তোমার স্বপ্নটা আমাকে বিক্রি করো।" এই বলে বার বার অনুনয় করতে থাকল সেই যুবক। অগত্যা সেই বৃদ্ধ তখন বলল—"ঠিক আছে। বলো তুমি কতো মুদ্রা দিতে প্রস্তুত?" যুবকটি বলল : "আমি তোমাকে তিনশত মুদ্রা দিতে প্রস্তুত আছি।" চুক্তিমতো বৃদ্ধ তার সঙ্গীর কাছে তিনশত মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রি করল তার স্বপ্নকে। এরপর, কাজ শেষ করে উভয়ে তাদের গ্রামের বাড়িতে ফিরে আসে। আবার ফেরি করতে বেরোচ্ছে, এমন ভাণ করে সেই যুবক গ্রাম ছেড়ে গোপনে এসে পৌঁছয় 'সারো দ্বীপে'র মধ্যে (Sado Island)। সমস্ত দ্বীপ ঘুরে অবশেষে সে খুঁজে পায় জমিদারের প্রাসাদ। প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করল সে। সেখানে মালিকের সঙ্গে দেখা হতেই যুবক বলল—"আমি খুবই গরিব। ইচিগো রাজ্যে থাকি। আপনি যদি আপনার বাগানের কাজের জন্য আমাকে নিয়োগ করেন, তাহলে কৃতজ্ঞ থাকব। "কিছুদিন ধরেই আমি বাগান পরিষ্কার করার জন্য একজন লোক খুঁজছিলাম। যদি তুমি রাজি থাক, তাহলে নিয়োগ করতে পারি।" জমিদার যুবকটিকে বলল। যে যুবকটি স্বপ্ন কিনেছিল, সে জমিদারের বাগান পরিচর্যার কাজ পেল। প্রতিদিন সে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে। আর মনে মনে অপেক্ষা করতে থাকে বসন্তের আগমনের জন্য। শীত পার হয়ে একদিন বসন্ত আসে। বাগানের গাছে গাছে ফোটে নানান ফুল। ক্যামেলিয়া গাছগুলিতেও ফুল ফোটে। কিন্তু সমস্ত ক্যামেলিয়া ফুলগুলিরই রঙ লাল। সাদা রঙের কোনো ক্যামেলিয়া ফুল দেখতে পায় না সে। তবুও যুবকটি হতাশ হয় না। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে থাকল আগামী বসন্তের জন্য। বসন্ত আবার এল। গাছে গাছে ফুটল ফুল। প্রতিদিন যুবকটি ফুলগুলি দেখতে যায়। অবশেষে একদিন একটি গাছে সাদা ক্যামেলিয়া ফুল দেখতে পায়। যুবকটি তখন আনন্দে আত্মহারা। তারপর, গভীর রাতে গোপনে সেই সাদা ফুলের ক্যামেলিয়া গাছের গোড়াটা খোঁড়ে এবং একটি ঢাকা দেওয়া পাত্রের মধ্যে প্রচুর স্বর্ণমুদ্রা দেখতে পায়। এরপর স্বর্ণমুদ্রার পাত্রটি যুবক লুকিয়ে রাখে বাগানের এক গোপন জায়গায়।

তারপর একদিন জমিদারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসে তার গ্রামে। সঙ্গে সেই স্বর্ণমুদ্রার পাত্র। যে যুবকটি স্বপ্নটি কিনে ছিল, সে হয়ে উঠল সেই গ্রামের বিরাট জমিদার। বাকি জীবনটা সুখে-শান্তিতে কাটতে লাগল তার। সমাজ সভ্যতার প্রতিটি পর্ব বা স্তরে কল্পনা বা স্বপ্নের বিশেষ একটি ভূমিকা রয়েছে। আমাদের আলোচ্য গল্পে স্বপ্নের বাস্তবায়নের যে চিত্র প্রত্যক্ষ করলাম, তা বৈজ্ঞানিক চিন্তার অনুষঙ্গে লালিত। এ কাহিনী আমাদেরকে এই প্রজ্ঞায় উন্নীত করে যে, সমাজ-সভ্যতার প্রবহমান ধারায় বাস্তব সূত্রকে আশ্রয় করে উদ্ভূত কল্পনার একটি বিশেষ ভূমিকা আছে, সমাজ অগ্রগতির ক্ষেত্রে। মার্কসের তত্ত্ব অনুযায়ী আমাদের চিন্তা-চেতনা-প্রজ্ঞা সবকিছুই বস্তুকে আশ্রয় করে উদ্ভূত বা সৃষ্টি হয়। যত সূক্ষ্ম বা ক্ষুদ্রই হউক, সমস্ত কল্পনা বা

স্বপ্নের মধ্যে বাস্তব সূত্র থাকা এক আবশ্যিক শর্ত। স্বপ্ন মানুষের অবচেতন মনের বাস্তব সূত্র সাপেক্ষ আশা-আকাঙ্ক্ষার রূপকথা। যে মানুষ স্বপ্নের সেই রূপকথার বাস্তব-সূত্রকে বিশ্লেষিত করে নিষ্ঠা, ধৈর্য ও সততার সঙ্গে তাকে রূপায়িত করতে পারে সে মানুষই নব নব আবিষ্কারের আস্বাদন পায়।

আলোচ্য কাহিনীর বাস্তব-সূত্রগুলির একটি তালিকা উল্লেখ করা যায়। যেমন—

(ক) ডাঁশ মাছি

(খ) সারো দ্বীপ (Sado Island)

(গ) ক্যামেলিয়া গাছ

(ঘ) বসন্তকালে গাছে গাছে ফোটা ফুল

(ঙ) উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য কৃষিযোগ্য জমিতে লাঙল দেওয়া বা খনন করার প্রক্রিয়া

(চ) জমিদার ও জমিদারের প্রাসাদ

(ছ) মোহর বা মুদ্রা ইত্যাদি ইত্যাদি।

যে ব্যক্তি স্বপ্ন দেখেছিল উপরোক্ত সমস্ত বস্তুগুলিই সে ইতিপূর্বে প্রত্যক্ষ করেছিল। ঐ প্রত্যক্ষ বাস্তব সূত্রগুলি এবং অবচেতন মনে সংগুপ্ত বা লালিত পালিত হওয়া আশা-আকাঙ্ক্ষা ও বাসনাগুলির সম্মিলিত মিশ্রণে সৃষ্টি হয়েছিল সেই স্বপ্ন বা কল্পনা। মানুষের সংগ্রামী জীবনে স্বপ্ন ও কল্পনা তাই আশা-আকাঙ্ক্ষার বর্ণময় রূপ। আমাদের আলোচ্য গল্পে (যে স্বপ্নটি ক্রয় করেছিল) দ্বিতীয় ব্যক্তি স্বপ্নের বস্তুতান্ত্রিক দিকটি উপলব্ধি করে তাকে সততা এবং নিষ্ঠার সঙ্গে প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়েছিল বলেই সে সফল হয়েছিল—একথা নিশ্চয় পাঠককে বোঝাতে হবে না।

পশুপাখি-জীবজন্তু-রাক্ষস-খোক্কস প্রভৃতি নানান চরিত্রের আবর্তনের মধ্য থেকে শেষ পর্যন্ত একটি জীবন ভাবনা বা সত্যকে রূপায়িত করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় লোককাহিনীগুলিতে। কথকরা তাঁদের কাহিনীর বুনোটের মধ্য দিয়ে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন নানান মজার মজার গল্প, যা তাঁদের চিন্তা-চেতনা ও দক্ষতার মুন্সিয়ানাকেই প্রকাশ করে। প্রায় প্রতিটি কাহিনীব কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে একটি জীবন্ত ভাবনা, বা দর্শন এবং তাকে আশ্রয় করেই আবর্তিত হয় বর্ণময় চরিত্রগুলি। নানান চরিত্রের আকর্ষণ-বিকর্ষণ ও দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে গল্প এগোতে থাকে, তার অভীষ্ঠ লক্ষ্যের দিকে। অবশেষে দুর্বল অসহায় ও অত্যাচারিত প্রাণের বিজয় ঘোষণার মধ্যে সমাপ্তি হয় কাহিনীর। শুভ ও অশুভ শক্তির দ্বন্দ্বের মধ্যে যার যাত্রা শুরু, তার সমাপ্তি ঘটে নতুন দিনের আলোক বর্তিকায়—এখানেই লোককথাগুলির চিরায়ত ও স্থায়িত্বেব ঐশ্বর্য লুকিয়ে আছে।

বাংলা তথা ভারতের প্রত্যন্ত গ্রামগুলি আজও অশিক্ষা ও কুসংস্কারের অন্ধকারে নিমজ্জিত। এক শ্রেণীর মানুষ আজও অতিমানবীয় শক্তি অর্জনের উপায় হিসেবে

তন্ত্রসাধনার আশ্রয় নেয়, এবং সিদ্ধিলাভ করার অভিপ্রায়ে দেবতার থানে 'নরবলি' দেওয়ার আয়োজন করে। বহু অতীতকাল থেকেই একশ্রেণীর তন্ত্রসাধক বিশ্বাস করে আসছেন যে, নির্দিষ্ট নিয়ম-নীতির মধ্য দিয়ে দেবী মূর্তির সামনে 'নরবলি' দিতে পারলে, সেই আরাধ্য দেবী তাদেরকে অতিমানবীয় শক্তির অধিকারী করে দেবেন। 'নরবলি' প্রথা সভ্যসমাজে আইনত অপরাধ। শাস্তিযোগ্য দণ্ড দেওয়ার ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও মাঝে মাঝেই প্রত্যন্ত গ্রামে সংঘটিত এমন কাহিনী, সংবাদপত্রের মাধ্যমে আমাদের কাছে এসেছে। প্রকৃতির কোলে আশ্রিত ও লালিত-পালিত মানব সমাজে একদিন এই রকম তন্ত্রসাধকদের দৌরাত্ম্য ও বাড়-বাড়ন্ত ঘটেছিল। বাংলার প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে আপন প্রভুত্ব কায়েম রাখার অভিপ্রায়ে অতিমানবীয় শক্তির উপায় রূপ সিদ্ধিলাভের এই উন্মত্ত খেলায় তন্ত্রসাধকরা ছিল মত্ত। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই জঘন্য কুৎসিৎ প্রথার চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে তেমনই এক কাপালিকের চরিত্র খুঁজে পাওয়া যায়। সিদ্ধিলাভের জন্য নবকুমারকে দেবী মূর্তির সম্মুখে বলি দেওয়ার আয়োজন করেছিল সেই কাপালিক। কিন্তু কপালকুণ্ডলার জন্য রক্ষা পায় নবকুমার—এ কাহিনী বাংলা সাহিত্যের প্রায় সকল ছাত্রেরই জানা। লোককথার কথকরা সেই জঘন্য কুৎসিৎ প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ কাহিনী নির্মাণ করেছিলেন সেদিন। রেভারেণ্ড লাল বিহারী দে কর্তৃক সংগৃহীত একটি লোককথায় সে কাহিনী চিত্রিত রয়েছে। 'যে মানুষ সিদ্ধিলাভ করতে চেয়েছিল' (The Man who wished to be perfect)[১৩] শীর্ষক কাহিনীটিতে নরবলি প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও সংগ্রামের চিত্র প্রতিভাত। এ কাহিনীর শেষে দেবীমূর্তির মুখ দিয়ে জীবনের এক প্রকৃত সত্যকে প্রকাশ করা হয়েছে। সাধুকে হত্যা করে যখন রাজপুত্ররা মুক্তি পায়, তখন দেবীমূর্তি রাজপুত্রকে বর দিয়েছিল এই বলে—"ঐ সাধু নিখুঁত হবার আশায় এতগুলো নিষ্ঠুর হত্যা করেছিল; তবু নিখুঁত হতে পারেনি। আমি বর দিলাম তার বদলে তুমি নিখুঁত হবে। আর এই নির্দোষ মানুষগুলো বেঁচে উঠবে।" অশুভ শক্তিকে বিনাশ করাই প্রকৃত মানুষের ধর্ম হওয়া উচিত, দেবীর বর প্রদানের মধ্য দিয়ে এমনই একটি ভাবনা সঞ্চারিত করেছেন এ গল্পের কথক।

সমাজের এই রকম নানাবিধ সমস্যা ও তার থেকে উত্তরণের প্রচেষ্টা লোককথাগুলিতে চিত্রিত হয় অনায়াসে। রেভারেণ্ড লালবিহারী দে কর্তৃক সংকলিত 'Folk Tales ot Bengal' গ্রন্থের 'শেয়াল ঘটক' (The Match making jackel)[১৪] গল্পে ঘটক চরিত্রের যে পরিচয় পাই, তা আমাদের সমাজেরই পরিচিত একজন। ঘটকরা যে শেয়ালের মতোই চতুর ও মিথ্যেবাদী হন—এ কাহিনীটিতে তারই বর্ণনা রয়েছে। এ গল্পে এক তাঁতির সঙ্গে এক রাজকন্যার বিবাহের আয়োজন করে 'শেয়াল ঘটক'। নানান ছল-চাতুরীর আশ্রয় নিয়ে শেয়াল তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে। যদিও এ

গল্পের শেষে দেখতে পাব অসীম ধৈর্য্য ও বুদ্ধিবলে রাজকন্যা শেষ পর্যন্ত তাঁর স্বামী তাঁতিকে বিপুল ধনরত্নের ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। এই অংশে কথকরা নারীসমাজের প্রবল ইচ্ছাশক্তি ও ভবিতব্যকে জয় করার দক্ষতা ও ক্ষমতা প্রদর্শনের যে মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন, তা যতই নাটুকে ও প্রতীকী বলে মনে হোক—তার গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। কারণ, বাংলার নারী আজও চতুর ঘটকের দ্বারা প্রতারিত হওয়া সত্ত্বেও, স্বামীর মঙ্গলের কথা ভেবে মুখ-বুজে তা তারা সহ্য করেন—এটা প্রায় প্রামাণ্য সত্য। দু-একজন ব্যতিক্রমী চরিত্র ব্যতীত বাংলার ঘরে ঘরে এমনটাই ঘটে। 'শেয়াল ঘটক' গল্প কাহিনীটিতেও জীবনের এক করুণ সত্যকে রূপ দিয়েছেন এবং তারই সঙ্গে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতামাতাকে সজাগ করতে চেয়েছেন। চতুর ঘটকদের কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করাটা আসলে যে, আপন কন্যাকে বিপদের মধ্যে ঠেলে দেওয়া বা হত্যার সামিল--এমনই একটি ইঙ্গিত বর্ণময় কাহিনীর আড়ালে এ গল্পে প্রকাশিত হতে দেখি।

আগেই বলেছি মানুষের জীবন এবং তাকে কেন্দ্র করে যে সমাজ-রাষ্ট্র, তাকে আশ্রয় করেই লোককাহিনীগুলি আবর্তিত। জীবন কি, জীবন কেন, কিসেই বা জীবনের মহত্ত্ব প্রকাশিত হয় এবং তার পরিণতিই বা কি—এমন বহুবিধ দার্শনিক প্রশ্নের যুক্তিগ্রাহ্য সূত্র পাওয়া যায় প্রাচীন লোককথাগুলিতে। এমনই একটি গল্প 'কত দিন বাঁচতে চাও' (The Duration of life)।[১৫] গ্রীম ভ্রাতৃদ্বয়ের সংগৃহীত ও সংকলিত গ্রন্থে লোককথাটি রয়েছে। গড় সাধারণ মানুষের জীবন কেমনভাবে অতিবাহিত হয় তারই একটি চিত্র এ কাহিনীর আশ্রয়। গভীর ব্যঞ্জনার সঙ্গে জীবনের বিশেষ এক দর্শনকে এ গল্পে প্রকাশ করা হয়েছে। গল্পটি এই রকম ঃ

"পৃথিবী সৃষ্টির সময় ঠিক হয়ে গিয়েছিল কোন্ প্রাণী কতদিন বাঁচবে। প্রথমেই গাধা এসে সৃষ্টি কর্তার কাছে জানতে চাইল, সে কতদিন বাঁচবে। উত্তর হল, ত্রিশ বছর। তারপরেই সৃষ্টিকর্তা গাধাকে জিজ্ঞেস করল "এতেই হবে তো?" গাধা জবাব দিল, 'হায়রে, সময়টা তো বড় বেশি দীর্ঘ। ভাব তো, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমাকে কত ভারী ভারী বোঝা বয়ে বেড়াতে হবে। অন্য সকলে যাতে রুটি খেতে পারে তার জন্য গমের বস্তা তো আমাকেই বয়ে নিয়ে যেতে হবে কলঘরে। তার জন্য আমি তো লাথি-গুঁতো ছাড়া আর কিছুই পাব না। অথচ সব সময়ই আমাকে কাজ করতে হবে; অন্যের মন রেখে চলতে হবে। তাই আমি মিনতি জানাই, আমার জীবনের মেয়াদটা কয়েক বছর কমিয়ে দিন।" গাধার মিনতি রাখা হল। তার জন্য নির্দিষ্ট হল আঠারো বছরের জীবন। গাধা হাসিমুখে চলে গেল।

তারপর এল কুকুর। একই প্রশ্ন সে করল (সে কতদিন বাঁচবে?) তাকেও প্রশ্ন করা

হল, "তুমি কতদিন বাঁচতে চাও? গাধা বলে গেল, ত্রিশ বছরের জীবন তার পক্ষে বড়ই বেশি! কিন্তু তুমি হয়ত তাতেই খুশি হবে।" কুকুর বলল, "তুমি কি তাই মনে কর? ভেবে দেখ তো, সেক্ষেত্রে আমাকে কত পথ দৌড়তে হবে; আমার পা চারটে তো ততদিন চলতেই পারবে না। তাছাড়া ততদিনে আমার গলা ভেঙে যাবে, আমি ঘেউ ঘেউ করতে পারব না। দাঁত দিয়ে কাউকে কামড়াতে পারব না; কিছু চিবুতে পারব না; পারব কেবল এ গলি থেকে সে গলি লেংচে লেংচে চলতে, আর নাকে কাঁদতে। অতএব—"

হ্যাঁ কুকুরের আর্জিও শোনা হল। তার জীবনের মেয়াদ কমিয়ে বার বছর করা হল। সেও বিদায় নিল। এবার হাজির হল বাঁদর। তাকে বলা হল, "তুমি নিশ্চয় ত্রিশ বছরই বাঁচতে চাও? তোমাকে তো আর গাধা বা কুকুরের মতো খাটুনি খাটতে হয় না। তোমার দিনগুলো তো ভালোই কাটবে।" বাঁদর বলল, "হায়রে। সেটাই তো হওয়া উচিত; কিন্তু আসলে ব্যাপারটা কিন্তু অন্যরকম। মানুষকে হাসাতে আমাকে সব সময়ই কালো মুখে ভেংচি কাটতে হবে; অথচ তারা আমাকে যে সব ফল খেতে দেবে সে সবই তো টক ফল। কত দুঃখকে আর হাটি-ঠাট্টার আড়ালে লুকিয়ে রাখা যায়। ত্রিশ বছর ধরে সে কষ্ট আমি সইতে পারব না।" সুতরাং তার জীবনের মেয়াদ ঠিক হল দশ বছর।

সবশেষে এল মানুষ—স্বাস্থ্যবান, টগবগে মানুষ। সেও জানতে চাইল তার জীবনের মেয়াদ। তাকে বলা হল, "তুমি বাঁচবে ত্রিশ বছর। তাতেই চলবে তো?" মানুষ হৈ হৈ করে বলে উঠল, "এত অল্প সময়! তখন তো সবে আমার বাড়িটা তৈরি হবে, উনুনে আগুন জ্বালাবার ব্যবস্থা হবে, বাগানে গাছ বসানো হবে—কবে তার ফল হবে সেই আশায়। সবে তো জীবনটাকে ভোগ করার সময় হবে, আর তখনই আমাকে মরতে হবে! আমার একান্ত প্রার্থনা—আমার জীবনের মেয়াদ বাড়িয়ে দেওয়া হোক!"

"তার সঙ্গে গাধার আঠারো বছর যোগ করা হলো।"

"তাতেও চলবে না!" মানুষ বলল।

"কুকুরের জীবনের বারো বছরও তুমি পাবে।"

"তবু জীবনটা বড়ই ছোট হয়ে যাচ্ছে।" মানুষ বলল।

"ঠিক আছে; বাঁদরের দশ বছরও তুমি পাবে। কিন্তু এর বেশি তুমি চেয়ো না।" অগত্যা মানুষ সেখান থেকে বিদায় নিল, কিন্তু সে খুশি হল না।

এইভাবে গড় মানুষের জীবনের মেয়াদ হল সত্তর বছর। প্রথম ত্রিশ বছর সে পেল মানুষ হিসেবে; তার সেই মেয়াদটা খুব তাড়াতাড়ি কেটে যায়। তখন সে কাজ করে খোশমেজাজে, আর বেঁচে থাকে সুখে ও আনন্দে। তারপর তার জীবনে আসে গাধার জীবনের আঠারো বছর। তখন একটার পর একটা বোঝা এসে তার মাথায় চাপে। যে

ফসল ফলাতে তাকে কঠিন পরিশ্রম করতে হয় তাতে পেট ভরে অন্য লোকের। তার কপালে জোটে শুধু কটূক্তি আর দোষারোপ। তারপর আসে কুকুরের বারো বছর। মানুষ তখন ঘরের কোণে বসে খালি ঝিমোয়, কামড়াবার মতো দাঁত না থাকায় কেবলই গজগজ করে। তারপর, সেই সময়টাও যায়, তখন আসে বাঁদরের জীবনের দশ বছর। মানুষ তখন ছেলেমানুষী করে, বোকার মতো আচরণ করে, আর এমন সব অদ্ভুত কাণ্ড কারখানা করে বসে, যাতে ছোটছোট ছেলেমেয়েদের চোখেও সে হয়ে ওঠে হাসির খোরাক।

বহুবিচিত্র জীবন ও তার গতি প্রকৃতি নিয়েই লোককথার ঐশ্বর্য। লোভ-মোহ-আকাঙ্ক্ষা ও বাসনার জটিল আবর্ত নিয়ে অসংখ্য লোককথা রচিত হয়েছে। প্রতিটি কাহিনীই স্বকীয় ভঙ্গীতে উজ্জ্বল। আকাঙ্ক্ষা ও বাসনা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। সেই আকাঙ্ক্ষা ও বাসনার কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। এক থেকে দুই, দুই থেকে চার-গাণিতিক নিয়মে বৃদ্ধি পায় সেই আকাঙ্ক্ষা ও বাসনা। মানুষ নিজেও জানে না কি পেলে একজন মানুষ নিজেকে পরিপূর্ণ সুখী বলে অনুভব করতে পারবে। ফলে, প্রায়শ আকাঙ্ক্ষা ও বাসনার জটিল আবর্তে ঘুরতে ঘুরতে তারা দিশেহারা। মোহ ও আকাঙ্ক্ষায় আষ্টেপৃষ্টে বাধা জীবন কিভাবে তার প্রকৃত অবস্থান ভুলে যায় এবং কিভাবে মানুষ ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে রূপায়িত করতে গিয়ে সমাজস্থিত গণমানসের ক্ষতি করতে উদ্যত হয় তারই এক বিশ্বস্ত চিত্রণ রয়েছে 'ইউক্রেনে'র একটি লোককথায়। অতিলোভী এক বুড়ি গ্রামের সকল মানুষকে তাদের অধীনে ক্ষেতমজুর করতে চাওয়ায় শাস্তি পেয়েছিল, ঐ লোককথায়। সেই সঙ্গে রয়েছে প্রকৃতির দান বৃক্ষকে রক্ষা করতে পারলে সে দু'হাত ভরে সাহায্য করে মানুষকে, এমনই একটি ভাবনার প্রতীকী রূপ। গল্পটি এইরকম : এক ছিল বুড়ো আর বুড়ি। তারা খুব গরিব। বুড়ি একদিন বুড়োকে বনের থেকে লাইম গাছের কাঠ কেটে আনতে বলে, উনুনে আঁচ দেবার জন্য। বুড়ির কথায় বুড়ো কুড্রুল নিয়ে চলে গেল বনে। বনের মধ্যে একটা লাইম গাছ বেছে নিয়ে কাটবার জন্য যেই কুড্রুল তুলেছে, হঠাৎ মানুষের কণ্ঠে কথা বলতে শুরু করে লাইম গাছ ঃ "হে ভালো মানুষ, আমাকে কেটো না, তোমার বিপদে কাজে লাগবো আমি।" ভয়ে বুড়োর হাত থেকে খসে পড়ে কুড্রুল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ ভাবল বুড়ো, তারপর ফিরে গেল বাড়ি। বাড়িতে এসে বুড়িকে সমস্ত ঘটনা জানাল। কথাটা শুনে বুড়ি বলল—"এক্ষুনি লাইম গাছের কাছে গিয়ে বল একটা ঘোড়া ও তার সঙ্গে গাড়ি দিতে। তোমার আমার পায়ে হেঁটে আসা যাওয়া অনেক হল বাপু।" বুড়ির কথামতো বুড়ো লাইম গাছকে সেকথা জানাল। লাইম গাছটি বলল, 'ঠিক আছে, বাড়ি যাও। তাই হবে।' বাড়িতে ফিরে বুড়ো দেখে কুঁড়ে ঘরের কাছে দাঁড়িয়ে গাড়ি এবং তার সঙ্গে ঘোড়া। এরপর বুড়ি বলল, আমাদের কুঁড়ে ঘরটা ভেঙে

পড়ার উপক্রম হয়েছে। যাও বুড়ো, লাইম গাছের কাছে একটা বাড়ি চেয়ে নাও। লাইম গাছ ওদেরকে তাই দিল। বুড়ি একের পর এক আকাঙ্ক্ষার কথা বুড়োর মাধ্যমে লাইম গাছকে জানায় এবং লাইম গাছ তা পূর্ণ করে দেয়। এইভাবে গরু বাছুর, হাঁস মুরগী ও প্রচুর মোহরের অধিকারী হয়ে তারা ধনী হয়ে উঠল।

তবে এতেও হয় না তাদের। লোকে যাতে তাদের ভয় পায়, সেটাও দরকার। কারণ তারা এখন ধনী। এবার তারা লাইম গাছের কাছে চাইল এমন ব্যবস্থা, যাতে লোকে তাদের ভয় পায়। তাই করে দিল লাইম গাছ। বাড়িতে এখন সেপাই লসকর গিজ্‌গিজ্ করছে, পাহারা দিচ্ছে তাদের। কিন্তু এতেও বুড়ির মন ওঠে না। বুড়ি এবার বুড়োকে বলল, 'আমাদের এখন আর কিছুর অভাব নেই। চাইবারও আর কিছু নেই আমাদের। সব কিছুই আছে আমাদের। এবার আমাদের দরকার গাঁয়ের সব লোক যেন আমাদের ক্ষেতমজুর হয়।' বুড়ির কথামতো বুড়ো লাইম গাছটার কাছে তাই চাইল। অনেকক্ষণ চুপ করে রইল লাইম গাছ। তারপর বলল, 'তোমাদের শেষ ইচ্ছেও পূরণ হবে'। বাড়ি এসে বুড়ো দেখল কিছুই নেই। দাঁড়িয়ে আছে সেই জীর্ণ পুরনো কুঁড়ে ঘরটা। অতি লোভী বুড়ির ইচ্ছে হয়েছিল সব লোককে ক্ষেতমজুর করবে, তাই তার শাস্তি হলো।[১৬]

জগতের সবকিছুই পরিবর্তনশীল। আমাদের চতুর্দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বস্তুজগতের মধ্যেও সেই পরিবর্তনের ক্রিয়া চলেছে। পরিবর্তনের কারণ, বস্তুর অন্তর্নিহিত অসামঞ্জস্য। বস্তুর পূর্বেকার অবস্থাটিকে 'স্থিতি' এবং অন্তর্নিহিত অসামঞ্জস্যটি হচ্ছে 'অস্থিতি'। 'স্থিতি' ও 'অস্থিতি'র দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে যে রূপ আবির্ভূত হয়, তাকে বলে 'সমস্থিতি'। আর সেই সমস্ত প্রক্রিয়াটিকে; সমাজবিজ্ঞানীরা দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। সমাজবিজ্ঞানের এই সূত্রই জগৎ পরিবর্তনের প্রধান কারণ। জগতের সমস্ত বস্তুর মধ্যে যে শক্তি বিরাজমান এবং যে ক্রিয়ার ফলে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির জন্ম হয়, তার মধ্যেই একদিন আমাদের প্রাচীন মুনি-ঋষিরা প্রাণের অস্তিত্বকে খুঁজে পেলেন। জগতের সমস্ত বস্তুর মধ্যে প্রাণের অস্তিত্ব আছে, এমন একটি ভাবনাকে মানুষের মনে সঞ্চারিত করলেন তাঁরা। আর যেখানে প্রাণের অস্তিত্ব, সেখানে ঈশ্বর বিরাজমান—এমন ভাবনাও তাঁরা প্রচার করলেন। সেই ঈশ্বর অতীন্দ্রিয় শক্তির অধিকারী কোনো মানব, এমন কল্পনা থেকেই ঈশ্বরের রূপ নির্মাণ করেছিলেন তাঁরা। মানুষের মঙ্গলের জন্য ঈশ্বরের রূপ কল্পনা। সুতরাং মানুষকে বাদ দিয়ে এবং তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে প্রাধান্য দিলে, প্রাকৃতিক নিয়মেই তার মধ্যে বিকৃতি ঘটতে বাধ্য।

প্রাচীন পণ্ডিতরা এমন অনেক সংস্কারের বীজ রোপণ করেছিলেন আমাদের চিন্তায়, যা প্রকৃতপক্ষে বৈজ্ঞানিক সূত্রকে আশ্রয় করেই উদ্ভূত। তাঁদের অভিজ্ঞতা ও

অধীত বিদ্যাকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন গণজীবনের মধ্যে। কিন্তু সভ্যতার বিশেষ এক পর্বে বৈজ্ঞানিক সত্যাসত্যকে বিচার না করে কুসংস্কারের মধ্যে নিমজ্জিত হল সমাজসভ্যতা। এর পেছনে কাজ করেছিল মুষ্টিমেয় স্বার্থান্বেষী কিছু ব্যক্তির দ্বারা সৃষ্ট ঈশ্বরের মহিমা বিষয়ক কিছু মিথ্‌। ফলে বিভ্রান্ত ও উপেক্ষিত হল গণমানস। মানুষের উপরে ঈশ্বরকে স্থান দেওয়ায়, প্রকৃতির অভিশাপ নেমে এল তখন। তাঁরা ভুলে গেলেন যে, মানুষের মঙ্গলের জন্যই ঈশ্বরের রূপকল্পনার সৃষ্টি, ঈশ্বরের জন্য মানুষ নন। কুসংস্কার কিভাবে আচ্ছন্ন করে রাখে মানুষের মনকে এবং তার পরিণতি কি কুৎসিৎ হতে পারে তারই এক চিত্র পাই জাপানী লোককথা "সেখানে কোনো ঈশ্বর নেই"[১৭] (There's No Deity There) শীর্ষক কাহিনীতে :

"এক ধর্মযাজক তার শিষ্যকে সঙ্গে নিয়ে চলেছে। পথে শিষ্যর খুব পেচ্ছাব (প্রস্রাব) পেয়েছে। শিষ্য পথের কিনারে পেচ্ছাব করার জন্য উদ্যোগ নেয়। সঙ্গে সঙ্গে সেই ধর্মযাজক বলে ওঠে—"থামো, থামো। এখানে পেচ্ছাব করো না। কারণ, পথের দেবতা রয়েছে এখানে।"

কিছুদূর অগ্রসর হয়ে শিষ্য পথের ধারের একটি মাঠে পেচ্ছাব করার জন্য তৈরি হয়। ধর্মযাজক তৎক্ষণাৎ চীৎকার করতে থাকে এই বলে—"থামো, থামো। এখানে করো না। কারণ, শস্যের দেবতা এখানে রয়েছেন।" হাঁটতে থাকে তাঁরা।

শিষ্য অনুনয় করে জানায়—"আমি আর পেচ্ছাব ধরে রাখতে পারছি না। সামনের এই নদীতেই আমি পেচ্ছাব করব।" ধর্মযাজক এবারও বলে ওঠে—"জলের দেবী এখানে আছেন। এখানে পেচ্ছাব করো না।" আবার তারা হাঁটতে থাকে।

কিছুদূর অগ্রসর হয়ে শিষ্য এবার পথের ধারে ফাঁকা বৌদ্ধদের শিশুর দেবতা 'জিজোসামা' মূর্তির পাশে পেচ্ছাব করতে উদ্যত হয়। সঙ্গে সঙ্গে ধর্মযাজক চিৎকার করে বলতে থাকে, "কোনো সুস্থ ব্যক্তি কখনোই এমন কাজ করতে পারে না। তোমার নরকে যাওয়া উচিত।"

পেচ্ছাব ধরে রাখার আর ক্ষমতা ছিল না শিষ্যর। তাই সে তখন ধর্মযাজকের মাথায় পেচ্ছাব করতে থাকে এই বলে—"এইখানে কোনো দেবতা নেই। পেচ্ছাব করার এটাই আদর্শ স্থান।"

জীবনের প্রায় সমস্ত দিকগুলি নিয়েই লোককথা রচিত হয়েছে। মানুষ ও মানুষের জীবন এবং তাকে কেন্দ্র করে যে বৃহত্তর সমাজ সেটাই প্রাধান্য পেয়েছে লোককথায়। আমাদের প্রত্যেকের জীবনই সমাজের সমষ্টিগত জীবনবৃত্তের সঙ্গে অঙ্গীভূত। ফলে, সামাজিক পরিবেশের ওপর আমাদের জীবন ভাবনাটি প্রায়শই নিয়ন্ত্রিত হয়। আর তাই সমাজের সমস্ত অশুভ ও কলুষিত ভাবনা-চিন্তা পরিহার করে, সুস্থ সবল জীবন দর্শনই আমাদের কাম্য। অথচ, প্রত্যেক সমাজেই এমন এক শ্রেণীর মানুষ থাকেন, যারা নানান

অপপ্রচারে সিদ্ধহস্ত। নানান গুজব ছড়িয়ে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করেন। সেই বিভ্রান্তিকর সংবাদ অনেক সময়েই সমাজ-সভ্যতা ধ্বংসের অনুঘটক হয়ে দাঁড়ায়, এমন কি জাতিতে জাতিতে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ঘটাতে পারে—যা প্রকৃতপক্ষে মানব সভ্যতার উন্নত থেকে উন্নততর জীবনের অন্বেষণের পথকে রুদ্ধ করে। ব্যক্তি বা সমাজ উভয়ের ক্ষেত্রেই এই গুজব বা অপপ্রচার কিভাবে সঙ্ঘটিত হয় তারই একক সুন্দর চিত্র রয়েছে "মুখের মধ্যে সারস"[১৮] লোককথাটিতে। গল্পটি এইরকম— কাশতে কাশতে এক পণ্ডিতের মুখের মধ্যে থেকে এক টুকরো পাখির পালক বেরোয়। সে কথা সে তার স্ত্রীকে জানায়। সেই স্ত্রীর কাছ থেকে একজন প্রতিবেশি এবং ঐ প্রতিবেশির কাছ থেকে অন্য একজন প্রতিবেশি এভাবে কথাটি নানান মুখ ঘুরে প্রচার হতে থাকে। এক টুকরো পালক শেষ পর্যন্ত গুজব ছড়াতে ছড়াতে গিয়ে দাঁড়ায় যে, পণ্ডিতের মুখ থেকে অসংখ্য পাখি অনর্গল বেরিয়ে এসে উড়ে যাচ্ছে আকাশে। এ কথা প্রচার হতেই হাজার হাজার লোক ছুটে চলেছে সেই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করতে, পণ্ডিতের বাড়ির উদ্দেশে। পণ্ডিত বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যান। যতক্ষণ পর্যন্ত এ তাজা খবর বাসি না হল, ততক্ষণ ফেরে নি।

মানুষের মনের গভীরে প্রবেশ করে মনের নানা পরিচয়কে তুলে ধরেছে লোককথার কথকরা। তাদের স্বচ্ছ সহজ-সরল দৃষ্টি জীবনের বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতা, তত্ত্ব ও দর্শনকে এক লহমায় আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। জীবনকে তাঁরা নানান দৃষ্টিকোণ থেকে উলটে-পালটে প্রত্যক্ষ করার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের রচিত কাহিনীগুলিতে তাই জীবনই প্রাধান্য পেয়েছে। নানান ভঙ্গিমায়, নানান শৈল্পিক রূপকের আড়ালে জীবনের মহৎ সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন লোককথার কথকরা। আর তাই লোককথাগুলি হয়ে ওঠে জীবনের ভাষ্য। জীবন-দর্শনের নানান তত্ত্ব অনায়াসে প্রকটিত হয় তাঁদের রচিত কাহিনীগুলিতে। "এ জীবন, অন্য জীবন'[১৯] শীর্ষক একটি লোককথায় জীবনের এক দার্শনিক তত্ত্ব প্রতিফলিত হয়েছে। গল্পটি হল :

"দুই বন্ধুর পথে দেখা। দুজনে দুদিকে যাচ্ছে। একজন যাচ্ছে এক মহিলার কাছে। অন্যজন যাচ্ছে এক ধর্মসভায়। সেখানে এক বিখ্যাত ধর্মপ্রচারক ও কথক আসবেন।

যে ধর্মসভায় যাচ্ছিল, সে অন্য বন্ধুকে বলল, "এই মেয়েটার কাছে যাচ্ছ কেন? ধর্মসভায় চল না। আমাদের প্রচারক ও কথক যখন কথা বলেন, তখন মনে প্রেরণা জাগে। তিনি ঠাকুর-দেবতা ও সাধুসন্ত নিয়ে চমৎকার চমৎকাব গল্প বলেন। চল আমার সঙ্গে।"

যে বন্ধু মেয়েটার কাছে যাচ্ছে, সে বলল 'তুমি আমার সঙ্গে চলো না কেন? তোমাকেও একটি রূপসী, চনমনে মেয়ে দেখে দেব। ঠিক আমারটির মতন। ঐ রকম জোলো ধর্মীয় জ্ঞান শুনে সময় নষ্ট করো কেন?"

কেউ কাউকে দলে টানতে পারল না। যে যার পথে চলে গেল। যে ধর্মসভায় গেল, সে ধর্মীয় কোনো ব্যাপারে মনই বসাতে পারল না। তার কেবলই মনে হতে থাকল, আহা! বন্ধু এক সুন্দরী মেয়ের বাহুর বন্ধনে কি সুখেই সময়টা কাটাচ্ছে। আর আমি এক প্রচারকের বক্তৃতা শুনে সময় অপচয় করছি। অন্যদিকে যে গেছে মেয়েটার কাছে, সে মেয়ের আলিঙ্গনে থেকেও মনে কোনো আনন্দ পাচ্ছে না। শুধু মনে হচ্ছে, তার বন্ধু সাধুসন্ত ও দেবদেবীর গল্প, স্তোত্রপাঠ—এ সব শুনে পুণ্য অর্জন করছে। স্বর্গে যাওয়ার পথ প্রশস্ত করছে। আর সে? বোকার মতো প্রগলভ নারীর সাহচর্যে জীবনটা নষ্ট করছে।

উল্লিখিত কাহিনী আমাদের শিক্ষা দেয় আমরা প্রত্যেকেই কোনো না কোনো মোহের পেছনে ছুটে চলেছি। আর তাই আমরা কেউই সুখি নই। প্রত্যেকেই অতৃপ্ত। নিজের অবস্থানের পরিবেশ পরিস্থিতি প্রত্যেকে উপলব্ধি করেও, তার থেকে মুক্ত হতে পারি না। এই মোহমুক্তি ঘটে না বলেই, ইচ্ছে থাকলেও আপন গণ্ডি অতিক্রম করে বৃহত্তর স্বার্থে নিজেকে যুক্ত করতে পারি না। যে ব্যক্তি ধর্মসভায় গিয়েছিল সে যেমন অন্য এক জীবনের মোহে ছুটে চলেছে, কিন্তু তবুও এ জীবনকে সম্পূর্ণ নির্লিপ্তভাবে উপেক্ষা করতে পারছে না। অন্যদিকে যে গিয়েছিল মেয়েটার আলিঙ্গনে ধরা দিতে, সেও সেই নারীর বাহুবন্ধন থেকেও অন্য জীবনের হাতছানির মোহকে উপেক্ষা করতে পারেনি। এমনি ভাবেই আমরা আপন সৃষ্ট মোহের মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ, অথচ অন কোনো মোহের আকর্ষণের অনুভবে চঞ্চল। এই চঞ্চল-অস্থির আকর্ষণ-বিকর্ষণে এক দ্বৈত সত্তা আমাদের মধ্যে জন্ম নেয়। ফলে, কোনো কিছুর প্রতিই আমরা নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পিত করতে পারি না। আর তাই আমাদের খণ্ডিত মন কখনোই শান্তি বা সুখের স্পর্শ পায় না।

লোককথাগুলি পড়তে পড়তে মনে হয়, এ শুধুমাত্র প্রাচীন কথকের কাহিনী নয় যেন আমাদের প্রতিদিনকার জীবনচিত্র। জীবনকে বহুমাত্রিক দিক থেকে দেখার সুযোগ ঘটে আমাদের। চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেই সব জীবন-দর্শন, যা একান্তভাবেই আমাদের নিজস্ব অনুভূতি। এমনই এক লোককথা "পাতাল-পুরীর কথা।"[২০] এ কাহিনীর নায়ক এক চাষার ছেলে। যার নাম ছোটু। ছোটু একদিন কোমরে তরোয়াল গুঁজে রাজার কাছে উপস্থিত। উদ্দেশ্য, সে সৈনিক হবে। কারণ, সে বীর যোদ্ধা। সাধারণ কেরানির কাজ বা মোসাহেবি করতে সে চায় না। এই বাসনা ও আকাঙ্ক্ষা নিয়েই সে একদিন হাজির হয়েছিল রাজ দরবারে। রাজা তাকে ফিরিয়ে দেয়। কারণ, রাজার কোনো শত্রু নেই। তাই তাকে সৈনিক হওয়ার সুযোগ দিতে পারছে না রাজা। ফিরে আসে সে। বিফল মনোরথ হয়ে ছোটু এগিয়ে চলে গভীর বনের দিকে। মনে তার বীর সৈনিক হওয়ার আকাঙ্ক্ষা। বনের ভেতর একটা পোড়ো বাড়ি দেখতে পায়

সে। বাড়িটার মধ্যে আলো দেখা যাচ্ছে। সাহসে ভর করে দৃঢ় পায়ে এগিয়ে যায় ছোটু। ঘরের ভেতর প্রবেশ করেই দেখতে পায় বিশাল বড় এক সাপ। মুহূর্তের মধ্যে কোমরের তরবারি বার করে আঘাত করতে উদ্যত হয় সে। এদিকে তখন হাওয়ায় ভেসে আসে এক নারীর কণ্ঠ। ছোটু দেখতে পায়, সাপের মাথার দিকে এক রাজকন্যার মুখ। রাজকন্যা তখন তাকে জানায় যে, "এক জাদুকরের প্রভাবে সে তার শরীর হারিয়েছে। তাই তার সারা শরীর সাপের দেহের আবরণে ঢাকা। যদি ছোটু পাশের ঘর থেকে তার বেনারসী শাড়িটা এনে রাজকন্যার শরীরে এবং মুকুটটা মাথায় পরিয়ে দেয়, তাহলে সে আবার তার শরীর ফিরে পাবে।" রাজকন্যার কথামতো ছোটু বেনারসী শাড়ি ও মুকুট পরিয়ে দেয়। মুহূর্তের মধ্যে সেই সাপ পরিবর্তিত হয় রাজকন্যা রূপে। ছোটু রাজকন্যার রূপে মুগ্ধ হয়। সে তাকে বিবাহ করতে চায়। কিন্তু পাতাল-পুরীর রাজকন্যা তাকে ছলনা করে চলে যায় পাতাল-পুরীর দেশে। ছোটু তাকে অনুসরণ করে চলে। কিন্তু কিছুতেই তাকে ধরতে পারে না। ছোটু তবু তাকে ধরার জন্য চলতে থাকে। চলতে চলতে সে পরিশ্রান্ত ও ক্লান্ত হয়ে পড়ে। অবশেষে এক কুটীরের সামনে এসে উপস্থিত হয় ছোটু। সেখানে এক পবিত্র পরমা সুন্দরীর সঙ্গে তার দেখা হয়। সেই সুন্দরী তখন মাছের জাল বুনছিল। তাকে ছোটু সব কথা জানায়। ছোটু জানায় যে, 'পাতাল পুরীতে সে যেতে চায়, সেই রাজকন্যাকে বিয়ে করার জন্য। ছোটুর কথা শুনে পবিত্র শান্ত সেই কুমারী, ছোটুকে দুটি জাদুকরী জিনিস দেয়। একটি সিল্কের চাদর, অন্যটি একটি পুঁতির থলি। সিল্কের চাদর গায়ে পরে ছোটু যেখানে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করবে, সেখানেই যেতে পারবে। আর পুঁতির থলিতে নাড়া দিলেই পাবে ইচ্ছে মত মোহর। এ দুটি জাদুকরী জিনিসের মাধ্যমে সে এক সময় এসে পৌঁছায় পাতাল পুরীতে। একেবারে রাজকন্যার কাছে। রাজকন্যা তাকে বিবাহ করতে অস্বীকার করে এবং ছলনা করে ছোটুর জাদুকরী জিনিস দুটি ছিনিয়ে নেয়। অসহায় ছোটু ঘুরতে থাকে গভীর বনে। অবশেষে রূপালী ও সোনালী কুলের দৌলতে রাজকন্যার কাছ থেকে উদ্ধার করে আনে তার 'জাদুকরী চাদর' ও 'পুঁতির থলি'। এবার সে রাজকন্যার মোহ ত্যাগ করে ফিরে আসে সেই শান্ত-পবিত্র কুমারীর কাছে, যে তাকে ঐ দুটি জাদুকরী জিনিস দিয়েছিল। সেই পবিত্র কুমারী ছোটুর কাছে জানতে চায় রাজকন্যার কথা। ছোটু এবার কুমারীকে জানায় যে, সে আর বাজকন্যাকে বিবাহ করতে চায় না। কারণ, রাজকন্যা পাষণ্ড। উপকারীর উপকার স্বীকার করে না। শুধু তাই নয়, ছলনা করে রাজকন্যা তার জাদুকরী জিনিস দুটি ছিনিয়ে নিয়ে সর্বস্বান্ত করতে চেয়েছিল। এই বলে সে কুমারীর দেওয়া চাদর ও পুঁতির থলিটা ফিরিয়ে দেয় এবং তাকে জানায় যে, পবিত্র কুমারীকে সে বিবাহ করতে চায়। শান্ত-পবিত্র সেই পরমা সুন্দরী তখন বলে, 'আমি বিয়ে করতে রাজি আছি। তবে একটা শর্ত আছে। শর্তটি হল ঐ মোহরের মোহ

ত্যাগ করে পুঁতির থলিটি এবং কামনারূপ সিল্কের চাদরটি জলে ভাসিয়ে দিতে হবে। যদি ছোটু ঐ মোহ এবং কামনা ত্যাগ করতে পারে, তবেই কুমারীর পক্ষে বিবাহ করা সম্ভব।' ছোটু কুমারীর শর্তে রাজি হয় এবং তাই করে। এরপর ওরা দুজনে সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে থাকে। এ কাহিনী এক অপূর্ব দার্শনিক উপলব্ধি ও তত্ত্ব নিয়ে আমাদের কাছে উপস্থিত হয়। মানুষ প্রতিনিয়ত মোহ ও কামনার পেছনে ছুটে বেড়াচ্ছে। অর্থের মোহ মানুষকে সারাজীবন ছুটিয়ে নিয়ে যায় এবং অর্থ অর্থ করেই সে তার জীবনের সমস্ত কিছুকে হারায়। যে সুখের সন্ধানে মানুষ অর্থের মোহকে আশ্রয় করে ছুটে বেড়ায়, সেই সুখ অধরাই থেকে যায় তার। আবার যে কামনা বাসনার মধ্যে প্রেমের আকাঙ্ক্ষা করে মানুষ, তাও সে কোনোদিন পায় না। অর্থের মোহ ও কামনাকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করতে পারলেই প্রকৃত সুখের সন্ধান পাওয়া যায়—এমনই একটি ইঙ্গিত রূপকের আড়ালে লোককথাটির মধ্যে প্রতিভাত হয়েছে। "এরা সুখের লাগি চাহে প্রেম সুখ মেলে না"—বাউলের সেই জীবন দর্শনই যেন এ কাহিনীতে প্রতিভাত।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারিবর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণরা ধর্মশাস্ত্র আলোচনা ও সমাজে ধর্ম প্রচার করবেন, এটাই ছিল প্রাচীন ঋষিগণের সিদ্ধান্ত। সেই সূত্রেই ব্রাহ্মণগণের এমন জীবন-যাপন করা উচিত, যাতে ধর্মের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকে। ধর্মের একটি প্রধান অঙ্গ অহিংসা। আর তাই ব্রাহ্মণদের এমন জীবিকা নির্বাহ করার কথা বলা হয়েছে, যার দ্বারা কারোর উপর অত্যাচার না হয়। যে রকম ভাবে জীবনযাত্রা করলে কোনো প্রাণীর কষ্ট হয় না, অথবা সামান্য মাত্র কষ্ট হয় ব্রাহ্মণরা সেইরূপ বৃত্তি অবলম্বন করবেন। ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠ বৃত্তি হচ্ছে "উঞ্ছশিল"। অর্থাৎ, পথে বা ক্ষেত্রে যে ধান্যাদি পড়ে থাকে, তা এক একটি করে কুড়িয়ে এনে তার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করাকে "উঞ্ছশিল" বলে।[২১] প্রাচীনকালে ধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণকে প্রতিপালন করা সমাজের কর্তব্য বলে বিবেচিত হত। কারণ, জ্ঞানের আলোক দ্বারা তাঁরা সমাজে ধর্মভাব প্রতিষ্ঠা করবেন, এমনই একটি ভাবনা ছিল প্রাচীনকালে। আর তাই ব্রাহ্মণদের ভিক্ষাবৃত্তিকেই প্রাচীনশাস্ত্রে শ্রেষ্ঠ বৃত্তি বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। প্রাচীন ঋষিরা মনে করতেন, যে ব্রাহ্মণ ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করেন, তার মনে অহঙ্কার উদিত হয় না এবং বিলাস ব্যসনের দ্বারা তার জীবন দূষিত হয় না। কিন্তু কালের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য পরিবর্তিত হতে থাকে। শিক্ষায়, জ্ঞানে, পাণ্ডিত্যে ব্রাহ্মণরা এগিয়ে থাকার ফলে, সমাজ-সভ্যতাকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রবণতা তাঁদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। এর ফলে উত্তরকালে জমিদারী থেকে রাজকার্য, সকল ক্ষেত্রেই ব্রাহ্মণদের বিশেষ ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। আর তাই পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানের অধিকারী হয়েও তাঁদের মধ্যে অহঙ্কারের বীজ বিস্তার লাভ করে, যা প্রকৃতপক্ষে তাঁদের আদর্শের পরিপন্থী। বিদ্যা ও

পাণ্ডিত্যের অহঙ্কারে অনেকসময় তারা ভুলে যায় যে, সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের মধ্যেও বুদ্ধির প্রাখর্য থাকা সম্ভব। ব্রাহ্মণরা নরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এমন ভাবনার কোনো প্রাসঙ্গিক কারণ নেই। যুগ যুগ ধরে চলে আসা ব্রাহ্মণের অহঙ্কারের মূলে কুঠারাঘাত করতে দেখা যায় "এক চতুর ভৃত্যের গল্প"[২২] শীর্ষক লোককাহিনীতে। অসমীয়া ভাষায় রচিত এই লোককথায় এক চতুর ভৃত্য, তার মালিক বা প্রভুকে কিভাবে প্রতি পদে পদে বোকা বানিয়েছিল, তারই এক সুন্দর চিত্র রয়েছে। সাধারণ ভৃত্যের কাছে পণ্ডিত ব্রাহ্মণের অত্যাচার ও অহঙ্কারের পরিণতির কথাটাই যেন এখানে ব্যক্ত।

"এক ব্রাহ্মণ তার শাশুড়ির কাছে যাচ্ছেন। সঙ্গে তার এক ভৃত্য। প্রথানুযায়ী সেই ব্রাহ্মণ বেশ কিছু কলা ও অন্যান্য ফলমূল সঙ্গে নিলেন। ফলের ঝুড়িটা ভৃত্যের হাতে দিয়ে বললেন—'দেখো, লুকিয়ে লুকিয়ে কলা আবার খেয়ো না যেন। মনে রেখ, পেছনেও আমার একটা চোখ আছে। আমি কিন্তু কলা খেলেই দেখতে পাবো।' তিনি এগিয়ে চললেন। পেছনে পেছনে ভৃত্যও হাঁটছে।

কিছুক্ষণ হাঁটার পর ভৃত্যের খুব খিদে পেয়েছে। সে তখন একটা কলা ছিঁড়ে খেতে লাগল। এরপর একটার পর একটা কলা খেয়ে, সমস্ত কলা শেষ করে ফেলল। হঠাৎ সেই ব্রাহ্মণ পেছন ফিরে তাকান। তাকিয়ে দেখেন কলার কাঁদিতে একটা কলাও অবশিষ্ট নেই। ব্রাহ্মণ রেগে আগুন। ভৃত্যকে গালাগাল দিতে শুরু করলেন। ভৃত্য তখন শান্তভাবে জানায়—"you told me you could see at your back, so I showed you every banana and ate it. You did not say me anything. How could I know that you would be angry?" ব্রাহ্মণ এ কথার কোনো উত্তর দিতে পারলেন না। এইভাবে সেই ভৃত্য একের পর এক কাজে ব্রাহ্মণকে বোকা বানিয়েছিল এবং ব্রাহ্মণের অহঙ্কারকে চূর্ণ করেছিল। শুধু তাই নয়, এ কাহিনীর শেষে আমরা দেখতে পাব যে, বুদ্ধিবলে সেই ভৃত্য গ্রামের সকলকে ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলেছে। ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে নিম্নশ্রেণীর অর্থাৎ অন্ত্যজ শ্রেণীর চরম ঘৃণার প্রকাশ এই কাহিনীকে এক নতুন মাত্রা দিয়েছে।

"সদাগরের তিন ছেলে" শীর্ষক একটি লোককথায় জীবনের এক মহৎ সত্যকে উন্মোচিত হতে দেখি। গোষ্ঠীবদ্ধ সংগ্রামী মানুষের জীবন ভাবনা যে কতো গভীর ও অগ্রগামী চিন্তার উৎস হতে পারে—তারই নিদর্শন এ গল্প। এর কাহিনী আমাদের হৃদয়ের অন্তঃস্থল ছুঁয়ে যায়। "এক সদাগরের তিন ছেলে। নাম তাদের—আতাল, চাতাল ও পাতাল। সদাগর তার ছেলেদের ডেকে বললেন, "তোমরা এখন বড় হয়েছ। ঘরে বসে আমার পয়সায় বাবুয়ানা করা চলবে না। সদাগরের ছেলে যখন, তখন ব্যবসা বা কাজ করে খেতে হবে। অতএব, কাজ শেখার চেষ্টা কর। এক বছর সময় দিলাম। এক বছর পর কাজ শিখে আমার সঙ্গে দেখা করবে।"

পিতার আদেশে তারা বেরিয়ে পড়ল কাজ শেখার জন্য। বড় জন গেল উত্তর দিকে, মেজো দক্ষিণে এবং ছোট জন গেল পুবদিকে। এক বছর পর তারা ফিরে এল। বড় ছেলে শিখল চুরিবিদ্যা, মেজো ছেলে শিখল যে কোনো কিছু লক্ষ্যভেদ করার অমোঘ কৌশল, আর ছোট ছেলে শিখে এল পৃথিবীর যে কোনো জিনিস জোড়াতালি দিয়ে পূর্বের রূপে ফিরিয়ে দেবার বিদ্যা। শিক্ষার পরীক্ষা নেওয়ার জন্য পিতা তাদেরকে ডাকলেন। একটি গাছ দেখিয়ে আতালকে বললেন, "ঐ গাছে এক ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমী থাকে। আতাল তুমি ঐ ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমীর বাসা থেকে এমনভাবে ডিম চুরি করে আনবে, যাতে তারা টের না পায়।" পিতার আদেশ মতো আতাল গাছে চড়ে এমন কৌশলে ডিম পেড়ে আনল, ব্যঙ্গমারা টেরও পেল না। এবার পিতা চাতালকে ডো · বললেন, "তুমি আতালের 'দু'-আঙুলের মধ্যে ধরা ডিমটিকে দূর থেকে ·ক্ষ্যভেদ করে দেখাও।" পিতার আদেশ মতো চাতাল তীর-ধনুক নিয়ে লক্ষ্যভেদ করতে এগিয়ে এল এবং সঠিকভাবে লক্ষ্যভেদ করে দেখাল। পিতা এবার তার ছোট পুত্র পাতালকে ডাকলেন। বললেন, 'তুমি এবার ঐ ভাঙা ডিমটি জোড়াতালি দিয়ে পূর্বেকার রূপ ফিরিয়ে দাও।' পিতার আদেশ মতো পাতাল মুহূর্তের মধ্যে সেই ভাঙা ডিমটিকে জোড়া দিয়ে দিল। ঐ কাণ্ড দেখে উপস্থিত সকলে বিস্ময়ে অবাক। ভেঙে চুর চুর হয়ে যাওয়া ডিমকে এমন সুনিপুণভাবে জোড়া দেওয়া যায়, একথা কেউ কল্পনা করতেই পারে না। পাতাল কিন্তু সেই কাজটাকেই খুব নিপুণভাবে করেছিল।

সমগ্র দেশে ছড়িয়ে পড়ল তাদের বিদ্যাশিক্ষার খবর। এদিকে দেশে তখন এক বিপদ ঘটেছে। দেশের রাজার একমাত্র কন্যা স্নানের পর ছাদের ওপর চুল শুকোচ্ছিল। হঠাৎ এক হুমো পাখি এসে তাকে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে গেছে। রাজা তখন সদাগরকে ডেকে পাঠালেন। সদাগর এলে রাজা বললেন, 'শুনলাম তোমার ছেলেরা নাকি নানান বিদ্যাশিক্ষা করে এসেছে।' সদাগর উত্তর দিল 'হ্যাঁ, মহারাজ'। রাজা বললেন, 'দেখোনা তোমার ছেলেরা আমার কন্যাকে উদ্ধার করতে পারে কিনা। যদি পারে তাহলে তাদের পুরস্কৃত করব আমি। রাজকন্যার সঙ্গে তোমার ছেলের বিবাহ দেব।" কথা শুনে সদাগর বললেন, 'মহারাজ আপনার তো একটি মাত্র কন্যা। আমার তিন ছেলে। রাজা বললেন, 'ঠিক আছে, আগে রাজকন্যা উদ্ধার হোক, তারপর স্থির করা যাবে। রাজকন্যা ঐ তিনজনের মধ্যে যাকে বিয়ে করতে চাইবে, তার সাথেই বিবাহ দেব। বাকি দুজনকে অন্যভাবে পুরস্কৃত করব।'

আতাল-চাতাল-পাতাল সদাগরের তিন ছেলে বেরিয়ে পড়ল, রাজকন্যাকে উদ্ধার করতে। তারপর, তিনজনে নানান প্রতিকূলতাকে জয় করে অবশেষে রাজকন্যাকে উদ্ধার করে আনল। রাজা রাজকন্যাকে পেয়ে খুব খুশি। এবার শর্ত পূরণের পালা। রাজা রাজকন্যাকে ডেকে বললেন, "এই তিনজন ছেলের মধ্যে কাকে তোমার বিবাহ

করতে পছন্দ হয়?"

রাজকন্যা তখন বলল, 'আতাল চুরি বিদ্যায় পারদর্শী। চুরি করা খুবই ঘৃণ্য বৃত্তি, তাই ওকে বিবাহ করতে পারব না। আর চাতাল সুনিপুণ ভাবে লক্ষ্যভেদ করতে পারে, এটি তার বিশেষ গুণ। তবে সে লক্ষ্যভেদ করে প্রাণী হত্যা করে। জীবহত্যা মহাপাপ, তাই চাতালকেও বিবাহ করতে পারব না আমি। কিন্তু পাতাল পৃথিবীর সমস্ত ভাঙা জিনিসকে মুহূর্তে জুড়ে দিতে পারে। সেই তো মহৎ, যে জীবনের সবকিছু ভাঙা চোরাকে জুড়ে দিতে সক্ষম। তাই এই পাতালকে বিবাহ করব আমি।"—এই লোককথাটি জীবনের বিশেষ এক দর্শনকে প্রতিভাত করেছে। সমাজ সংসারে সেই তো মহৎ কারিগর, যে সকল কিছুকে অর্থাৎ সকল সংকট মুহূর্তকে অপসারিত করে প্রবহমান জীবনকে ধরে রাখতে পারে একই ভাবে অনন্তকাল। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির, ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের, সমাজের সঙ্গে জাতির, জাতির সঙ্গে বিশ্বের মিলন কৌশল যার করায়ত্ত সে মানুষই মহৎ। সৃষ্টির অমোঘ প্রতিভা আছে তারই অন্তরে। সেই তো পারে জাতি-দেশ তথা বিশ্বের বিচ্ছিন্ন বিশৃঙ্খল ভাঙাচোরা মহত্ত্বগুলোকে একত্রিত করে মানব সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে। লোককথার কথকদের ভাবনার আকাশের এই বর্ণময় আলোর ছটা আমাদেরকে গভীরভাবে স্পর্শ করে।

এ গল্পের সঙ্গে আফ্রিকার একটি উপকথার কিছু মিল পাওয়া যায়। 'তিন অদ্ভুত পুত্র'[২৪] শীর্ষক সেই গল্পে পুত্ররা তিনজন তিনটি বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী ছিল। একজনের শ্রবণশক্তি ছিল প্রখর। ক্ষুদ্রতম পতঙ্গের মর্মরধ্বনিও তার কানে ধরা পড়ত। কিছুই এড়িয়ে যেতে পারত না। দ্বিতীয় পুত্রের ছিল অদ্ভুত দৃষ্টিশক্তি। এক মাইল দূরে পড়ে থাকা একটি বালি তার চোখকে ফাঁকি দিতে পারত না। এমন কি নদীর তীরের কলা গাছের ওপর ভন্ ভন্ করা একটি মাছি, তাও তার দৃষ্টিতে ধরা পড়ত। তৃতীয় পুত্রটি ছিল গণনায় পারদর্শী। গাছের পাতা থেকে আকাশের নক্ষত্র সবকিছুই গণনা করে দিতে পারত সঠিকভাবে। ওরাও তাদের মা-বাবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দূর দেশের উদ্দেশে যাত্রা করেছিল। সঙ্গে তারা কিছু নেয় নি। কেবলমাত্র এক থলে জনার নিয়েছিল তারা, পথের খাদ্য হিসেবে।

পথে শালতিতে করে যাওয়ার সময় একটা জনার পড়ে গিয়েছিল নদীতে। প্রথম জন সেই শব্দ শুনতে পায়, দ্বিতীয় জন নদীর জলে ঝাঁপ দিয়ে তাকে খুঁজে বার করে এবং নদীতে ডুব দিয়ে তুলে আনে, আর তৃতীয় জন গুণে দেখে সত্যি সত্যি একটা জনারই কম ছিল থলিতে।

এই তিনজনের মধ্যে চতুরতম কে? এমন প্রশ্ন করেই গল্পটি শেষ হয়।

জাপানের একটি প্রাচীন লোককথা 'কাগুইয়াহিমে'[২৫] (ঝিল্‌মিল্ কন্যা)। পণ্ডিতরা

মনে করেন এর রচনাকাল ৮১০ থেকে ৯৪৬ সালের মধ্যে কোনো এক সময়ে। এই লোককথাটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল, এ গল্পের নায়িকা চাঁদের দেশের ছোট্ট এক পরী। সে এসেছিল চাঁদের দেশ থেকে, 'তাকেতোরি' নামক দাদুর দুঃখকষ্ট দূর করতে। জাপানী ভাষায় 'তাকে' মানে 'বাঁশ', আর 'তাকেতোরি' মানে বাঁশ আনা। ঐ বুড়ো দাদু পাহাড়ের উপর চড়ে বাঁশ কেটে আনত। সেই বাঁশ দিয়ে নানান ঝুড়ি বানাত এবং তা বিক্রি করেই সংসার চলত তার। সেই 'তাকেতোরি' দাদু ও দিদিমার দুঃখ কষ্ট দূর করতে, সে এসেছিল এ পৃথিবীতে। একদিন বাঁশ কাটতে গিয়ে বাঁশের গোড়ার মধ্যে পায় তাকে। সে এতই ছোট ছিল যে হাতের তালুতে করে তাকে নেওয়া যায়। কিন্তু আলোয় ঝলমল করা রূপ ছিল তার। সে বড় হলে দাদু-দিদিমা আদর করে তার নাম রেখেছিল 'কাগুইয়াহিমে', অর্থাৎ ঝিলমিল কন্যা। 'কাগুইয়াহিমেকে' বাড়িতে আনার পরই ওদের দুঃখ কষ্ট দূর হয়। কারণ, এরপরে 'তাকেতোরি' দাদু যে বাঁশই কাটত, তার মধ্যে থেকে ঝনঝন করে পড়ত সোনার মোহর। ফলে, 'তাকেতোরি' দাদুর আর অভাব রইল না।

এরপর নির্দিষ্ট দিনে, এক পূর্ণিমার রাত্রিতে চাঁদের দেশের লোক মেঘের উপর চড়ে এসে নিয়ে যায় 'কাগুইয়াহিমাকে'। শুধু তাই নয়, ফিরে যাওয়ার সময় দেশের সম্রাট সৈন্যসামন্ত নিয়ে চাঁদের দেশের লোকদের বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে ব্যর্থ হয়। চাঁদের দেশের শক্তির কাছে তারা কিছুই করে উঠতে পারে না। অবশেষে চাঁদের দেশের তৈরি পালকের পোশাক (আধুনিক কালের Space-Suit-কে মনে করিয়ে দেয়) পরিয়ে 'কাগুইয়াহিমে'কে মেঘের উপর বসিয়ে উড়তে উড়তে চলে যায় চাঁদের দেশের লোক।

এ গল্প পড়লেই পাঠক বুঝতে পারবেন যে, তৎকালীন কথকদের চিন্তা চেতনায়, অন্যগ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব তথা উন্নত কোনো মানব জাতি বর্তমান আছে—এমন ভাবনাটি লালিত পালিত হচ্ছিল। কল্পবিজ্ঞানকে আশ্রয় করে রচিত কথকদের এমন কাহিনী নির্মাণ ভাবনাটি যে, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানকেই প্রশ্রয় দেয় তা বলাই বাহুল্য। মনে রাখতে হবে, এ গল্পের রচনাকাল ৮১০ থেকে ৯৪৬ সালের মধ্যে। অর্থাৎ, তখনো আধুনিক বাংলা সাহিত্য চর্যাপদের সূতিকাগার থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি। সুতরাং, একথা সহজেই অনুমেয় যে, লোককথার কথকরা সমকালের থেকে অনেক বেশি অগ্রগামী চিন্তার ধারক-বাহক ছিলেন। তাই তাঁদের সৃষ্ট লোককথাগুলিতে আধুনিক জীবনের অনেক কিছুই প্রতিফলিত হয়েছে, সহজ সরল কথার আড়ালে। এমনই একটি গল্প 'যে কুমারী আকাশ থেকে এসেছিল; (The Woman Who Came Down From Heaven)[২৬]। এ গল্পেও আমরা দেখতে পাই যে, এক কুমারী স্বর্গ থেকে প্রতিদিন এ পৃথিবীর ঝর্ণার জলে স্নান করতে আসে এবং স্নান সেরে আবার

ফিরে যায় স্বর্গে। কিন্তু একদিন এক যুবক সেই নারীর ঝলমলে পোষাকটা দেখতে পায় গাছের উপর, যা পরে সেই কুমারী, প্রতিদিন আসত এ পৃথিবীতে। যুবক সেই পোষাকটা নিয়ে নেয় এবং কুমারীকে তা ফিরিয়ে দিতে অস্বীকার করে। ফলে, কুমারী ফিরে যেতে পারে না স্বর্গে বা অন্যগ্রহে। স্বর্গের সেই কুমারী অনেক কাকুতি-মিনতি ও অনুরোধ করতে থাকে, পোষাকটা ফিরে পাবার জন্য। কিন্তু যুবক সেই পোষাকটা ফিরিয়ে দেয় না। যুবক ও সেই কুমারীর কথোপকথনের একটি অংশ এখানে উল্লেখ করলাম, যা পড়লে পাঠক বুঝতে পারবেন লোককথায় কথকদের চিন্তা-চেতনার ঐশ্বর্যটি। কুমারী পোযাকটা পাবার জন্য হাত জোড় করে মিনতি করছে এই বলে—"Mikeran (যুবকের নাম); did you not understand my request. That Kimono (পোষাক) is mine. Unless I have it, I cannot return to heaven. You are a human being and a flying Kimono is of no use to you; please give it back to me."[২৭]

উপরোক্ত সংলাপের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ দুটি হল "Unless I have it, I cannot return to heaven এবং "flying Kimono"। অর্থাৎ ঐ পোযাকটা ছাড়া সেই কুমারী স্বর্গ বা অন্যগ্রহে যেতে পারবে না এবং সেটি 'উড়ানের পোযাক'। সুতরাং, পোযাকটি যে আধুনিককালের 'Space-Suit' কে চিহ্নিত করছে, তা নিশ্চয় বলার অপেক্ষা রাখে না। অতএব, মহাকাশ অভিযানের কল্পনা কথকদের চিন্তার বৃত্তে ঘুরে ফিরছিল, তা নিশ্চিত করে বলা যায়। সেই সঙ্গে অন্য কোনো গ্রহে উন্নত জীবের অস্তিত্ব বর্তমান—এমন ভাবনাটিও তাঁদের চিন্তা-চেতনায় সক্রিয় ছিল তা বলাই যায়। আর তাই এমন কাহিনী নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছিল, তৎকালীন কথকরা।

সংগ্রামই মানব ইতিহাসের বিবর্তনের মূল সূত্র। আদিম মানবকে টিঁকে থাকার জন্য প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করতে হয়েছিল হিংস্র পশু ও প্রকৃতির ভয়ংকর রূপের বিরুদ্ধে। এরপর গোষ্ঠী পরিবার সমাজ-রাষ্ট্র প্রভৃতি প্রবহমান জীবন ধারার প্রত্যেক স্তরেই মানুষকে সংগ্রাম করতে হয়েছে। সমাজ বিবর্তনের যে স্তরে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার পত্তন ঘটেছিল, সেই স্তরে আপামর সাধারণ মানুষকে সংগ্রাম করতে হয়েছিল সামন্ত প্রভুদের সঙ্গে। লোককথার কথকরা সমাজ জীবনের প্রত্যেক পর্বের সংকট ও তার থেকে উত্তরণেব মৌলসূত্রটিকে কাহিনীর মধ্যে রূপ দিতে চেয়েছেন। খুব স্বাভাবিক কারণেই সামন্তপ্রভুদের বিরুদ্ধে গণমানসের সংগ্রামী চেতনাকে সঞ্চারিত করার জন্য তাঁরা গল্প কথকের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন—একথা বলাই বাহুল্য। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় একশ্রেণী ছিল ভূমির মালিক, তারাই উৎপন্ন ফসলের সিংহভাগ ভোগ করত। আর এক শ্রেণী ছিল মেহনতি মানুষ, যারা সামন্ত প্রভুর ভূমিতে কাজ করত—তারা হল ভূমিদাস। সামন্ত প্রভুদের কাছে ভূমিদাসরা সবসময়েই

ছিল কেনা গোলামের মতো। সামন্ত প্রভুদের ইচ্ছে অনিচ্ছের উপর নির্ভর করত তাদের জীবন-মরণ। আর তাই মাঝে মাঝেই ভূমিদাসদের মাথা-কাটা যেত, সামন্ত প্রভুদের হাতে। সবদেশে-সবকালে সামন্তপ্রভুদের চরিত্র একই। কিন্তু এই অত্যাচার ও বঞ্চনার হাত থেকে মুক্তি পেতে চাইল ভূমিদাসরা। পারস্পরিক মিলন ও ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামই তাদেরকে সেই সংকট থেকে মুক্তি দিতে পারে, একথা উপলব্ধি করল তারা। ভূমিদাসরা হল একত্রিত। তাদের মিলিত, ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের কাছে পরাজিত ও পিছু হটেছিল সামন্তপ্রভুরা—এমনই এক ইঙ্গিত খুঁজে পাওয়া যায় স্কটল্যাণ্ডের লোককথা "সাদা ভেড়া" কাহিনীতে।[২৮]

"এক সাদা ভেড়া মনিবের বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। কারণ, বড়দিনের উৎসবে ভেড়াটাকে কেটে খাবে বলে ঠিক করেছিল মনিব। পথে যেতে যেতে এক মোটা সোটা ষাঁড়ের সঙ্গে দেখা হলো তার। ষাঁড় তাকে জিজ্ঞেস করল—"ভাই, এই ভরদুপুরে কোথায় চলেছ?" দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভেড়া বলল—"বড়দিনে মনিব আমাকে কেটে খাবে ঠিক করেছে; তাই প্রাণ বাঁচাতে পালিয়ে এলাম।" ষাঁড়ও তখন তার দুঃখের কথা জানাল। তারও একই অবস্থা। মনিবের খেত-খামারে খেটেছে, নানান কাজকর্ম করেছে। সেই মনিব, বড়দিনের উৎসবে তাকে কেটে খাবে বলে ঠিক করেছে। তাই সে মনিবের বাড়ি ছেড়ে পালাচ্ছে। ভেড়া তখন তাকে বলল, "তাহলে তুমিও এসো আমার সঙ্গে। আমরা একসাথে বনে যাই। সেখানে গিয়ে মনের আনন্দে চরে বেড়াবো।" এই বলে তারা দুজনে একসাথে চলল বনের দিকে।

পথে তাদের সঙ্গে দেখা হল কুকুর, বেড়াল ও মোরগের সঙ্গে। তাদেরও একই অবস্থা। তারাও তাদের মনিবের বাড়ি থেকে প্রাণ ভয়ে পালাচ্ছে।

পাঁচজনের সংকট ও দুরবস্থা একই। বিপদের দিনে একসাথে পথ চলতে থাকল তারা। চলতে চলতে গভীর বনের মধ্যে এক পোড়ো বাড়ির খোঁজ পেল তারা। সেখানে থাকবে বলে তারা মনস্থির করল। কিন্তু, সেখানেও তারা রেহাই পেল না। কারণ, সেখানে রয়েছে দস্যুরা। তখন তারা একসাথে মিলিত হয়ে হুঙ্কার দিতে শুরু করল। তাদের মিলিত কণ্ঠের আওয়াজে কেঁপে উঠল বন। দস্যুরা সেই শব্দ শুনে ভয় পেল। অবশেষে, পোড়ো বাড়ি ছেড়ে প্রাণ ভয়ে পালাল দস্যুরা। তারপর ওরা পাঁচজনে মিলে নিশ্চিন্তে বসবাস করল সেই পোড়ো বাড়িতে। এইভাবে সেদিন লোককথার কথকরা ভূমিদাসদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের কাহিনী চিত্রিত করে গণমানসকে জাগ্রত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন, তা নিশ্চয় বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রায় একই চিন্তার নির্যাস রয়েছে গ্রীম ভাইদের সংগৃহীত রূপকথা "ব্রেমেন এর বাদ্যিকররা" (The Musicians of Breman) শীর্ষক লোককথায়।

আগেই বলেছি রাষ্ট্র-রাজনীতির নানান পাশাখেলার চিত্র লোককাহিনীতে খুঁজে

পাওয়া যায়। সেই পাশাখেলার ছকে হারিয়ে গেছে কতো জীবন। যুগ যুগ ধরে উপরতলার মানুষ সমাজের তথাকথিত অপাংক্তেয় বঞ্চিত নিম্নবিত্ত গণমানসের প্রতি অত্যাচার করে এসেছে। রাষ্ট্র রাজনীতির পাশাখেলায় যেমন একলব্যরা এসেছে, তেমনি আবার জতুগৃহে হত্যা করা হয়েছে পাঁচ নিষাদপুত্র সহ জননীকে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আত্মত্যাগ ও প্রাণ দিয়েছে নিম্নশ্রেণী ও নিম্নবিত্তের গণসাধারণ। সভ্যতার বিজয়রথ তাঁদের বুকের ওপর দিয়ে গড়িয়ে চলেছে যুগ যুগ ধরে, ইতিহাসই তার সাক্ষী। রবীন্দ্রনাথ 'রক্তকরবী' নাটকে যাদের বলেছেন, 'রাজার এঁটো'। প্রত্যেক কালে প্রত্যেক দেশেই এই রাজার এঁটোরা জন্মেছেন। তারপর একদিন সময়ের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা না করে ফিরে গেছেন তারা, নীরবে নিশ্চুপে। মহাকাল তাঁদের কথা মনে রাখেনি। এমনই এক রাজার এঁটোর কাহিনী রয়েছে "লাল পাহাড়"[২৯] শীর্ষক সিঙ্গাপুরের এক লোককথায়। বাদাং নামে এক ব্যাধের জীবনকাহিনী। মহাভারতের একলব্যকে তার অসীম দক্ষতার জন্য বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ কেটে গুরুদক্ষিণা দিতে বাধ্য করা হয়েছিল, আর লোককথার বাদাংকে তার প্রখর বুদ্ধির জন্য দিতে হয়েছিল প্রাণ—দুটি ক্ষেত্রেই উচ্চশ্রেণী ও উচ্চবিত্ত কর্তৃক নির্যাতিত-অত্যাচারিত হয়েছে নিম্নশ্রেণী ও নিম্নবিত্তের মানুষ। গল্পটি এইরকম :

"অনেক, অনেক বছর আগেকার কথা। সিঙ্গাপুরের চারপাশের সমুদ্রে তলোয়ার মাছ ঘুরে বেড়াত তখন। তলোয়ারের মতন ধারলো তার দাঁত। ওই দাঁতে যদি কোনো জীবজন্তুকে সে আক্রমণ করত, রক্ষা ছিল না তার। লোকে এই ভয়ংকর মাছের আক্রমণের ভয়ে সমুদ্রে স্নান করতে পারত না। শুধু তাই নয়, জেলেদেরও মাছ ধরা কঠিন হলো। কেননা, তাদের পাতা জাল তলোয়ার মাছ কেটে দিত। দাঁতে নৌকোর তলা ফুটো করে দিত। জল উঠে তা তলিয়ে যেত গভীর সমুদ্রে। ফলে জেলেদের রুজি রোজগার একরকম বন্ধ হবার যোগাড় হলো।

জেলেরা একজোট হয়ে তখন রাজাকে তাদের দুঃখের কথা জানালো। জেলেদের কথা শুনে রাজা খুব বিচলিত হলেন। তিনি তাঁর সেনাদের ডেকে পাঠালেন। তলব পেয়ে সেনারা তক্ষুনি রাজার কাছে উপস্থিত। রাজা তাদেরকে বললেন, 'তলোয়ার মাছের উৎপাতে রাজ্যের জেলেদের অবস্থা খুবই সঙ্গিন। এই মাছেদের হাত থেকে জেলেদের রক্ষা করা দরকার। তাই, তোমরা সবাই তীরের কাছে বুক-জল নেমে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকবে। ঢেউয়ে ঢেউয়ে মাছেরা যখন তীরের দিকে এগিয়ে আসবে, তখন তাদের বর্শা দিয়ে গেঁথে ফেলবে।'

রাজার আদেশ মতন সকল সৈনিক এক হাতে বর্শা আর অন্য হাতে ঢাল নিয়ে বুকজলে নেমে দাঁড়াল। কিন্তু তারা হাতের বর্শা উঁচিয়ে তোলার আগেই, এক লহমায় তলোয়ার মাছ চড়াও হয়ে সৈনিকদের দেহ এফোঁড় ওফোঁড় করে ফেলল। যত সেনা

মারা গেল, তার থেকে বেশি হল আহত। রক্তে রাঙা হয়ে গেল নীল সমুদ্র। রাজা এবার আরও শক্তিশালী একদল সেনাকে পাঠালেন। কিন্তু তারাও কিছুই করতে পারল না। তাদের অনেকেই মারা গেল তরোয়াল মাছের হাতে। রাজা আরও একদলকে পাঠালেন, কিন্তু তাদেরও একই অবস্থা হল।

এদিকে সমুদ্রের ধারে ছিল এক গ্রাম। সেই গ্রামে থাকত এক ব্যাধের ছেলে। কাঁধে তীর ধনুক ঝুলিয়ে বনে পাহাড়ে, সাগরের ধারে সে ঘুরে বেড়ায়। খরগোশ, হরিণ, পাখি শিকার করে। কখনো বা তীর দিয়ে গেঁছে মাছ ধরে।

সাগরের ধারেই দাঁড়িয়েছিল বাদাং। এতগুলো সৈনিকের অসহায় মৃত্যু দেখে তার ভারি দুঃখ হল। সে বিহ্বল হয়ে রাজার কাছে ছুটে গিয়ে বলল, "করছেন কি মহারাজ! এত সেনাকে এমন ভাবে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছেন।" বাদাং-এর কথা শুনে রাজা বললেন, "ওহে ছেলে, আমার আর কি করার আছে, বল তো? সেনারা ছাড়া এই ভয়ংকর তলোয়ার মাছের মোকাবিলা কে করবে? কেন যে ওরা মাছগুলোর সঙ্গে পেরে উঠছে না, বুঝতে পারছি না।"

বাদাং বলল, 'মাছগুলোর সঙ্গে সরাসরি লড়াইতে পেরে ওঠা যাবে না। একটু ভিন্ন পথ নিতে হবে। রাজা বললেন। 'কি রকম?'

বাদাং বলল, "মহারাজ, শুনুন তাহলে। রাজ্যে যত কলাগাছ আছে, কেটে আনার হুকুম দিন। তারপর গাছগুলোকে বুকজলে একটা একটা করে সার দিয়ে পুঁতে ফেলুন। প্রত্যেক গাছের পেছনে হাতে বর্শা নিয়ে একজন করে সৈনিক দাঁড়াবে। তরোয়াল মাছে এসে কলাগাছে দাঁত বসাবে, আর অমনি তাতে আটকে যাবে। ছটফটিয়ে দাঁত ছাড়াতে যাবে, আর সেই ফাঁকে সৈনিকরা হাতের বর্শা দিয়ে তাদের গেঁথে ফেলবে। এতে সেনারা মরবে না, কিন্তু তরোয়াল মাছ খতম হয়ে যাবে।"

রাজা বাদাং-এর কথাটা একটু ভাবলেন। তারপর, লাফিয়ে উঠে বললেন, "দারুণ পথ বাতলেছো তো।" সঙ্গে সঙ্গে পাইক-পেয়াদাকে রাজ্যের সমস্ত কলাগাছ কেটে আনতে হুকুম দিলেন। রাশি রাশি কলাগাছ এল। বাদাং এর কথামতো একটু করে তফাত রেখে পুঁতে ফেলা হল। এক এক জন সেনা বর্শা হাতে নিয়ে প্রতি গাছের পেছনে দাঁড়াল।

জোয়ার এল সমুদ্রে। ঝাঁকে ঝাঁকে তলোয়ার মাছ কূলের দিকে চলল। ঢেউ আছড়ে পড়ল কলাগাছে। তলোয়ার মাছ তার ধারালো দাঁত দিয়ে বিঁধছিল কলাগাছকে। কলাগাছের নরম কাণ্ডে আটকে গিয়ে তারা ছটফট করে ছাড়াতে চেষ্টা করল। সেই সুযোগে সৈনিকরা বর্শা দিয়ে তাদের গেঁথে ফেলল। এইভাবে একে একে মারা পড়ল সব তলোয়ার মাছ।

সবাই বাদাংয়ের জয় জয়কার করল। রাজার কানে গেল সব। তলোয়ার মাছ মারা পড়ায় তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

কিন্তু বাদাংয়ের বুদ্ধির কথা ভেবে তিনি খুব চিন্তিত হলেন। মনে মনে ভাবলেন এ ছেলে বড় হলে, আমাকে সিংহাসন থেকে তাড়াতে বেশিক্ষণ সময় লাগবে না। রাজার মনে ভয় ও আশঙ্কা চেপে বসল। কিছুতেই তিনি স্থির থাকতে পারলেন না। মন্ত্রীকে ডেকে তাঁর দুর্ভাবনার কথা জানালেন।

মন্ত্রীও রাজার কথায় সায় দিলেন। দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, 'ঠিকই বলেছেন মহারাজ। একে আর বড় না হতে দেওয়াই ভালো। এখনই একটা বিহিত করা উচিত।' তিনি রাজ্যের সেনাপতিকে ডাকলেন। সেনাপতি সব শুনে মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে বলল, "ব্যবস্থা করছি উজির-মশাই। মহারাজকে নিশ্চিন্তে থাকতে বলুন।"

পাহাড়ের মাথায় বাদাং শিকারে গেছে। সেই সুযোগে সেনাপতির অনুচরেরা ঘিরে ফেলল বাদাংকে। এরপর একের পর এক তলোয়ারের আঘাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল বাদাং। পাহাড়ের মাটি লাল হয়ে উঠল বাদাংয়ের রক্তে। পাহাড় আর ধূসর থাকল না। হল ঘন লাল। সেই থেকে ওই পাহাড়ের নাম হল 'লালপাহাড়'।

তাইওয়ানের লোককথা 'মা লিয়াং ও যাদুতুলি'[৩০] কাহিনীতে পাই শিল্পীর স্বাধীনতা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। সবকালে সবদেশে দুই শ্রেণীর শিল্পী-সাহিত্যিকের আবির্ভাব ঘটেছে। যেমন, এক শ্রেণীর শিল্পী সাহিত্যিকের সন্ধান পাওয়া যায়, যাঁরা রাজা তথা রাষ্ট্রশক্তির তাঁবেদারি করত। এদের ভাগ্যে জুটত সাফল্য, বৈভব, সুনাম সব কিছুই। আর এক শ্রেণীর শিল্পী সাহিত্যিকদের সন্ধান পাওয়া যায়, যারা কোনোদিন রাজা তথা রাষ্ট্রশক্তির কাছে মাথা নোয়াতো না। রাজা বা রাষ্ট্রশক্তির অবিচার, অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাত, তাদের শিল্প-সাহিত্যের মধ্য দিয়ে। ফলে তাদের ভাগ্যে জুটত অত্যাচার ও বঞ্চনা। রাজরোষে পড়ে তাদের জীবন হতো বিষময়। কিন্তু তবুও তারা তাদের আদর্শ থেকে কোনোদিন বিচ্যুত হতো না। 'মা লিয়াং' ছিল তেমনই এক শিল্পী। তাব তুলির স্পর্শে জীবন্ত হয়ে উঠত সব। গ্রাম থেকে শহরে ছড়িয়ে পড়ল 'মা লিয়াং'-এর যাদু তুলির কাহিনী। জমিদার তাকে ডেকে পাঠালেন। হুকুম করলেন, বিশাল এক কুকুরের ছবি আঁকতে। 'মা-লিয়াং ভাবল, 'এত বড় কুকুর যদি আঁকি. তাহলে সেই কুকুর প্রজা সাধারণকে অতিষ্ঠ করে তুলবে।' এই কথা ভেবে সে জমিদারের হুকুম মতো ছবি আঁকতে রাজি হল না। ফলে, জমিদার তাকে বন্দী করে রাখলেন। বন্দী অবস্থাতেই লিয়াং ছবি আঁকতে থাকল। অবশেষে একদিন জমিদারের অসতর্ক মুহূর্তকে কাজে লাগিয়ে পালিয়ে গেল সে। পালিয়ে গিয়ে পৌঁছাল অন্য একরাজার রাজ্যে। সেখানেও সে ছবি আঁকে। প্রকৃতির সব কিছুই তার তুলির স্পর্শে জীবন্ত ও মুখরিত হয়ে উঠতে লাগল। শালিক, টিয়া, ময়না, মুনিয়া নানান পাখির ছবি আঁকে সে। তারপর সেই সব জিনিস বাজারে বিক্রি করে. যা টাকা পয়সা পায় তাতেই ভালোভাবে চলে যায় তার দিন।

এবারও তার ছবি আঁকার অদ্ভুত ক্ষমতার কথা রাজার কানে পৌঁছাল। রাজা জোর করে জাদু তুলি কেড়ে নিলেন। তারপর ভাবলেন, ঐ তুলি দিয়ে নিজের ইচ্ছে মতো ছবি আঁকবেন। কিন্তু তার ফলে, ঘটে চলল নানান বিপত্তি। অবশেষে রাজা ঠিক করলেন,লিয়াংকে মুক্তি দিয়ে তাঁকে দিয়েই নিজের ইচ্ছে মতো ছবি আঁকাবেন।

লিয়াং এবার ছবি আঁকলেন। তবে এবার লিয়াং ছবি আঁকলেন সাগরের। তাঁর মধ্যিখানে একটি ছোট্ট পালতোলা নৌকো। নৌকোর উপর বসে আছেন স্বয়ং রাজা। তার সমস্ত শরীর অলঙ্কারে ঢাকা। তারপর সেই যাদু তুলির স্পর্শে সাগরের বুকে প্রচণ্ড ঢেউ তুললেন লিয়াং। রাজা চিৎকার করছেন ভয়ে। ঢেউয়ের বেগ আরও বাড়িয়ে দিল লিয়াং এবং সাগরের সেই উথাল পাতাল ঢেউয়ের আঘাতে, মুহূর্তের মধ্যে ডুবে গেল রাজার নৌকো। সাগরের অতল জলে চিরকালের মতো তলিয়ে গেলেন রাজা। এ কাহিনী আমাদের শিক্ষা দেয় যে, প্রকৃত শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীরা কোনোদিনই রাজা তথা রাষ্ট্রক্ষমতার কাছে মাথা নত করে না। গণমানসের জীবন বিপন্ন হয়, এমন কিছুকে তাঁরা প্রশ্রয় দেন না। জনমানসের ওপর নেমে আসা নানান অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান তাঁরা। গণজীবনের জীবন ভাবনাকে চিত্রিত করাই তাঁদের কাজ। তা করতে গিয়ে যদি রাজরোষের শিকার হতে হয়, তবুও তাঁরা তার থেকে সরে আসেন না। শুধু তাই নয়, প্রয়োজন হলে এই শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীরাই একদিন, অত্যাচারীর আসন চিরকালের মতো ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দিতে পারেন—এমনই এক সত্যের ইঙ্গিত কাহিনীটির মধ্যে প্রকটিত।

লোককথার কথকরা যেহেতু সমাজেরই একজন খুব স্বাভাবিক কারণেই তাঁদের রচিত কাহিনীগুলিতে সমাজ-রাজনীতির চিন্তার সূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। সেই চিন্তার নির্যাস এতই প্রখর ও তার অভিমুখ এতটাই বাস্তবতার দিকে যে, আজও তার শৈল্পিক বৈশিষ্ট্য ও দক্ষতা আমাদেরকে ভাবায়। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সোভিয়েত ইউক্রেনের এক উপপ্রদেশে সংগৃহীত একটি লোককথায় রাষ্ট্র-রাজনীতির নানান কূট কৌশল স্পষ্টভাবে চিত্রিত রয়েছে। "যে সিংহ রাজা হয়েছিল" (The Lion who was made Tsar) শীর্ষক সেই লোককাহিনী পড়তে পড়তে যে কোনো পাঠকই বর্তমান পৃথিবীর সমাজ রাজনীতির সঙ্গে মিল খুঁজে পাবেন। শুধু মিল খুঁজে পাবেন তা নয়, রাষ্ট্র রাজনীতির বহুবিধ অসঙ্গতি এবং সাধারণ মানুষের দুর্দশার করুণ চিত্রগুলি এ কাহিনীতে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে চিত্রিত করার প্রতীকী ভাবনাটিও বেশ চমকপ্রদ। এ গল্পেও শেষপর্যন্ত লাঞ্ছিত ও অত্যাচারিত সমাজের জয় হয়। আমরা জানি যে, লোককথার মধ্যে জীবজন্তু নিয়ে রচিত কাহিনীগুলিতে সবসময়ই গল্পের "একটি চোখ থাকে মানুষের দিকে।"[৩২] আর তাই লাঞ্ছিত ও অত্যাচারিত জীবজন্তু আসলে যে, মানুষেরই প্রতীকী রূপ—একথা বুঝে নিতে আমাদের অসুবিধা হয় না। কিন্তু আমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে কথকরা কেন তাঁদের কাহিনী নির্মাণের জন্য জীব-জন্তুর প্রতীককে বেছে

নিয়েছিলেন? এর একটি কারণ যদি হয় কথকদের সামনে তখন প্রকৃতি ও জীবজন্তুই ছিল প্রত্যক্ষ বাস্তব, অন্যটি হল সমকালীন রাজা বা রাষ্ট্রশক্তির বলপ্রয়োগের আশঙ্কা, অর্থাৎ অত্যাচারের সম্ভাবনার কথা ক্রিয়াশীল ছিল গল্প-কথকদের চিন্তা চেতনায়। আর তাই রাজা তথা রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার জন্য তাঁদের ওপর শাস্তি নেমে আসতে পারে এমন ভাবনা থেকে গল্পকাহিনী নির্মাণের জন্য জীব জন্তুর প্রতীকের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছিল তাঁদের। তবে পঞ্চতন্ত্রের কাহিনী নির্মাণের ক্ষেত্রে কিন্তু দাক্ষিণাত্যের মহিলারোপ্য রাজ্যের রাজা অমর শক্তির তিন মূর্খ পুত্রকে সুকৌশলে শিক্ষা দেওয়ার জন্য বিষ্ণুশর্মা এই প্রতীকী আঙ্গিকের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন—একথা ইতিহাস স্বীকার করেছে। পঞ্চতন্ত্রের বেশির ভাব কাহিনীই পশুপাখিদের নিয়ে এবং তাদের মুখ দিয়েই বিষ্ণুশর্মা গল্পগুলি বলেছেন। সংস্কৃত ভাষায় রচিত পঞ্চতন্ত্রের কাহিনীগুলির জন্মকাল, আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বেকার। যদিও এটা আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে, পঞ্চতন্ত্র রচনার সময়কালের রাষ্ট্র রাজনীতির সঙ্গে ঊনবিংশ শতাব্দীতে সংগৃহীত গল্প-কাহিনীর সময়কালের রাষ্ট্রনীতির প্রেক্ষাপটের পার্থক্য আছে। তবে সেইসঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে যে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে সংগৃহীত কোনো কাহিনীর রচনাকাল ঊনবিংশ শতাব্দীতে—এমন সিদ্ধান্তও সঠিক নয়। কারণ, কথকদের মুখে মুখে ঘুরে ফেরা কাহিনীগুলির মূলকাহিনীটির নির্মাণকাল সঠিকভাবে নির্ধারণ করা আজ আমাদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব, তবে উপাদানগুলির বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করে কাছাকাছি একটি সময়ের আন্দাজ করা যায় মাত্র। "যে সিংহ রাজা হয়েছিল" শীর্ষক কাহিনীটির বিষয়বস্তু আধুনিক কালের জীবনভাবনাকেই প্রশ্রয় দিয়েছে এবং তার নির্মাণ আঙ্গিকটিও বেশ আধুনিক। আর তাই এ কাহিনী খুব বেশি প্রাচীন বলে মনে হয় না। কাহিনীটিতে সুকৌশল ভাবে রাজা তথা রাষ্ট্রশক্তির ক্ষমতার অধিকারের কুৎসিৎ কৌশল ও দম্ভ এবং তার অপব্যবহারের চিত্রটি প্রকটিত হয়েছে। সিংহ কিভাবে শেয়ালের সাহায্যে ও দাক্ষিণ্যে রাজা হয়েছিল, রাজা হওয়ার পর কিভাবে দুর্জন শেয়ালরা সুযোগ গ্রহণ করে সাধারণ দুর্বল পশুদের অত্যাচার করেছিল এবং তার পরিণতিই বা কি হয়েছিল—এ সবই লোককথাটিতে চিত্রিত রয়েছে।

বনের পশুরা একদিন মিলিত হয়ে পরামর্শ করতে লাগল, এমন কাকে রাজা করা যায় যাকে সবাই কেবল ভয়ই পাবে না, ন্যায্য বিচারক বলে মান্যও করবে।

সবচেয়ে দুর্বল আর অসহায় পশুরা বলল, "হাতিরই রাজা হওয়া উচিত। কারণ, সমস্ত পশুদের মধ্যে সে বেশি বুদ্ধিমান এবং সবচেয়ে ন্যায্য মতে চলে।" অন্যদিকে বেশি বলবান ও চটপটে জন্তুরা বলল, 'রাজা হওয়া উচিত সিংহের। কারণ, সে শুধু হাতির চেয়ে বেশি চটপটে তাই নয়, দেখতেও সুন্দর।" এইভাবে নানান আলোচনা চলতে থাকল। এদিকে শেয়াল ভয় পাচ্ছিল সিংহকে। শেয়ালকে সে বলেছিল তার পক্ষ নিতে। এমনকি সে ভয়ও দেখিয়েছিল শেয়ালকে। তাকে রাজা না করা হলে

শেয়ালকে সে কুটিকুটি করে খাবে। প্রাণের ভয়ে শেয়াল সিংহকে রাজা করার জন্য উঠে পড়ে লাগল। সে সকলকে পরামর্শ দিল এই বলে : 'অনেকে হাতিকে রাজা করতে চায়। কারণ, হাতি বুদ্ধিমান, গায়ে শক্তি আছে, রক্ত ভালোবাসে না, অন্যকে মাংস খেতে দেবে না। কিন্তু তোমরাই ভেবে দেখো, এমন একজন জুবুথুবু কেমন করে রাজা হবে সে? আমাদের শত্রুরা এখনকার চেয়েও বেশি করে ক্ষতি করবে আমাদের, লুটপাট করবে। ওরা হাতিকে ভয়ই পাবে না। কারণ, ওরা জানে যে হাতি কাউকে শাস্তি দিতে পারবে না। কারো পিছু ধাওয়া করলে, তারা খুব সহজেই পালাতে পারবে। আমার মনে হয়, সিংহকেই রাজা করা উচিত। সে একাধারে বুদ্ধিমান, বলবান এবং বেশ চটপটে। ফলে দোষীদের সে শাস্তি দিতে পারবে এবং শত্রুরা ওকে ভয় পাবে।" হরিণ বলল, "এ সবই ঠিক, কিন্তু ন্যায় কাজ করবে কি? তার চেয়ে বরঞ্চ অধিকাংশ যা বলবে, তাই হোক। এসো লটারি করা যাক। এতে কারো ক্ষোভ থাকবে না।"

সকল পশুরা হরিণের কথায় চিৎকার করে সায় দিল। ঠিক হল যে, যারা সিংহকে রাজা করতে চায়, তারা গাছের কোটরে 'বাদাম' ফেলবে। আর যারা হাতিকে রাজা করতে চায়, তারা ফেলবে 'ওক' ফল। কথামতো সবাই পালা করে ডাঁই করে রাখা 'ওক' ও 'বাদাম ফলের দিকে যেতে লাগল। যার যা পছন্দ, তাই নিয়ে ফেলতে থাকল গাছের কোটরে। হিংস্র পশুরা রক্তের ভক্ত, তারা নিতে লাগল 'বাদাম'। আর যারা ঘাস-পাতা খেয়ে থাকে, তারা নিতে লাগল 'ওক' ফল। সিংহের ভাগে কম পড়ছে দেখে লেজ নাড়তে লাগল শেয়াল, জন্তুদের কাছে ছোটাছুটি করে সে চোখ মটকাতে লাগল, যেন বলতে চায় বাদাম নাও। আর ছোট ছোট জন্তুরা যখন আসতে লাগল ডাঁইয়ের কাছে, শেয়াল তাদের কানে ফিস্‌ফিস্ করতে শুরু করল, 'বাদাম নাও, নাহলে সিংহ রেগে যাবে, চিঁড়ে চ্যাপ্টা করবে তোমায়, আমিও রেগে যাবো, থাকার জায়গা দেবো না।' সিংহের কুনজরে পড়ার ভয়ে ছোট ছোট জন্তুরা, বাদামের ঢিপির কাছে লাইন দিল। অন্যদিকে শেয়াল যে একটা বাদামের বদলে পুরো একমুঠো তুলে কোটরে ফেলেছিল, সেটা কেউ খেয়ালই করেনি। 'ওক' আর বাদাম ফল যখন গোনা হল, তখন দেখা গেল দুজনেই সমান সংখ্যা পেয়েছে। ভাল্লুক বলল, 'তাহলে আবার লটারি হোক। তবে এবার লক্ষ্য রাখতে হবে কেউ যেন একটার বেশি পছন্দের ফল না ফেলে এবং অন্য কেউ যেন কোন্, ফলটা নিয়ে ফেলতে হবে তা নিয়ে ফুস্‌ফাস্ না করে।"

শেয়াল নতুনভাবে লটারি করতে রাজি হল না। সে বলল, "ফল গুণে দেখলাম, দুজনের অধিকারই সমান সমান। আর তাই আমি বলি কি, দৌড়ে যে অন্যকে হারাতে পারবে সেই হবে আমাদের রাজা।' হাতি তাতে রাজি হল না। এরপর শেয়াল বলল, 'তাহলে আপনাদের মধ্যে যে বেশি উঁচুতে লাভ দিতে পারবে, সেই রাজা।' হাতি বলল, "না, লাফাতে আমি পারি না। আমি তো আর হালকা-পলকা নই।" শেয়াল সে

কথা শুনে বলল, "তাহলে সিংহই রাজা হোক।" হাতি তখন রেগে বলল, 'এত আমার অবশ্য কিছুই এসে যায় না। তবে এটা অন্যায়। সিংহ যা করতে পারে, আমি তা পারি না। আর আমি যা পারি, সিংহ তা পারে না। এই যখন ব্যাপার, তখন সিংহ লড়ুক আমার সঙ্গে। সে যদি আমার হারাতে পারে, তবে সেই হবে রাজা।" শেয়াল হাতির কথায় রাজি হল, তবে মনে মনে একটা ফন্দি করে বলল, 'ঠিক আছে তাই হবে। তবে আজ নয়। কাল সকালে লড়াইটা হবে। আর হ্যাঁ, তোমরা কেউ লড়াই দেখতে আসবে না। কারণ, ওনারা দুজনেই গণ্যমান্য, ওনারা লজ্জা পেতে পারেন। আমরা পরে এসে দেখব, কে কাকে হারিয়েছে।'

সবাই তাতে সায় দিল। এদিকে রাত নামল, ঘুম পেল হাতির। বনে গেল সে, তেমন মোটা নয় এমন একটা ওক্ গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল সে। হাতিরা সাধারণত ঘুমোয় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, গাছে ঠেস দিয়ে। কাত হয়ে শুলে নিজে নিজে আর উঠতে পারে না। দূর থেকে হাতির ওপর নজর রেখেছিল শেয়াল, যেই দেখল হাতি অঘোরে ঘুমোচ্ছে, সিংহের কাছে সে ছুটে গিয়ে বলল, "হুজুর, চলুন তাড়াতাড়ি। হাতি ঘুমিয়ে পড়েছে। কাজে লাগা যাক।" সিংহ বলল, 'না আমি পারবো না। হাতিকে পিষে ফেলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।' শেয়াল বলল, 'ওকে পিষে ফেলার দরকার নেই। হাতি গাছে ঠেস দিয়ে ঘুমোচ্ছে। গাছটা আমরা কামড়ে ভেঙে ফেলব। গাছও পড়বে, সঙ্গে সঙ্গে হাতিও পড়বে। আমরা বলব, তুমি হাতিকে হারিয়ে দিয়েছ'। কথামতো শেয়াল কয়েক গণ্ডা নেকড়েকে নিয়ে এল হাতির কাছে। তারা ওক গাছ কামড়াতে লাগল। কামড়াতে কামড়াতে প্রায় ভোর হয় হয়। গাছ টলছে, কিন্তু তবু পড়ছে না। এবার শেয়াল ছুটে গিয়ে ডেকে আনল তিনজন ভল্লুককে। তাদেরকে বলল, 'আমাদের ভাবী রাজা হাতি মধু পেয়েছে এই ওক্ গাছে। মধু চাই হাতি জেগে ওঠার আগেই। নইলে তোমাদের শাস্তি পেতে হবে।' গাছটা যে দিকে হেলে পড়েছে, সেই দিকে দেখাল শেয়াল ভাল্লুকদের। ভাল্লুকরা উঠল একেবারে আগায়, সেই ভার সইতে পারল না ওক্ গাছ। মট্‌মট্ করে ভেঙে পড়ল। হাতিও উলটে পড়ল চিৎপাত হয়ে। উঠতে পারে না। আর ভাল্লুকগুলো অতো উঁচু থেকে যেই না পড়া, অমনি অক্কা।

এদিকে সকালে সবাই এসে দেখল, হাতি চিৎপাত হয়ে পড়ে আছে। আর ধরাশায়ী হাতির ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে সিংহ। সমবেত সকলকে উদ্দেশ করে শেয়াল তখন বলল, "তোমরা দ্যাখো, কী বলবান আমাদের রাজা। হাতিকে সে হারিয়েছে। হাতিকে সাহায্য করতে তিনটে ভল্লুক হাতির পক্ষ নিয়েছিল, তাদেরকেও ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। ঐ দ্যাখো পড়ে আছে তারা।" অনেকেই ভয়ে কাঁপতে লাগল। একবাক্যে চেঁচিয়ে উঠল, "সিংহই আমাদের রাজা।" সেই থেকে সিংহই হল বনের রাজা। রাজা হয়েই সিংহ তার রাজত্বের জন্য কয়েকজন লাট নিয়োগ করল। নেকড়ে, পেল ঘেসো মাঠের,

বাঘ বনের, আর শেয়াল পেল খেতের ভার।

এদিকে লাট অর্থাৎ মন্ত্রীত্ব নিয়ে জন্তুদের মধ্যে বলাবলি চলতে থাকল। কেউ বলল, 'নেকড়ে আর শেয়াল কী এমন করেছে যে অমন মান্যি?'' হরিণ বলল, 'কোনো একটা চালাকি ছিল তাতে। শেয়াল তো চালাকিতে ওস্তাদ, কিছু একটা ফন্দি করেছিল সে। নেকড়েরাও নিশ্চয় সাহায্য করেছিল, তাই তাদের এত কদর। কিন্তু বাঘ, সেটা অন্য ব্যাপার। বাঘ বলবান। কর্তা হওয়া তার সাজে। তাছাড়া ওকে বাদ দিলে চলবে না। সিংহের ওপর ক্ষেপে উঠতে পারে। সব বানচাল করে দেবে তখন। শক্তিতে সে সিংহের চেয়ে তেমন খাটো নয়।' 'আমারও তাই মনে হচ্ছে', বলে উঠল ভালুক। 'বেশ বোঝা যাচ্ছে হাতিকে ওরা বোকা বানিয়েছে।' সবাই সায় দিল ভালুকের কথায়।

এরপর জন্তুরা যে যার নিজের মতো থাকতে লাগল। যারা ঘাস পাতা খায় তারা রইল শান্তিতে। আর হিংস্র পশুরা শুরু করল নানান অত্যাচার। দুর্বলদের ওপর চলল তাদের নিষ্ঠুর নিপীড়ন। চলল লুঠপাট, খুন জখম। লাটদের কথা বিশ্বাস করত রাজা। ভালো কাজের জন্য পুরস্কার দেওয়া হতো তাদের। এরপর চলল মন্ত্রীত্ব নিয়ে খবরদারি। শেয়ালের খেতের লাটগিরিতে বিরক্ত ধরে গেল। ছোটোখাটো নেংটি ইঁদুর-টিঁদুর ছাড়া কিছু সেখানে মিলত না। সে চায় মুরগি-টুরগি, হাঁস-টাঁস। রাজার কাছে সে আবদার করল। আবদার মেনে নিল সিংহ। এরপর যথেচ্ছ প্রকারে লুঠপাট চলল মুরগির খোঁয়াড়ে। মুরগিরা নেকড়েকে শেয়ালের বিরুদ্ধে অভিযোগ করল। নেকড়ে জানাল সিংহকে। শেয়াল চালাকি করে সিংহকে দিয়ে নেকড়ের প্রাণ নিল। এতে অন্যান্য নেকড়েরা গেল ক্ষেপে। এরপর শেয়াল আর নেকড়েদের মধ্যে চলল তুমুল লড়াই।

এ লড়াই কতদিন চলত বলা যায় না। কিন্তু লোকদের বিরক্তি ধরে গেল। কেবলি খোয়া যাচ্ছে কখনো মুরগিটা, কখনো ভেড়াটা, কখনো বাছুর। হিংস্র জন্তুদের ঘেরাও করল তারা। সিংহকে ধরে বন্ধ করা হল খাঁচায়। মারা পড়ল অনেক নেকড়ে। বাকি জন্তুরা প্রাণ ভয়ে পালাল। শান্ত হয়ে এল দেশটা।

উপরোক্ত কাহিনীর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল পশু বা জীবজন্তুর রূপকের আড়ালে প্রজাসাধারণ কর্তৃক 'রাজা' বা রাষ্ট্রপ্রধানকে নির্বাচিত করার কাহিনীটি। ধূর্ত শেয়ালরা কিভাবে সমস্ত নির্বাচন প্রক্রিয়াটিকে প্রহসনে রূপান্তরিত করে এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আমলাতান্ত্রিক পরিকাঠামোটি দুর্বল হলে, রাজা তথা রাষ্ট্রশক্তির আশ্রয়ে লালিত-পালিত একশ্রেণীর তাঁবেদার কিভাবে ক্ষমতার অপব্যবহার করে—তারই বর্ণময় কাহিনী এ গল্পকে গতিময় করে তুলেছে। সেই সঙ্গে জনসাধারণের ওপর নেমে আসা নানান অন্যায় অত্যাচারের পরিণতি কি হতে পারে, তারও একটি ইঙ্গিত রূপকের আড়ালে এই লোককথায় প্রকটিত।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের লোককথাগুলি পড়লে দেখা যাবে যে, প্রায় প্রত্যেক

দেশের লোককথাতে পশু-পাখি, জীব-জন্তু ইত্যাকারে জীবজগৎ, অনেক ক্ষেত্রেই কাহিনীর প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ। শুধু তাই নয়, অনেক ক্ষেত্রেই তারা মানুষের সঙ্গে সহাবস্থান করেছে। এমন কি অনেক কাহিনীতেই মানুষের বিপদকালে তাদেরকে পরিত্রাতার ভূমিকা গ্রহণ করতে দেখা যায়। ফলে, আমাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, এর পেছনে কোন রহস্য বা বিস্ময় লুকিয়ে আছে? এই রহস্য বা বিস্ময়ের পেছনে দুটি প্রধান উদ্দেশ্য লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, প্রাচীনকালের মানুষ এটা উপলব্ধি করতে পেরেছিল যে, প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখতে, মানব বিবর্তনের ধারায় প্রকৃতি ও তার কোলে আশ্রিত জীবকুলের অস্তিত্ব এক অপরিহার্য শর্ত। কারণ, মানুষ ছাড়াও পৃথিবীর বিচিত্র জীব-জগতের মধ্যে প্রাণের যে নিরন্তর প্রবাহ বয়ে চলেছে, সেই প্রবহমান মানবজগৎ ও জীবজগৎ প্রকৃতির সঙ্গে এক সূত্রে গ্রথিত। মানব জগৎ ও জীবজগতের নিগূঢ় সম্পর্কের কথা মাথায় রেখেই কথকদের কাহিনীগুলিতে পশু-পাখি জীব জন্তুর এতো আনাগোনা। প্রকৃতি ও জীবজগতের সঙ্গে মানুষ নিজেকে এক অভিন্ন সত্তা রূপে অনুভব করেছে, সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকেই। এই অনুভবের জন্যই সে সার্থক ও সম্পূর্ণ। আর তাই লোককথার পশু-পাখি-গাছ মানুষের সঙ্গে কথা বলে অনায়াস ভঙ্গীতে। যেন এমনটাই স্বাভাবিক এমনই একটি মনন ক্রিয়াশীল ছিল সবসময় কথকদের চিন্তায়। খুব স্বাভাবিক কারণেই, প্রাচীন লোককথাগুলিতে একদিকে যেমন পশু-পাখি জীব-জন্তু প্রভৃতির জায়গা সূচিত হল, অন্যদিকে তাঁদের সৃষ্ট দেব-দেবীর কল্পনার মধ্যেও দেবদেবীর বাহন হিসেবে জুড়ে রইল পশু-পাখি প্রভৃতি এক একটি প্রাণী।

দ্বিতীয়ত, মানব মনের নানান ওঠা-পড়া, তার নানান টানাপোড়েন ও গতি প্রকৃতিকে রূপকের আড়ালে প্রকাশ করার জন্য কথকদের সামনে যে প্রত্যক্ষ বাস্তবতা ছিল, তাকেই সে গ্রহণ করেছে রূপকের প্রতীক হিসেবে। প্রকৃতি ও জীবজগৎই ছিল তখন তাদের সম্মুখে সবচেয়ে বেশি প্রত্যক্ষ বাস্তব। আর তাই ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশে পশু-পাখি বৃক্ষের ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়।

পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের লোককথাগুলি পর্যালোচনা করে বেশ কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন—(১) লোককথা মানুষের জীবন ভাবনা ও অভিজ্ঞতা সঞ্চালনের মাধ্যম। (২) লোককথাগুলিতে অত্যাচারিত, নিপীড়িত, বঞ্চিত-দুর্বল-অসহায় মানুষের প্রতি গভীর সহানুভূতি এবং পরিশেষে তাদের জয় ঘোষিত হয়েছে। (৩) লোককথার পাত্রপাত্রীদের মধ্যে শুভ ও অশুভের দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়। এই দ্বন্দ্বই প্রকৃতপক্ষে সমাজ বিবর্তনের প্রধান অনুঘটক। (৪) লোককথার 'অন্তর কাঠামো' (Deep Structure) ও 'বহির কাঠামো' (Surface Structure)-এর মধ্যে সুসংহত সামঞ্জস্য থাকে। (৫) দেশে দেশে বা অঞ্চল ভেদে একই লোককথার যে পরিবর্তন বা পরিবর্ধন লক্ষ্য কবা যায়, তা নিয়ন্ত্রিত হয় সুনির্দিষ্টভাবে। পরিবর্তনটি প্রধানত সূচিত

হয় 'বহির কাঠামো'র (Surface Structure) উপাদানগুলির মধ্যেই। (৬) লোককথার 'অন্তর কাঠামো'র (Deep Structure) মধ্যেই থাকে কথকের মূল অভিপ্রায়। অর্থাৎ, যে অভিজ্ঞতা বা দর্শনটিকে কথক তার কাহিনীর মধ্যে সঞ্চালন করতে চান, তার প্রাণটি সংগুপ্ত থাকে 'অন্তর কাঠামো'র মধ্যে। (৭) পশুপাখি-জীবজন্তু প্রভৃতি রূপকের আড়ালে মানুষের জীবনদর্শন বা জীবন ভাবনাটি প্রকাশিত হয় লোককাহিনীতে। (৮) লোককাহিনীর মৌলসূত্র বা দর্শনটি দেশ-কাল-সমাজ অতিক্রম করে বিশ্বজনীন হয়ে ওঠে, তাই তা সবকালে ও সবদেশেই আজও প্রাসঙ্গিক। (৯) লোককথাগুলির মধ্যে সমকালীন সমাজের বা সমকালীন রাষ্ট্ররাজনীতির চিত্র প্রতিফলিত হয়। (১০) যেহেতু 'অন্তর কাঠামোটি' প্রধানত কথকের অভিজ্ঞতা বা গোষ্ঠীজীবনের অভিজ্ঞতার সূত্র, সেহেতু তা বাইরে থেকে দেখা যায় না। অথচ তার উপস্থিতি টের পাওয়া যায়। কারণ, তার উপর ভর করেই দাঁড়িয়ে থাকে সমগ্র কাহিনীটি। এটি উপলব্ধি জাত।

পৃথিবীর অসংখ্য লোককথা পর্যালোচনা করে দেখানো যায় যে, লোককথার ভুবনে ব্যক্তিসমাজ ও রাষ্ট্র ইত্যাদির প্রসঙ্গ কিভাবে ঘুরে ফিরে এসেছে কথকদের চিন্তা-চেতনায়। এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যে আলোচনা করলাম, তাতে নিশ্চয় এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, লোককথা কেবলমাত্র গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের বা মানবগোষ্ঠীর অলস অবসর দিনযাপনের দিনলিপি নয়। লোককথা হচ্ছে গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের প্রতিদিনকার জীবনযন্ত্রণা, তার থেকে মুক্তির উপায় এবং সর্বোপরি তাদের সংগ্রামী জীবনের অভিজ্ঞতার অভিজ্ঞান। সেই সঙ্গে রয়েছে সৃষ্টিশীল কল্পনার আশ্রয়ে লালিত বিজ্ঞান মনস্কতার বহিঃপ্রকাশ। বেশিরভাগ পরীকথাতেই বৈজ্ঞানিক মনস্কতার সেই নির্যাস ছড়িয়ে আছে। কথকদের সৃষ্ট গল্প-কাহিনীগুলিতে যে রূপক ও প্রতীকের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়, তা আধুনিক চিন্তাবিদদের ভাবনার ঐশ্বর্য থেকে কোনো অংশে কম নয়। শুধু তাই নয় লোককথার কথকরা সমাজ-সভ্যতার বিবর্তনের প্রত্যেক স্তর পর্বটিকে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন এবং বিবর্তন ধারায় সেই প্রক্রিয়াটিকে খুব সহজ-সাবলীল ভাষায় রূপকের আড়ালে প্রকাশ করতে পারতেন যা তাঁদের সুসংহত চিন্তার বৃত্তটিকে প্রকাশ করে।

নিয়ত সংগ্রামরত গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের অভিজ্ঞতার এক দার্শনিক অভিব্যক্তি এই লোককথা। অভিজ্ঞতা যেহেতু বস্তুকে আশ্রয় করেই আবর্তিত হয়, সেহেতু গল্প-কথকদের চিন্তার সঙ্গে পরিচিত হতে হলে, বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে সেগুলিকে বিশ্লেষিত করতে হবে আমাদের। কেবলমাত্র তবেই কথকদের মূল উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায়টির সঙ্গে পরিচিত এবং সমাজ বিবর্তনের ধারায় তাঁদের ভূমিকাটিকে উপলব্ধি করতে পারব আমরা, যে উপলব্ধি আগামী ভবিষ্যৎকে সঠিক পথে ও সুসংহতভাবে পরিচালিত হতে সাহায্য করবে।

সূত্রপঞ্জী

১। সাহিত্যে ছোটগল্প/নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়/৪র্থ সংস্করণ, ১৩৭৪।
২। আফ্রিকার উপকথা/ড. বরুণ কুমার চক্রবর্তী/নভেম্বর ২০০২।
৩। বিদেশী লোককাহিনী/জগমোহন মুখোপাধ্যায়/এপ্রিল, ১৯৮৭।
৪। Philosophy for Socialists/Maurice Onforth, May, 1960
৫। বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ/অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু/১৯৫৯।
৬। মাসিক বসুমতী।
৭। Culture Religion and Society/Edited: S. K. Chatterjee & Hunter P. Mabry
৮। ট্রাজেডী তত্ত্ব ও নাটক/অধ্যাপক শীতল ঘোষ/১৩৭৯।
৯। ভারতের লোককথা/সঙ্কলন ও সম্পাদনা : এ কে রামানুজম/অনুবাদ ঃ মহাশ্বেতা দেবী/১৯৯৮
১০। তদেব।
১১। তদেব।
১২। Folk tales of Japan/Edited : Keigo Seki/The University of Chicago Press/3rd Edition, 1969.
১৩। Folk tales of Bengal/Rev Lalbihari Dey.
১৪। ibid
১৫। Grimm's Fairy Tales/Edited & Translated by Manindro Dutta.
১৬। Ukrainian Folk tales/Translated by Irina Zheiezova/USSR/1985
উক্ত গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৮১ সালে। গ্রন্থে ৭৮টি গল্প সংকলিত হয়েছে। পরবর্তীকালে ভ্লাদিমির বইকো 'ইউক্রেনের লোককথা' নামে একটি সংকলন প্রকাশ করেন। সেই গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করেন ননী ভৌমিক ১৯৮৮ সালে। তার গল্প সংখ্যা মাত্র ৩৮। দুটি গ্রন্থ থেকেই সাহায্য নিতে হয়েছে।
১৭। Folk tales of Japan/Edited . Keigo Seki
১৮। ভারতের লোককথা/অনুবাদ ঃ মহাশ্বেতা দেবী।
১৯। তদেব।
২০। মাসিক বসুমতী।
২১। মাসিক বসুমতী/বৈশাখ, ১৩৪২।
২২। Fables and Folk tales of Assam/G. K. Ghosh & Sukla Ghosh/1998
২৩। মাসিক বসুমতী/পৌষ, ১৩৪৫।
২৪। আফ্রিকার উপকথা/ড. বরুণ কুমার চক্রবর্তী।
২৫। জাপানি রূপকথা/ড. নির্মলকুমার দাস/Translated from Japanese Fairy Tales/2007
২৬। Folk tales of Japan/Edied : Keigo Seki

২৭। ibid/Page no 64

২৮। ইউরোপের রূপকথা/অনু : নরেশচন্দ্র জানা/১৪০৭।

২৯। এসিয়ার উপকথা/অনু : নরেশচন্দ্র জানা/১৪০৫।

৩০। তদেব।

৩১। Ukrainian Folk-tales/1985

৩২। ইউক্রেনের লোককথা/ভূমিকা : ভ্লাদিমির বইকো/অনু : ননী ভৌমিক।

সহায়ক গ্রন্থ

১। *Marxist thought in India/Debi Chatterjee/Calcutta 1985.*

২। *Culture Religion and Society/Edited . S. K. Chatterjee & Hunter P. Mabry*

৩। *Faith and Science in an Unjust World/Report of the World Council of Churches Conference on "Faith, Science and The Future/Edited · Paul Abrecht/Vol-2/1979.*

৪। *Manifesto of the Communist Party/Karl Marx & Frederick Engles/ Moscow/1975 edition*

৫। *Agrarian India between the world wars/Rostilav Ulyanovsky/1981.*

৬। *Grimm's Fairy tales/Printed in Great Britan/Dean & son Ltd*

৭। *ভারতীয় সমাজ পদ্ধতি/ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত/সংস্করণ ১৯৮৪।*

৮। *সংস্কৃতির প্রগতি/সুধী প্রধান/বৈশাখ ১৩৮৯।*

৯। *লোকায়ত সংস্কৃতি ঃ প্রেক্ষিত ও রূপরেখা/সম্পা ঃ সঞ্জীব সরকার ও অরুণ রায়/১৯৭৮।*

১০। *লোককথা/দিব্যজ্যোতি মজুমদার/১৯৯৮।*

১১। *লোককথার অন্তর্লোক/পল্লব সেনগুপ্ত/২০০০।*

১২। *ফোকলোর চর্চায় রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ/মযহারুল ইসলাম/'লোক লৌকিক' পত্রিকা/সম্পা : তপন চক্রবর্তী/২য় বর্ষ, যুগ্ম সংখ্যা/সম্পাদক মণ্ডলীতে ছিলেন : দিব্যজ্যোতি মজুমদার, সৃজন সেন, উৎপল বসু, দীনেন্দ্র কুমার সরকার, সুজিত সুর।*

উক্ত প্রবন্ধটি যখন প্রকাশিত হয় তখনো পর্যন্ত মযহারুল ইসলামের ওই বিষয়ের উপর গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় নি। ২০৫ পৃষ্ঠার আলোচনাটি ওই পত্রিকাতেই প্রথম প্রকাশিত হয়।

তুলনামূলক লোককথা : একটি সমীক্ষা

সৌমেন দাশ

'ক'

শিল্প-সাহিত্যের সমালোচনায় তুলনামূলক পদ্ধতি বিশিষ্টতম। জনপ্রিয়তার নিরিখেও তুলনামূলকতা অন্য পদ্ধতিব তুলনায় অগ্রবর্তী। এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের, এক যুগের সঙ্গে অন্য যুগের, এমনকি সমকালীন লেখকের সাহিত্যের মধ্যেও তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে সাহিত্যবিচার আজ সর্বজনস্বীকৃত। গোত্র, বিষয় বা সামান্য ধর্মে ঐক্য থাকলেই হল। এক দেশের সাহিত্যের সঙ্গে অন্য দেশের সাহিত্যের, এক যুগের সাহিত্যের সঙ্গে অন্য যুগের সাহিত্যের বা সমকালীন বিভিন্ন সাহিত্যের মধ্যে সামান্যধর্ম আবিষ্কার করা দুরূহ নয়। কারণ মূলত: মানব জীবন নিয়ে সাহিত্য, আর মানবচিত্ত ভূগোল-ইতিহাসের ব্যাপক পার্থক্য সত্ত্বেও মোটামুটি এক। কয়েক হাজার বছর পূর্বে ক্রৌঞ্চদ্বয়ের একের মৃত্যুতে অপরের মনে যে বেদনাবোধ আদিকবির মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল, আজও পরিবর্তিত পট ভূমিতে একই ঘটনায় যে কোনো সহৃদয় ব্যক্তি বেদনা বোধ করবেন। পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে মাতৃক্রোড়ে শিশুকে দেখে যে অনুভূতি জাগে অন্য যে কোনো স্থানে একই অনুভূতি জাগবে। এই সামান্য ধর্মকে পুঁজি করে তুলনামূলক সমালোচকগণ তাঁদের সমালোচনায় ব্রতী।

বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তুলনামূলক পদ্ধতির স্রষ্টা। তাঁর 'উত্তর চরিত', 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব', 'শকুন্তলা, মিরান্দা ও দের্সদিমোনা' ইত্যাদি প্রবন্ধে তুলনামূলক পদ্ধতিব সার্থক ব্যবহার লক্ষ্য করি। নিরপেক্ষতা উদারতা সহৃদয়তা ও সামান্য ধর্ম এই বৈশিষ্ট্যগুলি না থাকলে তুলনামূলক আলোচনা সম্ভব নয়। তুলনামূলক আলোচনার একটি প্রধান গুণ হল এই, নানা দেশের সাহিত্য ও স্রষ্টার অপরিচয়ের কুয়াশা দূর হয়, এক দেশের পাঠক অন্য দেশের ভাষা শিখতেও প্রলুব্ধ হয়।

লিখিত সাহিত্যের মতো লোকসাহিত্যেরও একটি উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি তুলনামূলক। প্রথম বিজ্ঞানসম্মত ভাবে লোকসংস্কৃতির অনুশীলন পদ্ধতির উদ্ভাবন ঘটে জার্মানীতে। জার্মানীর ভাযাতত্ত্ববিদ ও পুরাতত্ত্ববিদ গ্রীম ভ্রাতৃদ্বয় (গ্রীম জ্যাকব লুউ উইস ১৭৮৫-১৮৬৩ এবং গ্রীম উইলহেম কার্ল ১৭৮৬-১৮৫৯) লোকসংস্কৃতির বৈজ্ঞানিক অনুশীলন পদ্ধতির প্রতিষ্ঠাতা রূপে স্বীকৃত। গ্রীমের রূপকথা নামে পরিচিত Kunder and Hansmarchan গ্রন্থের দুটি খণ্ড (১ম-১৮১২ খ্রীঃ, ২য়- ১৮১৫) জার্মান ভাষায় প্রকাশিত হয়। পরে ১৮২২ খ্রীস্টাব্দে গ্রীম ভ্রাতৃদ্বয় জার্মানীতে বিভিন্ন

অঞ্চলে প্রচলিত লোককথা সংগ্রহ করে তুলনামূলক আলোচনা সমৃদ্ধ এক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তাঁরা মূলতঃ লোককথা অবলম্বনে এক ধরনের ক্ষুদ্র জাতীয়তাবোধ দ্বারা চালিত হয়ে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর মূল নির্ণয় ও পুরাকথার ভগ্নাংশ আবিষ্কার করতে বিশেষ যত্নবান হন। কারণ তাঁরা ছিলেন মূলতঃ ভাষাতত্ত্ববিদ ও পুরাতত্ত্ববিদ। তাঁরা বলতে সচেষ্ট হলেন জার্মান ভাষাই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষা এবং ইন্দো ইউরোপীয় ভাষা গোষ্ঠীর মূল হিসাবে জার্মান ভাষাকে স্থান দেওয়া উচিত। এই সঙ্গে তাঁরা আরও বললেন অন্যান্য ভাষায় সংগৃহীত যেসব লোককথার সঙ্গে অভিন্নতা লক্ষ্য করা গেছে, তা আসলে জার্মান ভাষা থেকেই ছড়িয়ে পড়েছিল। লোককথা সম্পর্কিত গ্রীমের এই মতবাদ 'ইন্দো ইউরোপীয় থিয়োরী' বা 'পুরাকথার ভগ্নাংশ' নামে পরিচিত।

এতদিন পর্যন্ত লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রে (প্রধানত লোককথা) গ্রীমের তুলনামূলক গ্রন্থটি বিশেষ প্রভাব ফেলেনি, কিন্তু গ্রন্থটি যেই ইংরাজীতে অনূদিত হল সারা বিশ্বের মানুষ অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখল সেই গল্পগুলির সঙ্গে তাদের দেশে প্রচলিত গল্পগুলির অদ্ভুত মিল আছে। এ সময়েই একজন জার্মান-ভাষার শ্রেষ্ঠত্বের বিরুদ্ধে সোচ্চার হলেন, তিনি ম্যাক্সমূলার, তিনি নানাভাবে সংস্কৃত ভাষার অনন্যতা ও প্রাচীনতা বিষয়ে সরব হলেন। তিনি মত প্রকাশ করেন যে ভারতবর্ষের প্রাচীন ঋষিগণ ঋগবেদের অলঙ্কার বহুল ভাষায় কথা বলতেন এবং এভাবেই ক্রমান্বয়ে লোককথা ও লোকপুরাণের উদ্ভব হয়েছে। গ্রীমের তত্ত্ব প্রথম বিরোধিতার মুখোমুখি হল। ইতিমধ্যে জার্মান দেশীয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ও বহুভাষাবিদ থিয়োডার বেনফে (Theodre Benfey) সংস্কৃত পঞ্চতন্ত্র গ্রন্থটি ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে অসংখ্য টীকা-টীপ্পনিসহ জার্মান ভাষায় অনুবাদ করে ফেলেন। তাতে দেখা যায় পঞ্চতন্ত্রের অধিকংশ গল্পের সঙ্গে ইউরোপে প্রচলিত গল্পের বিশেষ মিল আছে। তিনি জানালেন যে একমাত্র ভারতবর্ষ থেকেই বিশ্বের যাবতীয় লোককথার উদ্ভব। তাঁর মতে তিনটি পথে ভারতের লোককথা সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। সেগুলি হল ক) দশম শতকের পূর্বে মৌখিক ঐতিহ্য বাহিত হয়ে লোককথা ছড়ায়, খ) দশম শতাব্দীর পরবর্তী কালে লিখিত মাধ্যমে ইসলামিক প্রভাবে বিশেষত বাইজানটিয়াম ইতালি ও স্পেনের পথ ধরে এগুলি ছড়িয়ে পড়ে, এবং গ) বৌদ্ধদের মাধ্যমে চিন তিব্বতের পথ ধরে পৃথিবীর নানা স্থানে যায়। বেনফের এই ভারতীয় উদ্ভবতত্ত্ব ও পশ্চিমে অভিযাত্রার তত্ত্বকে বিশেষভাবে সমর্থন করেন রাইন হোলড কোহলার ও ইয়ানুয়েন বাসক্যুম।

অতি স্বাভাবিক কারণেই গ্রীমের মতবাদ এবং বেনফের ভারতীয় উৎসতত্ত্ব বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হল। এখন নৃতত্ত্বের আলোকে লোককাহিনী- পুরাকাহিনী বিশ্লেষণ করে নৃতাত্ত্বিকগণ এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন। ই. বি. টাইলার সাহেবের 'প্রিমিটিভ রিলিজিয়ন এণ্ড কালচার', ফ্রেজারের 'গোল্ডেন বাও' প্রভৃতি গ্রন্থ আদিম মানুষের বিশ্বাস ও ধর্মের উপর নতুনভাবে আলোকপাত করে। তাঁরা লক্ষ্য

করেন ভারতের সঙ্গে কোনরূপ যোগাযোগ নেই এমন বহু দেশের মধ্যে প্রচলিত গল্পে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা গেল। এটা কিভাবে সম্ভব হল? আসলে ইন্দো ইউরোপীয় তত্ত্ব বা ভারতীয় উৎস তত্ত্ব নয়, এর পিছনে মূল কারণ হল লোকমানসে এমন কতকগুলি মৌলিক প্রবণতা আছে যা সহজে দেশ কালের সীমা অতিক্রম করে যায়। লোকসংস্কৃতির মধ্যে এমন কতকগুলি মৌলিক ঘটনা, অভিপ্রায় বা বিষয় ব্যক্ত হয় যা মানবাত্মার চিরন্তন বাণী জীবনসত্যকে প্রকাশ করে। এ ছাড়া সব মানবগোষ্ঠী বিবর্তনের স্বাভাবিক নিয়মানুসারে একই ভাবে বিবর্তিত হয়েছে, ফলে সমস্ত দেশের লোককথার মধ্যে লক্ষ্য করা গেছে সাদৃশ্য। নৃতত্ত্ববিদ অ্যাণ্ড্রু ল্যাং যুক্তি তর্ক দিয়ে প্রমাণ করলেন যে আসলে এসব লোকসাহিত্য লোকপুরাণ প্রভৃতি প্রাচীন সমাজেরই বিশ্বাস ও রীতি-নীতির ধারা। তবু ল্যাং বেফের মতকে একেবারে নাকচ করে দেননি। তার সত্যতা মেলে একালের একজন উল্লেখযোগ্য লোকবিজ্ঞানীর কণ্ঠেও—'The presence of these parallels with European tales in most part of India and of still other parallels in the old literary collections crused a whole generation of older scholars to conclude that India is the great homeland of most of the European folk stories.'

যাইহোক গ্রীমের থিয়োরী ও বেনফের ভারতীয় উৎসতত্ত্ব সমকালে প্রভূত আলোড়ন জাগায় এবং লোকসংস্কৃতির আলোচনায় একাধিক পদ্ধতির জন্ম দেয়। লোককথা তুলনামূলক আলোচনার ক্ষেত্রে আরো অগ্রসর হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে পিতা জুলিয়াস ক্রোর্ণ (১৮৩৫-১৮৮) ও পুত্র কার্ল ক্রোর্ন (১৮৬৩-১৯৩৩) তুলনামূলক পাঠের একটি পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করেন যা ঐতিহাসিক— ভৌগোলিক পদ্ধতি (Historical-Geographical method) নামে পরিচিত। এই মতানুসারে লোককাহিনী সময় এবং স্থানের ভাষা ও সংস্কৃতির বাধা অনায়াসে অতিক্রম করে। ফলে প্রচুর পাঠান্তর লক্ষ্য করা যায়। পাঠগুলি সংগ্রহ করে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার বিশ্লেষণ করে তার মাধ্যমে উৎসের নিকটে পৌছানো যায়। এই মতগোষ্ঠীর মতে পরিভ্রমণের কালে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটলেও প্রাচীনতম মৌল পাঠ Urtype, archetype, oikotype নির্ধারণ সম্ভব। কারণ কাহিনীর মৌলিক আভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য ও নিজস্বতা একেবারে হারিয়ে যায় না।

ঐতিহাসিক ভৌগোলিক পদ্ধতির ত্রুটিগুলি সহজেই আমাদের চোখে পড়ে। প্রথমতঃ নৃতত্ত্ববিদদের Polygenesis theory কে অস্বীকার করে। এই theory হল অনুরূপ পরিবেশে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে অনুরূপ লোকসাহিত্যের সৃষ্টি হয়। কিন্তু ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক পদ্ধতির উদ্‌গাতাগণ এই মতকে অস্বীকার করেন, তাঁরা সকল দেশে প্রচলিত একই ধরনের লোককথার একটি মূল আবিষ্কারে যত্নবান হন। তাঁরা দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করেন একদেশ থেকে অন্যদেশে কাহিনীর পরিভ্রমণের ফলে ভিন্ন ভিন্ন দেশের কাহিনীগত সাদৃশ্য গড়ে উঠেছে। বলা বাহুল্য অনেক সময়ই তা সত্য

নয়। দ্বিতীয়ত বোডকারের মতে এই পদ্ধতির মাধ্যমে একটি কাহিনীর পাঠ পর্যালোচনায় যে পরিমাণ পরিশ্রম, চিন্তাভাবনা ও কঠিন সাধনার প্রয়োজন, সে তুলনায় ফল অতি সামান্য, এমনকি গবেষক যে নিশ্চিন্তে সিদ্ধান্তে আসবেন তারও নিশ্চয়তা নেই। বিশ্বে বিভিন্ন ভাষায় যেভাবে কাহিনী ছড়িয়ে আছে, তাতে একজন গবেষকের পক্ষে মূল নির্ণয় করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা যায় Type 480, "Kind and Unkind girls" নামক কাহিনীটি নিয়ে ওয়ারেন ই রবার্টস ৯০০'র অধিক পাঠান্তর নিয়ে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা প্রসঙ্গে মূল নির্ণয়ে সচেষ্ট হন। মজার বিষয়, গ্রন্থের সমালোচক জেমস এবং ওয়াল্টার আণ্ডারসন গবেষকের আলোচনায় বহু প্রচলিত পাঠান্তর স্থান না পাওয়ায় আলোচনা অসম্পূর্ণ বলেছিলেন। তবে এই পদ্ধতির প্রয়োগে একেবারেই যে সফলতা আসেনি তা বলা যাবে না।

তৃতীয়ত : সি. ডবলু. ভনসিডো ও অ্যালবার্ট' ওয়েসেলেসলি ঐতিহাসিক ভৌগোলিক পদ্ধতির তীব্র সমালোচনা করেছেন, তাঁদের মতে এই পদ্ধতির গাণিতিক যান্ত্রিকতা লোকসংস্কৃতির ঐতিহ্য, শিল্প-নন্দনতত্ত্বগত বৈশিষ্ট্য ও দার্শনিক ভিত্তিকে উপেক্ষা করে, তবুও এ প্রসঙ্গে বলা যায় এই পদ্ধতির প্রয়োগে "লোকসংস্কৃতি" বিজ্ঞানের একটি শাখায় পরিণত হয়েছে। পরিসংখ্যান ও গাণিতিক পথে লোকসংস্কৃতি যেমন শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়েছে তেমনি লোকসংস্কৃতির অনুশীলনে টাইপ ও মোটিফ সূচী ব্যবহারের কার্যকারিতা বিশেষভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে।

তুলনামূলকতার মাধ্যমে যে ঐতিহাসিক ভৌগোলিক পদ্ধতিতে লোকসাহিত্য বিচার তা বিশেষভাবে ত্রুটিপূর্ণ। তুলনার সাহায্যে যদি শিষ্ট সাহিত্যের মতোই লোকসাহিত্যের বিচার করা যায় তা অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য। এমনকি ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক পদ্ধতির যে ত্রুটি তাও দূর করা সম্ভব। শিষ্ট সাহিত্যের সমালোচনায় তুলনামূলক আলোচনা প্রসঙ্গে দেখি বিশেষ মিল না থাকলেও সামান্য ধর্মে মিল থাকলেই তুলনামূলক আলোচনা করা সম্ভব। আর যেহেতু আমরা লক্ষ্য করেছি ইন্দো ইউরোপীয় তত্ত্ব বা বেনফের ভারতীয় উৎসতত্ত্ব কিংবা নৃ বিজ্ঞানীদের Polygenesis theory যাই হোক না কেন সামান্য ধর্মে মিল অবিষ্কার করা কোনো সময়েই দুরূহ নয়। ঐতিহাসিক ভৌগোলিক পদ্ধতিতে দ্বিতীয় যে ত্রুটিটা ছিলো তা হলো মূল পাঠ নির্ধারণ যে সম্ভব তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। লোকসংস্কৃতি আলোচনায় বিভিন্ন মতবাদ থাকলেও তা মূলতঃ একের সঙ্গে অন্যটির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সম্পৃক্ত। একমাত্র লোকসাহিত্যের আঙ্গিকগত, নন্দনতত্ত্বগত, দর্শনতত্ত্বগত— যা কিনা ঐতিহাসিক ভৌগোলিক পদ্ধতিতে উপেক্ষিত হত বলে সমালোচকগণ বিরক্তি প্রকাশ করেছেন— তাও আলোচনা করে পূর্বোক্ত প্রক্রিয়ার নীরস কাঠামোয় রস সঞ্চার করা যায়। সাত ভাই ও বোন সম্পর্কিত চারটি লোককথার তুলনামূলক আলোচনায় আমরা দেখব আমাদের জাতীয় সংহতির দৃঢ়তা।

বাংলা- সাত ভাই চম্পা

এক রাজার সাত রানি। ছোট রানির ছেলে হবে। অন্য রানিরা হিংসায় মরে। সাত পুত্র ও এককন্যা হয়। অন্য রানিরী হাঁড়ি সরাতে পুরে ছাই গাদাতে পুঁতে ফেলে। রাজাকে বলে ইঁদুর-কাঁকড়া জন্মেছে। রাজা ছোট রানিকে নির্বাসন দেয়। সে এখন ঘুঁটে কুড়ানী দাসী। সেই ছাই গাদায় সাত ভাই চম্পা ও বোন পারুল হয়ে জন্মেছে। মালী ফুল তুলতে গেলে ফুলেরা রাজাকে আসতে বলে। ক্রমে আসে অন্য সব রানি, শেষে বলে যদি আসে ঘুঁটে কুড়ানী দাসী তবে দেব ফুল। রানি এলে মা-মা বলে কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। রাজা সব বুঝতে পেরে বড় ছয় রানিকে কাঁটার উপরে কাঁটা দিয়ে পুঁতে ফেলতে আদেশ দেন। ছোট রানি, সাতপুত্র ও কন্যাকে নিয়ে রাজপুরীতে এলে জয়ডঙ্কা বেজে ওঠে। (দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার : ঠাকুমার ঝুলি, সাত ভাই চম্পা)

হিন্দী— একটি পারুল বোন

রাজার সাতপুত্র— এক কন্যা। ভায়েদের চোখের মণি বোন। সাত ভায়ের সাত বৌ বাড়িতে আসে। সবাই রাজকন্যাকে ভালবাসে দেখে ছোট বৌ হিংসায় মরে। রাজকন্যারও বিয়ে হয়ে যায়, কিন্তু রাজা এক বছর বাড়িতে রাখলেন। 'তীজ' উৎসবে রাজকন্যা ছোটরানির শাড়ি পরতে চাইলেন। ছোটরানি বললেন নোংরা করলে রক্তে রাঙিয়ে তিনি শাড়ি পরবেন। ছোট রানি একটা কাককে দিয়ে শাড়িটা নোংরা করে দিলেন। ছোট রাজপুত্র বৌ-এর বাসনা পূর্ণ করতে রাজকন্যার শিরশ্ছেদ করলেন। এক বছর পর রাজকন্যার শ্বশুর নাপিতকে পাঠালেন বৌমা আনতে। নাপিত বনে আমগাছের দেখা পেল। সে আমগাছ তাকে জানায় ভাই মেরেছে বোনকে, ফিরে যাও। রাজা এলে, শেষে রাজকন্যার স্বামী রাজপুত্র এল। এখন আমগাছ থেকে নেমে এল রাজকন্যা। রাজা নব বধূকে আদরে প্রাসাদে নিয়ে গেলেন। ছোট বৌ রানি সব দেখে হিংসায় জ্বলতে লাগলেন। (মীরা পাকড়াশী : বিহারের লোককথা)

সাঁওতালী -- সাত ভাই এক বোন

রাজার সাতপুত্র এক কন্যা। রাজা রানি মারা গেলে ভায়েরা বিয়ে করেও বোনকে আদরে রাখে। ভায়েরা বাণিজ্যে গেলে সাত বৌদি ননদকে অত্যাচার করে। ছেঁদা কলসী করে জল এনে চৌবাচ্ছা ভর্তি করতে বলে। বারবার ব্যর্থ হলে তার কান্না শুনে ব্যাঙের সাহায্যে জল আনে। জঙ্গল থেকে পাতা আনতে বলে না বেঁধে, ময়াল সাপ দড়ির কাজ করে। বনে গাছের উপর তুলে নীচে কাঁটা দিয়ে দেয়। না খেতে পেয়ে মৃতপ্রায় হয়ে যায়, একসময় বাকশক্তিও হারিয়ে যায়। দাদারা বাণিজ্য থেকে ফেরে এই পথেই, গাছের নীচে বিশ্রাম নিলে বোনের একফোঁটা চোখের জল পড়ে বড় ভাইয়ের

গায়ে। বোনকে লুকিয়ে নিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করে বৌদের কথা: স্ত্রীরা মুখ চাওয়া চাওয়ি করে। সাত ভাই সাতটা কুয়ো কেটে ফেলে দেয় বৌদের। যখন প্রায় মরতে বসে তখন তুলে নিয়ে আসে, আর কোনদিন বৌরা ননদের প্রতি খারাপ ব্যবহার করে না। (নন্দলাল ভট্টাচার্য : সাঁওতালী লোককথা)

ওড়িয়া— সাত ভাই ও কাঞ্চন

রাজার সাত পুত্র ও এক কন্যা কাঞ্চন। রাজা রানি মারা গেলে সাতপুত্র ও কন্যার বিয়ে হয়। সাতপুত্র একবার বাণিজ্য থেকে দেশে ফিরলে উৎসবের আয়োজন হয়। বোন কাঞ্চন শাক কোটে, আঙুল কেটে একটু রক্ত শাকে লেগে যায়। ভায়েদের কাছে সেজন্য খুব সুস্বাদু লাগে। তারা ভাবে কাঞ্চনের মাংস নিশ্চয়ই আরও সুস্বাদু। একদিন বনে গিয়ে তারা বোনকে সাতটুকরো করে ফেলে। ছোট ভাই নিজের ভাগ না খেয়ে মাটিতে পুঁতে রাখে। সেখান থেকে কাঞ্চন বৃক্ষ হয়। কাঞ্চনের শ্বশুর ও পরে স্বামী একদিন সে পথ দিয়ে নিতে এলে বৃক্ষ করুণ সুরে বলে— 'পাপি আ ভাইরে মহাপাপ কলু/ রাবণের কাণ্ড আনি বুকুরে বিন্ধিল/ কে তোলই কে তোলই বনমল্লী ফুল/ তোল তোল স্বামীন ভাঙ্গি, ন ভাঙ্গি ডাল'। ছোট ভাই সবকিছু বলে দিলে ভায়েদের ছেড়ে কাঞ্চন চিরদিনের জন্য শ্বশুরবাড়ি চলে যায়।(নিজস্ব সংগ্রহ, ভদ্রক)

চারটি গল্পেরই টাইপ এক তা হল সাত ভাই এক বোন (৭০৭ই)। এক্ষেত্রে টাইপটিকে সামান্যধর্মে বিশেষ মিল দেখিয়ে তুলনামূলক আলোচনা করা যায়। বাংলার 'সাত ভাই চম্পা' গল্পটিতে যে মটিফগুলি আছে, তা--

১। ডি ২১২ : রূপ পরিবর্তন, মানুষ থেকে ফুল
২। ডি ৯৭৫ যাদু ফুল
৩। ডি ১৬১০.৪ কথা বলা ফুল
৪। এইচ ৩১.১২ কেবল মাতা ফুল তুলতে পারবে
৫। জে ১১৯.৫ মানুষের পেটে ইঁদুর, কাঁকড়া হয় কখনো?
৬। কে ২১১৫ পশুকে জন্ম দেবার জন্য অপবাদ
৭। কে ২২২২ বিশ্বাসঘাতিনী সতীন
৮। জেড ৭১.৫.১: সংকেত সংখ্যায় সাত ভাই এক বোন।

হিন্দি 'একটি পারুল বোন' লোককথার মটিফ—

১। ডি ২১৫ রূপ পরিবর্তন : মানুষ থেকে গাছ
২। পি ২৫৩.১০ বোনের প্রতি ভায়েদের অপার ভালবাসা
৩। কে ২২১১.০.২ বিশ্বাসঘাতক ছোটভাই
৪। ডি ১৬১০.২ কথাবলা গাছ
৫। জেড ৭১.৫.১ সাত ভাই এক বোন

৬। ই ০ পুনর্জীবন

সাঁওতালী 'সাত ভাই এক বোন' লোককথার মটিফ—

১। পি ২৫৩.১০ বোনের প্রতি ভায়েদের অপার ভালবাসা

২। বি ২১০ কথাবলা পশু।

৩। বি ৪১৯.১ উপকারী সাপ

৪। এইচ ১০১০ অসম্ভব কাজ

৫। এল ৪৫১ পুনর্মিলন।

৬। এ ৪৬৫ শাস্তি-কুয়োয় ফেলে দেওয়া।

৭। জেড ৭১.৫.১ সংকেত সংখ্যা সাত ভাই এক বোন।

ওড়িয়া— সাত ভাই ও কাঞ্চন' লোককথার মটিফ—

১। ডি ২১৫ মানুষ থেকে গাছ

২। ডি ১৬১০.২ কথা বলা গাছ

৩। এল ৪৫১ পুনর্মিলন

৪। কে ২২১১ বিশ্বাসঘাতক ভায়েরা

৫। জেড ৭১.৫.১ সংকেত সংখ্যা সাত ভাই এক বোন

চারটি লোককাহিনীর মটিফ বিচারে দেখা যায় তাদের মধ্যে যেমন সাদৃশ্য আছে তেমন কিছু পার্থক্যও আছে। চারটি গল্পের মধ্যে তিনটিতে, বাংলা, ওড়িয়া ও হিন্দীতে বোনের মৃত্যু হয়েছে কিন্তু সাঁওতালী লোককথায় বোন মৃতবৎ হয়ে গেছে। বাংলায় সাত ভাই চম্পায় শুধু বোন পারুল নয়, তার সাত ভাইও যড়যন্ত্রের শিকার হয়। কিন্তু অপর তিনটি লোককথাতেই কেবল বোনের উপরই বিপাক নেমে আসে এবং সেই বিপাকের কারণ ত্রিবিধ। হিন্দিতে ছোটরানির কথায় বোনকে হত্যা করে ছোট ভাই। সাঁওতালীতে বোন মৃতবৎ হয় বৌদিদের অকারণ অত্যাচার ও লাঞ্ছনায় এবং ওড়িয়া লোককথায় বোনের মাংসের আহারের উদ্দেশ্যে ছয় বড়দাদা তাকে হত্যা করে। হিন্দি লোককথায় যেখানে ছোটভাই বোনকে হত্যা করে, সেখানে ওড়িয়া লোককথায় একমাত্র ছোটভাই-ই হত্যার বিরুদ্ধে দাঁড়ায় ও বোনের মাংস ভক্ষণ করে না। রূপকথার নায়ক যে সাধারণত ছোটপুত্র হয় তা ওড়িয়া রূপকথাতেও বর্তমান, অন্যদিকে হিন্দীতে স্বয়ং ছোটপুত্রই খলতার আশ্রয় নেয়।

সাতভাই চম্পায়— নবজাতকদের ছাই গাদায় পোঁতা যেন চাঁপা ফুলের বীজ, যা থেকে চাঁপা ফুলের গাছ ও ফুল জন্মেছে, প্রায় একই মানসিকতা কাজ করেছে সাতভাই ও কাঞ্চন গল্পটিতেও। সেখানে বোনের পুঁতে রাখা মাংস থেকেই কাঞ্চন গাছ জন্মেছে। বাংলা, হিন্দী, ওড়িয়া এই তিন লোক কথাতেই চম্পক বৃক্ষরা ছড়া আকারে কথা

বলেছে, যার মধ্যে আদিম মানুষের বিশ্বাস প্রতিফলিত এবং সর্বক্ষেত্রেই নিজেদের পরিচয় দেবার সময় একের পর এক চরিত্রকে আসতে বলা হয়েছে। শেষে সবচেয়ে আপনজন এলে তবেই পরিচয় দিয়েছে। সাঁওতালীতে বোনের মৃত্যু না হওয়া এবং অন্য কিছুতে রূপান্তরিত না হওয়ায় ভায়েরাই তার এরূপ হবার কারণ জেনেছে। লক্ষণীয় বাংলা, হিন্দী ও ওড়িয়া তিনটি লোককথাতেই কথা বলা বৃক্ষ বা ফুল প্রথম কথা বলেছে সামান্য জনের কাছে, বাংলায় মালি, হিন্দীতে নাপিত, ওড়িয়ায় তুলনামূলক ভাবে বিশেষ ব্যক্তি শ্বশুরের সঙ্গে। তুলামূলক বিচারে বাংলা, হিন্দী ও ওড়িয়া লোককথার মধ্যে যে বিশেষ স্বাধর্ম তা অনেকটাই অনুপস্থিত সাঁওতালীতে, ফুটো কলসীর সাহায্যে জল আনা, বাঁধা ছাড়া প্রচুর পাতা ও কাঠ আনার মতো অসম্ভব কাজ তাকে করতে বলা হয়েছে এবং এসব ক্ষেত্রে তাকে আনুকূল্য করেছে ব্যাঙ, সাপ ইত্যাদি। গোত্র বিচারে বাংলা হিন্দী ও ওড়িয়ার লোককথাটি যেখানে পরিপূর্ণ রূপকথার পর্যায়ভুক্ত, তুলনামূলকভাবে সাঁওতালী লোককথাটিতে রূপকথার সঙ্গে কিছু পশুকথাও এসে গেছে। লোককথার ক্ষেত্রে যা অতি স্বাভাবিক ঘটনা।

চারটি লোককাহিনীর উপসংহারে অর্থাৎ শাস্তি প্রসঙ্গে বড় পার্থক্য ঘটে গেছে। রূপকথায় সাধারণত সব সমস্যার সমাধান করেই কাহিনী শেষ হয় এবং খল ব্যক্তি শাস্তি পায়। সমাধান ব্যাপারে ঠিক আছে কিন্তু শাস্তি প্রসঙ্গে ভিন্ন পদ্ধতি দেখা গেছে। বাংলা 'সাত ভাই চম্পা' গল্পে চরমতম শাস্তি স্বরূপ ছয় রানির মৃত্যুর কথা বলা আছে। কাঁটার উপর কাঁটা দিয়ে তাদের পুঁতে ফেলা হয়। সাঁওতালী লোককথা 'সাত ভাই এক বোন' এ সাত ভায়ের স্ত্রীদের কুয়ো খুঁড়ে ঠেলে ফেলার কথা বলা আছে, অবশ্য মৃত্যু নেই; বোনকে যেমন মৃতবৎ ক[illegible]েছিল, স্ত্রীদেরও ভায়েরা মৃতবৎ করে তুলে আনে। বলা যায় বাংলায় সাত ভাই চম্পায় মৃত্যুর পরিবর্তে মৃত্যুর কথা আছে। সাঁওতালীতে এর পরিবর্তে মৃতবৎ। কিন্তু হিন্দী বা ওড়িয়াতে একটি পারুল বোন বা কাঞ্চন এ প্রায় কোন শাস্তির কথা বলা হয় নি, যা রূপকথার বিশেষ ব্যতিক্রম। একটি পারুল বোন-এ ছোট বৌ-এর সারা জীবন হিংসায় জ্বলা ও সাতভাই ও কাঞ্চন এ ভায়েদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা শুধু বলা হয়েছে, যা রূপকথার মূল শাস্তি অপেক্ষা একেপারেই ন্যূনতম।

গঠনগত দিক থেকে আলোচনায় বলা যায় ভলাদিমির জে প্রপ রূপকথার ৩১টি ক্রিয়াশীলতা আবিষ্কার করেছিলেন, সেগুলি হল—

১। প্রাথমিক অবস্থার পরে লোককথায় দেখা যাবে সেই পরিবারের কোনো একজন্ (সাধারণত নায়ক বাড়ি থেকে দূরের পথে রওনা হয়। গৃহত্যাগী মানুষটি সাধারণত বড় ভাই কিংবা ছোট ভাই হয়।)

২। সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়। নায়কের ক্ষতি হতে পারে এমন কথা বলা হয়।

৩। নায়ক সতর্কবাণী লঙ্ঘন করে।

৪। খলনায়ক নায়কের বিরুদ্ধে কাজ করে। প্রাথমিক পরীক্ষা শুরু করে।

৫। খলনায়ক নায়কের বিরুদ্ধে কাজ করার জন্য নায়ক সম্পর্কে নানা তথ্য সংগ্রহ করে।

৬। খলনায়ক প্রতারণার আশ্রয় নেয়। সে নানা ধরনের ফাঁদ পাতে।

৭। নায়ক নিজের অগোচরে নিয়তির বিধানে খলনায়কের ছলনার শিকারে পরিণত হতে বাধ্য হয়। এই অবস্থায় খলনায়কই জয়ী হয়।

৮। খলনায়ক ক্ষতি সাধন করে। এই ক্রিয়াশীলতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কেননা এই অবস্থা থেকেই কাহিনী নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে।

৯। নায়ককে প্রথমে অনুরোধ ও পরে আদেশ করা হয়। এ হল সংযোগকারী ক্রিয়াশীলতা।

১০। প্রতিরোধ অথবা প্রতিশোধমূলক কাজে অগ্রসর হয়। নায়ক এ বিষয়ে একমত হয় ও সিদ্ধান্ত নেয়।

১১। নায়ক তার লক্ষ্য বস্তুর সন্ধানে নতুন পথে যাত্রা করে।

১২। বাধার সম্মুখীন হয় নায়ক, তাকে পরীক্ষা দিতে হয়, নানাবিধ প্রশ্নের জবাব দিতে হয়।

১৩। নায়কের প্রতিক্রিয়া হয় ও সেইমতো কাজ করে।

১৪। নায়ক যাদুর দ্রব্য লাভ করে ও তা প্রয়োগ করে।

১৫। নায়ককে অন্য কোন জায়গায় পাঠানো হয়।

১৬। নায়ক ও খলনায়ক সংঘাতে লিপ্ত হয়।

১৭। নায়কের শরীরে চিহ্ন করে দেওয়া হয়।

১৮। নায়কের বিজয় ও খলনায়কের পরাভব ঘটে।

১৯। নায়কেব জীবনের প্রাথমিক দুর্ভোগ অপসারিত হয়।

২০। নায়ক ফিরে আসে।

২১। নায়ককে অনুসরণ করা হয়।

২২। খলনায়কের দুষ্ট প্রভাব কিংবা অনুসরণ থেকে নায়ককে উদ্ধার করা হয়।

২৩। নায়কের অপরিচিত অবস্থায় আগমন।

২৪। নায়কের দাবি অগ্রাহ্য করা হয়, নকল-নায়ক আসল নায়কের পরিবর্তে দাবি আদায়ে অগ্রসর হয়।

২৫। নায়ককে কঠিন সব কাজ সমাধা করতে বলা হয়।

২৬। নায়ক সমস্ত কাজই সমাধা করে।

২৭। নায়কের আসল পরিচয় জানা যায়।

২৮। নকল-নায়কের আসল পরিচয় জানা যায়।

২৯। নায়কের আকৃতির পরিবর্তন ঘটে।

৩০। খলনায়ককে শাস্তি দেওয়া হয়।

৩১। নায়ক শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়, বিবাহ করে, ধনসম্পত্তি লাভ করে, সুখে-শান্তিতে বাস করতে থাকে।

উল্লিখিত ক্রিয়াশীলতার মধ্যে বাংলা সাত ভাই চম্পায় যে ক্রিয়াশীলতাগুলি উপস্থিত তা হল—

১। প্রাথমিক পরিচয় (রাজা, সাত রানি)

৪। খলনায়কের নায়কের বিরুদ্ধে কাজ (ছোটরানি সন্তানবতী হওয়ায় ঈর্ষা)

৬। খলনায়ক প্রতারণার আশ্রয় নেয়।

৭। প্রাথমিক অবস্থায় খলনায়ক জয়ী (সন্তান হত্যা করা ও রাজাকে দিয়ে ছোটরানীকে তাড়ানো)

৮। খলনায়ক ক্ষতি সাধন করে

২৭। নায়কের আসল পরিচয় জানা যায়

২৮। খলনায়কের পরিচয় জানা যায়

২৯। নায়কেব আকৃতির পরিবর্তন ঘটে

৩০। খলনায়ককে শাস্তি দেওয়া হয়

৩১। নায়ক শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়ে শান্তিতে বাস করে

হিন্দি একটি পারুল বোন এ যে ক্রিয়াশীলতাগুলি উপস্থিত তা হল—

১। প্রাথমিক পরিচয়

৪। খলনায়কের নায়কের বিরুদ্ধে কাজ

৬। খলনায়ক প্রতারণার আশ্রয় নেয়।

৭। প্রাথমিক অবস্থায় খলনায়ক জয়ী

৮। খলনায়ক ক্ষতি-সাধন করে।

২৭। নায়কের আসল পরিচয় জানা যায়

২৮। খলনায়কের পরিচয় জানা যায়

২৯। নায়কের আকৃতির পরিবর্তন ঘটে

৩০। খলনায়ককে শাস্তি দেওয়া হয়

৩১। নায়ক শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়ে শান্তিতে বাস করে।

সাঁওতালী সাত ভাই ও এক বোনে এই ক্রিয়াশীলতাগুলি উপস্থিত—

১। প্রাথমিক পরিচয়

৪। খলনায়কের নায়কের বিরুদ্ধে কাজ

৬। খলনায়ক প্রতারণার আশ্রয় নেয়।

৭। প্রাথমিক অবস্থায় খলনায়ক জয়ী

৮। খলনায়ক ক্ষতি সাধন করে

২৭। নায়কের আসল পরিচয় জানা যায়

২৮। খলনায়কের পরিচয় জানা যায়

২৯। নায়কের আকৃতির পরিবর্তন ঘটে

৩০। খলনায়ককে শাস্তি দেওয়া হয়।

৩১। নায়ক শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়ে শান্তিতে বাস করে।

ওড়িয়া সাত ভাই ও কাঞ্চন এ যে ক্রিয়াশীলতাগুলি উপস্থিত তা হল—

১। প্রাথমিক পরিচয়

৭। নায়ক নিজের অগোচরে নিয়তির বিধানে খলনায়কদের ছলনার শিকারে পরিণত হতে বাধ্য হয়, এই অবস্থায় খলনায়ক জয়ী

৮। খলনায়ক ক্ষতি সাধন করে

১৯। নায়কের জীবনে প্রাথমিক দুর্ভোগ অপসারিত হয়

২৭। নায়কের আসল পরিচয় জানা যায়

২৮। খলনায়কদের পরিচয় জানা যায়

৩১। শেষ পর্যন্ত সুখে শান্তিতে বাস করে

আঙ্গিকগত তুলনামূলক আলোচনায় সাঁওতালী লোককথায় সর্বাধিক ক্রিয়াশীলতা বর্তমান ১১টি, বাংলায় ১০টি, হিন্দিতে ৯টি, সবচেয়ে কম ওড়িয়ায় ৭টি।

চারটি কথার মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় নিতে গেলে আঙ্গিকের দিকে লক্ষ্য দিতে হয়। টিপিক্যাল লোক কথা যে ভাবে শুরু সাত ভাই চম্পার শুরু ঠিক সেইভাবে। রাজার কোন অভাব না থাকা সত্ত্বেও সন্তানহীন, এরপর ছোটরানির গর্ভবতী হওয়া, কিন্তু একটি পারুল বোন, সাত ভাই একবোন, সাত ভাই ও কাঞ্চনের শুরু ঠিক এইভাবে নয়। রূপকথায় রাজার নাম পাওয়া যায় না, কিন্তু রাজকন্যা ও রাজপুত্রের নাম পাওয়া যায়। বাংলা ও হিন্দী রূপকথায় রাজকন্যার নাম পারুল। আর ওড়িয়াতে কাঞ্চন, বর্ণগত ও মাধুর্যগত কুসুমের যে নাম সাদৃশ্য তা সহজেই চোখে পড়ে, সাঁওতালীতে কোন নামোল্লেখ নেই। হিন্দীতে বিহারের একটি বিশেষ উৎসব 'তীজের' কথা বলায় তা আঞ্চলিকতার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে লোকসাহিত্যের সার্বভৌমকতাকে ক্ষুণ্ণ করে। চারটি গল্পেই কৌতূহল বজায় থাকে। তবে এক্ষেত্রে হিন্দীতে কিছুটা কম। হিন্দীতে এবং ওড়িয়াতে রাজকন্যাকে হত্যা করলেও খলের কোন শাস্তি না হওয়াতে এ কাহিনী শুনে পরিপূর্ণ তৃপ্তি আসে না। মনে হয় কাহিনী যেন অসম্পূর্ণ। সাঁওতালীতে গল্পের গঠনভঙ্গী বড় বেশি দৃঢ় হয়ে লোক উপভোগ্যের প্রতিবন্ধক হয়েছে। বাংলা লোককথাটি এ সব দোষ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত, তাই তুলনামূলক বিচারে একেই শ্রেষ্ঠ বলতে হয়।

উৎস ও প্রভাবগত দিক থেকে বলা যায় বাংলা, ওড়িয়া, হিন্দী লোককথায়, যে মৃত্যু রহস্য উন্মোচনের কথা আছে, তার উৎস সম্ভবত এক। কি সেই উৎস তা নির্ণয় করা অসম্ভব। আদিম মানুষ যে সর্বপ্রাণবাদ ও সর্বাত্মবাদের কথা ভেবেছে, বৃক্ষকে দেবতা জ্ঞান করেছে তার প্রভাবেই সম্ভবতঃ 'কথা বলা গাছ' এসেছে। আদিম মানুষ হয়তো ভেবেছে বৃক্ষ সবই জানতে পারে। কোন কোন লোককথায় বৃক্ষকে সর্বজ্ঞানী করে দেখানোও হয়েছে, সেই ধারণারই প্রতিফলিত গল্প তিনটিতে। তবে এখানে কোন গল্পের উপর অপর কোন গল্পের প্রভাব আছে কিনা নিশ্চিত করে বলা কঠিন। তবে পশ্চিমবঙ্গে মেদিনীপুরে প্রাপ্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য সংগৃহীত 'কাঞ্চন' গল্পটি ওড়িয়ায় প্রাপ্ত 'সাত ভাই ও কাঞ্চন' গল্পের প্রভাব জাত। শুধু ভাবের দিক থেকে নয়, ভাষাতেও আছে ওড়িয়া প্রভাব—

যাউচি যাউচি, দিদি, তিরিকার

ডাহন, দিগদি, দিদি থাউ পরারি

কিংবা

মাগো মা, ফুলটাকে নিয় গো গভাবে (ঘরে) গেঞ্জিব।

পত্র না বিনাশ করিব। মুই তোমার ঝিঅ

বাংলা ভাষাতত্ত্ব বিচারে দেখা যায় আদি মধ্য বাংলা পর্যন্ত পাশাপাশি দুটি স্বরধ্বনি অবস্থান করতে পারে কিন্তু অন্ত্যমধ্য বাংলা থেকেই এই প্রবণতা লোপ পেয়েছে। অন্যদিকে ওড়িয়া ভাষায় পাশাপাশি দুটি স্বরধ্বনির অবস্থান আজও লক্ষণীয়। তাই এখানে যাউচি, যাউচি শব্দের প্রয়োগ। 'দুহিতা' শব্দ থেকে বাংলায় এসেছে 'ঝি'। দুহিতা >ধিতা > ধিআ > ঝি। বাংলায় উদ্বৃত্ত স্বরের লোপ ঘটিয়ে যেখানে 'ঝি' হয়েছে, সেখানে ওড়িয়া ভাষার রক্ষণশীলতার জন্য 'ঝি অ' শব্দ থেকে গেছে। তাই মেদিনীপুরে বাংলায় এ লোককথাটি পাওয়া গেলেও তা প্রান্তবর্তী রাজ্যের ভাষা ওড়িয়া থেকেই এসেছে বোঝা যায়।

বাংলা রূপকথা : রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পদ্ধতির আলোয়

সনৎকুমার নস্কর

রূপকথা লোকসমাজের চিরায়ত সৃষ্টি। গল্পের প্রতি মানুষের আকর্ষণ বোধহয় সেই প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে। বিশেষজ্ঞদের মতে, অরণ্যচর গুহাবাসী মানুষেরা অবসর যাপনের মুহূর্তে নিজেদের মধ্যে যে সব দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার বিনিময় করত, গল্প বলার রীতিটি সেখান থেকেই মানব সমাজে প্রচলিত হয়েছে। আদিম মানুষের সহচর ছিল অরণ্যের পশুপাখি, হিংস্র ও উপকারী নানা জীবজন্তু। তার অস্তিত্বের পরিমণ্ডল ছিল বন-জঙ্গল-নদী-মাঠ-পর্বত-সমুদ্র। ফলে অভিজ্ঞতা-ঋদ্ধ লোককথায় এদেরই অবশ্যম্ভাবী উপস্থিতি। পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে পাওয়া লোককথার যে বিপুল সমৃদ্ধ ভাণ্ডার মিলেছে বিষয়বস্তুর দিক থেকে তারা অনেক বৈচিত্র্যের সন্ধান দিয়েছে। উৎসাহী গবেষকরা গল্পগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে তাদের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য পর্যবেক্ষণ করেছেন। এতে বেরিয়ে এসেছে গল্পগুলির কিছু সাধারণ লক্ষণ, শ্রেণীচরিত্র, উপস্থাপন ভঙ্গির ঐক্য, গল্পগঠনের অভিন্ন কৌশলের পৌনঃপুনিকতা এবং অবশ্যই তাদের বিষয়বস্তুগত শ্রেণীভেদ। ১৮১২ খ্রিস্টাব্দে জার্মানিতে গ্রিমভাইদেব প্রথম লোককথা সংকলন প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে লোককথা নিয়ে নানান তত্ত্ব গড়ে ওঠবার অবকাশ হয়। সুপ্রসিদ্ধ জার্মান সংস্কৃতি বিশারদ ম্যাক্সমুলার পুরাকথায় 'সোলার মিথলজি' বা সৌর পুরাতত্ত্বের আমদানি ঘটান, যার মূল কথাটি ছিল সূর্যকে কেন্দ্র করেই আদিম মানুষের ধর্ম ও ধর্মীয় বিশ্বাস সমূহের উদ্ভব হয়েছে। তিনি একই সঙ্গে লোককথায় ভাষার বিকৃতি ও শব্দতত্ত্বের রীতি অনুধাবনের তত্ত্বও প্রচার করতে শুরু করেন। তাঁর এ মতের বিরোধিতায় নামেন অ্যান্ড্রু ল্যাঙ। ১৮৫৯ সালে থিয়োডর বেনফে যখন সংস্কৃত 'পঞ্চতন্ত্র'-এর জার্মান অনুবাদ ইওরোপের বিদগ্ধ মহলের সমক্ষে হাজির করলেন, তখন তার গল্পগুলির সঙ্গে পশ্চিমী দুনিয়ায় দীর্ঘকাল প্রচলিত লোককথার বিপুল সাদৃশ্য দেখে গড়ে উঠল আর একটি নতুন তত্ত্ব, যার নাম 'ইণ্ডিয়ানিস্ট থিয়োরি'। এই তত্ত্ব বলে, ভারতীয় উপমহাদেশই হল পৃথিবীজোড়া লোককথা ও রূপকথাগুলির প্রথম আঁতুড়ঘর, পরে তা এখান থেকে ছড়িয়ে পড়ে অন্যত্র। কিন্তু এই 'ওয়াণ্ডারিং অফ টেলস্' বা লোককথার পরিভ্রমণ তত্ত্ব খারিজ হয়ে যায় ফ্রান্সের যোসেফ বিডইরের পর্যালোচনায়। পরবর্তীকালে ফিনল্যাণ্ডের দুই লোকসংস্কৃতিবিদ জুলিয়াস ক্রোন ও তাঁর পুত্র কার্লে ক্রোনের প্রচেষ্টায় ঘটে

ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক পদ্ধতির প্রতিষ্ঠা। আর এক ফিনিশীয় লোকসংস্কৃতিবিদ অ্যান্টি আর্নে প্রথমে এ পদ্ধতির সঙ্গে যুক্ত থাকলেও অচিরে টাইপ-ইনডেক্সের প্রবর্তন করে লোককথা বিশ্লেষণে অভাবনীয় গবেষণা পদ্ধতির প্রমাণ রাখলেন। এই ধারাটিই আরো সূক্ষ্ম ও বলশালী হয়ে উঠল স্টিথ টমসনের মোটিফ-ইনডেক্সের যুগান্তকারী উদ্ভাবনায়।

বাংলায় যে কত লোকগল্প প্রচলিত আছে তার সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া দুষ্কর। তবে ইতিমধ্যে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগৃহীত মৌখিক গল্পের যেসব সংকলন প্রকাশ পেয়েছে তাতে গল্পগুলির বর্গীকরণ করা সহজ হয়েছে। জীবজন্তুদের নিয়ে প্রাণীকথা, রাজপুত্র-রাজকন্যাদের নিয়ে রূপকথা, উপদেশমূলক কাহিনী নিয়ে নীতিকথা হুরপরীদের নিয়ে পরীকথা, লৌকিক দেবতার মাহাত্ম্য নিয়ে ব্রতকথা, প্রাচীন দিনের অবিশ্বাস্য কাহিনী নিয়ে কিংবদন্তি ইত্যাদি আখ্যাননির্ভর লোককথা একদা সারা বঙ্গদেশ জুড়ে প্রচলিত ছিল। আমাদের বর্তমান অভিনিবেশের বিষয় হল রূপকথা। এগুলির আদি ও অকৃত্রিম সন্ধান পাওয়া যাবে বাংলার পল্লীগ্রামের আনাচে-কানাচে কথাকোবিদ গ্রামবৃদ্ধবৃদ্ধাদের মুখে। তাঁদের মুখের সজীব বাচনিকতা সহ কাহিনী উপড়ে এনে কেউ কেউ তা পুঁতে দিয়েছেন শিক্ষিত বাঙালির কর্ষিত মনোভূমিতে। এ প্রসঙ্গে স্মরণে আসে তিনটি বিশিষ্ট সংকলনের কথা। অনেকেই জানেন, বাংলা রূপকথা বিষয়ক প্রথম বইটি হল রেভারেণ্ড লালবিহারী দে'র 'ফোক্‌টেলস্ অফ্ বেঙ্গল'। সংকলনটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে। ইংরেজিতে লেখা এই বইটি ১৩৮৪ বঙ্গাব্দে অনূদিত হয়ে প্রকাশ পায় 'বাংলার উপকথা' নামে। গ্রন্থটির অনুবাদক ছিলেন প্রখ্যাত শিশুসাহিত্যিক শ্রীমতী লীলা মজুমদার। এতে আছে মোট বাইশটি গ্রাম্যগল্প। সাধারণভাবে 'রূপকথা' বললে যে-ধরনের গল্প ও তার উপজীব্য বিষয় মনে ভেসে ওঠে, লালবিহারীর এই সংকলনে জায়গা পাওয়া সব কটি উপাখ্যানে তার উপস্থিতি দেখা যায় না। এখানে রূপকথার পাশাপাশি ভূতপ্রেত, ব্রহ্মদত্যি, কথা-বলা পাখি, শেয়াল, সাধারণ গেরস্থঘরের অসাধারণ কাহিনী থেকে শুরু করে কয়েকটি মিথভিত্তিক গল্পও আছে। এজন্য অনুবাদক, খুব সচেতনভাবেই, 'ফোকটেল্'-এর বাংলা অনুবাদ করেছেন 'উপকথা' এবং 'অনুবাদকের নিবেদন' অংশে একটুখানি কৈফিয়ৎ দাখিল করেছেন এভাবে : 'রূপকথা আর উপকথা ঠিক এক জিনিস নয়। রূপকথা হল ছেলেভুলানো পরীদের গল্প, ইচ্ছে হলে আজও তৈরী করা যায়। উপকথা লোকের মুখে মুখে যেন আপনা থেকে গড়ে ওঠে, তাদের মূল থাকে অতীতে। আমি বলি কি, রূপকথা হল অন্যদের গল্প, আর উপকথা আমাদের নিজেদের গল্প। আমাদের দেশের মাটি জল হাওয়া দিয়ে গড়া, আমাদের দুঃখবেদনায় বিধুর, আমাদের সুখে-আহ্লাদে ভরপুর।' খাঁটি রূপকথার লক্ষণ মিলিয়ে এ সংকলনে এ শ্রেণীর রচনা ৪/৫টির বেশি হবে না। যাইহোক, বাংলার রূপকথার আদত সংকলন হল দক্ষিণারঞ্জন মিত্র

মজুমদারের দুটি অনবদ্য গ্রন্থ 'ঠাকু'মার ঝুলি' ও 'ঠাকুরদাদার ঝুলি'। প্রথমটির প্রকাশ ১৯০৭-এ, আর দ্বিতীয়টি বেরোয় ১৯০৯-এ। 'ঠাকু'মার ঝুলি'-তে মোট গল্পের সংখ্যা পনেরো, যদিও এর মধ্যে নির্ভেজাল রূপকথার সংখ্যা হল দশটি। গ্রন্থটির প্রকাশকালে আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ এর একটি অসামান্য ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন। তাঁর ভাবনায়, দক্ষিণারঞ্জন-সংকলিত বাংলার মৃত্তিকারসে সজীবিত এই উপাখ্যানগুলি বাঙালি শিশুর কাছে 'মাতৃদুগ্ধ' তুল্য। গল্পগুলির ভিতর দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে 'স্নেহময়ীদের মুখের কথা', 'দেশলক্ষ্মীর বুকের কথা'। তৎকালীন স্বদেশ-ভাবনায় উদ্দীপিত রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থভূমিকায় লিখলেন, 'এই যে আমাদের দেশের রূপকথা বহুযুগের বাঙ্গালী-বালকদের চিত্তক্ষেত্রের উপর দিয়া অশ্রান্ত বহিয়া কত বিপ্লব, কত রাজ্য পরিবর্তনের মাঝখান দিয়া অক্ষুণ্ণ চলিয়া আসিয়াছে, ইহার উৎস সমস্ত বাংলাদেশের মাতৃস্নেহের মধ্যে। যে স্নেহ দেশের রাজ্যেশ্বর রাজা হইতে দীনতম কৃষককে পর্যন্ত বুকে করিয়া মানুষ করিয়াছে, সকলকেই শুক্লসন্ধ্যায় আকাশে চাঁদ দেখাইয়া ভুলাইয়াছে এবং ঘুমপাড়ানী গানে শান্ত করিয়াছে, নিখিল বঙ্গদেশের সেই চিরপুরাতন গভীরতম স্নেহ হইতে এই রূপকথা উৎসারিত।' এর দু'বছর পরে 'ঠাকুরদাদার ঝুলি'তে দক্ষিণারঞ্জন আরও পাঁচটি গল্প পাঠকের সামনে হাজির করেছিলেন এবং সবকটি গল্পই ছিল খাঁটি রূপকথার। মূলত এই গল্পগুলির উপর নির্ভর করে পশ্চিমী গঠনতত্ত্বের আলোকে বাংলা রূপকথা সম্পর্কে দু'চারটি মামুলি কথা বলাই বর্তমান নিবন্ধকারের উদ্দেশ্য।

আগেই বলেছি, উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে গ্রিমভাইদের রূপকথার সংকলন প্রকাশের পরে পরেই সূচনা হয় লোককথা চর্চার বিভিন্ন পদ্ধতিবিদ্যার। রূপকথার ক্ষেত্রে সমালোচকরা দেখতে পেলেন এমন কিছু বিশেষ গোত্রলক্ষণ যা অন্য ধরনের লোকগল্পে মেলে না। লোককথার যে অন্যান্য বিভাগ রয়েছে তাদের সঙ্গে তুলনায় রূপকথাগুলি আয়তনে একটু দীর্ঘ হয়ে থাকে। এর কারণ বোধহয় বিভিন্ন কথকের নিজস্ব সংযোজন। গল্পকে রমণীয় তথা আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য মূল আখ্যানের নানা অংশে এর বক্তারা নিজেদের ইচ্ছে-মতো ঘটনাংশ বাড়িয়ে নিতে পারেন পরিণতি অক্ষুণ্ণ রেখে। রূপকথায় থাকতে পারে অলৌকিক অস্বাভাবিক অনেক উপকরণ, যাকে আধুনিক বুদ্ধি দিয়ে প্রশ্ন করা যায়। কিন্তু যাদের জন্য এর আয়োজন সেখানে এ ধরনের প্রশ্ন ওঠা অসম্ভব। বিষয়বস্তুগত বিচারে, রূপকথা হল মূলত রাজা-রানী-রাজপুত্র-রাজকন্যা-ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমী-পক্ষীরাজ ঘোড়া কিংবা বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বীচির মতো উদ্ভট প্রসঙ্গযুক্ত এমন এক কাল্পনিক কাহিনী, যার প্রধানতম অবলম্বন রোমান্স রস। রূপকথার জগৎ আদতে ফ্যান্টাসির জগৎ—সম্ভব-অসম্ভবের কোনও পবিধিতে যাকে বেঁধে রাখা যায় না। স্বপ্নরাজ্যের অলীকত্বের সঙ্গে রূপকথার ফ্যান্সি কল্পনার কোথায় যেন সাযুজ্য রয়েছে। রূপকথার

একমাত্র দায় বোধহয় শ্রোতার মনোরঞ্জন—যে শ্রোতা পরিণত-বুদ্ধি দিয়ে বিষয়কে বোঝে না, বরং পুরোপুরি চালিত হয় নিজের অবোধ রঙিন হৃদয়বৃত্তির দ্বারা। বাংলা ছেলেভুলানো ছড়ার অসংবদ্ধ চিত্রাবলীর সঙ্গে এইখানে আন্তরধর্মে মিল রয়েছে বাংলার গ্রাম্য রূপকথার। মনে রাখা প্রয়োজন, এই দুটি মৌখিক সাহিত্যই মূলত শিশুভোগ্য। ছাড়ার অসংবদ্ধ চিত্রাবলীর সঙ্গে এইখানে আন্তরধর্মে মিল রয়েছে বাংলার গ্রাম্য রূপকথার। মনে রাখা প্রয়োজন, এই দুটি মৌখিক সাহিত্যই মূলত শিশুভোগ্য। ছড়ার অগোছালো চিত্রধর্মিতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ শিশুচিত্তের যে বৈশিষ্ট্যাবলীর কথা বলেছেন, রূপকথার গঠন তত্ত্বের আলোচনায়ও সেটি সমানভাবে প্রযোজ্য। তবে শিশুতোষ কাহিনীরূপে রূপকথা গড়ে উঠলেও এর ঘটনাপ্রবাহে কোথাও অসংলগ্নতা নেই, যা প্রায়শ দেখা যায় ছড়ায়। গল্পের নিজেরই একটা গঠনতন্ত্র আছে, যেখানে কাহিনীর আদি-মধ্য-অন্ত্যের অনিবার্যতা রক্ষা করতে হয়। এখানেও তা বিদ্যমান। তবে রূপকথার গল্পগুলির সূচনাভাগ প্রায় একই রকমের হয়ে থাকে। ঘটনার সূত্রপাত হয় অতি সাধারণ এক বিবৃতি দিয়ে, কোন রোমাঞ্চকর ঘটনা দিয়ে নয়। যেমন—'এক যে ছিল রাজা' কিংবা 'এক দেশে এক রাজা ছিল' অথবা 'এক ছিল সওদাগর' ইত্যাদি। এই স্বাভাবিক সূচনা উপান্তে পৌঁছে সুসংগত পরিণামে গিয়ে ঠেকে। আখ্যান নির্মাণের ক্ষেত্রে যে দুটি প্রচলিত রীতির কথা বিশেষজ্ঞরা বলেন—'এরপর কী হল' এবং 'কেন এমন হল'—এই দুই বিকল্পের মধ্যে রূপকথাতে অনুসরণ করা হয় কেবল প্রথমটি। চরিত্রের নিয়ন্ত্রণে কিংবা ঘটনার মোড় ফেরাতে এর সুপ্রচুর ব্যবহার খুব চোখে পড়ে। বাংলা রূপকথার সাধারণ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে শেষকথা এই যে, আদিমকাল থেকে লোকসমাজে চলে-আসা বিভিন্ন সংস্কার, লোকবিশ্বাস, ট্যাবু বা নিষেধমূলক বিধান এই গল্পগুলি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা নেয়। এদেরই হাত ধরে গল্পে আসে মায়াবী রাক্ষস-খোক্কস-ভূত-প্রেত-দত্যি-দানোর ছলনার কথা, আসে দুর্গম কোন স্থানে লুকিয়ে রাখা তাদের প্রাণ-ভোমরার কথা; এভাবেই গল্পে জায়গা করে নিয়েছে ছদ্মবেশী রাজকুমার বা রাজকন্যারা—যারা প্রকাশ্যে সাপ, মাছ বা অন্য কোন রূপ ধারণ করে থাকে। রূপকথায় নানা নিষেধের ছড়াছড়ি। নির্দেশ অমান্য হলে অনিবার্য হয়ে ওঠে সেই বিপদ। আবার ভাগ্যের সুপ্রসন্নতায় দুয়ো হয়ে যান সুয়ো, অন্যায়কারীরা পায় চরমতম শাস্তি। অধিকাংশ রূপকথার গল্পে দেখা যায় রাজপুত্রের দেশভ্রমণের প্রসঙ্গ। অজানার উদ্দেশে রাজকুমারের একক অথবা যৌথ অভিযান। সেই দূরদেশে গিয়ে রাজকন্যার সঙ্গে রাজপুত্রের আকস্মিক সাক্ষাৎ। সাক্ষাতের স্থান নির্জন মায়াবী কোন পাতালপুরী, কিংবা বিপদ সঙ্কুল রাক্ষসপুরী। অতঃপর সেখান থেকে নিরাপদে বেরিয়ে আসাটাই হয়ে ওঠে তাদের কাছে চ্যালেঞ্জ। প্রতিকূল মায়াবী শক্তিগুলিকে পরাস্ত করে রাজপুত্রের বিজয়লাভ ও রাজকন্যাকে নিয়ে স্বদেশে পাড়ি দেওয়া রূপকথার এক চিরন্তন মোটিফ। রাজপুত্রের রাজকন্যা লাভের

অন্য ধরনের আখ্যানও বেশ কিছু আছে। সেখানে কোনও রাজা প্রায় অসম্ভব কোনও এক দুঃসাহসিক চ্যালেঞ্জ উপস্থিত করেন রাজপুত্রদের সামনে, বাজি জিততে পারলে পুরস্কার স্বরূপ ঘোষণা করেন রাজকন্যা ও অর্ধেক রাজত্ব। এ ধরনের গল্পে রাজপুত্রের সামনে বাধার পরিমাণ একটু বেশি থাকে, যদিও অন্তিমে রাজপুত্রেরই জয় হয়। সোজাকথায়, রূপকথার কাহিনী কিছু সমস্যা নিয়ে আবির্ভূত হয়, অন্তিমে ঘটে সেই সমস্যাগুলির সমাধান। এমন গল্পের শেষে সুখদায়ক এক সমাপ্তির ঘোষণা থাকে, থাকে বিরুদ্ধ শক্তির পরাজয়, শাস্তি কিংবা দুর্ভোগ। এ থেকে নীতিগল্পের একটা আদলও হয়তো বেরিয়ে আসতে পারে, কিন্তু অন্যান্য উপদেশাত্মক গল্পের সঙ্গে এর স্পষ্ট পার্থক্য লক্ষ করা যায়। নীতিপ্রচার রূপকথার প্রধান উদ্দেশ্য নয়, বরং প্রারম্ভ ও সমাপ্তি মিলিয়ে প্রতিটি রূপকথাই হয়ে ওঠে ইচ্ছাপূরণের গল্প। এ হেন সুখকর পরিণতি শিশুচিত্তকে আনন্দিত করে তোলে, তাদের চিত্তবিনোদনের যথার্থ উপকরণ হয়ে ওঠে বিশেষ ঢঙে বলা গান ও ছড়াসমৃদ্ধ রোমান্স রসে ভরপুর রূপকথা।

বাংলা রূপকথাগুলির নিবিড় অনুশীলন করে দেখা গেছে, একটি নির্ধারিত ছক মেনে গল্পগুলি নির্মাণ করা হয়েছে। আর কেবল বাংলা রূপকথার কথাই বা বলছি কেন, এই ছক পৃথিবীর সবদেশের প্রায় সমস্ত লোকগল্পগুলিতেই মিলেছে। এর কারণ লোকগল্পগুলির গঠনতাত্ত্বিক সর্বজনীনতা। এক্ষেত্রে গবেষকরা 'ইণ্ডিয়ানিস্ট থিয়োরি'-কে তেমন গুরুত্ব না দিলেও এটা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন যে, পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে থাকা লোকগল্পগুলির মধ্যে এক ধরনের কাঠামোগত ঐক্য রয়েছে। হয়তো বিশেষ কোন সভ্যতায়, বিশেষ কোন সাংস্কৃতিক স্তরে এই গল্পগুলির প্রাথমিক উদ্ভব ঘটেছিল, পরে সেখান থেকে অন্যান্য সব দেশে, সভ্যতায়, সংস্কৃতিতে তা ছড়িয়ে পড়েছিল। উৎসমূল অভিন্ন হওয়ায় তাই অন্তর্লীন মিলটুকু বজায় আছে। সেই মিলের সন্ধানে নেমে গবেষকরা লোকগল্পগুলির কাহিনী, উপকাহিনী, চরিত্র ঘটনার জটিলতা, পরিণতি ইত্যাদি নিয়ে পর্যালোচনা করেছেন। দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী পর্যালোচনাগুলি এক-একটি পদ্ধতিবিদ্যার জন্ম দিয়েছে। বাংলা রূপকথার আলোচনায় এরকম দু'একটি পদ্ধতির প্রয়োগ বর্তমান নিবন্ধে দেখানো চেষ্টা করা হয়েছে। অথ মূল বিষয়ারম্ভ।

বাংলা রূপকথার বিচারে প্রথমেই স্মরণে আসে ডেনমার্কের প্রখ্যাত লোকসংস্কৃতিবিদ্ অ্যাক্সেল ওলরিকের নাম। তিনি তাঁর দেশের 'সাগেন'-গুলিকে ভিত্তি করে গঠনগত দিক থেকে মোট তেরটি সূত্র নির্দেশ করেছিলেন, যাদেরকে 'এপিক ল' (Epic Law) নামে অভিহিত করা হয়। এই সূত্রগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল Law of Opening and Closing, Law of Repetition, Law of Two, Law of Three. Law of Twins, Law of Single Strand. Law of Patterning ইত্যাদি। দেখা যাচ্ছে, বাংলা রূপকথার গঠনে এর অনেকগুলিই উপস্থিত। প্রত্যেক রূপকথারই একটা

শুরু ও সমাপ্তির গতানুগতিক কৌশল আছে। গল্পকথক সূচনা করেন 'এক যে ছিল রাজা' কিংবা 'এক ছিল সওদাগর' বা এই জাতীয় কোন সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দিয়ে। তেমনি কাহিনী শেষ হয় মধ্যবর্তী পর্বে উদ্ভুত কোন সমস্যার সমাধান দিয়ে ও সুখান্তর পরিণতি ঘটিয়ে। যেমন, দুয়োরানীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারিণী রাণীদের ছলনা-চাতুর্য ধরা পড়ে গেল। রাজা নিজর ভুল বুঝতে পারলেন এবং দোষীদের চরম শাস্তি দিলেন। কথক এই ধরনের এক বাক্যে শেষ করেন কাহিনী—'তারপর দুয়োরানীর দুঃখ ঘুচল। রাজা সবাইকে নিয়ে সুখে-শান্তিতে দিন কাটাতে লাগলেন।' পুনরাবৃত্তির সূত্রও (Law of Repetition) বাংলা রূপকথায় ক্রিয়াশীল। এই সূত্র অনুযায়ী একই ধরনের ঘটনা কাহিনীর মধ্যে আনা হয় বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য। কথক যে-বর্ণনা করেন তাতেও থাকতে পারে এই ধরনের পুনরাবৃত্তি। 'চাঁদের কপালে চাঁদ' রূপকথায় দেখা যায়, রাজা বিয়ে করেছেন ঘুঁটে কুড়ুনির মেয়েকে। তার সৌভাগ্যে অন্য রানীরা তাকে হিংসে করে। রানী সন্তানসম্ভবা। এমন সময় রাজাকে রাজ্য পরিদর্শনে যেতে হল। যাওয়ার আগে রাজা এক সোনার ঘণ্টা দিয়ে বলে গেলেন, ছেলে হওয়ার সময় সে যেন ঘণ্টাটা বাজায়, তাহলে তিনি যেখানেই থাকুন না কেন তার কাছে ঠিক চলে আসবেন। এরপর রাজা রওনা হলে অন্যান্য রানীরা রাজাকে বিরক্ত করার জন্য একাধিক বার অপ্রয়োজনে ঘণ্টা বাজিয়ে রাজপুরীতে ফিরিয়ে আনে। কথক এই স্থানগুলিতে বর্ণনায় প্রায় একই রকমের বাক্যবিন্যাস করেছেন। এ ধরনের মোটিফ 'সাত ভাই চম্পা' রূপকথাতেও আছে। তবে সেখানে ঘণ্টার স্থান দখল করেছে শিকল। Law of Contrast বা পরস্পর বিরোধী গুণ, বস্তু বা ব্যক্তির সূত্র তো বাংলা রূপকথায় প্রচুর পরিমাণে ছড়িয়ে আছে। রাজার যদি ন্যূনপক্ষে দুই রানী থাকেন, তাহলে আবশ্যিকভাবে তার একটি হবেন সুয়ো, অন্যজন দুয়ো। রাক্ষসপুরীতে বীভৎস দর্শন রাক্ষস-রাক্ষসীদের মধ্যে বারবার দেখা গেছে অপরূপ সৌন্দর্যময়ী রাজকন্যাকে। এছাড়া কাহিনীর ভিতর কেউ একজন খুব নিষ্ঠুর হলে অন্যজন পরম দয়ালু হন। পরিণামের ক্ষেত্রেও দেখা যায় দুয়োর কপাল ফেরে, আর সুয়ো বা সুয়োদের কপালে জোটে হেঁটে কাঁটা ওপরে কাঁটা দিয়ে জ্যান্ত সমাধি। রূপকথার অনেক গল্পে যমজ সন্তানের প্রসঙ্গ (Law of Twins) আছে। তাদের ক্ষেত্রে ঘটনাগুলিতে সমতামূলকতা থাকে। দক্ষিণারঞ্জন সংগৃহীত 'শীতবসন্ত' রূপকথায় এর দৃষ্টান্ত রয়েছে। গল্পটিতে দেখা যায়, শীত ও বসন্ত দুই ভাই, তারা দুয়োরানীর যমজ সন্তান। সুয়ো কৌশলে দুয়োকে পাখিতে পরিণত করে সতীন পুত্রদের উপর অত্যাচার শুরু করে। জল্লাদ দিয়ে দুই ভাইকে হত্যা করিয়ে তাদের রক্তে স্নান করতে চায়। কিন্তু জল্লাদ বনের মধ্যে শীত ও বসন্তকে ছেড়ে দিয়ে কুকুর কেটে সেই রক্ত রানীকে দেখায়। এরপর তৃষ্ণার্ত বসন্তের জন্য শীত জল আনতে গিয়ে এক রাজ্যের শ্বেত হস্তী কর্তৃক নির্বাচিত হয়ে সেই রাজ্যের রাজা হয়ে বসে। আর তৃষ্ণার্ত বসন্তকে নিয়ে যান এক মুনি। পরে সে শুকসারির মুখ থেকে গজমোতির কথা শুনে ধবল পাহাড়ে গিয়ে অনেক

বিপত্তির সম্মুখীন হয়েও কার্যসিদ্ধি করে। Law of Three বা তিনের সূত্র কেবল লোক কাহিনীতেই নয়, লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়ে থাকে। বাংলায় '৩' সংখ্যাটি অমঙ্গলসূচক। যেমন, তিন শত্তুর দিতে নেই, তিনজনের একত্রে বেরুনো নিষেধ, মৃতের ত্রিপাদ দোষ ইত্যাদি। 'কলাবতী রাজকন্যা'-র কাহিনীতে দেখা যায়, কলাবতীর সন্ধানে দূরদেশযাত্রী পাঁচ রাজপুত্রকে তিন বুড়ি গিলে ফেলে, কিংবা 'শীতবসন্ত'-এর গল্পে বসন্ত গজমোতি সংগ্রহের পর বালি খুঁড়ে তিনটি মাছ নিয়ে আসে, যারা আসলে তার সৎমায়ের তিন সন্তান। এছাড়া একাধিক ক্ষেত্রে প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য রূপকথায় এসেছে 'তিন সত্যি' করার প্রসঙ্গ। এই সূত্রগুলির বাইরেও আরো দুটি সূত্রের কথা বলেছেন ওলরিক। তার মধ্যে একটি হল Unity of Plot বা বৃত্তগত ঐক্যের সূত্র এবং অন্যটি হল Concentration of a Leading Character অর্থাৎ প্রধান চরিত্রের উপর গুরুত্বদানের সূত্র। দেখা যাচ্ছে, বাংলা প্রতিটি রূপকথাই ভীষণভাবে বৃত্তবদ্ধ। আদিমধ্যঅন্ত সমন্বিত একটি সুঠাম কাহিনী রূপকথাগুলিতে পাওয়া যায়। প্রধান চরিত্রকে 'ফোকাস' করার জন্যও ঘটনাগুলি সন্নিবিষ্ট হয়ে থাকে। পরবর্তীকালে ওলরিকের এই তেরোটি সূত্রও বাংলা রূপকথার ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য। টমসন পরিকল্পিত একটি সূত্র হল : কাহিনীর মধ্যে যে সবচেয়ে দুর্বল বা নিকৃষ্ট সেই-ই শেষপর্যন্ত শ্রেষ্ঠ হয়ে ওঠে। সাধারণভাবে কনিষ্ঠ ভ্রাতা বা ভগ্নীই বিজয়ী বলে প্রমাণিত হয়। এই সূত্রটির দৃষ্টান্ত হিসাবে কলাবতী রাজকন্যা বা বুদ্ধুভুতুম, সাতভাই চম্পা, চুনির জন্ম, শীতবসন্ত প্রভৃতি গল্পগুলির উল্লেখ করা চলে।

লোককথা বিশ্লেষণের ধারায় রুশ লোকসংস্কৃতিবিদ ভ্লাদিমির জে. প্রপ্ যে-পদ্ধতির সূচনা করেছিলেন তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর পদ্ধতিটি রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি নামে পরিচিত। অনেকের মতে, এটি সাম্প্রতিক কালে লোকসংস্কৃতি আলোচনায় সবচেয়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী ও বিতর্কিত একটি পদ্ধতি। পদ্ধতিটিকে প্রপ্ বিজ্ঞানভিত্তিক করে তুলতে চেয়েছিলেন, যার অভাব তিনি লক্ষ করেছিলেন আগের পদ্ধতিগুলিতে। তাঁর ধারণায়, একটি উদ্ভিদের সমগ্র অংশের সঙ্গে তার খণ্ডাংশগুলির যেমন সম্পর্ক আছে, আবার ক্ষুদ্র প্রতিটি খণ্ডাংশের রয়েছে নিজস্ব গুরুত্ব, তেমনি লোককাহিনীর ভিতরেও প্রতিটি ক্ষুদ্রাংশের সঙ্গে তার সমগ্রের একটি সম্পর্ক রয়েছে, রয়েছে তাদের নিজস্ব গুরুত্ব। প্রপের পদ্ধাতিটি গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে ভাষাবিজ্ঞানের অগ্রগতিও অনেকটা সাহায্য করেছে। সংগঠন তত্ত্বানুসারে বাক্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন উপাদান যেমন নির্দিষ্ট নিয়ম মেনেই বসে, তেমনি লোককথায় ঘটনা ও চরিত্রের মধ্যে যেসব ক্রিয়াশীলতা দেখা যায় তারাও আসে বিশেষ একটি রীতি মেনে। এই রীতিটি তাঁর ভাষায় 'Syntagmatic model'। এই মডেল বলে, পৃথিবী জুড়ে যেসব লোককথা দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত তাদের মধ্যে কাহিনীগত বৈচিত্র্য কিংবা ভাষাগত ভিন্নতা থাকলেও তারা গঠনতত্ত্বের দিক থেকে একই। এর কারণ হল, লোককথা যখন

এক স্থান থেকে বা জনগোষ্ঠী থেকে অন্য স্থানে বা লোকসমাজে পরিভ্রমণ করে তখন মৌখিকতার সূত্রে তাতে অনেক পরিবর্তন ঘটে। এমনকি নতুন নতুন অনেক উপকাহিনীও তার দেহে স্থান পেতে পারে। কিন্তু এই রূপান্তর কেবল সৌধ বা উপরিতলের, তা কখনই কাঠামোকে পরিবর্তন করে না। তাঁর মতে, লোককথার একটি বিশ্বজনীন ভাবনাগত কাঠামো আছে এবং সেটি অপরিবর্তনীয়। ১৯২৮ সালে এই তত্ত্বটি প্রপ্ উপস্থাপিত করলেন রুশ ভাষায় তাঁর লেখা গ্রন্থ 'মরফোলজিয়া স্কাজকি'-তে, এর ত্রিশ বছর পর ১৯৫৮ সালে বইটির ইংরেজি অনুবাদ 'Morphology of Folktale' নামে প্রকাশিত হয় আমেরিকার ইণ্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। এই বইটিতে তিনি লোককথার উপাদান নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে দুটি শব্দ ব্যবহার করলেন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে। এদের একটি হল 'variables' ও অন্যটি 'constants'। ভেরিয়েবলস্ বা পরিবর্তনশীল উপাদান বলতে তিনি বোঝাতে চাইলেন গঠনের সেইসব উপাদানকে যা মৌখিক পরিভ্রমণের সময় হারিয়ে যায় বা নতুন উপকরণ রূপে এসে যুক্ত হয়। আর যে সব উপাদান কাঠামোতে চিরস্থায়ী তারা হল কনস্ট্যান্টস্ বা অপরিবর্তনীয় উপাদান। পরিবর্তনশীল উপাদানের প্রভাবে বিভিন্ন দেশের লোককাহিনীগুলিতে সেই সেই দেশের পারিবেশিক সংস্কৃতি অনুসারে গল্পের বাইরের চেহারায় পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়। অন্যদিকে অপরিবর্তনীয় উপাদান থাকে বলে সমজাতীয় লোককাহিনীর ভিতর দেখা যায় একধরনের অন্তর্লীন শৃঙ্খলা ও পারম্পর্যের বোধ। প্রপ্ মোট একত্রিশটি functional unit বা ক্রিয়াশীলতার ভাগ করে দেখিয়েছিলেন লোককথার কনস্ট্যান্টস্ অংশটি (এ বিষয়ে দেখুন দিব্যজ্যোতি মজুমদারের 'বাংলা লোককথার টাইপ ও মোটিফ ইনডেক্স')। প্রপের বক্তব্য, প্রতিটি গল্পে এদের সকলকে একসঙ্গে না হোক কতকগুলিকে অবশ্যই দেখা যাবে এবং বাক্যে পদগুলি যেভাবে ব্যাকরণের নিয়মানুসারে একের পর এক এসে বসে, কাঠামোতে ক্রিয়াশীলতাগুলি সেভাবে একাদিক্রমে উপস্থিত হয়ে কাহিনীকে দৃঢ় ভিত্তি দান করে। প্রপ্ তাঁর এই অবয়ববাদী পদ্ধতিবিদ্যাকে প্রথম প্রয়োগ করেন রুশদেশের লোককথার উপর। প্রয়োগ করতে গিয়ে দেখেন, লোককথার মৌলিক উপদানগুলি কেবল পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত তাই নয়, এরা ধারাবাহিকতা বজায় রেখেই গল্পে আবর্তিত হয়। লোককথার মধ্যে প্রপ্ চারটি মৌলিক উপাদন খুঁজে পেয়েছিলেন। এগুলি হল : নায়কের প্রতি প্রতিশোধ, নায়ক কর্তৃক সেই প্রতিশোধকে অগ্রাহ্য করা, খলনায়কের প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচন এবং নায়কের বিবাহ ও সিংহাসন লাভ। রূপকথার গঠন বিষয়ে প্রপ্ আলাদাভাবে নজর দিতে গিয়ে তিনটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। এগুলি হল—চরিত্র বা চরিত্রের ভূমিকা, চরিত্রের কাজ ও রূপান্তর। রূপকথাতে সর্বাধিক সাত ধরনের চরিত্র থাকতে পারে বলে মনে করেন প্রপ্। এগুলি হল নায়ক, নায়িকা, খলনায়ক, হিতকারী, দাতা, বার্তাপ্রেরক ও রাজা। চরিত্রের কাজ

বলতে তিনি সেই ধরনের সক্রিয়তাকে বুঝিয়েছেন যা ঘটনাপ্রবাহকে তাৎপর্যময় করে তোলে। রূপান্তর হল বহিরঙ্গিক পরিবর্তন, আর এই পরিবর্তনের পিছনে রয়েছে সমকালীন ভাবধারার প্রভাব। তবে এই রূপান্তরণ সব সময়েই নিজস্ব কিছু নিয়মকে অনুসরণ করে চলে।

প্রপের এই তত্ত্বের আলোকে এবার বাংলা রূপকথাগুলির দিকে ফিরে তাকানো যেতে পারে। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার সংকলিত গল্পগুলির মধ্যে 'কলাবতী রাজকন্যা' অন্যতম। কাহিনীটি সংক্ষেপে এইরকম : এক রাজার সাত রানী। কিন্তু কারুর কোন ছেলেপিলে হয়নি। একদিন এক সন্ন্যাসী এসে একটি গাছের শিকড় দিয়ে তা ভাগ করে সাত রানীকে খেতে বললেন। কিন্তু ন'রানী ও ছোটরানীকে কৌশলে বঞ্চিত করে বাকি পাঁচজন সেই শিকড়-বাটা খেলেন। ন' রানীর ভাগ্যে জুটলো বাটির শেষে পড়ে থাকা তলানি ও ছোটরানীর ভাগ্যে শিল-ধোয়া জল। সময়কালে সাত জনেই গর্ভবতী হলেন। পাঁচরানীর ছেলে জন্মালো যেন সোনার চাঁদ, আর ন'রানীর পেট থেকে বেরুল এক প্যাঁচা এবং ছোট রানী প্রসব করলেন একটি বানর ছানাকে। বানরের নাম হল বুদ্ধু ও পেঁচার নাম হল ভুতুম। পাঁচ রাজপুত্র এদের ভাই বলে স্বীকার করে না, পদে পদে অপমান ও ব্যঙ্গ করে। পাঁচ রাজপুত্র কলাবতী রাজকন্যাকে পাওয়ার জন্য ময়ূরপঙ্খীতে পাল তুলে রওনা দিল। তা দেখে বুদ্ধু-ভুতুমের মনে ভারি দুঃখ। কিন্তু কোথায় পাবে তেমন রাজকীয় নৌকো। তাদের ইচ্ছের কথা জানতে পেরে তাদের মায়েরা দুখানি সুপারির ডোঙায় কড়ি, ধান, দূর্বা, সিঁদুরের ফোঁটা দিয়ে মাঙ্গলিক আচরণ করে ডোঙা দুটি ভাসিয়ে দিলেন। তাতে চড়ে দূর সমুদ্রে পাড়ি দিল বুদ্ধু ও ভুতুম। ততদিনে পাঁচটি রাজপুত্র তিন বুড়ির রাজ্যে পৌঁচেছে। বুড়িরা তাদের সব কিছু আটক করে পাঁচজনকে গিলে খেল। সেই রাজ্যে এসে বুদ্ধু ও ভুতুম বুড়িদের পেট কেটে দাদাদের মুক্ত করল। ময়ূরপঙ্খীতে সবাই মিলে যখন কলাবতীর সন্ধানে যাচ্ছিল, তখন আবার দুই ভাই পাঁচজনের দ্বারা নিগৃহীত হল। কিছু পথ যাওয়ার পর পাঁচটি ময়ূরপঙ্খী সহ পাঁচ রাজপুত্র হঠাৎ কোথায় ডুবে গেল। তখন ভুতুমকে সুতো ধরার দায়িত্ব দিয়ে সেই সুতো বেয়ে বুদ্ধু অতল জলে ডুব দিল। গিয়ে সে পৌঁছল পাতালপুরীতে। এ পুরী কলাবতী রাজকন্যার। বুদ্ধু সন্তর্পণে রাজকন্যার ঘরে ঢুকে কলাবতীর মাথার মোতির ফুল তুলে নিল। তবে রাজকন্যা বুদ্ধুকে বিয়ে করার আগে তার বুদ্ধি ও সাহসের পরীক্ষা নিলেন। পরীক্ষায় সফল হল বুদ্ধু। পূর্বের শর্ত মতো তাদের বিয়ে হল। তারপর রাজকন্যা, ভুতুম আর পাঁচ দাদাকে সঙ্গে নিয়ে বুদ্ধু পিতৃরাজ্যে ফিরে এল। সবশেষে রয়েছে বুদ্ধু ও ভুতুমের পাখি ও বানরের ছাল পুড়িয়ে ফেলে তাদের রূপবান রাজপুত্রে পরিণত হওয়ার সুখান্তক কাহিনী।

'সাত ভাই চম্পা' নামক রূপকথাতেও আছে এ ধরনের কাহিনী। এক রাজার সাত রানী। প্রথম ছ'জন খুবই অহংকাবী, ছোটরানীটি শান্ত। সেজন্য রাজা ছোটরানীকে খুব

ভালোবাসেন। ছোটরানী আসন্নপ্রসবা। রাজার মনে আর আনন্দ ধরে না। তা দেখে হিংসেয় জ্বলে বাকি রানীরা। রাজা রানীর প্রসবের আগে সোনার শিকল এনে দিয়ে গেলেন, বলে গেলেন সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে সেটা নাড়তে। দুষ্টবুদ্ধি রানীরা রাজাকে ছোটরানীর প্রতি ক্রুদ্ধ করে তোলার জন্য অকারণে শিকল ধরে নাড়া দিল। রাজা এসে বিরক্ত হয়ে চলে গেলেন। ছোটরানীর কিন্তু সাত ছেলে ও এক মেয়ে হল। রাজার কাছে ছয় রানী খবর দিল ছোটরানী ইঁদুর আর কাঁকড়া প্রসব করেছে। আর ভূমিষ্ঠ হওয়া সাত ছেলে ও মেয়েকে তারা হাঁড়ি-সরাতে পুরে পুঁতে ফেলল ছাইগাদাতে। রাজা ছোটরানীকে নির্বাসন দিলেন। সে ঘুঁটেকুড়ুনি দাসী হয়ে রইল। ছাইগাদায় পোঁতা সাত ছেলে সাত চাঁপা হয়ে ফুটলো। আর মেয়েটি হল তাদের বোন পারুল। মালী ফুল তুলতে গেলে গাছের ডাল অনেক উঁচুতে উঠে গেল। ফুলেরা রাজাকে আসতে বলল। রাজা এলেন. অন্যান্য রানীরা এলেন। ফুলেরা ঘুঁটে-কুড়ুনিকে আনতে বলল। ছোটরানী এলে ফুলেরা মাটিতে নেমে এসে 'মা মা' বলে কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। রাজা তখন সব কিছু বুঝতে পারলেন। দুষ্ট রানীদেরকে শাস্তি দিলেন হেঁটে কাঁটা উপরে কাঁটা দিয়ে পুঁতে ফেলে। সাত রাজপুত্র ও এক কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে ছোটরানী সহ রাজা পুরীতে প্রবেশ করলেন।

বাংলা রূপকথার সব কাহিনীকে যদি এভাবে সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরে তাদের গঠন-কাঠামো বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে দেখা যাবে প্রপ্-নির্ধারিত একত্রিশটি ক্রিয়াশীলতার মধ্যে গল্পের মোটিফগুলি ঘোরাফেরা করছে। এ কাজ করতে গিয়ে প্রপ্‌কে হয়তো বিভিন্ন দেশের কয়েক হাজার লোককথা পর্যবেক্ষণ করতে হয়েছে। তর্কবিদ্যার আরোহ পদ্ধতিতে তিনি বিশেষ থেকে সামান্যের পথে ক্রমশ এগিয়ে গেছেন এবং সম্প্রসারণক্ষম একটি আদর্শ নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছেন। তবু তাঁর বিবেচনার বাইরে হয়তো কিছু মৌলিক ক্রিয়াশীলতা এখনও থেকে যাওয়া সম্ভব। সেই সম্ভাবনার কথা ভেবে প্রপ্ এমনভাবে তাঁর রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পদ্ধতিকে সাজিয়েছেন যাতে ভবিষ্যৎ কালের অনুবর্তী ভাবুকদেরকে না সমস্যায় পড়তে হয়। তবে এ প্রসঙ্গে একটি কথা না বললেই নয়। সেটি হল প্রপের আগে অ্যান্টি আর্নে ১৯১০ সাল থেকে প্রকাশ করে আসছিলেন লোককথার টাইপ-ইনডেক্স। ১৯২৫-এ তাঁর মৃত্যুর পর এই কাজকে সম্পূর্ণতা দান করেন স্টিথ টমসন। তিনি ১৯২৮ সালে আর্নের তালিকার পরিবর্ধন ও সম্পূর্ণতা বিধান করে প্রকাশ করেছিলেন 'The Types of the Folktale'। আর এর চার বছর পর থেকে টমসন শুরু করলেন আর এক অসামান্য কাজ—পৃথিবীজোড়া লোককথাগুলির মোটিফ-ইনডেক্স নির্মাণ। প্রপ্ এই দুই ইনডেক্স বা তালিকাকে খুবই গুরুত্ব দিয়েছিলেন তাঁর গবেষণায়। বস্তুত প্রপ্-নির্দেশিত ক্রিয়াশীলতাগুলির মধ্যেও টাইপ ও মোটিফের অন্তর্নিহিত রূপটির সন্ধান পাওয়া যায়।

ভ্লাদিমির প্রপের পর লোককথার অবয়ব বিশ্লেষণে রূপতাত্ত্বিক পদ্ধতিতে খ্যাতিলাভ করেন ফরাসী নৃবিজ্ঞানী ক্লদ লেভি স্ট্রাউস্। তিনি বিশ শতকের মধ্যবর্তী

পর্ব পর্যন্ত আবিষ্কৃত ভাষাবিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্বের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হন। ১৯৫৫ সালে স্ট্রাউস 'Journal of American Folklore'-এ প্রকাশ করলেন 'Structural Study of Myth' নামের একটি প্রবন্ধ। অবয়ববাদী ভাষাবিজ্ঞানের আলোচনায় sign, signifier, signified তথা চিহ্নায়ন প্রক্রিয়া যেমন স্থান পেয়েছিল, স্ট্রাউস্‌ও তেমনি মিথকে মনে করলেন সমাজের বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক চিহ্ন। মিথের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা বিভিন্ন আচার, প্রথা, বিনোদন, বিবাহসম্পর্ক, খাদ্যাভ্যাসকে বিশ্লেষণ করে যে প্রাচীন সমাজের স্বরূপ অনুধাবন করা যেতে পারে—এমন একটি ধারণা তিনি পোষণ করতেন। তাঁর এই ধারণা থেকে তৈরি হয়েছিল তিনটি তত্ত্ব—মৈত্রীতত্ত্ব, মানবভাবনার ঐক্যতত্ত্ব ও মিথের অবয়ববাদী বিশ্লেষণতত্ত্ব। তাঁর মৈত্রীতত্ত্বের মূলে রয়েছে বিবাহ প্রথা। বিবাহ সম্পর্কের মধ্যে দিয়েই বিচ্ছিন্ন মানুষরা সংহত হয়, সমাজ গড়ে ওঠে। আবার সামাজিক রীতিনীতি প্রবর্তনের পিছনে কাজ করেছে মানব ভাবনার ঐক্যতত্ত্ব (human mental process theory)। অতঃপর এই ভাবনার কাঠামো থেকেই পৃথিবীর সব মানব সমাজে জন্ম নিয়েছে মিথ বা লোকপুরাণ। পৃথিবীব্যাপী লোককথার একটা বড় অংশ হল এই মিথ। সুতরাং মিথকে বিশ্লেষণ করতে পারলে সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের অতীত পথরেখা অনেকটাই স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারবে। এই উদ্দেশ্য নিয়ে মিথের গঠনতত্ত্ব বিষয়ে কাজে নেমে পড়েন লেভি স্ট্রাউস্। এ কারণে অ্যালান ডানডেস্ বলেন যে, লেভি স্ট্রাউসের উদ্দেশ্য ছিল সামাজিক বাস্তবতার কাঠামোটি খুঁজে বার করা, আর সে কাজে তাঁর একমাত্র হাতিয়ার ছিল মিথ। বাস্তবে তিনি সমাজ-নিরপেক্ষভাবে মিথের কাঠামো খুঁজে বার করতে মোটেই আগ্রহী ছিলেন না। যাইহোক, ১৯৬১ সালে প্রকাশ পায় তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'Structural Anthropology'-র প্রথম খণ্ড; এর পনেরো বছর পরে বেরোয় বইটির দ্বিতীয় খণ্ড। মিথের কাঠামো খুঁজতে গিয়ে লেভি স্ট্রাউস প্রপের মতো কেবল পরস্পর সম্পর্কযুক্ত কয়েকটি ধারাবাহিক মৌলিক উপাদানই খোঁজেননি, বরং এর মধ্যে লুকিয়ে থাকা বিপরীতধর্মী সম্পর্ককেও খুঁজে বের করতে চেয়েছিলেন। বস্তুত লোককথার রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে স্ট্রাউসের যুগান্তকারী আবিষ্কার হল 'Binary opposition' বা বিপরীতধর্মী দুটি শক্তির অস্তিত্বের উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করা। তাঁর মতে, লোকসাহিত্যের সব উপাদানের ভিতরেই এমন যুগ্ম বৈপরীত্য রয়েছে। মিথ বা লোককথার সঠিক অর্থোদ্ধারের জন্য প্রয়োজন মোটিফগুলিকে বিযুক্ত করে অর্থবোধক পন্থায় সেগুলি সাজিয়ে ফেলা এবং বিপরীতধর্মী বিষয় ও ক্রিয়াগুলিকে সনাক্ত করা। লোককাহিনীর ঘটনাগুলি ছুটে চলে এই যুগ্ম বৈপরীত্যের দ্বন্দ্বমূলক ক্রিয়াশীলতায় এবং সবশেষে এক বা একাধিক মধ্যস্থতাকারীর সহায়তায় কাহিনী লাভ করে তার প্রার্থিত পরিণাম। কাহিনীর মধ্যে যুগ্ম বৈপবীত্যের সন্ধানে নেমে স্ট্রাউসও প্রপের মতো মোটিফ-ইনডেক্সের উপর নির্ভর করেছেন। তাঁর বক্তব্য, পুরাকাহিনীর কাঠামোকে code বা সাংকেতিক নিয়মের আলোকে ব্যাখ্যা করা উচিত। কেননা মানুষের মনের

মৌলিক বিশ্বাস-সংস্কার-চিন্তাভাবনাগুলি তার আশেপাশের যেসব বস্তুসামগ্রী রয়েছে তাদেরই রূপকের আশ্রয়ে কল্পনায় অভিব্যক্তি পায়। ফলে 'কোড'-এর ব্যাখ্যা ছাড়া মিথের অন্তর্নিহিত সত্য অনুধাবন করা যায় না। মিথের টুকরো টুকরো অংশগুলিকে তিনি নাম দিয়েছেন 'মিথেম' (mytheme)। বাক্য যেমন অনেক পদের সমন্বয়, মিথও তেমনি অনেক মিথেমের যোগফল। বাক্যকে বিশ্লেষণ করতে গেলে যেমন পদ প্রকরণের সূক্ষ্ম আলোচনা জরুরী, তেমনি মিথকে সমাজতত্ত্বের দিক থেকে ব্যাখ্যা করতে গেলে মিথেমের আলোচনা অত্যাবশ্যক। স্ট্রাউস তাঁর আলোচনায় সেইভাবেই এগিয়েছেন। এজন্য তাঁর পদ্ধতিকে বলা হয় 'Paradigmatic analysis' বা পদপ্রকরণজাত বিশ্লেষণ।

এবার এই তত্ত্বের সাহায্যে কয়েকটি বাংলা রূপকথার কাহিনী বিচার করে দেখা যেতে পারে। রেভারেণ্ড লালবিহারী দে'র 'Folktale of Bengal'-এর প্রথমেই রয়েছে 'লাইফ'স্ সিক্রেট' গল্পটি। অনুবাদিকা লীলা মজুমদার এর নাম দিয়েছেন 'গোপন প্রাণ'। এর কাহিনীতে দেখা যায় : এক রাজার দুই রানী—সুয়ো আর দুয়ো। কোন রানীরই সন্তান হয়নি। একদিন এক ফকির ভিক্ষা নিতে এসে সেকথা জানতে পেরে তিনি সুয়োরানীকে একটি শিকড় দিয়ে ডালিম ফুলের রসের সঙ্গে খেতে বললেন। ফকির রানীকে জানিয়ে গেলেন আরো দুটি কথা। রানীর ভাবী সন্তান নিরাপদ নয়, তাকে হত্যা করার জন্য শত্রুর অভাব নেই পুরীতে। আর সেই ছেলের প্রাণ বাঁধা থাকবে রাজবাড়ির বড় দীঘিতে চরা বিরাট বোয়াল মাছের কল্‌জেতে রাখা কাঠের কৌটোর ভিতর হারের সঙ্গে। যথাসময়ে সুয়োরানী পুত্র সন্তান প্রসব করলেন। রাজপুত্রের নাম রাখা হল ডালিমকুমার। বিমাতা দুয়োর চোখে ডালিমকুমার বিষ হয়ে গেল। ছোটরানী ফন্দি আঁটতে লাগলো কীভাবে তাকে হত্যা করবে। দুয়ো কৌশলে ডালিমের জীবনের গোপন রহস্য জেনে নিয়ে অসুখের ছলনা করে সেই বোয়াল মাছটা ধরাল ও তার পেট চিরে সোনার হারটি পরলো। ডালিমকুমারের প্রাণ নিস্তেজ হয়ে গেল। বলাবাহুল্য যে, কাহিনীর এই অংশে সুয়ো ও দুয়োর যুগ্ম বৈপরীত্য ও তাদের ভিতরকার দ্বন্দ্বমূলক ক্রিয়াশীলতা গল্পকে এতদূর পর্যন্ত টেনে এনেছে। কাহিনীর পরের অংশে ঘটেছে 'মিডিয়েটর'-এর আবির্ভাব, যার সহায়তায় কাহিনীটি একটি সুন্দর পরিণতির পথে এগিয়ে গেছে। সুয়ো ছেলের নিষ্প্রাণ দেহ নিয়ে রাজার নিভৃত বাগানে একটি ঘরে সাজিয়ে রেখে এল। মন্ত্রীর ছেলে ছিল ডালিমকুমারের বন্ধু। সে প্রতিদিন আসতো সেই বাগানে। গভীর রাতে রাজা দুয়োর সঙ্গে রাত্রিবাস করতে এলে দুয়ো যেই হারটা গলা থেকে খুলে রাখতো অমনি বাগানে ডালিমকুমার বেঁচে উঠতো। সে তখন বন্ধুর সঙ্গে কথা বলতো, খাবার খেতো, গল্পগুজব করতো। এদিকে বিধাতা পুরুষের এক কন্যা জন্মালো। তার কপালে লেখা যে মরা বরের সঙ্গে তার বিয়ে হবে। সেই মেয়েকে নিয়ে তার মা পথে বেরিয়ে পড়লো। কিন্তু পরে কপালের লিখন ক্রমে ডালিমকুমারের সঙ্গে সেই মেয়েটির দেখা হয়ে গেল। পরিচয়ের পর সেই

বাগানে দুজনের বিয়ে হল। এমনিক তাদের দুটি ছেলেও জন্মাল। তখন নাপিতানী সেজে মন্ত্রীর ছেলের পরামর্শে ডালিমের বউ সেই দুয়োরানীর ঘরে গিয়ে কৌশল করে হার নিয়ে এল। ডালিমকুমার চিরতরে বেঁচে গেল। রাজা হারানো রাজপুত্রকে পেয়ে খুব আনন্দিত হলেন এবং প্রকৃত অন্যায়কারী দুয়োরানীকে গর্তে জ্যান্ত পুঁতে তার অপকর্মের শাস্তি দিলেন।

কেবল এই রূপকথাটিই নয়, 'চাঁদের কপালে চাঁদ', 'শ্বেতবসন্ত', 'কলাবতী রাজকন্যা', 'কাঁকনমালা কাঞ্চনমালা' প্রভৃতি গল্পেও এ ধরনের যুগ্ম বৈপরীত্য রয়েছে এবং পারস্পরিক হিংসা-দ্বেষ-ঈর্ষার হাত ধরে কাহিনীতে গতি সঞ্চারিত হয়েছে। মধ্যবর্তী পর্বে আবির্ভূত হয়েছে কোন-না-কোন মধ্যস্থতাকারী শক্তি যে নায়ক বা নায়িকার অনুকূলে কাজ করেছে এবং শেষ পর্যন্ত একটি সুখকর পরিসমাপ্তি ঘটাতে সাহায্য করেছে। যেমন—'চাঁদের কপালে চাঁদ' রূপকথায় রাজার প্রথম ছয়রানীর বিপরীতে রয়েছে ঘুঁটে কুড়ুনির সেই উচ্চাশী মেয়েটি, যাকে রাজা সবশেষে বিয়ে করেছেন এবং সর্বাপেক্ষা ভালোবাসেন। ছয় সতীন তার সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত হয় এবং ছোটরানীকে নানাভাবে বিপদে ফেলার চেষ্টা করে। ছোটরানী সুন্দর সন্তান প্রসব করলেও রাজাকে তার বদলে দেখানো হয় কুকুরছানা। এতে ছোটরানীর ভাগ্যবিপর্যয় ঘটে। এদিকে ছোটরানীর গর্ভ থেকে জন্ম নেওয়া সেই দুই পুত্র ও কন্যা ভাগ্যচক্রে এক কুমোর-দম্পতির সাহায্যপ্রাপ্ত হয়। আরো পরে রাজপুত্র রাক্ষস, রাক্ষসী, কচুরীপানা ও মহাসাগরের সাহায্যে দুর্গম স্থানে গিয়ে কেতকী ফুল সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। তার সঙ্গে দেখা হয় সোনার পালঙ্কে শায়িত এক রাজকন্যার। রাজপুত্র সোনার কাঠি রূপোর কাঠি ছুঁইয়ে তার ঘুম ভাঙায়। রাজকন্যা বলে যে সে রাক্ষসপুরীতে বন্দিনী। এরপর রাজকন্যা কৌশল করে রাক্ষসবুড়ির কাছ থেকে তাদের মৃত্যুরহস্য জেনে নিয়ে রাজপুত্রকে জানায় এবং পরিশেষে রাক্ষসকুলকে হত্যা করে রাজপুত্র অচিন দেশের রাজকন্যাকে নিয়ে নিজের দেশে পাড়ি দেয়। সব শেষে পিতা-পুত্রের মিলন হয় ও দোষীরা শাস্তি পায়।

'কাঁকনমালা-কাঞ্চনমালা' রূপকথাটি একটু অন্য ধরনের। কাহিনীতে নীতিকথার মৃদু ছোঁয়া আছে বলে মনে হয়। প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা রক্ষা না করলে যে অপরাধ হয়, মানুষের ভাগ্যবিপর্যয় তার সাথে জড়িত। গল্পটি সংক্ষেপে এইরকম : রাজপুত্রের সঙ্গে এক রাক্ষস ছেলের বন্ধুত্ব হয়েছে। রাজপুত্র রাজা হলে বন্ধুটিকে মন্ত্রী করবেন বলে কথা দিলেন। কিন্তু পরে রাজপুত্র রাজা হয়ে কাঞ্চনমালাকে বিয়ে করে আগের প্রতিশ্রুতির কথা বেমালুম ভুলে গেলেন। এই অপরাধে রাজার জীবনে ভাগ্যবিপর্যয় নেমে এল। তাঁর দেহে সর্বত্র সুঁচ দেখা দিল। রাজা বসতে পারেন না, খেতে পারেন না, শুতে পারেন না। সর্বদা অস্বস্তি আর যন্ত্রণা। একদিন নদীর ঘাটে স্নান করতে গিয়েছেন রানী। স্নান করছেন সব পোষাক ও অলঙ্কার খুলে। তাঁর দাসী কাঁকনমালা সেই ফাঁকে রানীর পোষাক ও অলঙ্কার পরে নিয়ে নিজেই হল রানী, আর রানীকে

করল দাসী। এরপর থেকে আসল রানী মনের দুঃখে দিন কাটান, আর প্রকৃত দাসীটি রাজসুখ ভোগ করে। গল্পে এরপরেই আবির্ভূত হয়েছে 'মিডিয়েটর', যার সহায়তায় রাজা ও কাঞ্চনমালার জীবনে আবার সৌভাগ্যের উদয় ঘটেছে। কাঞ্চনমালা একদিন নদীতে গিয়েছেন। নদীর তীরে একজন মানুষকে প্রচুর সুতো নিয়ে বসে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করে জানলেন সে তার সুতোর জন্য প্রচুর সূঁচ চাই। রানী তাকে রাজপুরীতে ডেকে নিয়ে এলেন। কাঁকন যে এই রাজবাড়ির দাসী, প্রকৃত রানী নয়, সেটা বুঝতে লোকটির সময় লাগল না। তখন সে তার মন্ত্রঃপূত সুতোকে নির্দেশ দিল রাজার শরীর থেকে সূঁচ উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে যেন কাঁকনের চোখ-মুখ সেলাই করে দেয়। মুহূর্তে রাজার শরীর থেকে সব সূঁচ উঠে গেল ও কাঁকনের চোখ-মুখ সেলাই করে দিল। রাজা চোখ খুলেই মানুষটিকে চিনতে পারলেন। সে আর কেউ নয়, তাঁর সেই রাখাল বন্ধুটি। রাজা নিজের দোষ স্বীকার করে নিলেন এবং পূর্ব প্রতিশ্রুতি মতো রাখাল বন্ধুকে মন্ত্রী করে কাঞ্চনমালাকে নিয়ে সুখে রাজত্ব করতে লাগলেন।

লেভি স্ট্রাউসের পর লোককথার রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে সবচেয়ে কার্যকরী সূত্র আবিষ্কার করেছেন আমেরিকান লোকসংস্কৃতিবিদ আলান ডান্‌ডেস্। ১৯৬৫ সালে বেরোয় তাঁর 'The Study of Folklore'। এতে তিনি স্টিথ টমসন-কৃত মোটিফ-ইনডেক্সের ধারণাকে খুবই গুরুত্ব দিয়েছেন। প্রপের তত্ত্বও তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তিনি প্রপের তত্ত্বের সঙ্গে আরও নতুন কিছু সূত্র সংযুক্ত করেছেন। ১৯৬২ সালে ডান্‌ডেস্ তাঁর আলোচনায় নতুন একটি পরিভাষার সৃষ্টি করেছেন, সেটি হল 'মোটিফেম' (motifeme)। এর অর্থ হল উপকরণগুচ্ছ, যেখানে টমসন-আবিষ্কৃত মোটিফটিকে মনে করা হয় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র উপকরণ। অর্থাৎ মোটিফেমের উদ্ভব ঘটে অনেকগুলি মোটিফ মিলে। ডান্‌ডেসের মতে, যেমন তেমন ভাবে এই মোটিফগুলি একত্র সংবদ্ধ হয় না, তারা আসে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে নির্দিষ্ট কোন বক্তব্যের সাপেক্ষে। কতকগুলি বিশেষ বাঁধা-ধরা ছক থাকে লোককথায়। সেই ছকগুলি আবিষ্কার করতে পারলেই কোন্ কোন্ মোটিফ নিয়ে মোটিফেমটি গঠিত হয়েছে তাও অঙ্কের মতো নির্ভুলভাবে বলে দেওয়া যায়। তবে মোটিফেম নির্মাণে আঞ্চলিক সংস্কৃতি ও লোকমনস্তত্ত্বেরও একটা প্রভাব লক্ষ করা যায়। এই দুটি নিয়ন্ত্রণ করে মোটিফ নির্বাচন। মোটিফেমের অন্তর্গত মোটিফগুলিরও রূপান্তর দেখা যেতে পারে বিভিন্ন গল্পে। তাতে মূল ছকের কোন পরিবর্তন ঘটে না। ডান্‌ডেস্ উত্তর আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানদের লোককথাগুলি পর্যবেক্ষণ করে দুটি প্রধান মোটিফেমের সন্ধান পেয়েছিলেন। তাঁর ভাষায় এ দুটি হল : ১. Lack বা অভাববোধ ও ২. Liquidation of Lack বা অভাববোধের পরিপূরণ। বাংলা প্রতিটি রূপকথায় এই দুই মোটিফেমের আবশ্যিক দেখা মিলেছে।

বাংলার লোককথা : আর্থ সামাজিক চিত্র

রতনকুমার নন্দী

অলৌকিকতা ও বস্তুরস

লোককথা বাংলার সাহিত্য ভাণ্ডারের এক গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। অবশ্য এই অভিমত শুধু বাংলা- লোককথা সম্পর্কেই নয়, বিশ্বের সব ভাষার লোককথা সম্পর্কেই প্রযোজ্য। ঠিক কোন সময়ে কিভাবে একটি লোককথার সৃষ্টি হয়েছে তা সঠিকভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। কারণ, লোককথায় প্রত্যক্ষভাবে সময় বা ব্যক্তির পরিচয় থাকে না। লোককথা প্রায়শই শুরু হয় অনির্দিষ্ট ব্যক্তি বা সময়কে অবলম্বন করে। যেমন 'এক যে ছিল রাজা', কিংবা 'একদা কোন এক দেশে' জাতীয় বিবরণের মাধ্যমে। কাজেই একটি লোককথা পাঠ করে বোঝা যায় না কোন সময়ে, কোন দেশের কথা বর্ণনা করা হচ্ছে। স্বভাবতই, কোন বিশেষ লোককথা থেকে একটি অঞ্চলের ইতিহাস এবং সেই সময়ের আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রকৃত রূপটি নির্ধারণ করা কঠিন। বিশেষত লোককথার অন্তর্ভুক্ত সর্বাধিক জনপ্রিয় শাখা রূপকথার জগৎ অলৌকিক অতিপ্রাকৃতের জগৎ। সেখানে সম্ভব-অসম্ভবের মধ্যে কোন সীমারেখা নেই। ব্রতকথা, নীতিকথা, বা ভূত-প্রেতের গল্পের মধ্যেও মানব-দানব-দেবতা -ভূত-প্রেতের জগৎ মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। অর্থাৎ আপাত দৃষ্টিতে লোককথার বিষয়বস্তুর মধ্যে সামাজিক রীতিনীতি বা অর্থনৈতিক অবস্থা রূপায়ণের সচেতন প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় না। এক কথায় আমরা যাকে রূঢ় বাস্তব বলে চিহ্নিত করি, যে বাস্তবের সঙ্গে সামাজিক রীতি-নীতি, সমাজ-সংশ্লিষ্ট বিবিধ সমস্যা, অর্থনৈতিক সংকট লোককথায় মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে না। লোককথার পাশে গীতিকাকে রেখে তুলনামূলক পর্যালোচনা করলেই বিষয়টি স্পষ্টভাবে অনুধাবন করা সম্ভব। 'মহুয়া', 'মলুয়া' দেওয়ান ভাবনা, চন্দ্রাবতীর মত গীতিকায় গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থা, সেখানকার অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, জাতিভেদ এবং শোষণ নিপীড়নের যে চিত্র আছে, সে জাতীয় বিবরণ লোককথায় বিশেষ করে রূপকথায় নেই। আপাতদৃষ্টিতে রূপকথা বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কহীন অলৌকিক-অতিপ্রাকৃত ঘটনার বৃত্তান্ত। তবে নীতিকথামূলক যে গল্পগুলি পশু পাখীদের অবলম্বন করে লেখা, সেখানে পশুর আড়াল থেকে আত্মপ্রকাশ করে সমাজের পরিচিত মানুষজন। অন্যদিকে দেবী মহিমা প্রচারের উদ্দেশ্য নিয়ে রচিত হলেও বাংলার ব্রতকথাগুলির সঙ্গে মাটির সম্পর্ক অধিকতর।

বিশ্বে লোককথার প্রচলন ও সংগ্রহের ইতিহাস সুপ্রাচীন হলেও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে লোককথা পর্যালোচনার কাজটির সূচনা হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে, ১৮৭৮ খ্রিঃ ইংলণ্ডে 'ফোকলোর সোসাইটি' প্রতিষ্ঠার পর থেকে। এর অল্পকালের ব্যবধানেই ইউরোপের অন্যত্র এরকম আরও প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়। লোককথা যে কেবল অলৌকিক আজগুবি বিষয় নয়, এর মধ্যে সমাজ, অর্থনীতি, ভাষাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, মনস্তত্ত্বের মত বিবিধ বিষয় নানাভাবে জড়িত হয়ে আছে সে কথা বিভিন্ন দেশের গবেষকেরা তুলে ধরতে প্রয়াসী হন। তাঁরা দেখলেন লোককথা শুধুই শিশুমনের সামগ্রী নয়, এর মধ্যে লোকমানস, সামাজিক চেতনা, গোষ্ঠীচেতনা এবং মানুষের নানাবিধ আশা আকাঙ্ক্ষা জড়িত হয়ে থাকে। ফলে, লোকসাহিত্যের অন্যান্য প্রকরণের মত লোককথাও শুধু সাহিত্য হিসাবে নয়, নৃতত্ত্ব, সমাজবিদ্যা, ভাষাতত্ত্ব, মনোবিজ্ঞান অর্থাৎ জ্ঞানরাজ্যের বিবিধ শাখাতেই গুরুত্ব পেতে থাকে। লোককথার এ জাতীয় চর্চায় প্রথমেই স্মরণ করা যেতে পারে গ্রীম ভাইদের কথা। জার্মানীর প্রখ্যাত পণ্ডিত Jacob Grimm ছিলেন ভাষাতত্ত্ববিদ্। তিনি ভাষাতত্ত্বের গবেষণায় লোককথার পর্যালোচনার উপর গুরুত্ব আরোপ করলেন। অপর ভাই Wilhelm Grimm ছিলেন লোকসংস্কৃতিবিদ। দুজনের জগৎ ভিন্ন হলেও দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে একটা ঐক্য ছিল। লোককথার বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাঁরা অতীতের গৌরবময় যুগকে আবিষ্কার করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। তাঁদের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে পরবর্তীকালে বিতর্কের সৃষ্টি হলেও তাঁরা একটা সম্ভাবনার দিকে আলোকপাত করেছিলেন। এ থেকে বোঝা গেল লোককথার বাইরের রূপটাই শেষ কথা নয়, এর সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে আরও একটা অন্য জগৎ, যার পরিচয় নিহিত আছে, আভাসে-ইঙ্গিতে, রূপক ও সংকেতের মধ্যে।

গ্রীম ভাইদের পরবর্তীকালে লোককথার পর্যালোচনায় যাঁরা অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের অন্যতম ছিলেন ম্যাক্সমূলার। ম্যাক্সমূলারের তত্ত্ব সৌরতত্ত্ব বা Solar Theory নামে পরিচিত। আবার অনেকে গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন Mythological Method -এর উপর। তত্ত্বের নাম বা পদ্ধতি যাই হোক না কেন, এরা লোককথার ভিতর থেকে অন্যকথাকে আবিষ্কারে প্রয়াসী হয়েছিলেন। E.B Tylor, Andrew Lang, J. Frazer এর মত ব্রিটিশ গবেষকেরা Anthropological Method এর উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। আবার রুশ দেশের Historical Schoolএর অন্তর্ভুক্তরা লোককথার বিশ্লেষণে ঐতিহাসিক মতবাদের উপর নির্ভর করতে চেয়েছিলেন। লোককথার বিশ্লেষণে মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গির গুরুত্বও অপরিসীম। কার্ল মার্কস Critique of Political Economy গ্রন্থে কোন কোন প্রসঙ্গে লোককথা সম্পর্কে কিছু অভিমত প্রকাশ করেছিলেন, যার মধ্যে পরবর্তীকালের গবেষকেরা লোককথা পর্যলোচনার পথনির্দেশের ইঙ্গিত পেয়েছেন। এঙ্গেলস 'লোককথাকে নিছক শিল্পগত বিষয় হিসাবে না দেখে তার সামাজিক ভূমিকা অধ্যয়নের প্রয়োজনীতার দিকে'

বিশেষ গুরুত্ব আরোপের কথা বলেছিলেন। এ প্রসঙ্গে পল লাফার্গের নামটিও স্মরণ করতে হয়। লাফার্গ রচিত একটি বিখ্যাত গ্রন্থের নাম 'Sketches of the History of Primitive Culture'. এই গ্রন্থে "তিনি লোককথার ইতিহাসকে মানব সমাজের বিকাশের সাধারণ নিয়মগুলির সঙ্গে মিলিয়ে অধ্যয়নের চেষ্টা করেন। তিনি লোককথাকে সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবেশের পটভূমিতে বোঝার চেষ্টার উপর বিশেষ জোর দেন। তাঁর অর্থনীতি সংক্রান্ত রচনাবলীতে তিনি প্রায়ই লোককথার উপাদানের বিষয় উল্লেখ করেন, এবং তার তাৎপর্য, বিশেষভাবে যে সব জনসমষ্টির কোন লিখিত সাহিত্য নাই, তাদের অতীত বোঝার পক্ষে ঐ সব উপাদানের তাৎপর্যের কথা বলিষ্ঠভাবে উপস্থাপিত করেন।"[১] ম্যাক্সিম গোর্কী মনে করতেন লোককথার প্রাণবস্তু হল যুগে যুগে জনগণের সুখী, সুন্দর জীবনের স্বপ্ন সংগ্রাম। আবার ফ্রয়েডীয় মতবাদে বিশ্বাসী গবেষকেরা লোককথার মধ্যে খুঁজে পান ইচ্ছাপূরণ তত্ত্বকে।

'সমাজবিকাশের প্রক্রিয়ার পটভূমিতে' লোকমানসের প্রতিফলন প্রক্রিয়াকে অনুধাবনই হল লোককথা পর্যালোচনায় মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গির মূল কথা। মার্কসবাদী সমালোচকেরা মনে করেন— "লোককথার ভাণ্ডারকে দুটি প্রধান অংশে ভাগ করা যেতে পারে। একটি অংশকে বলা চলে অতীতের সঞ্চয় বা অবশেষ। এবং অপরটি হল প্রবহমান। লোককাহিনীগুলির মধ্যে উক্ত দুটি অংশের অস্তিত্ব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। অনেকগুলি কাহিনী একেবারে স্মরণাতীত আদিমকাল থেকে পুরুষানুক্রমে লোকমুখে চলে আসছে। ঠিক কখন সেগুলির উৎপত্তি, বা কারা সেগুলির রচয়িতা জানার বা নির্ণয় করার উপায় নেই। যুগ যুগ ধরে সংশ্লিষ্ট জনসমষ্টির যৌথ উত্তরাধিকাররূপে তা চলে আসে এবং সমাজের সমবেত সৃষ্টিরূপে বিবেচিত হয়...। তেমনি আবার প্রত্যেক যুগে নতুন নতুন কাহিনী সৃষ্টি হয়। পুরাতন কাহিনীর মধ্যে যোগ হয় নতুন নতুন উপাদান।... তারপরে লিখিত সাহিত্য সৃষ্টি হওয়ার পরে এ সব কাহিনীর কিছু কিছু পুঁথির পাতায় স্থান লাভ করে।

জীবন তথা সমাজের অগ্রগতির পরম্পরায় বিভিন্ন অধ্যায়ে ও পর্যায়ে অর্জিত অভিজ্ঞতা লোককথার মধ্যে প্রতিফলিত হয়। লোককথার এই আবহমানকাল ধরে প্রচলিত প্রবাহই সমস্ত দেশে নেপথ্য থেকে জাতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির উৎসরূপে কাজ করে। বিভিন্ন জাতির প্রাচীন মহাকাব্যগুলি লোকসাধারণের মধ্যে প্রচলিত কাহিনীগুলিকে অবলম্বন করেই গড়ে উঠেছে আর সেইজন্যেই উক্ত মহাকাব্যগুলিকে সংশ্লিষ্ট জনগণেরসমস্ত অন্তঃকরণের ইতিহাস আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে।"[২]

পূর্বোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একথা বলা যায় যে লোককথার জগৎ অলৌকিক অতিপ্রাকৃতের জগৎ হলেও এগুলি মর্ত্যের জীবনরস থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়। গভীরতর পর্যালোচনা ও বিচার বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে এর মধ্যে বিশেষ বিশেষ কিছু বাস্তবিক চিত্র আত্মগোপন করে আছে। বাংলার লোককথা

সম্পর্কেও এই বিশেষভাবে প্রযোজ্য। প্রাচীন বংলার সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন চিত্রের বিবিধ পরিচয় এগুলির মধ্যে নানাভাবে জড়িত হয়ে আছে। বিশদ পর্যালোচনার মাধ্যমে এ থেকে বাংলার সেকালের একটা রূপরেখা প্রণয়ন করা সম্ভব।

২

বাংলার লোককথার আর্থ-সামাজিক চিত্র

বাংলা লোককথায় অতীতের যে জীবনচিত্র প্রতিফলিত হয়েছে তাতে বোঝা যায় সেই যুগে রাজতন্ত্র বা সামন্ত্রতন্ত্র প্রচলিত ছিল। এই রাজা, জমিদার বা সামন্তপ্রভুরা ছিলেন দণ্ডমুণ্ডের কর্তা এবং একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী। রাজার কথাই শেষ কথা। রাজ্য পরিচালনার কাজে রাজাকে সহায়তা করেন মন্ত্রী, কোটাল এবং অন্যান্য রাজকর্মচারীরা। লোককথাগুলিতে সমাজের বিভিন্ন পেশার মানুষের কথাও স্থান পেয়েছে। প্রাচীন সাহিত্যে দেখা যায় নদীমাতৃক বাংলায় বাণিজ্য যাত্রা ছিল অন্যতম জীবিকা। এই সওদাগরেরা বিভিন্ন সময়ে নৌকা বোঝাই করা মালপত্র নিয়ে বাণিজ্যে বের হতেন। পথে তাঁরা নানাবিধ বিপদ-আপদের সম্মুখীন হতেন আবার সেই বিপদ থেকে মুক্তিলাভও করতেন। লোককথায় এই বিপদ ও বিড়ম্বনার কাহিনি স্থান লাভ করেছে ভিন্নভাবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা দৈব বা অলৌকিক শক্তির দ্বারা সংঘটিত হলেও বাণিজ্যযাত্রায় সওদাগরের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের বিবিধ দিকগুলি নানাভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে। বিভিন্ন লোককথায় স্থান পেয়েছে অতি সাধারণ মানুষের কথাও। এদের মধ্যে রয়েছে চাষী, তেলী. মালী, ধোপা, ছুতোর, তাঁতী বা জোলার মত বিভিন্ন পেশার সঙ্গে যুক্ত মানুষ। ব্রাহ্মণেরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দরিদ্র, এরা ভিক্ষাজীবী মানুষ। সমাজের বিবিধ স্তরে অবস্থানকারী এই সকল মানুষের মধ্যে জাতিগত বা বৃত্তিগত কারণে বিরোধের বিবরণ লোককথায় নেই। জাতপাতের ব্যবধান ভুলে সামাজিক অবস্থার তারতম্য ঘুচিয়ে মানুষে মানুষে আন্তরিক সম্পর্ক স্থাপনের কথা লোককথায় আছে। তাই রানীর সঙ্গে চামার বৌ (বিপত্তারিণী গল্প), কিংবা ব্রাহ্মণীর সঙ্গে গোয়ালিনীর সখীত্ব (হরিষমঙ্গলচণ্ডীর ব্রত), এতে বোঝা যায় লোককথার জগতে সামাজিক ভেদ বুদ্ধি বিশেষ গুরুত্ব পায়নি।

লোককথার একটা অংশে মুখ্যভূমিকা গ্রহণ করেছে পশু-পাখী চরিত্র। বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না যে এরা সমাজের বিভিন্ন মানুষকে প্রতিনিধিত্ব করেছে। লোককথার অন্যতম মুখ্য চরিত্র শিয়াল, কোন কোন গল্পে শিয়ালের সঙ্গে পণ্ডিত শব্দটি যুক্ত করা হয়েছে। সমাজ ব্যবস্থায় একদিকে যেমন শ্রমজীবী মানুষরা অবস্থান করে, তেমন পরশ্রমভোগী একটি গোষ্ঠীও ধীরে ধীরে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করতে শুরু করে। শ্রমজীবী মানুষের শারীরিকশক্তি যেমন বেশি, তেমনই তাদের মনটি হয় সহজ ও সরল। এরা বুদ্ধিমান মানুষদের সম্মান করে, তাঁদের কথা বিশ্বাস করে। শারীরিক

শক্তিতে পিছিয়ে থাকা এই সব বুদ্ধিমান চতুর মানুষদের দ্বারা সরল স্বভাবের মানুষেরা প্রায়শই প্রতারণা ও শোষণের শিকার হয়। সামাজিক সাম্য ও সুস্থিতির পক্ষে এরা বিপজ্জনক ভূমিকা পালন করে। লোককথার ধূর্ত শিয়াল এ জাতীয় শঠ মানুষেরই প্রতিনিধি। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ভাঁড়ুদত্ত বা মুরারি শীলের কথা। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় অশনি সংকেত উপন্যাসে গঙ্গাচরণ চরিত্রের মাধ্যমেও দেখিয়েছেন কিভাবে এরা সরল স্বভাবের মানুষদের ঠকিয়ে জীবন নির্বাহ করে থাকে। লোককথার ধূর্ত শিয়ালের কাছে নির্বোধ কুমীর বা প্রবল শক্তিশালী বাঘ সিংহও হার মানে। স্মরণ করা যেতে পারে বহুল প্রচলিত বানরের পিঠে ভাগ গল্পটি। বানরের মত ধূর্ত মানুষ জগতে যথেষ্ট পরিমাণেই অবস্থান করে। তারা বাদী-বিবাদীর বিরোধকে বাড়িয়ে দিয়ে অনেকসময় উভয়কেই সর্বস্বান্ত করে দেন। একালের উপন্যাসেও এধরনের বিবরণ দেখা যায়।

সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায়ত ক্ষমতার একচ্ছত্র অধিকারী সামন্ত প্রভু নানাভাবে প্রজাদের শোষণ ও নিপীড়ন করতেন। এর মধ্যে অর্থনৈতিক শোষণ যেমন আছে, তেমনই আছে অন্যবিধ অত্যাচার। নারীদেহের উপর আসক্তি সে কালের রাজা বা সামন্ত প্রভুদের স্বৈরাচারের অন্যতম নিদর্শন। সহস্র এক আরব্য রজনীতে কাহিনির সূত্রপাত হয়েছে সুলতানের নারী বিদ্বেষ এবং নারীদেহ সম্ভোগেচ্ছার বিবরণ দিয়ে। প্রতি রাতে একজন যুবতীকে সুলতানের কাছে পাঠাতে হোত। সারা রাত ধরে ভোগ লালসা চরিতার্থ করার পর প্রভাতে সুলতান সেই রমণীকে হত্যা করতেন। এক সময় অন্য রমণীকে খুঁজে না পেয়ে উজির নিজের কন্যাকেই সুলতানের কাছে পাঠাতে বাধ্য হন। বুদ্ধিমতী এই নারী সহস্র এক রজনী গল্প শুনিয়ে সুলতানের স্বভাব পরিবর্তন করেছিল। বাংলা ভাষাতেও এ জাতীয় প্রসঙ্গ আছে। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য 'বাংলার লোক -সাহিত্য' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে 'প্রশ্নোত্তর-বাচক' একটি ছড়াকে স্থান দিয়েছেন। নামে ছড়া হলেও এর মধ্যে একটা কথাবস্তু আছে। ছড়াটির অংশবিশেষ এইরূপ—

"দূত। রাজার খবর আইলো।
সব মেয়ে। কি খবর আইলো?
দূত। একটি বালিকা চাইল।" (২৪, প্রশ্নোত্তর বাচক।)

রাজা মশাইএর একটি বালিকা প্রয়োজন। এটা তিনি দূতের মাধ্যমে জানিয়েছেন। রাজার এই নির্দেশ প্রজারা মানতে বাধ্য। আপাতদৃষ্টিতে বিষয়টিকে মনোরঞ্জনের বিষয় বলে মনে হলেও রাজাদের নারী দেহ লোলুপতা এবং সেই আকাঙ্ক্ষাপূরণে প্রজাদের উপর অন্যায় ভাবে জুলুমের ইতিহাসই আভাসে ব্যক্ত হয়েছে।

লোক সমাজে দুর্বলের উপর প্রবলের অত্যাচারের এ জাতীয় বৃত্তান্ত রূপকের মাধ্যমে বাংলা লোককথায় নানাভাবেই ব্যক্ত হয়েছে। একটি লোককথায় দেখা যায় পশুরা সিংহের দাবি মেনে নিয়ে প্রতিদিন একটি করে পশুকে তার কাছে উপঢৌকন

হিসাবে পাঠাতে স্বীকৃত হয়েছিল। পশুরা সেই নির্দেশ মেনে নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে আত্মবলিদানের জন্য তার কাছে নিয়মিত পাঠাতে বাধ্য হয়েছিল। এই ভয়ানক বন্দোবস্ত থেকে পশুদের রক্ষা করেছিল একটি খরগোস। সিংহের তুলনায় খরগোস নিতান্তই দুর্বল ও নগণ্য এক প্রাণী। কিন্তু এই ক্ষুদ্র প্রাণীটির বুদ্ধিমত্তার কাছেই পরাজিত হল প্রবল শক্তি। এই গল্পটিতে একদিকে শোষণ-নিপীড়নের বিবরণ আছে, সেই সঙ্গে ব্যক্ত হয়েছে দুর্বলের প্রতিরোধ গড়ার আকুতি।

পূর্বে এদেশে বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। সমাজজীবনে পুরুষের বহুপত্নী গ্রহণের বিবরণ লোককথায় আছে। অনেক রূপকথার প্রারম্ভেই রাজার একাধিক পত্নীর কথা জানানো হয়, যথা— "এক যে ছিল রাজা— তার দুই রানী। বড় রানীর নাম দুয়োরানী আর ছোটর নাম সুয়ো রানী।" কোন কোন গল্পে রাজার পাঁচপত্নী বা সাতপত্নীর কথাও বলা হয়েছে। রাজা রাজ্যের সর্বেসর্বা, তিনিই আইন এবং সামাজিক বিধিবিধানের কর্তা। কিন্তু দরিদ্র ভিক্ষাজীবী ব্রাহ্মণেরও একাধিক পত্নী গ্রহণের তথ্য লোককথায় রয়েছে। যেখানে একাধিক পত্নী সেখানে সপত্নী বিরোধ থাকবেই। রূপকথারগল্পে দেখা যায় বহুপত্নীক রাজার রানীরা পরস্পরের মধ্যে নানাবিধ দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েছেন এবং ঈর্ষার বশবর্তী হয়ে তাঁরা নানাবিধ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছেন। একটি গল্পে দেখা যায় নিঃসন্তান রাজা এক ঘুঁটে কুড়োনির সুন্দরী কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। এই রানীর গর্ভে সন্তান জন্মের পর অপর রানীরা এমন ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করেছিলেন যে রাজা তাঁকে রাজপুরী থেকে বিতাডন করেছিলেন। সেকালে পুরুষেরা বিবাহের জন্য যে পাত্রী নির্বাচন করতেন তার অন্যতম শর্ত ছিল নারীর সৌন্দর্য। রূপকথার রাজা যেমন ঘুঁটে কুড়োনির মেয়েকে বিবাহ করেন তেমন তাঁর পত্নীদের মধ্যে স্থান পেয়েছে রাক্ষসকুলোদ্ভূতা রমণীও। অনুমান করা যেতে পারে সেকালে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত ছিল।

পুরুষের বহুবিহার জনিত কারণে অপর যে সমস্যাটির সৃষ্টি হত তা হল সতীনের পুত্রকন্যার প্রতি বিদ্বেষ ভাবনা। রূপকথার গল্পে সতীনের সন্তানের অনিষ্ট সাধনের বৃত্তান্ত অনেক রয়েছে। সাত ভাই চম্পা, বুদ্ধুভুতুম, লালকমল নীলকমল জাতীয় গল্পে সতীনের সন্তানের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে। লালকমলের রাক্ষসী সৎমা সতীন পুত্রের মাংস খাওয়ার জন্য প্রলুব্ধ হয়েছিল। লোককথার অন্যশাখা বিশেষত ব্রতকথাতেও এরকম দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে। সেখানে দেখা যায় যে সওদাগর ব্যবসার কারণে বাইরে গেলে তার প্রভাবশালী পত্নী দাসী বা অন্য কোনো দলভুক্ত ব্যক্তির দ্বারা সতীন এবং তাঁর পুত্র কন্যাদের উপর অকথ্য অত্যাচার করেছে।

সমাজের ধনবৈষম্যের দিকটিও নানাভাবে তুলে ধরা হয়েছে। যেমন রাজপুরীতে সম্পদ ঐশ্বর্যের ছড়াছড়ি সেখানে হাজারো দাসদাসী কাজ করে। কিন্তু সাধারণ মানুষ

দরিদ্র। লোককথায় যে ব্রাহ্মণেরা স্থান পেয়েছেন তাঁরা খুবই দরিদ্র এবং ভিক্ষাই তাঁদের জীবন ধারণের অন্যতম অবলম্বন। রূপকথার রাজপুত্র পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে সাতসমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে রাজকন্যাকে লাভ করে। কোনো প্রতিকূলতাই তার স্বপ্নভঙ্গের কারণ হতেপারে না। কিন্তু দরিদ্র ব্রাহ্মণের সামান্য স্বপ্ন পূরণ হওয়ার নয়। একটি গল্পে দেখা যায় মহাবিষুব সংক্রান্তিতে এক ব্রাহ্মণ যজমান বাড়ি থেকে এক পাত্র ছাতু পেয়েছিল। ব্রাহ্মণের স্বপ্ন বিবাহ করা এবং বহু সন্তান নিয়ে সুখে ঘর করা। কিন্তু অর্থাভাবে তাঁর সাধপূর্ণ হয়নি। তাই ছাতু পেয়ে আহ্লাদিত ব্রাহ্মণ ভেবেছিলেন এই ছাতু দিয়ে ব্যবসা করে তিনি অর্থের পরিমাণ বাড়াবেন এবং বিবাহ করে বহু সন্তানের জন্ম দেবেন। এটা ভাবতে ভাবতে ব্রাহ্মণ ঘুমিয়ে পড়েন এবং স্বপ্ন দেখেন তাঁর সন্তানেরা মারামারি করছে। ব্রাহ্মণ সেসময় লাঠি দিয়ে সন্তানদের শাসন করতে গেলেন, কিন্তু বাস্তবে ঘটে যায় বিপর্যয়। তাঁর লাঠির আঘাতে মাটির পাত্র ভেঙ্গে ছাতু ভূমিতে পড়ে নষ্ট হয়ে যায়। অর্থাৎ ব্রাহ্মণের স্বপ্নপূরণ হল না। কিন্তু রাজপুত্রের স্বপ্নপূরণ হয়। বোঝা যায় অর্থাভাবে দরিদ্রের বাসনা অপূর্ণ থাকার যন্ত্রণাটি এই গল্পের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে।

লোককথার বিভিন্ন আঙ্গিকে সমাজের আরোও বহু বিচিত্র কিছু দিক প্রতিফলিত হয়েছে। সন্তানের জন্মদানে ব্যর্থ জনক জননীর মুখ দেখা অশুভ। বিশেষত বাসীমুখে এদের মুখ দেখতে নেই। এমনকি রাজাও যদি আঁটকুড়ো হয় তাহলে তার মুখদর্শন করা থেকে মানুষ বিরত থাকতে চায়। একটি গল্পে দেখা যায় রাজবাড়ির মালী প্রভাতে উঠেই আগে আহার গ্রহণ করে তারপর রাজার বাড়ি যেত নিজস্ব কাজ করতে। এমনকি ফকির বা সন্ন্যাসীরাও আঁটকুড়ে পরিবার থেকে ভিক্ষা নিতে চাইতেন না। সন্তান, বিশেষ করে পুত্র সন্তান লাভের জন্য পুরুষেরা একের পর এক বিবাহ করে যেতেন। সমাজে নারীর নিরাপত্তা ছিল না বললেই চলে। রাজা অন্যের প্ররোচনায় বা নিজের সিদ্ধান্তে একজন রানীকে রাজপরিবার থেকে বিতাড়ন করে ঘুঁটে কুড়োনোর কাজে নিযুক্ত করতে পারেন। এমনকী একজন সাধরণ ব্যক্তিও পত্নী বা কন্যাকে সামান্য অপরাধের জন্য বনবাসে পাঠিয়ে দেন। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর অবকাশ এঁরা পান না। বিভিন্ন লোককথায় খাদ্যসামগ্রী এবং পূজা উপকরণের বিবরণ আছে। বিবিধ ব্রতকথায় স্থান পেয়েছে পিঠার প্রসঙ্গ। পূজার উপকরণের মধ্যে পান, সুপারি. কলা, আতপ চালের গুঁড়ো প্রভৃতি ব্যবহারের কথা আছে। মানুষের পরিচয় হিসাবে ব্যক্তিনামের বদলে ব্যবহার করা হয়েছে পেশা বা বৃত্তিকে।

এভাবেই বাংলার লোককথায় বাংলার সামাজিক জীবনের চিত্র বিক্ষিপ্ত হলেও স্থান পেয়েছে। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য লোককথার আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন.... "লোককথার সংগ্রহ যত আধুনিকই হুউক না কেন, ইহা সর্বদাই একটি অতি প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারা অনুসরণ করিয়া থাকে; সেইজন্য ইহাদের মধ্যে সমাজ জীবনের বহু

বিস্তৃত আচার আচরণের সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারা যায়। ইহাদের ভিতর দিয়া জাতীয় সমাজ জীবনের অগ্রগতির ধারাটি অনুসরণ করিবার সুযোগ হয়... লোক-শ্রুতি (Folklore) সামাজিক বা সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বেরই একটি অংশ এবং লোককথা জাতির লোক শ্রুতিরই অন্যতম বিভাগ, মানব-সমাজের সাংস্কৃতিক জীবনের ক্রমবিকাশের ধারার সঙ্গে লোক-কথার ক্রমবিকাশের ধারা জড়িত।"[৩] তিনি আরো বলেছেন, "বাংলার ব্রতকথাগুলির মধ্যদিয়া বাঙ্গালীর জীবন ও চরিত্রের যে বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা আর কিছুর মধ্যেই প্রকাশ পায় নাই। বিশেষত ইহারা নানা বিষয়ে রক্ষণশীল বলিয়া বাঙ্গালীর সমাজ ও আচার জীবনের এক অতি প্রাচীন রূপ ইহাদের মধ্য দিয়াই সার্থকতমভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। দেবতার কথা ইহাদের মধ্যে অবান্তর মাত্র। সমাজ ও মানুষই ইহাদের মধ্যে মুখ্য।"[৪]

৩
একটি লোককথা বিশ্লেষণ

লোককথায় সমাজ ও অর্থনৈতিক প্রসঙ্গ যে স্থান লাভ করে তার সার্থকতম নিদর্শন হল লক্ষ্মীর পাঁচালী। লোককথার প্রকাশ মাধ্যম মূলত গদ্য। প্রধান পুরুষ বা রমণীরা লোককথা পবিবেশন করেন। তবে, এক্ষেত্রে নারীর ভূমিকাই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। রেভারেণ্ড লালনবিহারী দে "Bengal Peasant Life' গ্রন্থে দেখিয়েছিলেন যে শম্ভুর মা নামের এক গ্রাম্য বৃদ্ধার মুখে গল্প শুনেই চাষী বালক গোবিন্দ প্রতি সন্ধ্যায় বেশ কয়েক ঘণ্টা সময় কাটিয়ে দিত। তৎকালীন একজন ইংরেজ প্রশাসক এই বৃত্তান্ত পড়ে লালবিহারী দে কে পত্রে জানিয়েছিলেন ভারতবর্ষের বৃদ্ধারা ছোট ছেলেমেয়েদের যে সমস্ত গল্প শুনিয়ে থাকেন সেগুলি সংগ্রহ করে একটা সংকলন গ্রন্থ তৈরি করলে তা খুবই হৃদয়গ্রাহী হবে। লালবিহারী দে 'FolkTales of Bengal' গ্রন্থের মুখবন্ধে-এ প্রসঙ্গে জানিয়েছিলেন যে শম্ভুর মা কোনো একজন রমণী নয়, হাজার হাজার শম্ভুর মা এভাবেই ছোট বালক বালিকাদের সামনে গল্প পরিবেশন করেন। গল্প বলার মাধ্যমটি ছিল গদ্য, মাঝে মাঝে গল্পের প্রয়োজনে ছড়া। কিন্তু লক্ষ্মীর পাঁচালী ছন্দোবদ্ধে রচিত। এই কথাগুলিকে গদ্যেও বলা যেতে পারত। একটি লোককথার মধ্যে যে বৈশিষ্ট্যগুলি বিরাজ করে তা লক্ষ্মীর পাঁচালী গ্রন্থেও লক্ষ্য করা যায়। তাই এর অপর নাম লক্ষ্মীর ব্রতকথা। এই গ্রন্থে বাংলার সমাজচিত্র অর্থনৈতিক পরিবেশ এবং লোকশিক্ষার বিবিধ দিকগুলি ব্যক্ত হতে দেখা যায়।

'লক্ষ্মীর পাঁচালী'র প্রথম দিকে নারদের উক্তিতে মর্ত্যবাসীদের অসহায় অবস্থার একটা চিত্র পরিবেশিত হয়েছে। নারদ বলেছিলেন—

"অন্নাভাবে শীর্ণকায় বলহীন দেহ।
সেই কষ্টে আত্মহত্যা করিতেছে কেহ।।

কেহ প্রিয় প্রাণাধিক পুত্রকন্যাগণে।
করিতেছে পরিত্যাগ অন্নের কারণে।"

স্পষ্টতই দেখা যায় এখানে, মর্ত্যবাসীর (বাঙালির) বেদনাময় জীবনচিত্র ফুটে উঠেছে। এর কারণ ব্যাখ্যা করে লক্ষ্মী উত্তর দিয়েছিলেন—

"শাস্ত্র নাহি মানে দেখ মত নারীনর।
অশাস্ত্রকে শাস্ত্র জ্ঞান করে নিরন্তর।।
....
নিজধর্ম নিজশিক্ষা দিয়া বিসর্জন।
পরধর্ম পরশিক্ষা করিছে অর্জন।"

স্পষ্টভাবে বোঝা যায় ভিন্নজাতির সংস্পর্শে এসে বাঙালির সাংস্কৃতিক-সামাজিক জীবনে পরিবর্তন ঘটছে। তারা নিজের ধর্ম নিজের শিক্ষাকে বর্জন করে অপরের ধর্ম ও সেই শিক্ষাকে গ্রহণ করছে। সমাজ বিজ্ঞানে acculturation শব্দটি প্রচলিত। এর ভালমন্দ দুটি দিকই আছে। এই পাঁচালী রচনার তারিখ জানা যায় না। তবে রচয়িতা সম্ভবত পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রতি বঙ্গের শিক্ষিত জনের অত্যধিক আগ্রহের প্রতি আলোকপাত করেছেন।

লক্ষ্মীর ব্রতকথায় এদেশের পারিবারিক জীবনের আদর্শ কি হওয়া উচিত, ব্যক্তিগত জীবনচর্যা কেমন হবে, পরিবারের অন্য সদস্যদের প্রতি বধূরা কি আচরণ করবে তারও ইঙ্গিত রয়েছে। যথা—

ক) "দিবানিদ্রা অনাচার ক্রোধ অহংকার।
আলস্য কলহ মিথ্যা ফিরিছে সংসার।"
খ) "শ্বশুর শাশুড়ি প্রতি নহে ভক্তিমতী।
কটু বাক্য কহে সদা তাহাদেরই প্রতি।।
পতির আত্মীয়গণে না করে আদর।
থাকিছে চাহয়ে সদা হয়ে স্বতন্তর।।"

শ্বশুর শাশুড়ির প্রতি শ্রদ্ধা, স্বামীগৃহের আত্মীয়স্বজনকে নিজের করে নিয়ে সংসারকে সুখী করাই বাংলা সমাজ জীবনের সনাতন আদর্শ। কিন্তু মানুষ এই আদর্শ থেকে বিচ্যুত হচ্ছে। একান্নবর্তী পরিবার ভেঙ্গে যাচ্ছে। স্বামীর মৃত্যুর পর সংসারের গৃহিণীকে চরম অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়। এই পাঁচালীর এক অংশে আছে—"সাত পুত্র সাত হাঁড়ি হয়েছে এখন/ সতত বধূরা মোরে করে জ্বালাতন।" লক্ষ্মীর পাঁচালীর আর এক অংশে বলা হয়েছে—

"লক্ষ্মীর ভাণ্ডার স্থাপি প্রতি ঘরে ঘরে।
রাখিবে তণ্ডুল তাহে একমুষ্টি করে।।
সঞ্চয়ের পন্থা ইহা জানিবে সকলে।

অসময়ে উপকার পাবে এর ফলে।।"

পরিবার তথা দেশের উন্নতির জন্য সম্পদের প্রয়োজন। আর পুঞ্জীভূত স্বল্প সঞ্চয় থেকেই তৈরি হয় দেশের মূলধন। সমাজ ও অর্থনীতির এই মূল বার্তাটিকে লক্ষ্মীর ব্রতকথায় অপরূপভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

৪

লোককথায় ভৌগোলিক পরিবেশ ও জাতি সত্তা

Ecology এবং Ethnic Character এর সঙ্গে সামগ্রিকভাবে লোকসংস্কৃতি ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। লোকসংস্কৃতির অন্যতম অঙ্গ লোকসাহিত্য। আবার লোক-সাহিত্যের উপবিভাগ হল লোককথা। পূর্বে লোককথার যে দৃষ্টান্তগুলি উল্লেখ করা হয়েছে কিংবা যার মধ্য থেকে বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থার রূপরেখা নির্মাণের প্রয়াস সাধিত হয়েছে সেগুলি মূলত পূর্ব, মধ্য এবং দক্ষিণবঙ্গে বিশেষভাবে প্রচলিত। মুদ্রণশিল্প এবং আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে এই লোককথাগুলি গ্রন্থাকারে অথবা বৈদ্যুতিন মাধ্যমকে অবলম্বন করে বাংলার সমগ্র অঞ্চলেই প্রসার লাভ করেছে। কিন্তু বাংলার লোককথার আরো বিশাল ভাণ্ডার ছড়িয়ে রয়েছে রাঢ় অঞ্চলে এবং উত্তরবঙ্গের মত স্থানে। অধ্যাপক ডঃ সুধী শঙ্কর ভট্টাচার্য এবং হিমাদ্রি শঙ্কর ভট্টাচার্য কোচবিহার থেকে কিছু প্রাচীন ব্রতকথা সংগ্রহ করে 'কোচবিহারের প্রাচীন ব্রতকথা' নামে প্রকাশ করেছিলেন। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৮৩ খ্রীঃ এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। আবার সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় "দলিতের আখ্যানবৃত্ত" নামে একটি লোককথা সংগ্রহ (মৃত্তিকা ২০০৫) প্রকাশ করেছিলেন। এরমধ্যে আদিবাসী এবং তপশিলী সম্প্রদায় মধ্যে প্রচলিত অনেকগুলি লোককথা স্থান লাভ করেছে। অবশ্য এ সম্পর্কে ইংরেজি ও বাংলাভাষায় রচিত হয়েছে আরও অনেক গ্রন্থ। এ সকল গ্রন্থে পশ্চিম সীমান্ত বাংলা এবং ঝাড়খণ্ড অঞ্চলে প্রচলিত লোককথা স্থান পেয়েছে। এগুলির সঙ্গে পূর্ব-মধ্য এবং দক্ষিণবঙ্গে প্রচলিত লোককথার জীবন চিত্রের পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

'কোচবিহারের প্রাচীন ব্রতকথা' গ্রন্থে 'দায়ো-বায়ো' নামে একটি লোককথা বর্ণিত হয়েছে। গল্পটি নানা দিক থেকেই বিচিত্র উপাদানে পুষ্ট। এক ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীকে নিয়ে রচিত হয়েছে এই গল্প। ব্রাহ্মণ গরীব, তার 'কামালী রাখার ক্ষমতা নাই।' ঘরের যাবতীয় কাজ করার সময় ব্রাহ্মণী ছাত্রদের ঘর-বিছানা পরিষ্কার করলে তাদের পাপহয় এটা বিবেচনা করে তারা সবাই মিলে চাঁদা তুলে ব্রাহ্মণের হাতে দিয়ে বলল— 'গুরু এই টাকা দিয়া একজন কামালী কিনি আনো।" হাটে মানুষ বিক্রি হয়, ব্রাহ্মণ গেলেন সেখান থেকে কামালী কিনতে। ব্রাহ্মণী এসময় ব্রাহ্মণকে পরামর্শ দিয়ে বলেন— "এক আনেন হাঁটুর জোকা (সমান) ছাওয়ার বয়সী, আর না হয় মায়ের বয়সী। মধ্যবয়সী কামালী না আনেন।"

সেদিন হাটে মধ্যবয়সী ছাড়া আর কোন রমণী পাওয়া গেল না। ব্রাহ্মণ একজন ভরযুবতী শূদ্রানীকে কিনে আনলেন। ব্রাহ্মণী এজন্যে স্বামীকে তিরস্কার করে বললেন— "পাছৎ (পরে) ইহার ঠ্যালা সামলান"। এর কিছুদিন পর শূদ্রানী ঋতুমতী হল। ব্রাহ্মণ এটা বুঝতে পেরে শূদ্রানীর ঘরে রাত্রিযাপন করলেন এবং শূদ্রানী গর্ভবতী হল। গর্ভসঞ্চারের পর থেকে সন্তান প্রসবের পূর্ব পর্যন্ত ব্রাহ্মণের পত্নী শূদ্রানীকে নানা ভাবে বিব্রত করতে সচেষ্ট হয়। কিন্তু ব্রাহ্মণের সতর্কতায় সব বিপত্তি অতিক্রম করে শূদ্রানীর একটি কন্যা সন্তান হয়। তার নাম দায়ো। দুই বছর পর শূদ্রানী আবার গর্ভবতী হয় এবং এবারও সে একটি কন্যা সন্তানের জন্ম দেয়। এই মেয়েটির নাম রাখা হয় বায়ো। এরপরও দায়োবায়োকে নিয়ে গল্প এগিয়ে চলে।

এই গল্পের মধ্যে রয়েছে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ—

ক. হাটে মানুষ বিক্রি হয়। সেখান থেকে দাস-দাসী কেনা যায়।

খ. ব্রাহ্মণ পরিবারে কাজকর্মের জন্য শূদ্র কন্যাকে স্থান দেওয়া হয়েছে।

গ. ব্রাহ্মণ এই দাসীর সঙ্গে সহবাস করেছেন এবং শূদ্রানীর গর্ভে ব্রাহ্মণের দুটি সন্তানের জন্ম হয়েছে।

ঘ. সমাজ এই ঘটনা জানে এবং এজন্য ব্রাহ্মণ বা শূদ্রানী দাসীকে কোনরূপ সামাজিক পীড়ন সহ্য করতে হয়নি।

ঙ. গল্পের সঙ্কট তৈরি হয়েছে সমাজ ব্যবস্থার কারণে নয়, সপত্নীর প্রতি ঈর্ষার কারণে।

চ. দায়ো-বায়োর কাহিনিটি দীর্ঘ। তাতে স্থান পেয়েছে বিবিধ সমাজচিত্র এবং সামাজিক আচার অনুষ্ঠান। নারী গর্ভবতী হলে কোন মাসে কি কি আচার অনুষ্ঠান পালন করা হয় তা নৈপুণ্যের সঙ্গে প্লট নির্মাণে ব্যবহার করা হয়েছে।

অর্থাৎ এই লোককাহিনিতে একটি নির্দিষ্ট এলাকার জনগোষ্ঠীর জীবনচর্যার বিশিষ্ট রূপটি ধরা পড়েছে। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সামাজিক রীতিনীতির পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু লোককথায় পুরাতন জীবনবোধ অস্তিত্ব রক্ষা করে থাকে। একটি বিশেষ জাতিগোষ্ঠীর (Ethnic Group) জাতিসত্তার স্বরূপ উদ্ঘাটনে এ জাতীয় লোককথা বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করতেপারে।

অনুরূপভাবেই লোককথার মধ্যে ভৌগোলিক প্রতিবেশের (Ecology) পরিচয়টিও জড়িত হয়ে থাকে। পৃথিবী এবং মানবের জন্ম কাহিনি সম্পর্কে সাঁওতালদের মধ্যে লোককথা প্রচলিত আছে। নানাবিধ গ্রন্থে কিছুটা রূপভেদের মাধ্যমে গল্পটি পাওয়া যায়। 'দলিতের আখ্যানবৃত্ত' গ্রন্থে এই কাহিনির শেষে বলা হয়েছে—"এইভাবে মাটি গঠনের পরও জলের যে ফেনা অবশিষ্ট ছিল, ঠাকুর তাতে বেনা বীজ বুনলেন; তারপর দূর্বাঘাস, করমগাছ, শাল,মহুয়া ইত্যাদি সর্বপ্রকার গাছ।তখন সেই বেনাঝোপে হংস যূথ বাসা বাঁধল এবং হাঁসলির ডিম থেকে মনুষ্য

সন্তান জন্মাল। তাদের নাম পিলচু হাড়াম আর পিলচু বুড়ি।"[৫]

লক্ষণীয় যে এই কাহিনি যেখানে মর্ত্যলোকের কথা বলছে, সেখানে স্থান পেল মানুষের চেনা জগৎ, পরিচিত প্রকৃতি। তাই পরিবেশ বর্ণনায় করমগাছ, শাল, মহুয়া গাছই গুরুত্ব পেল। ধন, মান, সরযে জাতীয় শস্যের কথা নেই। পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গে প্রচলিত অন্যান্য লোককথাতেও প্রকৃতি, মানুষ এবং জীবনচিত্রের যে পরিচয় পাওয়া যায় তার একটা নিজস্ব পরিচিতি আছে। করম, বাঁধনা, টুসু, ভাদু, —এরকম বিবিধ লোকউৎসবের সঙ্গে যে সকল কিংবদন্তি বা গল্প কথা জড়িত হয়ে আছে তার মধ্যে একটা নিজস্বতা আছে। লোককথার বিজ্ঞান সম্মত বিশ্লেষণে এ ভাবেই একটি বিশেষ অঞ্চলের ভৌগোলিক পরিবেশ, জাতিবিশেষের জীবনচর্যা এবং জীবনবোধ, সেই সঙ্গে তাদের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কেও অবহিত হওয়া যায়

৫
কথাটি ফুরোল

মানুষের চেতনা পরিপুষ্ট হয় তার পারিপার্শ্বিক চেনা জগৎ এবং জীবন থেকে। মানুষের সৃষ্টিকর্মে এই অভিজ্ঞতার প্রকাশ ঘটে কখনও সরাসরি, কখনও বা রূপক প্রতীকের সহায়তায়। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত বস্তুবাদী সমালোচক George Thompson এর একটি অভিমত স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন— "Thought is a function of the brain, which is a material organism. Matter exists without thought, but there can be no thought without Matter."[৬] অভিমতটি যথার্থ। একারণেই দেখা যায় মানুষ দেবলোকের চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে মর্ত্যলোকের অভিজ্ঞতাকেই আশ্রয় করে। এভাবেই Illusionএর মধ্যে থাকে Realityর ভিত্তি ভূমি। তবে এই Reality সর্বদা স্পষ্টভাবে বোধগম্য হয়না। কথাটি লোককথা সম্পর্কেও প্রযোজ্য। ধাঁধা, প্রবাদ, ছড়ার মত লোকসাহিত্যের অন্যান্য প্রকরণে সমাজচিত্র এবং অর্থনৈতিক অবস্থা যেভাবে ব্যক্ত হয়, লোককথায় সেভাবে তার প্রকাশ ঘটেনা। তাই অনেক সময় মনে হয় লোককথা, বিশেষত রূপকথা, উপকথা, ব্রতকথাগুলি অবাস্তব বা আজগুবি। যেখানে দেবতা- দানব-মানবের মধ্যে কোন ভেদ নেই। জীবন-মৃত্যু, সৃষ্টি ও ধ্বংসের মধ্যবর্তী ব্যবধান নেই বললেই চলে। মৃত ব্যক্তি সহজেই পুনর্জীবন লাভ করতে পারে। ডুবে যাওয়া সম্পদ অলৌকিক মহিমায় পূর্বাবস্থায় ভেসে উঠে। বাঁদর, প্যাঁচা মানুষে রূপান্তরিত হতে পারে এবং রাজপুত্র অসাধ্য সাধন করে তার মনের মানুষ রাজকন্যাকে পায় প্রভূত ধন সম্পদ ও রাজ্য সহ। তৎসত্ত্বেও একথা অনস্বীকার্য যে এর মধ্যেও রয়েছে বাস্তবের উপকরণ। মর্ত্যমানবের 'আবেগ-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন'।

তবে রূপকথা জাতীয় লোককাহিনির অন্তরালে যে বাস্তব চিত্র রয়েছে তার প্রকৃতিটি কিছুটা স্বতন্ত্র। এই বিষয়টিকে সার্থকভাবে বিশ্লেষণ করেছেন প্রখ্যাত সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। 'রূপকথা' শীর্ষক এক প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন— "আমাদের বঙ্গদেশের সামাজিক ব্যবস্থা ও বিচারের এক সম্পূর্ণ ছবি এই রূপকথার মধ্যে প্রতিফলিত হইয়াছে। সমস্ত রূপক ও বর্ণনার বাহুল্যের অন্তরালে আমাদের বঙ্গদেশের পরিবার ও সমাজের একটি নিখুঁত ছবি ইহার মধ্যে পাওয়া যায়। আমাদের বহুবিবাহ, আমাদের গৃহের সপত্নী-বিরোধ, সপত্নী পুত্রের প্রতি বিমাতার অত্যাচার, রূপসী প্রণয়িনীর মোহ ও পরিশেষে সেই মোহভঙ্গ, আমাদের শঠতা ও বিশ্বাসঘাতকতা ইত্যাদি আমাদের পারিবারিক জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি কল্পনার উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত হইয়া আমাদের সম্মুখে দেখা দেয়।"[৭] এই অভিমত সামগ্রিক ভাবে বাংলার লোককথার সকল শাখা সম্পর্কেই প্রযোজ্য। রূপকথার গল্পে রাজকন্যা ও রাজপুত্রের মিলনের মাঝে প্রতিবন্ধকতার প্রাচীর তৈরি করে রাক্ষস। বাস্তব জীবনে এই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয় নানাবিধ কারণে। রাজপুত্র-রাজকন্যা ও রাক্ষসীর ষড়যন্ত্র তাই একালের মানুষের কাছে রূপক বলেই প্রতিভাত হয়। তবে যারা এই রূপকার্থ অনুধাবনে সক্ষম নন, তাদের অবচেতনেও পরোক্ষে এই বোধ কাজ করে। সেই সঙ্গে সক্রিয় থাকে জাগতিক জীবনের সীমাবদ্ধতা এবং ইচ্ছাপূরণের আকাঙ্ক্ষা।

উল্লেখ পঞ্জী

১. সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার, 'মার্কসীয় দৃষ্টিতে লোকসংস্কৃতি', ১৯৮৬, মনীষা, পৃ:১৩

২. প্রাগুক্ত— পৃ.১৯

৩. আশুতোষ ভট্টাচার্য, 'বাংলার লোকসাহিত্য' (চতুর্থ খণ্ড-কথা), ১৯৬৬, নিবেদন অংশ।

৪. প্রাগুক্ত

৫. সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'দলিতের আখ্যানবৃত্ত,' মৃত্তিকা, ২০০৫, পৃ:১০

৬. George Thompson, Human Essence, 1947, page 1

৭. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'রূপকথা', 'একালের সমালোচনা সঞ্চয়,' (ক.বি).

লোককথা জীবন্ত দলিল

লীনা চাকী

লোককথাগুলি বিশ্লেষণ করতে গেলে দেখা যাবে সব কাহিনিতেই আছে অসম্ভবের কথা। আজগুবি বা কল্পিত বিষয়, যা সত্য ঘটনা হতে পারে না। তবুও এর মধ্যে সত্য আছে যা রূপকের আশ্রয়ে প্রকাশ হয়ে পড়ে। এইসব লোককথার জন্ম মানুষের মুখে মুখে, যাকে আমরা মৌখিক সাহিত্য বলি। কিছু নৃ-বিজ্ঞানী, ধর্মযাজক ও উৎসাহী মানুষ সেগুলিকে লিখিত রূপ দিয়েছেন। হাজার হাজার লোককথা এভাবেই সংগৃহীত ও প্রকাশিত হয়েছে। অবশ্য এই কাজটি মূলত হয়েছে ইউরোপিয়ান দেশগুলিতে। আমাদের দেশেও এই কাজটি হয়েছে, কিন্তু কিঞ্চিৎমাত্র। এখনও মুর্শিদাবাদ জেলায় গল্পবলার মানুষ আছেন যাঁরা মুখে মুখে তাৎক্ষণিক চেষ্টায় গল্প বলে যেতে পারেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

এখানে মূল আলোচনার বিষয় লোককথার মধ্যে রূপকাশ্রিত যে ঘটনাবলী তার স্বরূপ সন্ধান করা।

একটি পশুকথার উল্লেখ করি। সিংহ ও খরগোশ। গভীর বনে এক অত্যাচারী সিংহ ছিল। সে এন্তার পশু হত্যা করত। রোজই তার নতুন নতুন খাদ্য চাই। বনের পশু প্রায় শেষ। তখন পশুরা সভা করে সিংহের হাত থেকে বাঁচার উপায় খুঁজতে লাগল। প্রতিদিন একটা করে পশু সিংহের খাদ্য হয়। সেদিন পালা পড়ল এক খরগোশের। খরগোশ বুদ্ধি করে সিংহকে বলল, "মহারাজ আপনি আমাকে খাবেন বলছেন কিন্তু ওই কুয়োর মধ্যে আর একটা সিংহ আমাকে খেতে চায়"। সিংহ হুংকার দিয়ে বলল, কে সে? খরগোশ কুয়োর কাছে সিংহকে নিয়ে গিয়ে বলল, "আপনিই দেখুন," বোকা সিংহ কুয়োর জলে নিজের ছায়া দেখে ভাবল আর একটা সিংহ। রাগের চোটে সে কুয়োয় ঝাঁপ দিল ও মারা গেল।

এই গল্পের মধ্যে প্রত্যক্ষ আছে অত্যাচারী সিংহের কথা। নীতিকথাও হতে পারে। যেমন কর্ম তেমন ফল। কিন্তু পরোক্ষে আমরা খুঁজে পাই এক সামন্ত প্রভুকে। সে অত্যাচারী ও তার রাজ্যের প্রজাদের উৎপীড়ন করে। প্রজারা রাজাকে খাজনা দিতে বাধ্য হয়। সেই খাজনা দেওয়া হয়ত কৃষকটির পক্ষে কষ্টকর। কিন্তু সামন্তপ্রভু তো সেসব মানে না। তার খাজনা চাই-ই। এটা একটা বাস্তব চিত্র যে প্রজারা অত্যাচারী, অবুঝ প্রভুর হাত থেকে নিষ্কৃতি চায়। তার মৃত্যু কামনা করে। খাজনার রূপক হল পশুভেট। এই পর্যন্ত কাহিনি সত্য। তারপরেই আছে কৃষকদের মনোবাসনার প্রকাশ।

প্রজারা তো সামন্তপ্রভুকে মেরে ফেলতে পারে না। এই ইচ্ছাপূরণ তাদের বাস্তব জীবনে সম্ভব নয়। কিন্তু কল্পনায় তার মৃত্যু ঘটিয়ে মনের বাসনা পূর্ণ করতেই পারে। এইটাই কাহিনিতে সম্ভব হয়েছে। সামন্তপ্রভুর মৃত্যু ঘটিয়ে তারা নিজেদের ইচ্ছাপূরণ করেছে।

এ সম্পর্কে দিব্যজ্যোতি মজুমদার বলছেন, 'ঐতিহাসিক বস্তুবাদী এই পদ্ধতি যে ইতিহাসসম্মত ও বিজ্ঞাননির্ভর তা কোনোভাবেই অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের বাইরে এই পদ্ধতির প্রয়োগ ক্ষীণ হয়ে আসছে। লোকসংকৃতিবিদরা এই পদ্ধতিকে খুব খোলামনে গ্রহণ করতে পারেননি। আসলে এই পদ্ধতির সঙ্গে রাজনৈতিক মতাদর্শের সম্পর্ক এতই গভীর যে পণ্ডিতগণ এই পদ্ধতি সম্পর্কে বেশ দ্বিধান্বিত হয়ে পড়েন। .....খুব স্বাভাবিক কারণেই নির্ভেজাল পণ্ডিতকুল রাজনৈতিক মতাদর্শকে এড়িয়ে লোকসংস্কৃতির বিশ্লেষণ করতে চান। ...এই পদ্ধতির প্রয়োগ নিয়ে যত মতভেদই থাকুক না কেন, লোকসাহিত্য বিশেষ করে লোককথার ঐতিহাসিক-সামাজিক বিশ্লেষণে এই পদ্ধতি নিঃসন্দেহে একটি যুগান্তকারী ও উল্লেখযোগ্য সংযোজন।' বাংলা লোককথার টাইপ ও মোটিফ ইনডেক্স, পৃঃ ৩৮)

এই পদ্ধতিকে মেনে নেওয়ার ফলে বহু লোককথার মধ্যে সামাজিক ও রাজনৈতিক দিকটি প্রকাশ পেয়েছে।

কিন্তু পশুকথার মধ্য দিয়ে যে লোককথাগুলি দেখি সেগুলি নিয়ে সংশয় জাগতে পারে। এই পদ্ধতি বা পশুনামের কারণ কি? কিছু কারণ অনুমান করা যায়। আদিম অধিবাসীদের কাছে পশু ছিল পূজ্য। পশুকে তারা মানবসমাজের একটা অংশ বলে ভাবত। বেদ, উপনিষদেও পশুনামের আড়ালে কোনও কোনও দেবতাকে দেখা যায়। ঋষিদের নাম যে পশুনামেও হত তার উল্লেখ করছেন দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'লোকায়ত দর্শন' গ্রন্থে— 'ঋগ্বেদে একদল মানুষের উল্লেখ রয়েছে যাদের পরিচয় হল অজ। অজ মানে ছাগল। আর একদন মানুষের খবর পাওয়া যাচ্ছে যাদের নাম হল নিগ্রু বা সজনে। আবার একদল মানুষের নাম হল মৎস্য। এহেন মাছ-নামধারী মানুষ নিশ্চয়ই ভারতবর্ষের নানা জায়গায় এবং নানান যুগে বাস করতো। .....বৈদিক সাহিত্যে প্রসিদ্ধ কয়েকটি ঋষি-নাম হল: কৌশিক মাণ্ডুক্যেয়, গোতম, বৎস, শুনক ইত্যাদি। কৌশিক মানে প্যাঁচা, মাণ্ডুক্যেয় মানে ব্যাঙের বাচ্চা (ব্যাঙাচি), গোতম মানে ষাঁড়, বৎস আর শুনক?

ঋষি-নাম হিসেবে 'শুনক' দেখে সত্যিই আর অবাক হবার অবকাশ নেই। কেননা ছান্দোগ্য-উপনিষদে আপনি এই নামেরই মানুষদের সামগান গাইতে দেখেছেন। শুনক মানে কুকুর'। (পৃ ১৩২-১৩৩)

এর ব্যাখ্যা হিসেবে তিনি বলছেন, 'জন্তু জানোয়ারের নাম থেকে নামকরণ করবার এই প্রথাটি আমাদের দেশে টিঁকে রয়েছে শুধুমাত্র প্রাচীন পুঁথিগুলির মধ্যে নয়, দেশের

পিছিয়ে-পড়া অঞ্চলের বাস্তব সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যেও। .... এ কি শুধুই আমাদের দেশের মানুষদের একটা বৈশিষ্ট্য নাকি? আসলে তা নয়। এ হল মানব জাতিরই সমাজ-সংগঠনের এক আদিম পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য।' (ওই, ১৩৩-১৩৪)।

দিব্যজ্যোতি মজুমদার বলছেন, 'পশুপাখি দেবতার সুদৃঢ় আসন দখল করেছে। আজকের অগ্রসর মানুষের কাছে আদিম মানুষের পশুপুজো বিষয়টি কিছুটা অদ্ভুত লাগতে পারে, কিন্তু বর্তমানকালের মানুষের মধ্যেও যে এর রেশ রয়ে গিয়েছে অভ্যাশবশত আমরা তা খেয়াল করি না। সেকালে পশু কখনও অবিকৃত আকারে আবার কখনও রং-চঙ চড়িয়ে সামান্য অন্যভাবে পূজিত হত। ভিন্ন ভিন্ন সমাজে ভিন্ন ভিন্ন পশুপুজোর প্রচলন ছিল। যে এলাকায় যে পশু পাওয়া যায় না সেই পশুর কোনও ধারণা না থাকার ফলেই সেরকম পশু পূজিত হত না কিংবা তাকে নিয়ে পশুকথাও গড়ে ওঠে না।' (ওই পৃ ৬৪)

বেশিরভাগ লোককথা, যা আদিম অধিবাসীদের সেকালের জীবনযাত্রা থেকে উঠে এসেছে, সেসবে প্রাধান্য দেখা গেছে পশুর, যার ধারা পরবর্তীকালেও দেখা গেছে। খরগোশ ও সিংহের গল্পে তাই অনায়াসে ঢুকে গেছে এক বুদ্ধিমান খরগোশ ও অত্যাচারী সিংহের কথা। যারা আসলে মানুষ। শোষক ও শোষিতের একটা রূপ সেখানে প্রকাশ পেয়েছে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি গল্প বলা যায়। মাঠে ধান ফলেছে। দুই প্রতিবেশী শেয়াল আর নেকড়ের খুব আনন্দ। সারাবছর তাদের আর খাওয়ার চিন্তা নেই। কিন্তু এরজন্য খাটুনি আছে। তাই তারা তাদের পড়শী ভালুককে ডেকে নিল।

ধান কাটা হয়ে গেল, কিন্তু শেয়াল পুরো ফাঁকি দিল। নেকড়ে বলল আমাদের তিনজনকে কাজ ভাগ করে নিতে হবে। শেয়াল চালাক, সে খাটতেও চায় না। ও করল কি কাঠের যে বেড়া দেওয়া ছিল, তার ওপরে উঠে বলল, আমি বরং কাঠগুলোকে ধরে রাখি যাতে তোমাদের মাথায় না পড়ে, কাঠ যদি তোমাদের মাথায় পড়ে তাহলে তোমরা কিন্তু বাঁচবে না। নেকেড় আর ভালুক রাজি হয়ে গেল। শেয়াল কাঠের পাঁচিলের ওপরে বসে আছে আর মাঝে মাঝে গাছের ডাল দিয়ে ওদের খোঁচা দিচ্ছে। নেকড়ে আর ভালুক কাজে ব্যস্ত। হাড়ভাঙা খাটুনির পর ধানকাটা শেষ হল। শেয়ালও ওপর থেকে নেমে এল। এমনভাব করতে লাগল যেন তারও খুব পরিশ্রম হয়েছে। নেকড়ে বলল, "তাহলে এবারে আমরা শস্যগুলো ভাগ করে নিই।" শেয়াল বলল, আমাদের মধ্যে যার দেহ সবচেয়ে বড় সে পাবে বড় ভাগটা, যার দেহ মাঝারি সে পাবে মধ্যের ভাগটা, আর যার দেহ ছোট সে পাবে সবচেয়ে ছোট ভাগটা। বোকা নেকড়ে আর ভালুক তাতেই রাজি। এবারে তারা চলল ধান কাটতে। ভালুক পেয়েছে খড়ের গাদা, নেকড়ে পেয়েছে তুঁষ আর শেয়াল পেয়েছে আসল জিনিস ধান।

এই গল্পও শোষক ও শোষিতের। শেয়াল কোনও কাজ না করে পেয়ে গেল ধান।

আর যারা প্রবল খাটাখাটি করল তারা কিছুই পেল না। শেয়াল এখানে শোষক আর নেকড়ে ও ভালুক শোষিত। যারা শোষিত, তারা প্রবলপরিশ্রম করে, শোষককে বিশ্বাসও করে। ভাবে তারও সমান পাওনা হবে। কিন্তু তা হয় না। এই শোষিত চাষিই আমাদের সমাজে বেশি। তারাই এই লোককথার জনক।

এই ভালুক আর নেকড়ে যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের হাসিম শেখ ও রামা কৈবর্ত্ত। 'ঐ যে হাসিম শেখ আর রামা কৈবর্ত্ত দুই প্রহরের রৌদ্রে, খালি মাথায়, খালি পায়ে এক হাঁটু কাদার ওপর দিয়া দুইটা অস্থিচর্ম্মবিশিষ্ট বলদে, ভোঁতা হাল ধার করিয়া আনিয়া চষিতেছে, উহাদের কি মঙ্গল হইয়াছে? উহাদের এই ভাদ্রের রৌদ্রে মাথা ফাটিয়া যাইতেছে, তাহা নিবারণজন্য অঞ্জলি করিয়া মাঠের কর্দ্দম পান করিতেছে; ক্ষুধায় প্রাণ যাইতেছে, কিন্তু বাড়ি গিয়া আহার করা হইবে না, এই চাষের সময়। সন্ধ্যা বেলা গিয়া উহারা ভাঙা পাতরে রাঙ্গা বড় বড় ভাত, নুন লঙ্কা দিয়া আধ পেটা খাইবে। তাহার পর ছেঁড়া মাদুরে, না হয় ভূমে, গোহালের এক পাশে শয়ন করিবে— উহাদের মশা লাগে না। তাহার পর দিন প্রাতে আবার সেই এক হাঁটু কাদায় কাজ করিতে যাইবে—যাইবার সময়, হয় জমীদার, না হয় মহাজন, পথ হইতে ধরিয়া লইয়া গিয়া দেনার জন্য বসাইয়া রাখিবে। কাজ হইবে না। নয়ত, চযিবার সময় জমীদার জমীখানি কাড়িয়া লইবে, তাহা হইলে সে বৎসর কি করিবে? উপবাস সপরিবারে উপবাস'। (বঙ্গদর্শন, ১২৭৯, ভাদ্র)

গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের শুরু থেকেই একটা ভেদ তৈরী হয়েছিল। যার জমি বেশি, তার শক্তি বেশি। এই বৈষম্যই একটা সময় রাজা বা সামন্তপ্রভুদের ক্ষমতাশালী করে ও কৃষককে করে দুর্বল। সরল মানুষরা ভয়ে ভক্তিতে সামন্তরাজাদের মান্য করত। কিন্তু অত্যাচারিতেরও মনে ক্ষোভ থাকে, বেদনা থাকে। তারাও একটা বিপরীত অবস্থানের স্বপ্ন দেখে। সেই স্বপ্নের বাস্তবায়ন হয়ে থাকে লোককথায় । নানা রূপকের মধ্য দিয়ে তাদের wishful thinking প্রকাশ পায়। সারা বিশ্ব জুড়ে যত লোককথা আছে তার স্বরূপ অনেকটা এইরকমই। লোককথায় দুর্বল শোষিত মানুষের জয় হয়, আর অত্যাচারী রাজার পরাজয় ঘটে। এইসব লোককথার মধ্যে যে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবনার প্রকাশ হয়তা সবসময় ইচ্ছাকৃত নয়, খুব সচেতন প্রয়োগও নয়। মানুষের অবচেতনে যে রসায়ন ঘটে তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটে লোককথায়। যেমন আফ্রিকার একটি লোককথার উল্লেখ করা যায়।

জঙ্গলের মধ্যে একটা প্রাসাদে এক রাজা ছিল । তাকে সকলেই খুব ভয় পেত। একদিন রাজার খাবার রান্না হচ্ছে খোলা জায়াগায়। সেখান দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল একটা বাজপাখি, তার নখে আটকানো ছিল এক টুকরো মানুষের মাংস। হঠাৎ সেই মাংসের টুকরোটা নিচে যেখানে রান্না হচ্ছিল সেই কড়াইয়ের ঝোলের মধ্যে পড়ে যায়। রাঁধুনীরা কেউই সেটা খেয়াল করে না। রাজার ঘরে তারা খাবার দিয়ে আসে। রাজা

সেই মানুষের মাংসের টুকরো খেয়ে চমৎকৃত। জীবনে এত সুন্দর মাংস তিনি খাননি। ভাবলেন এ কিসের মাংস? এত সুন্দর খেতে! যে রান্না করেছে তাকে ডেকে জানলেন সেটা ভেড়ার মাংস। পরের দিন রাজা ভেড়ার মাংস খেলেন, কিন্তু সেই স্বাদ নয় তো! শেষে ছাগল, গরু, মহিষ সবেরই স্বাদ নিতে লাগলেন, কিন্তু সেই স্বাদ পাচ্ছেন না। একদিন রাজার মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল। মানুষের মাংস খেয়ে দেখি তো কেমন হয়। তাঁর কেনা চাকরকে কেটে তার মাংস রান্না করে খেয়ে রাজা লাফিয়ে উঠলেন। এতদিন বাদে মাংসের হদিশ পাওয়া গেল। রাজা এবারে প্রাসাদের সব চাকরবাকর থেকে অনুগত মানুষদের একে একে খেয়ে ফেললেন। এমনকি ছেলে বউও বাদ গেল না। এইসব দেখেশুনে লোকজন রাজ্য ছেড়ে পালাতে লাগল। জনশূন্য হয়ে গেল রাজ্য। রাজা এদিকে মানুষের মাংস না পেয়ে নিজের শরীরেরই মাংস কেটে খেতে লাগলেন। দিন পনেরো পরে রাজার শরীরে হাড় ছাড়া আর কিছু থাকল না। এবারে রাজা মানুষ খুঁজতে বের হলেন। কিন্তু সবাই তো রাজ্য ছেড়ে পালিয়েছে। এদিকে তিনজন লোক ওই রাজ্যে এসেছে। তারা জানেনা যে রাজা মানুষখেকো। হাড্ডিসার রাজা তক্কে তক্কে রয়েছেন। তিনজনের মধ্যে একজনকে ধরতে পেরেই গাল টিপে ধরলেন। লোকটা মারা পড়ল। কিন্তু রাজা এতই ক্লান্ত ও দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন যে লোকটির দেহ টেনে আনতে গিয়ে নিজেই হুমড়ি খেয়ে পড়ে মারা গেলেন। গল্পের বাহ্যিক রূপটা হল, অত্যাচারী রাজা আর সরল প্রজাদের গল্প। এই গল্পের নীতিকথা হতে পারত যেমন কর্ম তেমন ফল। কিন্তু এর আড়ালে আছে অন্য এক কথন। দিব্যজ্যোতি মজুমদার তাঁর 'আদিবাসী লোকসাহিত্যে বিদ্রোহী মন' গ্রন্থে বিশ্লেষণ করেছেন এইভাবে, "আফ্রিকা মহাদেশের একটি দেশ ক্যামরুন। সেখানকার মানুষেরা দীর্ঘদিন ধরে অত্যাচারিত হয়ে আসছেন। সমাজে শ্রেণীশাসন তাদের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছিল। আদিবাসী গোষ্ঠীর সর্দার, সামন্তপ্রভু প্রভৃতির শোষণ প্রাচুর্যে ভরা ক্যামরুনেও সাধারণ মানুষকে অর্ধাহারে রেখেছিল, দৈহিক পীড়ন তো উপরি পাওনা। এখানকার আদিবাসীরা এই প্রাচীন রূপকথাটির আড়ালে তাদের সামন্তপ্রভুর অত্যাচারকে বর্ণনা করেছেন।' (পৃ ১৩)

শ্রেণীবৈষম্য যে কি ভয়াবহ রূপ নেয় তারই প্রকাশ দেখি লোককথায়। সাধারণ দরিদ্র মানুষ সামন্তপ্রভুর বিরোধিতা করতে পারে না। বিদ্রোহও নয়। তারা ক্রমাগত অত্যাচারিত হতেই থাকে। সংগঠিত বিদ্রোহ বা প্রতিবাদ তাদের আসে না। কিন্তু তারা স্বপ্ন দেখে শোষিতের পতনের বা মৃত্যুর। তারই ফলস্বরূপ রাজাকে মরতে হয়। এতেই তাদের তৃপ্তি।

লোককথায় তাই সবসময় দুর্বলের জয় সবলের পরাজয় ঘোষিত হয়। আমরা টুনটুনি আর রাজার গল্পেও দেখি, রাজাকে টুনটুনি কেমন বোকা বানিয়ে দিয়েছে। এ তো বাস্তবে হতে পারে না, কিন্তু কল্পনায় সম্ভব। গল্পে দেখি, রাজার একটা টাকা

টুনটুনি তার বাসায় নিয়ে এসেছে। টুনটুনি নানাভাবে রাজাকে বোকা বানাচ্ছে। শেষমেষ টুনটুনিকে মারতে গিয়ে রাজার নাকটাই কাটা গেল আর টুনটুনি উড়ে পালিয়ে গেল সেই দেশ থেকে। এ-ও হচ্ছে wishful thinking-এর ব্যাপার। যা সম্ভব নয় তাকে লোককথার মধ্য দিয়ে বলে সাধারণ মানুষের তৃপ্তি পাওয়া। বাস্তবে যা কার্যকর হয় না তাকে কল্পনায় সফল করাই এইসব লোককথার বৈশিষ্ট্য। যে কারণে শিয়ালকে দেখি বাঘের চেয়ে বেশি বুদ্ধি ধরতে, কুমিরকে বোকা বানাতে। কখনও দেখি না সবলের জয়, দুর্বলের পরাজয়। সে কারণেই টুনটুনি, শিয়াল, চড়াই, খরগোশের জয় হয়। তাদের চেয়েও সবল যারা তারা পরাজিত হয়। সারা বিশ্ব জুড়েই এই পদ্ধতি ছড়িয়ে রয়েছে লোককথাগুলির মধ্যে।

এখানে ঈশপের কথা বলা যেতে পারে। ঈশপ ছিলেন আয়াডমন-এর ক্রীতদাস। আয়াডমন ছিলেন সামোস-এর অধিবাসী। আয়াডমন ঈশপকে মুক্তি দিয়েছিলেন ক্রীতদাসত্ব থেকে। মিডিয়ার রাজা ক্রিসাস ঈশপকে বেশ পছন্দ করতেন। ঈশপ তাঁর নীতিকথাগুলি শোনাতেন গ্রিসের অধিবাসীদের। কিন্তু গ্রিসের অভিজাত সমাজ তাঁকে সহ্য করতে পারেনি। ঈশপ যে সব গল্প শোনাতেন তার মধ্যে তাঁরা দেখেছিলেন বিদ্রোহী, সংগ্রামী এক ক্রীতদাসকে। ঈশপ ক্রিশাসের বিশেষ কাজে ডেলকিতে আসেন। সেখানে ঈশপ নানা গল্প শোনাতেন যা অভিজাত সম্প্রদায়ের কাছে সন্দেহজনক ছিল। ফলে তাঁর মৃত্যুদণ্ড হয়। তাঁর একটি পশুকথার উল্লেখ করি।

একটা রাজহাস সুন্দর স্বরে গান করছে। পাশে ছিল একটা বক। সে জানত একটু পরেই রাজহাসটি মারা যাবে। তাকে মেরে ফেলা হবে। বক বলল, 'হায়, এতো কোনওদিন দেখিনি যে মরার সময় কেউ গান গায়। তুমি এমন বিপদের সময় গান গাইছ কি করে?'

রাজহাস বলল, 'আঃ কী আরাম। আমি আজ যেখানে যাচ্ছি সেখানে কোনও তীর আমায় বিদ্ধ করতে পারবে না। কোনও খাঁচা আমায় বন্দি করতে পারবে না। প্রচণ্ড খিদেয় আমি কষ্ট পাব না। তা, এই এত আনন্দের দিনে আমি গান করব না? আজ তো আমার মুক্তির দিন।'

এই লোককথার মধ্যে তো ঈশপের জীবনের কথাই বলা হয়েছে। লোককথা এমনই। সাধারণ মানুষের সংগ্রাম, বঞ্চনা আর অবমাননা থেকেই জন্ম নেয় লোককথা। বাহ্যিক চেহারাটুকু সরালেই আমরা ঈশপ বা তেমনই কারও জীবনকথা খুঁজে পাই। লোককথা যেন জীবন্ত দলিল। শোষকের বিরুদ্ধে শোষিতের উচ্চারিত স্বর লোককথাগুলিকে অন্য ভাবে মূল্যায়ন করে।

লোককথায় নারীমন

দেবলীনা দেবনাথ

বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তের লোকসমাজ সেই আদি অনন্তকাল থেকে সামাজিক প্রয়োজনে, ধর্মীয় তাগিদে ও অনাবিল আনন্দে লোককথা সৃষ্টি করে চলেছেন। লোককথা শুধু আনন্দেরই প্রকাশ নয়, ছিল ইচ্ছাপূরণের মাধ্যম। কালের বিবর্তনে প্রাচীন পৃথিবীর লোকসমাজের লোককথার প্রত্যক্ষ নিদর্শন যদিও আমরা পাইনি তবুও বিশ্বের সর্বত্র লোককথা তৈরি হয়েছে। লোককথায় প্রতীক ও রূপকের আড়ালে থাকে অবিচার, বেদনা, অত্যাচার আর আশা-আকাঙ্ক্ষার রূঢ় বাস্তব ছবি।

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও লোককথার প্রতি অনুরাগী ছিলেন। 'কড়ি ও কোমল' এর যুগ অতিক্রম করে তিনি যখন 'মানসী'র যুগে উত্তীর্ণ হলেন তখন বাংলার প্রকৃতি ও সমাজজীবনের প্রতি তাঁর আকর্ষণ স্পষ্টতর হল। আত্মকেন্দ্রিক ভাবসাধনার মাঝখানেও বাংলার প্রকৃতি ও জীবনকে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন তিনি। লোককথা, বিশেষক'রে রূপকথা সম্পর্কে তাঁর গভীর অনুভূতির পরিচয় মেলে তাঁর 'বধূ' কবিতায়—

কোথায় আছ তুমি কোথায় মা গো!
কেমন ভুলে তুই আছিস হা গো;
উঠিলে নব শশী ছাতের পরে বসি,
আর কি রূপকথা বলিবি না গো!

সমাজজীবনের বহু বিস্মৃত আচরণ লোককথায় বিধৃত থাকে। জাতির মনস্তত্ত্বের প্রধান হাতিয়ার এটি। অবচেতন মনের বহু আশা আকাঙ্ক্ষাই আত্মপ্রকাশ করে লোককথার মাধ্যমে।

নারী পুরুষের শারীরিক পার্থক্য প্রকৃতিজাত বা স্বাভাবিক। মাতৃ তান্ত্রিকতা থেকে পিতৃ তান্ত্রিকতায় পরিবর্তনের মধ্যেই পুরুষালি আধিপত্যের হিসেব নিকেশ লুকানো আছে। কৃষিকাজে বীজ বোনা থেকে শুরু করে কুটির শিল্পের আবিষ্কারের কৃতিত্ব মেয়েদেরই। সন্তান প্রতিপালন ও ভরণপোষণ করার জন্য আজও নারীকেই সময় ব্যয় করতে হয়। কেন্দ্রীয় পুরুষ নারীকে প্রত্যন্ত প্রান্তে ঠেলে দেয়। লোকসংস্কৃতির মধ্যে এই প্রান্তিকরণ প্রক্রিয়াটা ব্যাপক আকারে চলে। পুরুষ সমাজের দাবী যেন প্রত্যেক নারী সংসারের অশান্তি দূর করে সংসারে সুখ বৃদ্ধি করে। কিন্তু এরাই উপেক্ষিত। বাংলার ঘরে ঘরে এই মেয়েরা ছেঁড়া কাপড় পরে, আধপেটা খেয়ে, নীরবে স্বামী,

বাবা, ভাই, পুত্রদের সেবা করে চলেছে। এত কম পেয়ে, এত বেশি দিতে আর কোন সমাজের নারী পেরেছে কিনা তা সত্যি প্রশ্নের দাবী রাখে। লোককথাগুলো আলোচনা করলে দেখা যাবে সংসার জীবনে এরা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে। কাজকর্মের মধ্যেও সুখে-দুঃখে এগুলো তাদের জীবনের অঙ্গ হয়ে গেছে। বাস্তব জীবনবোধ থেকে এগুলো জাত,তাই এগুলো জীবনধর্মী রচনা। বাল্য বিবাহ, কৌলীন্য প্রথার নাগপাশে বন্দি সমাজ ব্যবস্থা যেমন এতে জায়গা করে নিয়েছে তেমন শাশুড়ী-ননদ, জা-ভাসুর সম্পর্কিত অভিজ্ঞতাগুলোও বাদ যায়নি। সহজ, সরল, করুণ রস সম্পৃক্ত এই লোককথাগুলোর জীবন ধর্মিতা অনস্বীকার্য, এগুলো জীবন রসসিক্ত।

আমি আমার বর্তমান নিবন্ধে লোককথা, বিশেষতঃ রূপকথা এবং ব্রতকথায় নারী মনকে ধরার চেষ্টা করেছি। লোককথার খণ্ড খণ্ড চিত্রের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়েছে সতীন বিদ্বেষ, সৎমার ঈর্ষাকাতরতা, কৌলীন্য প্রথার নাগপাশে বন্দী সমাজ।

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের 'কলাবতী রাজকন্যে' গল্পে আমরা বুদ্ধু ও ভুতুমকে পাই। সমাজে বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল, যার ফলস্বরূপ নারীকে সংসার করতে হত সতীন হয়ে। নারী তার স্বামী প্রেমের ভাগীদার সহ্য করতে পারেনা। সেখানে তার অধিকার বা সম্মান জড়িত। স্বামী প্রেম বঞ্চিতা নারীর পরিতাপের কারণ হয় অপর এক নারী। তাই প্রবল হয়ে ওঠে— সতীন বিদ্বেষ। তাই এর ফলস্বরূপ সন্ন্যাসী প্রদত্ত গাছের শেকড় ছোট রানীকে না দিয়ে বাকিরা খেয়েছে। পাঁচরানী রাজপুত্রের জন্ম দিল ও বাকি দুই রানী পেঁচা বানর প্রসব করল। অনেক প্রতিকূলতা জয় করে শেষ পর্যন্ত যখন বুদ্ধু ও ভুতুম যথাক্রমে বুধকুমার ও রূপকুমার হ'য়ে আত্মপ্রকাশ করল, পাঁচরানী হিংসায় ঘরে গিয়ে খিল দিলেন। কলাবতী ও হীরাবতী রাজকন্যেরা বুদ্ধু ভুতুমের [illegible] হ'লে বাকি রানী ও রাজপুত্রেরা তা মেনে নিতে পারেনি।

আবার 'কাঁকনমালা— কাঞ্চনমালা' গল্পে দেখি সূঁচ রাজার সূঁচ খুলে দেওয়ার জন্য রানী দাসী রাখলেন। অন্যের ভাগ্য সুখে নারীই একমাত্র ঈর্ষাকাতর হয়। তাই দাসী কাঁকন মালা রানীর পোযাক প'রে, গহনা প'রে রানী সাজল এবং কাঞ্চন হ'লেন দাসী। দাসী হ'য়েও সংসারের মঙ্গলকামনায় চিরব্রতী। সংসারের মঙ্গলকামনায় চিরকল্যাণকামী রূপ তার, তাই সংসারের শ্রীবৃদ্ধি করার জন্য ধানের ছড়া, মা লক্ষ্মীর পায়ের দাগের আলপনা দিয়েছে।

'সাত ভাই চম্পা' গল্পটিতে সতীন বিদ্বেষ, ঈর্ষাপরায়ণতা প্রকটিত হ'য়েছে। ছোটরানীর সন্তান সম্ভাবনা রাজার বড় রানীদের প্রতিহিংসা পরায়ণ ক'রে তুলেছে। নারীর পূর্ণতা তার মাতৃত্বে। বন্ধ্যানারীর মানসিক যন্ত্রণা সত্যিই অসহনীয়। মাতৃত্বের কোন বিকল্প নেই। সন্তানহীনা হওয়ায় বড়রানীরা অসুখী, তাই ছোটরানীর সদ্যোজাত সন্তানদের পাঁশ-গাদায় পুঁতে ফেলার মত অমানবিক আচরণ করতে তাদের একটুও বুক কাঁপেনি। এমনকি রাজা যখন ছোটরানীকে রাজপুরী থেকে বের করে দিলেন তখন

তাদের 'মুখে আর হাসি ধরে না;— পায়ের মলের বাজনা থামে না।' ছোটরানী বিতাড়িত হওয়ায় তাদের মনে হ'ল— 'সুখের কাঁটা দূর হইল'।

আবার 'শীত-বসন্ত' গল্পে দেখি সতীন বিদ্বেষ প্রবল হয়েছে সুয়োরানীব ক্ষেত্রে। দুয়োরানীর দুই সন্তানও তার কাছে চক্ষুশূল। নদীর ঘাটে গিয়ে সুয়োরানী মাথায় এক ওষুধের বড়ি টিপে দিয়ে দুয়োরানীকে টিয়া পাখি বানিয়ে দিল। সতীনের দুই ছেলের প্রতিও তার চরম বিদ্বেষ। মনভরা জ্বালা, পেটভরা হিংসা নিয়ে নিজপুত্রদের ঘিয়ে চপ্ চপ্ পঞ্চব্যঞ্জন সাজিয়ে দিলেও দুয়োরানীর ছেলেদের দিয়েছে আলুন, আতেল কড়কড়া ভাত, শাকের উপর ছাই। এ হেন ব্যবহার করতে তার জননী হৃদয় একটুও উদ্বেলিত হয়নি, পরবর্তীতে মনের দুঃখে সুয়ো রানী প্রাণ ত্যাগ ক'রেছে। সব বাধা-বিপদ কেটে দুয়োরানী যখন টিয়ার অঙ্গ ছেড়ে দুয়োরানী হ'লেন তখন কিন্তু তিনি সুয়োরানীর তিনছেলের প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হননি। সমান আদরেই তিনি নিজ পুত্র ও সতীন পুত্রদের বুকে টেনে নিয়েছেন। যে ব্যবহার তিনি এবং তার দুই পুত্র শীত ও বসন্ত পেয়েছেন সুয়োরানীর কাছ থেকে, সেই ব্যবহার তিনি সতীন পুত্রদের ফিরিয়ে দিতেও পারতেন, সেটাই সাধারণ ভাবে করা হয়। কিন্তু দুয়োরানী তা করেননি। উদারতা ও মহানুভবতার পবিচয় আমরা এখানে পাই, তিনিও যে জননী, মাতৃহারা সতীন সন্তানদের প্রতি তার অপত্য স্নেহ বর্ষিত হ'য়েছে। এখানেই তিনি বড় মনের পরিচায়ক।

পুরুষদের মধ্যে হিংসা, বিদ্বেষভাব সচরাচর দেখা যায় না। নারীর পরশ্রীকাতরতা এতটাই প্রবল যে তা কোন সম্পর্কের বাধা মানে না। মনের ওপর তাদের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। তাই নিজের বোন হ'লেও তার সুখ-সমৃদ্ধিতে হিংসায় জ্বলেছে বড় দুই বোন, যার প্রমাণ মেলে 'কিরণমালা' গল্পে। বড় দুই দিদি ঘেসেড়া ও সূপকারের স্ত্রী, ছোট বোন রানী, স্বভাবতই প্রথম দু'জন ও ছোট বোনের আর্থিক সঙ্গতি সমান নয়। রানী বোনের ইন্দ্রানীর মত ঐশ্বর্য্য দেখে দুই বোন ঈর্ষাকাতর হয়ে গেল। সন্তান প্রসবকালে ছোট বোন নিজের দুই বোনের কথাই আগে মনে করেছে কারণ— 'মায়ের পেটের রক্তের পোম্, আপন বলতে তিনটি বোন্'। কিন্তু বড় দুই বোনের মধ্যে কিন্তু এই অনুভূতি বা মানসিকতা অনুপস্থিত। চাঁদের পুতুলের মত দুই ছেলে ও এক মেয়েকে তারা অবলীলায় মাটির ভাঁড়ে নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়েছে। নিজের বোন হওয়া সত্ত্বেও তাদের প্রতি একটুও মাতৃত্ব সুলভ আচরণ তারা দেখায়নি। এও এক আশ্চর্য্য মানসিকতা।

'নীলকমল আর লালকমল' গল্পে দেখি রাজার এক রানী লক্ষ্মী মানুষ আর এক রানী রাক্ষসী। দুজনের সন্তানের মধ্যে কোন বৈরী মনোভাব নেই। সতীন পুত্রের প্রতি বিদ্বেষ থাকবে সেটাই স্বাভাবিক, সতীনের প্রতিও সুখদায়ক মনোভাব দেখা যাবে না, সেটাও অজানা নয়। সুযোগ বুঝে রাক্ষসী রানী একদিন লক্ষ্মীরানীকে মেরে ফেলল। আপন

পুত্র, সতীন পুত্রের সঙ্গ না ছাড়ায় সে সতীনপুত্রের ক্ষতি করতে পারছে না, ফলে রাগে সে অগ্নিশর্মা। মনের আগুনে জ্বলতে জ্বলতে সে বিষোদগার ক'রেছে এই ভাবে— কি! আপন পেটের পুত্র,

সে-ই হইল শত্রু!

সতীন পুত্রকে রাক্ষসীরানী খেতে লাগল, আর নিজের পুত্র অজিত যেই বিরোধিতা ক'রেছে রানী মনের আগুনে জ্ঞান দিশা হারিয়ে তাকেও মুড়, মুড় ক'রে চিবিয়ে খেয়ে ফেলেছে।

কথায় বলে কুপুত্র যদি বা হয়/ কুমাতা কদাচ নয়, জননী এমনই যে সন্তানের কাছে কোন প্রত্যাশা নেই, শুধু সন্তানের প্রতি অপত্য স্নেহ দিয়েই— তার স্বর্গীয় তৃপ্তি, সন্তানের সঙ্গে তার নাড়ীর সম্পর্ক—, কোন প্রতিবন্ধকতাতেই তা ছিন্ন হওয়ার নয়। কিন্তু এই গল্পটিতেই উদ্ঘাটিত হ'য়েছে নারী চরিত্রের এক বিচিত্র দিক। মাতৃত্বেও যে নারী সকলের ঊর্ধ্বে সেই মা-ই ক্ষেত্র বিশেযে আত্মকেন্দ্রিক, প্রতিহিংসা পরায়ণ হ'য়ে উঠেছে। লোককথার নান্দনিক মূল্যকে বাদ দিলে আর যে জিনিসটির গুরুত্ব অপরিসীম তা হ'ল লোককথা সমাজ জীবনের দর্পণ। লোককথার নানান আলোচনায় নারীমনের সূক্ষ্মদিক গুলো উন্মোচিত হয়েছে। জীবনরসে জারিত লোককথা গুলোয় মুক্তি ঘ'টেছে নারীর ইচ্ছাশক্তি, আশা ও আকাঙ্ক্ষার। লোককথার প্রতিটি ধাপে নারীর জীবন ও মননের প্রতিকৃতি প্রতিবিম্বিত হয়।

নারী যখন কোন পুরুষের প্রণয়াসক্ত হয় তখন তার জন্য পারেনা হেন কাজ নেই। শত কৃচ্ছ্রসাধনেও সে প্রস্তুত থাকে। লালবিহারী দে'র সংগৃহীত "দ্য স্টোরি অব প্রিন্স সবুর" (পৃঃ ১২৪-১৩৭) গল্পে দেখি কাঁচের গুঁড়ো ফেলা বিছানায় শুয়ে রাজপুত্রের গা কেটে গিয়েছে। ঘা হয়েছে। রাজকন্যা রাজপুত্রের দেশে গেছে এবং ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর বিষ্ঠা রাজপুত্রকে মাখিয়ে তাকে সারিয়ে তুলেছে। এই একই গল্পে দেখি ক্ষুব্ধ বাবা ছোট মেয়েকে ঘোর জঙ্গলে রেখে আসতে চাইলে পথে তার সঙ্গে ধাইমার দেখা হয়েছে, সেও চলেছে ছোট মেয়ের সঙ্গে। আসলে নারীর মধ্যে মাতৃত্বের ভাব প্রবল। ধাইমা প্রকৃত জননী না হলেও যেহেতু ছোট মেয়েকে সে লালন পালন করেছে তার প্রতি তার স্নেহ, মায়া, মমতা অনেকখানিই ছিল। এই কারণে স্বেচ্ছায় সেও ছোট মেয়ের সঙ্গে জঙ্গলে গেছে।

বণিকের কেনা সবুরের মধ্যে পাওয়া গেল যাদু পাখা, যে পাখায় বসানো একটি আয়না। ছোট মেয়ে পাখা দিয়ে হাওয়া খেতে সবুর রাজ সামনে এলো। ছয় দিদি বাসর রাতে কাঁচের কুচো বিছানায় রেখে ছিল। বোনেদের মধ্যে যতই সদ্ভাব থাকুক, কারও যদি সুপাত্রে বিবাহ হয় তবে অন্যান্য বোনেদের সেই বোনের প্রতি জাতক্রোধ বৃদ্ধি পায়। সৌভাগ্যবতী বোনের প্রতি তারা বিদ্বেষভাবাপন্ন হয়ে পড়ে। এখানেও দেখি

যেহেতু ছোট বোনের বিবাহ স্থির হয়েছে সবুর রাজের সঙ্গে তাই ছয় দিদি বাসর রাতে কাঁচের কুচো বিছানায় রেখে দিয়েছে।

ড. সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায় সংগৃহীত একটি গল্পে (পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গের লোকসাহিত্য, পৃঃ ৫৭-৫৮) দেখি রাজকন্যা দাসীকে নিয়ে বনে এসেছে বনদেবতার পূজা করতে। গাছতলায় একটি সুন্দর ছেলেকে শুয়ে থাকতে দেখে রাজকন্যা স্থির করেছে তাকেই সে বিবাহ করবে। নারী মাত্রই চায় সুন্দর বর। স্বামীর বিদ্যা কিংবা গুণপনার তুলনায় দৈহিক সৌন্দর্য্যেই যে তার আগ্রহ অধিক এখানে আমরা তারই পরিচয় পাই। নারীকে আমরা কম-বেশী তার ভালোবাসার জনের অন্ধ আনুগত্য করতে দেখি। তাই রাজপুত্র যখন রাজকন্যাকে বলেছে অপেক্ষা করে থাকতে, সে বন থেকে ফলমূল নিয়ে আসছে, সাবধান করে গেছে যে কারোর সঙ্গে কোন কথা না বলে, রাজপুত্র চলে যাওয়ার পর রাজপুত্রের বড় এবং মেজ ভাই বাণিজ্য সেরে ফিরেছে তারা কন্যাকে দেখে তার পরিচয় জানতে চেয়েছে, রাজপুত্রের নির্দেশ মেনে রাজকন্যা কোন জবাব দেয়নি। কোন উত্তর না পেয়ে রাজপুত্রের দুই ভাই রাজকন্যাকে জোর করে ধরে নিয়ে গেছে।

এইবার অন্য একটি গল্পের প্রসঙ্গ। এটিও সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত (পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গের লোকসাহিত্য পৃঃ ৬৯-৭১, ১৯৭৫)। সওদাগরের সাত ছেলে। তার মধ্যে ছয় ছেলের বউ আছে। ছোট ছেলের বউ নেই। কিছুদিন পর ছোট ছেলের বউ এল, সে ধান সিদ্ধ করল। চাল বিক্রি করে হাঁড়ি, নুন ইত্যাদি কিনে আনল, সাত ভাইকে পাতা পেড়ে খেতে দিল, ছয় ভাসুর ছোট বউয়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল। শুরু হল ছয় বউ এর হিংসা। এর উপর আবার ছোটবউ গর্ভবতী হলে ছয় বউ জ্যোতিষ আনিয়ে তাকে ঘুষ দিয়ে বশ করে বলালো যে ছোট বউয়ের সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাত ভাইয়ের মৃত্যু হবে। ছোট বউকে তাড়িয়ে দেওয়া হল। ভাগ্যচক্রে ছোট বউ এর বরাত ফিরল তাদের বাড়ি হল, এমনকি পুকুর কাটাবারও ব্যবস্থা হল। এই উপলক্ষ্যে ছোট বউয়ের স্বামী এবং তার ছয় ভাসুর এমনকি জায়েরাও এল মাটি কাটতে। ছেলেকে দিয়ে ছোট বউ তাদের সকলকে ডাকিয়ে আনিয়েছে, তাদের সকলকে ভালো থালা বাসনে খেতে দিয়েছে, খাট পালঙ্কে শুতে দিয়েছে। নারীর প্রতি অন্যে অবিচার করলেও অনেক সময় তার কোমল প্রাণ এইসব অবিচারকে মনে রাখে না। নারী তার সৌভাগ্য সুখ সকলের সঙ্গে মিলে মিশে ভাগ করে ভোগ করতে চায়। তাই ছোট বউকে দেখি ছয় ভাসুরের পুনর্বাসনের দায়িত্বও সে নিয়েছে।

ঐ একই লেখকের সংগৃহীত অপর একটি গল্পে (পৃ ৭৩-৭৫) এক সওদাগরের গুরু সওদাগরের কনিষ্ঠ পুত্রবধূকে তার সঙ্গে সহবাসের আহ্বান জানালো। লোভ দেখালো তবেই সে সন্তানবতী হবে। ছোট বউ সাধুকে বলেছে, 'তুমি আমার বাবার মত, একথা বল কি করে? যা বললে এমন কথা আর বলো না'। সতীসাধ্বী রমণী শত

প্রলোভনেও চরিত্রের শুচিতা নষ্ট করে না। তাই ছোট বউ সাধুর প্ররোচনায় পা দেয়নি।

সিংভূম জেলার হাতিবাড়ি অঞ্চলের ডোমজুড়ি গ্রাম থেকে একটি রূপকথা সংগৃহীত হয়েছে (লেখক ঐ, পৃঃ ৭৮-৮০)। রূপকথাটি হল এই রকম—

একদেশে এক রাজা ছিল, রাজার সাত রাণী, কিন্তু রাজার একটি মাত্র পুত্র। সেই পুত্রের প্রাণ ছিল বোয়াল মাছের পেটে। রাণীরা আব্দার করলে ঐ বোয়াল মাছটিকে এনে দিতে, তারা খাবে। ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের আবদারের পরিমাণ একটু বেশি তাই এখানে রাণীদের আব্দার করতে দেখা গেছে বোয়াল মাছ খাবে বলে।

স্বামী যদি বিত্তবান না হয় অন্ততঃ তার প্রাচুর্য যদি না থাকে তবে সেই স্বামীকে স্ত্রীর হাতে লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য করতে হয়। সকল স্ত্রীই চায় সচ্ছল দাম্পত্য জীবন যাপন করতে। সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত একটি গল্পে (পৃঃ ৯৭-৯৮) আমরা এর পরিচয় পাই। এক গরীব ব্রাহ্মণ ছিল। সে প্রতিদিন রাজবাড়িতে গীতাপাঠ করতো। কিন্তু গীতাপাঠ করে তার কোন আর্থিক উন্নতি হয়নি। কোন রকমে কায়ক্লেশে দিন চলতো। এইজন্য প্রতিদিন তাকে তার স্ত্রীর লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করতে হতো। একদিন সে ভাগ্যের সন্ধানে গীতা হাতে নিয়ে মনের দুঃখে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল। এই একই গল্পে বলা হয়েছে ব্রাহ্মণ পুত্র তার বাবাকে বলেছে যে সে বনের মধ্যে গীতা পাঠ করতে যাবে। কারণ পূর্ব থেকেই সে তার মায়ের সঙ্গে পরামর্শ করে রেখেছিল যে সাপটাকে কেটে সব মণিগুলি বার করে নেবে। এখানেও নারীর অর্থলোভ যে অপরিমেয় তার পরিচয় মেলে। তাই সাপকে কেটে সব মণি বের করে নেওয়ার ব্যাপারে ব্রাহ্মণ তার পুত্রকে পরামর্শ দিয়েছে।

লালবিহারী দে সংকলিত "দা স্টোরি অব শ্বেত-বসন্ত" (পৃঃ ৩৯-১০৭) তে আমরা দেখি শ্বেতের বউ শ্বশুর শাশুড়ীর জন্য কোলাব্যাঙ রেঁধেছে, অপর পক্ষে স্বামী আর দেওরের জন্য রেখে দিয়েছে জেলে কর্তৃক ধৃত আশ্চর্য মাছ। যে মাছ খেলে হাসলে মানিক ঝরে, কাঁদলে ঝরে মুক্ত। শ্বশুর শাশুড়ীর প্রতি বধূর বিতৃষ্ণা এবং অসম্ভব আচরণ সচরাচর নারীদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। শ্বেত-বসন্তের বাবা পুনরায় বিবাহ করেছে, সৎ মা কাউকে দেখতে পারে না এমনকি সৎমা পাছে মেরে ফেলে এই ভয়ে তিনজন রাত থাকতে পালিয়ে গেছে। সৎমা যে কিছুতেই সতীনের সন্তানকে দেখতে পারে না, এ এক সাধারণ ঘটনা। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর টুনটুনির বইয়ে বোকা জোলা আর শিয়ালের গল্পে দেখি রাজকন্যার সাথে বোকা জোলার বিয়ে হয়েছে। বোকা জোলা নানা ধরনের বোকামি করেছে, কিন্তু বুদ্ধিমতী বউ বোকা জামাইয়ের কথা কাউকে বলেনি। স্ত্রী নিজে স্বামীকে যতই ভর্ৎসনা করুক স্বামী অন্যের কাছে হাস্যাস্পদ হবে তা সে কখনোই সহ্য করতে পারে না। তার পাতিব্রত্যে কখনোই ঘাটতি দেখা যায় না। এও এক অভিনব মানসিকতার প্রকাশ।

বঙ্গরমণী আর্থ-সামাজিক কারণে ও মনস্তাত্ত্বিক কারণে ব্রত পালন করে। শিক্ষার স্পর্শ পেয়ে আজ মেয়েরা অনেক সংস্কার মুক্ত, তবুও মনের কোণে অজানা আশংকা দানা বাঁধা, এর থেকে মুক্তি পাওয়া সহজ নয়। ভোগবাদের ইঁদুর দৌড়ে সামিল হয়েছে শহুরে মেয়েরা। ইতুপুজো করে আজ যে আর সৌভাগ্যশালিনী হওয়া যায় না, তা জানলেও আরও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ব্রত পালনে মেয়েদের উদ্দীপনা চোখে পড়ার মত। মেয়েরা যতই শিক্ষিত হোক স্বামী সন্তান নিয়ে সুখী গৃহকোণ রচনা করার বাসনা সবারই থাকে। বৈধব্যের যন্ত্রণা, একাকীত্ব, বন্ধ্যাত্ব কারও কাম্য নয়, এগুলো দুঃখবহ মনস্তাত্ত্বিক ব্যাধি। তাই স্বামী-সন্তানের মঙ্গল কামনায় ব্রত পালন করে। ব্রতের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্রতকথাগুলোতে ফুটে উঠেছে বাংলার নারীর সহজ জীবনবোধ। বঙ্গনারী তাদের আশা— আকাঙ্ক্ষার রূপ দিয়েছে ব্রতকথায়। ব্রতকথাগুলো সমাজ জীবনের দর্পণ। সাধারণ গৃহস্থ জীবনের চাহিদা, সমস্যা, দুর্বলতা এবং সমস্যার সমাধানের কথাও বলা হয় ব্রতের কথাগুলোতে। ধর্মীয় নয়, মানবরসই এখানে মুখ্য হয়ে ওঠে।

ব্রতকথাগুলি নারীদের রচিত, নারীদের দ্বারা ব্যবহৃত এবং নারীদের আয়োজিত ব্রতাচরণের সঙ্গে সম্পৃক্ত। তাই স্বভাবতই ব্রতকথায় আমরা নারীদের অন্তর্জীবনের অকপট পরিচয় লাভ করি। তার আত্মকেন্দ্রিকতা, স্বার্থপরতা, নীচতা, দীনতা, অন্যদিকে তার মাতৃত্ব, কোমলতা, সহানুভূতি, কর্তব্যবোধ, এককথায় বিরল মানবিক ও গুণাবলীর পরিচয় লভ্য। ভাদ্রমাসের লক্ষ্মীপূজার কথায় ব্রাহ্মণী স্বর্গ থেকে প্রেরিত রথে আরোহণের পূর্বে তার পুত্রবধূকে পরামর্শ দিয়ে গেছে, "মা, ভাদ্রমাসে, কার্তিকমাসে, পৌষমাসে আর চৈত্রমাসে মা লক্ষ্মীর পূজা করবে। আর এই তিল ধুবড়ি রোজ পূজা করবে তাহলে কখনও কোন কষ্ট থাকবে না আর রোজ ভোরে উঠে ছড়া, ঝাঁট দেবে। বেলা পর্যন্ত কখনও ঘুমুবে না। সন্ধ্যা হলেই ধূপ, ধুনা, গঙ্গাজল দিয়ে ঘরে ঘরে আলো জ্বালবে। কখনও খনখন, ঝনঝন করো না। চলে গেলে যেন পায়ের শব্দ না হয়। সর্বদাই লক্ষ্মী-নারায়ণকে মনে মনে স্মরণ করবে। তাহলে মা লক্ষ্মীর দয়া হবে।"

আমরা ব্রাহ্মণীর এই উপদেশ বাণীগুলিকেই যদি বিশ্লেষণ করি তাহলে নারী বিশেষত জননীর মনস্তত্ত্ব চমৎকারভাবে ফুটে ওঠে। যতদিন ব্রাহ্মণী জীবিত ছিল ততদিন সংসারের ভালো-মন্দ দেখবার সুযোগ তার ছিল এখন সে মৃত্যুপথযাত্রী। তাই তার অবর্তমানে পুত্র এবং পুত্রবধূ যেন কোন সমস্যার সম্মুখীন না হয় সেজন্য সে অধিকতর চিন্তিত হয়ে উঠেছে। লক্ষ্মীপূজার মাধ্যমে লক্ষ্মীর করুণা লাভ, সুখৈশ্বর্য্য লাভের যে পরামর্শ তাতে নতুনত্বের কিছু নেই। কিন্তু ভোরবেলায় ঘুম থেকে ওঠা, বেলা পর্যন্ত না ঘুমান, সকালে গৃহে ছড়া-ঝাঁট দেওয়া, সন্ধ্যায় ধূপ-ধুনো দেওয়া, নিঃশব্দে চলাফেরা করার পরামর্শ দানের মধ্যে দিয়ে প্রকারান্তরে ব্রাহ্মণী পুত্রবধূকে আদর্শ গৃহিণী তথা আদর্শ পত্নীতে রূপান্তরিত করতে চেয়েছেন। সেকালের প্রেক্ষিতে

এগুলিই ছিল আদর্শ গৃহিণীর নিত্য-কর্মাদি। লক্ষ্মীর করুণালাভের লোভ দেখিয়ে গৃহিণী পুত্রবধূকে সুগৃহিণী করতে চেয়েছেন।

"কার্তিক মাসের লক্ষ্মী পূজা"র কথায় রাজা অঙ্গীকার করেছেন তার ছোটমেয়েকে সকালে ঘুম থেকে উঠে যে পুরুষকে দেখবেন তারই সঙ্গে বিবাহ দেবেন। এই কথায় রাণী বিচলিত হয়েছেন, হওয়ার কথা। কেননা শতহোক, তিনি কন্যার জননী, আর কোনো মা চায়না তার কন্যা অপাত্রে পড়ুক। তাই রাণী রাজার কথা শুনে নগরের সকলকে সকালে উঠতে আর হাটবাজার দোকান খুলতে বারণ করে পাঠিয়েছেন। উদ্দেশ্য স্পষ্ট, যাতে নগরের কোন সাধারণ ব্যক্তির সঙ্গে তার কন্যার বিবাহ না হয়।

ছোট রাজকন্যা তার বাবাকে মুখের ওপর জানিয়েছিল যে, সে তার পিতার ভাগ্যে খায় না। রাজা তার ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন এবং সেজন্যই তার বিবাহের ব্যাপারে খেয়ালখুশীমত সিদ্ধান্ত নিয়ে বসেছিলেন। কিন্তু যে মেয়ে যুক্তিবাদিনী, সে মেয়ে কখনই পিতৃবিরোধী হতে পারে না। পিতার শত প্ররোচনামূলক আচরণ সত্ত্বেও কন্যা তার পিতাকে একইরূপ শ্রদ্ধা এবং সম্মানের চোখে দেখে থাকে। ভাগ্যচক্রে মেয়েটির বাবা চরম দুর্দশার শিকার হলেন। মেয়েটি কিন্তু তার শ্বশুরকে দিয়ে তার গৃহে বৈগুণ্যের শিকার তার পিতাকে ডাকিয়ে আনিয়েছে। উপযুক্তভাবে আতিথ্য করেছে। বসতে রূপোর পিঁড়ি দিয়েছে, পা ধুইয়ে গামছা দিয়ে মুছিয়ে দিয়েছে, সোনার গেলাসে জল এবং সোনার থালায় ভাত দিয়েছে। একে যদি কন্যাটির ঐশ্বর্য প্রদর্শন বলে আমরা মনে করি তবে তার প্রতি অবিচার করা হবে। পিতার উপর কন্যার টান একটু অধিকতর হয়ে থাকে, এ টান মনস্তত্ত্ব সম্মত।

পৌষমাসের লক্ষ্মী পূজার কথায় এক ভাজ তার দুঃস্থ ননদের সঙ্গে যেভাবে অমানবিক আচরণ করেছে তাতে ননদ-ভাজের সম্পর্কের যে চিরন্তনবৈরীতা তাই যেন প্রতিপন্ন হয়েছে। ননদ এসে জানিয়েছে, "আর বোন, খেতে পাইনি, ছেলেমেয়ে না খেতে পেয়ে মারা গেল। বৌ, দাদা দয়া করে যদি কিছু দেন তাই এসেছি।" ভাজ উত্তরে জানিয়েছে "তুমি রোজ এসে আমার কাজকর্ম করে চাল, ডাল ঝেড়ে দিয়ে যেও, আর খুঁদ কুঁড়ো যা পড়বে নিয়ে যেও।" ননদ ভাজের মাথার উকুন বেছে দিতে অস্বীকার করেছে বলে, বাড়ির লাউগাছের দুটো লাউপাতা ননদকে দিতে অস্বীকার করেছে সে। শুধু তাই নয়, সামান্য কিছু দেওয়া খুদ তাও কেড়ে নিয়েছে। নারী যখন প্রতিহিংসা পরায়ণা হয়ে ওঠে তখন এত বেশি অমানবিক হয়ে পড়ে যে পশুর সঙ্গে তার কোন পার্থক্য থাকে না। তার উপর ননদ ভাজের সম্পর্কে এমন একটা অহি-নকুল সম্পর্ক আছে যে, যার ফলে কেউ কাউকে সহ্য করতে পারে না। এই প্রসঙ্গে সেই পরিচিত ছড়াটি আমরা উদ্ধার করতে পারি—

"ভালো কথা পড়েছে মনে আঁচাতে আঁচাতে
ঠাকুরঝিকে নিয়ে গেল নাচাতে নাচাতে।"

—ননদ কুমীরের শিকার হয়েছে কিন্তু ভাজ ঘটনাটিকে তেমন গুরুত্বই দেয়নি। আসলে বোন চায় ভাইয়ের ওপর পূর্ব অধিকার কায়েম রাখতে, অপরদিকে ভাজ চায় স্বামীকে পুরোপুরি নিজের কর্তৃত্বে রাখতে। কিছুতেই স্বামীকে বোনের প্রতি কর্তব্য করতে দিতে সে অন্তর থেকে যেন সায় পায় না, তেমনই উভয়ের সম্পর্ক মধুর থাকুক এও তার কাম্য নয়। যাইহোক, হতভাগিনী ননদ ঘটনাচক্রে ঐশ্বর্যের অধিকারিণী হয়ে উঠলে তখন কিন্তু পরম সমাদরে ভাজ ননদের পরিবারকে নিজ গৃহে আমন্ত্রণ জানিয়েছে এবং নানাবিধ উপচার সামগ্রী দিয়েছে। ননদ মুখের ওপর জবাব দিয়েছে তার বৌ-ঝিরা কেউই কিছু খায়নি। ননদ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে, তার ভাজ তাদের সোনাদানাকে নিমন্ত্রণ করেছে। নারী সহজে অপমানকে বিস্মৃত হয়না। তার আত্মমর্যাদাবোধ প্রবল। এখানেও দেখি ননদ ভাজকে ঠিক সময়ে শিক্ষা দিয়েছে।

চৈত্রমাসের লক্ষ্মী পূজার কথায় মেজবৌকে পেয়েছি আমরা অত্যন্ত খিটখিটে স্বভাবের বলে। লক্ষ্মী ছদ্মবেশে এক ব্রাহ্মণ গৃহে কাজ করতে এসেছেন। নানা আচার তিনি মেনে চলেন। মেজবৌ তার এই আচার নিষ্ঠা কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। তার বক্তব্য হল বাড়ির কাজের লোকের এত আচার নিষ্ঠা কেন? "………দাসীবৃত্তি করতে এসে পাতের এঁটো খাবেন না, ছেঁড়া কাপড় কাচবে না, সুখ দেখে আর বাঁচিনা" আমরা এই মন্তব্য থেকে বাড়ির দাসী বা পরিচারিকা সম্পর্কে নারী মনস্তত্ত্বের সন্ধান পাই। প্রচলিত ধারণা হল জীবিকার তাগিদে যে মহিলা বাড়ির কাজে নিযুক্ত হয়েছে, তার এঁটোকাটায় কোন বাছবিচার থাকা উচিত নয়।

মহিলারা স্বভাবতই অলঙ্কার প্রিয় হয়ে থাকে। মেজবৌও হার পাবে শুনে সাত তাড়াতাড়ি ঝাঁপি খুলেছে আর সাপের ছোবলে মৃত্যুবরণ করেছে।

কোজাগরী লক্ষ্মী পূজার কথায় রাজা তার গোপন কথা বলতে চান না, কেননা বললে তার মৃত্যু হবে। রাণী কিন্তু নাছোড়বান্দা রাজার গোপন কথা শুনবেই। এমনকি তাতে যদি রাজার মৃত্যু হয় তাতেও পরোয়া নেই। রাজা জিজ্ঞাসা করেছে, "রাণী তুমি আমায় চাও, না কথা চাও? রাণী সোজাসুজি জানিয়ে দিয়েছে, "আমি কথা চাই" আমরা এর থেকেই বুঝি নারীর অনুসন্ধিৎসা এবং গোপন তত্ত্ব জানার আগ্রহ কত সুগভীর।

ক্ষেত্রব্রত কথায় ননদ ভাজের বিষময় সম্পর্ক উপস্থাপিত। ননদ তার পতিবিয়োগের পর একমাত্র সন্তানকে নিয়ে ভাই-ভাজের ঘরে আশ্রয় নিয়েছে। ভাজ কেমন করে তাকে অভ্যর্থনা জানাল? "ননদ আসতেই ভাজ দাসী ছাড়িয়ে দিলেন, রাখাল ছাড়িয়ে দিলেন, ছেলেটি ছাগল, গরু চরায়। তার মা গোয়াল ঝাড়ে, সমস্ত পাট ঝাঁট করে, রেঁধে রাখে, ভাজ সকলকে ভাত দেয়।" আমরা এখানে দেখি অবস্থার বিপাকে পড়ে যে ননদ ভা'য়ের বাড়ি আশ্রয় নিয়েছে সেই ভাজ কি অমানবিক আচরণ

করেছে। পুরুষের তুলনায় নারী ঘর গৃহস্থালির ব্যাপারে অনেক হিসাবী। ননদ এবং তার ছেলে যে থাকবে খাবে, সেই জন্য তার ভাজ ষোল আনা উসুল করে নিয়েছে, বাড়ির সর্বপ্রকার কাজে ননদ এবং ভাগ্নেকে নিযুক্ত করে। লক্ষ্য করার ভাজ ভাত দেওয়ার ব্যাপারটা নিজের হাতে রেখেছে। এর কারণ দ্বিবিধ-সংসারে কর্তৃত্ব বজায় রাখা, দ্বিতীয়তঃ ভাতের যেন অপচয় না হয় অথবা ননদ এবং ভাগ্নে কে পরিমিত পরিমাণে ভাত দিয়ে কিছুটা সাশ্রয় করা। ভাজ স্বামীকে ননদ এবং ভাগ্নের বিরুদ্ধে কান ভাঙিয়ে তাদের গৃহ ছাড়া করতে উদ্যত হয়েছে এর পরেও। কিন্তু ঘটনাচক্রে যখন ভাগ্নে, ননদের অবস্থা ফিরে গিয়েছে তখন কিন্তু দুজনকে বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে এনে কত কিছুই না খাইয়েছে। এক বাটি দুধ, সর এনে ভাগ্নের মুখের সামনে ধরে বলেছে, "খাও বাবা"। ভাগ্নেও হাসতে হাসতে বলে উঠেছে,

মামা মামির লাঙ্গ্‌লা বিশু,
জলার ধারে ঘর।
এখন কেন বিশুর মুখে
বাটি ভরা সর।"

মামি লজ্জায় আর মুখ তুলতে পারে না, অর্থাৎ নারী তেলা মাথায় তেল দিতে ওস্তাদ, আত্মীয়ের যদি দুরবস্থা ঘটে তবে নারী সেই হতভাগ্য আত্মীয়কে যেভাবে লাঞ্ছিত এবং অপমানিত করে প্রতি পদে পদে বাস্তবিকই তা বড়ই দুঃখের।

বারোমেসে মঙ্গলচণ্ডীতে আমরা লহনা এবং খুল্লনা এই দুই সতীনকে পেয়েছি। সচরাচর এক সতীন আর এক সতীনকে দেখতে পারে না। বাংলা প্রবাদে বিশেষ করে ব্রতের ছড়ায় এই সতীন বিদ্বেষ বিশেষভাবে প্রকটিত হযেছে। কিন্তু লহনা এর ব্যতিক্রম। আমরা লহনা, খুল্লনাব এই ভাব ভালোবাসা সম্পর্কের কারণটি বুঝতে পারি। খুল্লনার সন্তান আছে, লহনার নেই। বিরোধের অন্যতম কারণই হল সন্তান। যদি লহনার সন্তান থাকতো তাহলে কিন্তু খুল্লনা এবং তার সন্তানকে লহনা তেমন আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করত কিনা তা বলা যায় না।

'অশোক ষষ্ঠী'র কথায় দেখা গেছে রাণীরা কি পরিমাণে বিদ্বষ পরায়ণ। তারা নিজেরা বন্ধ্যা। তাই এক কনিষ্ঠা রাণী সন্তানসম্ভবা জেনে কাপড়ে তার চোখ তারা বেঁধে দিয়েছে এবং একটি কাঠের সিন্দুকে পর পর তার সাত ছেলেমেয়েকে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিয়েছে ছয় রাণী। অসুখীর সামনে রেখে দিয়েছে সাতটি কাঠের পুতুল। পরবর্তীকালে অসুখীর ছয় ছেলে এবং মেয়ে রাজা অশোকের আমন্ত্রণে রাজপ্রাসাদে খেতে গেলে রাণীরা তাদের খাবারে বিষ মাখিয়ে রেখেছিল। নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখতে এবং নিজেরা বন্ধ্যা রমণী হলেও অসুখী যেহেতু সন্তানবতী তাই হিংসার বশবর্তী হয়ে ছয় রাণী এমন নীচতার পরিচয় দিয়েছে যে আমরা এই অমানবিক আচরণ কল্পনাও করে উঠতে পারি না।

অধিকাংশ ব্রতকথাতেই আমরা দেখব সন্তানহীনা রমণী ষড়যন্ত্র করে সন্তানবতী সতীনের সন্তানকে বিনাশ করতে উদ্যত হয়েছে। যেমন 'কটকি ফুল' গল্পে সন্তানবতী নতুন রাণীকে রাজার কাছে হেয় প্রতিপন্ন করতে ধাত্রীর সাহায্যে নবজাতক দুটিকে সরিয়ে ফেলেছে এবং নতুন রাণী দুটি কুকুরছানা প্রসব করেছে বলে প্রচার করেছে। 'সাত ভাই চম্পা' গল্পেও দেখি ছোট রাণীর সন্তান হবে জেনে বড় রাণীদের মনে হিংসার আগুন জ্বলে উঠেছে। 'শঙ্খকুমার' গল্পে সন্ন্যাসী প্রদত্ত শিকড় বড় রাণীরা ইচ্ছা করে ভক্ষণ করেছে। ছোট রাণীকে বঞ্চিত করেছে যাতে সে সন্তানবতী না হয়। নারী মনস্তত্ত্বের আরেকটি দিক হল সন্তানের জন্য জননীর অন্তহীন অপত্য স্নেহ। শঙ্খকুমার গল্পে শঙ্খকুমার চলে যাওয়ার পর থেকে ছোট রাণীর খাওয়া পরার সাধ চলে গেছে।

লোককথা শুধুমাত্র আনন্দের প্রকাশই ছিল না, ইচ্ছাপূরণেরও মাধ্যম। লোককথায় থাকে ইচ্ছাপুরণের তাগিদ। জীবনে যা পাওয়া হল না লোককথার মাধ্যমে সেই ইচ্ছাগুলোকে মানুষ পূর্ণতা দিল। লোককথার প্রতীক রূপকের আড়ালে থাকে অবিচার, বেদনা, অত্যাচার, আশা—আকাঙ্ক্ষার • রূঢ় বাস্তব ছবি। যেকোন সমাজব্যবস্থাতেই দেখা যায় নারী মনস্তত্ত্ব প্রতিফলনের প্রধান হাতিয়ার এই লোককথা। সমাজের সর্বস্তরের মানুষ নিয়ে লোককথার সৃষ্টি হয়েছে। বাল্য বিবাহ, বহুবিবাহ, যৌতুক প্রথা, সতীন বিদ্বেষ, সৎমার ঈর্ষাকাতরতা ইত্যাদি ছবি প্রতিফলিত হয়েছে লোককথার খণ্ড খণ্ড চিত্রের মাধ্যমে।

শিশুকালে বিবাহের পর থেকেই সে গৃহকোণে অন্তরীণ। সন্তান ধারণ— পালন করতেই কবে যেন সে বার্ধক্যে পৌঁছে যায়, নিজের কথা ভাবার সুযোগ হয়না। সমাজে এক নারী একপুরুষ এই ধারণা শুধু মেয়েদের বেলাতেই প্রযোজ্য। পুরুষের স্বাভাবিক অধিকার ছিল বহুগামিতায়। পুরুষ শুধু চিনেছে বীর ভোগ্যা পৃথিবী আর রূপমুগ্ধা নারী। তাই মাতৃ আজ্ঞা পালনের দোহাই দিয়ে দ্রৌপদীকে ভোগ করেছে পাঁচ ভাই। নিজস্ব ইচ্ছা-অনুভূতিকে দূরে সরিয়ে বার বার সন্তানবতী হ'য়েছে সে। আর অর্জুন— যাকে দ্রৌপদী ভালোবেসেছিল সে স'রে গেছেএকনারী থেকে অন্য নারীতে। দ্রৌপদী তো একটি প্রতীক মাত্র। সমাজের বাস্তব রূপটাই এই। পতি প্রেমের ভাগীদার সহ্য করতে না পারলেও সে আটকাতে পারেনি স্বামীর নারী বিলাস। তাই সতীনের প্রতি সে বিষোদগার করেছে রূপকথায়, ব্রতকথায়। কবেকার কোন্ কালের লোককথায় যে সামাজিক বৈষম্য ছিল, তার পরিবর্তন হয়নি এখনও। মাওয়ের ভাষায়, অর্ধেক আকাশ যে নারী তার আজও বুক ফাটে তবু মুখ ফোটে না' নীতিকে আঁকড়ে ধ'রে ভাগ্যের দোহাই দিয়ে নিছকই 'মেয়েছেলে' ব'নে আছে। নারী আজও ছাতা হ'য়ে থাকে, যার তলে সুখে বাঁচে সংসার।

হয়ত কোনদিন বদলে যাবে এই দৃশ্য। নিছক মেয়ে ছেলের ধারণা থেকে মুক্ত হ'য়ে নারী একদিন বলবে— 'আমিই সেই মেয়ে— আগুন আমাকে পোড়াইতে পারেনা।

জল আমাকে পচাইতে পারেনা। বায়ু আমাকে শুষ্ক করিতে পারে না। আমি অজর, অমর, অব্যয়'।

গ্রন্থপঞ্জী

১) আলম, ওহীদুল। ১৯৮৫; চট্টগ্রামের লোকসাহিত্য।

২) ইসলাম, মযহারুল। ১৯৯৩, ফোকলোর ঃ পরিচিতি ও পঠনপাঠন। ঢাকা।

৩) চক্রবর্তী, বরুণকুমার। ১৯৯৩, বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস। তৃতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ।

৪) চক্রবর্তী, বরুণ কুমার, ১৯৯৪, লোকসংস্কৃতির সুলুক সন্ধানে। বুকট্রাস্ট, কলকাতা

৫) দেবী, ইন্দুমতী। ১৯২৭, বঙ্গনারীর ব্রতকথা।

৬) দেবী, সুরমা। ১৯০৮, ইতুর কথা। ভারতী, কলকাতা।

৭) পাঠান, মুহাম্মদ হাবিবুল্লা। ১৯৯৬, '৯৭, '৯৮ বাংলাদেশের লোককাহিনী। ১ম খণ্ড, ২য় খণ্ড, ৩য় খণ্ড।

৮) বসাক, শীলা। ১৯৯৮, বাংলার ব্রতপার্বণ। পুস্তক বিপণি, কলকাতা।

৯) বসু, রীতা। ১৯৮৫, ব্রতকথার কথা। অরিত্র, কলকাতা।

১০) বন্দ্যোপাধ্যায়, সুভাষ। পশ্চিম সীমান্তবঙ্গের লোকসাহিত্য।

১১) ভট্টাচার্য, আশুতোষ। ১৯৬৬, বাংলার লোক-সাহিত্য। ৪র্থ খণ্ড।

১২) মজুমদার, আশুতোষ। মেয়েদের ব্রতকথা। দেব সাহিত্য কুটীর,কলকাতা।

১৩) মজুমদার, দিব্যজ্যোতি। ১৯৯৩, বাংলার লোককথার টাইপ ও মোটিফ ইনডেক্স।

১৪) মজুমদার, দিব্যজ্যোতি। লোককথার ঐতিহ্য।

১৫) মিত্র মজুমদার, দক্ষিণারঞ্জন। ১৯০৭, ঠাকুমার ঝুলি।

১৬) মিত্র মজুমদার, দক্ষিণারঞ্জন ১৯০৯, ঠাকুরদার ঝুলি।

১৭) মুখোপাধ্যায়, আশুতোষ। ১৯১৪, মেয়েদের ব্রতকথা

১৮) রায়চৌধুরী, উপেন্দ্রকিশোর। ১৯১০, টুনটুনির বই।

১৯) সিদ্দিকী, আশরাফ। লোকসাহিত্য। প্রথম খণ্ড ১৯৭৭, দ্বিতীয় খণ্ড দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৮০।

২০) Dey, Lalbihari 1883, Folktales of Bengal

২১) দেবী সুহাসিনী। ১৯৮৫, মেয়েলী ব্রতকথা, পুস্তক বিপণি, কলকাতা।

লোককথায় ব্যভিচার

বিকাশ পাল

মৌখিক সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হল লোককথা বা লোককাহিনী (Folktale)। শ্রুতিপরম্পরায় সৃষ্ট ও পুষ্ট হলেও লোককথার প্রাণশক্তিতে এমন কিছু শক্তিশালী উপাদান আছে যা যুগযুগান্তর ধরে একে প্রতি পালন করে আসছে। সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় লিখিত কথা সাহিত্য একদা আমাদের দেশে মৌখিক পরম্পরায় প্রবহমান ছিল। সংস্কৃত ভাষায় রচিত কথা সরিৎসাগর, দশ কুমার চরিত, বৃহৎ-কথা-মঞ্জরী, হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্র, প্রাকৃত ভাষায় বৃহৎ কথা— পালি ভাষায় জাতক কাহিনি তো মৌখিক কথা সাহিত্যের অন্তর্গতই ছিল। পরবর্তীকালে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীতে প্রচারিত হয়ে পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুযায়ী অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। যার ফলে লোককথাকে শিশুসাহিত্যের অন্তর্গত করে নিছক শিশুর কৌতূহলোদ্দীপক করে না দেখাই সমীচীন হবে। পল্লীগ্রামের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্নভাবে প্রচাবিত হওয়ায় তার মধ্যে সমাজেতিহাসের বহুবিচিত্র উপাদান প্রবেশ করে গেছে। ফলে লোক যেমন অশিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত মনের রসপিপাসা চরিতার্থ করেছে তাই নয়, পরিণত বয়স্ক ও পরিণত বুদ্ধির মানুষেরও উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। লিখিত কথা সাহিত্যের মত মৌখিক কথাসাহিত্যে সমাজের রূপ পরিস্ফুট হতে পারে না, তবে বিশেষ কালের রূপটি অন্বেষণ করা যেতে পারে।

লিখিত কথাসাহিত্য অর্থাৎ উপন্যাস ও ছোটগল্প-এর সঙ্গে মৌখিক কথা সাহিত্যের পার্থক্য অনেক, কিন্তু তা সত্ত্বেও লিখিত কথা সাহিত্যের সঙ্গে এর মিলও কম নয়। উদ্দেশ্যগত দিক থেকে সাযুজ্য আছে। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এসম্পর্কে যথার্থ বলেছেন— "উহার মধ্যে যথেষ্ট অলৌকিকতা থাকিলেও, উহার আকাশ-বাতাসে মায়া-মোহ ইন্দ্রজালের একটি ঘন প্রলেপ থাকা সত্ত্বেও, একটু সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিলে বুঝা যাইবে যে, লেখক ইহাতে মানুষের লৌকিক ও সামাজিক ব্যবহারেরই পরিণাম দেখাইয়া তাহারই উপর নিজ সমালোচনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।" (বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা পৃ. ১২)

সুতরাং মৌখিক কথা সাহিত্য বা লোককথায় অলৌকিকতা ও ধর্মকথার মোড়কটি ব্যবহৃত হলেও মানুষের জীবনকথাই প্রাধান্য লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথ আমাদের সকল আশ্রয়ের আশ্রয়, সুতরাং তাঁর প্রসঙ্গে আসতেই হয়। বাংলাদেশের মায়েদের কণ্ঠে উচ্চারিত লোককথা বাংলাদেশের সকল কিছুর সঙ্গে মিলে এক অবিচ্ছিন্ন, অবিচ্ছেদ্য সত্তায় পরিণত হয়েছে। সেকারণে মহা কবি রূপকথাকে কোনো ভাবেই বাঙালি জীবন

থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেন নি। রবীন্দ্রনাথ 'ঠাকুমার ঝুলি' গ্রন্থের ভূমিকা অংশে রূপকথা সম্পর্কে যে কথা বলেছেন তা অতীব মূল্যবান, "এই যে আমাদের দেশের রূপকথা বহুযুগের বাঙ্গালী বালকের চিত্তক্ষেত্রের উপর দিয়া অশ্রান্ত বাহিয়া কত বিপ্লব, কত রাজ্য পরিবর্তনের মাঝখান দিয়া অক্ষুণ্ণ চলিয়া আসিয়াছে, ইহার উৎস সমস্ত বাংলাদেশের মাতৃস্নেহের মধ্যে। যে স্নেহ দেশের রাজ্যেশ্বর রাজা হইতে দীনতম কৃষককে পর্যন্ত বুকে করিয়া মানুষ করিয়াছে, সকলকেই শুক্ল সন্ধ্যায় আকাশে চাঁদ দেখাইয়া ভুলাইয়াছে এবং ঘুমপাড়ানি গানে শান্ত করিয়াছে, নিখিল বঙ্গদেশের সেই চিরপুরাতন গভীরতম স্নেহ হইতে এই রূপকথা উৎসারিত।

অতএব বাঙ্গালীর ছেলে যখন রূপকথা শোনে তখন কেবল যে গল্প শুনিয়া সুখী হয়, তাহা নহে— সমস্ত বাংলাদেশের চিরন্তন স্নেহের সুরটি তাহার তরুণ চিত্তের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, তাহাকে যেন বাংলার রসে রসাইয়া লয়।"

লোককথা নির্বিশেষ হলেও একটি জাতির জাতীয়চরিত্র এর মধ্যে পরিস্ফুট হয়ে থাকে, তা না হলে জাতীয় সাহিত্য হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেতে পারে না। এবং বাস্তব জীবনাশ্রয়ী সাহিত্য না হলেও বাস্তব জীবন থেকে বহুদূরে অবস্থিত নয়, বিশেষত মানব চরিত্র সম্পর্কে রচয়িতার অভিজ্ঞতা ও মূল্যায়ন এতে ফুঠে উঠে। পরীকথা, পশুকথা, নীতিকথা যাইহোক না কেন, এর চরিত্রগুলি কিন্তু মানবিক। পরীকথার পরী-চরিত্র, নীতিকথার চরিত্র কিংবা পশুকথার পশু-চরিত্র আচারে, আচরণে মানুষের মত, তাদের আবেগ-আকাঙ্ক্ষা মানুষের মত। নীতি কথার শেষে নীতিবাক্য উচ্চারিত হয়, তেমনি অন্যান্য শ্রেণির লোককথাতেও এক জাতীয় নীতি বাক্য, উপদেশ অনুচ্চারিত ভাবে হলেও থেকে যায়। সমাজ চরিত্র এবং মানব চরিত্র সম্পর্কে রচয়িতার অভিজ্ঞতা মানুষকে সংযত ও সচেতন করে তুলতে সাহায্য করে। সেই অভিজ্ঞতা জাত নীতিমূলক সত্য বা সত্যটি বাস্তব জীবনাচরণেরপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও নির্বিশেষ হয়ে থাকে। সত্যের জয়, অসত্যের পরাজয়, পুণ্যের জয় ও পাপের ক্ষয় মানব চরিত্রের উত্থান-পতন, স্খলনের মধ্য দিয়ে দেখানো হয়ে থাকে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ লোককথার বিষয়, রূপ ও অর্থের বিচারে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। এই শ্রেণিগুটি নিম্নরূপ ঃ (বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ— সম্পাদনা বরুণ কুমার চক্রবর্তী)

১। রূপকথা (Fairytale)

২। ব্রতকথা (Religious tale)

৩। পুরাকথা (Myth)

৪। পশুকথা (Animal tale)

৫। নীতিকথা (Fable)

৬। সন্তকাহিনি (Sage tale)

৭। বীরকথা (Hero tale)

৮। রোমাঞ্চকর গল্প (Novella)

৯। লোকপুরাণ (Legend)

১০। হাস্য-ব্যঙ্গের গল্প (Humourous tale)

১১। ব্যাখ্যাদানকারী গল্প (Explanatary tale)

সকলে শ্রেণীর লোককথাতেই মানব-চরিত্রের অনুবর্তন বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যেতে পারে। কখনো ধর্মকথার মোড়কে, কখনো পশুপাখির আচার-আচরণে, কখনো ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গীতে মানব চরিত্রের স্খলন-পতন, দোষ ক্রটি দেখিয়ে সংযত ও সচেতন করার প্রবণতা দেখা যায়। বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলিতে এই প্রবণতা পরিষ্কার ভাবে দেখা যেতে পারে। বাংলা লোককথার সঙ্গে মঙ্গলকাব্যগুলি ও অন্যান্য আখ্যায়িকামূলক কাব্যের অনিবার্য যোগ লক্ষ্য করা যেতে পারে। লোককথায় যা নির্বিশেষভাবে পরিবেশিত, মঙ্গলকাব্য ও অন্যান্য আখ্যায়িকা মূলককাব্যে দেশকালের সীমায় তা বিধৃত হয়েছে। লোককথায় যা সূত্রাকারে বিধৃত, মঙ্গলকাব্য ও অন্যান্য আখ্যায়িকা মূলককাব্যে তা বিশদভাবে পরিবেশিত। বাংলা মঙ্গলকাব্যের প্রেরণা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে লোককথার মধ্য থেকেই এসেছে।

বাঙালি সমাজে চারিত্রিক দৃঢ়তা ও নারীর সতীত্বের উচ্চমূল্য ছিল। পুরাকাহিনির সাবিত্রী থেকে মঙ্গলকাব্যের বেহুলা, খুল্লনা সতীত্বের উচ্চ আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে প্রশংসিত হয়েছে, তেমনি বিদ্যা, সুরীক্ষা, নয়ানী বৌরা নিন্দিত হয়েছে। চারিত্রিক দৃঢ়তার জন্য গোরক্ষনাথ প্রশংসিত, মীননাথ নিন্দিত. চারিত্রিক স্খলনের জন্য চাঁদের পতন ঘটে মনসামঙ্গলে। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখা যায় সামাজিক ন্যায়নীতির আড়ালে চলে ব্যভিচারিতা। বাংলা লোককথার মধ্যেও তাই ব্যভিচারিতার প্রসঙ্গ দুর্লক্ষ্য নয়। সাধারণভাবে লোককথায় ন্যায়-নৈতিকতা, ধর্মবোধের প্রসঙ্গ থাকে, অশ্লীলতা ও ব্যভিচারিতার প্রসঙ্গ প্রায় থাকে না বা লোককথা সাধারণভাবে তা থেকে মুক্ত। আশুতোষ ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, 'বহিরাগত শ্রেণীর কিছু লোককথায় অশ্লীলতার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। মঙ্গল কাব্য ও আখ্যায়িকামুলক কাব্যে দেবতার আশ্রয়ে-প্রশ্রয়ে, ধর্মকথার আবরণে ঢেকে তা পরিবেশিত হয়েছে। আরসমাজ জীবন যেহেতু সাহিত্যে চূড়ান্তভাবে অভিব্যক্ত হয়, তাই মানব চরিত্রের চূড়ান্ত অনুবর্তনই তাতে স্বাভাবিক।

'দিবসই বহুড়ী কাড়ই জর ভাঅ।
রাতি ভইলে কামরু জাএ"।

চর্যাকার কুক্কুরী পাদের রচিত পদে এই তথ্যটি লোকজীবনের ব্যভিচারিতাকে ইঙ্গিত করে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে রাধাকৃষ্ণের লৌকিক প্রেমকাহিনীতে ব্যভিচারের প্রসঙ্গটি ধর্মকথার অন্তরালে পরিবেশিত হয়েছে। লোককথার বিভিন্ন উপাদান কালক্রমে মঙ্গলকাব্যে মিশেছে— তার অন্যতম একটি হল অলৌকিক জন্ম প্রসঙ্গ। লোকশ্রুতিবিদ্‌গণ যাকে 'Supernatural birth motif' বলে থাকেন। এতো আসলে এক জাতীয় ব্যভিচারিতা। মনসামঙ্গলে শিববীর্যো অযোনীসম্ভবা কন্যা মনসার জন্ম।

বেলফল দেখে গৌরীর স্তন ভেবে গাছে আলিঙ্গন দান, বীর্যপাত, পদ্মপাতায় শিব-বীর্য স্থাপন ও সেখানে অযোনী সম্ভূতা মনসার জন্ম। পদ্মপাতার বিশেষ আকৃতি এখানে তাৎপর্যপূর্ণ। শিবের নেত্রাংশু থেকে বা ঘাম থেকে নেতা ও ধামাই-এর জন্ম কিংবা নাথ সাহিত্যে গোরক্ষনাথের কাহিনিতে গোরক্ষনাথের কৌপিন ধোয়া জলপান করে বিরহিনী নামক নারীর গর্ভে কর্পাটিনাথের জন্ম অলৌকিক জন্মকথা। লোককথায় সন্ন্যাসী প্রদত্ত ফল ভক্ষণ করে গর্ভ সঞ্চার একটি স্বাভাবিক দৃষ্টান্ত।

মনসামঙ্গল কাব্যে চাঁদ মনসার লোক কাহিনিতে ছদ্মবেশী মনসার প্রতি চাঁদের ব্যভিচারি মনোভাব দেখা যায়। ধর্মমঙ্গল কাব্যে নয়ানী-বৌ প্রসঙ্গ, সুরীক্ষার বৃত্তান্ত, বা নাথ সাহিত্যে মীননাথের যোলশত রমণী পরিবেষ্টিত হয়ে কদলী রাজ্যে বাস, গোপীচন্দ্রের গানে হীরানটীর প্রসঙ্গ- অলৌকিকতা পূর্ণ, লোককাহিনির বৈশিষ্ট্যযুক্ত ব্যভিচারিতা। মনসামঙ্গল ও শিবায়নে শিবের বাগদিনী সাহচর্য সামাজিক ব্যভিচারিতা। কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর কাব্যে বিদ্যা ও সুন্দরের অবৈধ প্রণয় ও গর্ভসঞ্চার সামাজিক ব্যভিচারিতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত বহন করে। এখানে দেবীকালিকাকে ব্যভিচারিতার সহায়ক হিসাবে দেখিয়ে সমাজ মানসের চূড়ান্ত অবনমনকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই ব্যভিচারিতা যে সর্বদা সামাজিকভাবে নিন্দিত ছিল তাও নয়। অনেক সময় স্ত্রীরাও পুরুষের ব্যভিচারিতার সহায়ক হত। মনসামঙ্গলে ধন্বন্তরীর কাহিনিতে দেখা যায় ধন্বন্তরীর স্ত্রী তার সই (ছদ্মবেশী মনসা)কে স্বামীর ভোগের জন্য তুলে দিচ্ছে—

> "সহেয়ার হ্যাব্যাস যদি বাড়ে তবমনে।
> রঙ্গে নিশি বঞ্চিহ আমার স্বামী সনে।।"

লোককথায় ব্যভিচারিতার প্রসঙ্গ খুব বেশি নেই, তা সত্ত্বেও বিভিন্নভাবে এই প্রসঙ্গের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যেতে পারে; যেমন অলৌকিক জন্ম কথা, অবৈধ প্রণয় প্রসঙ্গ, রাক্ষসী ও মানবীর ছদ্মবেশ ধারণ প্রসঙ্গ ইত্যাদি।

লোককথায় বিভিন্ন সময়ে অলৌকিক উপায়ে সন্তান লাভের প্রসঙ্গ দেখা যায়। মনসামঙ্গলে মনসার জন্মসম্পর্কিত লোককথায় যে অলৌকিকতা দেখা যায় তারকথা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। অলৌকিক উপায়ে সন্তান লাভের প্রসঙ্গ প্রায় সকল শ্রেণির লোককথাতেই আছে। সন্ন্যাসী ফকির, কিংবা অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন দেবতা প্রদত্ত কোনবস্তু আহার করে নারীর গর্ভধারণের প্রসঙ্গ আছে। আম, নারিকেল, ডালিম, ঔষধিগুণ সম্পন্ন গাছের শিকড়বাকড় ভক্ষণ করে গর্ভধারণের প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। আপাত দৃষ্টিতে অলৌকিক জন্ম মনে হলেও তা যুক্তি তর্কের অতীত নয়। ঔষধি গুণসম্পন্ন গাছ-পাতা, ফুল-ফল খেয়ে বন্ধ্যানারীর গর্ভাধান অলৌকিক নয়। মনসামঙ্গলে মনসার জন্ম প্রসঙ্গে ধর্মের রূপকে ব্যভিচারিতাই প্রাধান্য পেয়েছে। রামায়ণে সন্ন্যাসী প্রদত্ত প্রসাদ ভক্ষণ করে তিন রাণীর সন্তান লাভ, কথা সরিৎ সাগরে সন্ন্যাসী প্রদত্ত ফল ভক্ষণ করে বাসবদত্তার গর্ভসঞ্চার বা শিবপ্রদত্ত ফল ভক্ষণ করে

বিক্রমাদিত্য-জননীর গর্ভসঞ্চার। মহাভারতে কুন্তীর কানীন পুত্র কর্ণের জন্ম প্রসঙ্গ অলৌকিক জন্ম প্রসঙ্গ, কিন্তু সত্যবতীর গর্ভধারণের প্রসঙ্গে কিংবা বিচিত্রবীর্য ও ধৃতরাষ্ট্রের জন্ম প্রসঙ্গে অলৌকিকতা নেই, আছে ব্যভিচারিতা।

'ডালিমকুমারের রূপকথায়' দেখা যাচ্ছে 'ডালিমফুলের' সঙ্গে গাছের শিকড় বেটে খেয়ে রানীর গর্ভসঞ্চার হয়েছে। 'মধুমালা' গল্পে সোনার পাখির মাংস খেয়ে রানীর গর্ভসঞ্চার হয়েছে। এবং পাখির মাংস খেয়ে যে সন্তানের জন্ম হল সে পাখির চরিত্র গুণসম্পন্ন। পুষ্পমালা, মালঞ্চমালা, কটকি ফুল ইত্যাদি অনেক গল্পেই এরকম জন্মের কথা আছে। এই জন্ম প্রসঙ্গগুলিতে ভিন্নতা আছে। মন্থন ষষ্ঠী ব্রতকথায় দেখা যায় পুকুরে জল সঞ্চার করতে গিয়ে বৃদ্ধের নাতির রক্ত দিতে হয়েছে। পুকুরে জল সঞ্চার করার প্রসঙ্গটি তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয়। পুষ্পমালা গল্পটিতে পুত্র সরোবরে নাইতে গিয়ে প্রতিশ্রুতি এবং সন্তান লাভ প্রসঙ্গ দেখা যায়। অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন জলবিন্দুর সন্তান উৎপাদনকারী শক্তি আছে— এরকম বিশ্বাস করা হয়ে থাকে। অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন জল বিন্দু যে পুরুষের বীর্য সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। লোকসমাজে পুরুষের বীর্যপাতের প্রসঙ্গটিকে বৃষ্টিপাতের সঙ্গে এক করে দেখা হয়ে থাকে। সন্তান উৎপাদন ও শস্য উৎপাদন উভয়ই উর্বরতাবাদের সঙ্গে যুক্ত। কোচবিহার অঞ্চলে রাজবংশী নারীরা বৃষ্টিকামনায় হুদুমা দ্যাও ব্রত পালন করে থাকে। এই ব্রতে নারীরা উলঙ্গ অবস্থায় নৃত্যগীতের মাধ্যমে ব্রত পালন করে থাকে। পুরুষ এই দৃশ্য দেখতে বা ব্রতে যোগদান করতে পারে না। নাচগানের মধ্য দিয়ে বৃষ্টিপাত ঘটানোর ব্যাপারটির মধ্যে প্রজনন সংক্রান্ত সুপ্রাচীন বিশ্বাস ও সংস্কার আছে। মন্থনষষ্ঠী ব্রতের মন্থন ব্যাপারটির মধ্যে যৌনতার ইঙ্গিত আছে। মহাভারতের 'ঋষ্যশৃঙ্গ' কাহিনিকে ভিত্তি করে বুদ্ধদেব বসু' 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী' নাটক রচনা করেছেন। সেখানে নারীর মোহিনি মায়ায়প্রলুব্ধ করে এক ঋষিপুত্রের কৌমার্য্যভঙ্গ করে বৃষ্টিপাতের প্রসঙ্গ আছে। বুদ্ধদেব বসু এখানে শব্দধ্বনির সাহায্যে যে ভাষ্য রচনা করেছেন তা নারী পুরুষের দেহমিলনের চিত্র :

সর্প তোলে ফণা, ফেনিল হল সমুদ্র।
চলে মন্থন —মন্থন—মন্থন। দীর্ণ মেঘ, তীব্রবেগ।
রন্ধ্রে রন্ধ্রে পরিপূর্ণ ধরণী। বর্ষণ-বর্ষণ-বর্ষণ।।

রাঢ় অঞ্চলে ধর্মঠাকুরের পূজাচারে দেখা যায় ধর্মরাজোর শিলামূর্তিকে আনুষ্ঠানিকভাবে পুকুরে স্নান করানো হয় এবং বন্ধ্যানারীগণ পুত্র কামনায় শিলামূর্তি ধোয়া জল বিন্দু মাথায় ধারণ করে থাকে। বিশ্বাস করা হয় এর দ্বারা তাদের সর্ভসঞ্চার হবে। হিন্দুধর্মে শিবলিঙ্গ উপাসনা একই কামনা থেকে। প্রাচীনরোমে 'ফিস্ট অব লুম্পপারক্যালিয়া' বা লুপার ক্যালিয়া উৎসবে পুরুষরা উলঙ্গ হয়ে একটি লাঠি হাতে দৌড়ায়। বন্ধ্যানারীগণ ঐ লাঠিকে ছুঁয়ে দেবার চেষ্টা করে সন্তান কামনায়। এই সব আচরণের লক্ষ্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

মানুষ পুত্র কন্যার মধ্যে দিয়েই নতুন করে বাঁচার চেষ্টা করে। নিঃসন্তান হলে

তাদের মানসিক টানা পোড়েন থাকে। নারীর ক্ষেত্রে এই প্রবণতা আরো বেশী হয়। কিন্তু পুরুষতান্ত্রিকতা ও বিবাহ প্রথা যৌন স্বাধীনতাকে নষ্ট করেছে, ফলে অবদমিত কাম বা লিবিডোকে নানাভাবে প্রতিপূরণ করার চেষ্টা করে। তাই দেখা যায় লোককথার রাজা বা রানী কে সন্তান উৎপাদনে অক্ষম তা দেখা হয় না, পক্ষান্তরে নারীকে ঔষধ খাওয়ানো হয় এবং গর্ভাধান হয়। সুতরাং দেখা যায় ফল ভক্ষণ, বা অলৌকিকগুণ সম্পন্ন দ্রব্য ভক্ষণ সামাজিক ব্যভিচারের উপর নৈতিকতার প্রলেপ। এমনকি এখানে মানবীর গর্ভে পশুর জন্ম বা পশুর গর্ভে মানুষের সন্তান উৎপাদনের প্রসঙ্গও দেখা যায়। আবার নিজের শরীরের যে কোন অঙ্গ থেকে সন্তান উৎপাদনের প্রসঙ্গও আছে। ত্রিপুরী আদিবাসী লোককথায় নিজের উরুদেশ থেকে সন্তান উৎপাদনের প্রসঙ্গ আছে। এক জুমিয়া চাষির উরুদেশে কাঁটা ফোটে এবং তাতে ঘা হয়ে যায়, সেই কাঁটা বের করতে গিয়ে এক কন্যা বেরিয়ে আসে। সামাজিক ব্যভিচারিতাকে অলৌকিকতার প্রলেপ দিয়ে গ্রহণ করা হয়েছে।

লোককথার অলৌকিক জন্ম প্রসঙ্গের মধ্য দিয়ে জাত সন্তানের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য গল্পের পিতার মত হয় না, বরঞ্চ অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন বস্তু আহার করে লব্ধ সন্তানও অলৌকিক গুণ সম্পন্ন হয়ে থাকে। নানারকম দুঃসাহসিক অভিযান ও বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে শেষে প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং প্রকৃত পিতার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই সন্তানে বর্তায়।

লোককথায় অবৈধ প্রেম বা প্রণয় কাহিনি নিয়ে কিছু কিছু গল্পের সন্ধান পাওয়া যায় যে প্রেমকে সামাজিক দৃষ্টিতে ব্যভিচার বলা যায়। তাছাড়া রক্তের সম্পর্কযুক্ত প্রণয়ে অবৈধ যৌনসম্পর্ক স্থাপন বা অজাচারের ইঙ্গিত কোন কোন লোককথায় পাওয়া যায়। এ বিষয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন আদিম জনগোষ্ঠীতে বিভিন্ন রকম বিধি বিধান আছে। টোটেম নিয়ম অনুযায়ী একই টোটেম ভুক্ত মানুষের ক্ষেত্রে বিবাহসম্পর্ক অবৈধ বা ব্যভিচার বলে গণ্য হবে। মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় সন্তান মাতৃ টোটেমভুক্ত হয় আর পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় সন্তান পিতার টোটেমভুক্ত হয়। তাই পুত্র-মাতা, ভাই-বোন, পিতা-কন্যার যৌন সম্পর্ক অজাচার সম্পর্ক বলে গণ্য হয়।

লোককথায় পুত্র-মাতা, ভাই-বোনের প্রণয় সম্পর্কের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। পুত্র ও মাতার প্রণয়ের সমাজ বিগর্হিত রূপ দেখা যায় 'বিজয় বসন্ত' গল্পে; শীতবসন্ত গল্পেও তার সামান্য ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সপত্নী সন্তানের প্রতি ঈর্যাবশত গৃহ থেকে বিতাড়িত করার দৃষ্টান্ত বাংলা লোককথায় প্রচুর— কিন্তু তাকে ব্যভিচারিতা বলা যায় না। শীত বসন্ত গল্পে বিমাতা শীতবসন্তকে ঈর্যাবশত বিতাড়িত করে। পুরকথার 'কদ্রু-বিনতার' কাহিনিতেও এটা দেখা যায়। বিজয় বসন্ত গল্পে দেখা যায় বিমাতা রাজপুত্র বিজয়ের প্রতি প্রণয়াসক্ত হয়েছে। রাজপুত্রকে রেখে কন্যাসমা নারীকে বিবাহ করার ফলশ্রুতি আদায় এবং দেখা যায় বৃদ্ধ রাজা রানী প্রেমে ব্যর্থ হয়ে প্রতিশোধ স্পৃহাবশত রাজপুত্র দ্বয়কে বিতাড়িত করতে রাজাকে উত্যক্ত করেছে। গ্রীকপুরাকথা অবলম্বনে ওভিদ

Heroic Epistles বা Heroidas' নামে পত্রকাব্য রচনা করেছেন। এখানে দেখা যায় বিমাতা ফিড্র (Fidra) সপত্নীপুত্র হিপ্পোলিটাসের প্রতি প্রণয় জ্ঞাপন করেছে। বিজয়বসন্তের কাহিনি অবলম্বনে জি.সি. গুপ্ত 'কীর্তিবিলাস' নাটক রচনা করেছেন। ভারতীয় পুর কথায় পুত্রস্থানীয়ের প্রতি বা মাতৃস্থানীয়ের প্রতি প্রণয় জ্ঞাপনের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। মধুসূদন এর 'বীরাঙ্গনা' কাব্যে 'সোমের প্রতি তারা' পত্রিকায় সোমদেবের প্রতি তারার অবৈধ প্রণয়ের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। পুরাকথায় অবশ্য মাতৃস্থানীয়া গুরুমাতা তারার প্রতি সোমের প্রণয়ের কথা আছে।

লোকসমাজে শাশুড়ী-জামাই এর সামাজিক মেলামেশা ও আচরণ বিষয়ে নানা বিধি নিষেধ আছে। শ্বশুর-পুত্রবধূর সম্পর্কের বিধিনিষেধ থাকলেও তাতে খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ কিছু নেই। হিন্দুসমাজে জামাইকে শাশুড়ীর চুল দেখা নিষেধ বলে শাশুড়ীকে ঘোমটা দিয়ে থাকতে হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে এ নিয়ে নানা বিধিনিষেধ আছে। জুলু ফাফিরদের মধ্যে দেখা যায় জামাই শাশুড়ীর সান্নিধ্য যথাসম্ভব এড়িয়ে চলে। শাশুড়ী-জামাই-এর এই আচরণের কারণ হিসাবে স্যার জে লাবক 'The Origin of civilization' গ্রন্থে বলেছেন বিবাহ প্রথার প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে। প্রাচীন কালে কন্যা হরণ করে বিবাহ করার ফলে কন্যার মাতার ক্রোধ থাকত জামাই এর প্রতি। পরবর্তীকালে আনুষ্ঠানিক বিবাহ হলেও মায়ের ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ ও এড়িয়ে চলার প্রতীক হয়ে গেল আচরণ। ই.বি. টেলরসাহেব মনে করেন জামাতা বহিরাগত, স্বভাবতই তার পরিবারে বহিরাগত একজনের প্রবেশকে মেনে নিতে পারে না। কিন্তু ফ্রয়েডের মতে শাশুড়ী-জামাই সম্পর্কে ভালবাসা ও ঘৃণার উভয় বলতা কাজ করে। শাশুড়ী মেয়ের উপর কর্তৃত্ব ত্যাগ করতে পারে না অন্যদিকে জামাই স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মাঝখানে তৃতীয়জনকে পছন্দ করে না অথচ বিগত যৌবনা শাশুড়ীর চেহারায় স্ত্রীর সাদৃশ্য খুঁজে পেয়ে পীড়িত বোধ করে। মনঃসমীক্ষণ অনুযায়ী ব্যক্তি মনের গহনে নিহিত কামজ প্রেষণ অবচেতনে কাজ করে— যা সামাজিক বিচারে অবৈধ বা ব্যভিচারী।

বাংলা লোককথায় জামাই হল বোকা। এর কারণ পূর্বোক্ত অর্থাৎ শাশুড়ীর কন্যাকে জামাই অপহরণ করে— যেকারণে জামাই বাবাজীদের প্রতি শ্বশুর বাড়ির প্রত্যেকের সুপ্ত ক্ষোভ থাকে। সেকারণে জামাই ঠকানো, কানমলা দেওয়া জাতীয় নির্যাতন শ্যালক-শ্যালিকাগণের হাতে জামাই-এর প্রাপ্য। সেকারণে লোককথায় জামাইকে বোকা প্রতিপন্ন করা হয়। তাছাড়া শাশুড়ী-জামাইকে নিয়ে রঙ্গরসিকতা প্রচলিত আছে যা অনেক সময় শ্লীলতাকে অতিক্রম করে যায়। বিয়ের গানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জামাই ও শাশুড়ীর প্রতি গালিগালাজ।

শাশুড়ী-জামাই এর সম্পর্ক নিয়ে অনেক গল্প প্রচলিত থাকলেও উভয়ের সম্পর্কের অবৈধতা নিয়ে বাংলা লোককথায় সন্ধান তেমন পাওয়া যায় না। গোপাল ভাঁড়ের গল্পে শাশুড়ী লেবু তুলতে গিয়ে জামাই-এর হাতে পড়ে নাকাল হয়েছিল, এর

পরে জামাই আর আনতে যায় না শাশুড়ী। আর একটি লোককথা 'কপালের অন্ন'। বোকা জামাই শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছিল। এমন সময় এক সাধু তাকে বলে, আজ রাতে তার কপালে অন্ন নেই। শ্বশুর বাড়ি গিয়ে জামাই শ্যালকগণের সঙ্গে খেতে বসেছে। শাশুড়ী পরিবেশন করছে। চব্য-চোষ্যের রীতিমত আয়োজন দেখে সাধুর কথা স্মরণ করে জামাই হেসে ফেলে— আর এমনি সময় পরিবেশনরত শাশুড়ীর বুকের আঁচল খসে পড়ে। শ্যালকরা ভাবে তাদের মাকে দেখে জামাই কু দৃষ্টি বশত হেসে উঠেছে। সুতরাং তারা জামাইকে রীতিমত প্রহার করে তাড়িয়ে দেয় আর এভাবে বিধাতার বিধান ফলে যায় অর্থাৎ জামাই এর কপালে অন্ন জোটে না। এ জাতীয় গল্পের মোটিফটি অত্যন্ত স্পষ্ট অর্থাৎ অদৃষ্টকে খণ্ডানো যায় না— এরকম।

ভাইবোনের অজাচারি সম্পর্ক নিয়ে লোককথায় কিছু কিছু গল্পের সন্ধান পাওয়া যায়। ক্যাথলিক খ্রিস্টান ধর্মে এবং হিন্দুধর্মে রক্তসম্পর্ক যুক্ত ভাইবোন ছাড়াও জ্ঞাতি ভাই বোনের মধ্যে অজাচারি সম্পর্কে নিষিদ্ধতা আছে। একই টোটেম সম্পর্ক যুক্ত ভাইবোনের প্রণয় সম্পর্ক অজাচারিতা। ভাইবোনের সম্পর্কের ক্ষেত্রে বাল্যকালে তারা একসঙ্গে হেসে খেলে বড় হয়। ধীরে ধীরে লিঙ্গ সচেতনতার জন্ম হয় এবং যৌবনে তাদের সম্পর্ক জটিল আকার ধারণ করে। সামাজিক কারণে তারা শিষ্টাচার বজায় রাখলেও মনের সুপ্ত প্রবৃত্তি লুপ্ত হয় না, কোনো না কোনো ভাবেই তা থেকে যায়। মেলানেশিয়ায় ছেলেদের পক্ষে মা ও বোনের সম্পর্ক অনেক সময় নিষিদ্ধ। কোনো কোনো সমাজে যৌবনে ভাই বোনের কাছে মুখ দেখাতে পর্যন্ত পারে না। কোনো কোনো সমাজে পুত্রের যৌবনে মায়ের ক্ষেত্রে পর্যন্ত অনুরূপ নিয়ম পালিত হয়। সরাসরি রক্তের সম্পর্ক ছাড়া জ্ঞাতি সম্পর্ক ও শ্রেণি সম্পর্কিত ভাইবোনের সম্পর্কেও অনুরূপ নিষেধ আছে। মায়ের ক্ষেত্রে ছেলের প্রতি যেমন, তেমনি বাবার ক্ষেত্রে মেয়ের প্রতি বিধিনিষেধ আছে।

লোককথায় সাধারণত ভাইবোনের অজাচারি সম্পর্ক দেখা যায় না। বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতিবিদ্ ভেরিয়র এলউইন তাঁর সংগৃহীত লোককথায় এরকম জটিল শ্রেণির সম্পর্ক দেখতে পাননি। তিনি লোককথা থেকেই উদাহরণ দিয়ে লিখছেন—

"The brother and sister loved one another so much that they always ate from the same plate and slept in the same bed.......the fact that they cast a sombre light upon it should not be taken to impty that murder and incest are common between brother and sister. I know of no actual case of murder and though examples of incest occur from time to time, they are sufficiently rare to cause a major scandal."

(Folk tales of Mahakoshal)

কিন্তু তা সত্ত্বেও লোককথায় ভাইবোনের অজাচারি সম্পর্কের সন্ধান পাওয়া যায়। ভারতীয় পুরাকথায় যম ও যমীর কাহিনীতে ভাইবোনের বিবাহের কথা আছে। গ্রীকপুরাণের কাহিনিতে ভাইবোনের বিবাহের কথা আছে। গ্রীক পুরাণের কাহিনি

অনুসারে লিখিত ওভিদের Heroic Epistles এর Canase এবং Macaring এর ভাইবোনের ব্যভিচারি প্রণয়ের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে আদিবাসী সমাজে প্রচলিত লোক কাহিনিতে ভাইবোনের অজাচারি সম্পর্ক নিয়ে দুরকম কাহিনি পাওয়া যায়। প্রথমত অজাচার বৃত্তান্ত এবং ভাইবোন হত্যা।

ত্রিপুরী আদিবাসী লোককথায় 'ভাইবোন হাতি হয়ে গেল' নামে একটি গল্প প্রচলিত আছে। এই গল্পে দেখা যায় জুমিয়ার দুই ছেলেমেয়ের মধ্যে অত্যন্ত ভালোবাসা। তারা একে অপরকে ছেড়ে কখনো থাকে না। কিন্তু নিষেধ (taboo) অমান্য করে 'তুই বুং' (পুকুর) এ স্নান করায় তারা এক সঙ্গে হাতি হয়ে গেল। গল্পটিকে জটিল মনস্তত্ত্ব সম্মত ভাবে দেখা যায়। ভাইবোনের প্রেম একটা পর্যায় পর্যন্ত স্বাভাবিক। কিন্তু তাদের অজাচারি সম্পর্ক সমাজে ব্যভিচারিতা নির্দেশ করে। পশুদের মধ্যে এরকম কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে না। তাই তারা পশু হয়ে গেল, অথবা তাদের সম্পর্ক সামাজিক দৃষ্টিতে পাশবিক। আবার কোনো কোনো গল্পে দেখা যায় ভাইবোনের অত্যন্ত স্নেহের সম্পর্ক থাকলেও রাক্ষসী বা জাদুকর ভাইকে মন্ত্রের সাহায্যে পশুতে পরিণত করে। কিন্তু তারা তবু এক সঙ্গে বসবাস করে। পরে পুনরায় পশু মানুষে পরিণত হয়। ভাইবোনের সম্পর্কের নিষ্ঠুরতার পাশাপাশি নিষ্ঠুরতার কথাও পাওয়া যায়। বোনের সাত ভাইয়ের ছয়ভাই কাঞ্চনীকে হত্যা করে তার মাংস ভক্ষণ করে। এমনকি কোনো কোনো লোককথায় মা সন্তানের মাংস ভক্ষণ করছে এরকম দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়। আবার ভাইবোনের প্রীতি দেখে ভাই-বৌ কর্তৃক ননদ হত্যা বা বিতাড়নের কাহিনিও পাওয়া যায় বা ননদ কর্তৃক বধূবিতাড়নের গল্পও আছে। শঙ্খমালার বৃত্তান্তে শঙ্খমণির স্ত্রী-শক্তি সুন্দরকে স্বামীর বোন কুঁজি বিতাড়িত করে ব্যভিচারিতার দোহাই দিয়ে। বেণুবতীর গল্পে ভাইয়ের স্ত্রী সামান্য অপরাধে হত্যা করে।

উন্নত ও অনুন্নত উভয় সমাজেই এধরনের ঘটনা ঘটে থাকে। তবে উন্নত সমাজে মানসিক জটিলতা ততখানি থাকে না। বাংলা ও আদিবাসী উভয় শ্রেণির লোককথায় যে অভিপ্রায়গুলি প্রকাশ পায় তা মানব মনের অচেতন-অবচেতন ক্রিয়ার ফল, যেগুলি ঈর্ষা হিংসা বা সমাজবিগর্হিত ব্যভিচারিতার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়।

অজাচারিতা ভিন্ন অবৈধ প্রণয় সম্পর্কের কথা খুব কম পাওয়া যায় না দেশী-বিদেশী লোককথায়। অবদমিত কাম বা লিবিডোর বহিঃপ্রকাশ ঘটে যায় নানা ভাবে। মানুষের যা সহজাত প্রবৃত্তি তাকে আইন করে বা সামাজিক বিধিনিষেধের দ্বারা দমন করা সহজ নয়। অজাচার ভীতি বা অজাচারের প্রতি বিরাগ যৌন অবদমনের ব্যাপার, কিন্তু ফ্রেজার-এর মতে অজাচারের প্রতি স্বাভাবিক ঝোঁক আছে। আইন তাকে বলপূর্বক দমন করে। একই কথা প্রযোজ্য রক্তসম্পর্ক বহির্ভূত যৌনসম্পর্ক বা ব্যভিচারি প্রেমের ক্ষেত্রেও।

রক্তসম্পর্ক বহির্ভূত ব্যভিচারি প্রেম বা যৌনব্যবহারকে প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ নানাভাবে ব্যবহার করে এসেছে। আগুনের আবিষ্কার সম্পর্কিত একটি লোককথা

প্রচলিত আছে দঃ আফ্রিকার বুশোঙ্গা জাতির মধ্যে। এই লোককাহিনিতে দেখা যায় কেরিকেরি নামক এক ব্যক্তি দেবতাকে সন্তুষ্ট করলে দেবতা তাকে আগুন জ্বালাবার কৌশল বলে দেয়। কিন্তু কেরিকেরি এই কৌশলকে মানবকল্যাণের উদ্দেশ্যে ব্যবহার না করে অর্থ-উপার্জন ও অসদুদ্দেশ্যে ব্যবহার করে। তখন বৃহত্তর জনস্বার্থের কথা ভেবে রাজা মুচুমুশাঙ্গা তার কন্যা কাতেঙ্গেকে ব্যবহার করে। রাজকুমারী কাতেঙ্গের প্রণয়ের ফাঁদে ফেলে মিলনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে কৌশলে আগুন জ্বালাবার পদ্ধতি রপ্ত করে নেয়। মানব কল্যাণের উদ্দেশ্যে ব্যভিচারি প্রেমে সম্মতি দান প্রশংসনীয় ছিল এবং কাতেঙ্গে গাঁওসভায় সম্মানীয় আসন লাভ করেছিল। ত্রিপুরী আদিবাসী লোককথাতে 'বাঘ ও শিয়ালের উপকথা'তে বাঘ ও ধূর্ত শিয়ালের ব্যভিচারি সম্পর্ক স্থাপনের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। বাংলা লোককথায় বাঘ শক্তিশালী হলেও নির্বোধ, শেয়াল ধূর্ত। এক শেয়াল বাঘিনীকে সম্ভোগ করার জন্য বাঘকে হত্যা করে এবং বাঘ ও বাঘিনীর সন্তানদের পিতা হয়ে বসে। বাঘের বাচ্চারা বড় হলে যখন জানতে পারল শেয়াল তাদের পিতা নয় তখন শেয়াল কৌশলে বাঘের বাচ্চাগুলিকে হত্যা করে এবং সেখান থেকে পালিয়ে যায়। দুর্বল হলে বুদ্ধির দ্বারা অসদুদ্দেশ্য সাধনের মোটিফটি এই কাহিনিতে পরিস্ফুট হয়েছে।

লোককথাগুলিতে বারবার ছদ্মবেশ ধারণের প্রসঙ্গ এসেছে। বাংলামঙ্গল কাব্যগুলিতে দেবীদের ছদ্মবেশ ধারণ করতে দেখা যায়। মনসামঙ্গলে দেবী মনসা চাঁদের মহাজ্ঞান হরণ করেছে কিংবা ধন্বন্তরীর মৃত্যু রহস্য জানার জন্য ছদ্মবেশ ধারণ করে সামাজিক ভাবে ব্যভিচারিতা করেছে। বাংলা লোককথাগুলিতে রাক্ষস-রাক্ষসীদের বারবার মানুষের ছদ্মবেশ ধারণ করতে দেখা যায়। কখনো কখনো পশুপাখির ছদ্মবেশ ধারণ করতেও দেখা যায়। ছদ্মবেশ ধারণের সাহায্যে অসদুদ্দেশ্য সাধন নৈতিক ব্যভিচারিতা ভিন্ন কিছু নয়। দু-একটি দৃষ্টান্ত দিলেই বিষয়টি স্পষ্ট হতে পারে। 'লালকমল আর নীল একজন ছদ্মবেশী রাক্ষসী। রাক্ষসী রানী সতীনের রক্ত চোষে ফলে তার মৃত্যু হয়। সতীনের ছেলেকে বিতাড়িত করে খায় এবং বৃদ্ধ রাজাকে মন্ত্র পড়ে হাবাগোবা নিরেট করে রেখে তাণ্ডব চালায়। এই গল্পের লক্ষ্য বাংলার সতীন সমস্যা। ডালিম কুমারের গল্পে রাক্ষসী রানীকে হত্যাকরে নিজে রানীর ছদ্মবেশ নিয়ে থাকে। 'ছদ্মবেশিনী' গল্পে এক রাক্ষসী অসামান্যা রূপসী সেজে বনে বসে থাকে। রাজা শিকারে গিয়ে সুন্দরী কন্যাকে দেখে বিবাহ করে রাজ্যে নিয়ে আসে। রাজপুত্রের হাতে শেষ পর্যন্ত রাক্ষসী রানীর মৃত্যু ঘটে। নারীর রাক্ষসী রূপ আসলে ব্যভিচারিতা ভিন্ন কিছু নয়। সাতভাই চম্পার কাহিনীতে, অশোকষষ্ঠী ব্রতের কাহিনিতে, বুধকুমার গল্পে, কলাবতী রাজকন্যা গল্পে, শীতবসন্ত, বিজয় বসন্ত গল্পে রাজার অপরাপর রানীগণের বা নারীর যে রূপ প্রকাশ পেয়েছে তা আসলে রাক্ষসী সত্তা। সপত্নী সন্তান ও সপত্নীর অনিষ্ট সাধনে তারা যে হীনতা ও নীচতার পরিচয় দিয়েছে বা দুশ্চরিত্রতার পরিচয় রেখেছে— তাতে গল্পের অভিপ্রায় ফুটে উঠেছে।

সাত সেকরার কথা গল্পে জমিদারের বোন ছাগলীর ছদ্মবেশ ধারণ করে থাকত, আসলে সে একজন রাক্ষসী। প্রতিদিন সকালে দেখা যায় একজন স্যাকরাকে রাক্ষসী ছাগলী রক্তশোষণ করে হত্যা করেছে। শেষতম স্যাকরা যখন জানতে পারে জমিদারের বোন একজন রাক্ষসী তখন সে পালিয়ে যায়। রাক্ষসী তার পিছু তাড়া করে এবং শেষে তার স্ত্রীর পরিচয় দেয়। শেষে এক রাজার কাছে বিক্রি হয়ে যায়। রাজা তাকে বিবাহ করে। রাক্ষসী রানী রাজ্যে তাণ্ডব সৃষ্টি করে। নানা ঘটনার পর শেষে রাক্ষসীর মৃত্যু ঘটে। এই কাহিনির অভিপ্রায় অত্যন্ত স্পষ্ট। এক নারীর পুরুষ লোলুপতাই এখানে উপজীব্য হয়েছে। ত্রিপুরী আদিবাসী লোককথার 'কলম্পা কন্যার কাহিনি'তে ব্যভিচারিতার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে বন পথে যাচ্ছিল। তখন রাক্ষসী স্ত্রীকে খেয়ে ফেলে তার ছদ্মবেশ ধারণ করে থাকে এবং স্বামী-পুরুষটির সঙ্গে সংসার করতে থাকে। এক নারীর এহেন আচরণ সামাজিক ব্যভিচারিতা। সাধু সন্ন্যাসীদের ধূর্ততা ও ভণ্ডামী অবলম্বন করেও ব্যভিচারিতার কথা পাওয়া যায় লোককথায়। যেমন 'অসাধু' গল্পটি। এক সওদাগর তার ছোট বৌকে গুরুর পরিচর্যা করার জন্য রেখে বাণিজ্যে যায়। গুরু তখন একদিন ছোট বৌকে বলে, তুমি আমার কথা মত চললে ছেলে হবে। তুমি আমার সঙ্গে থাক। ছোট বৌ তার দুরভিসন্ধি বুঝতে পেরে তা অস্বীকার করে। তখন সাধু ছোট-বৌকে ডাইনী প্রতিপন্ন করে। সওদাগর ছোট বৌকে কঠিন শাস্তি দেয়। কিন্তু এক রাজার সাহায্যে ছোট বৌ উদ্ধার পায়। আর ভণ্ড সাধুর মৃত্যু ঘটে ভালুকের গ্রাসে। এই গল্পে একদিকে যেমন দুষ্কর্মের শাস্তি দেওয়া হয়েছে তেমনি ভণ্ড সাধুদের চরিত্র উন্মোচিত হয়েছে। বাংলা লোককথায় এজাতীয় অভিপ্রায় খুব বেশি প্রকাশ পায়নি।

সমকামিতা বর্তমানে আইনের দৃষ্টিতে ব্যভিচারিতা না হলেও কিছুকাল আগে পর্যন্ত সমাজে নিন্দনীয় ছিল এবং ব্যভিচারিতা বলেই গণ্য হত। বাংলা লোককথায় এর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। পুরুষে পুরুষে বন্ধুত্ব এবং নারীতে নারীতে সখীত্ব স্থাপনের দৃষ্টান্ত লোককথায় প্রচুর। বন্ধুত্বের সেবা, ত্যাগ, নিষ্ঠার বিবরণ পাওয়া যায়। নারী পুরুষের বিবাহের মাধ্যমে তার যৌন সম্পর্কের সামাজিকীকরণ করে নেওয়া হয়। সমলিঙ্গের সম্পর্কে অনেকসময় সামাজিক অনুষ্ঠানের দ্বারা সামাজিকভাবে বৈধতাপ্রাপ্ত হয়। বাঙালি ও আদিবাসী উভয় সমাজে এধরনের প্রথা প্রচলিত আছে। P.O. Bodding তাঁর 'Santal Folktales vol-1 এ লিখেছেন : The matter here referred to is a peculiar custom by which an intimate and life long friendship is established between two persons of the same sex. The parties concerned put a flower in each other's hair and exchange presents of cloth and money. They address each other and speak of each other as phal flower, they feast each other and assist each other in all circumstances" (page 164-165, 1925) বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলিতে সহেলা বা সখীত্ব স্থাপনের প্রচুর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ভারতীয় সংস্কৃতিতে সমকামী যৌনতা দেখা

যায় না। কেননা ভারতবর্ষে সমকামী যৌনগোষ্ঠী বলে চিহ্নিত গোষ্ঠী নেই বা ছিল না। কিন্তু ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে আজটেক ও মায়া সভ্যতায় সমকামী যৌনতার ব্যাপক প্রচলন ছিল। মনঃসমীক্ষণ যেহেতু মানুষের নির্জ্ঞান মনের রহস্য খুঁজে বেড়ায় তাই মনে হয় বন্ধুত্ব বা সখীত্বের মধ্যে সমকামী যৌনতার প্রচ্ছন্ন আচরণ থাকতে পারে।

আগুনের আবিষ্কার সম্পর্কিত পলিনেশিয় লোককথায় দেখা যায়, এক সাপ এক মানবীকে বিবাহের দাবী করে এবং জানায় যে তার মধ্যে পুরুষত্বের সমস্ত গুণই আছে। শেষ পর্যন্ত তাদের বিবাহ হয় এবং সন্তান জন্মায়। একদিন দেখা যায় সে রোদে সেঁকা খাবার আর খেতে পারছে না, আগুনে রান্নাকরা খাবার খেতে চায়। কিন্তু আগুনের খোঁজ তাদের জানা নেই। তখন সাপটি তারপুত্রকে জানায়, তার পেটে আগুন আছে। এবং পুত্রকে তার পেটে ঢুকে আগুন আনতে বলে। পুত্র পিতার পেটে ঢুকে আগুন নিয়ে এলে রান্না হয়। এভাবে আগুনের আবিষ্কার হয়।— এই লোককথায় পুত্র পিতার পেটে ঢুকে আগুন নিয়ে আসছে। এই আগুন কিসের আগুন? পুত্র ও পিতার সমকামী যৌনতার ইঙ্গিত এখানে পাওয়া যাচ্ছে বলে মনে হয়।

সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি আসলে জীবনের অনুকরণ। সুতরাং সাহিত্যে মানব জীবনের অনুকৃতি থাকে। লোককথাতে তাই মানব জীবনের কথাই আছে। এগুলি ঠিক কখন কিরূপ দেশ কালের প্রেক্ষিতে রচিত হয়েছিল তা হয়ত নির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব নয়। তবে এগুলি যে একটি সময়ে রচিত নয় তা বিশেষ ভাবেই বলা যায়। রামায়ণ, মহাভারতের গল্প, পঞ্চতন্ত্র ও জাতকের গল্প ব্যক্তি চিহ্নিত রচনা হলেও এগুলিতে লোককথার সন্নিবেশ লক্ষ্য করা যায়। লোককথার অপরাপর শ্রেণিগুলি রূপকথা, ব্রতকথা, পশুকথা, নীতিকথা, বীরকথা, লোকপুরাণ, হাস্যব্যঙ্গের গল্পগুলিতে পরিবর্তনশীল সময়ের রূপটি অনেকাংশে ধরা পড়ে। বাংলামঙ্গল কাব্যের কাহিনিতে যে সব লোককথার সন্নিবেশ আছে তার সঙ্গে ইতিহাসের সম্পর্ক আছে। আবার ব্রতের দেবতাদের মধ্যে যেমন অনেকেই অর্বাচীন, তেমনি ব্রতের মন্ত্র বা ব্রত কথায় যে কামনা বাসনায় প্রক্ষেপ পড়েছে তাতে চিহ্নিত সময়ের রূপটি ধরা যায়। সত্য নারায়ণ, শনি, ত্রিনাথ, সন্তোষীরা যেমন অর্বাচীন দেবতা, তেমনি সেঁজুতি ব্রতের মন্ত্রে আছে অর্বাচীন ইহলৌকিক কামনার প্রকাশ। এই ব্রতের ছড়ায় আছে— "আরশি আরশি, আরশি/ আমার স্বামী পড়ুক ফারসী। এই কামনা অত্যন্ত নতুন।

ব্যভিচারিতা সমাজ মানসেরই একটি অবদমিত কামনার প্রক্ষোভ। ফ্রয়েডবাদ অনুসারে মানব মনের তিনটি স্তর অদস, ইগো এবং সুপার ইগো। অদস এর সুখবাদী কামনাকে ইগো অবদমিত করে দেয়। মনঃসমীক্ষণ শাস্ত্র অনুযায়ী অদ্‌সের সুখবাদী মনোভাব ইগোর বাস্তবতা নীতির দ্বন্দ্বে আদমের জন্ম হয়। অদমের ইচ্ছা বাস্তবতার পরিপন্থী হলে ইচ্ছাকে অবদমিত করে সুপার-ইগো বা নির্জ্ঞান স্তরে প্রেরণ করা হয়। মনের নির্জ্ঞান স্তরে অবদমিত সঞ্চিত আকাঙ্ক্ষাগুলির কখনো কখনো আত্মপ্রকাশ ঘটে। যার ফলে ন্যায় নৈতিকতাকে অস্বীকার করে ব্যভিচারিতায় নিমগ্ন হয়।

লোককথায় ব্যভিচারিতা খুব বেশি পাওয়া না গেলেও কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। নির্জ্জন মনের জান্তব প্রবৃত্তিগুলি মাঝে মাঝে আত্মপ্রকাশ করে এবং লোককথায় রাক্ষস-খোক্কস, বন্যজন্তুর আচরণের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। পঞ্চতন্ত্রের গল্পে বীরবর ছুতারের স্ত্রী স্বামীকে লুকিয়ে ব্যভিচারিতায় নিমগ্ন হয়েছিল, পরে ধরা পড়লে স্বামীর সঙ্গে মিথ্যাচারিতা করে। ত্রিপুরী লোককথার বাঘ ও শেয়ালের গল্পে ধূর্ত শেয়াল যেভাবে বাঘিনীকে সম্ভোগ করতে চেয়েছে— সেখানে বীরবরের ধূর্ত স্ত্রী আর ধূর্ত শেয়ালের পার্থক্য থাকে না। -এইভাবে দেখা যায় ছদ্মবেশি রাক্ষসীর আচরণ, ডাইনী বা ভূত প্রেতের আচরণে মানব আচরণই প্রকাশ পেয়েছে। সমাজ সৎকার্য্যের জন্য যেমন পুরস্কার দিয়েছে তেমনি অসৎকার্য্যের জন্য দিয়েছে কঠিন শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। তাই চরিত্রবান রাজপুত্রের হাতে রাক্ষসী পেয়েছে মৃত্যুদণ্ড। পুণ্যের জয় ও পাপের পরাজয় দেখিয়ে সমাজ শক্তি সমাজকে রক্ষা করতে চেয়েছে। লোককথায় এই আকাঙ্ক্ষার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

সাহায্যকারী বই

১। ঠাকুরমার ঝুলি— দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, মিত্র ও ঘোষ
২। ঠাকুরদার ঝুলি— ঐ ঐ
৩। গল্প আর গল্প— সুখলতা রাও, মিত্র ও ঘোষ
৪। গল্পের ঝুলি— প্রীতি পালচৌধুরী, তুলিকলম
৫। হিন্দুস্থানী উপকথা— শান্তাদেবী ও সীতাদেবী, মিত্র ও ঘোষ
৬। পঞ্চতন্ত্রের গল্প— বিষ্ণুশর্মা, তুলি-কলম
৭। ফোকটেলস অব বেঙ্গল— রেভ. লালবিহারী দে, সুবর্ণরেখা
৮। বাংলার লোকসাহিত্য— আশুতোষ ভট্টাচার্য, ক্যালকাটা বুক হাউস।
৯। মেয়েলিব্রত— অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়। শ্রীলেখা চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, প্যাপিরাস।
১০। মেয়েদের ব্রতকথা— গোলাপচন্দ্র ভট্টাচার্য, নির্মলবুক এজেন্সি সম্পাদিত।
১১। বাংলার ব্রত— অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী।
১২। বালার ব্রতপার্বণ— ডঃ শীলা বসাক, পুস্তক বিপণি
১৩। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস— আশুতোষ ভট্টাচার্য্য এ. মুখার্জী এণ্ড কোং
১৪। যৌনতা ও সংস্কৃতি— সুধীর চক্রবর্তী সম্পাদিত, পুস্তক বিপণি
১৫। লোকক্রীড়ায় সামাজিক উৎস— অসীম দাশ, পুস্তক বিপণি
১৬। কেরেঙ্কথমা— কুমুদ কুণ্ডু চৌধুরী সম্পাদিত। অক্ষরপাবলিকেশন
১৭। টোটেম ও ট্যাবু— সিগমুণ্ড ফ্রয়েড, ভাষান্তর ধনপতিবাগ, সুবর্ণরেখা
১৮। বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ— বরুণ কুমার চক্রবর্তী সম্পাদিত, অপর্ণাবুক ডিস্ট্রিবিউটার্স।
১৯। লোকপুরাণ ও লোকসংস্কৃতি— পল্লব সেনগুপ্ত, পুস্তক বিপণি
২০। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা— শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ন বুক এজেন্সি।
২১। ফ্রয়েড— সুনীলকুমার রায়, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ
২২। বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস, বরুণকুমার চক্রবর্ত্তী।

লোককথা ও মানবমনের স্বপ্নপূরণ

মাধুরী সরকার

(১)

লোককথার প্রাথমিক স্তরের গল্পগুলি মানুষের এমন এক মানসিক স্তর থেকে জন্ম নিয়েছিল, যেখানে প্রতিটি গল্পে (মিথে) পাই কোনো না কোনো জিজ্ঞাসা এবং সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধি দিয়ে তার সমাধান,— যা জন্ম নিয়েছিল মানব মনের আদিমস্তরে, যেখানে পারিপার্শ্বিক প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক নানা পরিবর্তনকে কেন্দ্র করে ছিল মানুষের জিজ্ঞাসা। প্রকৃতিই শুধু মানুষকে ভাবিয়ে তুলেছিল তা নয়, মনে প্রশ্ন জেগেছিল পাশাপাশি নিসর্গজগৎ, প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতের বিষয়েও। তাই প্রাথমিক স্তরের লোককথাগুলিতে স্থান পেয়েছে মাটির প্রকৃতি, নিসর্গ প্রকৃতি, প্রাণীকুল ও উদ্ভিদজগৎকেন্দ্রিক প্রশ্ন এবং সর্বশক্তিমান একজন দেবতার অস্তিত্ব। কিন্তু কালক্রমে সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বিষয়েরও পরিবর্তন ঘটতে শুরু করেছে। এ বিষয়ে বলা বাহুল্য যে, এই বিষয়গুলিই গল্প সৃষ্টির কাল নির্ণায়ক এবং আজও তা প্রবহমান, —শুধুমাত্র প্রশ্নের বিষয়গুলির পরিবর্তন ঘটেছে মাত্র।

কালের প্রবাহে গোষ্ঠীবদ্ধ যৌথ জীবন ভেঙ্গে সভ্যতার বিবর্তনের পথে পা বাড়িয়ে মানুষ ধীরে ধীরে যখন প্রকৃতিকে অতিক্রম করে, দেবনির্ভরতাকে ছাপিয়ে নিজেকেই সর্বপ্রথম বলে ভাবতে শিখেছে, তখন থেকেই নিজের চাওয়া-পাওয়া, লাভ-ক্ষতির বিষয়গুলি তাকে প্রতিনিয়ত ভাবিয়ে তুলেছে। সমাজ-অর্থনীতির বিবর্তনে কিছু মানুষের হাতে এসেছে অনেক ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য আর বাকিরা হয়েছে অত্যাচারিত ও শোষিত। এই শোষণ গোষ্ঠীপতি থেকে জমিদার এবং তা থেকে রাজা এবং কালক্রমে সমাজের উচ্চস্তরের মানুষের কাছ থেকে এসে আঘাত হেনেছে সাধারণ অপেক্ষাকৃত নিম্নবিত্তের ওপর। এমন মানসিক পরিস্থিতি থেকে যে লোককথার জন্ম মানুষ যুগ যুগ ধরে দিয়ে চলেছে, সেখানে মূর্ত হয়েছে তাদের জীবনের না পাওয়ার যন্ত্রণা থেকে সৃষ্ট নানা স্বপ্ন ও তা অতি সহজ ভঙ্গীতে পূরণ করার কথা। বাস্তবে যা এই মানুষগুলো কখনোই পাবে না, অথচ একটু দূরত্বে বসবাসকারী অনেক ক্ষমতাশালী মানুষই তা ভোগ করে,— যাদের জীবনের সবকথা জানার স্বাধীনতাও নেই এই সাধারণ মানুষের। সেক্ষেত্রে খানিকটা কল্পনা প্রসূত এক জগৎকে আপন মনের স্বপ্ন মিশিয়ে কামনা করেছে এই লোককথাগুলিতে।

এই স্বপ্নপূরণের লোককথাগুলিতে যে শুধুমাত্রই অর্থনৈতিক বৈষম্যের কথা স্থান পায়, এমন নয়, মানবমনের যাবতীয় ইচ্ছা যা তার একান্তই নাগালের বাইরে, তাকে কেন্দ্র করেই মানুষ সৃষ্টি করেছে লোককথাগুলি। এই লোককথার উন্মুক্ত আকাশে মানবমনের অবাধ বিচরণ। হয়ত যে মানুষটা হীরে, মণিমুক্তো চোখেই দেখেনি কোনোদিন, সে যখন তার গল্পে ঘুমন্ত পুরীর বর্ণনায় 'সোনার খাট', 'খাটে হীরার ডাঁট', 'সোনার পদ্মফুল'-এর কথা বলে,— যেখানে তাকে নিষেধ করার কেউ থাকে না, সে তখন সৃষ্টিকর্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ। এই মানুষ অসম্ভব বস্তুকে সম্ভব করার জন্য গল্পে কাজে লাগিয়েছে তাদের একান্ত নিজস্ব জাদুবিশ্বাস ও সর্বপ্রাণবাদকে। তাই 'ঠাকুরমার ঝুলি'-র রাজপুত্রের সোনার কাঠির ছোঁওয়ায় রাজা চোখ ফিরে পান গল্পকারের দুরারোগ্য ব্যাধি সারানোর ইচ্ছার জোরে।

সহজসরল রাজবাড়ির দাসীরও ইচ্ছা হয় রানী সাজার। তাই 'কাঁকনমালা' গল্পেরানী স্নান করতে যাবার আগে নদীর ঘাটে রেখে যাওয়া কাপড় গয়না চুরি করে দাসী রানী সেজে নিজের ইচ্ছাপূরণ করেছে। বিখ্যাত 'সুখু দুখু'র গল্পে কথাকার ভাগ্য বিড়ম্বিত গরিব তাঁতীর মেয়ে দুখুকে ভরিয়ে দিয়েছেন দুহাতে। তার কাপড় বোনার তুলো জোগানোর রাস্তা দেখায় বা াস, — সে নিয়ে যায় চরকা কাটা চাঁদের বুড়ির কাছে। বুড়ির নির্দেশে কাপড় গামছা নিয়ে দুই ডুব দিতে প্রথমবারে দুখু পেল উথলে পড়া সৌন্দর্য আর দ্বিতীয়বারে জুটল গা-ভরা গয়না। খাবার ঘরের প্রাচুর্যের মধ্যেও নির্লোভ দুখু খেল একটু পান্তা আর তুলো নেবার বেলায় নিল সবচেয়ে ছোট প্যাঁটরার তুলো। চাঁদের বুড়ির কাছে বিদায় নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে দুখু যাবার সময় যাদের যাদের সাহায্য করেছিল, তাদের মধ্যে : সওড়া গাছ দিল এক ঘড়া মোহর, কলাগাছ দিল মস্ত এক ছড়া সোনার কলা, গাই দিলকপিলা লক্ষ্মণ বক্না, ঘোড়ার বাচ্চার পিঠে সব কিছু তুলে, বক্নাকে নিয়ে দুখু বাড়ি এল। রাতে প্যাঁটরা খুলতে বের হল দুখুর রাজপুত্র বর।

— লোককথাটিতে সাধারণ মানুষের যা কিছু চাহিদা বেঁচে থাকার জন্য, সব কিছুই পূরণ করেছেন গল্পকথক শুধুমাত্র দুখুর নির্লোভ হবার পুরস্কার স্বরূপ। গরিব দুখুকে করেছেন রাজরানী। এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট গরিব কন্যাটির রাজরানী হবার প্রত্যক্ষ বাসনা না থাকলেও গল্পকারের হাত দিয়ে সকল গরিব মেয়ের বাসনাই এখানে সফল হয়েছে।

সার্সী রেড ইণ্ডিয়ানদের রূপকথায় পৃথিবীর মেয়ের সাঁঝের তারাকে বর হিসেবে পাবার স্বপ্ন পর্যন্ত পূরণ হয়েছে। সাঁঝের তারা নেমে এসেছে পৃথিবীতে— মেয়েটিকে স্ত্রী হিসেবে নিয়ে গেছে আকাশ লোকে, — সেখানে তাদের সন্তানেরও জন্ম হয়েছে। লোক কথাটিতে এইপর্যন্ত এসে আবার বাস্তবে ফেরানোর চেষ্টায় নিষিদ্ধ কর্মের সূত্র ধরে পৃথিবীর মেয়ে ও তার ছেলেকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে বটে, তবে জ্যোৎস্না রাতের মায়াবী আলোয় মানুষ আকাশভরা চাঁদ তারার জগতের প্রতি যে আকর্ষণ

অনুভব করে আসছে আবহমান কাল থেকে,— এ গল্পে তারই কথা স্বপ্ন হয়ে এসেছে আমাদের সামনে এবং তা পূরণও করেছেন কথাকার অতি যত্নে যদিও তাঁর বাস্তববোধ তাঁকে মেয়েটিকে ফিরিয়ে আনতে বাধ্য করেছে কোনো এক ছুতোনাতায়।

বেল্লাকুলা রেড ইণ্ডিয়ানদের রূপকথায় চাঁদ বা তারার স্নিগ্ধ দেশে পৌঁছনোর ইচ্ছা প্রকাশেই মানব মন ক্ষান্ত হয়নি, পৌঁছেছে সূর্যের বাড়িতে, শুধু তাই নয় ছেলেটি বিয়ে করতে চেয়েছে সূর্যের মত প্রখর প্রতাপশালী শক্তির মেয়েকে। সেখানে চাঁদের চরকা কাটা বুড়ির মতই বাড়ির দেখাশোনা করার যে বুড়ি, সে ছেলেটিকে দিয়েছে এক থলে ঠাণ্ডা হাওয়া,— যার সাহায্যে সূর্যের তাপ থেকে বাঁচা যায়। সূর্য ছেলেটির প্রতি বিরক্ত হয় এবং তাকে মেরে ফেলার জন্য অনেক ছলচাতুরী করেও ব্যর্থ হয়। ছেলেটি স্যামন মাছের রূপ ধরে বিপদগুলো থেকে মুক্তি পায়। শেষে অচিন্‌পাখি, যাকে ধরে আনার হুকুম ছিল ছেলেটির ওপর, — তার সাহায্যে ছেলেটি কানা করে দিল সূর্যের দুটো চোখ,— জব্দ হল সূর্য। তাই বাধ্য হয়ে শরণ নিল হবু জামাইয়ের (ছেলেটির)। ছেলেটি শ্বশুর সূর্যকে বাগে আনতে পেরে জাদুমন্তর দেওয়া জল ছিটিয়ে চোখ সারিয়ে দিল আর সূর্যদেবতার যে মেয়েকে ছেলেটির পছন্দ ছিল, তার সঙ্গে ওর বিয়ে হয়ে গেল। ওরা ফিরে এল পৃথিবীর বুকে লাল মানুষের গ্রামে আর সুখে ঘর করতে লাগল।

— প্রকৃতির আশ্চর্য উপাদানগুলি মানুষকে প্রতিনিয়ত আকর্ষণ করে। সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ,তারা মানুষের প্রতদিনের সঙ্গী হলেও তারা বড় দূরের। তাই তাদের প্রতি স্বভাবতই মানুষের আকর্ষণ বেশি হওয়া স্বাভাবিক। এই আকর্ষণবোধই সৃষ্টি করেছে মানব মনে এক ধরনের কল্পলোকের অস্তিত্ব এবং তাকে ঘিরে মানুষের নানা স্বপ্ন আর স্বপ্ন পূরণের কথার সৃষ্টি। কল্পনায় নিসর্গজগতের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের ইচ্ছাও জেগে উঠেছে অতি সহজেই, আর সেই পথ ধরেই আকাশের চাঁদ, সূর্য হয়ে উঠেছে মায়েদের শিশুভোলানোর এক আজব ব্যক্তিত্বে,— 'চাঁদমামা' ও 'সূয্যিমামা'-র মত আদরের ধন। এধরনের সম্পর্ককে ছাপিয়ে এই গল্পের কল্পনা এগিয়ে গেছে আরো এক দুষ্প্রাপ্য স্বপ্নের দিকে। সূর্যের উত্তাপের তীব্রতায় প্রতিষেধকও তাই উপস্থিত আছে লোককথাটিতে (এক থলে হাওয়া)। সবচেয়ে বড় কথা মানুষ তার মনোরাজ্যে সূর্যলোকে যাওয়া ও তাকে জয় করার যে স্বপ্ন দেখে, এখানে সেই স্বপ্ন পূরণই আমাদের সামনে উপস্থিত। সবচেয়ে বড়কথা উঁচুতলার মানুষের প্রতিভূ স্বর্গের দেবতারা পৃথিবীর মেয়েকে হরণ করার পরিবর্তে এখানে মানুষ জয় করেছে সূর্যলোক ও তার মেয়েকে। মানুষের জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য চাওয়াগুলি হল,— খাদ্যাভাব থেকে মুক্তি, সন্তানপ্রাপ্তি, ধনঐশ্বর্য্য সুখ ও সামাজিক প্রতিপত্তি লাভ। লোককথার মানসিকতায় মানুষ নিজেকে দেখতে চেয়েছে উন্নত জীবন যাপনের মধ্যে। তাই সমাজের ওপর তলার মানুষের জীবন-যাপনের সঙ্গে তুলনা করেছে তার নিজের কম খেয়ে কম পরে থাকার জীবনকে। প্রথমে দুঃখ পেয়েছে,— হয়েছে দেবনির্ভর।

এই স্তরে এসেছে দেবদেবীর বরে ধনঐশ্বর্য ও সন্তান প্রাপ্তির কথা (সন্তানকে ঐশ্বর্য বলে মনে করা হত)। 'ঠাকুরমার ঝুলি'র গল্পে মা ষষ্ঠীর নির্দেশ যথাযথ মানতে ভুল হওয়া সত্ত্বেও যে 'দেড় আঙুলে' সন্তান প্রাপ্তি ঘটেছে, তাকেও কিন্তু রাজা করতে ভোলেন নি কথাকার। আপন সন্তানের দুধে ভাতে থাকার সুপ্ত বাসনাটি যথাযথভাবে কাজ করেছে এ ধরনের গল্পের পরিণতি সৃষ্টির অন্তরালে।

কিন্তু এধরনের লোককথার পরবর্তীস্তরে এসেছে অর্থনৈতিক সংঘাতের চেতনায় গড়ে ওঠা লোককথাগুলি। মানুষ নিজের হাতে যাদেরকে শত্রু মনে করে, এমন ক্ষমতাশালী ওপরতলার মানুষ বা শাসকদের বাস্তবে মারতে না পারলেও, মেরেছে তাদের গল্পে। নানাভাবে শাস্তি দিয়েছে, কেড়ে নিয়েছে তাদের ক্ষমতা,— অথবা চালাকি করে তাদের বোকা বানিয়ে সমাজে নিজের স্থানকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার স্বপ্নকে করে তুলেছে সফল। লোককথাগুলিতে এধরনের শাস্তিযোগ্য অপরাধী হিসেবে উপস্থিত হয়েছে,— ডাইনি, রাক্ষস, দৈত্য, দেবতা, জমিদার, রাজা প্রভৃতি চরিত্রগুলি। এ প্রসঙ্গে পর পর কয়েকটি লোককথাকে বিশ্লেষণ করলে বিষয়টি পরিষ্কার হয়—

খাদ্যাভাব থেকে মুক্তি—উত্তর রাশিয়ার রূপকথায় বনের ধারের গ্রামের গরিব মা-মরা মেয়ে সোনিয়া সৎমায়ের নির্দেশে শীতকালে বনে গেছে স্ট্রবেরি ও বসন্তের ফুল আনতে। বরফে ঢাকা বনে দাঁড়িয়ে মেয়েটি কেঁদে কেটে বারোমাসের দেবতার কাছে মিনতি জানিয়ে পেয়েছে স্ট্রবেরি ও বসন্তের ফুল এবং এই মেয়ের বিয়েও হল রাজপুত্রের সঙ্গে।— শীতের খাদ্যাভাব থেকে মুক্তির উপায়টাই এখানে স্বপ্নের রূপে এসেছে এবং তার পূরণও ঘটেছে লোককথাটিতে। এমন করে বারোমাসের কাছে যদি কেঁদে কেটে প্রার্থনা জানিয়ে সারা বছর বসন্তের ফল ও ফুল পাওয়া যায়, তাহলে খাদ্য প্রাচুর্যের স্বপ্নটি হয় সফল। — এমন চিন্তাপ্রসূত এই লোককথাটি।

জার্মান রূপকথায় গরিব কাঠুরের দুটি মেয়ে হ্যানসেল ও গ্রেটেলকে সৎমার বুদ্ধিতে বাবা ও সৎমা মিলে গভীর বনে ছেড়ে চলে এল। ক্ষুধার্ত দুই বোন বনের মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে ডাইনির বাড়ি দেখতে পেল। সেই বাড়িটা তৈরি চকোলেট, পিপারমেন্টের মত ছোটদের লোভনীয় খাদ্য সামগ্রী দিয়ে, যা গরিব কাঠুরের মেয়ের নাগালের বাইরের বস্তু। এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য যে, গরিব কাঠুরের মেয়েদের স্বপ্নের খাদ্য দ্রব্যগুলোই গল্পে এসেছে ডাইনির বাড়ি হয়ে। ডাইনির আয়ত্তে থাকা ভালো খাওয়া থাকার সকল সুখকে তারা দখল করে নিল বুদ্ধি করে পাজি ডাইনিকে চুল্লির মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে। যে সুখ ছিল তাদের স্বপ্নেরও অতীত, গল্পে তা এল তাদের ভাসিয়ে নিতে। ডাইনির প্রাপ্ত সুখকে ছিনিয়ে নেবার গল্পে একথা পরিষ্কার যে,— ডাইনি সমাজের এমন এক ব্যক্তিত্ব, যে ধনসম্পদের জোরে সমাজের সমস্ত সুখকে কব্জা করে রাখে। আর তার সুখ ও সম্পদকে আয়ত্তে রাখার ক্ষমতাই রূপকথার গল্পে বর্ণিত হয় 'জাদু' ব'লে। ছোট্ট দুটি নিরীহ মেয়ের দ্বারা গল্প কথক ঘায়েল করেছেন

সমাজের শত্রুকে, ঘটেছে স্বপ্নপূরণ। এ শুধু হ্যানসেল গ্রেটেলের স্বপ্নপূরণ নয়,— সমস্ত সাধারণ মানুষের স্বপ্নপূরণ, — হ্যানসেল ও গ্রেটেল যাদের প্রতিনিধিত্ব করেছে মাত্র লোককথাটিতে।

ভালো খেয়ে পরে সামাজিক প্রতিপত্তি পাবার স্বপ্নে সকলের আগে যে ধরনের লোককথাগুলি আমাদের সামনে আসে, সেগুলি অনেকটা 'সিণ্ডারেলা'-র গল্পের মতই সাধারণ মেয়ের রানী হবার গল্প অথবা অতি গরিব ঘরের ছেলের রাজা হওয়া, অন্ততঃ রাজার জামাই হবার গল্পগুলি। চেকোশ্লোভাকিয়ার রূপকথায় ঠিক 'সিণ্ডারেলা'-র গল্পের ধাচের গল্পটিতে সাধারণ মেয়ে পোপেল্কা রাজবাড়িতে উৎসবে যোগ দেবার জন্য সাজপোষাক পেল নারকেলের মধ্যে— তাকে দেখেই রাজার পছন্দ হল। এই পোষাক ও জুতো পরলেই তাকে দেখতে হয়ে যেত রানীর মত, এমন কি বাড়ির লোকেরাও চিনতে পারত না। উৎসবশেষে তাড়াতাড়িতে ফেলে আসা একপাটি জুতোর সাহায্যে তাকে খুঁজে বের করলেন রাজা এবং তাকে বিয়ে করলেন। পোপেল্কা হল রাজরানী। কোনো নির্দিষ্ট পোশাক পরলেই সুন্দরী রানীর মত রূপ পাবার সহজ বাসনা সবমেয়ের অন্তরেই বাস করে স্বপ্ন হয়ে। লোককথাকার তাই এই স্বপ্নের সঙ্গে রাণী হবার স্বপ্নটিকেও যোগ করে উপস্থাপন করলেন গল্পটিতে স্বপ্নপূরণের কথা।

লোধা জনগোষ্ঠীর লোককথায়, অতি গরিব মায়ের ছেলের বাধ্য হয়েরাখাল হওয়া ও অবশেষে তার বনের কিশোর রাজা হবার পেছনে প্রথমে বনের গরু মোষ,— যারা তাকে দিয়েছিল বাঁশি, আর সেই বাঁশির শব্দেই সেই গরুমোষেরা ছেলেটিকে প্রতিদিন খাবার জন্য চাল দিয়ে যেত। পরবর্তীকালে দেবী কাকেদের দ্বারা সেই বাঁশি হরণ করে নিজে আবির্ভূত হয়ে তাকে বনের রাজা করলেন—

গল্পটিতে বাঁশি পাওয়া ও তার শব্দে গরু মোষেদের কাছ থেকে চাল পাওয়া, — এই বিষয়গুলি রাখাল বালকের জীবন ও গরু মোষেদের চাল দেবার মধ্য দিয়ে কৃষিকার্যের মাধ্যমে ফসল পাবার ইঙ্গিতবাহী। কালক্রমে দেবীর বাঁশি হরণ এবং কৃষি ও গবাদি পশু-নির্ভর রাখাল বালকটির বনের রাজা হবার ঘটনার মধ্য দিয়ে রাখাল (পশুচারণজীবী) থেকে কৃষক (কৃষিজীবী) এবং তা থেকে জমিদার (অর্থাৎ যাকে বনের রাজা বলা হচ্ছে), — এমন উত্তরণ লক্ষিত হয়। লোককথায় অতি সহজ সরল ভঙ্গীতে বাস্তবায়িত হয়েছে গরিব মানুষের ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে রাজা হবার স্বপ্ন।

অর্থনৈতিক সংঘাতের চেতনায় গড়ে ওঠা লোককথাগুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান করে নিয়েছে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরি সংকলিত টুনটুনির গল্পগুলি। রাজার রোদে শুকোতে দেওয়া সোনার মোহর চুরি করে টুনটুনি জোর গলায় গান গেয়েছে, "রাজার ঘরে যে ধন আছে, টুনির ঘরেও সে ধন আছে।" এই আমজনতার প্রতিনিধি টুনটুনি প্রতিনিয়ত রাজাকে বোকা বানায় এবং তাকে আয়ত্তে আনতে না পেরে রাজা যখন তাকে জল দিয়ে গিলে খান, তখন টুনি ফুড়ুৎ করে তার নাক দিয়ে বেরিয়ে আসার

সময় রাজার সৈনিকেরা তলোয়ার দিয়ে টুনিকে কাটতে গিয়ে স্বয়ং রাজারই নাকটি কেটে ফেলে। গল্পকথক না খেতে পাওয়া মানুষের ক্ষোভকে উগ্রে দিয়েছে টুনটুনির চরিত্রের মধ্যে দিয়ে। রাজার নাক টাকার মত কাজটি বাস্তবে সম্ভব নয়, তাই ছলে বলে কৌশলে টুনটুনির মত ছোট্ট পাখির দ্বারা কাজটি সমাধা করেছেন লোককথাকার। — এতো সমাজের অত্যাচারিত মানুষের যথার্থ স্বপ্নপূরণ । কারণ রাজার রোদে শুকোতে দেবার মত অঢেল ধনরাশি সঞ্চিত হয় গরিব প্রজাদের শোষণের মাধ্যমেই। আর যাদের শ্রমের বিনিময়ে এই অর্থ, সেই প্রজাদেরই রাজা বাধ্য করেন দারিদ্র্যের অন্ধকারে হাতড়ে মরতে। এই শোষিত মানবগোষ্ঠীর প্রতিনিধি করে লোককথাকার উপস্থিত করেছেন টুনটুনি চরিত্রকে এবং সফল করেছেন মানুষের স্বপ্ন।

গ্রীক রূপকথায় চতুর কারিগর ও তার ছেলে চাতুরীর দ্বারা বাদশার ধন অপহরণ করেই ক্ষান্ত হয়নি। ছেলেটি বাদশার জামাইও হয়েছে।

এমন বোকা বানিয়ে স্বপ্নপূরণের লোককথার মধ্যে রুশদেশের উপকথায় সেয়ানা চাষী তার গ্রামের জমিদারকে বোকা বানানোয় কৃতকার্য্য। সে প্রমাণ করে দিয়েছে যে, ঘরের কোণে তার সহজ সরল বোকা মায়ের চেয়েও জমিদারটি বোকা, এবং তাকে বোকা বানানোর কাজটি করেছে চাষী নিজেই।-- শাসক জমিদারের অত্যাচার যখন মানুষকে অতিষ্ঠ করে তোলে, তখনই যে প্রতিহিংসার সৃষ্টি হয় শোষিতের মনে, সেখান থেকেই জন্ম নেয় এই ধরনের স্বপ্ন সফলকারী লোক কথা, — যা বাস্তবে সম্ভব নয়, তা রূপ পায় গল্পে।

একই ধরনের রাজাকে বোকা বানানোর গল্পে রুশদেশের উপকথায় উপস্থিত হয়েছে 'সাত-বছুরে'। সে গরিব মানুষের বুদ্ধিমতী মেয়ে। তার বুদ্ধিতে সে ক্ষমতাবান দুষ্টরাজাকে হার মানিয়ে নিজের বাবার ঘোড়ার বাচ্চা (সম্পদ) ফিরিয়ে এনেছে।— দেশের রাজার মত বিচারকের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সত্য, মিথ্যা নিয়ে লড়াই করা বাস্তব জীবনে গ্রামের গরিব মানুষের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। তাই গল্পকার সাত বছুরে মেয়েকে দিয়ে কাজটি সম্পন্ন করেছেন,— হয়েছে স্বপ্নপূরণ।

রুশদেশের উপকথাতেই 'গপ্পীবউ' গল্পে গল্পবাজ বাচাল চাষী-বৌয়ের বুদ্ধিতে জমিদারকে বোকা বানিয়ে নিজেদের পাওয়া গুপ্তধন বাঁচাতে পারাও কম কথা নয়।

জমিদারের কাছে প্রতিনিয়ত অপমানিত ও অত্যাচারিত চাষীদেরও একদিন ইচ্ছা হয় জমিদারের খাস কামরায় গিয়ে তার সঙ্গে বসে একই খাবার সম্মানের সঙ্গে খেতে, — যে খাবার সে কল্পনাতেও আনতে পারে না। এমনই স্বপ্ন থেকে জন্ম নেয় রুস দেশীয় এই উপকথাটি— ব্যাপারটি খুব সহজ নয়, তাই চাষীকে চালাকির আশ্রয় নিতে হয়। সে জমিদারের কাছে গিয়ে গোপনে জিজ্ঞাসা করে, "একটা সোনার তাল, ধরুন এই টুপির মত, কত দাম হবে?"— জমিদার মনে করল চাষীর কাছে নিশ্চয়ই তালটা আছে। তাই নানারকম খাদ্য ও পানীয় দিয়ে তাকে আদর করল, সোনার তালটি

হস্তগত করার জন্য। যখন জানা গেল শুধুমাত্র দামই চাষী জিজ্ঞাসা করেছে, — তা চাষীর কাছে নেই, তখন জমিদারের তাড়া খেয়ে তাকে বোকা প্রতিপন্ন করার পুরস্কার হিসেবে বাজি ধরেছিল যে দোকানদারের সঙ্গে, তার কাছ থেকে দুটো ঘোড়া ও একটা বাছুর পেয়ে লাভবানও হল চাষী। একই সঙ্গে হল স্বপ্নপূরণ ও লাভ।

কথা দিয়ে কথা না রাখা অর্থাৎ পূর্বের উপকার ভুলে বেইমানির সাজা দিতেও ভোলেন না লোককথাকারেরা। 'ঠাকুরমার ঝুলি'-তে রাজপুত্র তার রাখাল বন্ধুর পূর্বের উপকার এবং নিজের দেওয়া অঙ্গীকার ভুলে যখন সে রাজপুত্র থেকে রাজা হল, তখন একদিন রাখাল বন্ধু প্রাসাদে তার অঙ্গীকারের কথা মনে করাতে এলে তাকে প্রাসাদ থেকে তাড়িয়ে দেবার শাস্তি স্বরূপ রাজার সারা গায়ে ছুঁচ বিঁধে ছিল। নিজের অন্যায় বুঝে বন্ধুকে মন্ত্রী পদে বসানোর পর সেই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পান রাজা। — লোককথাটির মধ্যে দিয়ে গল্পকার পূর্ণ করেছেন সামান্য রাখাল বালকের স্বপ্ন, যা সহজ সরলভাবে আসেনি, গল্পকারকে নিতে হয়েছে আদায় করে।

মানুষের আকাশে ওড়ার স্বপ্ন কোন্ আদ্যিকালের কথা। আর এই স্বপ্ন থেকেই মানুষ কৃত্রিম পাখা লাগিয়ে উড়ো জাহাজের পিঠে চড়ে মুক্ত আকাশের দাবিদার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এরই প্রাথমিক স্তরের মানব ভাবনায় জন্ম নিয়েছিল রূপকথার পরীরা, যাদের দুটো পাখায় ভর করে তারা মানুষের দুঃসময়ে এসে তাদের উপকার করেছে, দূর করেছে মানুষের দুঃখ। বিদেশী লোককথায় পরী ছাড়াও দেবদূতেরও দুটি-পাখা লক্ষিত হয়। প্রতিদিনের দুঃখ ও দারিদ্র্য-দুর্দশার মাঝে হয়ত মানুষ কখনও এমন কোনো ব্যক্তিকে খুঁজে ছিল, যে মানুষের থেকে কিছুটা হলেও পৃথক ক্ষমতার অধিকারী,— যে প্রয়োজনে পাখির মত দ্রুতগামী হতে পারে, আর উদ্ধার করতে পারে মানুষকে। এক্ষেত্রে পক্ষীরাজ ঘোড়ার ভাবনাটিও উল্লেখযোগ্য। এ ধরনের ভাবনা ছাড়াও আবার মানুষেব পাখি হয়ে প্রেমিক প্রেমিকার রূপে যুগ-যুগান্তর বেঁচে থাকার কথা বিভিন্ন দেশের লোককথায় লক্ষিত হয়। মুক্ত আকাশে যেখানে পৌঁছোয় না সমাজের শাসন, অত্যাচার অথবা বিচারের নামে প্রহসন, —কেউ বাধা দেয় না তাদের ভালোবাসায়, —এমন খোলা স্বাধীন আকাশে পৃথিবীর মাটির মানুষের অত্যাচার থেকে মুক্তি পেয়ে তারা লোককথায় বেঁচে থাকে জন্ম জন্মান্তর।— এ তো সব প্রেমিক প্রেমিকারই অন্তরের কথা, অতি আন্তরিক স্বপ্ন,— যা সমাজের বুকে বার বার হয় আহত ও ক্ষত বিক্ষত। সমাজ তার বিধি নিষেধের ঘেরাটোপে আবদ্ধ করে পিষে মারে মানুষের ভালোবাসাকে। আর সেই বন্ধন থেকে মুক্তি পাবার আসায় লোক কাহিনীকারের এই স্বপ্নের ও তা পূরণের অবতারণা,— বাস্তবে না হোক, অন্ততঃ কল্পনায় তো ঘটে।

পৃথিবীর এত রং রূপ গন্ধকে উপভোগ করে বেঁচে থাকার জন্যই তো মানুষের এত সংগ্রাম, এত কল্পনা, এত স্বপ্ন বিলাস। কিন্তু মানুষ জানে তার মৃত্যু অনিবার্য, তবুও

মেনে নিতে পারে না এই অমোঘ সত্যকে। তাই মৃত্যুঞ্জয় হবার স্বপ্নও দেখে মানুষ,-- তার পরিচয়ও পাই লোককথা বা লোককাহিনীগুলিতে। মৃত্যুর দেবতাকেও বোকা বানানোর গল্পে মানবমন হয়েছে সিদ্ধ হস্ত। রুশ দেশের উপকথায়, তিরিশ বছর বয়স্ক এক তরতাজা সৈনিকের কাছে যখন যমরাজ কফিন নিয়ে উপস্থিত, তখন সৈনিক তাঁকে কেমন করে কফিনে শুতে হয় শিখিয়ে দিতে বলে। যমরাজ তা দেখিয়ে দিতে গেলে সৈনিকটি চট্ করে সেই কফিনের মুখ বন্ধ করে দিল ও যমরাজকে কফিন সমেত দিল নদীর জলে ফেলে। যতদিন বাক্স জলে পড়ে ছিল, ততদিন সকলে বেশ মজাতেই দিন কাটাচ্ছিল। নদী থেকে সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে ঝড়ে হঠাৎ কফিনের ডালা খুলে যমরাজ আবার বেরিয়ে এল সৈনিকের কাছে। সৈনিক ছেলেটি তখন একটা থলে দেখিয়ে বলল, "আবার বন্ধ করে পুকুরে ফেলে দেব।" থলেটা জাদু থলে ভেবে যমরাজ পালাল। লোকে বলে আজও বেঁচে আছে সেই সৈনিক।

— মানুষের মৃত্যুঞ্জয়ী হবার বাসনা থেকে জন্ম এধরনের লোককথার। হিন্দু পুরাণবৃত্তে যমরাজকে তুষ্ট করে অথবা বোকা বানিয়ে মানুষ জোগাড় করেছে মৃত্যুঞ্জয়ী অমর হবার বর,— এরূপ ছোট ছোট গল্পেরও কোনো অভাব নেই, যা বিভিন্ন লোককথা থেকে যুক্ত হয়েছে পরিশীলিত পুরাণকথাগুলিতে। জন্ম থেকে আপনজনের বিয়োগ ব্যথা এবং সর্বশেষে নিজের মৃত্যুভয় মানুষের জীবনকে করে তোলে অস্থির। তাই মৃত্যুকে জয় করার স্বপ্ন কে না দেখে! —আর এই স্বপ্ন সফলের একমাত্র পথই তো এই লোককথাগুলো, যা মানুষের সব না পাওয়ার বেদনাকে ভুলিয়ে দেয় এক সহজ সরল ভঙ্গীতে।

সহায়ক গ্রন্থ

পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী লোককথা— দিব্যজ্যোতি মজুমদার. তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, প্রথম প্রকাশ— নভেম্বর ২০০৬, কলকাতা।

ভারতের লোককথা, সংকলন ও সম্পাদনা— এ. কে. রামানুজম, অনুবাদ— মহাশ্বেতা দেবী, ন্যাশনাল বুকট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, নয়াদিল্লী, ১৯৯৮।

রুশদেশের উপকথা, অনুবাদ— সুপ্রিয়া ঘোষ, সম্পাদনা— ননী ভৌমিক, 'রাদুগা' প্রকাশন, মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ১৯৮৬।

ঠাকুরমার ঝুলি (পঞ্চবিংশ সংস্করণ), প্রকাশক— শ্রী গজেন্দ্রকুমার মিত্র, মিত্র ও ঘোষ ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২, ১৩৭৯ (বাংলা)

রেড ইণ্ডিয়ান রূপকথা— পল্লব সেনগুপ্ত, পুস্তক বিপণি, কলিকাতা, ১৯৮৪।

বাংলার লোককাহিনী : শ্রেণীসংগ্রামের ভিন্নরূপ

মো. হাবিবুর রহমান

বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় সমস্ত প্রগতিশীল শক্তির মূল উদ্দেশ্য হল শান্তি এবং জাতিতে জাতিতে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় সংগ্রাম। শান্তির মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতেও শোষণ ও বৈরী শ্রেণী বিলোপের মতো কর্তব্য সাধিত হতে পারে। সমাজ ব্যবস্থায় বিভিন্ন ধরনের প্রণালী রাষ্ট্রের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানেই কেবলমাত্র শ্রেণী উচ্ছেদের মতো পরিস্থিতি গড়ে উঠতে পারে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনমতো লোকসংস্কৃতির উপাদান ব্যবহার করা যায়। আসলে মানুষের আদর্শগত চেতনার দিকগুলি উন্মোচনের মধ্য দিয়ে সমাজে শান্তি ও সহাবস্থানের মতো পরিস্থিতির উদ্ভব ও বিকাশ ঘটতে পারে— যা শোষণরূপ পরিস্থিতির পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। সেদিক থেকে আমাদের ঐতিহ্যবাহী লোককাহিনীগুলো শোষণ সম্পর্কে মানুষকে সচেতন এবং তা থেকে মুক্তি পাওয়ার পথ প্রদর্শকের একটা ভূমিকা পালন করে থাকে। লোককাহিনীর এমনতর ভূমিকা পালন তথা সচেতনায়ন প্রক্রিয়ার স্বরূপ আলোচনাই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

মানুষের মানবীয় হয়ে ওঠার এক বৈশিষ্ট্যময় প্রকাশই তার সংস্কৃতি। যা ব্যাপকতম অর্থে কোনো বিশেষ ভৌগোলিক অঞ্চলে বসবাসরত ছোট-বড় জনগোষ্ঠী, দেশ বা মহাদেশের লৌকিক জীবনের সংগ্রামশীলতার, হাজার বছরের লালিত জীবন সংগ্রাম, জীবনযুদ্ধ এবং এই জীবনযুদ্ধের মধ্য দিয়ে মনুষ্যত্ব অর্জনের সম্মিলিত আকাঙ্ক্ষার বহিঃপ্রকাশ। লোককাহিনী এই সম্মিলিত আকাঙ্ক্ষা তথা লোকসংস্কৃতির অন্যতম উপকরণ। যা নিছক গল্পরসের আধার নয়, সমাজমানসের মূল্যবোধজনিত চেতনা, সমাজের আনন্দ--- বেদনা, দুঃখ-দুর্দশা, শোষণ-নির্যাতন ও বঞ্চনার দর্পণও। এগুলো সুপ্রাচীনকাল থেকে শ্রেণীবিভক্ত সমাজেব নানান বিষয় বহন কবে চলেছে। একটি দল বা গোষ্ঠী আর একটি দল বা গোষ্ঠীর উপর যে শোষণ করে আসছে— যা অবিচ্ছেদ্যভাবে লোকায়ত জীবনযাত্রার প্রবলমান ধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং যে শোষণের বিরুদ্ধ সরাসরি ক্ষোভ বা ঘৃণা দেখানোর সাহস থাকেনা, সেইসব অস্ফুট ক্ষোভ, ধিক্কার প্রতিবাদের রূপকে ধ্বনিত হয় লোককাহিনীর অন্তরালে। একারণে অবহেলিত, প্রবঞ্চিত, দুর্বল, অসহায়, অত্যাচারিত চরিত্রগুলো গল্পের শেষে জয়ী হয় কিংবা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। আর অত্যাচারিত, শোষক শ্রেণীর ধ্বংস হয় অনিবার্যভাবেই। লোককাহিনীর এই বিশ্বজনীনতা শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠায় শ্রেণীসংগ্রামের ভিন্ন হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

আদিম যুগ থেকে মানুষ সংঘ শক্তির জোরে প্রকৃতি ও বহিঃশক্তির বিরুদ্ধে জয়লাভের জন্য সংগ্রাম করে এসেছে। স্বপ্ন দেখেছে সুখী, সুন্দর ও শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার। কিন্তু সমাজ শ্রেণীবিভক্ত হওয়ার পর থেকে তারা সংগঠিত হওয়ার পরিবর্তে হয়েছে বিভক্ত। ক্রমে তাদের সংঘচেতনা হয়েছে দুর্বল, ক্ষীণ। বেড়েছে গোষ্ঠী, দল, সম্প্রদায় বা শ্রেণী। ফলে সমাজবিভক্তির রূপ প্রকাশ পেয়েছে ধনী-দরিদ্র, সবল-দুর্বল, শোষক-শোষিত ইত্যাদি নানা বৈশিষ্ট্যে। পুঁজিবাদী ও সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার কারণে এই গোষ্ঠীগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক দ্বান্দ্বিক। আর এই পুঁজিবাদী উৎপাদন রীতিতে শ্রমিক শ্রেণী হয় শোষিত শ্রেণীর প্রতিভূ। যাদের উপর উৎপাদন উপকরণের মালিকানা বর্তায় না এবং বেঁচে থাকার জন্য শ্রম বিক্রি করতে হয়। মেহনতি এই গোষ্ঠী তাই সর্বদাই নানাভাবে পুঁজিবাদী শোষণের শিকার হয়। মহাজনী পুঁজিপতি, শিল্প পুঁজিপতি কিংবা বণিক পুঁজিপতি— সকলেই সমাজের উচ্চকোটীর মানুষ। অভিজাত বংশীয়। তাদের কাছে অর্থই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বাংলা লোককাহিনীর অন্যতম সংকলন 'ঠাকুরমার ঝুলি'র 'চ্যাংব্যাং' গল্পটিতে তা উজ্জ্বলভাবে প্রতীয়মান। এতে দেখা যায়, দেড় আঙুলে তার বাবাকে অনুসন্ধান করছে। কোথাও না পেয়ে অবশেষে হাজির হল রাজপ্রাসাদের সামনে। দেখল তার বাবা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কাঠ কাটছে। দেড় আঙুলে বাবাকে জানাল, তাকে সে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। তার বাবারও ইচ্ছে বাড়ি ফিরে যাবার, কিন্তু রয়েছে এক মস্ত বড় বাধা। দেড় আঙুলের বাবার কথায়—

'বাপ! আমার সোনা, কী করে যাই, রাজার কাছে আপনা বেচেছি।'

—এখানে বাবা তার শ্রমশক্তি বিক্রি করেছে কিংবা নিজে সে বিক্রীত হয়ে রাজার কাছে ক্রীতদাসে পরিণত হয়েছে। গত্যন্তরহীন দেড় আঙুলে রাজার কাছে জানতে চাইল— 'রাজা মশাই, রাজা মশাই রাজ-রাজ্যের কাঠ কাটে কে?' রাজা জবাবে বলে, 'কাঠ কাটে অচিন দেশের নচিন কাঠুরে।' শোষকের কাছে শ্রমজীবী মানুষের ব্যক্তি পরিচয় কিছু থাকে না। তার একটাই পরিচয়, সে শ্রমজীবী। তাই রাজার কাছে কাঠুরের পরিচয় 'নচিন' রূপে। দেড় আঙুলে তার কাঠুরে বাবাকে নিয়ে যেতে চাইলে রাজা বলেছে—

'নিয়ে এল হাটুরে, কড়ি দিয়ে কিনলাম কাঠুরে
ব্যাটা বড় মস্তকী, সেই কাঠুরে তোরে দি'।

তারপরে রাজা যদিও তার পূর্ব অবস্থান থেকে সরে এসেছে তবে শর্ত প্রদান করেছে—

'নিয়ে এসো কড়ি
তবে আসিস রাজ রাজড়ার পুরী'

শর্ত পূরণার্থে দেড় আঙুলে বেরিয়েছে টাকার সন্ধানে। রাজা যে পরিমাণ অর্থে তার বাবার শ্রমকে ক্রয় করেছে, সেই পরিমাণ অর্থ সংগ্রহে। গল্পে দেখা যায়, পিতার উপর পুত্রের কোন অধিকার নেই, নিছক অর্থকৌলীন্যের জোরে দেড় আঙুলের

পিতার উপর অধিকার অরোপ করেছে ওই রাজা। এর মধ্য দিয়ে রাজার সামন্ত্রতান্ত্রিক মানসিকতার প্রতিফলন ঘটেছে। অবশ্য ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায়, শ্রমজীবী সাধারণ মানুষ কখনো অন্যায় অবিচারের সামনে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করেনি বা তাদের সংঘশক্তির উপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেনি। একারণে প্রবল পশুর বিরুদ্ধে দুর্বল ও ক্ষুদ্র পশুর দ্বন্দ্ব-সংঘাতের চিত্র অনেক। আসলে প্রবল ক্ষমতাধর রাক্ষস-খোক্কস-ডাইনি দৈত্যের সঙ্গে সাধারণের কাল্পনিক সংঘাতের মধ্য দিয়ে ক্ষমতাবান বা প্রভাব প্রতিপত্তিশালীর সঙ্গে দরিদ্র সাধারণের শ্রেণীগত দ্বন্দ্বই হয়ে থাকে। রাক্ষস-খোক্কসের অনিবার্য করুণ পরিণতি আসলে তথাকথিত অন্ত্যজ বা পর্যুদস্ত সাধারণের নিকট শোষক শ্রেণীর পরাভবেরই রূপক।

পশুকাহিনীর মাধ্যমে সাধারণ মানুষ তার সামাজিক অভিজ্ঞতাকে রূপক হিসেবে প্রকাশ করে। যেগুলোয় মানুষ ও পশুর মধ্যে প্রায়ই অভেদ কল্পনা করা হয়। আসলে যখন থেকে সামাজিক আয়তনে অর্থনৈতিক শ্রেণীবিভাজন ঘটেছে তখন থেকেই লোককাহিনীতে পশুকে রূপক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। শোষক ও অত্যাচারীর বিরুদ্ধে অন্ত্যজের প্রতিবাদ পশুকাহিনীর মাধ্যমে ধ্বনিত হয়। এই জন্যে দুর্বল, অসহায়, ক্ষুদ্র প্রাণীকে কাহিনীর শেষে সফল হতে দেখা যায়। গায়ের জোরওয়ালা পশুকাহিনীর সংকলন পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ এবং ঈশপস ফেবলস। আসলে সামাজিক অবিচার-অনাচার থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় প্রায়শই নীতিকাহিনী ও পশুকাহিনীর মধ্যে পার্থক্য করা হয়নি। এ প্রসঙ্গে 'টুনটুনি আর টুনটুনা' কাহিনীটির উল্লেখ করা যেতে পারে। এই লোককাহিনীটি জসীমউদ্দিন সম্পাদিত 'বাঙালীর হাসির গল্প'-এর প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। এটি হাসির গল্প হিসাবে পরিচিত হলেও আসলে গল্পটি শোষিত এবং অবহেলিত মানুষের মর্মবেদনার করুণ চিত্ররূপ। কথক এখানে রাজা বনাম টোনাটুনির বিবাদে রাজার তুলনায় অতি দুর্বল ও ক্ষুদ্র টোনাটুনির পক্ষাবলম্বনকারী। টোনাটুনির মুখ দিয়ে ছড়া কেটে গল্পের মধ্যে কাব্যিক ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করা হয়েছে এবং একই সঙ্গে ছড়ার বক্তব্য দিয়ে শক্তিধর রাজাকে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করা হয়েছে। অবশেষে রাজা ও তার পারিষদবর্গের জ্ঞানগরিমা টোনাটুনির সরলতার কাছে হার মেনেছে, পর্যুদস্ত হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত রাজাকে পরাজয়ের গ্লানি বরণ করতে হয়েছে।

গল্পে রাজার সিন্দুকের টাকা শুকতে দেওয়ার মধ্যে প্রাচুর্যের ইঙ্গিত রয়েছে। যা ধনতান্ত্রিক সমাজের চিত্র। সম্পত্তি বা ধনবণ্টনের কারণে কিছু মানুষ অতিরিক্ত সম্পদ ভোগ করে। পরিণামে সাধারণ মানুষ বঞ্চিত হয় ন্যূনতম প্রয়োজনের ক্ষেত্রেও। রাজা এখানে বিত্তবানদের প্রতিনিধি-- যিনি সাধারণ অর্থে শোষণকারী। অপরপক্ষে টুনটুনি হল সাধারণ শোষিত-বঞ্চিত শ্রেণীর প্রতিনিধি। সে রাজার শুকোতে দেওয়া টাকা থেকে একটি মাত্র টাকা নিয়ে ফূর্তির বশে বলেছে রাজার ঘরে যে ধন আছে, টুনির ঘরেও সে ধন আছে। রাজা তা কিছুতেই মেনে নিতে পারলেন না। তাই লোক পাঠিয়ে

টুনটুনির টাকাটি নিজের কাছে আনিয়েছেন। আসলে এ হল শোষক শ্রেণীর আত্মসাৎ। এটা শোষক শ্রেণীর অন্যতম একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। রাজাকে নিজের সঙ্গে তুলনা করার অপরাধে রাজা তাকে ধরে আনছে, গিলে খাচ্ছে, ভোজ খেতে চাইছে, রেঁধে খেতে চাইছে। টুনির চরিত্রটি এখানে যেন সমাজের নির্যাতিত বা শোষিত শ্রেণীর রূপক এবং তার শাস্তিও ঠিক তাই। কিন্তু টুনটুনি তার সীমিত ক্ষমতায় লোভী, শোষক রাজাকে শাস্তি দিয়েছে। তার কারণে রাজাকে ব্যাঙভাজা খেতে হয়, সাত রানীর নাক কাটা যায়। এমনকি শেষ পর্যন্ত নাকটিও আস্ত থাকেনা। টুনটুনি রূপী শোষিত সর্বহারার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়—

'নাক কাটা রাজারে
দেখ তো কেমন সাজা রে'।

শ্রেণীবৈষম্য চেতনা বা শোষণের রূপ বা প্রকৃতি কিভাবে লোককথায় লুকিয়ে থাকে এটি নিঃসন্দেহে তারই একটি উদাহরণ। লোভী এবং উৎপীড়কের পরিণামে শাস্তিলাভ এবং লাঞ্ছিত ও অসহায়-এর মর্যাদা লাভ-এই চিরায়ত বিশ্বাসের পরিকাঠামো গল্পের মধ্যে নিহিত।

'ছোট খরগোশ ও পশুরাজ' লোককাহিনীতে দেখা যায়, খরগোশ প্রতিবাদী শক্তি; সামন্তপ্রভুর বিরুদ্ধে তার অভিযান। ছোট্ট পশু খরগোশ কৌতুকপ্রিয় ও সাহসী। আত্মত্যাগ ও চিন্তায় সে অন্যদের চেয়ে অগ্রসর। এই খরগোশ মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েও সাহস হারায় নি। গল্পকারের মানসলোকের বাসনার প্রতিফলন ঘটেছে এ গল্পে। কাহিনীর মধ্যে পশুরাজ সিংহকে সুকৌশলে হত্যা করে স্বস্তি পেয়েছে, মানসিক তৃপ্তি অনুভব করেছে। পশুকথার মধ্য দিয়ে উত্তরপুরুষের কাছে স্বীয় অবস্থা, মনের বাসনা-কামনা-আকাঙ্ক্ষা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

একই মটিফের আরেকটি লোককাহিনী 'সিংহ ও খরগোশের গল্পে' শ্রেণীবৈষম্য ও শ্রেণীশোষণের চিত্র বেশ স্পষ্ট। গল্পে বর্ণিত হয়েছে— এক গভীর বনে এক সিংহ ছিল। তার ভয়ে বনের পশুরা সব ভয়ে ভয়ে থাকত। একটু অসাবধান হলেই সিংহের থাবায় জীবন শেষ। অবশেষে একদিন বনের পশুরা মিলে সভা করে ঠিক করল কিভাবে সিংহের থাবা থেকে বাঁচা যায়। তারা সিদ্ধান্ত নিল যে প্রতিদিন একজন করে যাবে সিংহের খাদ্য হিসাবে। শেষকালে দেখা গেল ছোট খরগোশের বুদ্ধির কাছে অত্যাচারী সিংহের পরাজয় ও মৃত্যু। কুয়োর মধ্যে সিংহকে পাঠিয়ে তারা শান্তিতে বাস করতে থাকল। এখানে সামন্ত প্রভুর উৎপীড়নকে সিংহের অত্যাচারের রূপকে প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতিদিন সিংহের কাছে একটি করে পশু পাঠানোকে এখানে খাজনার রূপক হিসাবেই দেখতে হবে এবং শেষপর্যন্ত যে ছোট খরগোশের বুদ্ধির কাছে অত্যাচারী সিংহের মৃত্যু হল তা আসলে অসহায় নিপীড়িত মানুষগুলির মনের অবদমিত ইচ্ছার রূপক। বহু লোককথাতেই আমরা এভাবে শ্রেণীদ্বন্দ্ব ও তার থেকে মুক্তিলাভের জন্য সাধারণ মানুষের সংগ্রামী ও প্রতিবাদী চেতনাকে লক্ষ্য করি। অর্থাৎ

বাস্তবে শোষক বা শাসক শ্রেণীর সঙ্গে তারা পেরে উঠতে না পেরে গল্পে তাদের পরাজয়, মৃত্যু বা বোকা বানানোর মধ্য দিয়েই তারা যেন তাদের বিরুদ্ধে অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে চেয়েছে।

আসলে মানুষ যতই অসহায় হোক, তবুও তার আত্মমর্যাদা থাকেই। শোষণ মুক্তির কথা সে ভাবে। পীড়ন, অত্যাচার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তাদের সামনে দুটি পথ খোলা থাকে। এক সঙ্ঘবদ্ধ শক্তি অর্থাৎ সকলে মিলে যদি প্রতিপক্ষের বিরোধিতা করা যায়, তবে প্রবল পরাক্রান্ত শক্তিও পর্যুদস্ত হয়। বহু গল্পের মধ্যে এই সঙ্ঘবদ্ধ শক্তির জয় ঘোষণা দেখা যায়। তবে সরাসরি এই ঘোষণা হয় না— হয় রূপকের মাধ্যমে। আর দ্বিতীয় পথ হল বুদ্ধিমত্তার। বুদ্ধির জোরে যে দুর্বল, অসহায়, শক্তিহীন অনায়াসেই শক্তিমানদের উচিত শিক্ষা দেয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়— একটা চিংড়ি মাছ পদ্মপাতায় রোজ তার চুল শুকোয়। একদিন একটা কাক এসে বললে সে তাকে খাবে। চিঙড়ি মাছ বললে, পুঁটি মাছের কাছে তারা যাবে বিচারের জন্য। পুঁটি মাছের কাছে উভয়ে হাজির হলে, পুঁটি মাছ চলে গেল চ্যাং মাছের কাছে। চ্যাং মাছ বিচার করতে বসে কাঁকড়াকে ডাকার কথা বলল। কাঁকড়া এসে সামনে কাককে দেখে কাকটার মাথা মটকে মেরে ফেলল। চিংড়ি মাছ জলের তলায় চলে গেল। চিংড়ির বুদ্ধির কাছে কাক পর্যুদস্ত হল। এখানে চিংড়ি মাছ হল সাধারণ দরিদ্র মানুষ। কাকরূপী বিত্তবানরা এই সব হত দরিদ্রের সামান্য সম্বলটুকুও কেড়ে নিতে চায়। বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে সঙ্ঘবদ্ধতার মধ্য দিয়ে নির্যাতিতরা বিত্তবানকে নির্ধন করে। কল্পনার আলোকে বিত্তবানকে নির্ধন করাই হল প্রতিবাদী মানসিকতার প্রতিফলন। শ্রেণী সংগ্রামের এই তো চিত্র। রূপকের আড়ালে নিজেদের চিরসংগ্রামী জীবনের কথা নিহিত।

বঞ্চনা, অপমানের পাশাপাশি লোককাহিনীর কথাকাররা পরিহাসের তীব্র বাক্যবাণে সমাজের চিত্রটি সুন্দরভাবে তুলে ধরেন। 'ঘুঘু দেখেছ, ফাঁদ দেখনি' গল্পে কৃপণ মোল্লা ঘুঘুর সরলতার সুযোগ নিয়েছে, যা তার মহাজনী পুঁজিপতি মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ। দুর্বল ঘুঘুর বোকামিকে পুঁজি করে মোল্লা তাকে শোষণ করেছে। বোকা ঘুঘু কৃপণ মোল্লার কৃপণতা ও শোষণের জাল থেকে মুক্তি না পেলেও তার ভাই ফাঁদ-এর কাছে মোল্লার পরাজয় ঘটেছে। কৃপণ মোল্লারই তৈরি করা কলাপাতায় লেখা শর্তানুযায়ী তার অর্থসম্পত্তি, বসতবাড়ি সবকিছুই খোয়া যায়। লোকমানস এমনিভাবে তাদের অবদমিত ইচ্ছার মুক্তি ঘটিয়ে থাকে। তারা নিপীড়ন, নির্যাতন ও বঞ্চনার শিকার হয়েও ব্যঙ্গবিদ্রূপের মাধ্যমে প্রতিবাদ করে শোষক শ্রেণীর মুখোশ উন্মোচন করে থাকে। অপর একটি কাহিনীর মূল প্রতিপাদ্য বিষয় উপস্থাপনা করলে বিষয়ের যথার্থতা প্রমাণিত হবে : ব্রাহ্মণ জমিদারের ছোট নাতির অন্নপ্রাশনে নীচের উঠোনে খেতে বসে দীন-দরিদ্র 'ছোটজাতের' প্রজারা দেখতে পেল— ওপরের দালানে বাবুদের পংক্তিতে যে-পায়েস পরিবেশিত হচ্ছে, তার বর্ণ শুভ্র (অর্থাৎ চিনির পাক), আর তাদের পাতে যে পায়েস পড়েছে তার রং ধূসর (অর্থাৎ ভেলী গুড় দিয়ে তৈরি

বলে সেটার রং অমন) একজন তখন বিনয়ে, করজোড়ে (এঁটো হাতেই!) জনৈক কর্মকর্তাকে বলে উঠলেন : কত্তায় জোদি ভরোসা দ্যান ত এউগ্‌গা কথা কই? ....আস্‌সা বাবু ঐ হাদা মিষ্টান্ন (সাদা পায়েস) গুলিন প্যাটে হান্দাইলে (গেলে) বুঝি নমো-ক্যাওটের পোলাগো মিত্যু আইব, আঁই? লোককাহিনীর মাধ্যমে সাধারণে এই ব্যঙ্গ শ্লেষ এবং তির্যক মিথস্ক্রিয়ায় সমাজের শ্রেণীসংগ্রামের রূপটি প্রকাশ পায়। যুগে-যুগে, কালে-কালে বয়ে চলা এই সংগ্রামের ভেতর দিয়ে অবহেলিত, প্রান্তিক জনের দমিত ইচ্ছার মুক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। রূপককাহিনীর মধ্যে মানুষের সামাজিক মানসিকতা ও তার বহু সূক্ষ্ম অনুভূতি ও উপলব্ধির প্রতিফলন ঘটে থাকে। সামাজিক শ্রেণীসম্পর্ক এবং অবচেতন মনের নানান প্রত্যাশা ও অভাববোধ কাহিনীর পরিকাঠামো গড়ে তোলে। এ কারণে রাজা-রানী-রাজপুত্র -রাক্ষস-দৈত্য-ডাইনি-জাদু -মন্ত্র অলৌকিকতা ইত্যাদি বহিঃসৌধের অন্তরালে সাধারণ মানুষের জীবনের প্রত্যাশা, নৈরাশ্য, আকাঙ্ক্ষা এবং শোষণমুক্ত সমাজভাবনা এর মধ্যে লুকিয়ে থাকে। দেখা যায়, অত্যাচারী, অন্যায়কারী ভিলেন— রাক্ষস দৈত্য যারা প্রবল ক্ষমতাধর হয়ে সাধারণের ক্ষতিসাধন করে পরিণতি পর্বে তারা শাস্তিবরণ করে। আর যারা কাহিনী জুড়ে হয় প্রতারিত, লাঞ্ছিত, বঞ্চিত তাদের ভাগ্যে জোটে বিজয় এবং সাফল্য। এ কারণে নির্যাতিত দরিদ্র দুখু নিজের সততা ও নির্লোভতার কারণে অবশেষে বিজয়ী হয় অন্যদিকে অধিক লোভের বশে সুখু হয় পরাজিত। দেখা যায়, দুষ্টমতি সুখুকে তার অজগর বর গিলে খায় আর দুঃখিনী দুখু হয় রাজার বউ। কাজলরেখাকে দাসী বানিয়েও শেষ পর্যন্ত কাঁকন দাসীই হেঁটোয়-কাঁটা ওপরে— কাঁটার শাস্তি পেয়ে মারা যায়। আর কাজল ফিরে পায় নিজের ঘর-বর। আর এই একই কারণে কাঞ্চনমালা, মালঞ্চমালা, মণিমালা অবশেষে জয় লাভ করে। জনমানসের সামূহিক অবচেতন মনে দৈত্য-দানব- রাক্ষস খোক্কস অশুভের প্রতীকবাহী আর রাজপুত্র-মন্ত্রীপুত্র-কোটালপুত্র- রাজকুমারী, যারা উচ্চশ্রেণীর বাসিন্দা, যারা কিনা শোষকেরই প্রতিরূপ, রূপকাহিনীর কথকের বেঁচে থাকার আশঙ্কায় নিজেদেরকে সেই স্থানেই প্রত্যক্ষ করতে চায়। আসলে এ হল যৌথ অবচেতনার এক বিচিত্র জটিল গ্রন্থি। বাস্তবে যে শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে বিজয় লাভের প্রত্যাশা করেন, তারই আস্বাদ লাভ করেন রূপকাহিনীর মাধ্যমে।

এমনিভাবে রূপকথা, পশুকথা, রসকথা, ব্রতকথা সর্বত্রই এমনতর শ্রেণীসংগ্রামের রূপ কখনো স্পষ্টভাবে আবার কখনোবা অস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। যেমন রূপকথায় রাজপুত্র বনাম রাক্ষসের যে দ্বন্দ্ব, পশুকথায় ক্ষমতাসম্পন্ন পশুর সঙ্গে অল্প ক্ষমতাসম্পন্ন পশু বা মানুষের যে দ্বন্দ্ব কিংবাব্রতকথায় এক দেব বা দেবীর সঙ্গে অন্য দেব বা দেবীর যে দ্বন্দ্ব তা অন্ত্যজ দুর্বল মানুষের শ্রেণীবিভক্ত গোষ্ঠী মানসিকতারই ফসল। এই দ্বন্দ্ব যতদিন থাকবে, শ্রেণীসংগ্রামের অভিব্যক্তি ও চেতনাও ততদিন লোককাহিনীর প্লটে কোন না কোনভাবে প্রকাশ পাবে।

লোককথা— ক্ষুদ্রের বিজয়গাথা

দেবতুষি মিশ্র চৌধুরী

(১)

সমাজ যেন এক প্রিজম। আর এই প্রিজমের প্রতিটি দিকের পরিকাঠামো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় উচ্চ-নিম্ন, বৃহৎ-ক্ষুদ্র, সবল-দুর্বল— এইসব ভেদাভেদে সমাজের প্রতিটি প্রেক্ষিতে তৈরী হয়েছে দ্বন্দ্বের প্রেক্ষাপট। উচ্চের শোষণে নিম্ন, বৃহৎ-এর অবদমনে ক্ষুদ্র, সবলের অত্যাচারে দুর্বলের মনে ঘনিয়ে ওঠে রোষ। বাস্তব পটভূমি যাচাই করলে দেখা যায় বৃহৎ তার শক্তি-সামর্থ্য, অর্থনৈতিক জোর-এর বলে ক্ষুদ্রকে নিষ্পেষিত করতে থাকে। ক্ষুদ্রের পক্ষে বৃহৎকে প্রতিরোধ করা হয়ে ওঠে দুষ্কর। সাহিত্য সমাজের দর্পণ। তাই সাহিত্যের অন্যতম ধারা লোককথাগুলিতেও সমাজ উঠে এসেছে স্বাভাবিক ভাবেই। শুধু তাই নয় লোককথায় প্রতিফলিত হয়েছে সমাজদ্বন্দ্বের স্বরূপ। তবে লোকসাহিত্যের অন্যতম লোককথাগুলিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাহিত্যের শৈল্পিক গুণকে নষ্ট না ক'রে এই— সমাজদ্বন্দ্ব প্রকাশিত হয়েছে পরোক্ষে। অন্তরালে বা রূপকের আড়ালে। এই রূপকসূত্রে কখনও পশু-পাখি, কীটপতঙ্গ, হয়ে উঠেছে লোককথার মূল অবলম্বন আবার কখনও বা পশুপাখি এবং নরনারী উভয়েই সমান জায়গা ক'রে নিয়েছে এখানে। সাহিত্যের সাথে বাস্তবের পার্থক্য এখানেই যে সাহিত্যে বাস্তব প্রতিফলিত হলেও তা হুবহু বাস্তবের প্রতিলিপি হবে না। তাই বলা যায় লোককথা রূপকের আড়ালে সমাজদ্বন্দ্বের স্বরূপ প্রকাশকারী— এই বৈশিষ্ট্য যথার্থ সাহিত্য গুণান্বিত।

প্রসঙ্গত সুইজারল্যাণ্ডের মনোবিজ্ঞানী কার্ল-গুস্তাভ ইয়ুং এবং তার শিষ্য জোসেফ ক্যাম্পবেল-এর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। লোককাহিনীতে অবদমিত মানবজাতির লাস্যময় জীবনের প্রতিচ্ছবি দেখেন এবং লক্ষ্য করেন জীবনের নীতিময় দিক। মানুষের অতৃপ্ত কামনা বাসনা যে লোককাহিনীতে ব্যাপকভাবে রূপ লাভকরেছে একথাও তিনি ঘোষণা করেছেন। ক্যাম্পবেলের এই মন্তব্যের সত্যতা চোখে পড়ে তখনই যখন দেখা যায় বাস্তবক্ষেত্রে বহু অত্যাচার সহ্য করার পর ক্ষুদ্রের জয়লাভের দুঃসাধ্য বিষয়টি লোককথা মাত্রই অনায়াসসাধ্য। সেখানে সবসময়ই জয়যুক্ত হয়েছে ক্ষুদ্র, তুচ্ছ, দুর্বল।

উদাহরণ সহযোগে বিষয়টি স্পষ্ট করা যেতে পারে। লোককথা মূলতঃ মুখে মুখে গোষ্ঠী কর্তৃক সৃষ্ট। মৌখিকভাবেই প্রচারিত। কিন্তু লোকসমাজের এই অমূল্য

সম্পদগুলি যাতে যুগযান্ত্রিকতা সূত্রে কালান্তরে না হারিয়ে যায় তাই নানাজনে নানাসময়ে এগুলি সংগ্রহ ক'রে দুই মলাটের মধ্যে প্রকাশ করেছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হিসাবে প্রথমেই উইলিয়ম কেরীর 'ইতিহাস মালা' (১৮১২) গ্রন্থটির কথা উল্লেখ করতে হয়। তারপরই আসে রেভারেণ্ড লালবিহারী দের 'Folktales of Bengal' (১৮৮৩), উইলিয়ম ম্যাককুলোক-এর 'Bengali Household Tales' (১৯১২), দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের 'ঠাকুরমার ঝুলি' (১৯০৭), ঠাকুরদার ঝুলি (১৯০৮), ঠানদিদির থলে (১৯০৩), দাদা মহাশয়ের থলে (১৯১৩), এছাড়াও ঈশপের গল্পসমগ্র প্রভৃতি লোককথা সংগ্রহ গ্রন্থের কথা। বহুখ্যাত এইসব গ্রন্থের বহুপরিচিত কিছু কাহিনী বিশ্লেষণ সূত্রেই আলোচ্য বিষয়টি পরিস্ফুট করা যেতে পারে।

উল্লেখ্য, লোকসমাজে এই লোককথাগুলির জন্ম তাদের মনের গভীর থেকে উত্থিত এক সুপ্ত তাগিদ থেকে। যে তাগিদ বাস্তবে না হলেও গল্পের কাহিনীতে তাদের ইচ্ছাপূরণ করে। বৃহৎশক্তির শাসনের নামে অত্যাচার প্রবঞ্চনা, বল প্রয়োগে স্বাধীনতা হরণ, লাঞ্ছনায় তিতিবিরক্ত 'ক্ষুদ্র' অসহায়, দৈহিক শক্তিতে অপটু ক্ষুদ্রশক্তি বাস্তবে সুবিচার পায় না। কিন্তু মনে মনে কল্পনা করে— এইসব সমাজপতি, দুর্বৃত্ত শোষকদের পরাভব। তাদের অন্তর্নিহিত এই ভাবনাই ইচ্ছাপূরণের তাগিদে জন্ম নেয় লোককথা রূপে। লক্ষ্য করলে দেখা যায় লোককথায় নানাভাবে ক্ষুদ্রশক্তি নিজেকে বিজয়ী চরিত্র রূপে প্রতিষ্ঠা করেছে। যেমন—

১। কখনও সবল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ভাবে রুখে দাঁড়িয়ে কাঙ্ক্ষিত জয় ছিনিয়ে নিয়েছে দুর্বল এই শ্রেণী।

২। কখনও বুদ্ধির জোরে জয়ধ্বজা উড়িয়েছে তারা।

৩। বৃহৎশক্তির অসীম ক্ষমতার তুলনায় নিজ ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ক্ষুদ্রশক্তি অনেক সময় ক্ষমতাগত এই বিভেদ সত্ত্বেও মাত্রাতিরিক্ত বঞ্চনার শিকার হয়ে বৃহতের উপর নিজ জয় প্রতিষ্ঠায় উন্মুখ হয়ে Helping hand বা Helping object —এই মোটিফের সহায়তায় লোককথায় নিজ জয়ের আসন বজায় রেখেছে।

৪। সবল প্রতিপক্ষের কাছে ক্ষেত্রবিশেষে অসামর্থ্য স্বীকার করে নিয়ে মাথা নুইয়েও নিজেদের অবস্থান সুরক্ষিত রেখে পরাজয়ে গ্লানিমুক্ত থেকেছে দুর্বলশক্তি।

৫। অনেক সময় দুঃসাহসে ভর ক'রেও কাঙ্ক্ষিত জয় ছিনিয়ে এনেছে ক্ষুদ্রশক্তি।

৬। সবলের চাতুরীতে না ভুলে, নিজ সামর্থ্য সম্পর্কে সচেতন থেকে; অনেকসময় দুর্বলশক্তি সবলের থেকে দূরত্ব বজায় রেখেও থেকেছে অপরাজেয়।

৭। কখনও স্বার্থান্ধ বৃহৎশক্তি প্রবল আগ্রাসী মনোভাব নিয়ে চলে নিজেদের কৌশলে নিজেরাই পরাজিত হয়েছে।

৮। দুই সমকক্ষ সবল প্রতিপক্ষের পারস্পরিক বিরোধ অনেকসময় দুর্বলের পক্ষে হয়ে ওঠে লাভজনক।

৯। বিধাতার আনুকূল্যে অনেকসময় জয়ী হয়েছে ক্ষুদ্রশক্তি।

১০। যখন সবলের অত্যাচার ধৈর্য্যের সীমা করেছে লঙ্ঘন; কিন্তু প্রবল সে শক্তির সম্মুখে ক্ষুদ্র নেহাৎই তুচ্ছ, হীন বলে প্রতিপন্ন হয়েছে; অথচ তার একান্ত মনোগত বাসনা সবলের পরাভব; তখন সব যুক্তি, তর্কের উর্ধ্বে গিয়ে লোককথায় স্থান নিয়েছে অলৌকিক ঘটনাবলী। অলৌকিক ঘটনা সম্বলিত নানা মোটিফের ব্যবহারে সেক্ষেত্রে লোকসমাজ জিতিয়ে দিয়েছে তাদের নিজ শ্রেণীরই প্রতিভূ স্বরূপ ক্ষুদ্র, তুচ্ছকে।

(২)

প্রসঙ্গত উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী সংকলিত 'টুনটুনি আর নাপিতের কথা' গল্পটির কথা উল্লেখ করা যায়। এই গল্পে দেখা যায় বেগুন কাঁটা ফুটে ফোঁড়া হলে টুনি নাপিতের কাছে যায় তা কাটাতে। এদিকে রাজাকে কামায় নাপিত। তাই সে নাক সিঁটকায় টুনির ফোঁড়া কাটতে। টুনি তখন যায় রাজার কাছে। কোনও ফল হয় না। এরপর একে একে টুনি যায় ইঁদুরের কাছে রাজার ভুঁড়ি ফুটো করার আর্জি নিয়ে, বিড়ালের কাছে ইঁদুর মারার আর্জি নিয়ে, লাঠির কাছে বিড়াল ঠ্যাঙানোর আর্জি নিয়ে, আগুনের কাছে লাঠি পোড়ানোর আর্জি নিয়ে, সাগরের কাছে আগুন নেভানোর আর্জি নিয়ে, হাতির কাছে সাগরের সব জল খেয়ে নেওয়ার আর্জি নিয়ে। কিন্তু কেউই তার আবেদন অনুযায়ী কাজ করতে রাজি হয় না। অবশেষে টুনটুনি যায় মশার কাছে। অমনি "পীন— পীন্ ক'রে যত রাজ্যের মশা, বাপ বেটা ভাই বন্ধু মিলে হাতিকে কামড়াতে চলল। মশায় আকাশ ছেয়ে গেল।" তাতে ফল হল এই—

"হাতি বলে, সাগর শুষি।
সাগর বলে, আগুন নেবাই।
আগুন বলে, লাঠি পোড়াই!
লাঠি বলে, বিড়াল ঠেঙাই!
বিড়াল বলে, ইঁদুর মারি
ইঁদুর বলে, রাজার ভুঁড়ি কাটি,

রাজা বলে, নাপতে বেটার মাথা কাটি। আর নাপিত তখন বলে—"রক্ষে কর, টুনিদাদা। এস তোমার ফোঁড়া কাটি।" এভাবে টুনটুনির ফোঁড়া যায় সেরে।

এপ্রসঙ্গে প্রথমেই বলা যায়, লোককথাগুলিতে মানুষ-পশু-পাখি জড় পৃথিবী একভাবে কথা বলতে সমর্থ। সমাজতত্ত্বের স্বরূপ পরিস্ফুটনে মোটিফের ব্যবহারে মূক জগৎও লোককথায় হয়ে উঠেছে প্রগলভ। সে যাইহোক, এ গল্পে দেখা যায়, বৃহৎ শক্তি গায়ের জোরে ক্ষুদ্র শক্তিকে হেয় জ্ঞান ক'রে তাদের ওপর আধিপত্য চালায়। তাদের আধিপত্য বিস্তারের আর একটি কারণ, শোষিতের একটা বড় অংশ হল তাদের তাঁবেদার। কিন্তু যখন সর্বহারা শ্রেণী ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাদের দলনের বিরুদ্ধে সোচ্চার

হয়, তখন তাদের ঐক্যবদ্ধ শক্তির কাছে এই তাঁবেদার শ্রেণী ও শোষকশ্রেণী উভয়েই পর্যুদস্ত হয়। ঐক্যবদ্ধ শক্তি যে শোষিতদের জয়ের অন্যতম সোপান এ গল্পে তা দেখানো হয়েছে। এখানে রাজা ও নাপিত বৃহৎশক্তি; আর ইঁদুর, বেড়াল, লাঠি, আগুন, সাগর, হাতি হল তাঁবেদার শ্রেণীভুক্ত; তবে এরাও পারস্পরিক দ্বান্দ্বিক অবস্থানে অবস্থিত। আর টুনটুনি ও মশার পাল দলিত সর্বহারা শ্রেণীর প্রতিনিধি। যাদের মিলিত সংগ্রাম শোষকশ্রেণীকে পরাভূত ক'রে তাদের নিজ অধিকার অর্জনে সহায়তা করে।

অপর একটি গল্পে দেখা যায় একজন দরিদ্র ব্যক্তি অর্থের প্রয়োজনে রাজার কাছে টাকা চাইতে যায়। যাওয়ার পথে পৃথক পৃথক ক্ষেত্রে ইঁদুর, গাধা, ভাল্লুককে অত্যাচারিত হতে দেখে তাদের সেই দৈন্য থেকে উদ্ধার করে সে। এরপর লোকটি যায় রাজার কাছে এবং চাহিদামত অর্থ নিয়ে ফেরার পথে রওনা হলে— পথে পাহারাওয়ালা তাকে চোর অপবাদ দিয়ে আটক করে এবং বিচারে তাকে বাক্সে ভরে জলে ফেলা হয়। এইসময় এগিয়ে আসে সেই ইঁদুর, গাধা আর ভাল্লুক। অনেক প্রচেষ্টাব পরও অকৃতকার্য হয় তারা। শেষে পায় সাদা ডিমের মত আকৃতির এক ভাগ্যপাথর। আর এই পাথরের সাহায্যে তারা বাঁচায় তাদের উদ্ধারকর্তাকে। দরিদ্র ব্যক্তি উদ্ধার হওয়ার পর পাথরের কাছে চায় এক বিশাল রাজপ্রাসাদ। সঙ্গে সঙ্গে তাই পায়। হঠাৎ সেখানে এসে পৌছয় এক সওদাগর। সওদাগর তার প্রাসাদ দেখে কৌতূহলী হয়ে ওঠে এবং জানতে পারে সেই দুষ্প্রাপ্য ভাগ্যপাথরের কথা। হঠাৎ বড়লোক হওয়া সেই দরিদ্র ব্যক্তিকে সওদাগর প্রচুর ধনরত্নের লোভ দেখায় এবং সেই ভাগ্যপাথরটি হাতিয়ে নেয়। সাথে সাথে পূর্বোক্ত সেই দরিদ্র ব্যক্তি দেখে সে সেই বাক্সে বসে ভেসে চলেছে অকূল পাথারে। আর ইঁদুর, গাধা, ভাল্লুকও সেক্ষেত্রে কিচ্ছু করতে পারে না।

অন্যদিকে সওদাগর বিশাল প্রাসাদে জাঁকিয়ে বসে। মনে পড়ে যায় সামন্ততান্ত্রিক প্রথার অন্যতম দিক সম্বলিত রবীন্দ্রনাথের পংক্তি— "রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি।" যাক্ সে কথা; এখন এই সওদাগরটি ভাগ্যপাথরটা পাহারা দেবার জন্য নিযুক্ত করে বেড়াল। অনেক কৌশলে সে পাথর নিয়ে আসে ইঁদুর। তারপর গাধা আর ভাল্লুক যায় জল থেকে লোকটিকে উদ্ধার করতে। কিন্তু ভুল করে কথা বলতে গিয়ে গাধার মুখে থাকা সেই পাথরটি যায় জলের মধ্যে পড়ে। আবার বিপদ ঘনিয়ে আসে। শেষে ব্যাঙেদের মিথ্যা কথা বলে সেই পাথর তোলার ব্যবস্থা হয়। তারপর উদ্ধার হয় লোকটি এবং বাকি জীবন তারা একসাথে চারজন সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে প্রাসাদে কাটাতে থাকে।

উল্লেখ্য, এ গল্পের প্রথমাংশে বৃহৎশক্তির পারস্পরিক বোঝাপড়ার অভাবে ক্ষুদ্রশক্তির চরম দৈন্যের ইতিবৃত্ত উঠে এসেছে। ঐক্যবদ্ধ চেষ্টায় পুনরায় দৈন্যমোচন এবং সুখৈশ্বর্য লাভ সম্ভব হয়েছে ক্ষুদ্রশক্তির। কিন্তু এখানেই কাহিনীর শেষ নয়। কেবল

ক্ষুদ্রশক্তির জয়গান গেয়েই লোককথা থেমে থাকেনি; আকাঙ্ক্ষার মাত্রাতিরিক্ত —তা যে পুনরায় বিপদ ঘনিয়ে তুলতে পারে তা উঠে এসেছে এখানে। জাগানো হয়েছে— ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকাই শেষ কথা নয়। থাকতে হবে সচেতনও। ভোগবাসনা তার সীমা অতিক্রম করলেই সেই রন্ধ্রপথে কূটকৌশলী সবল দুর্বলের সুখের আগারকে মুহূর্তে ধ্বংস করার বীজ অনুপ্রবিষ্ট করিয়ে দেয়। তখন সেই ধ্বংসের পথ রোধ পূর্বাপেক্ষা আরও কঠিন হয়ে ওঠে। তবে সব শেষে এই লোককথা আবার ঐক্যবদ্ধ থেকে শ্রমভাগ করে নিয়ে জীবনের জটিলতা জয়ের পথ দেখিয়েছে।

(৩)

ঈশপের গল্পসমগ্রের একটি লোককথা— 'খরগোশ ও সিংহ'–এর কাহিনীতে দেখা যায় বনের রাজা সিংহ আইন করেছে প্রতিদিন একটি ক'রে পশুকে তার খাদ্য হিসাবে তার কাছে যেতে হবে। এইভাবে প্রতিদিনই একজন না একজন নিরুপায় প্রাণীর মৃত্যু ঘটছিল। ক্রমশ একদিন আসে খরগোশের পালা। সে অনেক পথ ঘুরে, বেড়িয়ে, অনেক দেরী ক'রে সিংহের কাছে যায়। এদিকে খাওয়ার নির্দিষ্ট সময়ের অনেক দেরী ক'রে পৌঁছানোয় সিংহ তখন রেগে আগুন। খরগোশ জানায় যেতে তার কোনও দোষ নেই, পথে আসতে তারই মত অবিকল এক সিংহ তার দেরী করিয়ে দিয়েছে। সে নিজেকে বনের রাজা ব'লে জাহির ক'রে খরগোশকে আটক ক'রে রেখেছিল। অনেক কষ্টে সেখান থেকে সে পালিয়ে এসেছে। সিংহ একথা শুনে, অপর সিংহটিকে দেখতে চাওয়ার বাসনা প্রকাশ করে। আর খরগোশ তাকে নিয়ে যায় একটি কূপের সম্মুখে এবং সেখানে নিয়ে গিয়ে কূপের জলের দিকে নির্দেশ করে সে। সিংহ সেদিকে তাকিয়ে নিজের প্রতিবিম্ব দেখে তাকেই প্রতিপক্ষ ব'লে ভেবে নেয় এবং যখন তর্জন গর্জন ক'রে প্রতিবিম্বকেও একই আচরণ কবতে দেখে, তখন কূপে ঝাঁপ দেয় তাকে মারার জন্য এবং সিংহের মৃত্যু ঘটে। আর এইভাবেই জয় হয় দুর্বল খরগোশের।

এই গল্পে লুকিয়ে আছে দীর্ঘদিন ধরে বৃহৎ কিভাবে ক্ষুদ্রের উপর আধিপত্য চালায় তার ইঙ্গিত— ১। গায়ের জোরে। ২। ভয় দেখিয়ে। ৩। ক্ষুদ্রের ঐক্যের অভাবে।

শোষিতরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে মুক্তির উপায় খুঁজলে বুদ্ধির জোরে একদিন না একদিন তারা বৃহৎ শক্তিকে পরাভূত ক'রে জয়লাভ করেই। এ গল্পেও দেখা যায় শেষকালে ক্ষুদ্র খরগোশের বুদ্ধির কাছে অত্যাচারী সিংহের পরাজয় ও মৃত্যু। ড. দিব্যজ্যোতি মজুমদার গল্পটির মধ্যে সামন্তপ্রভুর উৎপীড়নকেই সিংহের অত্যাচারের রূপকে প্রতিফলিত হতে দেখেছেন। প্রতিদিন সিংহের কাছে একটি ক'রে পশুকে পাঠানো এখানে সামন্তপ্রভুর কাছে প্রজাদের দেয় খাজনার রূপক হিসাবেই দেখতে হবে এবং শেষপর্যন্ত যে ছোট খরগোশের বুদ্ধির কাছে অত্যাচারী সিংহের মৃত্যু হল তা আসলে অসহায় নিপীড়িত মানুষগুলির মনের অবদমিত ইচ্ছারই রূপক। বহু লোককথাতেই আমরা এভাবে শ্রেণীদ্বন্দ্ব ও তার থেকে মুক্তিলাভের জন্য সাধারণ মানুষের সংগ্রামী বা

প্রতিবাদী চেতনাকে লক্ষ্য করতে পারি। অর্থাৎ, বাস্তবে শোষক বা শাসক শ্রেণীর সঙ্গে তারা পেরে উঠতে না পেরে গল্পে তাদের পরাজয়, মৃত্যু বা বোকা বানানোর মধ্য দিয়ে যেন তারা তাদের প্রতি অত্যাচারেরই প্রতিশোধ নিতে চেয়েছে।

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী সংকলিত 'নরহরি দাস' গল্পে বাড়ি থেকে অনেকদূরে বনের ভেতর প্রচুর ঘাস খেয়ে চলৎশক্তি হারিয়ে এক ছাগলছানা সন্ধ্যের সময় শেয়ালের গর্তে ঢোকে। রাতে বাঘের বাড়ি নিমন্ত্রণ খেয়ে শেয়াল নিজ গর্তে ফিরলে ছাগলছানা নিজেকে রক্ষার জন্য বুদ্ধি ক'রে বলে—

"সিংহের মামা আমি নরহরি দাস।
পঞ্চাশ বাঘে মোর এক এক গ্রাস।।"

এ কথা শুনে শেয়াল ভয় পেয়ে পুনরায় বাঘের কাছে পালায়। বাঘ শেয়ালকে বেশ ক'রে লেজের সাথে বেঁধে নরবরি দাসকে দেখতে শেয়ালের গর্তে এল। ছাগলছানা সামনে সমূহ বিপদ দেখে। কিন্তু এই বিপন্মুক্তির জন্য সাহস ক'রে শেয়ালকে বলে—

"দূর হতভাগা! তোকে দিলুম দশ বাঘের কড়ি
এক বাঘ নিয়ে এলি লেজে দিয়ে দড়ি।"

বাঘ ভাবে শেয়াল ফাঁকি দিয়ে তাকে নরহরি দাসের খাদ্য হিসাবে নিয়ে এসেছে। ভয়ে সে শেয়াল শুদ্ধ পঁচিশ হাত লম্বা লম্বা লাফ দিয়ে খেতের উপর দিয়ে, আলের উপর দিয়ে সারারাত ধরে পালায়। আর শেয়াল একেই বাঘের রাগের কারণ হয়; তার ওপর মাটিতে আছাড় খেয়ে খেয়ে তার আর দুরবস্থার অন্ত থাকে না। শিয়ালের সেদিন ভারি সাজা হয়েছিল আর ছাগলছানা নির্বিঘ্নে পরের দিন বাড়ি ফিরে এসেছিল।

বুদ্ধির জোরে ক্ষুদ্র শক্তি যে নিজেকে বৃহৎ শক্তির অত্যাচার থেকে রক্ষা করতে পারে এবং বৃহৎ শক্তিকে তার কাছে হার স্বীকার করতে বাধ্য করতে পারে— নিম্নশ্রেণীর একান্ত মনোগত এ আকাঙ্ক্ষার ইঙ্গিত এ গল্পে আছে। সমাজে ক্ষুদ্র শক্তির উপর বৃহতের একচ্ছত্র আধিপত্য শ্রেণীদ্বন্দ্বের মূল কারণ। ক্ষুদ্র শক্তির (এ গল্পে ছাগলছানার) শক্তিসামর্থ্য বৃহৎশক্তির (এ গল্পে বাঘ ও তার তাঁবেদার শেয়ালের) তুলনায় তুচ্ছ। তাই শারীরিক শক্তিতে বলীয়ান বৃহৎ শক্তি চায় তাকে গায়ের জোরে পদানত ক'রে রাখতে। কিন্তু বুদ্ধিবলে ক্ষুদ্র শক্তি এ অবস্থার মোকাবিলা করতে সমর্থ— এই হল এ গল্পের মূল প্রতিপাদ্য। যদিও বাস্তব ক্ষেত্রে বেশীর ভাগ সময়েই ভয়ে পিছিয়ে আসে তারা।

(৪)

এর কারণ— বৃহৎশক্তির বুদ্ধিও কিছু কম নয়। অনেক সময়ই দেখা যায় বৃহৎশক্তি কথার জালে ভুলিয়ে, ক্ষুদ্র শক্তিকে নিজ অধীন ক'রে; তার দ্বারা কার্যসিদ্ধি করে। তারপর তারই উপর শুরু করে অত্যাচার। কিন্তু বাস্তবের এ পটভূমি কোনও কোনও লোককথায় উঠে এলেও শেষ পর্যন্ত জয়স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হয় ক্ষুদ্রশক্তিরই। এ ক্ষেত্রে

নিজ অপারগতার সীমাবদ্ধতা ঘুচিয়ে বৃহতের উপর জয় প্রতিষ্ঠার জন্য ক্ষুদ্র শক্তি দ্বারস্থ হয় কোনও এক সাহায্যকারীর কাছে। যেমন— 'দুষ্ট বাঘ' গল্পে খাঁচায় বন্দী বাঘ পথচলতি ঠাকুরমশাইকে দেখে বারবার প্রণাম করতে থাকে এবং হাত জোড় ক'রে ঠাকুরমশাইকে বলে—

"আজ্ঞে, একটি বার যদি এই খাঁচার দরজাটা
খুলে দেন। আপনার দুটি পায়ে পড়ি।"

ভালোমানুষ ঠাকুরমশাই ফন্দিবাজ বাঘের ফন্দি অনুধাবন করতে না পেরে খাঁচার দরজা খুলে দিতেই বাঘ তাকেই খেতে চায়।

কিন্তু গল্পের পরিণতিতে দেখা যায় ঠাকুরমশাইয়ের সাক্ষী স্বরূপ এক শিয়াল আসে। সে পুরো ঘটনাটা ভালো ক'রে বুঝে নিতে চায়— কে খাঁচার ভিতরে ছিল, কে ছিল বাইরে, দেখতে চায়— সেই পথ আর খাঁচা। কিন্তু ভালোমানুষ ঠাকুরমাশাই এবং ফন্দিবাজ বাঘ দুজনে মিলে যতই তাকে ঘটনাটা বোঝাতে চেষ্টা করে সে ইচ্ছে করেই না বুঝতে পারার ভান করে। তখন বাঘ রেগে খাঁচার ভিতর ঢুকে বলে—

"ও কথা তোকে বুঝতেই হবে। দেখ,
আমি এই খাঁচার ভিতরে ছিলুম, দেখ
এই এমনি ক'রে—"

আর, বাঘ যেই খাঁচায় ঢোকে শেয়াল অমনি খাঁচার দরজা বন্ধ ক'রে হুড়কো এঁটে দেয়। আসলে সে প্রথম থেকেই সবই বুঝতে পেরেছে, কিন্তু সে জানে বাঘের তুলনায় তার শক্তি কত নগণ্য, তাই গায়ের জোরে বাঘকে হারিয়ে সে যে ঠাকুরমশাইকে রক্ষা করতেপারবে না একথা তার অজানা নয়, ঠাকুরমশাইকে রক্ষা করতে সে কারণে সে এই বুদ্ধিব পথ অবলম্বন করে এবং তার কাজে জয়ী হয়।

দুর্বল শ্রেণী মনে মনে কল্পনা করে তাদের অত্যাচারীদের পরাভব। আর নিজেদের শক্তিতে, বুদ্ধিতে তা সম্ভব না হলে কল্পনা করে সাহায্যপ্রার্থী কারো কথা। যার দ্বারা প্রতিকূলতা অতিক্রম করা সম্ভব হবে। এ গল্পে মানবাকাঙ্ক্ষার সেই বিশেষ দিকটিই উঠে এসেছে।

(৫)

যেমন— 'টুনটুনি আর বিড়ালের কথা' গল্পে বেগুন গাছে বাসা বাঁধে এক টুনটুনি, তার বাসায় ছোট্ট ছোট্ট তিনটি ছানা হয়। তারা উড়তেও পারে না, চোখও মেলতে পারে না। এক দুষ্টু বিড়াল শুধুই ভাবে— 'টুনটুনির ছানা খাব'। সেই উদ্দেশ্যে সে একদিন এসে বলে— 'কী করছিস লা টুনটুনি?' টুনটুনি মাথা হেঁট ক'রে বেগুন গাছের ডালে ঠেকিয়ে বলে— 'প্রণাম হই মহারানী!' বিড়ালনী তাতে খুশি হয়ে চলে যায়। রোজই ঘটে এমন ঘটনা। দিন যায়। যখন টুনটুনি বোঝে তার ছানারা উড়তে সক্ষম

হয়েছে; তখন টুনটুনি তাদের উঁচু তালগাছের ডালে গিয়ে বসতে বলে। ছানারা গিয়ে বসে। এরপর আসে বিড়াল। আর এবার বিড়াল আসলেই টুনটুনি পা উঠিয়ে, তাকে লাথি দেখিয়ে বলে— 'দূর হ লক্ষ্মীছাড়া বিড়ালনী।' বলেই সে ফুড়ুৎ ক'রে উড়ে পালায়। দুষ্টু বিড়াল দাঁত খিঁচিয়ে লাফিয়ে গাছে ওঠে কিন্তু না ধরতে পারে টুনটুনিকে, না খেতে পারে তার ছানাদের। উপরন্তু বেগুন কাঁটার খোঁচা খেয়ে ক্ষতবিক্ষত হয়।

নিজের দুর্বলতার রন্ধ্রপথ ভক্তির প্রলেপে সযত্নে আচ্ছাদন ক'রে রেখেছিল এখানে টুনটুনি আর যেই সেই দুর্বলতাটুকু জয় ক'রে নিল সে; তখনই সেই ভিত্তিহীন ভক্তিকে গোড়া থেকে ছেঁটে ফেলে, প্রবলের প্রতি তার অশ্রদ্ধার ডালি দেয় উপুড় ক'রে।

সবসময় মারের বদলা মার নয় দুঃসাহসে ভর ক'রে অবদমিত আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার প্রয়াসও মেলে লোককথায়। যেমন-- প্রচলিত এক লোককথায় মেলে সাহসের জোরে এক গরিব মানুষের দারিদ্র্য জয় করার ইতিবৃত্ত। বাজারে মোট বয়ে, প্রভূত কষ্ট সহ্য ক'রে সাত ছেলেমেয়ে ও বউ নিয়ে সংসার চালায় সেই গরিব মানুষটি। একবার গাছে বারোটা লাউ হলে, অর্থলাভের আকাঙ্ক্ষায় সে লাউগুলি নিয়ে যায় বাজারে বিক্রি করতে। কিন্তু বিক্রির জন্য বাজার মাশুল দিতে গিয়ে তার কাছে আর একটিও লাউ অবশিষ্ট থাকে না। রাগে ক্ষোভে সে সাহসে ভর ক'রে বেআইনি ভাবে নিজেকে রানীর বউর ভাই-- এই মিথ্যা পরিচয় দিয়ে নিজেই মাশুল তুলতে শুরু করে। তার পরিচয় শুনে সবাই ভয়ে তাকে মাশুল দিয়ে দিত। এদিকে রানীর কানে যায় এ ঘটনা। রানী তাকে ডেকে পাঠান। গরিব মানুষ তার দুঃখের ইতিহাস মেলে ধরে রানীর সামনে। সব শুনে রানীর মন গলে যায়। তার সত্য পরিচয় প্রকাশ না ক'রে মিথ্যা পরিচয়ই বজায় রেখে রানী ঘোষণা করলেন— শুধুমাত্র আমার বউয়ের ভাইকে মাশুল দিতে হবে। আর সব মাশুল আজ থেকে বন্ধ ক'রে দিলাম।

(৬)

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী সম্পাদিত 'টুনটুনির কথা' গল্পসংকলনের 'টুনটুনি আর রাজাব কথা' গল্পে দেখা যায় রাজার এত টাকা যে তিনি তা রোদে শুকোতে দিয়েছেন। বেচারী টুনটুনি তা থেকে একটি টাকা নিতেই রাজা রেগে আগুন। টুনটুনি যখন বলে—

"রাজার ঘরে যে ধন আছে

টুনির ঘরেও সে ধন আছে।"— তা শুনে রাজার লোক টুনির টাকা নিয়ে যায়। টুনির চরিত্রটি এখানে বঞ্চিত, সর্বহারা মানুষদের প্রতিনিধিত্ব করে। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে টুনিদের মত তুচ্ছাতিতুচ্ছ সাধারণকে শোষণ করেই উচ্চবিত্ত সমাজ তাদের ধনতৃষ্ণা চরিতার্থ করে।

এই গল্পের পরবর্তী অংশে দেখা যায় ওই টাকাকে কেন্দ্র করেই দ্বন্দ্বে রাজা টুনটুনিকে মারতে প্রবৃত্ত হয়েছেন এবং শেষে উপায়ান্তর না দেখে তার বিনাশ সাধনার্থে জল দিয়ে তাকে গিলে ফেলেন। কিন্তু তবু মরে না টুনটুনি। রাজার ঢেঁকুরের সাথে বেরিয়ে আসে সে। টুনটুনি এখানে সর্বহারার প্রতীক। আর এই নিঃস্ব এই সর্বহারারা বাঁচার ইচ্ছাতেই বাঁচে। কথায় আছে— আশায় বাঁচে চাষা। যাই হোক, রাজা সেপাইকে হুকুম দেন ঢেঁকুরের সাথে টুনটুনি বাইরে বেরিয়ে এলেই সে যেন প্রস্তুত হয়ে থাকে। কিন্তু তার তলোয়ার টুনটুনির গায়ে পড়ে না। পড়ে রাজার নাকে ও তার নাক কেটে যায়। মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে এ গল্পে ক্ষুদ্রপ্রাণের অন্তরের একান্ত অবদমিত ইচ্ছার স্বরূপটি ফুটে উঠেছে। আর তা হল— সমাজে শোষকশ্রেণী তাদের অত্যাচারের পাপের শাস্তি ঠিকই একসময় পাবে।

আবার অন্য একটি গল্পে দেখা যায় একটি লোকের একটি ছাগল এবং একটি গাধা। ছাগলটি গাধাটিকে ঈর্ষা করে। বুদ্ধি, বাক্‌চাতুর্যে ছাগল গাধার তুলনায় অনেকটা এগিয়ে। একদিন ধূর্ত ছাগল মনিবের গাধাকে ভালোমত খাওয়ানো আর সহ্য করতে না পেরে গাধাটিকে গিয়ে বলে— "সত্যি ভাই, তোমার জন্য বড় দুঃখ হয় · দিন নেই, রাত নেই কেবল খালি কাজ করো : তোমার যেন মূর্ছা রোগ হয়েছে এই ভাণ ক'রে এক গর্তের মধ্যে পড়ে যাও। তা হ'লে অন্তত একটা দিনের জন্যও তুমি রেহাই পাবে।" বুদ্ধির সামর্থ্যে পিছিয়ে থাকা গাধা ছাগলের এই প্ররোচনায় ভুলে তার কথা মত কাজ করে এবং গর্তে পড়তে গিয়ে রীতিমত আহত হয়। ছাগল নিজের কেরামতিতে দুর্বল গাধাকে বিপাকে ফেলে যার পরনাই আনন্দিত হয় কিন্তু তার আনন্দ বেশীক্ষণ টেঁকে না। কারণ, গাধাকে বিপদে ফেলার ফাঁদ পাততে গিয়ে সে নিজেই ফাঁদে জড়িয়ে পড়ে। কারণ, আহত গাধাকে দেখতে এসে পশুচিকিৎসক মালিককে বলে গাধাটিকে ছাগলের কলজের মাংস খাওয়াতে। আর তাই ছাগলটিকে অচিরে জবাই হতে হয়।

এখানে দেখা যায় সবলের দুর্বলের প্রতি নিক্ষিপ্ত জ্যামুক্ত তীর বুমেরাং হয়ে ফিরে গেছে তারই দিকে এবং বিদ্ধ করেছে তাকে।

গ্রন্থঋণ :

সুধীরকুমার করণ, বিশ্বলোককথার রূপরেখা, পুনশ্চ, ১৯৬৭
মযহারুল ইসলাম, ফোকলোর পরিচিতি ও পঠন পাঠন, ২য় সং, বাংলা একাডেমি,১৯৭৪
বরুণকুমার চক্রবর্তী সম্পাদিত বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ, ২য় সং, ২০০৭
দিব্যজ্যোতি মজুমদার, বাংলা লোককথায় টাইপ ও মোটিফ ইনডেক্স, ৩য় সং, ১৯৯৩
দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, ঠাকুরমার ঝুলি
উপেন্দ্রকিশোর রচনা সংগ্রহ, ১ম খণ্ড, ১৯৭৭
ঈশপের গল্প সংগ্রহ (তারাপদ রায়) ১ম প্রকাশ, ১৩৯৩

বাংলা-লোককথায় জাদু-বাস্তবতা

শান্তি সিংহ

(এক)

বাংলা-লোককথায় জাদু বাস্তবতা আলোচনায়, প্রথমেই জাদু-বাস্তবতা (Magic Realism) সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা দরকার।

'ম্যাজিক রিয়ালিজম' শব্দটির উৎস জার্মান শব্দ 'ম্যাজিসচার রিয়েলিসমাস'। ফ্রাঞ্জরো (Franz Roh) Nach-Expressionism (Magischer Realismus) বইয়ে এই বিশেষ রীতির প্রয়োগ দেখান। ১৯২৫ সালে প্রকাশিত এই বইটি বিশেষ রীতির অঙ্কনের ব্যাখ্যা তুলে ধরায় প্রয়াসী হয়। পরে লাতিন আমেরিকার লেখক Alejo Carpentier এই শব্দটি Real maravilloso বলে ব্যবহার করেন, যার থেকে ধারণা তৈরি হয় magischer realismus এবং Magic Realism-এর।

আর্জেন্টিনিয়ার লেখক জর্জ লুইস ব্রোজেস তাঁর উপন্যাস ও লেখায় 'ম্যাজিক রিয়ালিজম' নিয়ে সাহিত্যে প্রথম নতুন মাত্রার (Dimension) সংযোজন ঘটান। পরবর্তীকালে কলম্বিয়ার লেখক গ্র্যাব্রিয়েল গর্সিয়া মার্কেজ এবং জার্মানির গুন্টার গ্রাসের লেখায় ম্যাজিক রিয়ালিজমের চমৎকারিত্ব ও স্বপ্নাবেশের কুহক-জানানো বিশ্বপ্রিয়তা দেখা যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য হলেন, গুয়েতেমালার সিগুয়েল অ্যাঞ্জেল (১৮৯৯-১৯৭৪), আর্জেন্টিনার জুলিও কোর্টাজার (১৯১৪-৮৪), মেক্সিকোর কার্লোস্ ফুয়েন্টিস, ইতালিয়ান ঔপন্যাসিক ইটালো ক্যালভিনো (১৯২৩-৮৫), প্রবাসী ভারতীয় সলমন রুশদি (১৯৪৭-)

Fraz Roh-র ম্যাজিক রিয়ালিজম তত্ত্ব ইউরোপ ও লাতিন আমেরিকার সাহিত্যে গভীর প্রভাব ছড়ায়। ইতালিয় সৃজনশীল 'ম্যাজিক রিয়ালিস্ট' লেখক ম্যাসিমো বনটেমপলি বলেন, ... 'Opening new mythical magical perspectives on reality ; সেই ভাবনায় প্রভাবিত ভেনেজুয়েলার লেখক আর্থো আলসা পিয়েত্রী।

সাহিত্যে Magic Realism বা Magical Realism সম্পর্কে সহজভাবে বলা যায় : এক বিশেষ ধরনের সাহিত্যরীতি বা আধুনিক নভেল, যেখানে উপকথা-লোককথা এবং চিত্তচমৎকারী উপাদানযোগে বর্ণনার পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়। বস্তুগত বাস্তবতা এবং তার বিশ্বাসযোগ্যতার দিকটি, অবস্থানগত বাস্তবতার বাঁধন ছাড়িয়ে এক ভিন্নতর মাত্রায় পৌঁছে যায়। যেখানে আলাদাভাবে ধরা

দেয় লোককথা, পৌরাণিক ঘটনা— যা বাস্তবতার ছোঁয়ায় খুবই প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। কার্পেটিয়ারের অভিমত— 'To seize the mystery that breaths behind things.'

ম্যাজিক্যাল রিয়ালিজমের সঙ্গে অতিপ্রাকৃত ধারণা প্রায়শই মিশে বাঁধিয়ে দেয় অস্পষ্টতা, কারণ এই 'দুই ঘরানা' মানুষ এবং তার অস্তিত্ব নিয়ে অযৌক্তিক ও অবাস্তব বিষয়ে অবতারণা করে। ফ্রাঞ্জ রো 'ম্যাজিক্যাল রিয়ালিজম' এবং 'সুররিয়ালিজম' এই দুই ধারণায় শক্তিশালী যোগসূত্র খুঁজে পেয়েছেন; যদিও 'সুররিয়ালিজম' এবং 'ম্যাজিক্যাল রিয়ালিজম'-এ আছে যথেষ্ট পার্থক্য।

জেনি উল্‌ফ বলেন, ম্যাজিক রিয়ালিজম এক ধরনের 'ফ্যান্টাসি-লেখা', যাঁরা স্প্যানিশ জানেন, তাঁরাই এ ধরনের লেখা লেখেন। অথচ অ্যামারেল বিয়াট্রিস চ্যাণ্ডির মতে— ফ্যান্টাসি থেকে ম্যাজিক রিয়ালিজম আলাদা। তবু অতি কল্পনার (Fantasy) , সঙ্গে জাদু-বাস্তবতার (Magic Realism) অন্তর্লীন যোগসূত্র অস্বীকার করা যায় না। প্রাচ্যের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যধারায় দুইয়ের মিল দুর্নিরীক্ষ্য নয়।

(দুই)
বাংলা-লোককথার রূপরেখা

বাংলা-লোককথার সংগ্রাহক হিসাবে জি. এইচ. ড্যামাণ্ট স্মরণীয়। 'The Indian Antiquary' পত্রিকায় অনেকগুলি লোককথা প্রকাশ করেন ড্যামাণ্ট। 'Descriptive Ethnology of Bengal' গ্রন্থে নৃতাত্ত্বিক আলোচনার পাশাপাশি বাংলা লোককথা-সংগ্রহের বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন থেকেছেন। উইলিয়ম কেরীর 'ইতিহাসমালা' নিছক গল্পসংকলন নয়; তাতে আছে বাংলার প্রচলিত লোককথাও। তবে, যথার্থ বাংলা লোককথার সংকলক উইলিয়াম ম্যাক্‌কুলোক। তাঁর 'Bengali Household Tales' গ্রন্থে, তৎকালীন বাংলার গ্রাম বৃদ্ধ-গ্রামবৃদ্ধাদের মুখের ধারা (Oral tradition) সংকলনে মান্য; তদুপরি যথোপযুক্ত 'পরিশিষ্ট' সংযোজিত।

লালবিহারী দে (১৮২৪-১৮৯৪) বর্ধমান জেলার সোনাপলাশী গ্রামে বৈষ্ণবভাবাপন্ন -সুবর্ণবণিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। কলকাতায় পড়াশুনার সময় আলেকজাণ্ডার ডাফের প্রভাবে ১৮৪৩ সালের ৯ জুলাই খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত হন। (লক্ষণীয়, তাঁর খ্রিস্টধর্মগ্রহণের পাঁচমাস পূর্বে ১৮৪৩ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি কবি মধুসূদন দত্ত খ্রিস্টধর্মগ্রহণ করেন।) পরবর্তীকালে, তিনি খ্রিস্টধর্মযাজক রেভারেণ্ড লালবিহারী দে নামে সাধারণে পরিচিত হলেও, শিক্ষাজগতের প্রতি গভীরতর আগ্রহে, খ্রিস্টীয় ধর্মপ্রচারকের দায়িত্ব থেকে বিরত হয়ে, সরে আসেন হুগলি কলেজের অধ্যাপনা-কর্মে। এ হো বাহ্য। গ্রামবাংলার প্রতি সহজ গভীর ভালোবাসায় তিনি বাংলার লোককথার বিশিষ্ট সংকলক-সম্পাদক। তাঁর 'Folktales of Bengal' গ্রন্থ

লোকসাহিত্যে সমাদৃত গ্রন্থ। (তাঁর অন্য একটি ক্ষেত্রসমীক্ষাধর্মীগ্রন্থ 'Bengal Peasant Life,') তাঁর সম্পাদিত Bengal Magazine পত্রিকায় ১৮৭৫-এর আগস্ট থেকে মুদ্রিত হয় Folk Tales of Bengal-এর লেখাগুলি।

শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাল্যবন্ধু আশুতোষ মুখোপাধ্যায় 'রাক্ষস-খোক্ষস' ও 'ভূত-পেত্নী' নামে দুটি শিশুমনোরঞ্জনী গ্রন্থের লেখক। সেগুলি বাংলা লোককথার ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ।

জন্মসূত্রে ঢাকার উলাইল গ্রামের মানুষ দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার তৎকালীন ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত টাঙ্গাইল মহকুমার অধীনে দীঘাপাতিয়া গ্রামে সন্তানহীনা পিসিমার স্নেহভালোবাসায় প্রতিপালিত। বাল্যযৌবনের দেখা গ্রামাঞ্চলের বিচিত্র নরনারী এবং তাঁদের মুখে-শোনা লোককথা তাঁর স্মৃতি-মঞ্জুষায় সুরক্ষিত থাকার সুবাদে, তাঁর 'ঠাকুরমার ঝুলি' (১৯০৭) সংকলনগ্রন্থ আশ্চর্য সরলতায় শিশুপ্রিয় রূপকথা বা লোককথার মূল্যবান সাহিত্য সামগ্রী হয়ে উঠেছে। তাঁর লেখা 'ঠানদিদির থলে', 'দাদামশায়ের থলে' বইদুটি তত জনপ্রিয় নয়।

জ্ঞানেন্দ্রশশী গুপ্তের 'উপকথা', উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর 'টুনটুনির বই,' অম্বিকাচরণ গুপ্তর 'পিসীমার গল্প,' শ্যামাচরণ দে-প্রণীত 'বঙ্গের উপকথা', চণ্ডীচরণ গুপ্তের 'ঠাকুরমার রূপকথা', কালীমোহন ভট্টাচার্যের 'ঠাকুরদাদার রূপকথা', মহম্মদ আয়ুব হোসেন-সংকলিত 'বাংলার লোককথা' (১৯৮৫) রফিকুল ইসলাম-সংকলিত 'নিম্ন দামোদরের লোকগল্প' (১৯৮৬) প্রভৃতি কিছু বই বাংলা-লোককথার ধারাকে সজীব-গতিশীল রেখেছে।

সবিশেষ লক্ষণীয়, বঙ্কিমচন্দ্রের চেয়ে চোদ্দ বছরের বড় লালবিহারী দে, তাঁর সংকলিত লোককথায় বর্ধমান, হুগলি এবং সংলগ্ন গাঙ্গেয় জনপদে ক্ষেত্র সমীক্ষালব্ধ লোককথার সংকলন করেছেন। লাল মাটির দেশ বাঁকুড়া-পুরুলিয়া-বীরভূম এবং সন্নিহিত বর্ধমান বিহার-ঝাড়খণ্ডের বাংলাভাষাভাষী জনজীবনে প্রচলিত লোককথার রূপ 'Folktales of Bengal'-এ পাওয়া যায় না। প্রসঙ্গত জানাই লালমাটির দেশ বাঁকুড়া-পুরুলিয়ায় মানুষ হওয়ার সুবাদে ক্ষেত্রসমীক্ষায় অনেক নতুন ধরনের লোককথা গ্রামীণ জনজীবন থেকে সংগ্রহ করার সুযোগ হয়েছে বর্তমান লেখকের। যা লালাবিহারী দে মহাশয়ের সংগৃহীত লোককথা থেকে রূপে-রসে ভিন্নস্বাদের। ক্ষেত্রসমীক্ষায় এবং অবশ্যই মৌখিক ধারার (Oral Tradition) অনুবর্তনে সংগৃহীত সেইসব লোককথা একদা একটি বাংলা দৈনিক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের সুযোগও ঘটে। লালমাটির লোককথাগুলির শিরোনাম : ১) হাড়টুকরো গান গায়, শেষে হয়রানি, ২) সদাগর-বউ থেকে রানি, ৩) টুরি ব্যাঙের বিয়ে, ৪) দুইভাই, ৫) কাক ও ইঁচলিমাছ, ৬) রাজার বিচার, ৭) ভাগ্যের চাকা ইত্যাদি।

(তিন)
বাংলা-লোককথায় জাদু-বাস্তবতা

মর্ত্য থেকে স্বর্গ ও পাতাল— একথায় ত্রিভুবন-প্রসারী-কল্পনার সুদূর প্রসারিতা আপাতবিচারে অলীক, তবু লোককথায় আনে সত্যের বিভ্রম। সেইসঙ্গে গ্রামীণ লোকমানসে, বিশেষত শিশুকল্পনায় আনে বিশ্বাসযোগ্য স্বচ্ছতা। এই ধরনের চিত্তচমৎকারী অতিকল্পনায় (Fantasy) বেঙ্গমা-বেঙ্গমী কথা কয় মানুষের মতই, তারা যে-সব ভবিষ্যৎবাণী করে তা যথাযথ রূপ পায়। লোককথায় দৈত্যের পরাক্রম, রাক্ষস-রাক্ষসীর অমানুষিক শক্তির সঙ্গে জাদুবিদ্যার প্রয়োগ, সাধু-সন্ন্যাসী, পীর-ফকির কিংবা ডাকিনী-ডাইনির জাদুশক্তির অসাধ্যসাধন ক্ষমতায় সন্তানহীনা নারী সন্তানবতী যেমন হয়, তেমনই নয়নের মণি সন্তান বা প্রাণের প্রিয়জনদের হারায়। রাক্ষসী হয় সুন্দরী নারী, কিংবা অতিকায় প্রাণী। এ-সবই জাদু-বাস্তবতার (Magic Realism) আশ্চর্যরূপ হয়েও পরিবেশগত কারণে বাস্তবতার সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষা করে।

'বেঙ্গমা পাখির পালক' লোককথায় দেখা যায়— মানুষের মতই কথা-বলা-পাখি, অথচ তার পালকে থাকে অলৌকিক শক্তি। সেই পালকের জোরেই একান্নবর্তী পরিবারে অবহেলিত ছোট ভাই দেখায় কৃতিত্ব। তার (পালকের) অভাবেই মর্মান্তিক পরিণাম। নানাবিধ অবিচার ও ষড়যন্ত্রে বিপর্যস্ত মানুষ অলৌকিক শক্তির (জাদুশক্তি) জোরেই কিভাবে খ্যাতি-প্রতিষ্ঠা লাভ করে জীবনে, তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় 'সোনামানিক' কিংবা 'হাড়টুকরো গান গায় শেষে হয় রানি' লোককথায়।

হাড়-কাঁপানো পৌষ রাতের শীত। পৌষালি সন্ধ্যায়, বাংলায় গ্রামজীবনে, মূলত কৃষিভিত্তিক পরিবারে তৈরি হয় পৌষ-পিঠে। অতি-কল্পনায় (Fantasy) যেমন 'টাকারগাছ' হয়, তেমনই লোকায়ত জীবনের খাদ্য প্রিয়তায় হয় 'পিয়ে-গাছ'! 'রাখালের পিঠে গাছ ও রাক্ষসী' লোককথায় গ্রামীণ মানুষের কল্পনার সুদূরপ্রসারিতা, সেই সঙ্গে দেখা যায়— রাক্ষসীর (বা ডাইনির) অপক্ষমতা (witch craft) লোকবিশ্বাস। কৃষিসভ্যতার বড় উপকরণ ঢেঁকি এখানে যেমন এসেছে, তেমনই আদিম লোকবিশ্বাসসঞ্জাত ঝড়বৃষ্টি, শিলাবৃষ্টির মধ্যে জাদুক্ষমতার কথাও এসেছে। লোককথার চিরকালীন প্রিয় উপাদান বা চিত্রকল্প— 'প্রাণভোমরা'! এ-সবই জাদু-বাস্তবতায় (Magic Realism) প্রোজ্জ্বল।

গ্রামবাংলার লোকজীবনের চিরকালের ধূর্তপাখি কাক। তার নির্লজ্জ লোভ ও যাবতীয় শঠকৌশলেব শোচনীয় পরিণাম আবহমানকালের লোককথায় বিধৃত। তারই পাশাপাশি পুঁটিমাছ এবং ছোট চিংড়ি (কুচো চিংড়ি) অভাব সর্বস্ব লোকজীবনের প্রিয় খাদ্য। আমড়া দিয়ে চিংড়ি-টক (অম্বল রান্না) এখনও অনেকের জিভে বা স্মৃতিতে

আনে রসার্দ্রতা! এ-সব লৌকিক উপাদান বাংলার লোককথায় ফুটে উঠেছে 'কাক ও চিংড়িমাছ' বা 'কাক ও কাল্লারানি' লোককথায়। বাচনভঙ্গির সরল পরিবেশনে ছোট ছোট অসংখ্য গ্রামীণ লোকভাবনা ও চিত্রকল্পের স্বপ্নসাধ আনে জাদু-বাস্তবতার রহস্যঘন রসার্দ্রতা!

দজ্জাল শাশুড়ি, বধূ-নির্যাতন, অত্যাচার-পীড়িতা নববধূর গৃহত্যাগ, নারীর পুরুষবেশ ধারণ, বণিকের বাণিজ্যযাত্রা প্রভৃতি গ্রামবাংলার একদা অতিপরিচিত সমাজ চরিত্র। 'ভাগ্যচক্র' লোককথায় এইসব সামাজিক-উপকরণ দেখা যায়। 'রাজার অসুখ' (সুকুমার রায়ের 'রাজার অসুখ' গল্প থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের) লোককথায় আবহমান বাংলার গ্রাম জীবনের কল্পনার বিচিত্ররূপ, রোমাঞ্চ অলৌকিক ক্ষমতা বা জাদুশক্তির প্রকাশ ঘটেছে। 'জ্যান্তমড়া, সাতশ রাক্ষস, রাক্ষসীবুড়ি ও ইন্দ্রের অপ্সরী' লোককথায় স্বর্গমর্ত্যপাতালব্যাপী বিশাল প্রেক্ষিতে, রহস্যময় গা-ছমছমভাবে, জাদু-বাস্তবতার উপাদান বিস্তর। সবিশেষ উল্লেখ্য, লোকজীবনে 'অপ্সরা' কথাটির চেয়ে 'অপ্সরী'-র প্রয়োগ বেশি দেখা যায়।

জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ এ-সবই দৈবের হাত। এ হল চিরায়ত লোকবিশ্বাস। সেই বিধিলিপি বা অদৃষ্টবাদ কতখানি বহু নাটকীয় ঘটনায় রমণীয় হয়ে উঠতে পারে, তার সুন্দর দৃষ্টান্ত 'বিধিলিপি' লোককথাটি। পৌরাণিক বিশ্বাসপ্রসূত ক্ষীরসাগর এবং সেখানে সঞ্চরণশীল তিমিমাছ গ্রামীণ মানুষের বিশ্বাসযোগ্যতায় হয়েছে সুবিশাল শোল মাছ!

এই প্রবন্ধে উল্লিখিত ও আলোচিত লোককথাগুলি আমার নিরবচ্ছিন্ন ক্ষেত্রসমীক্ষার ফসল। এ-সব লোককথাগুলি 'লালমাটির লোককথা' শিরোনামে একদা একটি বাংলা-দৈনিক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত। সবিশেষ লক্ষণীয়, লালবিহারী দে সংকলিত 'Folktales of Bengal' থেকে সংকলিত লোককথাগুলিও স্বতন্ত্রভাব ও রূপে উজ্জ্বল। বলাবাহুল্য, একদা-কথিত মল্লভূম-বাঁকুড়া, মানভূম-পুরুলিয়ার বিস্তীর্ণ লোকজীবনে-প্রচলিত লোককথা সম্পর্কে লালবিহারী দে অবহিত ছিলেন না।

এতৎসত্ত্বেও বাংলা লোককথার যে-সব সাধারণ উপকরণ বা মালমশলা লালবিহারী দে, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার থেকে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, মুহম্মদ আয়ুব হোসেন প্রমুখ প্রথিত যশা ব্যক্তি সংগ্রহ করেছেন, যে-সব উপকরণ বা উপাদান মদীয় ক্ষেত্রসমীক্ষায় সংগৃহীত লোককথায় যথেষ্ট পরিমাণেই আছে।

(চার)
উপসংহার

গ্রামবাংলার লোকজীবনে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির প্রভাবে লোককথার ধারাটি এখন ক্রমশ ক্ষীণ। কারণ, গ্রামজীবনকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে শহুরে জীবন। গ্রামীণ মানুষের স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষা এখন প্রযুক্তিবিদ্যার (Information technology) সোনালি আঁচলে (নাকি ওড়নায়) ঢাকা একালের শিশুপাঠ্য ছড়ায় 'চাঁদের বুড়ি' চরকা কাটেনা, নীল আর্মস্ট্রং বিশাল বুট-পায়ে চাঁদের বুকে হাঁটে। অধিকাংশ শিশু বাংলা-ছড়া আবৃত্তি না করে, ইংরেজি-ছড়া শোনায়! তাতে সেইসব শিশুর মা-বাবার খুশি ও সম্মান নাকি বাড়ে!

বিপ্রতীপ ভাবনায়, শৈশব-স্মৃতি এখনও আমাদের মনে জাগে। সেইসময় রাতের বেলায়, একই বিছানায় বা কাছাকাছি বিছানায় শুয়ে মা কিংবা ঠাকুমা অথবা এইরকম আত্মীয়া, ছোট শিশুদের মুখে-মুখে শোনাতেন লোককথা। লালমাটির দেশ বাঁকুড়া-পুরুলিয়ার গ্রামাঞ্চলের মানুষ লোককথাকে এখনও বলেন— 'কইনি' বা 'রাত-কথা'। 'কইনি' শব্দটি 'কাহিনি' (Story) থেকে এসেছে। রাত্রিবেলার গল্পকথা অর্থে 'রাত-কথা'। একদা মা-ঠাকুমা কিংবা ওইরকম বয়স্কা মমতাময়ী নারী যখন মধুর অথচ নাটকীয় বাচনভঙ্গিতে আকর্ষণীয় 'কইনি' বলতেন, তখন টানটান আগ্রহ নিয়ে আনন্দের স্রোতে শিশুরা ভেসে যেত কল্পনা-রাজ্যে। বাস্তব-অবাস্তব, সম্ভব-অসম্ভবের সীমানা যেত মুছে।

গ্রামবাংলায়, মাটির ঘরের মাথায় ঘরের বা টিনের 'চাল' (আচ্ছাদন)। রাতের আঁধার। লম্ফ (কুপী) কিংবা বিষ্ণুপুরী লণ্ঠনের টিমটিম আলো। সেই ক্ষীণ আলোয় রাতের আঁধার আরও রহস্যময় হয়ে উঠত। মেটে দেয়ালে পড়ত ছায়া। গা-ছমছম, নিঝুম পরিবেশে 'কইনি'- শোনার অনেক অভিজ্ঞতা এখনও স্মৃতিতে মায়া জাগায়। 'কইনি' শোনার সময়, শিশুরা অবাক হয়ে মাঝে মাঝে 'হু' বলে। গল্প-বলিয়ে নারী সেই 'হু' (অর্থাৎ 'হ্যাঁ') মাঝে মাঝে শুনতে পেলে বোঝেন বাচ্চা ছেলে বা মেয়ে ঘুমিয়ে পড়েনি, জেগে শুনছে লোককথা। শিশু 'হুঁ-বলা বন্ধ করলেই 'কইনি'র কথিকা বুঝতে পারেন, ছেলে বা মেয়েটি ঘুমিয়ে পড়েছে! তখনই তিনি 'কইনি'-বলা থামিয়ে দিতেন। কিন্তু মজার বিষয়— 'কইনি' বলার নাটকীয় ঘটনার চমকে অধিকাংশ সময়ই শিশুরা জেগে থাকত। একই রাত্রে দু-তিনটি 'কইনি' সুদীর্ঘক্ষণ শোনার অভিজ্ঞতা আমারও আছে।

লোককথা ও বাঙালি নারী

তুলিকা মজুমদার

উনিশ শতকের নবজাগ্রত কলকাতায় তখন প্রাজ্ঞ মানুষের চিন্তার উত্তরণ ঘটেছে। পাশ্চাত্য ভাবাধারা-দর্শন-জীবনবোধ-স্বাদেশিক ভাবনা-রাজনীতি-সমাজনীতি সচেতনতা এক নব্য আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। এসব তথ্যভিত্তিক ইতিহাস। কিন্তু গ্রামীণ মানুষের মৌখিক সাহিত্যের ঐতিহ্যের যে উজ্জ্বল সব আঙ্গিক রয়েছে সেগুলি শিক্ষিত মানুষের উপেক্ষা ও অনেকাংশে তাচ্ছিল্যের শিকার হয়েছে। পত্র-পত্রিকা সাময়িকপত্রে কিছু কিছু আলোচনা হচ্ছে, সংগ্রহের গ্রন্থও প্রকাশিত হচ্ছে। তবু অনাকাঙ্ক্ষিত অবহেলা দূর হয়নি। এমন সময় একজন বিদগ্ধ মানুষ একটি রূপকথার সংকলন প্রকাশ করলেন এবং তার ভূমিকা লিখলেন রবীন্দ্রনাথ।

মুহূর্তের মধ্যে লোকসাহিত্য বিষয়ে সুধীজনের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে গেল। গ্রন্থটি দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের 'ঠাকুরমার ঝুলি'। ১৩১৪ বঙ্গাব্দে লিখিত রবীন্দ্রনাথের 'ঠাকুরমার ঝুলি প্রসঙ্গে' গ্রন্থটির সঙ্গে যখন যুক্ত হল তখন বাংলার লোককথা অন্য মাত্রা পেয়ে গেল।

সেই সঙ্গে লোককথার লালন পালনে বাঙালি নারীর অনন্য ভূমিকার কথাও রবীন্দ্রনাথের মাধ্যমেই প্রচারিত হল। শুরু হল গ্রামীণ লোকসাহিত্যের বিজয়যাত্রা ও লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রে বাঙালী নারী সমাজের ব্যাপ্ত প্রভাবের ইতিবৃত্ত। বাংলা লোককথার অঙ্গনে নারীর সেই অনন্য ভূমিকার সন্ধান দেওয়াই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

লোককথার বিভিন্ন বিভাগ রয়েছে। তার মধ্যে লোকপুরাণ, পশুকথা, নীতিকথা কিংবা কিংবদন্তি নারীর মুখে শোনা গেলেও অর্থাৎ নারী এসবের অনুশীলন করলেও দিদিমা-ঠাকুমা যে এসব সৃষ্টি করেছেন এমন কোনো তথ্য আমাদের হাতে নেই। কিন্তু রূপকথা ও ব্রতকথা সৃষ্টিতে নারীর স্রষ্টা হিসেবে ভূমিকার নির্দশন রয়েছে।

গ্রামীণ কৃষিজীবী সমাজে বেঁচে থাকতে হয় নানা প্রতিকূলতার মধ্যে। খরা-বন্যা-প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে গ্রামীণ জমিদার মহাজনের নিপীড়ন। মেয়েরা থাকে গৃহের অভ্যন্তরে, পারিবারিক বেষ্টনীতে। সাংসারিক দায়িত্ব ও সন্তান পালনে ব্যস্ত। বাইরে শস্য উৎপাদন, ফসল ফলানো কিংবা অর্থোপার্জন পুরুষের কাজ। এই বহিরঙ্গ জীবিকায় বাধা পড়লে, ফসল নষ্ট হলে কিংবা দিনের খাদ্য সংগৃহীত না হলে পুরুষ ক্ষুব্ধ হয়। অসহায়ত্ব বোধ করে। তার প্রতিক্রিয়া ঘটে সংসারে, বউয়ের ওপরে। এই তো জীবন। দারিদ্র্য, স্বামীর মুখঝামটা, রাগ, কখনও কখনও

দৈহিক অত্যাচার— সব মেনে নিতে হয় নারীকে। সামন্তসমাজে নারী তো প্রতিবাদ করতে শেখেনি। অথচ. স্ত্রী হিসেবে নারীরও স্বপ্ন থাকে। সে চায় স্বামীর ভালোবাসা। সে চায় সুন্দর স্বাস্থ্যবান শিশু, সে চায় সংসারের সচ্ছলতা, আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে। কিন্তু নির্মম সংসারে একান্নবর্তী পরিবারে শাশুড়ি-ননদের অত্যাচারে, সতীনের জ্বালায়, স্বামীর নিষ্ঠুরতায় তার স্বপ্ন খানখান হয়ে যায়। তবু নারী স্বপ্ন দেখে এবং সেই স্বপ্নকে সে জাগ্রত করে রাখে কিছু রূপকথার মধ্যে। রূপকথার বিষয় বিশ্লেষণ করলে আমরা জানতে পারব,—এগুলি নিঃসন্দেহে বঞ্চিত কিন্তু স্বপ্নময়ী নারীর সৃষ্টি। এখানে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হবে।

রবীন্দ্রনাথ লোকসমাজের প্রাণভোমরা উপলব্ধি করে রূপকথায় নারীর অনন্য ভূমিকাকে স্মরণ করে 'ঠাকুরমার ঝুলি'র ভূমিকায় নির্ভুলভাবে বলেছেন, "এই যে আমাদের দেশের রূপকথা বহু যুগের বাঙালী বালকের চিত্তক্ষেত্রের উপর দিয়া অশ্রান্ত বহিয়া কত বিপ্লব, কত রাজ্য পরিবর্তনের মাঝখান দিয়া অক্ষুণ্ণ চলিয়া আসিয়াছে, ইহার উৎস সমস্ত বাংলাদেশের মাতৃস্নেহের মধ্যে। যে স্নেহ দেশের রাজ্যেশ্বর রাজা হইতে দীনতম কৃষককে পর্যন্ত বুকে করিয়া মানুষ করিয়াছে, সকলকেই শুক্ল সন্ধ্যায় আকাশে চাঁদ দেখাইয়া ভুলাইয়াছে এবং গানে শান্ত করিয়াছে, নিখিল বঙ্গদেশের সেই চির পুরাতন গভীরতম স্নেহ হইতে এই রূপকথা উৎসারিত।"[১] গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ ও আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল বলেই তিনি এই ধরনের উক্তি করতে পেরেছিলেন। উনিশ শতকের একান্নবর্তী পরিবারে মানুষ হওয়ার সুবাদে এবং শিলাইদহ সাজাদপুর পতিসরে গ্রামীণ মানুষের সঙ্গে অন্তরঙ্গতার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় রবীন্দ্রনাথের এই উপলব্ধি ঘটেছিল। এই শাশ্বত অনুভব যে কত সত্য তা আমরা বাংলা রূপকথার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে অনুভব করতে পারব।

কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি.

১. এক রাজার ছয় রানি। কিন্তু কোনো ছেলেপুলে নেই। রাজা আবার বিয়ে করলেন। ঘুঁটে কুড়ুনির সুন্দরী মেয়ে হল রাজরানি। রাজা বিয়ের পর ছয় মাসের জন্য রাজ্য পরিদর্শনে গেলেন। সোনার ঘণ্টা ঝুলিয়ে গেলেন। ছেলে হলে বাজাবে। বড় ছয় রানির ভুল বোঝানোতে ছোটরানি অকারণে ঘণ্টা বাজালেন। আরও একবার। রাজা মিছিমিছি দুবার এসে ফিরে গেলেন। যখন সত্যি ছেলে হওয়ার ঘণ্টা বাজানো হল, রাজা এলেন না। বড়রানি ধাইমাকে বললেন. ছেলে হলে যেন মেরে ফেলা হয়। ছোটরানির যমজ ছেলে-মেয়ে হল। ছেলের কপালে চাঁদ, দু হাতের তালুতে তারা। ধাইমা ছেলে-মেয়েকে লুকিয়ে কুকুর ছানা দেখাল। তারা বড় হল, অন্যসব বিপদ কেটে গেল। রাজার সঙ্গে মিলন হল ছোটরানির। ছয় রানিকে মাটিতে পুঁতে দেওয়া হল। (দ্য বয় উইথ দ্য মুন অন হিস ফোরহেড)।[২]

একান্নবর্তী পরিবারে স্বামীর একাধিক স্ত্রী থাকায় সতীনের যে অত্যাচার তা নারী

ছাড়া আর কেউ উপলব্ধি করতে পারে না। এই রূপকথায় সতীনের প্রতি যে মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে তা আবহমানকালের বাঙালি স্ত্রীর মানসিকতাকেই তুলে ধরেছে। এই গল্পটি সংগৃহীত হয়েছিল একজন বাঙালি খ্রিষ্টান বৃদ্ধার কাছ থেকে।

২. "অমনি রাজপুরীর যত ঢাকঢোল বাজিয়া উঠিল। কলাবতী রাজকন্যা, নূতন-জলে স্নান, নূতন-কাপড়ে পরণ, ব্রতের, ধান-দূর্বা মাথায় গুঁজিয়া, দুই রানিকে বরণ করিয়া আনিতে আপনি গেলেন।

শুনিয়া পাঁচ রানি ঘরে গিয়া খিল দিলেন। পাঁচ রাজপুত্র ঘরে গিয়া কবাট দিলেন। লক্ষ সিপাই লইয়া, ঢোল-ডগর বাজাইয়া ন-রানি ছোট রানিকে নিয়া কলাবতী রাজকন্যা রাজপুরীতে ফিরিয়া আসিলেন। বুদ্ধু ভূতুম আসিয়া রাজাকে প্রণাম করিল।

পরদিন মহা ধূমধামে মেঘ-বরণ চুল কুঁচ-বরণ কলাবতী রাজকন্যার সঙ্গে বুদ্ধুর বিবাহ হইল। আর-এক দেশের রাজকন্যা হীরাবতীর সঙ্গে ভূতুমের বিবাহ হইল।" (কলাবতী রাজকন্যা)[৩]

৩. "ঘাম দিয়া সকলের জ্বর ছাড়িল। রাজা বলিলেন— 'ধন্য তুমি কোথাকার রাজপুত্র? যত ধন চাও ভাণ্ডার খুলিয়া নিয়া যাও।'

রাজপুত্র বলিলেন— 'আমি কিছুই চাই না, এতদিনে রাক্ষসীর হাত হইতে সকলে বাঁচিলাম, এখন আমরা দেশে যাইব।'

রাজা শুনিলেন না, ভাণ্ডার খুলিয়া সকল ধনরত্ন বাহির করিয়া দিলেন।

রাজকন্যাকে লইয়া রাজপুত্র, রাজপুত্রের তিনবন্ধু দেশে গেলেন।

দেশে গিয়া রাজপুত্রেরা বাপ-মায়ের আদরে, সুখে দিন গণিতে লাগিলেন।" (সোনার কাঠি রূপার কাঠি)[৪]

ওপরে উদ্ধৃত ২ ও ৪ এই দুটি রূপকথার মধ্যে নারীর জীবনে না-মেটা স্বপ্নের কথা আছে। বাস্তব জীবনের হাত থেকে নারী বাঁচতে চেয়েছে তার স্বপ্নের জগৎ গড়ে নিয়ে। সে জগৎ রূপকথার জগৎ, যার অধিকাংশের স্রষ্টা ঠাকুমা-দিদিমা। এইসব রূপকথায় উইশফুল থিংকিং বা ইচ্ছাপূরণের তাগিদই প্রকাশ পেয়েছে। চিরন্তন বাঙ্গালি বধূদের আর্ত নিঃশব্দ কান্না কল্পনার ডানা মেলে এইসব রূপকথাকে অনন্য অভিব্যক্তিতে মূর্ত করে রেখেছে।

একটি ক্ষেত্রে নারীর একাধিপত্য বিস্ময়কর। সামন্ত-সমাজের দৃঢ় বন্ধনের মধ্যে নারী প্রায় সর্বক্ষেত্রে অবহেলিত, তার ব্যক্তিত্ববিকাশের সমস্ত পথ রুদ্ধ করেছে পুরুষশাসিত বাঙালিসমাজ। কিন্তু ব্রত-পার্বণ উদ্‌যাপন ও আচারকে নিয়ে ব্রতকথার সমৃদ্ধ অঙ্গন নারীই সৃষ্টি করেছে, লালন করেছে,— সেখানে পুরুষের প্রবেশ শুধু নিষিদ্ধ নয়, পুরুষের কোনো আধিপত্যই নারী স্বীকার করেনি। কী করে এই অসম্ভব সম্ভব হল তার সমাজ বিজ্ঞান নির্ভর কোনো উত্তর আমাদের জানা নেই। কিন্তু বাস্তব অবস্থান আমাদের জানিয়েছে ব্রত ও ব্রতকথায় নারীর একক ভূমিকার কথা।

আমরা জানি পুরুষ কিছু ব্রত পালন করে, নারী পুরুষ যৌথভাবে কিছু ব্রত পালন করে। পুরুষ যেসব ব্রত পালন করে তার মধ্যে শিবচতুর্দশী, হরিষমঙ্গলচণ্ডী, চণ্ডী, কর্মপুরুষ, কল্কিনারায়ণ, জন্মাষ্ঠমী প্রভৃতি। সংখ্যায় খুব কম। শুধু তাই নয়, এইসব ব্রতকে কেন্দ্র করে যেসব ব্রতকথা আছে সেগুলির সাহিত্যিক মূল্যও নগণ্য, লোককথার আবেদনও হৃদয়গ্রাহী নয়। অন্যপক্ষে মেয়েদের নিজস্ব ব্রতের কথা এক অসাধারণ মর্মস্পর্শী সৃষ্টি।

মেয়েদের ব্রতকথার মূল উদ্দেশ্য, আমার সন্তান-স্বামীর ভালো হোক, প্রতিবেশীর ভালো হোক, পরিবারের সকলের ভালো হোক, গাঁয়ের মঙ্গল হোক, গাঁয়ের লোক নীরোগ জীবনযাপন করুক, রোগ-ব্যাধি-মহামারী যেন আমাদের সর্বনাশ করতে না পারে, দেবদেবীদের আশীর্বাদ ঝরে পড়ুক সবার ওপরে—সবার ওপরে 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে'। কী নির্মল সহজ মানবিক কামনা ও আকাঙ্ক্ষা। নারীহৃদয়ের উদারতা, স্নেহ, প্রেম, ভালোবাসা, উদ্বেগ, ভীতি, যন্ত্রণা ব্রতকথার মধ্যে উৎসারিত হয়েছে।

বছরের বারো মাসেই নারী ব্রত পালন করে। সংখ্যা অনেক। নারীর ব্রতপালনের শ্রেণি বিভাগে পাই— কুমারীব্রত, সধবাব্রত, বিধবাব্রত এবং কুমারী-সধবা-বিধবার যৌথ ব্রত। হিন্দু সমাজে বিধবার অবস্থান যে কী দুর্বিষহ তা আমরা সকলেই জানি। কোনো শুভকাজে বিধবার কোনো ভূমিকা নেই, বিশেষ করে বিবাহের সময় বিধবার উপস্থিতিও অমঙ্গলকর। এই করুণ সামাজিক বিধানের মধ্যে ব্রত-পার্বণে বিধবার সদম্ভ উপস্থিতি আমাদের বিস্মিত করে। এই ক্ষেত্রেও আমাদের কাছে সমাজবিজ্ঞাননির্ভর কোনো সদুত্তর নেই।

বাঙালির 'বারো মাসে তেরো পার্বণ' কথাটির মধ্যে 'বারো মাসের' কথা সঠিক, কেন না বারোমাসের অধিক তো আর সময়সীমা থাকে না। কিন্তু তেরো পার্বণ শব্দ দুটিকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করা হয়নি। এখানে তেরো মানে অনেক, অসংখ্য। ব্রত-পার্বণের ক্ষেত্রে আমরা তেরোর এই অর্থই দেখে থাকি।

মেয়েদের সব ব্রতেই যে ব্রতকথা রয়েছে এমন নয়। কিংবা হয়তো একসময় ছিল, কালপ্রভাবে সেগুলো হারিয়ে গিয়েছে। আবার যেসব ব্রত লিপিবদ্ধ হয়েছে, তার বাইরেও বিভিন্ন জেলায় কত শত ব্রত যে পালিত হত তা আমাদের অজানা। যেসব ব্রত-পার্বণ লিপিবদ্ধ হয়েছে তাতেই নারীর সৃষ্টিশীলতায় আমাদের বিস্মিত হতে হয়।

ব্রত-পার্বণ নারীরা উদ্‌যাপন করলেও ব্রতকথার সন্ধান সব ব্রতে পাওয়া যায় না। নারীর পালিত ব্রতের মধ্যে সবচেয়ে আদরণীয় ব্রত হল ষষ্ঠীব্রত। ষষ্ঠীব্রতের কামনা হল, —নারীকে সুপুত্রবতী করো, সন্তানদের নীরোগ করো ও দীর্ঘ আয়ু দান করো। সমাজে বন্ধ্যা নারীর যে মর্মন্তুদ অভিজ্ঞতা তা নারী বোঝে বলেই ষষ্ঠীর এত সংখ্যাধিক্য। আমরা তেরোটি ষষ্ঠীর সন্ধান পাচ্ছি : অরণ্য, চন্দন, কর্দম, লোটন,

পাটাই, দুর্গাবোধন, মন্থন, মুলা, শীতল, অন্নরূপা, অশোক, গো-রূপিনী ও স্কন্ধ ষষ্ঠী।

শুভ কাজে বন্ধ্যানারীর উপস্থিতি বিধবার মতোই অমঙ্গলকর। 'বাঁজা' নারীর কাছে ভিখারিও ভিক্ষা নিত না। এসব সামাজিক অবিচারের জন্যই নারীর সন্তান কামনায় ষষ্ঠীর এত প্রভাব।

১৩০৩ বঙ্গাব্দে কার্সিয়াং অবস্থানকালে অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'মেয়েলি ব্রত' গ্রন্থের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ ব্রতের কথার অনন্যতা বিষয়ে মন্তব্য করেছেন যা ব্রতকথার মর্মবস্তু উদ্‌ঘাটনে অবিস্মরণীয় হয়ে রয়েছে। "যে সকল কথা ও গাথা সমাজের অন্তঃপুরের মধ্যে চিরকাল স্থান পাইয়া আসিয়াছে তাহারা দর্শন, বিজ্ঞান ও ইতিহাসের মূল্যবান উপকরণ না হইয়া যায় না— যাহারা স্বদেশকে অন্তরের সহিত ভালোবাসে তাহারা স্বদেশের সহিত সর্বতোভাবে অন্তরঙ্গরূপে পরিচিত হইতে চাহে এবং ছড়া রূপকথা ব্রতকথা প্রভৃতি ব্যতিরেকে সেই পরিচয় কখনো সম্পূর্ণতা লাভ করে না।'

"সাধনায় যখন আমি এগুলি সংগ্রহ ও প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম তখন আমার কোনপ্রকার মহৎ উদ্দেশ্য ছিল না। সমাজের সুধাভাণ্ডার যে অন্তঃপুর, তাহারই প্রতি স্বাভাবিক মমত্ববশত আকৃষ্ট হইয়া মাতা মাতামহী আমাদের স্ত্রীকন্যা সহোদরাদের কোমল হৃদয়পালিত মধুর কণ্ঠলালিত চিরন্তন কথাগুলিকে স্থায়ীভাবে একত্র করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম।"[৫]

রবীন্দ্রনাথের এই সংক্ষিপ্ত মন্তব্যের মধ্যেই ব্রতকথার উজ্জ্বল দিকটি প্রতিভাত হয়েছে।

এই গ্রন্থের প্রস্তাবনায় অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, "মেয়েলি ব্রতের কথাগুলি মেয়েলি ভাষায় মেয়েলি ছড়াতে মেয়েলি ভঙ্গীতে রচিত। ইহার শ্রোতা বক্তা সমস্তই স্ত্রীলোক। কোন প্রবীণা রমণী এই ছড়া ও কথাগুলি আনন্দ ও উচ্ছ্বাসের সঙ্গে যখন বর্ণনা করেন, শ্রোতৃমণ্ডলী শ্রদ্ধাপূর্ণ চিত্তে তাহা শ্রবণ করিয়া থাকেন। ইহাতে কথাগুলি তাঁহাদের হৃদয়ক্ষেত্রে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়া যায়। এই সমস্ত ব্রতোপাখ্যান হইতে আমাদের রমণীগণ স্বামীভক্তি, দেবভক্তি, ভ্রাতা-ভগিনীর প্রতি স্নেহ-মমতা, ইন্দ্রের-সংযম, ধৈর্য্য, তিতিক্ষা প্রভৃতি বিবিধরূপ শিক্ষালাভ করিয়া থাকেন।"[৬]

ব্রতকথা বলবার সময় যে কামনা জানানো হয় তা একান্তভাবেই নারীর, পুরুষের নয়। আবার পুরুষব্রতের যে কামনা তা নারীর কামনা নয়। এভাবে নারীর সৃষ্টি কোনটি তা জানা যায়। দু-একটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে:

পাকা পাতাটি মাথায় দিলে
পাকা চুলে সিন্দুর পরে।
কমল পুত্র কোলে পায়। কচি পাতাটি মাথায় দিলে

কিংবা

আমার ভাই বাপ লক্ষেশ্বর

লক্ষ লক্ষ দিয়ে গেল বর
ধনে পুত্রে বাড়ুক ঘর।

কিংবা

পুণ্যিপুকুর পুষ্পমালা।
কে পোজেরে দুপর বেলা।।
আমি সতী লীলাবতী।
সাতভায়ের বোন ভাগ্যবতী।।
স্বামীর কোলে পুত্র দোলে।
মরণ হয় যেন একগলা গঙ্গাজলে।।

ব্রতের আচার-অনুষ্ঠানের পরে নারীসমাজ যে ব্রতকথা বলে তার মধ্যেই নারীর কামনা-বাসনার স্বরূপ প্রকাশিত হয়। আজকের বাঙালি সংস্কৃতি বলয়ে অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ ও স্বাধীন সার্বভৌম গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের হিন্দুসমাজ আগের অবস্থানে নেই। কিন্তু সামাজিক ইতিহাসের তথ্যাদি সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণে ব্রতকথাগুলি বাঙালি মানসিকতার অসাধারণ ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

নারীসমাজ মৃত্যুর পরে স্বর্গের দুয়ারের সন্ধান করেছে, 'অন্তে গঙ্গা জল' চেয়েছে। এই পারামর্থিক কামনা ছাড়া তার সব কামনা জাগতিক, বস্তুগত, পারিবারিক-সামাজিক আশাকে কেন্দ্র করে। আর যেহেতু এই সব ব্রতকথার স্রষ্টা নারী, তাই কোনোরকম গোপনীয়তা অবলম্বন না করে প্রকাশ্যে নারীসমাজের সামনে তার মনোবাসনা প্রকাশ করেছে। কোনো দ্বিধা নয়, কুণ্ঠা নয়, পুরুষের উপস্থিতিতে যেখানে নারী তার মনের ভাব প্রকাশ করতে সংকুচিত থাকে এখানে তার কোনো আগল সে রাখেনি। ইষ্ট লাভই ব্রতকথার মূল কথা।

একজন প্রাজ্ঞ মানুষ ব্রতকথার মর্মকথাকে অতি সুন্দরভাবে উদ্‌ঘাটিত করেছেন, "ব্রতের কথাগুলি অতীতযুগে দেশের সুখ-সমৃদ্ধির অলিখিত ইতিহাস। প্রাচীন ধর্মচিত্রের সহিত সমাজ ও পরিবার চিত্র একত্র সন্নিবিষ্ট হইয়া এক অভিনব সৌন্দর্যের সৃষ্টি করিয়াছে। এই অনাবিল সৌন্দর্যের ছবি মাতৃভক্তিতে স্বর্গীয় এবং বঙ্গ-গৃহশ্রী-বধূগণের লক্ষ্মীভাবে কোমল। কথার ভাষা আদিম। ইহাতে ব্যাকরণের শাসন প্রবেশ করে নাই, এবং অলঙ্কারের কৃত্রিম শোভায় ইহার অবয়ব অলঙ্কৃত হয় নাই।" [৭]

ব্যাকরণের শাসন ও অলঙ্কারের কৃত্রিম শোভা থাকবে কেমন করে? নারীর তো সাক্ষর হবার কোনো 'অধিকার' ছিল না। আর প্রায়ান্ধকার পল্লীসমাজে নারী পুত্র কামনা, স্বামী কামনা, সধবা থাকবার কামনা, সতীনহীন ঘরের কামনা ও স্বর্গ কামনা ছাড়া আর কীইবা কামনা করতে পারে।

ব্রতকথা ছাড়াও পশুকথা, নীতিকথা, কিংবদন্তি, লোকপুরাণ প্রভৃতি লোককথার অনুশীলন করেছে নারী। কিন্তু এসবের স্রষ্টা হিসেবে নারীর সন্ধান আমরা পাই না।

নারী নীতিকথা সৃষ্টি করেনি, নারী পশুকথা বিশেষ করে বিড়াল-গোরু-ছাগল-হাঁস-চড়াই-টুনটুনি-কাক- পিঁপড়ে-মাকড়শা প্রভৃতি প্রতিদিনের প্রতি মুহূর্তে দেখা পশু-পাখিকে নিয়ে পশুকথা সৃষ্টি করেনি তা হতেই পারে না। কিন্তু সৃষ্টির তথ্য পাওয়া যায়নি। লোকপুরাণ-কিংবদন্তি সম্পর্কেও একই কথা বলা চলে।

তথ্যসূত্র

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ঠাকুরমার ঝুলি। ২০ ভাদ্র ১৩১৩ বঙ্গাব্দ, রবীন্দ্ররচনাবলী, পঞ্চদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ফেব্রুয়ারি ২০০০, পৃষ্ঠা ৮৩৯।

২. Lalbehari Dey : Folktales of Bengal. Macmillan, London, 1910, Pages 236-256 ।

৩. দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার : রচনাসমগ্র। প্রথমখণ্ড, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা ১৩৮৬, পৃষ্ঠা ৩-২২

৪. প্রাগুক্ত। পৃষ্ঠা ১০৩-১০৪।

৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর . ভূমিকা। মেয়েলি ব্রতকথা : অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়। প্যাপিরাস, গণেন্দ্র মিত্র লেন, কলকাতা, নতুন সংস্করণ : সম্পাদনা— লেখা চট্টোপাধ্যায়, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা ১১-১২

৬. অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় : মেয়েলি ব্রতকথা। পৃষ্ঠা ১৩।

৭। গুরুবন্ধু ভট্টাচার্য। প্রতিভা পত্রিকা। প্রথম বর্ষ, দশম সংখ্যা, মাঘ, ১৩১৮ বঙ্গাব্দ। পৃষ্ঠা ৫২৬।

একটি প্রাচীন লোককথা ও জাদু-বাস্তবতা

দিব্যজ্যোতি মজুমদার

মানব সমাজ বিবর্তনের পথে বেশ কিছুটা অগ্রসর হওয়ার পরে যখন গ্রাম-সংগঠন সুষ্ঠু রূপ পেল এবং কৃষির উদ্ভাবনের পরবর্তী পর্যায়ে গৃহপালিত পশুর সাহায্যে উন্নত যন্ত্রপাতি প্রয়োগে অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ হল তখনই জাদু ভাবনার সূত্রপাত। পরবর্তী কালের জাদু-ভাবনার সঙ্গে এর কোন সাদৃশ্য নেই।

যে প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে লোকসমাজ একান্ত সম্পৃক্ত হয়ে বসবাস করছে, সেই পরিবেশে এমন সব প্রাকৃতিক ঘটনা বিপর্যয়-ভয়াবহতা ঘটে যাচ্ছে যার কোনও উত্তর যৌথ মানুষের জানা ছিল না। এইসব বিপর্যয়ের কয়েকটি সাময়িক ক্ষতি করলেও স্থায়ী কিছু উপকারও করে। প্রবল বৃষ্টিতে বন্যা হলে ক্ষতি হয়, জীবনহানি ঘটে। কিন্তু কিছুদিন পরে দেখা যায়, ফসলের জমিতে কেমন নরম মাটি ছড়িয়ে রয়েছে। একই পরিশ্রম, কিন্তু ফসল অনেক বেশি হল।

কেন এগুলো হয়? সেই কেনর সন্ধান করতে জাদুর উদ্ভব। এই সমাজে জাদু ছিল প্রাথমিক বিজ্ঞান, জ্যোতিষবিদ্যা যাকে আদিম জ্যোতির্বিদ্যা বলা যেতে পারে, আর এই জাদু ছিল 'alchemy with primitive chemistry'.

সেই সমাজে জাদুর প্রথম প্রয়োগ করা হয় উর্বরতার আকাঙ্ক্ষায়। আমাদের গোষ্ঠীর জমিতে প্রচুর ফসল হোক, আমাদের গৃহপালিত পশুর অনেক বাচ্চা হোক, আমাদের বউদের অনেক সন্তান হোক। সেই কারণে সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানীরা বলেন, magic developed from the thought processes of primitive man by means of association of ideas, becoming organised into an elaborate and systemetic pseudoscience. সেই প্রাথমিক পর্যায়ে নেতিবাচক বা negative চিন্তা ছিল না। সবই ছিল ইতিবাচক বা positive. এই জাদু-বিশ্বাস ও জাদু-প্রক্রিয়া ছিল সমাজ বাস্তবতার অঙ্গ, বরং বলা ভালো জীবনচর্যার অঙ্গীভূত।

কিন্তু জীবনচর্যার এই অতি-স্বাভাবিক জাদু-বাস্তবতা ধ্বংস করলেন সুচতুর পুরোহিত সম্প্রদায়। এরা ভালোভাবে বিলাসে থাকতে চান, কিন্তু আগাগোড়া পরিশ্রমবিমুখ। আর পরগাছা মানুষ সবসময় ফন্দি-ফিকির খোঁজে। জাদু এদের হাতে পড়ে হয়ে গেল ভেল্‌কি, পুরোহিতের অলৌকিক শক্তি প্রদর্শনের মাধ্যম। আদিম জাদু-বাস্তবতা অবলুপ্ত হল।

পরবর্তী কালে ভারতবর্ষীয়-চৈনিক-আক্কাদীয়-মিশরীয়-ব্যাবিলোনীয়-

মোসোপটেমীয় সভ্যতায় রাজন্যবর্গের আনুকূল্যে পুরোহিত সম্প্রদায় ইতিবাচক সামাজিক জাদু-প্রক্রিয়াকে বিকৃত করে সমাজ-ভাবনায় পরিবর্তন ঘটালেন। সুস্থ মানসিকতার অবসান ঘটল।

প্রাচীন গোষ্ঠীসমাজের জাদু-ভাবনার সঙ্গে তাই পরবর্তীকালের উইচক্র্যাফ্‌ট, অকালটিজ্‌ম, ব্ল্যাক ম্যাজিক, ভুডু পুতুল, জোম্বি মানুষ, উল্‌ফি, উইচদের ধর্ম উইকা, শয়তানের কাজকর্ম, ওয়াইল্ড উইকার ছবি-ভাস্কর্য, কালো রঙের ধারাল ছুরি, জাদুদণ্ড, ধূপ-ধুনো, জল ও ওয়াইনের পাত্র, ঝাঁটা, ঘণ্টা প্রভৃতির কোন সম্পর্ক নেই। এ সবই আরোপিত বিশ্বাস, জাদু-বাস্তবতায় কোথাও আরোপিত কিছু নেই।

এমন কি বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ল্যাটিন আমেরিকার কিছু দেশে যে স্পেনীয় কথাসাহিত্য ও কবিতায় জাদু- বাস্তবতার কথা আমরা পড়ি, সেসব অনন্য সাহিত্য-সৃষ্টি, কিন্তু সেসবও শিক্ষিতজনের বিশ্বাস সঞ্জাত জাদু-বাস্তবতা। গোষ্ঠীমানুষের মনের হদিস সেখানে পাওয়া যাবে না। এমন কী আজকের ল্যাটিন আমেরিকার দারিদ্র্যপীড়িত শ্রমজীবী কৃষক শ্রমিকের ভাবনার ও জীবনচর্যার সঙ্গেও তার কোনও সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যাবে না। আরোপিত দর্শন গোষ্ঠীসমাজের মানসিকতাকে উন্মোচিত করতে পারে না। বার্গম্যানের সব চলচ্চিত্রেই জাদু-বাস্তবতার প্রয়োগ রয়েছে। অনন্য প্রকাশ- ভঙ্গিমা। কিন্তু তবু বলতে হয়, সেগুলো লোকসমাজের সেইকালের জাদু-বাস্তবতার সঙ্গে সম্পর্কহীন।

বিমূর্ত আলোচনার পরে একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি যেখানে জাদু-বাস্তবতার স্বরূপ জানা যাবে। একটি মিথকথায় রয়েছে জীবনচর্যার সঙ্গে সেই জাদু বাস্তবতার অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক।

'দুই ভাইয়ের গল্প',— একটি মিথকথা। ১২৫০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে সম্রাট দ্বিতীয় সেতি-র আমলে এটি লিপিবদ্ধ হয়। আন্‌নানা নামে একজন লিপিকরের এই মিথকথা প্যাপিরাসের ওপরে হিয়েরোগ্রিফিক চিত্রলিপিতে লিখিত। এই মিথকথাটি প্রাচীন মিশরের প্রথম সম্পূর্ণ আকারে পাওয়া গিয়েছে। ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে এই মিথকথা প্রথম আধুনিক বিশ্বে ইংরেজি ভাষায় অনূদিত হয়ে প্রকাশ পায়। জাদু-বাস্তবতা কীভাবে সেই সমাজে সমাজ বাস্তবতা হিসেবে প্রকাশিত হত তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এই মিথকথা।

এক যে ছিল বাবা-মা। তাদের দুই ছেলে। বড় ভাইয়ের নাম আনুপ, ছোট ভাইয়ের নাম বাটু। বড় ভাইয়ের বউ ছিল। ছোট ভাই ছিল সন্তানের মতো। ফসলের জমিতে একসঙ্গে দুজনে কাজ করত।

একদিন দুজনে কাজ করছে। আজ বীজ ছড়াতে হবে। কিন্তু বীজ আনা হয়নি। দাদা ভাইকে বীজ আনতে বাড়ি যেতে বলল। ঝুড়িতে বীজ নিয়ে ঘরের বাইরে আসার সময়ে বড় ভাইয়ের বউ কুপ্রস্তাব দিল। ভাই অবাক হয়ে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি মাঠের দিকে রওনা দিল।

আঁধার ঘরে বউ একা বসে রয়েছে। আলোও জ্বালে নি।

কী হয়েছে তোমার? কেউ কিছু বলেছে?

বউ ভাইয়ের বিরুদ্ধে আজেবাজে কথা বলল। দাদা বিশ্বাস করল। এত বড় আস্পর্ধা। ভাইকে মেরেই ফেলবে। ছুরি হাতে গোয়ালের পাশে অন্ধকারে লুকিয়ে রইল।

সূর্য ডুবে গিয়েছে। গোরুগুলোকে নিয়ে ছোট ভাই গোয়ালের দিকে যাচ্ছে। একটা বাছুর তাকে বলল, দাদা ছুরি নিয়ে লুকিয়ে রয়েছে, সাবধান! কাছে যেয়ো না। ভাই দরজার ফাঁক দিয়ে ছুরি হাতে দাদাকে দেখতে পেল। ভাই দৌড় দিল, পেছনে বড় ভাই। ভাই অন্ধকারের মধ্যে সূর্যদেবতাকে স্মরণ করল, তাঁকে সব বলল,— সব অভিযোগ মিথ্যে, দয়ালু দেবতা, আমাকে রক্ষা করো। সূর্যদেবতা মনে মনে বললেন, যে মানুষ পবিত্র, তার কোন বিপদ হবে না।

হঠাৎ দুই ভাইয়ের মাঝখান দিয়ে একটা নদী বয়ে গেল। নদীর মধ্যে অনেক কুমির। দুপারে দাঁড়িয়ে দুজন।

ভাই বলল, দাদা, তোমার কাছে আমি কোনদিন খারাপ কিছু করিনি। কোন অন্যায় করিনি। কেন আমাকে মারতে গেলে কিছুই বুঝতে পারছি না। তোমরা দুজনে আমার বাবা-মায়ের মতো। কিন্তু তোমার বউ খারাপ প্রস্তাব দিয়েছিল। আমি আর কোনদিন তোমার বাড়িতে ফিরব না। আমি দূরে পাহাড়ে-বনে চলে যাব।

দাদা কাঁদতে লাগল। হায়! এ কী করল সে? ঘরে এসে এক আঘাতে বউকে মেরে ফেলল।

এদিকে ছোট ভাই পাহাড়ি বনে একা একা থাকে। সে দেবদারু গাছের উঁচু ডালে একটা ফুলের মধ্যে তার হৃদয়কে লুকিয়ে রাখল। সেই গাছের নীচে ডালপালা দিয়ে ঘর তৈরি করে থাকতে লাগল।

একদিন ছোট ভাই ঘরের বাইরে এসেই নয় জন দেবতাকে দেখতে পেল। দেবতারা বললেন, বড় ভাইয়ের বউয়ের জন্য তুমি কেন ঘরবাড়ি - জমি ছেড়ে এখানে পড়ে রয়েছ? দেশে ফিরে যাও।

হঠাৎ সূর্যদেবতা বললেন, ছোটভাইকে একটা মেয়ে দাও। সে তার বউ হবে। দেবতা মেয়ে দিলেন, সে হল বউ। হঠাৎ আর এক দেবতা ভবিষ্যৎ-বাণী করলেন, এই রূপবতীর পরিণতি শুভ নয়। তার মৃত্যু হবে বীভৎসভাবে।

পাতায় ছাওয়া ঘরে থাকে দুজন। বউকে দূরে কোথাও যেতে দিত না। বলত, আমার হৃদয় রয়েছে গাছের ডালের ফুলের মধ্যে, বিপদ এলে তোমায় বাঁচাতে পারব না। একদিন হৃদয় এনে বউকে দেখাল। বউ অবাক হল।

একদিন বউ পাশের ঘন বনে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ সাগর ধেয়ে এল। সে বউকে খুব ভালোবাসত। বউ ছুটে ঘরে ঢুকে গেল।

বউয়ের চুল একদিন নদীতে পড়ল। সে চান করছিল। ভাসতে ভাসতে সেই চুলের গুচ্ছ ফারাও-এর প্রাসাদের নীচে আটকে গেল। অপূর্ব সুগন্ধি সেই চুলে। ফারাও ঠিক করল, এই মেয়েকে বিয়ে করতে হবে।

অনেকবার অভিযান চালিয়েছিল। শেষবারে দলে ছিল এক নারী। সে খুঁজে পেল বউকে। তার হাত ধরে বউ এল, হল ফারাও-এর আদরের বউ।

ফারাওকে একদিন বউ আগের স্বামীর হৃদয়ের কথা বলে দিল। বলল, গাছ কেটে ফেললে সে মরে যাবে। গাছ কেটে ফেলল সৈন্যরা, ছোট ভাই তক্ষুণি মরে গেল।

এদিকে বড় ভাইও ছোট ভাইয়ের খোঁজে বেরিয়ে পড়ল। জলের একটা পাত্র নিয়ে কিছু খাবার নিয়ে রওনা দিল। খুঁজে পেল ভাইদের ঘর। দেখল, ভাই ঘরের মধ্যে শুয়ে রয়েছে। নিথর দেহ। হৃদয় খুঁজছে বড় ভাই, তিন বছর ধরে খুঁজছে, কিন্তু পেল না। ঠিক করল, কাল সকালে ফিরে যাবে। হৃদয় আর পাওয়া যাবে না। হঠাৎ সন্ধ্যের মুখে আধো আলো-আঁধারে সে একটি ফুল দেখতে পেল। ফুলটিকে জলের পাত্রের মধ্যে ডুবিয়ে দিল,— পাত্রের জল শুকিয়ে যাচ্ছে। ভাইয়ের নিথর হাত-পা-দেহ কাঁপছে। কিন্তু ভাই কথা বলছে না! পাত্রের জলটুকু দাদা খেয়ে ফেলল। ছোট ভাই চোখ মেলে উঠে দাঁড়াল। দুজনে জড়িয়ে ধরল। দুজনের চোখেই নোনতা জলধারা।

ভাই প্রতিশোধ নিতে চাইল। বলল, দাদা, এবার হব আমি একটা ষাঁড়, আমার মানুষের দেহ পালটে যাবে। কেউ বুঝতে পারবে না আমি কে। সকাল হলেই তুমি ষাঁড়কে নিয়ে রওনা দেবে, যাবে ফারাও-এর প্রাসাদে। ওখানে রয়েছে আমার বউ। ওখানে গেলে আমার তোমার ভাগ্য ফিরে যাবে।

সূর্য ডুবে গেল। অন্ধকার চারিদিকে। সূর্য উঠল। আলো চারিদিকে। ছোট ভাই ষাঁড় হয়ে গেল। ষাঁড়ের পিঠে চেপে দাদা রওনা দিল।

ফারাও-এর প্রাসাদের সামনে এসে তারা থামল। এই ষাঁড়ের রয়েছে সব সুলক্ষণ। ফারাও খবর পেয়ে বাইরে এল। ষাঁড় দেখে খুশি হল। উৎসব লেগে গেল। রাজ্যের কল্যাণ হবে কেননা এ ষাঁড় মঙ্গলের দূত। বড় ভাইকে সোনা-দানা উপহার দেওয়া হল। বউ ভাই গাঁয়ে ফিরে গেল। ষাঁড় রইল ফারাও-এর প্রাসাদে।

এক পরবের দিনে ষাঁড়কে আনা হল মন্দির চত্বরে। সেখানে রয়েছে ছোট ভাইয়ের বউ। বউকে দেখে ষাঁড় বলল, তুমি চেয়েছিলে, কিন্তু আমি মরিনি। এখনও বেঁচে আছি, যেমনভাবে বেঁচে থাকে সত্য।

বউ বলল, তুমি কে?

ছোট ভাই বলল, চিনতে পারছ না? আমি বাটু। তোমার স্বামী। তুমি তো চাওনি আমি বেঁচে থাকি। তাই ফারাওকে বলে দিলে দেবদারু গাছের ফুলের কথা। আমাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিলে। আমি ষাঁড় হয়ে আছি, আমি জীবিত যেমনভাবে জীবিত থাকে সত্য।

বউ খুব ভয় পেয়ে গেল। অপরাধী মন তার। সে মন্দির-চত্বর থেকে তাড়াতাড়ি চলে গেল।

ফারাও ঘরে এল। বউ বলল, সূর্যদেবতার নামে শপথ করুন, আমি যা চাইব তাই দেবেন! রাজি হল ফারাও। বউকে সে সবকিছুই দিতে পারে।

বউ বলল, ওই ষাঁড়ের হৃদয় খেয়ে ফেলার অনুমতি দিন আমাকে। ষাঁড়কে বলি দিন।

ফারাও ভাবতে পারেনি, বউ এমন জিনিস চাইবে। বড় পয়মন্ত ষাঁড়। কিন্তু কথা দেওয়া আছে।

পরের দিন উজ্জ্বল আলো মেলে সূর্যদেবতা আকাশে উঠলেন। ভৃত্যরা পয়মন্ত ষাঁড়কে বলি দেওয়ার জন্য আনল। ষাঁড়ের গলায় তীব্র আঘাত করল। দু-ফোঁটা রক্ত গড়িয়ে পড়ল প্রাসাদের দরজার দুপাশে। রক্ত থেকে জন্ম নিল দুটো পিচ্ গাছ। মঙ্গলের প্রতীক এই পিচ্ গাছ। সবাই খুশি।

একদিন ফারাও ও বউ এল গাছের নীচে। অনেক বড় হয়েছে দুটি গাছ। গাছ বউকে বলল, তুমি বিশ্বাসঘাতিনী, তুমি একদিন ফারাওকে জানিয়ে দিয়েছিলে আমার হৃদয় কোথায় আছে, তুমি ষাঁড়রূপী আমাকে হত্যা করালে। তুমি কী রকম নারী? আমি তবু মরিনি, বেঁচে আছি, গাছ হয়ে বেঁচে আছি। যেমন বেঁচে থাকে সত্য।

বউ মোহিনী চোখে স্বামীর দিকে চাইল। অনুপমা রূপবতী নারীর মোহময়ী চোখ। চোখের ভাষায় প্রেম।

বউ বলল, দরজার দুপাশের দুটো গাছ কেটে ফেলতে আদেশ করুন প্রভু। ওখানে বসানো হবে এই গাছের কাঠ দিয়ে তৈরি দুটি সুন্দর ফলক।

ভৃত্যরা গাছ কাটছে। বিশ্বাস নেই কাউকেই। তাই পাশে দাঁড়িয়ে বউ গাছ কাটা দেখছে। হঠাৎ কুঠারের আঘাতে এক চিলতে কাঠের টুকরো এসে বউয়ের মুখের মধ্যে ঢুকে গেল। বউ গর্ভবতী হল। একদিন জন্মাল এক পুত্রসন্তান। বউয়ের প্রথম সন্তান হল।

উৎসব শুরু হয়ে গেল। রাজার সন্তান হয়েছে। ধাত্রীর ওপরে সব দায়িত্ব দেওয়া হল। আসলে কিন্তু এই সন্তান ছোট ভাই বাটু ছাড়া আর কেউ নয়।

ফারাও-এর ছেলে হিসেবেই সে বড় হতে লাগল। বড় হয়ে সে হল ফারাও-এর প্রতিনিধি। বৃদ্ধ ফারাও মারা গেল। রাজা হল সেই রাজপুত্র।

একদিন ফারাওরূপী বাটু সবাইকে ডাকল। সে সত্য প্রকাশ করে দেবে। সত্যকে গোপন করতে নেই। জীবনের মতোই উজ্জ্বল হল সত্য।

ফারাও বসে রয়েছে। পাশে বানি। ফারাও বলল, আমি বাটু। এই বউ আমাকে বারবার মেরে ফেলতে চেয়েছিল। কিন্তু পারেনি। সত্য জয়ী হয়েছে। আমি বাটু,

ফারাও হয়ে বেঁচে আছি। ফারাও বউ ও মা— একই দেহের এই নারীকে হত্যা করবার নির্দেশ দিল। বিশ্বাসঘাতিনীকে বাঁচিয়ে রাখতে নেই। অমঙ্গল হয়। বউ মরে গেল।

বাটু গ্রাম থেকে দাদা আনুপকে ডেকে আনল। আনুপ হল রাজা। তিরিশ বছর পরে দাদা মারা গেল। তারপরে ফারাও হল বাটু। ফারাও বাটু।

'দুই ভাইয়ের গল্প' মিথকথায় যেভাবে কাহিনি এগিয়েছে, একটি ঘটনা থেকে অন্য ঘটনার সূত্রপাত হয়েছে, তার পরতে পরতে রয়েছে জাদুর ধারণা। কিন্তু এই জাদু অলৌকিক নয়, সামাজিক জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। জীবনের কথা বলতে এখানে ইচ্ছাপূরণের তাগিদ বা 'উইশফুল থিংকিং' জোরালভাবে এসেছে। এই ভাবনা আরোপিত নয়। তাই প্রতিটি ভাবনায় ফুটে উঠেছে জাদু-বাস্তবতা।

জাদু ও সমাজবাস্তবতা মিলেমিশে গিয়েছে। এই মিথকথায় কীভাবে সমাজ-জীবনের বাস্তব কথা এসেছে? সেইকালের মিশরের ধর্মীয় বিশ্বাস ও সামাজিক রীতিনীতির হদিস মিলবে জাদু-বাস্তবতার বিশ্লেষণে। গ্রামের মানুষ ছিলেন মূলত কৃষিজীবী, গোরু ছিল অন্যতম সম্পদ। ষাঁড় ছিল পয়মন্ত পবিত্র পশু, কৃষিসভ্যতার ব্যাপক প্রভাব ছিল বলেই ষাঁড় পয়মন্ত। ব্যভিচার ছিল, কিন্তু তাকে ঘৃণা করা হত। বউদি কুপ্রস্তাব দিলেও ভাই তা ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান করছে। আবার কামনা জর্জরিত নারী প্রতিশোধ নিতে মিথ্যা অভিযোগ জানায়। আধুনিক সমাজ জীবনের প্রতিচ্ছবি নয় কী? মনের অন্ধকার থাকলেও নৈতিকতা প্রাধান্য পেয়েছে। অন্যদিকে সামন্তপ্রভু ইচ্ছে করলেই শক্তিবলে অন্যের গৃহবধূকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। মানুষের দেহ থেকে আত্মাকে বিচ্ছিন্ন করে দেখার যে আদিম জাদু-বিশ্বাস তা সেই সময়েও বিদ্যমান ছিল। মানুষ স্বেচ্ছায় রূপ পরিবর্তন করতে পারে, এই পৌরাণিক বিশ্বাসও ছিল।

আবার দার্শনিক ভাবনার কথাও জাদু-বাস্তবতার অবয়বে প্রকাশিত হয়েছে। তিন-চারবার বলা হয়েছে, যেমনভাবে সত্য বেঁচে থাকে, আমি জীবিত, যেমনভাবে বেঁচে থাকে সত্য। কত প্রতিকূলতা, অসহায়তা, সামাজিক প্রতিবন্ধকতা, তবু সেই কালেও মানুষ সত্য সম্পর্কে এমন অভিমত প্রকাশ করেছে। বিস্ময়কর উপলব্ধি। এবং এই অনুভব সম্ভব হয়েছে জাদু-বাস্তবতার জীবনবোধ থেকে।

লোককথা : শ্রেণীচেতনার দৃষ্টিকোণে

তপনকুমার বিশ্বাস

পুষ্পের প্রতি ভ্রমরের যেমন চিরকালীন আকর্ষণ, গল্পের প্রতি মানব মনের আকর্ষণও তেমনি। তাই স্নেহের পুত্তলী নাতি-নাতনিদের গল্প শোনার আব্দার মেটাতে মা-ঠাকুমা, দাদু-দিদারা যখন ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়েন তখন বাধ্য হয়েই বলেন— গল্প-সল্প তিলে পুচকির ছা/ গল্প যদি শুনবি তবে মোল্লা বাড়ি যা...

কিন্তু কচি-কাচারা নাছোড়বান্দা—সুতরাং গল্প রচনা করতেই হয়। তাই বলা যায় লোককথার উদ্ভব হয়েছে শিশু মনের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যেই। কিন্তু লোককথা লৌকিক সমাজের এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। ঐতিহ্য পরম্পরায় মুখে মুখে প্রচলিত ও গদ্যে বর্ণিত জনশ্রুতিমূলক গল্পকে লোককথা বা লোক কাহিনী বলা যায়। গল্পগুলো ছোট হোক বা বড় হোক তা হবে পূর্ণাঙ্গ। গঠনগত বিচারে একক ও সরল রৈখিক গল্প যেমন আছে, তেমনি আছে শাখা-প্রশাখা সম্বলিত জটিল গল্পও। লোককথাগুলির মধ্যে সামাজিক ও গ্রামীণ অর্থনৈতিক ইতিহাসের মৌখিক উপাদান যেমন লুকিয়ে আছে তেমনি নিহিত আছে শ্রেণী চেতনার ঐতিহ্য। সামগ্রিকভাবে লোককথার একটি বিশ্বজনীন চরিত্রও রয়েছে।

ঐতিহাসিক বস্তুবাদের কষ্ঠিপাথরে মানব সমাজের ক্রমবিকাশের ধারা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, আদিম সাম্যবাদী সমাজের পর থেকে সমাজ বিকাশের বিভিন্ন স্তরের সমগ্র ইতিহাসই হল শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস— অর্থাৎ শোষক ও শোষিত, প্রভুত্বকারী ও তাদের পদানতদের মধ্যেকার সংগ্রামের ইতিহাস। আজ পর্যন্ত যত সমাজ দেখা গেছে, তাদেব সকলের ইতিহাস হল শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস। প্রত্যেক সমাজে অবস্থিত শ্রেণীগুলিকে দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা— মুখ্য ও গৌণ। মুখ্য শ্রেণীগুলি শোষকশ্রেণী হিসাবে পরিচিত এবং গৌণ শ্রেণীগুলি শোষিত শ্রেণী হিসাবে পরিচিত। ঐতিহাসিক বস্তুবাদ বলে যে, সভ্যতার ইতিহাস মানেই শ্রেণীতে শ্রেণীতে দ্বন্দ্বের ইতিহাস। উৎপাদন পদ্ধতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক শ্রেণীর বিন্যাসেরও পরিবর্তন ঘটে। ভিন্ন ভিন্ন অর্থনৈতিক স্বার্থ নিয়ে যে শ্রেণীগত দ্বন্দ্ব ঘটে, তারই পরিপ্রেক্ষিতে থিসিস বনাম অ্যান্টিথিসিসের মোকাবিলায় যে সিন্থেসিস (যথাক্রমে তত্ত্ব, প্রতিতত্ত্ব ও সমন্বিত তত্ত্ব) উদ্ভাসিত হয়— তার সবটুকুই প্রতিফলিত হয় সাহিত্যে; কখনো প্রত্যক্ষ এবং কখনো পরোক্ষভাবে। মনোবিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতির যৌনতা সর্বস্ব অনুভাবনার সীমাবদ্ধতাকে ফেলে রেখে ঠিক এই কারণেই ঐতিহাসিক

বস্তুবাদী পদ্ধতিকে লোককথা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণতম বলে গণ্য করতে হয়; যেহেতু গোটা সমাজ ব্যবস্থারই হৃদস্পন্দন তার মধ্যে অনুরণিত হয়। লোক কাহিনীর বিচারের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের প্রয়োগ যে এত গভীরে যেতে পারে, তা কিন্তু বাস্তবিকই বিস্ময়কর।

লোক কাহিনীগুলিকে বিশ্লেষণ করলে শ্রেণী দ্বন্দ্বের চিত্রটি প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। লোককথাগুলি শুধুমাত্র আনন্দ বা বিনোদনের প্রকাশ নয়, এর মধ্যে লোক সমাজের বেদনাময় সংগ্রামশীল রূঢ় বাস্তবের ঐতিহাসিক ভিত্তিটি লুকিয়ে আছে। দারিদ্র্য, বঞ্চনা, উৎপীড়ন, অপূর্ণ আশা-আকাঙ্ক্ষা ও জীবনযুদ্ধের জ্বালা সমাজের সর্বক্ষণের সঙ্গী। লোককথাগুলি ও সবেরই সাহিত্যিক বহিঃপ্রকাশ, রূপকের আড়ালে তা জীবনের জলছবি।

ভারতের লোককথা কিংবা পৃথিবীর অন্যান্য জাতি বা গোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত লোককথা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে ঐতিহ্য পরম্পরায় গড়ে ওঠা মূল্যবোধ তথা সংগ্রামী শ্রেণী-চেতনা বিভিন্ন সংকেত, প্রতীক, রূপকের আবরণে নিজেদের অজান্তেই বিশ্বজনীনতা লাভ করেছে। এই দমন পীড়নের চিত্র মানুষের মনকে করুণায় আর্দ্র করে এবং তা বিশ্বজনীন ব্যাপ্তি পায়।

এই বিশ্বজনীনতায় দেখা যায় লোভী ও উৎপীড়কের পরিণাম শাস্তি আর লাঞ্ছিত ও অসহায়ের মর্যাদা লাভ। লাঞ্ছিতরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সকলেই 'টুনটুনি'। লোভী ও উৎপীড়কেরা 'নাককাটা' রূপকে শাস্তি লাভ করেছে। গল্পের পরিকাঠামো অনুযায়ী রূপের পরিবর্তন ঘটে থাকে। কোনো গল্পে সুয়োরাণীর হেঁটোয় কাঁটা ওপরে কাঁটা, কোন গল্পে 'প্রাণ ভোমরা' কে তরোয়ালের এক কোপে মেরে ফেলা, কোন গল্পে দুষ্ট সতীনদের জীবন্ত পুঁতে ফেলা প্রভৃতি— লোককথার কথাকাররা বাস্তবের অন্যায় সুখ, সমৃদ্ধি, প্রতিপত্তি প্রভৃতি বিষয়গুলি পাওয়ার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষায় কল্পনার বেড়াজালে বহিরাঙ্গিক শ্রেণীরূপের পরিবর্তন ঘটায়। নিজেরাই রাজপুত্তুর কিংবা কোটালপুত্তুর হয়ে ওঠে। তারাই যেন তার প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করে। শ্রেণীচেতনার এই রূপক নানা গল্পে আরোপিত হয়েছে।

'Weaker defeats stronger'— এটি অবশ্যই একটি সুপরিচিত মোটিফ। শোষক, অতি শক্তিশালী এবং শারীরিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বলশালীদের সঙ্গে দুর্বল অসহায় মানুষ পেরে ওঠে না। নানাভাবে প্রবল প্রতিপক্ষের দ্বারা সাধারণ, সহজ সরল মানুষ শোষিত হয়, পীড়িত হয়, লাঞ্ছিত হয়, অপমানিত হয়। মানুষ যতই অসহায় হোক, দুর্বল হোক তথাপি তার আত্মমর্যাদা বোধ থাকেই, যাকে শোষণমুক্তির কথা সে ভাবে। পীড়ন থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য তাদের সামনে দুটি পথ খোলা থাকে। একটি সঙ্ঘশক্তি। সকলে মিলে যদি প্রতিপক্ষের বিরোধিতা করে তবে প্রবল পরাক্রান্ত শক্তি পর্যুদস্ত হতে বাধ্য। বহু গল্পেই এই সঙ্ঘশক্তির জয় ঘোষিত হতে দেখা

যায়। তা অবশ্যই রূপকের আড়ালে। আর দ্বিতীয়টি হল বুদ্ধিমত্তার। বুদ্ধিমত্তার জোরে যে দুর্বল, অসহায় শক্তিহীন সে অনায়াসেই শক্তিমানকে উচিত শিক্ষা দিতে পারে। বেশ কিছু লোককথাতেই এই বুদ্ধিমত্তার জয় ঘোষিত হতে দেখা যায়।

নেপালের একটি প্রচলিত লোককথা 'A Needle's Determination' বা 'একটি সূচের সংকল্প' গল্পে দেখা যায় যে, হিমালয়ের পাদদেশে ঘন গভীর বনের মধ্যে বাস করে এক দুর্ধর্ষ সিংহ। বনের সমস্ত প্রাণীকুলের কাছে সে এক মূর্তিমান হিংস্রতার প্রতীক। কিন্তু তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে সাহস করত না কেউ।

সেই বনের এক প্রান্তে বাস করত ছোট্ট একটি সূচ। বনভূমির প্রাণীকুল যখন সিংহের অত্যাচারে দিশেহারা, তখন সেই সামান্য সূচ মনে মনে সেই ঘৃণ্য সিংহের অত্যাচারের হাত থেকে পরিত্রাণের পথ খুঁজতে লাগে। অবশেষে সিংহকে হত্যা করার পরিকল্পনা শুরু করল সে। তার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার জন্য সে সাহায্য চাইল বনের হাতুড়ির। প্রস্তাবে রাজি হল সেই হাতুড়ি।

পরিকল্পনা মতো তারা দুজনে এগিয়ে চলল। পথে তাদের সঙ্গে যোগ দিল পিচ্ছিল গোবর। যখন তারা তিনজনে একত্রে তাদের লক্ষ্যপূরণের জন্য কর্মপদ্ধতি নিরূপণ করতে বসল, গোবর তখন জানাল যে, তাদের এই যুদ্ধে 'ভীমরুল' (বোলতা) ও 'কেউটে'-কেও সঙ্গে নেওয়া উচিত। অন্য দুজন সঙ্গী গোবরের কথায় সায় দিল। সেই মতো তারা খুঁজতে বেরোল ভীমরুল ও কেউটেকে। ভীমরুলকে যুদ্ধে যোগ দেওয়ার জন্যে রাজি করাতে একটু কষ্ট হয়েছিল, তবে কেউটে এক কথায় তাদের প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছে।

এবার নির্দিষ্ট দিনে তারা সকলেই সিংহের গুহায় উপস্থিত। সিংহ তখন শিকার ধরতে বনে গেছে। তারা ঠিক করল সিংহকে আক্রমণের জন্য ওৎ পেতে লুকিয়ে থাকার এটাই উপযুক্ত সময়। কেউটে সূচকে পরামর্শ দিল, সে যেন সিংহের বিছানায় এমনভাবে লুকিয়ে থাকে যাতে সোজাসুজি সে সিংহের শরীরে নিজেকে বিদ্ধ করতে পারে। ভীমরুল নিজেকে আয়নার সামনে লুকিয়ে রাখল, হাতুড়ি রইল দরজার পেছনে। আর কেউটে নিজেকে জড়িয়ে নিল বাতি জ্বালাবার স্থানে।

এদিকে আহার সমাপ্ত করে গুহায় ফিরে এল সেই সিংহ। সন্ধ্যে হয়ে গেছে। অতিরিক্ত আহারের ফলে ক্লান্তিতে আলো না জ্বালিয়েই বিছানার ওপর সোজা গা এলিয়ে দিল সিংহ। গুহার ঘন অন্ধকারের মধ্যে দেখতে না পাওয়ায় তার শরীরের নিম্নাঙ্গের গভীরে বিদ্ধ হয়ে গেল সূঁচ। অসহ্য যন্ত্রণায় দিক্‌ভ্রান্ত হয়ে সিংহ তখন আলো জ্বালানোর জন্য ছুটে গেল বাতির কাছে। বাতি জ্বালানোর আগেই কেউটে তার ডান নাকের উপর ছোবল মেরে দ্বিতীয় আঘাতটি করল। ফলে তার পক্ষে আলো জ্বালানো আর সম্ভব হল না। অসহ্য যন্ত্রণা ও বিষ জর্জর রক্তাক্ত নাক নিয়ে সে যখন ছুটে গেল আয়নার কাছে, তখনই তৃতীয় আঘাতটি হানল ভীমরুল। সম্মিলিত সেই আক্রমণে দিশেহারা হয়ে রক্তাক্ত সিংহ তখন বেরিয়ে যেতে চাইল খোলা আকাশের নীচে। কিন্তু

চৌকাঠ পেরোনোর আগেই হাতুড়ি তার সমস্ত শক্তি দিয়ে আঘাত করল সিংহের মাথায়।

হাতুড়ির আঘাত সহ্য করেও সিংহ দৌড়ে যাবার জন্য চেষ্টা করল। কিন্তু সেই মুহূর্তে পিচ্ছিল গোবরে পা-পড়ে ছিটকে পড়ল সিংহ মাটিতে। আর তখনই হাতুড়ি একের পর এক আঘাত হেনে অত্যাচারী সেই সিংহকে পরাস্ত ও হত্যা করল।

সফল হল ঐক্যবদ্ধ শক্তির প্রতিবাদ ও যুদ্ধ পরিকল্পনা। মৃত সিংহটি পড়ে রয়েছে মাটিতে। কিন্তু সিংহের শরীরে আমূল বিদ্ধ হয়ে যাওয়া সূঁচকে কেউই রক্ষা করতে পারেনি। সকলে মাথা নত করে শ্রদ্ধা জানাল তাদের সহযোদ্ধা সূঁচের মৃত্যু বরণের জন্য। আদর্শের জন্য মৃত্যু বরণকারী যে সূঁচ নিজের প্রাণ দিয়ে অত্যাচারী সিংহের হাত থেকে এইভাবে রক্ষা করেছিল হিমালয়ের পাদদেশের বনভূমিকে ও প্রাণীকুলকে। এমনই ঘটে চিরকাল। যুগ যুগ ধরে চলে আসা অত্যাচারের হাত থেকে দেশ তথা জাতিকে মুক্ত করার জন্য সূঁচের মতো সংকল্পে স্থির গণমানসকে প্রাণ দিতে হয়েছে বারে বারে। তাদেরই আত্মত্যাগ ও আত্মবিসর্জনের ওপর নির্মিত হয়েছে সভ্যতার সৌধ। আর তাই এই কাহিনী হয়ে ওঠে অত্যাচারী শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে গণমানসের প্রতিবাদ-প্রতিরোধের কাহিনী। বহুযুগ ধরে চলে আসা অত্যাচারের বিরুদ্ধে কথকদের প্রতিবাদী ভাবনাটি চিত্রিত হয়েছে সামান্য একটি সূঁচের সংকল্পের মধ্যে।

আত্মরক্ষা করা প্রাণী জগতের বিশেষ ধর্ম। প্রত্যেকটি প্রাণী তার আত্মরক্ষার কৌশল আয়ত্ত করে। প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়ে টিঁকে থাকার এই কৌশলই 'অভিযোজন প্রক্রিয়া'। যেমন মৌমাছিরা তাদের শত্রুদের আক্রমণ করতে দল বেধে ঝাঁকে ঝাঁকে যায়। এমনই এক ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের কাহিনী ইউক্রেনের লোককথা 'The Bear and the Bees' (ভল্লুক ও মৌমাছিরা)। এ গল্পে এক দাম্ভিক ও উদ্ধত ভল্লুকের পরাজয়ের কাহিনী চিত্রিত হয়েছে।

এক গাছে বেশ কিছু মৌমাছি বাসা বেঁধেছিল। একটি ভল্লুক সে কথা জানত। ভল্লুক নিজেকে খুব শক্তিমান মনে করত। একদিন সেই ভল্লুক মৌমাছিদের বাসার কাছে গিয়ে মৌমাছিদের উদ্দেশ করে বলল— 'তোমরা আমার চেয়ে খুবই ছোট এবং দুর্বল। তোমরা নিশ্চয় নিজের ইচ্ছায় আমাকে তোমাদের মধু খেতে দেবে। যদি তোমরা তা না দাও, তাহলে জোর করে আমি খাব এবং সেই সঙ্গে গাছটা মাটি থেকে উপড়ে ফেলে তোমাদেরকে হত্যা করব।' ভল্লুকের কথা শুনে মৌমাছিরা বলল— 'ঠিক আছে, চেষ্টা করে দেখই না কি হয়। তখন তুমি টের পাবে, কিভাবে আমরা তোমাকে শাস্তি দেই।' মৌমাছিদের সেই প্রতিবাদী হুমকি শুনে ভল্লুক গেল রেগে। রাগে গজ্‌গজ্ করতে করতে সে তার মাথাটা ঢুকিয়ে দিল মৌচাকের গভীরে। তারপর নির্দয়ভাবে জোর করে খেতে শুরু করল সেই মধু। তখন মৌমাছিরা একসঙ্গে সকলে ঝাঁপিয়ে পড়ল ভল্লুকের উপরে। ভল্লুকের নাকে, কানে, জিভে কামড়াতে লাগল সমস্ত

শক্তি দিয়ে। মৌমাছিদের হুলের বিষে ভল্লুক তখন দিশেহারা, যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করতে করতে ভুলেই গেল কত বলবান সে।

এরপর দৌড়ে পালিয়ে গেল সেই ভল্লুক। মৌমাছিরা তখন পলায়নরত ভল্লুককে উদ্দেশ করে বলল— 'মনে রেখো, সমস্ত প্রাণীজগৎ জানে বিপদের দিনে কিভাবে নিজেদের রক্ষা করতে হয়, সে যত ছোট প্রাণীই হোক না কেন।' এই ঘটনার পরথেকে সেই ভল্লুক আর কোনদিন মৌমাছিদের আঘাত করেনি। এই গল্পটির মধ্যেও রয়েছে শ্রেণী চেতনা ও ঐক্যবদ্ধ সংগ্রমের জয়ের ঘোষণা।

বাংলার একটি লোককথায় দেখা যায় গৃহস্থের ঘরের পেছনে বেগুন গাছে বাসা বেঁধেছিল এক টুনটুনি পাখি। বাসার ভিতরে ছিল তিনটি ছোট ছোট ছানা, যারা উড়তে পারে না, চোখও মেলতে পারে না। খালি হাঁ করে আর চিঁ চিঁ করে। গৃহস্থের বেড়ালটি ভারী দুষ্টু। সে খালি ভাবে টুনটুনির ছানা খাব। একদিন সে বেগুন গাছের তলায় এসে বললে, কি করছিস লা টুনটুনি? টুনটুনি তার মাথা হেঁট করে বেগুন গাছের ডালে ঠেকিয়ে বললে, প্রণাম হই মহারাণী! এতে বিড়ালিনী ভারী খুশী হয়ে চলে গেল। এমনি সে রোজ আসে, রোজ টুনটুনি তাকে প্রণাম করে আর মহারাণী বলে; আর সে খুশি হয়ে চলে যায়। এখন টুনটুনির ছানাগুলো বড় হয়েছে, তাদের সুন্দর পাখা হয়েছে, তারা আর চোখ বুজে থাকে না। তা দেখে টুনটুনি তাদের বললে,—বাছা তোরা উড়তে পারবি? ছানারা বললে, হ্যাঁ মা পারব। টুনটুনি হেসে বলল এখন দুষ্টু বিড়াল আসুক দেখি! খানিক বাদেই বিড়াল এসে বললে, কি করছিস লা টুনটুনি? তখন টুনটুনি পা উঠিয়ে তাকে লাথি দেখিয়ে বললে, দূর হ লক্ষ্মীছাড়ি বিড়ালিনী! বলেই সে ফুড়ুৎ করে উড়ে পালাল। দুষ্টু বিড়াল দাঁত খিঁচিয়ে লাফিয়ে গাছে উঠে টুনটুনিকে আর ধরতে পারল না, ছানাও খেতে পেল না। খালি বেগুন গাছের কাঁটার খোঁচা খেয়ে নাকাল হয়ে ঘরে ফিরল।

টুনটুনির গল্পের আঙ্গিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, অসহায় টুনটুনি শেষ লড়াইতে প্রবল প্রতাপান্বিত প্রতিপক্ষ অর্থাৎ বেড়ালকে পর্যুদস্ত করতে পারে। টুনটুনির গল্পের স্রষ্টা নিজেই উচিত-অনুচিত বিচারের ন্যায়দণ্ড নিজের হাতে তুলে নিয়ে কাহিনীর সমাপ্তি ঘটিয়েছেন।

অন্য একটি লোককথায় দেখি একটি চিংড়ি মাছ পদ্ম পাতায় প্রতিদিন তার চুল শুকোয়। একদিন একটি কাক এসে বললে সে চিংড়িকে খাবে। চিংড়ি বলল পুঁটিমাছের কাছে তারা যাবে বিচারের জন্য। পুঁটিমাছের কাছে দুজনেই হাজির হল। পুঁটিমাছ চলে গেল চ্যাং মাছের ঘরে। চ্যাং মাছ বিচার করতে বসে কাঁকড়াকে ডাকার কথা বলল। অতএব কাঁকড়াকে ডাকা হল। কাঁকড়া এসে সামনেই কাককে দেখতে পেল। তখন কাঁকড়া সবই বুঝতে পারল এবং কাকটার মাথাটা মটকে মেরে ফেলল। চিংড়ি পালিয়ে গেল জলের তলায়। অর্থাৎ বুদ্ধিমত্তার কাছে কাক পর্যুদস্ত হল। (পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গের উপকথা)।

বাঘকে শিয়ালের কাছে বারবার পর্যুদস্ত হতে হয়েছে। বাঘ হল শিয়ালের তুলনায় শক্তিশালী। শিয়াল তার বুদ্ধিমত্তার জোরে বারংবার বাঘকে নাকানি-চোবানি খাইয়েছে। এ হেন পশুর জগতে চতুর বলে পরিচিত শিয়াল, তাকেও পর্যুদস্ত হতে দেখা যায়। তাও একটি ছাগলের কাছে। বলাবাহুল্য শিয়ালের তুলনায় ছাগল অসহায় ও নিরীহ জীব। কিন্তু সেই ছাগল দিব্যি তার বুদ্ধিমত্তার জোরে শিয়ালকে হারিয়েছে।

একটি ষাঁড়ের সঙ্গে একটি ছাগল বনের মধ্যে গিয়েছিল ভালো ঘাসের সন্ধানে। প্রচুর ঘাস খেয়ে সে একটি গর্ত দেখে তার ভেতরে ঢুকে পড়ল। এই গর্তটি ছিল একটি শিয়ালের। অনেক রাতে শিয়াল ঘরে ফিরে দেখল তার গর্তে অন্য এক জন্তু প্রবেশ করেছে। সে জিজ্ঞাসা করল কে রয়েছে? ছাগলছানা জবাবে বলল, 'আমি সিংহের মামা নরহরি দাস, পঞ্চাশ বাঘে মোর এক এক গ্রাস'। এই কথা শুনে শিয়ালের আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হওয়ার উপক্রম। সে তাড়াতাড়ি বাঘকে ডেকে নিয়ে এল। শিয়ালকে লেজে বেঁধে নিয়ে বাঘকে আসতে দেখেই ছাগল বলল, 'দূর হতভাগা। তোকে দিলুম দশ বাঘের কড়ি, এক বাঘ নিয়ে এলে লেজে দিয়ে দড়ি।' —শুনেই বাঘ ভাবলে, শিয়াল ফন্দি করে নরহরি দাসকে দিয়ে তাকে খাওয়াবে বলে এনেছে। বাঘ দিল দৌড়, সঙ্গে শিয়ালও। বেচারী শিয়ালের মাটিতে আছাড় খেয়ে, কাঁটার আঁচড় খেয়ে ক্ষেতের আলের ঠোক্কর খেয়ে প্রাণ যায় আর কি। শিয়ালের এইভাবে সেদিন খুব সাজা হয়েছে। পরদিন ছাগল নিরাপদে বাড়ি ফিরে এল। (বাংলার লোকসাহিত্য, আশুতোষ ভট্টাচার্য, চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৮০-৮১)

ছাগল ছানা ক্ষুদ্র ও অসহায় জীব; সেই জন্য বাংলার লোককথার সাধারণ আদর্শ অনুযায়ী সে সর্বাপেক্ষা চতুর। আসলে, শ্রেণীবিভক্ত সমাজে সে শোষিত শ্রেণী। বুদ্ধিবলে সে ধূর্ত শৃগাল এবং হিংস্র বাঘের কাছ থেকে আত্মরক্ষা করেছে। শোষক শ্রেণীকে বুদ্ধিবলে পরাস্ত করেছে। বাংলার এই গল্পটি রূপকাশ্রিত।

সিংহ ও খরগোসের গল্পে দেখি, এক জঙ্গলে থাকত এক সিংহ। সে প্রতিদিন জঙ্গলের পশুদের ধরে খেত। তাই একদিন সব পশুরা মিলে ঠিক করে যে, প্রতিদিন একটি করে পশু সিংহের কাছে পাঠানো হবে। এমনভাবে বেশ কয়েকদিন কেটে যাওয়ার পর একদিন একটি খরগোসের যাবার পালা আসে। সে নির্দিষ্ট সময়ের অনেক পরে গিয়ে সিংহের কাছে পৌঁছায়। সিংহ রেগে গিয়ে তার আসতে দেরি হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে বললে তারই মতো আরেকটি সিংহ আসার সময় তার পথ আটকে তাকে খেতে চেয়েছিল। সেখান থেকে অনেক কষ্টে পালিয়ে এসেছে। তাই তার আসতে দেরি হয়েছে। একথা শুনে সিংহ আরো রেগে গিয়ে জানতে চাইল ঐ সিংহটি কোথায় থাকে। জানল সে থাকে কুয়োয়। সিংহ কুয়োর মধ্যে উঁকি মারতেই কুয়োর জলে নিজের প্রতিচ্ছবি দেখে ভাবল সত্যিই একটা সিংহ এইখানে থাকে। এই ভেবে সে রেগেমেগে অস্থির হয়ে কুয়োর জলে ঝাঁপ দিল, আর উঠতে পারল না ফলে মারা গেল।

এই লোককথাটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ক্ষুদ্র পশু খরগোসের বুদ্ধিমত্তার ফলে পরাক্রমশালী সিংহের পরাজয় ঘটে। খরগোস তার বুদ্ধির বলে জঙ্গলের সকল পশুদের প্রাণ বাঁচাল। এইভাবে শোষিত শ্রেণী অর্থাৎ খরগোসের হাতে শোষক সিংহের পরাজয় ঘটে।

এছাড়াও ভারতীয় পুরাণবৃত্তে দেবাসুরের যে দ্বন্দ্ব চিত্রিত হয়েছে তাতে সমুদ্র মন্থনের শেষে চুক্তিভঙ্গ করে অমৃত-সুধার ভাণ্ড নিয়ে পালিয়ে গেল দেবতার দল। আর নাগবাসুকীর বিষে জর্জর অসুরেরা নিষ্ফলা শ্রমের শেষে ধুঁকতে লাগল বসে বসে। শ্রমজীবি মানুষের মেহনতে সভ্যতার সুধাভাণ্ড ভরে ওঠে, আর তা ভোগের অধিকার বর্তায় দেবরূপে প্রতিষ্ঠিত ও ওপরতলায় মানুষের হাতে। মেহনতের বিষে জর্জর হয়ে ধুঁকতে থাকে দেহশ্রমী শূদ্র তথা অসুরের দল।

এই শ্রেণী চেতনা জাগ্রত ছিল বলেই অনামা লোককথকরা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে সারা দুনিয়া জুড়ে কাহিনীর শেষ পরিণামে ভাল যে, উৎপীড়িত যে, বঞ্চিত যে, — তাকেই বিজয়ী করেন; মন্দ যে, উৎপীড়ক যে, বঞ্চক, তার মৃত্যু কিংবা কঠোর শাস্তিই হয়ে থাকে। বাস্তবে যে লড়াই জেতা কঠিন লোককথার মাধ্যমে সেই যুদ্ধ এইভাবেই জয় করেছেন লোককথাকার। সাধারণ মানুষের দলের যারা, ঐ টুনটুনি, খরগোস, বিড়াল, চিংড়ি, সুঁচের মতোই নগণ্য এবং দুর্বল; তাদের শ্রেণী চেতনাই এইসব গল্পের মৌল উপাদান।

লোকসমাজ লোককথা বলেন। বিশেষ বিশেষ অনুভূতি প্রকাশের জন্য এসবের সৃষ্টি হয়। মানবতা বিরোধী শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে তাদের প্রতিবাদী মানসিকতার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় এই লোককথাগুলির মধ্যে। অন্যভাবে বলা যায়, সমাজে চলার পথের নানাবিধ বিরোধ তাদের এই মৌখিক সাহিত্যের মধ্য দিয়ে অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে প্রকাশ পেয়েছে। যুগযুগ ধরে অবর্ণনীয় শোষণের হৃদয়ফাটা যন্ত্রণাকে তারা প্রকাশ করেছেন তাদের লোককথায়। ব্যক্তিমানস এর স্রষ্টা হলেও সমগ্র সমাজের সম্পদ বলেই এগুলো গণ্য হয়। লোককথা তাই সংহত সমাজের সামগ্রিক সৃষ্টি। তা কখনোই পুরানো হয়না। সমাজে শ্রেণীদ্বন্দ্বের স্বরূপ জানতে ও শ্রেণীসংঘর্ষের ইতিহাস বিশ্লেষণ করতে গেলে লোককথাগুলির ব্যাখ্যা সত্যিই অনস্বীকার্য। ইতিহাসগত ভাবে আমরা যদি শ্রেণীবিরোধের ধারাটি আবিষ্কার করতে চাই তাহলে লোককথাগুলির বিশ্লেষণ ছাড়া বিকল্প কোন পথ নেই।

ঋণ স্বীকার— 'একটি সূচের সংকল্প' এবং 'ভল্লুক ও মৌমাছিরা' গল্প দুটি দিয়ে সাহায্য করেছেন ড. বিশ্বজিৎ রায় চৌধুরী।

লোককথা ও সামন্তসমাজ

বাবুল চট্টোপাধ্যায়

লোককথা বা Folktale শব্দটি ব্যাখ্যার দাবি রাখে। Folk শব্দটির অর্থ 'লোক' আর 'লোক' বলতে আমরা সংহত সমাজকে বুঝিয়ে থাকি। আমরা এও জানি যে সংহত সমাজের সামগ্রিক চেতনা Folk বা লোক এর অর্থে ক্রিয়াশীল থাকে।

এরপর থাকে 'কথা' শব্দটি। কথা অর্থে কাহিনি। 'কথা' থেকে অনেক শব্দ এসেছে। যেমন উপকথা, রূপকথা, পশুকথা, পরীকথা, কথাবার্তা ইত্যাদি। গল্পের প্রয়োজনে যদি এই কথায় প্রসঙ্গে যাই তবে পেয়ে যাব আখ্যান বা আখ্যায়িকা। আখ্যায়িকা আবার সাধারণত গল্প তথা উপগল্পে বিভক্ত। কথকের বলার ভঙ্গিমা আবেগ প্রবণতা, বংশ-পরম্পরা সবকিছু নির্ভর করে এই কথা'র উপর।

আমরা এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা'র বিষয় বলতে পারি তা হল 'কথানিকা'। এটি বিয়োগান্ত গল্প। শেষাংশে অবশ্যই বিস্ময়। অবাস্তবতা কিংবা অদ্ভুত কোন কল্পনা এক্ষেত্রে আকর্যণীয় বিষয়।

এই গল্পের শ্রেণী বোঝাতে কতকগুলি শব্দের ব্যবহার আমার পেয়ে থাকি তা হল Sacred, tale, myth, legend ইত্যাদি। বাংলায় যাকে পুরাণ কথাও বলা যেতে পারে। পুরাণ কথায় ধর্মীয় ভাব প্রধান বস্তু এবং দেব দেবীর চরিত্র অবলম্বনে গ্রথিত হয়।

সুতরাং মানুষের মুখে মুখে আসা ঘটনা পরম্পরায় তথা ঐতিহ্যানুযায়ী যে কাহিনি পরবর্তী প্রজন্মে চলে এসেছে আমরা সেই সব কাহিনিকে লোককথা বলতে পারি। যেহেতু এটি একটি মৌখিক ক্রিয়া তাই এ কার্যে স্মৃতিই হল শেষ আশ্রয়স্থল।

লোককথার একটি দাবি হল ছোট বা বড় হোক গল্পটিকে হতে হবে পূর্ণাঙ্গ। অর্থাৎ একথা কখনও সরল রৈখিক যেমন হতে পারে তেমনই বিভিন্ন শাখা সম্বলিত জটিল গল্পও হয়ে থাকে।

আমরা রূপকথার গল্প শুনেছি, শুনেছি পক্ষীরাজ রাজপুত্র-কোটালপুত্রের গল্পও। গল্পের সামগ্রিক চেহারায় আছে এক অতিকল্পনের চিত্র। কিন্তু অতিকল্পনা বা অবাস্তব বা বিষয় যাই থাক না কেন লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে এরই মধ্যে লুকিয়ে আছে নীতিকথাও। গল্পের এটিই হল আসল চাবি।

লোককথায় এক বা একাধিক মোটিফ (motif) থাকে। মোটিফ হল গল্পের ক্ষুদ্রতম অংশ যা ঐতিহ্যে বেঁচে থাকার মত ক্ষমতা ধরে রাখে। আর এই মোটিফের মধ্যে কিছু অসাধারণ এবং আকর্ষণীয় গুণ থাকে। যা গল্পকে রহস্যঘন করে তোলে।।

আর এই কারণেই সব দেশের সমস্ত মানুষের কাছে লোককথা হল প্রিয় বিষয়।

মানুষ তাদের গল্প, গাথা, ছড়া, গান এগুলিকে জীবনের সঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে চলে। মানুষের আচার আচরণ, ব্যবহার সংস্কার, আশা-আকাঙ্ক্ষা, রুচি তথ্য আনন্দ সব কিছু মিলেমিশে আছে লোককথায়। আর সে কারণে লোককথাগুলিকে খুব সহজেই আমাদের সংস্কৃতির মধ্যে খুঁজে পাই। সুতরাং একথা আমরা বলতেই পারি যে সংস্কৃতি বা কালচার লোককথাকে বাদ দিয়ে নয়। আর এগুলি মানুষের জীবনের কাহিনীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত বলেই এর কোন বিনাশ নেই। সময়ের সঙ্গে চলে, ঐতিহ্যকে সাথে করে।

একটি কাহিনীর অন্তর্গত ক্রিয়াশীলতার (function) উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন ভ্লাদিমির জে-প্রপ। এই ক্রিয়াশীলতা বলতে কাহিনীর ঘটনাসমূহকে বোঝানো হয়েছে। লোকবিজ্ঞানী এ্যান্টি আর্নে ও স্টিথ থম্পসন বিশ্বের লোককথাকে ২৪৯৯টি টাইপ এ বিভক্ত করেছেন। তাদের মধ্যে জীবজন্তুর গল্পে ১২৯৯টি, রূপকথা ম্যাজিক রোমাঞ্চকর গল্পে ৩০০-১১৯৯টি টাইপ আছে। থম্পসন মনে করেন টাইপ হল একটি স্বতন্ত্র অস্তিত্বের অধিকারী জনশ্রুতিমূলক কাহিনী যা পূর্ণাঙ্গ কাহিনী হিসাবে পরিবেশিত হয়ে থাকে।

লোককথার আশ্রয়স্থল মানুষের স্মৃতি, এই লোককথার অনেক বেশি আশ্রয় মানুষের মনোজগতে। আসলে বাস্তবে যা সম্ভব নয়, সত্য নয় মানুষের মনে তা অবলীলায় ঘটে যায়। আর এখানেই অনেক ভুলে যাওয়া কাহিনী, ঘটনা, অনেক অচরিতার্থতা, আকাঙ্ক্ষা, মনের মগ্নস্তরে নেমে আসে। কুশলী কথকের মুখে লোককথা উপকথা প্রাণ পায়।

পি. কে. মিত্র মহাশয় মুণ্ডারি লোককথা সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে বলেছেন— "যারা লোককথার অনুশীলন করেন তারা বলেন যে লোককথার মধ্যে একটা জাতির প্রাচীন জীবনের অনেক কিছু জড়িয়ে থাকে। তার সংস্কার তার ফেলে আসা অতীত তার আরণ্যক জীবনের সংগ্রামী অস্তিত্বের অনেক কাহিনী রূপায়িত হয় লোককথায়।"

জে. এফ ফ্রেজার বলেছেন— "লোককথা হচ্ছে বিশ্বপ্রকৃতির একটি নির্ভুল ছবি যা মানুষের আদিম মনে প্রতিবিম্বিত হয়েছিল।"

বাংলায় প্রায় সব শ্রেণীর লোককথা আছে। যেমন রোমাঞ্চকর কাহিনীর উর্বরা ভূমিকেই ধরা যেতে পারে— আলি বাবা চল্লিশ চোর, হাতেম তাই, আলাউদ্দীনের প্রদীপ ইত্যাদি। এগুলি দীর্ঘকাল ধরে আমাদের দেশে রয়েছে। রয়েছে 'মধুমালা', 'রূপবান', 'চন্দ্রাবতী' ইত্যাদি। আমাদের Hero tale-এর অভাব। যদিও ধর্ম্মমঙ্গল—এ লাউসেন বীর চরিত্র তবে তা বিশেষ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। মনসামঙ্গলের চাঁদ সওদাগর প্রতিবাদী নির্ভীক চরিত্র।

—তবে সেখানে 'সাফারিং' যতটা আছে 'ডুইং' ততটা নেই। সুতরাং বীর হিসাবে ভাবমূর্তিও ততটা নেই। চণ্ডীমঙ্গলেও কালকেতুরও একই দশা।

আসলে বাংলার লোককাহিনীগুলি দেববলে বলীয়ান হলেও বাহুবলে বলীয়ান নয়।

আসলে ভারতীয় কাহিনীর রক্ষাকর্তা বা উদ্ধারকর্তা অর্থাৎ উদ্ধারকারী শক্তি-দেবতা, ইউরোপে ত্রাণকর্তা কোন ধর্মযাজক বা সন্ন্যাসি। আবার আফ্রিকার লোককথায় এই কাজটি করে থাকে প্রেতাত্মা।

আমরা এও দেখি যে এত নীতিমূলক গল্প রয়েছে যা সর্বযুগে সর্বমানুষকে কল্যাণে উদ্বুদ্ধ করে। যেমন ঠাকুমার ঝুলি'র লালকমল নীলকমল গল্পে বন্দি পুত্রের সফলতার কথাতেও নীতি বিষয় লুকিয়ে আছে। গল্পের চরিত্র মানুষ কিংবা পশু যাই হোক না কেন আমাদের লোককথার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ধর্মের জয় ঘোষণা, ধার্মিকের পুরস্কার লাভ। অন্যদিকে অপরাধের জন্য অপেক্ষা করে থাকে পরাজয় এবং তিরস্কার। আবার হাসি কিংবা বোকাচালাকের গল্প আমাদের লোককাহিনীতে রয়েছে। শুকসারি, ব্যঙ্গমা, -ব্যঙ্গমী, উপকারী পাখি, শৃগাল-কাক, চতুর প্রাণী, কুমীর-বাঘ আবার বক ও মেষ এর মত নিরীহ প্রাণীও রয়েছে লোককথায়। তবে এসব ক্ষেত্রেই দেখা গেছে ব্যঙ্গ ও কটাক্ষের মধ্যে শুভবোধ জাগ্রত করার একটি অপরূপ প্রচেষ্টা।

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী সম্পাদিত 'টুনটুনির বই'— এ অনেক উপাদেয় উপকথা আছে। আবার ব্রতকথা কিংবা গোপাল ভাঁড়েব গল্পেও লোক কাহিনী খুঁজে পাওয়া যায়— এসব নানাবিধ লোককথা থেকে বাঙালী জাতির বহু গুপ্ত ইতিহাস ও গুপ্ত ঐতিহ্য প্রকাশ পায়। আমরা এওজানি যে যে জাতি যত বিচিত্র বিষয়ক লোককথার জন্ম দেয় সে জাতি তত সাংস্কৃতিক চেতনায় সমৃদ্ধ।

এবারে আসা যাক সামন্ত্রতন্ত্র বা 'ফিউডালিজম' এর সম্পর্কে। মধ্যযুগে ইউরোপে জমির বিশেষ মালিকানার ভিত্তিতে যে আর্থিক সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে তা সামন্ত্রতন্ত্র বা 'ফিউডালিজম' নামে খ্যাত। এই সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় ইউরোপের জীবনধারার সর্বক্ষেত্রেই আমূল পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এই 'ফিউডালিজম' পঞ্চম শতাব্দি থেকে হাজার বছরের আর্থিক সময়ে ইউরোপে বজায় ছিল।

সামন্ততন্ত্রের উৎস ও জীবন পদ্ধতি

ইউরোপের রাজশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে জার্মান আক্রমণের ফলে। তখন জনসাধারণ নিজেদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য রাজার কাছে আত্মসমর্পণ না করে ভূস্বামী ও আঞ্চলিক প্রভুদের আশ্রয় নেয়। ফলে রাজার ক্ষমতা হ্রাস পায়, দেশরক্ষা ও প্রশাসনের ক্ষমতা রাজার অধস্তন বড় বড় আঞ্চলিক প্রভুদের হস্তগত হয়। শাসন করা, সৈন্য রাখা, খাজনা আদায় থেকে দেশের জমি ও রসদের বণ্টন, জীবিকা তথা নিরাপত্তার ব্যবস্থা সহ প্রায় সমস্ত কাজ ঐ প্রভুরাই করে থাকেন। কিন্তু তাদের পক্ষেও ঐ বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্রভুত্ব করা যেত না। তাই তারাও তাদের অধীনে দেশরক্ষা ও প্রশাসনের ক্ষমতা বণ্টন করে দিতেন মাঝারি প্রভুদের উপর। আবার এই মাঝারি প্রভুরা আবার সেই জমি একই নিয়মে বণ্টন করে দিতেন ছোট ছোট অঞ্চল প্রভুদের। এর ফলে দেশের সর্বেসর্বা হলেও প্রজার সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক থাকত না।

সামাজিক বিন্যাস

সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণের জীবনপদ্ধতি জন্মভিত্তিক হয়ে পড়ে। সমাজ, জমি ও রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের ভিত্তিতে জনজীবন বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত হয়ে পড়ে। সামন্ততন্ত্রের আদর্শছিল এই রূপ— শীর্ষস্তরের সামন্তের কাছে অধস্তন আনুষ্ঠানিকভাবে আনুগত্য জানাবে ও আত্মসমর্পণ করবে। বদলে ঐ সামন্ত প্রভুর কাছ থেকে পাবে ক্ষমতা, অধিকার ও সম্পত্তি। এইভাবে রাজা থেকে নিম্নতম ভূস্বামীরা পরস্পর আনুগত্যের বন্ধনে আবদ্ধ। রাজা সর্বোচ্চ প্রভু ও সর্বোচ্চ ভূস্বামী, এরপর থাকত বড়, মাঝারি ও ছোট সামন্ত। ওভারলর্ডরা মহাসামন্ত আর অধস্তন হতেন ভ্যাসল। অধস্তনকে নতজানু হয়ে উর্ধ্বতনের কাছে বিশ্বাসের ও আনুগত্যের শপথ (Oath of fealty) নিতে হত। ওই শপথ গ্রহণের বিনিময়ে প্রভু বা লর্ড (Lord) তার ভ্যাসলকে দিতেন 'ফিয়েফ' (Fief) রাজ্যাংশ। অর্থাৎ একচ্ছত্র ক্ষমতা বিভিন্ন স্তরে অসংখ্য সামন্ত প্রভুরা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিতেন। এই অধিকার ভোগের প্রধান বনিয়াদই ছিল জমি। আর এই জমি দান ও গ্রহণের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠত মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক। আবার আর্থিক দিক থেকে ভূসম্পত্তি প্রধান ছিল বলে সমাজে ভূস্বামীরাই ছিল প্রধান। ভূসম্পত্তি ও ভূস্বামী এই দুয়ের প্রাধান্যই হল সামন্ততন্ত্রের মূলকথা।

লোককথা সৃষ্টিতে সামন্তসমাজের প্রভাব ঃ-

একথা আমরা সকলেই জানি যে যেখানে যত অনিশ্চয়তা সেখানে তত বিশ্বাস তথা সংস্কার এর জন্ম। লোকবিশ্বাস, লোকসংস্কার—এ জাদু, টোটেম, মানা, ট্যাবু ইত্যাদি নানাবিধ বিষয় এসেছে। কখনো বিশ্বাস সৃষ্টি করেছে কখনো কল্পনা কিংবা ভাগ্যের নির্মম পরিহাস-এ পরিত্রাণ প্রচেষ্টা। আর এসব বিষয় আবর্তিত হয়েছে লোককথায়।

মনে করা যেতেই পারে যে অত্যাচার কিংবা নির্মম অত্যাচারে সৃষ্ট অসহায় অবস্থার অবসান কিংবা নিছক জীবিকা নির্বাহে সমৃদ্ধি থেকে লোককথার সৃষ্টি হয়েছে। সামন্তসমাজ এ দোষে দুষ্ট। সামন্ত সমাজে রাজা, প্রধান সামন্ত, মাঝারি ও ছোট সামন্ত হয়ে সার্ক বা ভূমিদাসদের দেখি। এদের দুর্দশার অন্ত নেই। এরা একেবারে পিছিয়ে পড়া জাতি। তাই হীনমন্যতায় বিপন্ন। ফলে অনিশ্চয়তা হতাশা গ্রাস করে সার্বিকভাবে। যার ফলে ভাগ্যের নির্মম পরিহাসকে নিজেদের জীবনের অনিবার্য পরিণতি হিসাবে ধরে নেয়। ফলে মানুষ দৈবনির্ভর হয়ে পড়ে ক্রমেই। এই অনিশ্চয়তার জয়কে সামনে রেখে নিয়ত মেতে ওঠে ফিউজালিজম।

যখন কর্মবলে আর কোন কিছুই করা সম্ভবপর হয়ে ওঠে না তখন দৈববলই একমাত্র ভরসা হয়ে ওঠে।

ভূমিদাস এর সঙ্গে কিভাবে ভূমি বা জমির সম্পর্ক আছে তা আমরা বুঝতে পারি, বুঝতে পারি, এই ভূমিকে কেন্দ্র করে কত উর্বরা শক্তি কিভাবে আমাদের গোটা সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করে। সাধারণভাবে কৃষি, আবহাওয়া, তিথি, গণনা, যাত্রার শুভাশুভ দিনক্ষণ, ভালোমন্দের লক্ষণ— এই সবকিছুকে কেন্দ্র করে লোককথার সৃষ্টি হয়েছে।

আমরা প্রবাদে ডাক বা খনার বচনকে লোককথার প্রতিবাদ্য বিষয় হিসাবে ধরতে পারি।

লোককথা বা লোকসাহিত্য সৃষ্টিতে ডঃ সুশীল কুমার দে এবং ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য প্রবাদ ও খনার বচনকে বিশেষ মাত্রা দান করেছেন। সেইসাথে এর বিস্তৃতিতে লোক সাহিত্যের সমৃদ্ধিও আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। যদিও 'বাংলা বিশ্বকোষ' গ্রন্থে ডাক ও খনার বচনকে 'ছড়া' বলে অভিহিত করা হয়েছে।

আমরা আলোচনার গোড়াতে লোক কথার কাহিনীতে ট্যাবু, টোটেম, জাদু, ম্যানা প্রসঙ্গ এনেছি যেগুলি সবই প্রায় লোকবিশ্বাসে অংশত এবং কিছু অনিশ্চয়তার মিশ্রণে গড়ে ওঠা এক অনির্দেশ্য বিশ্বাসের জোর।

আমাদের জীবনে লোককথাগুলি অর্থনৈতিক মানদণ্ডে বেশি প্রভাবিত। আমরা এও লক্ষ্য করি আদি মানুষের জীবনে পশুর ব্যবহার ছিল অনিবার্য। কারণ প্রথমে পশুশিকার তারপর পশুচালনা ও চারণা এবং সবশেষে এসছে কৃষি। 'টোটেম' সংস্কারাচ্ছন্ন প্রেক্ষাপটে কোন একটি পশুকে গোষ্ঠীর প্রধান হিসাবে ধরে চলত আদি প্রবর্তক। আবার একটি গাছ কিংবা ফুল বা ফলকে কেন্দ্র করেও শুভাশুভবোধ জাগ্রত হত। যা তাদের কার্যসিদ্ধিকে পূর্ণতা দেবে এটাই ছিল বিশ্বাসের মূল ভিত্তি। বিশেষ রূপে দেবতার কাছে নিজেকে নিয়োজিত করায় ছিল টোটেম বিশ্বাস। মনে হতেই পারে পশু শিকারে ফল কিংবা গাছের প্রভাব শুভদ্যোতক হল কি করে? এক্ষেত্রে মনে রাখার বিষয় প্রথম পশুশিকার, এরপর পশুচালনা ও চারণা এবং শেষে কৃষি— একে অপরেতে নিবিড় যোগ।

প্রকৃতিতে এমন কিছু বিষয় আছে যেখানে মাটি, জল, বৃষ্টি, আলো, গাছ, নদী, হ্রদ, সমুদ্র, পাহাড়, বন, মাট-ঘাট, খাল, নালা ইত্যাদি নানা নিসর্গবস্তু ও নৈসর্গিক ঘটনার অন্তরালে লুকিয়ে থাকে এক ধরনের অতিপ্রাকৃত শক্তি। এই শক্তি রূঢ় হয়ে উঠলে মানুষ নিরুপায়। আবার শক্তির আরাধনায় হয়ত বা আসে সমৃদ্ধি— আসলে এ শক্তি অলঙ্ঘনীয় এরা অনির্দেশ্য শক্তি। কোন যোদ্ধার যুদ্ধে জয়লাভ করা, কোন কৃষকের কৃষি সমৃদ্ধি কিংবা কোন শূকরশালায় প্রভূত পরিমাণ শূকর বৃদ্ধি— মনে করা হয় এই সবকিছুই অদৃশ্যশক্তি যা ম্যানাতে প্রতিফলিত হয়েছে। আবার এই সমৃদ্ধি বা বিশ্বাসের অজান্তেই 'জাদু' ক্রিয়া কাজ করে।

লোককথার রাজার একাধিক বিবাহ। ইচ্ছামত রাজা একজনের জীবন নেওয়ার অধিকারী। রাজাই সব শক্তির আধার। তাঁর ইচ্ছাই শেষ কথা। প্রজাসাধারণ রাজার করুণার ওপর নির্ভরশীল। রাজার অবিচার সম্পর্কে কারো কিছু বলার থাকে না। প্রজাদের যা কিছু ভাল, সম্পদ রাজা ইচ্ছামত তা অধিকার করার অধিকারী। এসবই হল সামন্ততন্ত্রের পরিচায়ক। তবে অত্যাচারী সামন্ত রাজের বিরুদ্ধে লোককথায় সাধারণকে সোচ্চার দেখা গেছে। সব ক্ষেত্রে যে এই প্রতিবাদ মানুষের তরফে এসেছে তা নয়, ক্ষুদ্র পশু, কীট, পতঙ্গ এদেরও প্রতিবাদী ভূমিকায় দেখা গেছে।

লোককথায় পেশাজীবী

মো. শহীদুর রহমান

সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকেই বাঁচার তাগিদে মানুষের পেশা নির্ধারিত হতে থাকে। এই পেশার ভিত্তিতেই স্তরীভূত হয় সমাজ, নির্ধারিত হয় মানুষের সংস্কৃতি-সভ্যতার ইতিবৃত্ত। এক অর্থে মানুষের পেশা নির্ধারণের পেছনে প্রকৃতি, সমাজ, রাজনীতি, ধর্ম, সংস্কার, সংস্কৃতি ক্রিয়াশীল ছিল বলে মনে হয়। এমনকি সভ্যতার ক্রমবিবর্তনও পেশা নির্ধারণে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। একথাগুলো বাংলা লোককথার পরতে পরতে বিধৃত বলে প্রতীয়মান হয়।

লোককথাগুলোতে মনে হয় মানুষ বেঁচে থাকার প্রয়োজনে প্রাচীন সভ্যতার দ্বারোদ্‌ঘাটন করেছে। সেখান থেকে তারা ক্রমান্বয়ে ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে আধুনিক সভ্যতায় উত্তীর্ণ হয়েছে। সভ্যতার প্রারম্ভে মানুষ খুঁজেছে খাদ্য, নিরাপত্তা এবং নিরাপত্তার জন্য করেছে যুদ্ধ-সংগ্রাম। আর ক্ষুধার তাড়নায় তারা শিকার করেছে বিচিত্র জীবজন্তু, অনেক সময় ভক্ষণ করেছে মানুষ হয়ে মানুষের মাংস। এভাবে তারা একসময় কৃষিকর্ম আবিষ্কার করেছে। এসব করতে গিয়ে যেখানে তার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ বলে মনে করেছে, সেখানেই সে শুরু করেছে পূজা-প্রার্থনা, তন্ত্র-মন্ত্র কিংবা যাদুবিদ্যামূলক পেশা। ফসলের অধিক ফলন কিংবা রোগব্যাধির হাত থেকে ফসল রক্ষা অথবা নিজেকে হিংস্র পশুর হাত থেকে রক্ষার তন্ত্র-মন্ত্র বা আহারের জন্য অধিক শিকার প্রাপ্তির উপায় হিসেবে দেবদেবীর পূজা-প্রার্থনার পেশাও তার কাছে ক্রমান্বয়ে পবিত্র পেশা বলে গৃহীত হয়েছে। এভাবে যুগের পরিবর্তনে, সমাজ সভ্যতার বিবর্তনে মানুষ যখন আদিম-বন্য শিকার সভ্যতা পেরিয়ে কৃষি সভ্যতা তথা আধুনিক সভ্যতায় পদার্পণ করেছে, তখন মানবজীবন কেন্দ্রিক পেশাগুলোরও অনেক ক্ষেত্রে বিবর্তন পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। বলা যায় সমাজ-সভ্যতার এক একটি ধাপ অতিক্রমণের পর পেশাগুলো ক্ষেত্র বিশেষে বিবর্তিত ও পরিবর্তিত কিংবা পেশার নানারকম ডালপালা বিস্তৃত হয়েছে। সারাদিনের কর্মক্লান্তি নিরসনে যেমন নাচ-গান-আনন্দানুষ্ঠান কিংবা ফসল-পশু সংরক্ষণে লোকনিয়োগ অথবা দেবতার অভিশাপ মুক্তিতে বা জীবনের দুঃখ মোচনে পূজা-প্রার্থনায় নাচগানের পেশাও পরিচর্যিত হয়েছে নানাভাবে। এমনকি নানা অনুষঙ্গে পৌরোহিত্যের পেশাও উদ্ভূত হয়েছে মানব সমাজে। উচ্চশ্রেণীর বিলাসী জীবনের সাহায্যকারী হিসেবে সৃষ্টি হয়েছে বাঁদী-দাসী-উজির-নাজির-পাইক-পেয়াদা-ধোপা-নাপিত-মালিনী-প্রহরী-কিংবা কৃষক প্রজা।

আবার সমাজ-সভ্যতার বিকাশে অনেক পেশা হারিয়ে গেছে, অনেকগুলো বংশ পরম্পরায় প্রচলিত আছে, আবার অনেকক্ষেত্রে তা অতীতের ভিত্তির উপর নতুন আঙ্গিকে দাঁড়িয়ে গেছে। অতএব অনুভূত হয়, পেশা মানুষের সমাজ-সভ্যতার বিবর্তন-পরিবর্তনে পরিমার্জিত হয়, সমাজের কারণে নতুন নতুন পেশা উদ্ভূত হয় কিংবা হারিয়ে যায় অথবা কোনো কোনো পেশা বংশ পরম্পরা রক্ষা করেই চলে। আর এই পেশার ভিত্তিতেই সমাজ-সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং সমাজ সম্পর্কই সংস্কৃতির প্রধান নিয়ামক এবং এর ভিত্তিতেই লোককথাগুলো প্রাণ লাভ করেছে। এজন্যই বোধ করি পল্লব সেনগুপ্ত বলেছেন, 'মনে রাখতে হবে মিথ হলো সভ্যতার ঊষালগ্নের সৃষ্টি; প্রাগৈতিহাসের পালা সেরে আসার পর টেল গড়ে ওঠে; সভ্যতার উন্নততর স্তরে লিজেণ্ডের আবির্ভাব। পরবর্তী সময়ে লোকপুরাণ আবার ধ্রুপদী পুরাণে যখন পরিণতি পায় অনেক সময়, তখন তার মধ্যে টেল (এবং লিজেণ্ড তো বটেই) এসে সংযুক্ত হয়।'[১] একথা থেকে অনুভূত হয় যে, অনুরূপভাবে সামাজিক স্তর বিন্যাসে পেশাগুলোও সভ্যতার এক স্তর থেকে আর এক স্তরে এসে লোককথার বিস্তৃতি ও বিকাশের ক্রমধারা পরিস্ফুট করেছে। একথা সমর্থন করেন ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য, ড. আশরাফ সিদ্দিকী, এমনকি থম্পসন পর্যন্ত। 'লোককথা এমন এক শক্তিমান শিল্পমাধ্যম যার উৎস প্রাচীন আদিম সমাজের নানামুখী ধ্যানধারণা, প্রয়োজন-আত্মরক্ষার, ধর্ম অধর্মের ধূসর অতীত থেকে, এবং যার অনায়াস বিস্তার বর্তমান থেকে ভবিষ্যতের দূরবর্তী অজানায়।'[২] এ কথা বাংলাদেশের পেশা ও পেশাজীবী মানুষের সামগ্রিক জীবনের বেলায়ও প্রযোজ্য।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন পেশা পরিলক্ষিত হয়। এসব পেশা সেইসব দেশের আবহাওয়া, জলবায়ু, ভূ-প্রকৃতি, নদী-নালা, পাহাড়-পর্বত, উদ্ভিদ, প্রাণী, জাতি, ধর্ম, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রভাবে গড়ে উঠেছে। একই কারণে তাদের সংস্কৃতি ও সমাজ ব্যবস্থার ভিন্নতাও দৃষ্টিগোচর হয় এবং সেই অনুসারে তাদের পেশাও প্রচলিত হয়েছে। অর্থাৎ 'পরিবেশের ভিন্নতার কারণে জীবনযাত্রা প্রণালী ও পেশার বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। শীতপ্রধান দেশের লোকেরা একটু বেশি পরিশ্রমী ও কর্মঠ হয়। আবার গ্রীষ্ম প্রধান দেশের লোকেরা কম পরিশ্রমী ও কর্মবিমুখ হয়। যে সমস্ত স্থানের জমি উর্বর, বৃষ্টিপাত নিয়মিত হয়, ফসল উৎপাদন পর্যাপ্ত, ভূমি সমতল, যাতায়াত ও জীবনযাত্রা সহজ, সে সমস্ত স্থানে গড়ে উঠেছে এক ধরনের সমাজ ব্যবস্থা।গড়ে উঠেছে এক ধরনের বৃত্তি বা পেশা। আবার মরুভূমি ও পাহাড়ি অঞ্চলের আবহাওয়া প্রতিকূল, যেখানে বেশি শীত, অসহিষ্ণু গরম, খাদ্যের প্রচণ্ড অভাব; সেখানে ভিন্ন ধরনের সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। সৃষ্টি হয়েছে ভিন্নধর্মী পেশার।'[৩] সে হিসেবে নদীমাতৃক পলিমাটি সমৃদ্ধ সুজলা সুফলা কৃষিভিত্তিক বাংলাদেশের পেশাও প্রচলিত হয়েছে। আর এই কৃষিপ্রধান দেশের পেশার ভিত্তিতেই বাংলা লোকসাহিত্য তথা লোককথাগুলো সৃষ্টি হয়েছে।

ভূমণ্ডলের কারণে বাংলাদেশ নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের নদীমাতৃক পলিমাটি সমৃদ্ধ কৃষি প্রধান দেশ। এখানকার আবহাওয়া ও মাটি সবুজ শস্যের উপযোগী। ধান ও পাট এখানকার প্রধান শস্য। আর কৃষি হলো প্রধান পেশা। এই কৃষিকে কেন্দ্র করে এদেশে আরো অনেক পেশা প্রচলিত হয়েছে। কৃষিকে কেন্দ্র করে রাজা-বাদশা-শাহ্-সামন্ত প্রশাসনজনিত কিছু পেশা প্রচলিত হয়েছে। রাজবাড়ি, রাজদরবার, নিরাপত্তা, কর আদায়, নাচ-গান, আনন্দরস উপভোগ, শিক্ষা-দীক্ষা, পূজা-অর্চনা, জ্যোতিষ গণনা, রোগ ব্যাধি নিরাময়, খোশ গল্প আসর, বিয়ে-শাদী ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু পেশা জন্ম নিয়েছে। আবার দেশের সাধারণ মানুষের জীবন ধারণের জন্য বহু সংখ্যক পেশা প্রচলিত হয়েছে। বলা যায় এই পেশাগুলো পরস্পর সম্পূরক এবং এক অর্থে বলা যায় মানুষ মানুষের জন্যই পেশার সৃষ্টি কিংবা পরিবর্তন অথবা পেশার ঐতিহ্যগত পরম্পরা রক্ষা করে চলেছে। অনেকেই এইসব পেশার শ্রেণীকরণ করেছেন। যেমন উচ্চশ্রেণীর ও নিম্নশ্রেণীর। সমাজের স্তর বিন্যাসে ধর্ম, বর্ণ, শিক্ষা, বিত্ত অনুসারে পেশার শ্রেণীকরণ হয়েছে। এদিক থেকে উচ্চশ্রেণী, মধ্যশ্রেণী এবং নিম্নশ্রেণীর পেশার বর্ণনা দেওয়া যায়।

ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় বলেন যে, বর্ণপ্রথাকে কেন্দ্র করে হিন্দু সমাজ বিচিত্র বর্ণ, উপবর্ণ ও সংকর বর্ণের সামাজিক স্থান নির্ণয় করেন। অথচ এ ধরনের বর্ণ প্রথা কেন্দ্রিক সামাজিক স্তর নির্ণয় আর্য পূর্বকালের বাংলায় ছিল না। নীহাররঞ্জনের ভাষাতেই বলা যায়,

> চতুর্বর্ণের বহির্ভূত অসংখ্য বর্ণ ও কোমের নরনারীর সঙ্গে চতুর্বর্ণধৃত নরনারীর যৌন মিলনের ফলে সমাজের যে বিচিত্র বর্ণ ও উপবর্ণের, বিচিত্রতর সংকর বর্ণের সৃষ্টি করা হইয়াছে, তাহা একান্তই অনৈতিহাসিক এবং সেইহেতু অলীক। তৎসত্ত্বেও স্বীকার করিতেই হয়, আর্য-ব্রাহ্মণ্য ভারতীয় সমাজ আজও এই যুক্তি-পদ্ধতিতে বিশ্বাসী, এবং সুদূর প্রাচীন কাল হইতে আদি চতুর্বর্ণের যে কাঠামো ও যুক্তি পদ্ধতি অনুযায়ী বর্ণব্যাখ্যা হইয়া আসিয়াছে সেই ব্যাখ্যা প্রয়োগ করিয়া হিন্দু সমাজ আজও বিচিত্র বর্ণ, উপবর্ণ ও সংকর বর্ণের সামাজিক স্থান নির্ণয় করিয়া থাকেন। বাঙলাদেশেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। এই সব বিচিত্র বর্ণ, উপবর্ণ, সংকর বর্ণ সকল কালে ও ভারতবর্ষের সকল স্থানে এক প্রকারের ছিল না, এখনও নয়; সকল স্মৃতিশাস্ত্রে সেইজন্য এক প্রকারের বিবরণও পাওয়া যায় না। প্রাচীন স্মৃতি কথাগুলির একটিও বাঙলাদেশে রচিত নয়; কাজেই বাঙলার বর্ণ বিন্যাসগত সামাজিক অবস্থার পরিচয়ও তাহাতে পাওয়া যায় না; আশা করাও অযৌক্তিক এবং অনৈতিহাসিক। বস্তুত, একাদশ শতকের আগে বাঙলাদেশের সামাজিক প্রতিফলন লইয়া একটিও স্মৃতিগ্রন্থ বা এমন কোনও গ্রন্থ রচিত হয় নাই যাহার ভিতর সমসাময়িক কালের বর্ণ বিন্যাসের ছবি কিছু মাত্র ধরা যাইতে পারে। বিশ্বাসযোগ্য ঐতিহাসিক সাক্ষ্য-প্রমাণ স্বীকার করিলে বলিতেই হয়, এই সময় হইতেই বাঙালী স্মৃতি ও পুরাণকারেরা সজ্ঞানে ও সচেতনভাবে বাঙলার সমাজ ব্যবস্থাকে প্রাচীনতর ব্রাহ্মণ্য

স্মৃতির আদর্শ ও যুক্তি পদ্ধতি অনুযায়ী ভারতীয় বর্ণবিন্যাসের কাঠামোর মধ্যে বাঁধিবার চেষ্টা আরম্ভ করেন। কিন্তু এই সজ্ঞান সচেতন চেষ্টার আগেই, বহুদিন হইতেই আর্য প্রবাহ বাঙলাদেশে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করে, এবং আর্য ধর্ম ও সংস্কৃতির স্বীকৃতির সঙ্গে সঙ্গেই বর্ণাশ্রমের যুক্তি এবং আদর্শও স্বীকৃতি লাভ করে।[৪]

আর এই বর্ণপ্রথা স্বীকৃতি লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে বাংলার মানুষের পেশাগুলোও উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীর কিংবা মধ্য শ্রেণীর বলে আখ্যায়িত হতে থাকে। তদ্‌সঙ্গে মানুষের মর্যাদাও উঁচু-নীচু হয়ে যায় এবং এর প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ে বাংলা লোককথাগুলোতে। নীহাররঞ্জন রায় বিত্তের মাধ্যমে প্রাচীন বাংলার পেশাভিত্তিক মানুষের সামাজিক স্তর ও মর্যাদার মূল্যায়ন প্রসঙ্গেও বলেন,

নানা বর্ণ, নানা জাতি এবং নানা শ্রেণীর অগণিত ও অলিখিত জনসমষ্টি হইয়া প্রাচীন বাঙলার যে সমাজ, তাহার পরিকল্পনা এবং সংস্থানে যে ধন প্রয়োজন হইত, তাহা আসিত কোথা হইতে? একটু ভাবিয়া দেখিলেই দেখা যাইবে, যাঁহারা রাজসরকারে চাকরি করিতেন, লেখমালায় যাঁহাদের বলা হইয়াছে রাজপাদপোজীবী, তাঁহারা ধন উৎপাদন করিতেন না, উৎপাদিত ধনের অংশ মাত্র ভোগ করিতেন, শ্রম ও বুদ্ধির বিনিময়ে। শিক্ষাবৃত্তি ছিল যাঁহাদের, ধর্মানুষ্ঠানের পুরোহিত ছিলেন যাঁহারা, সমাজের তথাকথিত হেয় কর্ম ইত্যাদি যাঁহারা করিতেন, তাঁহারাও যতটুকু পরিমাণে নিজ নিজ বিশেষ বৃত্তির মধ্যে আবদ্ধ থাকিতেন ততটুকু পরিমাণে এ ধনোৎপাদনের দায় ও কর্তব্য হইতে মুক্ত ছিলেন। কিন্তু উৎপাদিত ধনের অংশ তাঁহারা ভোগ করিতেন, শ্রম ও বুদ্ধির বিনিময়ে ...... সোজাসুজি প্রত্যক্ষভাবে ধনোৎপাদন ইহারা কেহই করেন না বটে, তবে পরোক্ষভাবে ধনোৎপাদনে সাহায্য সকলকেই কিছু না কিছু করিতে হয়, কোনও না কোনও উপায়ে। সমাজ বিবর্তনের ইতিহাসের সঙ্গে যাঁহাদের পরিচয় আছে, তাঁহারাই একথা জানেন।

তাহা হইলে প্রশ্ন দাঁড়াইতেছে, ধনোৎপাদনের উপায় কী কী? প্রাচীন বাঙলায় দেখিতেছি, ধনোৎপাদনের তিন উপায়: কৃষি, শিল্প এবং ব্যবসা-বাণিজ্য। ইহাদের মধ্যে কৃষি ও বাণিজ্য প্রধান; আজ পর্যন্তও বাঙলাদেশে কৃষিপ্রধান ধন সম্বল, তারপরেই শিল্প। এই কৃষি ও শিল্পজাত জিনিসপত্র লইয়া দেশে-বিদেশে ব্যবসা বাণিজ্যের ফলে উৎপাদিত ধনের বৃদ্ধি এবং দেশের বাহির হইতে নূতন ধনের আগমন হইত। এই তিন উপায়ে আহৃত যে ধন তাহাই প্রাচীন বাঙলার ধন-সম্বল। এবং এই ধন-সম্বলের উপরই সমাজ, রাজা, রাষ্ট্র, ধর্ম, শিক্ষা, শিল্প, সংস্কৃতি সবকিছুর প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ।[৫]

এ উদ্ধৃতি বিশ্লেষণে বাঙালি সমাজজীবনের নানাবিধ পেশার শ্রেণীবিন্যাস এবং বাংলাদেশের পেশার কার্যকারণ সবকিছুই যে কৃষি পেশার উপর নির্ভরশীল এ কথা উপলব্ধি করা যায়। অনুভব করা যায়, বাংলাদেশের আর্যপূর্বকালের সামাজিক স্তর বিন্যাসের সঙ্গে সম্পর্কিত পেশাগুলোও আর্যকালে কিংবা তারপরে নানারকম দ্বন্দ্ব সংঘর্ষে বিবর্তিত পরিবর্তিত, পরিমার্জিত, সমন্বিত ও বিকশিত হলেও তা কৃষি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়নি। এজন্যই দেখা যায়, বাঙালির কৃষিভিত্তিক সমাজের চিন্তা-দর্শন-কল্পনার

উপর ভিত্তি করে তার পেশা ও সাহিত্যগুলোও গড়ে উঠেছে। অতএব, তার মধ্যে এদেশের, সমাজের, সংস্কৃতির এবং সভ্যতার বিবর্তন পরিস্ফুটিত না হয়ে পারে না। আর সে পেশা ও সাহিত্যে রাজদরবার থেকে আরম্ভ করে পল্লীর পর্ণকুটির পর্যন্ত বিস্তৃত। এ বিস্তারে লোককথার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্ববহ।

বাংলার সমাজ মূলত আদি অস্ট্রাল নৃগোষ্ঠীর স্তম্ভের উপর, দ্রাবিড়, মোঙ্গলয়েড, আলপাইন ও নিগ্রোবটু এবং পরবর্তীকালে বাইরে থেকে আগত আর্য, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ইত্যাদির সামাজিক-সাংস্কৃতিক উপাদান মিশ্রিত হয়েছে। অতএব সেক্ষেত্রে পেশাগুলোরও মিশ্রণ ও সমন্বয় দৃষ্টিগোচর হওয়া অস্বাভাবিক নয়। সেজন্য পেশাগুলোর একটা পারস্পরিক সামঞ্জস্যপূর্ণ ক্রমধারা পরিলক্ষিত হয়। বাঙালির পেশা নির্ধারণের ক্ষেত্রে বলা হয়, বাঙলায় প্রথমে এসেছ অস্ট্রিক, তারপর এসেছে দ্রাবিড়, তারপর আলপাইন এবং তারপর নিগ্রোবটু গোষ্ঠীর মানুষ এবং এদের মনন উৎকর্ষই এদের জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে বিস্তার করে। ড. আহমদ শরীফ বলেন, "কৃষিজীবী ও বৃত্তিজীবী হয় ওরাই। দুর্বল অস্ট্রিক-দ্রাবিড়েরা অনেককাল ছিল ফল-মূল মৃগয়াজীবী ও আরণ্যক। তারা ছিল নিষাদ নামে পরিচিত। কোল, ভিল, মুণ্ডা, সাঁওতাল, কোরওয়া প্রভৃতি আরণ্য ও আদিবাসী উপজাতি আমাদের অস্ট্রিক-দ্রাবিড় জ্ঞাতি। কোচ-রাজবংশীরাও আমাদের জ্ঞাতি। ফল-মূল-মৃগয়াজীবী আরণ্য মঙ্গোলরা অভিহিত হতো কিরাত নামে। কোনো কোনো নৃতাত্ত্বিক বিদ্বানের মতে আলপীয় আর্যভাষাবর্গের জনগোষ্ঠীই বাঙলা-ওড়িশা-বিহারে উন্নত মনন ও আবিষ্কৃত হাতিয়ার প্রয়োগে জীবিকা ক্ষেত্রে প্রাধান্য এবং ক্রমে বিবর্তনের ধারায় প্রতাপে প্রবল হয়ে অন্যদের দাসে ও প্রয়োজনীয় সামগ্রীর যোগানদারে পরিণত করে। এবং এরাই পরবর্তীকালে বৈদিক আর্যভাষী প্রভাবিত সমাজে পেশানুসারে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ রূপে পরিচিত হয়। এই আলপীয় আর্যভাষীরা বৈদিক আর্যভাষীদের অবজ্ঞেয় ছিল অনেককাল। কিন্তু জৈন-ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র, সমাজ ও সরকারভুক্ত হওয়ার পর শাস্ত্রের সমাজের সরকারের আশ্রয়ে ও প্রশ্রয়ে নিজেরা হয়ে ওঠে শাসক-শোষক গোষ্ঠীর অনুগ্রহজীবী ও শরিক। কালে বর্ণে বিন্যস্ত ব্রাহ্মণ্য সমাজে তারা হল তথাকথিত গুণে-মানে মাহাত্ম্যে উচ্চবিত্তের ও উচ্চবর্ণের সুখী মানুষ এবং নিম্নবর্ণের নিম্নবৃত্তির ও নিঃস্ববিত্তের দুর্বল অজ্ঞ মানুষের সেব্য ও প্রভু।

আর অস্ট্রিক-দ্রাবিড়বর্গের নরগোষ্ঠীরা রক্তসঙ্কর হয়ে স্বাতন্ত্র্য হারিয়েও আড়াই হাজার বছর ধরে রইল আত্মোন্নয়নের সুযোগ বঞ্চিত ও জীবিকা নির্বাচনের অধিকাররিক্ত স্বল্প আয়ের অবজ্ঞেয় বৃত্তিজীবী ও অস্পৃশ্য প্রাণী হয়ে।

এদের মধ্যে যারা ঐ ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থদের ঘরে-সংসারে প্রাত্যহিক জীবনের আহার্য ও আবশ্যিক সামগ্রী যোগায় এবং যাদের প্রত্যক্ষ সেবা ও শ্রম ঘরে-সংসারে

অপরিহার্য, তারাই পেল জলাচার যোগ্যরূপে কিছুটা অনুগ্রহ। তারাই সদগোপ, নাপিত, ধোপা, স্বর্ণকার, কর্মকার, কুম্ভকার, গোপালক প্রভৃতি।

অন্যরা মুচি, মেথর, চাঁড়াল, বাগদী, কৈবর্ত, হাড়ি, ডোম, কাপালী প্রভৃতি রইল অস্পৃশ্য হয়ে। ইতোমধ্যে জৈন-বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য-ইসলাম প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রও এদেরকে সমাজভুক্ত করতে পারেনি।"[৬]

সেন আমলে সমাজের সর্বোচ্চ শ্রেণীতে ছিল ব্রাহ্মণ, তারপর কায়স্থ, তারপর বৈশ্য এবং সর্বনিম্নে শূদ্র। এদের কারো সঙ্গে কারো সামাজিক সম্পর্ক বা লেনদেন নিষিদ্ধ ছিল। তবে মুসলিম আমলে সমাজে ব্রাহ্মণদের একাধিপত্য ও অধীনতা থেকে সাধারণ মানুষ অনেকটা মুক্তি পায় এবং 'সমাজে তাদের জীবন ও মর্যাদার উন্নতি বিধানের জন্য তাদেরকে বহু অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে। ব্রাহ্মণরা তাদের একচেটিয়া অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা হারিয়ে ফেলে এবং বাংলাদেশে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে তারা বুদ্ধিবৃত্তিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে অন্যান্য বর্ণের হিন্দুদের সঙ্গে প্রতিযোগিতামূলক অবস্থার সম্মুখীন হয়। এভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে একাধিপত্যের সুযোগ-সুবিধা হারিয়ে ব্রাহ্মণরা বিভিন্ন পেশা অবলম্বন করে। এ সমস্ত পেশা ব্রাহ্মণ সমাজে তাদের মর্যাদা নির্দেশ করে। এরূপ ব্রাহ্মণরা তাদের পেশার ভিত্তিতে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং তারা গ্রামের বা শহরের বিভিন্ন মহল্লায় বসবাস করে।"[৭] এই ধরনের ব্রাহ্মণদের মধ্যে রয়েছে অভিজাত শিক্ষিত ব্রাহ্মণ, এরা মন্দির ও টোলকে জীবিকার উত্তম উপায় হিসেবে বেছে নেয়। এদের মধ্যে যারা অশিক্ষিত ব্রাহ্মণ তারা পুরোহিত হিসেবে পূজার আচার-অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে থাকে। এরা কপালে সিঁদুর-চন্দনের ফোঁটা দেয়, এবং ভিক্ষা করে জীবিকা অর্জন করে। এরা যে অঞ্চলে বসবাস করে সে অঞ্চলের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান উপলক্ষে মন্ত্রপাঠ করে দক্ষিণা পায়। এমনিভাবে আর এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ঘটকের পেশাও অবলম্বন করে। লোককথায় পেশাজীবী হিসেবে ব্রাহ্মণদের ভূমিকাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

বাংলার সমাজ বিকাশে পেশা হিসেবে কৃষিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে আহমদ শরীফ বলেন,

> কৃষিজীবী স্থায়ী ও স্থির নিবাসী সমাজেই সংস্কৃতি-সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে। ফল-মূল-মৃগয়াজীবী যাযাবর ও আরণ্য সমাজে সভ্যতার বিকাশ ঘটতে পারে না। যাযাবর কিংবা পথিক জীবনে প্রয়োজন সঙ্কুচিত করতে হয়, কেননা বোঝা মাত্রই চলমানতার বাধা স্বরূপ। তাই স্থির ও স্থায়ী নিবাস না হলে আকাঙ্ক্ষার প্রসার, চাহিদার বিস্তার ও উপকরণের বৃদ্ধি ঘটে না। এজন্যেই কৃষিজীবী মানুষ বা সমাজই একসময় গুণে-মানে-মাহাত্ম্যে ছিল শ্রেষ্ঠ। তাই সংস্কৃতিবাচক শব্দ 'কৃষ্টি' ছিল কর্ষণ সম্পৃক্ত। ক্রমে সমাজ বিকাশের ও সমাজ বিবর্তনের ধারায় হাতিয়ার প্রয়োগ নৈপুণ্যে ও বাহুবলে, জনবলে কিংবা বুদ্ধিবলে যারা প্রবল, তাদের প্রভাবে ও প্রতাপে তাদেরকে পরশ্রমজীবী

অবসরভোগী সেবাগ্রাহী হবার সুযোগ করে দিল তারা হয়ে উঠলো শোষক ও শাসকশ্রেণী। তখন শ্রমসাধ্য কর্ষণ হল ঘৃণ্য, কিন্তু ভূমির বা জমির মালিক হওয়াটাই হল গৌরবের, গর্বের ও মানের এবং দর্প-দাপটের উৎস। এমনিভাবে চাষী হল প্রজা ও শাসনপাত্র আর ভৌমিক বা জমিদার হল মান্য প্রভু।

আমাদের দেশে এভাবেই গণমানব শাস্ত্রপতির, সমাজ সর্দারের ও শাসন কর্তার এবং তাদের গণগোষ্ঠীর শাসন-শোষণ-পীড়ন-পেষণের পাত্র ও শিকার হয়েছে। শাস্ত্রপতি, সমাজপতি, ও শাহ্ সামন্তরাই ছিল গণমানবের দণ্ডমুণ্ডের মালিক। এ ছিল একপ্রকার দাস প্রথা। জানে মানে কোনো অধিকার ছিল না গণমানবের, শাস্ত্র-সমাজ ও সরকার নির্দিষ্ট গতর-খাটানো বৃত্তিতে নিযুক্ত থেকে কলুর বলদের মতো খেয়ে না খেয়ে, বুঝে না বুঝে, জেনে না জেনে জীবনপাত করতে হত তাদের অকালে। ঋণের দায়, খাজনার দায় ও পীড়ন ভয় এড়ানোর জন্যে নিঃস্ব নিঃসহায় মানুষ সে যুগে সপরিবারে পালিয়ে বেড়াত ভৌমিকের অধিকারে।[৮]

এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ জ্যোতিষী পেশাজীবী, এরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে মানুষের ভাগ্য গণনা করে জীবিকা অর্জন করে। এমনিভাবে বাংলার সমাজে রোগ ব্যাধি নিরাময়ের জন্য বৈদ্য আছে, আবার বৈদ্যদের অনেকেই খ্যাতি অর্জন করে রাজদরবারেও নিয়োগ প্রাপ্ত হয়েছে। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে ব্রাহ্মণদের অনেকেই ডাকাতি পেশা গ্রহণ করে অধঃপতিত হয়। লোককথায় ডাকাতি পেশাও পরিলক্ষিত হয়।

কায়স্থরা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পেশাজীবী এবং বুদ্ধিজীবী হিসেবে বিদ্যাবুদ্ধি দিয়ে সরকারী কর্মচারী, জমিদার ও রাজস্ব ইজারাদার হিসেবে সমৃদ্ধি লাভ করে এবং সমাজে মর্যাদার আসনে বসে। এদের মধ্যে অনেকে শঠতার পরিচয়ও দিয়েছে। এমনিভাবে বাংলার সমাজে পেশাজীবী হিসেবে আমরা পাই স্বর্ণকার, কুসীদজীবী, এর পরেই আমরা বৈশ্যদের কথা ভাবতে পারি। "বৈশ্যরা ছিল বেশির ভাগই কৃষক ও ব্যবসায়ী। এদের মধ্যে কেউ জমি চাষ করে, কেউ গাভী চরায়, কেউ গরুর গাড়ি চালায়, কেউ মৌসুমের ফসল ক্রয়-বিক্রয় করে। আবার কেউ মূল্যবান পাথর ক্রয়-বিক্রয় করে, দেশ-বিদেশে নৌকায় বাণিজ্য করে।"[৯] এই বাণিজ্যের বহরের উপর ভিত্তি করে অনেকগুলো গল্প সৃষ্টি হয়েছে—যাতে বাংলার ঐতিহ্য প্রতিফলিত।

জে. এন. দাসগুপ্ত তাঁর Bengal in the Sixteenth Century' গ্রন্থে শূদ্রদের সম্পর্কে বলেছেন যে, 'সমাজে শূদ্ররা কৃষক অথবা শ্রমিক। এই পেশার ভিত্তিতে তারা নানান শ্রেণীতে বিভক্ত'। এদের মধ্যে তাঁতী, নাপিত, কামার, কুমার, ছুতার, ধোপা ইত্যাদি পরিলক্ষিত। এদেরকেই বহিরাগত শক্তিশালী জাতিগোষ্ঠীরা এদেশে এসে বিজয়ের গর্বে ছোট জাত বলে ঘৃণা করেছিল। এক পর্যায়ে সমন্বিত বাঙালিদেরকেই তারা অস্পৃশ্য, বর্বর, ছোট জাত বলে গালি দিত। অর্থাৎ 'মুসলমানদের বাংলা বিজয়ের প্রাক্কালে, হিন্দু সমাজ অধঃপতিত ছিল। অব্রাহ্মণদের উপর, বিশেষ করে নিম্নবর্ণের হিন্দু ও বৌদ্ধদের উপর ব্রাহ্মণদের অত্যাচারই ছিল না, সব রকমের দুর্নীতি

ও অনাচার সামাজিক জীবনকে কলুষিত করেছিল। সমসাময়িক সংস্কৃত সাহিত্য সেকালের লোকদের নীতিহীনতার চিত্র তুলে ধরেছে। কবি ধোয়ীর 'পবনদূত' ও কবি সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' থেকে জানা যায় যে, সেন রাজারা মন্দিরের সেবায় 'দেবদাসী ও যুবতী ব্রাহ্মণ বিধবাদের নিয়োগ করার প্রথা প্রবর্তন করেন। এতে উচ্চশ্রেণীর ও প্রভাবশালী হিন্দুদের উপভোগের জন্য একটি উপাদানের সংস্থান হয়। ফলে হিন্দু সমাজের নৈতিকতার পতন ঘটে এবং দুর্নীতি ও অনাচার সামাজিক জীবনের সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়ে। হিন্দুদের বর্ণপ্রথা উচ্চশ্রেণীর লোকদের শূদ্র রমণী বিয়ে করতে অনুমতি দেয় না। কিন্তু এ প্রথা একজন ব্রাহ্মণকে শূদ্র রমণীর সঙ্গে যৌনাচার করা থেকে নিবৃত্ত করেনি।'[১০]

এ কথাগুলো থেকে অনুভূত হয় সমাজের অসহায় দরিদ্র রমণীরাই সেদিন বাধ্য হয়ে বাঈজী, পতিতা বা দেবদাসীর মত এক মর্মান্তিক পেশাজীবী হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়। আধুনিক যুগে এদেরকেই বলা হয় যৌনকর্মী। এই যৌনকর্মী সৃষ্টিতে মুসলিম রাজা-বাদশারাও কম যায়নি। তারাও মহলে উপপত্নী রাখতো এভাবেই। দু' একটি লোককথায় পতিতাবৃত্তির পেশাও পরিলক্ষিত হয়। সামন্ত প্রভুরাতো রূপজমোহে প্রায়ই বলপ্রয়োগে বিয়ে শাদীর বিষয়টিও সমাধা করতো এবং তার চিত্রও লোককথায় দুর্লক্ষ্য নয়।

ব্রাহ্মণরা বর্ণপ্রথার মাধ্যমে পেশা নির্ধারণের পর উপবর্ণ প্রথার মাধ্যমেও পেশা নির্ধারণ ও পেশার শ্রেণী বিভাগ করেছে। যেমন—

১. উত্তম সংকর পর্যায়ের বিশটি উপবর্ণ,

২. মধ্যম সংকর পর্যায়ের বারটি উপবর্ণ,

৩. অধম সংকর পর্যায়ের নয়টি উপবর্ণ;

এইসব উপবর্ণ কেন্দ্রিক পেশাগুলো হলো যথাক্রমে করণ বা পুস্তক লেখক, অম্বষ্ঠ বা বৈদ্য, উগ্র বা যুদ্ধবিদ্যা, মগধ বা সংবাদবাহী, তাঁতী, গন্ধবণিক বা বেণে, নাপিত, গোপ বা লেখক, কামার, তৈলিক বা সুপারী ব্যবসায়ী, কুমোর, কাঁসারী, শাঁখারী বা শংখকার, ভূমিদাস (কৃষি এদের কাজ) বা চাষী, বারজীবী (পানের বরজ উৎপাদনকারী), মোদক (ময়রা), মালাকার, সূত বা চারণগায়ক, রাজপুত্র, পান বিক্রেতা বা তাম্বলী ইত্যাদি। এছাড়া মধ্যম সংকর থেকে রয়েছে খোদাইকার, রজক, স্বর্ণকার, সুবর্ণবণিক, আভীর বা গোরক্ষক (রাখাল), তেলী, ধীবর, শুঁড়ি, নট (যারা নাচে খেলা ও বাজি দেখায়), শাবাক, শেখক, জেলে বা জালিক ইত্যাদি। অধম সংকর নির্ভর পেশাগুলো হলো মলেগ্রহী (বা বঙ্গবাসী সংমলেগ্রহী) কুড়র, চণ্ডাল বা চাঁড়াল, বাউড়ী, তক্ষণকার, চর্মকার বা চামার, খেয়াঘাটের মাঝি (ঘট্টজীবী), ডুলি, বেহারা, মল্ল বা মালো, পটুয়া বা চিত্রকর, রাজমিস্ত্রী, কোটক (ঘরবাড়ি তৈরি করে যারা), তীবর, তৈলকার, লেট, মল্ল, পৌণ্ডক (পোদ), চামার, কসাই, রাজপুত্র বা রাউত, কৈবর্ত (কলিযুগের ধীবর) রজক, কৌয়ালী, গঙ্গাপুত্র, যুগী এবং আগরী ইত্যাদি। এছাড়াও

রয়েছে গায়ক-গায়েন, বাদক বায়েন, কবি-কবিয়াল, শস্য-মাপজোখকারী কয়াল, বেহারা বা পাল্কিবাহক-জেলে-নিকারি ইত্যাদি। এছাড়াও রয়েছে পুরোহিত, কুলপঞ্জি পাঠকম, ঠিকুজী বা কুষ্ঠি গণক, বৈদ্য, কৃষক, গোয়ালা, তেলী, কাসারু, মালী, বারুই (পানচাষী), নাপিত, বাউরী (গ্রাম্য গায়ক), বাগদী (গ্রামের যোদ্ধা), ধোপা, দর্জি, ছুতার, ধীবর, চণ্ডাল এরা সব শহর ও পল্লীর শেষ প্রান্তের অধিবাসী। উপরন্তু বন জঙ্গল কেন্দ্রিক পেশাও বাংলাদেশে দৃষ্টিগোচর হয়। যেমন মধুসংগ্রহকারী বা মৌয়াল, কাঠকুড়ানি, লবণ উৎপাদনজনিত পেশা ইত্যাদি। এছাড়া বিভিন্ন আমলে বিভিন্ন রকম প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে এবং সেইসব প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রিক পেশা নির্ধারিত হয়। যেমন মন্দিরের পুরোহিত সেবায়েত, মসজিদের খাদেম, ইমাম, মুয়াজ্জিন, এমনকি বৌদ্ধ বিহারের ওস্তাগার, মৃৎশিল্পীদের অস্তিত্ব অনুমান করা যায়। এছাড়া বাঁশ-বেতের কারিগর, কাঠমিস্ত্রী, এছাড়াও বিভিন্ন বিভাগকেন্দ্রিক পেশা জন্ম নিয়েছে। যেমন বিচার বিভাগ, শান্তি রক্ষা বিভাগ, সৈন্য বিভাগ ইত্যাদি। এসব পেশাজীবীর উপস্থিতি লোককথার উপজীব্য বলে গণ্য হয়েছে।

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের 'ঠাকুরমার ঝুলি' ও 'ঠাকুর দাদার ঝুলি' কিংবা লাল বিহারী দে'র 'বাংলার উপকথা' উপেন্দ্রকিশোর রায়-এর 'টুনটুনির বই', জসমীউদ্‌দীনের 'বাঙালির হাসির গল্প' ইত্যাদি গ্রন্থে যে সমাজ-মানুষের পরিচয় পাই তাতে বাংলার আদিকাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত পেশার হুবহু সাদৃশ্য বিদ্যমান। এজন্য লোককথার পেশা সমূহের খানিকটা উল্লেখ করেই আলোচনার গভীরে প্রবেশ করা প্রয়োজন। বাংলা লোককথামূলক গ্রন্থ 'ঠাকুর দাদার ঝুলি'তে পেশাজীবীদের মধ্যে রয়েছে যথাক্রমে—

'ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, সাধু-সন্ন্যাসী, খনক, গণক, সেপাই, লস্কর, জ্যোতিষী, মাঝিমাল্লা, রাখাল, সওদাগর, দাস-দাসী, বাদ্যকর, গোপ; কোটাল, শিক্ষাগুরু, ভিক্ষুক, ডাকাত, ঘেসেরা (ঘোড়ার ঘাস কাটে যারা), মালী-মালিনী, ঢালী, ঢাকী; প্রহরী, কুমার, পটুয়া, যাদুকর, তাঁতী, ওঝা, উজির, নাজির, ধাই, মাঝি, ঘটক, জেলে, কলু, বেণে, ঘুঁটে কুড়ানী, বাদ্যকর, কাঠুরিয়া, পাখি শিকারী ইত্যাদি।'

আর 'ঠাকুরমার ঝুলি'তে রয়েছে যথাক্রমে—পাইক-পেয়াদা, ব্রাহ্মণ-সন্ন্যাসী, সেপাই, লস্কর, বাঁদি-দাসী, ঘুঁটে কুড়ানী, ইয়ারী, ছুতোর, মাঝি-মাল্লা, কৃষক, ঘেসেড়া, রাঁধুনী, মন্ত্রী, পাত্র-মিত্র, বাঁদী-দাসী, রাখাল, জল্লাদ, বেহারা, মুনি, কৃষাণ, ভিখারিনী, কাঠকুড়ানী, তাঁতী, সওদাগর, কোটাল, ছুতোর, জেলে, নাপিত, পুরোহিত, ঢুলি, কামার, কুমার, কাঠুরিয়া, চোর, পাটনি ইত্যাদি। লোককথায় এসব পেশাজীবী মানুষের চিত্র দেখলেই মনে হয় বাংলার মানুষের বাস্তব জীবনের প্রতিচ্ছবি যেন তাতে প্রতিফলিত। মনে হয় এই বস্তুনিষ্ঠ জীবনের অন্তর ছুঁয়েই গল্পের পাত্র-পাত্রী নির্ধারিত হয়েছে। আমরা প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তসহকারে বিষয়টি বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করবো।

বাংলার উপন্যাস 'ঠাকুরদাদার ঝুলি' গ্রন্থে কাহিনীর পাঁচটি স্তর আছে। এই স্তরগুলি হল পাঁচটি যথাক্রমে 'মধুমালা', 'পুষ্পমালা', 'মালঞ্চমালা', কাঞ্চনমালা' এবং শঙ্খমালা'।

'মধুমালা' গল্পটিতে রাজা, উজির-নাজীর, সন্ন্যাসী, শাস্ত্রী-সিপাই, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, খনক, গণক, পাইক, পেয়াদা লস্কর, কুঠারী, কোদালী, মাল, পালোয়ান, কারিগর (রাজমিস্ত্রী), করাতী, প্রহরী, দুয়ারী, ভাট ব্রাহ্মণ, পাত্র-মিত্র, ভিখ-ফকির, পুরুত, পণ্ডিত, যোগী জ্যোতিষী, দাই, শিকারী, রাজা-বাদশাদের বিলাসী শিকার বৃত্তি, মাঝি-মাল্লা, রাখাল, গোপ (ঘোষ), ঝাড়ুদার, দাসদাসী, ধাই, এয়ো ইত্যাদি পেশার মানুষ পরিলক্ষিত হয়।

মূলত গল্পগুলোতে রাজপরিবেশের পেশাজীবী থেকে আরম্ভ করে পল্লীর সাধারণ পেশাজীবী মানুষের জীবন পর্যন্ত পরিস্ফুট হয়েছে। যেমন—

> এক দেশের এক রাজা। রাজার গম্-গম্ রাজপুরী... সৈন্য সামন্ত লাঠ লস্করে ধরেনা। রাজার একচ্ছত্র রাজপাট। রাজার ঘরে হীরায় মানিকে কথা বাঁটে, স্বর্গের দেবতা রাজার দুয়ারে দুয়ারী খাটে। কিন্তু এত থাকিয়াও রাজার সুখ নাই। রাজা অপুত্রক। রাজপুরীর সাত-সলিতা ঘিয়ের বাতি নিবু নিবু! রাজত্ব আর থাকে না। দিনে দিনে দেশে দেশে রাজার আঁটকুড়ে নামে ঢি ঢি পড়িল।
>
> একদিন রাজপুরীর ঝাড়ুদার ভোর রাত্রে পুরীর আঙ্গন ঝাঁট দেয়। চেতন পাইয়া রাজা কবাট ঘুচাইতেই দেখেন, ঝাড়ুদার খোলার মালি! "রা-মঃ!!"
>
> মাথা তুলিয়া মারি দেখে, রাজা। তাড়াতাড়ি চোখে-মুখে হাত দিয়া বারো দেবতা স্মরণ করিয়া মালী আপন মনে বলিয়া উঠিল "আঃ-।"
>
> "রাত না পোহাতে দেখিলাম আঁটকুড়ের মুখ ভোজনে নাই সুখ, কপালে আজ অনেক দুঃখ।' কথা রাজার কানে গেল রাজা বলিলেন হাঃ-! খোলার মালি ঝাড়ুদার, তাহার কাছেও আমি অনামুখো আমার মুখ অযাত্রা।' (মধুমালা, পৃ. ৩৩-৩৪)

উদ্ধৃত অংশটুকুতে রাজার পরিবেশ, তাঁর মানসিক কষ্ট, সেই পরিবেশে তারই নিযুক্ত ঝাড়ুদার সমাজে প্রচলিত কুসংস্কারাচ্ছন্নতায় দেশের সমস্ত দণ্ডমুণ্ডের কর্তার মুখ দেখে অমঙ্গল আশঙ্কায় তাঁকে উপেক্ষা করেছে। রাজার এই অপরিসীম দুঃখ থেকে বাঁচার পথ বাতলিয়ে দিল এক সন্ন্যাসী। তার অলৌকিক চিকিৎসায় ঘরে সন্তান এলো। সেই সন্তানই গল্পের নায়ক মদনকুমার। সে স্বপ্নে মধুমালাকে দেখে ব্যাকুল হয়ে তাকে খোঁজার জন্য চৌদ্দডিঙ্গা সমুদ্র ভাসালো। পথে প্রচণ্ড ঝড়ে নৌকা ডুবে গেল। মধুমালা নাম জপতে জপতে মদন সমুদ্রের চড়ায় আটকে গেল। সেই চড়ায় গোচারণভূমিতে কিছু সংখ্যক রাখাল বালক মদনকুমারকে দেখে গ্রামে খবর দিল। তার বর্ণনা এরকম—

> সেই চড়ায় গো-চারণের মাঠ। এক রাখাল আসিয়া বলে, ভাইরে!-কি আশ্চর্য্য-ওরে ভাই, ছুটিয়া আয়! আজ আকাশের চাঁদ যে বালু চড়ায় পড়িয়া আছে!!
>
> সকল রাখাল গিয়া দেখে,—"তাইতো।"—'নারে ভাই, হাত দেখা যায়, পা দেখা যায়,

এতো চাঁদনা; দেবতায় দেবতায় লড়াই করিয়া স্বর্গের থেকেই খসে পড়েছে, কি সমুদ্রের থেকেই ভেসে উঠিয়াছে।"

ভয়ে সব রাখাল গিয়া গাঁয়ে খবর দিল। দলে দলে গাঁয়ের লোক সেই আকাশের চাঁদ কি পাতালের দেবতা দেখিতে আসিল। (মধুমালা)

এই যে প্রতিচ্ছবি এ ছবি রাজার রাজ্যে পল্লী গাঁয়ের কৃষক, রাখাল বা ঘোষ প্রজার ছবি। গোপ বা ঘোষেরা এভাবেই বাংলার গরু পুষে দুধ উৎপাদন করে এবং দুধ হতে নানা ধরনের মিষ্টি তৈরি করে। এ মিষ্টি রাজবাড়িতেও যায়। আবার রাজার রাজ্যে ধান উৎপাদন ছাড়া উচ্চবিত্তের মানুষগুলো কেন কারোরই গত্যন্তর নেই। তাছাড়া এই গ্রামের সহজ-সরল মানুষগুলোই বিপদে আপদে অন্যের পাশে দাঁড়ায়। যেমন দাঁড়িয়েছে রাজপুত্র মদন কুমারের পাশে। এদের শ্রমার্জিত ফসলের উপরই রাজার কর্তৃত্ব। প্রশাসনের সহযোগী শক্তি হিসেবে যারা কর আদায় করে কিংবা প্রশাসন চালাতে উজির নাজির সেপাই পণ্ডিত সবাই কৃষকের উপর নির্ভরশীল। কৃষকের দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া কারোরই কর্তৃত্বের অর্থ থাকে না। তাহলে বোঝা যাচ্ছে, কৃষক, রাখাল এবং রাজপুত্র পরস্পর নির্ভরশীল। কাউকে ছেড়ে কেউ নেই, সবাই কোনো না কোনোভাবে সম্পর্কিত। তবে রাজপুত্রের স্বপ্নের বিষয়টি মনস্তাত্ত্বিক। অসহায় অতৃপ্ত মানুষের স্বপ্ন পরিতৃপ্তির একমাত্র উপায়। বাস্তবে যাকে পাওয়া যাবে না—স্বপ্নে তাকে পাওয়া যেতে পারে। এখানে একটি দর্শন কাজ করে। মানুষ বস্তুনিষ্ঠ জগতের বাইরেও একটি আলাদা সৌন্দর্যের জগৎ সৃষ্টি করে। এবং সেখানে তার সৃজনশীল প্রতিভার কারুকার্য প্রদর্শনে বাধা নেই। লোকগল্পগুলোর স্রষ্টারা তাই কল্পনার বাসরে অলৌকিক প্রেমের স্বাদ বিতরণের কর্মটি অসাধারণ যোগ্যতায় একনিষ্ঠভাবে সম্পাদন করেছে। অনেকক্ষেত্রে তা পেশাকে অতিক্রম করে মানবিক উদারতায় সমন্বিত হয়েছে। এ জন্যই বোধ করি বাঙালি নারীর অমূল্য সম্পদগুলো প্রবাদ-প্রবচন কিংবা ধাঁধা, ব্রতকথার ভেতর দিয়ে লোককথায় প্রবিষ্ট হয়েছে। এখানে বরণ ডালায় ধান দূর্বা, মুঠি চাল সহযোগে স্বামীকে বরণ কিংবা প্রদীপ শিখায় পায়েস রেঁধে খাওয়ানোর বিষয়টি বাঙালি গার্হস্থ্য জীবনের অন্তর্নিহিত প্রতিচ্ছবি। উপরন্তু লম্বা চুলের সৌন্দর্য বাঙালি নারীর হৃদয়জনিত ভূষণ। এ ভূষণ দ্রাবিড়দের কাছ থেকে পাওয়া অপূর্ব সম্পদ। এই সৌন্দর্য চর্চা কিংবা লম্বাচুলের পরিচর্যার নিমিত্তেও বাঁদী-দাসী পেশার জন্ম হয়েছে।

বিয়ের পর সন্তান সম্ভবা নারীর একাকিত্ব ঘোচানোর উদ্দেশ্যে দাই বা ধাত্রী বা গল্পকথক পেশার প্রচলন বাঙালি সমাজে প্রচলিত ছিল। আমরা মদন কুমারের জন্মের সময় তার প্রতিচ্ছবি চিত্রিত হতে দেখি। শুধু তাই নয়, মদন কুমারের বার বছর পাতাল প্রাসাদে পূর্ণ হল কিনা তা গণনা করার জন্য জ্যোতিষী ডাকা হলো। এমনকি তার কোষ্টি বিচার করা হলো। উপরন্তু মদন কুমার ও মধুমালার বিয়েতে শাঁখে ফুঁ, হুলুধ্বনি দেওয়া, বরণ প্রদীপ জ্বালানো এবং ডালা সাজানোর জন্য এয়োদের ডাকা হলো।

এয়োদের এই কাজটি এক ধরনের পেশা। বিয়েতে গান-বাজনা করাটাও আর এক ধরনের পেশা বা জীবিকা উপার্জনের উপায়। বাঙালি সমাজে এগুলো এখনো প্রচলিত। এবং এসবের প্রত্যক্ষ প্রভাব 'পুষ্পমালা', 'মালঞ্চমালা', 'কাঞ্চনমালা' ও 'শঙ্খমালা' গল্পে লক্ষ্য করি।

'পুষ্পমালা' গল্পটিতে নিঃসন্তান রাজা ও আঁটকুড়ে কোটালের পরিবেশ প্রাধান্য পেয়েছে। তাঁদের রাজপরিবেশে বাঁদী-দাসী-শিক্ষাগুরু, কোটাল (নগর রক্ষক প্রহরী), সান্ত্রী-সিপাই, ডাকাত, ঘেসেড়া, মালিনী, মালি, যাদুকরী, 'অষ্টঢালী' নাপিত ইত্যাদি পেশাজীবী মানুষ পরিলক্ষিত হয়। এ মানুষগুলোও পেশার ভিত্তিতে উচ্চ-নীচ বলে শ্রেণী বিভক্ত হয়েছে। অথচ রাজা ও পেশাজীবীরা পরস্পর নির্ভরশীল। এদের কর্মকাণ্ডও রাজাকে কেন্দ্র করে পরিচালিত। রাণী এবং কোটাল স্ত্রীর আবার রাজা ও কোটালের তিন সত্যের কারণে বিশাল কাহিনি গড়ে উঠেছে। রাজা-রাণী বা কোটাল-কোটাল স্ত্রীর পুত্র ও কন্যা সন্তান হলে পরস্পর বিয়ে দেবে, কিংবা শুধু পুত্র বা কন্যা হলে বন্ধু বা সখী পাতিয়ে দেবে। ভাগ্যক্রমে রাণীর মেয়ে হয়, আর কোটাল স্ত্রীর ছেলে জন্মে। এখন তিন সত্য পূরণের পালা। কিন্তু কোটাল নিম্নবিত্তের মানুষ বলে রাজা-রাণী কোটাল পুত্রের সঙ্গে স্বীয় কন্যার বিয়ে-সাদী দিতে সম্মত নন। এমনকি বৈষম্য নীতির কারণে রাজা শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে কোটাল পুত্রকে রাজসভার পণ্ডিতের কাছেও শিক্ষা নিতে দেবে না।

তবে এ বৈষম্য কিন্তু বাঙালি লোকসমাজে এ রকম ছিল না। সেখানে একটা সমন্বয়ের সমাজ গড়ে উঠেছিল ক্রমান্বয়ে। কিন্তু আর্যীকরণেরকারণে বর্ণবৈষম্যজনিত ভেদাভেদ মানুষের মানসিক দ্বন্দ্বের প্রতিফলন হিসেবে সমাজে পরিলক্ষিত হয়। অনুভূত হয় এ যেন আর্য সভ্যতার সঙ্গে অনার্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব। অথচ এই মানুষগুলো সবাই একই দেশে একই সমাজে একই আলো-হাওয়ায় পরস্পর নির্ভরশীলতায় বসবাস করছে। আবার একই বিশ্বাসে, একই সংস্কার-সংস্কৃতিতে ব্যবহারিক জীবনের পরিচর্যাও পরিলক্ষিত হয়। শুধুমাত্র বুদ্ধি বলে যারা রাজা, রাজকর্মচারী তারা উচ্চ শ্রেণী এবং যারা সহজ-সরল পরাধীন তারাই হল ভাগ্যদোষে নিম্নবিত্তের দাসী-বাঁদী, কোটাল, প্রহরী, রাখাল, কৃষক, ধোপা, ইত্যাদি। অতএব কোটাল নিম্নবিত্তের মানুষ বলে উচ্চশ্রেণীর রাজা কোটাল পুত্রের সঙ্গে কন্যার বিয়েদিয়ে তিন সত্য পূরণ করছে না। এ ধরনের কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও বৈষম্যপীড়িত সমাজচিত্রের রেশ এখনো বাঙালি সমাজে বিদ্যমান এবং লোককথাগুলো তার বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টান্ত। মালঞ্চমালা গল্পেও রাজা নিঃসন্তান। গল্পের শুরুতেই বলা হয়েছে—

> এক রাজা। রাজা নিঃসন্তান। পুত্র কামনায়, রাজা, যোগী, জ্যোতিষী যত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সাধু সন্ন্যাসী আনাইয়া, 'সমারোহ' করিয়া যাগ-যজ্ঞ দিলেন।' (মালঞ্চমালা, পৃ. ১৫৫)

উদ্ধৃতিতে দেখা যাচ্ছে সবাই উচ্চশ্রেণীর পেশাজীবী এবং এভাবে বিপুল সমারোহে যাগ-যজ্ঞ অনুষ্ঠানের প্রচলন আর্য সংস্কৃতির নিদর্শন বলে মনে হয়। এ নিদর্শন ক্রমান্বয়ে বাঙালি সমাজেও প্রচলিত হয়েছে। কালের পরিক্রমায় বাঙালি জনমানুষ এখন শতধা বিচ্ছিন্ন। বাইরে থেকে যারা যখন এসে এ দেশ জয় করেছে তারা সবাই বাঙালি সমাজে নিজেদের সংস্কৃতি সভ্যতার অনুপ্রবেশ ঘটানোর চেষ্টা করেছে। এ সমাজে লৌকিক দেবতার স্থানে জায়গা করে নেয় উচ্চ বর্ণের দেবতা। আবার কখনো কখনো নিম্নবর্ণের দেবতাও প্রমোশন পেয়ে আর্যদেবতায় পরিণত হয়েছে। তাহলে বোঝা যায়, বিজিতদের দেবতা নিম্নবর্গের আর বিজয়ীদের দেবতা উচ্চবর্গের। এদিক থেকেও পেশার বৈষম্য সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রাজাদের আনন্দ উৎসবের মাত্রাও ভিন্ন ধরনের। সন্তানহীন রাজা-রাণী সন্তান প্রসবের খবর পেয়ে যে উৎসব আয়োজন করলেন তা সাধারণ মানুষের নয়। গল্পের ভাষায় বলা যায় :

> দেখিতে দেখিতে ছয়-ষষ্ঠীর রাত। ছয়-ষষ্ঠীর রাতে রাজা আঙ্গিনা ঘিরিয়া সোনার ঝালর সারি সারি চাঁদোয়া উঠাইলেন, চাঁদোয়ার নীচে ঘিয়ের বাতির সা'র দেওয়াইলেন। যতবাদ্য জোরে বাজিল। একশ' এক গায়েনের গান, চারিদিকে চার আগুনের কুণ্ড, পাইক, সিপাই, সান্ত্রী দিয়া, রাজা সারারাত খাড়া-পাহারা হুকুম দিলেন।
>
> আর?— আঁতুড়ঘর অবধি 'ফুল পুষ্পের' পথ; ফুলের মালা, আর চন্দন সিঁদুরের আঁকা!
>
> সেই পথে, ধারা তারা বিধাতারা আসিয়া রাজপুত্রের কপালের লিখন লিখিয়া যাইবেন।
>
> খাড়া-প্রহরী খাড়া পাহারা দেয়। প্রহরে প্রহরে বাদ্য বাজে। দাই-মাসী, মালিনী আঁতুড়ঘড়ের চোকাট-পাশাপাশি শুইয়া, রানীকে 'অমুক রাজা সমুক রাজা'য় রূপকথা শুনায়। 'অমুক কুমারী সমুক কুমারী'র পরাণ কথা শুনায়।' (মালঞ্চমালা)

তাহলে বোঝাই যাচ্ছে, গায়েনরাও জীবিকা অর্জনের উপায় হিসেবে গান গাওয়ার পেশা বেছে নিয়েছে। আবার প্রসূতিদের মানসিক প্রশান্তির জন্য দাই-মালিনী বা আলাপিনীদের নিযুক্ত করা হয়েছে। এমনকি বিয়ে বাড়ি সাজানো কিংবা বর-কনে বরণের নিমিত্তে এয়োদের পয়সার বিনিময়ে নিয়োগ করা হয়েছে। এসব অবশ্যই সমসাময়িক সমাজে উঁচু শ্রেণীর মানুষের ব্যবস্থাপনা ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু এখানে একটি কথা উপলব্ধির বিষয় যে, উঁচু শ্রেণীর মানুষগুলো যাদের উপেক্ষা করে, তারা ছাড়া ওদের জীবনের পরিপূর্ণতা কিছুতেই আসে না। কারণ নিম্নশ্রেণীর মানুষের পেশার উপর ভিত্তি করেই ওদের চলতে হয়। অথচ উচ্চশ্রেণীর মানুষরা ওই নিম্ন শ্রেণীর মানুষগুলোকে শোষণ-পেষণের মাধ্যমে অধিকার বঞ্চিত করে রাখে চিরদিন।

বলতে হয় এটা তাদের এক ধরনের অপকৌশল বা অনুদার স্বার্থপরতা ছাড়া আর কিছুই নয়। অনুরূপভাবে লোককথায় ভাগ্য গণনার জন্য জ্যোতিষী ব্রাহ্মণের পেশাও পরিলক্ষিত হয়। তারা পয়সার বিনিময়ে মানুষের ভাগ্য গণনা করে বা বিচার করে সন্তানের জীবনের আয়ুষ্কাল নির্ধারণ কিংবা মঙ্গলামঙ্গল বিচার করে। এ ধরনের প্রেক্ষাপট 'মালঞ্চমালা গল্পেও পরিলক্ষিত হচ্ছে। যেমন—

> 'বিধাতা?- রাজপুত্রের কপালে কি লিখিলে তা বলিয়া যাও।' বিধাতা দেখেন, বিপদ! বলেন, 'মালিনী? তা' জানিয়া তোর কাজ নাই। পা ছাড়িয়া দে।'
>
> মালিনী আপনার আঁচল দিয়া বিধাতার পায়ে শক্ত করিয়া বাঁধিল।
>
> তখন, বিধাতা, কোঁচড়ের কোণে যে চোকের জলটুকু ছিল, তাহা মালিনীর চোকে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, 'মালিনী! আর কি বলিব? রাজপুত্রের আয়ু মাত্র বারো দিন।' (মালঞ্চমালা, পৃ. ১৬২)

এ চিত্র এখনো বাঙালি সমাজে বিদ্যামান। এখনো সমাজে ভাগ্য গণনা বা কুষ্টি বিচারের পেশা অনেক ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়। আবার অমঙ্গল কাটানোর পরামর্শও জ্যোতিষীরা দিয়ে থাকেন। আবার এইসব লোককথায় নিম্নপেশার মানুষগুলো গান গায়, ছড়া কাটে, ধাঁধা বলে এমনকি জীবনের অভিজ্ঞতায় প্রবাদ বলে। যেমন—

> 'কুঁড়ে বাঁধি কুঁড়েয় আছি, তার তলেও রাজার হাঁচি।' (মালঞ্চমালা, পৃ. ১৬৬)

আবার ছড়ার ছন্দে বর্ণনা করে কোটাল—

> 'হেই হেই পড়শি! ফল পাড়িলাম আমি;
> তাই আজ কন্যার আমার রাজপুত্র স্বামী!' (মালঞ্চমালা, পৃ. ১৬৬)

তাহলে বোঝাই যায়, এই মানুষগুলো শুধু পেশার মাধ্যমে জীবন বাঁচায় না, তারাও সাহিত্য রচনা করে, জীবন দর্শন বাতলিয়ে দেয়, নীতি কথায় সমাজ পরিচালনার পর মঙ্গলময় সমাজ গড়ার ইঙ্গিত দেয় রঙ্গরসে। এমনকি কঠিন বাস্তবতার উপর দাঁড়িয়ে হৃদয় মিশিয়ে স্বপ্নের তাজমহল গড়ে কবিতায়। যেমন—

> 'পূর্ণিমার চাঁদ আর প্রভাতের রবি
> একই রথেতে উদয় যুগল সোনার ছবি!!" (মধুমালা, পৃ. ৯১)
>
> অথবা
>
> 'হায় হাত যতি হ'ত পাখা, পাখা হ'ত হাত,
> কুমারে ধরিতে বুকে না রইত তফাৎ!' (মধুমালা, পৃ.৯৭)

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিদ্বয়ে লোকজীবনের কঠিন বাস্তবতার মাঝেও কল্পনার কোমল প্রেমের ফুল ফুটিয়ে লোকআসর জমিয়ে দিচ্ছে। আর কোটাল এতদিন যে বাস্তব তিন সত্যি গোপনে বুকে চাপা দিয়ে রেখেছিল তা প্রকাশ পাওয়ায় কোটাল পুত্র 'তরোয়াল'

হাতে রাজদরবারে যেতে বাধ্য হল। তাই কোটাল মনে মনে বলে—

'যত্নে যে ধন ছিপায়ে রাখিলাম, হইল প্রকাশ!

পাথরের পাঁচিল ভেঙ্গে গজাইল ঘাস!' (পুষ্পমালা, পৃ. ১১৬)

তাহলে বোঝা যায়, জীবনের কঠিন বাস্তবতার ঘষায় পাথরের বুকে সবুজ ঘাস সদৃশ কবিতা জন্মে। আর এ কবিতার অপর নাম জীবন। অর্থাৎ কোটালের পেশাগত জীবনে কেবল নিষ্ঠুর দুঃখ কষ্টই নেই, আছে কোনো কোনো মুহূর্তে সবুজ ঘাস সদৃশ স্নিগ্ধ শান্তি ও তারুণ্যের শক্তি। কারণ কোটাল পুত্র রাজার প্রতিবাদ করতে তরবারি হাতে ছুটছে।

লোককথায় ডাকাতি পেশার পরিচয়ও মেলে। প্রত্যন্ত গ্রামগঞ্জে, ধূধূ মাঠ প্রান্তে, বন, অরণ্যে কেন্দ্রীয় প্রশাসনমুক্ত জনবিচ্ছিন্ন এলাকায় ডাকাতদের আবাস। লোককথার বর্ণনায়—

> 'এমন সময় মাঠের পর এক গ্রাম। ঘোড়া ছুটাইয়া দুইজনে গ্রামে উঠিয়া ডাকিলেন,— "কে কোথায় আছ, জল দিয়া বাঁচাও!"
>
> গ্রামে কেহই নাই, কেবল এক বুড়ী। বুড়ী উঁকি মারিয়া দেখিয়া তাড়াতাড়ি 'তিয়াসের জল আসনের পিড়ী' আনিয়া দিল। বলিলাম,— "বাছারা! ও গাঁয়ে হাট,সকলে হাটে গিয়াছে, নড়িতে পারিনা, একা আছি। তা 'আগতজন' তোমরা মাথার মণি। -ব'স, জিরোও, খাওদাও, পালঙ্কে শুইয়া ঘুম যাও।"
>
> বুড়ী সাত ডাকাতের মা। দেখে, সিপাইদের সাজ তাজে কত মণি। গায়ে পায়ে হীরার খনি!! বুড়ী তাড়াতাড়ি পা ধুইবার জল দিল, 'সিনানের তৈল দিল; বলিল,- "শুকন্ কি রন্ধন?"
>
> শুকন্ হলে আঁকড় ধানের চিঁড়ে দিত। ইটপাটকেল গুড় দিত, আটকলই আধভাজা আধকাঁচা, -ইহারই নাম শুকন।' (পুষ্পমালা, পৃ. ১২৪)

বাংলাদেশের ডাকাতদের ইতিহাস পাওয়া যায়। কেন্দ্রীয় প্রশাসন থেকে বিচ্ছিন্ন এলাকায় আইনের শাসন না থাকার কারণে ডাকাতির প্রভাবটা সেখানে ছিল বেশি। কিন্তু ডাকাতদের ডাকাতি পেশায় প্রবেশের কার্যকারণও অনুসন্ধান করা দরকার। পলিমাটি সমৃদ্ধ শস্য-শ্যামল বাংলাদেশে লুটতরাজের জন্য প্রবেশ করে এক শ্রেণীর দস্যু এবং তারা সেখানকার মায়ায় সেখানেই রয়ে গেছে। আবার এক শ্রেণীর এ দেশীয় মানুষ স্বাধীনতা হারিয়ে নিজ দেশে পরবাসী হয়ে আত্মসমর্পণ না করে জীবিকার তাগিদে ডাকাতি পেশা বেছে নিয়েছে। আর এক শ্রেণীর মানুষ অভাবের তাড়নায় জীবন বাঁচাতে ডাকাত সেজেছে। আর 'পুষ্পমালা' গল্পে ডাকাতের জীবন নির্ভরতা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।

'কাঞ্চনমালা' গল্পের কাহিনীতে আমরা রাজা ও সওদাগরের পুত্র-কন্যার বিয়ের

ঘটনার প্রাধান্য দেখি। এতে সওদাগর ও রাজার জীবনচিত্র পরিস্ফুটিত হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে পেশাজীবী মানুষগুলোর জীবনজীবিকা ও কামনা বাসনার চিত্রও কিছুটা পরিলক্ষিত হয়েছে। কাঞ্চনমালা ও সওদাগরপুত্রের বিয়েও হয়েছে। এ কাহিনীতে যে পেশাজীবী মানুষগুলোকে পাই তারা হল, মালিনী, সওদাগর ও রাজার চর, পটুয়া, বেহারা, এয়ো, বামুন, কলু, বেনে, দাঁড়ী-মাঝি, কুমোর, কামার, ধোপা ইত্যাদি।।

গল্পের এক জায়গায় বলা হয়েছে—

> এক, রাত্রে জ্যোস্নায় আকাশ ছাইয়া গিয়াছে, নিশির বাতাস ধীরে বয়, ঘুমে সওদাগর পুত্র স্বপ্ন দেখিলেন,— এক যে, কাঞ্চন-বরণ রাজকন্যা তা শিয়রে! কি সে রাজকন্যার রূপ! -রূপ উথলিয়া পড়ে। রাজকন্যার চুল তরে থরে মেঘের বরণ হইয়া সোনা অঙ্গ ঢাকিয়া পড়ে। (কাঞ্চনমালা, পৃ. ২২৬)

এই অপরূপ রূপ স্বপ্নে দেখে সওদাগর পুত্র পাগল হয়। তারপর কাহিনি নানা ডালপালা বিস্তার করে অগ্রসর হয়। রাজা বাদশাদের এই বিলাসী রূপজমোহের কাহিনির সহযোগী চরিত্রগুলো হল নিম্নবর্গের মানুষ। এই নিম্নবর্গের মানুষগুলোর সহযোগিতা ব্যতিরেকে সওদাগর-রাজাদের এক মুহূর্তও চলে না। অথচ এই মানুষগুলো তাদের কাছে সবচেয়ে বেশি অস্পৃশ্য ঘৃণ্য বলে বিবেচিত। গল্পের এক জায়গায় শ্রেণী বৈষম্যের এক বস্তুনিষ্ঠ চিত্র মালিনীর ভাবনায় পরিস্ফুট। যেমন—

> মানিলী একশ' বার করিয়া সওদাগরের বাড়িতে যায় 'ক্ষুরপায়ে হাঁটে। কোন্‌দিন শেষ শুনিবে, লিখন নারিকেল ফিরিয়া এল. পৃথিবী শুদ্ধ খুঁজিয়া কাঞ্চনবরণ কন্যা পাওয়া গেল না, -তখনি সাহস সওদাগরের কাছে বলিবে,— "যদি, যদি মালীর ঘরের মেয়ে নেন. কাঞ্চনবরণ কন্যা আমি দিতে পারি। (পৃ. ২৩০)

এই উদ্ধৃতি থেকে সমাজের নিম্নপেশার মানুষগুলোর আশা-আকাঙ্ক্ষা যে পদদলিত হয় এবং উচ্চ শ্রেণীর মানুষগুলো যে নিম্নশ্রেণীর মানুষগুলোকে কেবল নিজেদের বিলাসী জীবনেরসুখ-সুবিধা লাভের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে-এ কথাই প্রমাণিত হয়। উদ্ভাসিত হয় সমসাময়িক সমাজের পেশাজীবী নিম্নবর্ণের মানুষের জীবনের করুণ চিত্র। এই করুণ চিত্রের সমাপ্তি ঘটানোর জন্য মালিনী নানা রকম ছলা-কলার আশ্রয় নেয়।

সাধারণ পেশাজীবী মানুষগুলো যাদু-টোনায় বিশ্বাস করে এবং জীবনে প্রয়োগ করে, কাকের ডাকে অলক্ষণ আছে বলে বিশ্বাস করে, তন্ত্র-মন্ত্র চর্চা করে, সামাজিক নির্বাসনে বিশ্বাস করে, লোকসমাজের শাস্তিকে মেনে নেয়, নারীদের অপরিসীম পতিনিষ্ঠা, প্রেমের জন্য ত্যাগ স্বীকার করে, দেবতায় বিশ্বাস করে, এবং বিয়ে বাড়ি নানা ধরনের সংস্কার-সংস্কৃতিও মেনে চলে। এমনকি বিভিন্ন সাজ-সজ্জায় নানা

ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজন করে। এ সব কাজে যাদের সহযোগিতা নেয় কিংবা বিভিন্ন পেশার মানুষ সেখানে পরস্পর নির্ভরশীল ও অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। উদ্ধৃতি দেওয়া যায় :

> ঢোল কাঁশরের বাদ্য, ...
>
> মুখখানা বাঁকাইয়া 'ছে' কহিয়া, মালিনী গেল 'গিয়া মালিনী এ পাড়ায় যায়, ও পাড়ায় যায়, যত এয়োজন ঠিক করে, যত বড় টিকি তত বড় বামুনের কাছে গিয়া বোন্-ঝির বিয়ে দিন লগ্ন দেখে। —তা, মালিনী যে এয়োই ডাকিয়া আসে, তিন যাইতে না যাইতে সেই এয়োর সিঁদুর মুছিয়া যায়, যে বামুনের কাছে যায় সে্ বামুনের টোল গোহাল শূন্য হয়। আর এয়োজন মেলেনা, আর বামুন পাঁজি খোলেনা।
>
> মালিনী কলু বাড়ি থেকে তেল আনে, বেণে বাড়ি থেকে হলুদ আনে; কলুর বলদ মরে, বেণের বেণোত রসাতলে যায়। আর কলু তেল দেয়না, আর বেণে হলুদ দেয়না।
>
> মুকুটের ফুল খসে, চালুনির বাতি 'ধসে', গ্রীষ্মে হাঁড়ি কলসী ফাটে, মাঠে ধান পচে, হাটে সওদা আসেনা; গরু মরে বাছুর মরে; শীতে মানুষ মরে; -বসন্ত হাওয়া আসিল, তা' মালিনীর মালঞ্চের গাছ-পাতা, পাখ-পাখালী কীট বিহঙ্গ ঝরিয়া খসিয়া মরিয়া গেল। সারা বছর এ-ই। বিয়ে আর হইল না। (কাঞ্চনমালা, পৃ. ২৪৩-৪৪)

এই যে পেশাজীবী মানুষের চিত্র, সে চিত্রে একটা অমঙ্গল পরিদৃষ্ট হয়। এ অমঙ্গল প্রকৃতি, জীবজন্তু এবং মানব জীবনে একইভাবে প্রতিফলিত হয়ে সবকিছুকেই এক অখণ্ড চেতনায় আবদ্ধ করেছে। নিম্নবর্ণের সকল পেশাজীবী এক ও অভিন্ন হৃদয়ে অমঙ্গলের স্বাদ অনুভব করছে। এই অমঙ্গল কাটিয়ে ওঠার জন্য কিছু নিয়ম সংস্কার পালন করে এই পেশাজীবীরা। গল্পে বর্ণিত হয়েছে :

> ডঙ্কা দিলেন, নৌকা পড়েনা। কর্ণধার, দুলালধন, সকল মাঝি বলে,— 'সওদাগর! -একি! ডিঙ্গা কেন নড়েনা? —মায়ের কাছে তো বিদায় নিয়াছে?"

নিয়াছ"

"ভোগ প্রসাদ মুখে দিয়াছি?"

"দিয়াছি"

"তবে কেন নৌকা নড়েনা?"

"কি জানি"

"কি জানি? আচ্ছা ···

"সায় সিনান বাকী নাই? পঞ্চ দীপ বাদ নাই?"

"না"

"দেব মন্দিরের অষ্টচূড়া ধনকাহন উরা পূরা?"

"হ্যাঁ"

"তবে নৌকা নড়িবেনা কেন?" (কাঞ্চনমালা, পৃ. ২৪৭)

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিতে কতকগুলো সংস্কারের কথা বলা হয়েছে। এই সংস্কারগুলো পালন করলে নৌকা চলবে। কিন্তু তার পরেও যখন নৌকা চলছে না, তখন মাঝি বিস্মিত হয়েছে। এত কিছুর পরেও নৌকা না চলার কথা নয়। তবে কোন সে কারণে নৌকা চলছে না। তাই সে কারণ উদ্ধার করতে মাঝি পুনরায় জিজ্ঞেস করে—

'সওদাগর! দেব দেবতা সকলের কাছে গড়-প্রণাম বিদেয় নেও নাই?"

"তা নিয়েছি।"

'যা'র যার খোরাক বাঁটিয়ে দিয়াছ!"

"দিয়াছি"

'তবে আর আদায় বিদায় কোন্ ঠাঁই-আচ্ছা-বিদায় নিয়াছ বৌর ঠাঁই?"

'ওরে বাপ্! না!"

এবার মাঝি বলছে "হাঁ তবেই তো নৌকা নড়েনা! -যাও বিদায় নিয়া আইস।"

এবার সওদাগর বৌ-এর কাছে বিদায় নিয়ে এলে নৌকা চলতে থাকল। সংস্কারের সবকিছু মেনে এই যে স্ত্রীর প্রতি মর্যাদা দানের বিষয়টি একজন মাঝির হৃদয়ের ভেতর দানা বেঁধে ছিল, তাতে নিম্নবর্গের মানুষের হৃদয়গত সংস্কারে সতী স্ত্রীর কারণে মঙ্গলামঙ্গলের চিন্তায় আবহমান লোকসমাজের চিত্রই উদ্ভাসিত হয়, উদ্ভাসিত হয় সাধারণ পেশাজীবী মানুষগুলোর হৃদয়ই উন্নত সভ্যতার লালনভূমি। এ কথা 'কাঞ্চনমালা' গল্প থেকেও উপলব্ধি করা যায়। উপলব্ধি করা যায় এই গল্পে নরবলির মধ্য দিয়ে আদিম সমাজের বস্তুনিষ্ঠ প্রতিচ্ছবি উদ্ভাসিত হয়েছে এবংএকজন স্ত্রী সেখানেও নিজের সতীত্বের অলৌকিক শক্তি দিয়ে বলি হওয়া মৃত স্বামীকে পুনরায় জীবিত করেছে। এ যেন ঐতিহ্যনিষ্ঠ নারী বেহুলাকেই স্মরণ করিয়ে দেয় গল্পের মাধ্যমে।

'শঙ্খমালা' গল্পেও রাজা ও সওদাগরের জীবনচিত্র প্রাধান্য পেয়েছে। বর্ণিত হয়েছে, সওদাগরের এক ছেলে ও এক কন্যা। ছেলের নাম শঙ্খমণি এবং মেয়ের নাম কুঁজী। ছেলের বয়স হলে সওদাগর তাকে বিয়ে করালেন। কিন্তু মেয়ের বিয়ে হল না। এদিকে ছেলের বিয়ে দিয়েই সওদাগর মারা গেলেন। তারপর শুরু হল পরীক্ষা- নিরীক্ষা, জ্বালা-যন্ত্রণা এবং ননদীর অত্যাচার। ভাবীর নামে মিথ্যা বদনাম ছড়ায় ননদী। বাড়ি থেকে বের করে দেয় ভাবীকে। বাপ মারা যাবার পর শঙ্খমণি অভিভাবকহীন হওয়ায় যেমন ইচ্ছা তেমনভাবে চলে বাপের ব্যবসা-বাণিজ্যের হাল ছেড়ে দেয় এবং দরিদ্র

হয়ে পড়ে। গল্পে বর্ণিত হয়েছে :

> 'বাপ যদি মারা গেলেন, আর কি? শঙ্খমণির ডানা গজাইল। বাড়ির মাটিতে শঙ্খমণির আর পা পড়েনা। গান বাজনা সাজসজ্জা এসব নিয়া শঙ্খমণি কোথায় কোথায় যে থাকে, তার ঠিক নাই।'
>
> দরিদ্র অবস্থা থেকে উদ্ধার পাবার জন্য সওদাগর আবার বাণিজ্যে যায়। গল্পে বর্ণিত আছে—
>
> স্নান করিয়া, পাঠ সারিয়া, শ্বেত চন্দন গায়ে মাখিয়া, হাত পাখালিয়া সাধু তাম্বুল মুখে দিল, সাত সন্তান কর্ণ বার শাঁখে ফুদিয়া নায়ের মুখ ঘুরায়, সাধুর নৌকা বাণিজ্যে যায়। (শঙ্খমালা)

উদ্ধৃতি থেকে অনুভূত হয়, বাংলায় একসময় এভাবেই বাণিজ্য তরী ভাসানো হতো। দেশী পণ্য বিদেশে এবং বিদেশী পণ্য দেশে আনা হতো প্রয়োজনবোধে। গল্পে সওদাগরের এই যে জীবন, এ জীবনের সম্পূরক ও সহযোগী শক্তিই হলো নিম্নবিত্তের মানুষগুলো। এ গল্পে যে নিম্নপেশার মানুষগুলোর পরিচয় পাওয়া যায়, তারা হল যথাক্রমে, একটু উচ্চ শ্রেণীর বেণে, (অবশ্য উদাসীনতায় দরিদ্র হয়ে যায়), পাখি শিকারী (ব্যাধ), মালিনী, মাঝি, গণক, কাঠুরিয়া, কাঠুরাণী, ধাই, দাসী, সাধু-সন্ন্যাসী, চোর, প্রহরী, সিপাই, লস্কর, কোটাল, উজির, নাজির, ওঝা, ঘুটে কুড়ানী ইত্যাদি।

এইসব পেশাজীবী মানুষগুলোর বিশ্বাস-সংস্কারের মধ্যে, তাদের খাদ্য ও কাজকর্মের মধ্যে চিন্তা-দর্শনের মধ্যে, স্বপ্ন ও কল্পনার মধ্যে, তদানীন্তন শিল্প-সাহিত্যের রূপ পরিলক্ষিত হয়। দু'একটি উদ্ধৃতি তুলে ধরে বিশ্লেষণ করা যায় :

> ১. "দেখ ভাই রাজপুত্র, 'কাকের বাসায় কুলির ছা, জাত স্বভাবে করে রা' (শঙ্খমালা, পৃ. ৩৫৫)
>
> ২. "আবার একটু নরম হইয়া কাঠুরাণী বলে, "ষাঠ, ষাঠ! কোন যেন ডাইনী চাঁদের গা ছুঁইল, -দাসীলো, ওঝা ডাক্, রোঝা ডাক্, অমার দুধের ধারে বেটে চাঁদকে ওযুধ দেই।'
>
> ৩. "পতির নিষেধ, কবাট আমি খুলিবনা!" (পৃ. ২৯৬)

উদ্ধৃতিত্রয়ের প্রথমটিতে জাতিগত স্বভাব বৈশিষ্ট্য, সমাজে পতিতদের জীবনচিত্র এবং তৃতীয়টিতে পতিনিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হয়েছে। বাঙালি সমাজের এই বস্তুনিষ্ঠ চিত্রগুলোর ভিত্তিতেই তার প্রাণের আকুতি ভরা কথাসাহিত্য একদিন নিরক্ষর মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত হয়েছে। লোককথাগুলো তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

এই গল্পগুলো সম্পর্কে লীলা মজুমদার বলেছেন,

> আমি বলি কি রূপকথা হল অন্যদের গল্প আর উপকথা আমাদের নিজেদের গল্প। আমাদের দেশের মাটি জলহাওয়া দিয়ে গড়া, আমাদের দুঃখে-বেদনায় বিধুর, আমাদের সুখে-আহ্লাদে ভরপুর।

তার মধ্যে খানিকটা দেশের প্রাচীন ইতিহাস, খানিকটা লোকের মুখে শোনা কিংবদন্তী আর খানিকটা মনগড়া। কেউ লিখে রাখেনি, সব মুখে মুখে বলা, যার যেমন খুশি রঙ চড়ানো, তাই সত্য আর কল্পনার মধ্যিখানের মিহি পরদা খসে পড়েছে। এখন আর কিছু আলাদা করে চিনবার জো নেই, তবু আমাদেরই গল্প, আমাদের প্রাণের ইতিহাস, ইচ্ছার কিংবদন্তী। [১১]

প্রসঙ্গক্রমে লীলামজুমদার আরো বলেন,

আশ্চর্যের বিষয় হল তবু সেই ন্যাড়া বিকৃতির অসম্ভব, অবাস্তব, অভাবনীয় সব ঘটনার মধ্যে দিয়েও সেকালের বাঙালি চরিত্র, তার আশা-নিরাশা, সুখ-দুঃখ মেশা জীবনযাত্রা কেমন ফুটে উঠেছে। কিছু বাদ যায়নি, একদিকে সেই জাঁকজমক, অন্যদিকে সেই অভাব-অনটন, সেই চিরদিনের লোভ, হিংসা বিফলতা, ব্যর্থতা; সেই মহত্ত্ব, সেই সার্থকতা। গল্পকারের নিজের চরিত্রের বলিষ্ঠতা গল্পের মধ্যে ছাড়া পেয়েছে। [১২]

রেভারেণ্ড লাল বিহারী দে সংগৃহীত গল্পগুলো সম্পর্কে লীলা মজুমদারের এই মন্তব্য যথার্থই বস্তুনিষ্ঠ। এ অভিমত কেবল লালবিহারী দে সংগৃহীত গল্পগুলোর বেলায় নয়, বরং তা সমগ্র লোককথার বেলায়ও প্রযোজ্য। কারণ বাঙালির লোকজীবনের এমন কোনো দিক নেই যা প্রতিফলিত হয়নি। মনে হয় বাংলার হৃদয়মথিত জীবন কথা এই গল্পগুলো। এই গল্পগুলোতেও সেই উচ্চশ্রেণী নিম্ন শ্রেণী, লোকসংস্কার, লোকচিকিৎসা, সেই ধান-চালের প্রসঙ্গ, ঐন্দ্রজালিক আবহ, প্রাসাদ রাজনীতি, পারিবারিক দ্বন্দ্ব, স্বামী-স্ত্রীর প্রেম বিরহ, লোকাচার, ব্রতাচার, সতীনের সংসারের দ্বন্দ্ব-কলহ, হিংসা-ঈর্ষা ইত্যাদি পরিলক্ষিত। এবং এ সবের মধ্যেই বাঙালির পেশা ও বাংলার সমাজ, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের নিদর্শন পরিলক্ষিত।

গ্রন্থের প্রথম গল্প 'গোপন প্রাণ'। এটিতেও রাজার পরিবার পরিবেশের বস্তুনিষ্ঠ চিত্র প্রতিফলিত। রাজার দুই রাণীর মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ- হিংসা-ঈর্ষায় তার প্রাণনাশের প্রচেষ্টায় বোয়াল মাছ ধরার জন্য জেলেকে ডাকা হয়েছে। কারণ ঐ বোয়াল মাছের কলজের সঙ্গে ছোট্ট একটি কৌটায় ভরা সতীনের ছেলে ডালিম কুমারের জীবন। গল্পে বর্ণিত হয়েছে :

অমনি জেলেদের ডাক পড়ল, জাল নিয়ে আয়, বোয়াল মাছটি ধর। একটি বার জাল ফেলতেই বোয়াল মাছ উঠে এলো। ঘটনাক্রমে পুকুরের পাশেই, ফুল বাগানে কুমার বন্ধুদের সঙ্গে খেলা করছিলেন। জালে মাছ পড়তেই তিনি বললেন, আমার শরীর খারাপ লাগছে। তারপর যেই মাছটাকে জাল থেকে বের করে ডাঙ্গায় ফেলা হল, ডালিম কুমারও মাটিতে পড়ে হাঁস-ফাঁস করতে লাগলেন। প্রাণটা বুঝি এখনি যায়! সবাই

তাঁকে ধরাধরি করে সুওরাণীর ঘরে নিয়ে গেল। ছেলের এমন হঠাৎ অসুখের কথা শুনে রাজা স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

এদিকে কবরেজের হুকুমমতো মাছটাকে দুওরাণীর ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। মাটির ওপর পড়ে মাছটা পাখনা আছড়াতে লাগল। সুওরাণীর ঘরে যারা ছিল, তারাও তখনি ডালিমের বাঁচার আশা ছেড়ে দিল।

দুওরাণীর ঘরে মাছের পেট চিরে, তাব মধ্যে এক সুন্দর কৌটা পাওয়া গেল। সে কৌটার মধ্যে চমৎকার এক সোনার হার। দুওরাণী সেই হারটি গলায় দিলেন। অমনি তাঁর মায়ের ঘরে ডালিম কুমারের শেষ নিঃশ্বাস পড়ল। (ফোক টেলস অব বেঙ্গল, পৃ ১৩-১৪)

উদ্ধৃতিতে দুয়োরাণীর প্রতিহিংসা মনস্তাত্ত্বিক। সতীনপুত্রকে সে কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না। এখানে বোয়াল মাছের কলজের সঙ্গে, কৌটায় ডালিম কুমারের জীবনের সঙ্গে রাক্ষসের গল্পে ভোমরের ভেতর বা টিয়া পাখির ভেতর জীবন ধরে রাখার বিষয়টি আজগুবি। কিন্তু রাজপ্রাসাদে সৎমার মানসিক প্রতিক্রিয়ায় সতীনপুত্রকে যে কোনো প্রকারে মেরে ফেলার ইতিহাস কিন্তু অলৌকিক নয়। এটা আমাদের মনুষ্য সমাজে বাস্তব। আজগুবি অবিশ্বাস্য ঘটনার রেশের মধ্যে আমাদের চারপাশের ঘটনাবলী কিংবা জীবনের প্রচ্ছায়ার গল্পগুলোতে প্রাধান্য পেতে দেখি। সেখানে দেখি উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্তের জীবনচিত্র। নিম্নবিত্তের মানুষগুলোই এখানেও উচ্চশ্রেণীর মানুষের আজ্ঞাবহ ও সম্পূরক শক্তি। বাঙালি সমাজের এই বস্তুনিষ্ঠ চিত্রে, বাস্তব ও কল্পনার সমন্বয়ে এক বিশেষ রসঘন জীবন কথা ফুটে উঠেছে এই লোককাহিনিতে। ফুটে উঠেছে গর্ভধারিণী মায়ের সন্তান হারানোর হৃদয় বিদারক বস্তুনিষ্ঠ কষ্ট। এ গল্পে সাধক-সন্ন্যাসী- জ্যোতিষ-গণকের সন্ধান মেলে। তার ভবিষ্যৎ বাণীতে নির্ভর করেই গল্পের গতিবিধি নির্ধারিত হয়েছে।

লোককথার সমাজে গান্ধর্ব মতে মালা বদল করেও বিয়ে হতো। গল্পের একস্থানে বলা হয়েছে, 'বাগান থেকে ফুল এনে দু'টি মালা গাঁথা হল, সেই মালা বদল করে বিয়ে হল।' অর্থাৎ ডালিম কুমার আর বিধাতা পুরুষের বোনের মেয়ে মালাবদল করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হল। বেশ কিছুদিন পর ডালিমের স্ত্রীর সন্তান হল এবং তার মনে শাশুড়িকে দেখার বা তার সঙ্গে পারিবারিক বন্ধনে আবদ্ধ হবার সাধ জাগল। এখানে আমরা বাঙালি উচ্চশ্রেণীর মানুষের পারিবারিক চিত্র লক্ষ্য করি। পাশাপাশি নিম্নপেশার মানুষের পরিবারের প্রতিচ্ছবিও পরিস্ফুটিত হতে দেখি। ডালিমের স্ত্রী যখন সুয়োরাণীর সঙ্গে সাক্ষাতের ছলে দুয়োরাণীর অপকর্মের শোধ নিতে নাপিতের ছদ্মবেশে নাপিতের আচরণ করল, তখনই নিম্নপেশার মানুষের জীবনচিত্র উদ্ভাসিত হল। যেমন—

স্বামীর মত নিয়ে বৌ নাপতেনী সাজলেন। সত্যিকার নাপতেনীদের মতো

> সঙ্গে নিলেন একটা চুপড়ি, তাতে রাখলেন একটা নখ কাটার নরুণ, একটা উফো, পা পরিষ্কার করার একটা ঝামা, পা রাঙাবার জন্যও এক শিশি আলতা। এইসব নিয়ে দুই ছেলের সঙ্গে গিয়ে তিনি রাজবাড়ির দোরগোড়ায় দাঁড়ালেন। বললেন, 'আমি নাপতেনী, একবার সুওরাণীমার সঙ্গে দেখা করতে চাই।' তাই শুনে সুওরাণী তাকে ডেকে পাঠালেন ছেলে দু'টিকে দেখে রাণী অভিভূত হয়ে পড়লেন। এরা যে হুবহু তাঁর বুকের ধন ডালিম কুমারের মত দেখতে। হারানো মানিকের কথা মনে পড়তেই রাণীর দু'গাল বেয়ে পানির ধারা নামল। এরা যে তাঁরই আদরের ডালিমের ছেলে, সে কথা আর তিনি কি করে জানবেন।' সুয়োরাণী বললেন, বাছা, আমি তো সব সাজ-সজ্জা করা ছেড়ে দিয়েছি। আমার ডালিম-ই চলে গেল আর আমার সেজে কি হবে? তোমাকে কোনো কাজ দিতে পারছিনে মা, কিন্তু তোমার সুন্দর ছেলে দু'টিকে নিয়ে মাঝে মাঝে এসো। আমার ভালো লাগবে।' সেখান থেকে নাপতেনী দুওরাণীর মহলে গেলেন। বললেন, 'আমি নাপতেনী রাণীমা, কাজের আশায় এসেছি।' দুওরাণী হাত-পায়ের নখ কাটালেন, ঝামা দিয়ে পা পরিষ্কার করালেন, আলতা পরালেন। নাপতেনীর পরিপাটি কাজ আর মিষ্টি ব্যবহার দেখে তিনি এত খুশি হলেন যে বিদায় দেবার সময় তাকে বললেন, 'নিয়মিত আসিস বৌ, তোর কাজ বড় ভাল।

উদ্ধৃতিতে একটি গভীর পারিবারিক শূন্যতার চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। নাপতেনী সেই শূন্যতা ঘুচিয়ে ঐতিহ্যমণ্ডিত পারিবারিক বন্ধনের সুখ পেতে চায়। এখানেই সন্ন্যাসী ও নাপতেনী পেশার মানুষের সঙ্গে রাজপরিবারের নির্ভরতা লক্ষণীয়। এবং বাঙালি সমাজের সার্থকতা এখানেই।

'ফকিরচাঁদ' গল্পটিতেও আমরা রাজপরিবেশের প্রাধান্য দেখি। রাজপুত্র মন্ত্রীপুত্র মিলে সাপের মাথার মণি পাতাল পুরীর রাজকন্যা ও যক্ষের প্রাসাদ আবিষ্কারের বিষয়টি এ গল্পে পরিস্ফুটিত হয়েছে। অর্থাৎ এখানে দুই বন্ধুর দুঃসাহসিক অভিযানের কথা ও রাজপুত্রের রূপজমোহের প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে। এই বর্ণনার পাশাপাশি কাঠকুড়ুনীর জীবনচিত্র উদ্ভাসিত। তৎসঙ্গে রাজপরিবারের চিকিৎসার জন্য বদ্যি, রাজার অনুচর, জ্যোতিষী, ময়রা, গোয়ালা, বামুন, ফকির, পাহারাওয়ালা প্রভৃতি পেশাজীবী মানুষগুলো পরস্পর নির্ভরশীলতায় আমাদের অবসর সময় অতিবাহিত করার জন্য রসঘন কল্পনায় গল্পগুলো সৃষ্টি করেছে।

'গরীব ব্রাহ্মণের কথা' গল্পে বাঙালি সমাজের দরিদ্র ব্রাহ্মণের জীবন চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। গল্পে বাঙালির ফসলের দেবতা শিব, তার স্ত্রী দুর্গা, রাজা, জমিদার প্রভৃতি চরিত্র পরিলক্ষিত। গল্পের মূল প্রতিপাদ্য হল দরিদ্র ব্রাহ্মণ সম্পদশালী হওয়ায়

জমিদারের ঈর্ষার সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেবতার সাহায্যে ব্রাহ্মণ রক্ষা পায়। এখানে ভূতের কল্পনা অলৌকিক। কিন্তু দরিদ্র ব্রাহ্মণের দুঃখ কষ্টের কথাটি সত্যই হৃদয় বিদারক বাঙালি সমাজের বস্তুনিষ্ঠ চিত্র বলে অনুভূত হয়।

'রাক্ষসের গল্প' লোককথার বিষয়বস্তুও এক নির্বোধ ব্রাহ্মণের জীবন কেন্দ্রিক। সে অলসও বটে। এই অলস লোকটি বড়লোকদের বাড়ি ঘোরাঘুরি করে যেটুকু রোজগার করে তা দিয়েই দিব্যি তার সংসার চলে যায়। তার এই সংসার যাত্রায় চলতে ফিরতে এ দেশের শ্রেণী বৈষম্যপূর্ণ সমাজ,দরিদ্র পেশাজীবী মানুষ, বড়লোক, ছোটলোক, রাজা-প্রজা, তাদের সংস্কার-সংস্কৃতি, আচার-অনুষ্ঠান এবং বিচিত্র পেশার সন্ধান পাওয়া যায়। এমনকি দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার্য উপকরণ সামগ্রী, লোকপ্রসাধনী, লোকজ্ঞান, লোকপ্রযুক্তির পরিচয়ও মেলে। যেমন—

১. 'পাশের রাজ্যের রাজার মায়ের শ্রাদ্ধে ভারি ঘটা। চারিদিক থেকে দলে দলে বামুনরা আর ভিখারীরা কিছু দক্ষিণা পাবার আশায় ভিড় করতে লাগল।' (ব্রাহ্মণের গল্প)

২. 'বামুনী লোক মন্দ ছিল না। সঙ্গে সঙ্গে একটা কলাগাছ কেটে, গাছটি পুড়িয়ে ছাই বানিয়ে, সেই ছাই দিয়ে বামুনের ফতুয়া, ধুতি চাদর কেচে এমনি সাদা করে তুলল যে সাজি মাটিতেও অমন সাদা হয় না। বামুন যাবে মস্ত বড় রাজার বাড়িতে ময়লা কাপড় পরে তার সামনে যাবার কারো জো ছিল না। তাছাড়া হাজার হোক বামুনতো, সে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হবে নাতো হবেটা কে?' (রাক্ষসের গল্প)

প্রথম উদ্ধৃতিতে আমরা বামুন ও ফকিরের চিত্র পাই। বড়লোকের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে এরা কিছু দক্ষিণা পাবার আশায় উপস্থিত হয়। বর্ণ প্রথার কারণে ব্রাহ্মণদের স্থান সমাজের উচ্চস্থানে। ধনী দরিদ্র হওয়া সত্ত্বেও তারা বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানে মর্যাদার আসন পায়। এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট যে সমাজের অধিকাংশ মানুষ দরিদ্র এবং এই দরিদ্রদের সাবান হল প্রাকৃতিক। কলাগাছ পুড়িয়ে ছাই কিংবা চিটকা মাটি সাবান হিসেবে ব্যবহার করা যায়। চিটকা মাটিতে মাথা পরিষ্কার করা যায় আর কলাগাছ পোড়া ছাই দিয়ে কাপড় কাচা যায়। এখানে তদানীন্তন সমাজের প্রশাসন, বিনিময় মাধ্যম, বাহালি স্ত্রীর আদর-যত্ন ইত্যাদি উপলব্ধি করা যায়। যদিও বাস্তব মানুষের গল্পে রাক্ষসের আবির্ভাব লক্ষণীয়, তবু তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্যে মানুষের চরিত্র বা সুখ-দুঃখের সংসার পরিলক্ষিত হয়।

এ গল্পেও রাজা ও রাক্ষসের গল্পের অন্তরালে বিয়ে বাড়ির সাজ-সজ্জা, জাঁকজমক, বাজনা বাদ্যি, বাজি পোড়ানো, খাওয়া-দাওয়ার ঘটা ইত্যাদি বাঙালি সমাজে। এই সমাজের সামন্ত শাসনের মধ্যে সভাসদ, পাত্র-মিত্র, কোটাল সান্ত্রী-সেপাই আর সারাদেশের বিভিন্ন পেশার প্রজা সাধারণ। এই সামন্ত প্রভু ও দেশের সবাইকে প্রায় খেয়েই ফেলেছে রাক্ষস। এই রাক্ষসের প্রচ্ছায়ায় বাঙালি সমাজের একটা পরিবার

প্রথার সন্ধানলভ্য আর রাক্ষসরা যে সত্যি সত্যি আদিমকালের বর্বর মানুষ কিংবা সমসাময়িককালের বহিরাগত বর্বর অত্যাচারী রাজা এতে কোনো সন্দেহ নেই।

আদ্যিকালে বাঙালি সমাজ যে পণ্ডিত, ডাকাত এবং রাক্ষসের অন্তরালে মানুষ খেকো মানুষ ছিল সে কথা একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না। উড়িয়ে দেয়া যায় না তাদেরও শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল, সমাজ প্রশাসন ছিল এবং তাদের কাঁচা মাংস খাবার অভ্যাসও ছিল। তাহলে বোঝা যায় Primitive সমাজের মানুষগুলো বর্বর তথা কাঁচা মাংস ভক্ষণ করত এতে কোনো সন্দেহ নেই। গল্পটিতে নিপীড়িত সমাজের পরিচয় মেলে। বর্ণিত হয়েছে—

'বাড়ির মাথা হলেন বুড়ি ঠাকুমা, গৃহস্থের মা। তিনি হঠাৎ জোরে জোরে বলে উঠলেন, আমি যাই। আমার বয়স সবচেয়ে বেশি, বেঁচেছিও অনেককাল, আর বড় জোর দুই-এক বছর বাঁচতাম। আমি গেলে বিশেষ ক্ষতি হবে না'। (লালবিহারী দে, পৃ. ৫৫)

উদ্ধৃতিতে বলা হয়েছে রাক্ষস এসে প্রতি রাতে কোনো না কোনো গৃহস্থ পরিবারের সদস্যকে খেয়ে ফেলে। আজ এই গৃহস্থের পালা। সেজন্য গৃহস্থ পরিবারের সদস্যদের থেকে কে নিজেকে রাক্ষসের কাছে সোপর্দ করবে, তার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে সবাই মিলে। অতিথিদ্বয় এসব বুঝতে পেরে তারা কৃতজ্ঞতায় নিজেদের সোপর্দ করার কথা জানিয়ে দিল। কিন্তু গৃহস্থ অতিথিদের এ সিদ্ধান্ত সঠিক নয় বলে বাধা দিল। কারণ তখন সমাজে অতিথিদের সম্মান এতই উচ্চে ছিল যে, তাদেরকে দেবতা জ্ঞানে আপ্যায়ন করা হতো। কিন্তু তারপরেও কৃতজ্ঞতায় সহস্রদল এবং চম্পকদল দুই ভাই এক সঙ্গে রাজী হয়ে কালী মন্দিরে গেল। গল্পটিতে রাক্ষস, মা কালীর একটা প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। অনুভূত হয় রাক্ষসের অন্তরালে বহিরাগত বর্বর রাজাদের কাহিনি কিংবদন্তী। এ কারণেই দেশীয় রাজারা ভয়ে ভীত হয়ে প্রজাদের নিরাপত্তা দিতে অক্ষম ছিল। আর সেই নিরাপত্তা দিল সহস্রদল ও চম্পকদল। তারা দুইভাই বর্বর রাক্ষস সদৃশ বহিরাগতদের হাত থেকে গৃহস্থ তথা দেশকে বাঁচাল। বিষয়টিকে আমরা সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব সংঘাতও বলতে পারি। গল্পের এক স্থানে বলা হয়েছে—

"আমার বাবা আগে এখানকার রাজা ছিলেন. তাঁর লক্ষ লক্ষ প্রজা ছিল। তাদের নগর গ্রাম ধন-দৌলতে লোক জনে গম-গম করত। কয়েক বছর আগে এই রাক্ষসের দল আমাদের দেশ দখল করে সব্বাইকে খেয়ে ফেলেছে। প্রজাদের, আমার মা-বাবাকে, ভাই-বোনদের কাউকে বাকী রাখেনি। এ রাজ্যে আমি ছাড়া কোনো মানুষ নেই। আমাকেও কোন কালে খেয়ে ফেলত। কিন্তু এক বুড়ি রাক্ষসীর কেন যেন জানিনা আমার ওপর বড় মায়া পড়ে গেছে। সে-ই আমাকে অন্যদের হাত থেকে রক্ষা করেছে।' (সংগৃহীত রাক্ষসের গল্প)

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিতে আমরা বিজিত ও বিজয়ীদের চিত্র দেখি। বিজয়ীরা বিজিতদের

কাছে রাক্ষস ছাড়া আর কিইবা হতে পারে। বিজয়ীরা বিজিতদের দু'এক জনকে ওরকম বাঁচিয়ে রাখে। বাকী যাদেরকে তারা প্রতিবন্ধক বলে মনে করবে তাদেরকেই রাক্ষসরূপে দমন-পীড়ন-হত্যা করবেই। এই রাজা-রাক্ষসদের অধীনস্থ যারা তারা সবাই পেশাজাবী বলে অভিভিত হতে পারে— সে উচ্চই হোক আর নিম্নই হোক। এ গল্পেও আমরা নিম্নপেশার মানুষ হিসেবে কাঠুরে, দাস-দাসী প্রভৃতিকে পাই। এ গল্পেও মালা বদল করে গন্ধর্ব বিয়ে হতে দেখি। যা নাকি অতি প্রাচীন কালের মানুষের সমাজের বিয়ের প্রথা হিসেবে প্রচলিত।

মেয়েদের সজ্জা করা কিংবা রসময় ছেঁড়া চুল ফেলে দিতে নেই বলে সংস্কার আছে এ সমাজে, নদীমাতৃক বাংলাদেশের প্রধান যানবাহন নৌকোর কথাও এখানে উল্লেখ আছে। পতি ভক্তির নিদর্শনও দেখতে পাই বাঙালি সমাজের মতো, মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য মানত বা ব্রতাচারের কথাও লক্ষণীয় এ গল্পে। শাস্তিদণ্ড দেওয়ার জল্লাদের পেশার উল্লেখ আছে আলোচ্য গল্পে।

এমনিভাবে রেভারেণ্ড লাল বিহারী দে সংগৃহীত গল্পগুলোতে অলৌকিক বিষয় থেকে আরম্ভ করে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, বাস্তব এবং কল্পনা মিশ্রিত জীবনচিত্রের সঙ্গে দেবতার কথা, রাক্ষসের কথা, রাজা, বাদশা, উজির, নাজির, পাত্র, মিত্র, ঘটক, গোয়াল, শূদ্র, ছুতার, ধাই, পাখা বিক্রেতা, চুন উৎপাদক, যোগী, কবরেজ, বদ্যি, সন্ন্যাসী, চোর-ডাকাত, ধোপা, নাপিত, মাঝি, ব্যাধ, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, বেণে, দাস-দাসী, প্রহরী, বেহারা, তাঁতী জেলে, কুলি, চাষী, জ্যোতিষ, পাটনী, কাঠুরে, ঘটক, রাখাল ইত্যাদি পেশাজীবী মানুষের জীবন পরিলক্ষিত হয়। এমনকি বৈষম্যপীড়িত সমাজ, প্রাসাদ ষড়যন্ত্র, রাজপরিবেশের পাশাপাশি অসহায় দরিদ্র মানুষের কামনা, লোক চিকিৎসা, লোকাচার, নীতিকথা, লোকশিল্প, নারীর সৌন্দর্য-ভূষণের ক্ষেত্রে লম্বা চুল, বহুবিবাহের ফলশ্রুতি, সৎমা ও সতীনের কোন্দল, গার্হস্থ্য জীবনের নানা অসঙ্গতি, সুখ-দুঃখ, দেবদেবীর চেয়ে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা গল্পগুলোকে অপরিসীম ঋদ্ধ ও হৃদয়গ্রাহী করেছে। যেমন—

> লোকে ভাবে স্বর্গে বুঝি ঝগড়া-ঝাটি নেই! কিন্তু পুরনো গল্প পড়লেই বোঝা যায় এ ধারণা কত ভুল। তর্কাতর্কি, রেষা-রেষি সেখানে লেগেই থাকে। একবার শনির সঙ্গে লক্ষ্মীর মহা ঝগড়া বেধে গেল। সকলেই জানে শনি হলেন অমঙ্গলের দেবতা আর লক্ষ্মী হলেন মঙ্গল আর সাফল্যের দেবী। তাঁদের মধ্যে ঝগড়া লাগল পদমর্যাদা নিয়ে। শনি বললেন, 'আমি ত্রিভুবনের কোন সর্বনাশটা না ঘটাতে পারি! কাজেই আমার আসনই বেশি উঁচুতে।' লক্ষ্মী বললেন, 'আমি সকলের জীবনের সুখ-শান্তি এনে দিতে পারি, সর্বনাশের চাইতে অনেক বেশি মূল্য। কাজেই আমার আসন আরো উঁচুতে।'

স্বর্গের সমস্ত দেবদেবীরা এর মধ্যে জড়িয়ে পড়লেন। কেউ নিলেন এর পক্ষ, কেউ নিলেন ওর। দুই দলই সমান ভারি। শেষ পর্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বীরা ঠিক করলেন এ সমস্যা মেটানো ঠাকুর দেবতার কর্ম নয়; কোনো বিদ্বান, বুদ্ধিমান, ন্যায়বান মানুষের শরণাপন্ন হতে হবে। সেই সময় পৃথিবীতে শ্রীবাস বলে একজন অসাধারণ গুণী মানুষ বাস করতেন। তাঁর যেমন ধন-ঐশ্বর্য, তেমনি বুদ্ধি আর সততা। শনি আর লক্ষ্মী স্থির করলেন এই মানুষটিকে মধ্যস্থ মানতে হবে। (লাল বিহারী দে, পৃ. ৬৯)

উদ্ধৃতি থেকে সহজেই অনুভব করা যায় এখানে দেবতার চেয়ে মানুষই শ্রেষ্ঠ। গল্পগুলোর ধারাবাহিকতায় প্রথমে দেবদেবী, তারপর রাক্ষস-খোক্কস, তারপর অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন মানুষ। তারপর সমাজের উঁচু শ্রেণীর মানুষ, ঐতিহাসিক মানুষ এবং শেষে সাধারণ পেশাজীবী ও তাদের জীবন লোককথায় ক্রমবিবর্তিত হয়েছে।

সাধারণ পেশাজীব সম্পর্কে গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে :

'তোষক নিয়ে মাঝি রওনা হল। ....

শ্রীবৎস আর চিন্তামণি আরেকটু এগিয়ে গিয়ে দেখলেন একটি গ্রাম। ঐ গ্রামের বাসিন্দাদের মধ্যে বেশির ভাগই কাঠুরে। তারা ভোরে উঠে বনে কাঠ কাটতে যেত আর কাঠ কাটা হলে কাছেই এক নগরে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করত।..... আবার তারা পথ ধরলেন। হাঁটতে হাঁটতে অনেকখানি পথ পার হয়ে একটা গ্রামে পৌঁছলেন, সেখানকার লোকরা তাঁত বুনবার সুতো কেটে সংসার চালাত। চিন্তামণি চরকায় চমৎকার সুতো কাটতে পারতেন। তিনিও সুতা কাটা ধরলেন। ...চিন্তামণি রাঁধতেন বড় ভালো, মূর্খ গ্রামবাসীরা তাঁর রান্না খেয়ে বেজায় খুশি।' (লাল বিহারী দে, পৃ. ৭১)

এ উদ্ধৃতি থেকে সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে, শ্রীবৎস তার অবস্থান ছেড়ে গ্রাম দেশে বের হয়েই দেখল বৃক্ষ লতা পাতায় ঘেরা সুদৃশ্য গ্রাম। এ গ্রামের পাশ দিয়ে প্রবাহিত নদী অপূর্ব ছবির মতন মনে হয়। এই গ্রামেই বাস করে নৌকার মাঝি, গরীব কাঠুরিয়া, দরিদ্র তাঁতী, তাদের শিক্ষা নেই, দীক্ষা নেই, বড়ই অবহেলিত। এই অবহেলা কাটানোর প্রচেষ্টায় তারা সতী নারীর অলৌকিক ক্ষমতা আছে বলে বিশ্বাস করে। গল্পে বর্ণিত আছে,

তারা ভাবল এই মেয়ের নিশ্চয়ই অলৌকিক ক্ষমতা আছে, এর সঙ্গে থাকলে বিপদে আপদে সুবিধা হবে। অমনি সেই পাপিষ্ঠ মাঝিরা চিন্তামণিকে ধরে নৌকোয় তুলে, নৌকো ছেড়ে দিল।

এ গল্পের অলৌকিকত্বটুকু উপলক্ষ মাত্র। এখানে লোকক্রীড়ার প্রসঙ্গটি গুরুত্বের দাবীদার। 'সময় কাটাবার জন্য মাঝিরা পাশা খেলত। শ্রীবাসের

> চেহারা দেখে তাঁকে সৎ ও ভদ্র বলেই মনে হতো। তাই তারা ওকেও পাশা খেলতে ডাকত। কিন্তু শ্রীবৎস খুব ভালো খেলোয়াড় ছিলেন প্রায় সবসময় উনিই জিতে যেতেন। তাতে আবার মাঝিদের ঈর্ষা হতো। একদিন হেরে গিয়ে রেগে-মেগে তারা পানিতে ফেলে দিল। (লালবিহারী দে, পৃ. ৭২-৭৩)

তাহলে বোঝাই যাচ্ছে গল্পে দেবতার চেয়ে মানুষের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং সে মানুষ উচ্চ শ্রেণী থেকে নিম্ন শ্রেণী পর্যন্ত, আবার শিক্ষিত থেকে মূর্খ পল্লী গাঁয়ের মানুষ পর্যন্ত।

'ঠাকুরমার ঝুলি' গল্পগ্রন্থের গল্পগুলোতে আমরা রাজা-বাদশা ও রাক্ষস, রাজপুত্রের স্বপ্নের পরিবেশে তন্ত্র-মন্ত্রের প্রাধান্য লক্ষ্য করি। এর ফাঁকে ফাঁকে ছিটেফোঁটা সাধারণ পেশাজীবী মানুষের জীবন পরিলক্ষিত হয়। গল্পগুলোতে একটা বিবর্তনের ধারাও পরিলক্ষিত হয়। দেবতার কল্পনার অবসর থেকে পাত্রপাত্রী বাস্তব মানুষের জগতে উত্তীর্ণ হচ্ছে এখানে। যেমন—

> তখন, দুই বোনে যুক্তি করিয়া তাড়াতাড়ি পেঁচার পাখ বানরের ছাল আগুনে পোড়াইয়া ফেলিলেন। পোড়াতেই গন্ধ! গন্ধ পাইয়া দুই রাজপুত্র ঘোড়া ফেলিয়া ছুটিয়া আসিলেন। ছুটিয়া আসিয়া দেবকুমার দুই রাজপুত্র বলেন— "সর্বনাশ, সর্বনাশ! এ কি করিলে।'— সন্ন্যাসীর মন্ত্র ছিল, ছদ্মবেশে থাকিতাম. দেবপুরে যাইতাম আসিতাম, রাজপুরে পাহারা দিতাম,— আর তো সেসব করিতে পারিব না। এখন, আর তো আমরা বানর পেঁচা হইয়া থাকিতে পারিব না! —কথা যে প্রকাশ হইল! (ঠাকুরমার ঝুলি, কলাবতী রাজকন্যা, পৃ. ২৯)

এখানে আমরা মানুষগুলোকে তন্ত্র-মন্ত্রের প্রভাব মুক্ত হয়ে দেবতার আসর থেকে মানুষের আসরে অবতীর্ণ হতে দেখি। তারা দেবতার অলৌকিক জগৎ থেকে লৌকিক মানুষের জগতে এসে পৌঁছল। এই মানুষের জগতের যে জীবনব্যবস্থা, আচার-আচরণ, বিশ্বাস-সংস্কার-সংস্কৃতি তা প্রত্যক্ষ করি এখানে। বিশেষ করে বাঙালি জীবনের শ্রেণী বৈষম্য, বিশ্বাস-সংস্কার-আচার-ব্রত-তন্ত্র-ছড়া-প্রবাদ-সঙ্গীত, সন্ন্যাসী, জ্যোতিষীর প্রভাব, এমনকি লোকচিকিৎসা, লোকশিল্প ইত্যাদির স্পর্শ লক্ষণীয়। গল্পটির ভাব দেবতার প্রভাব মুক্ত হয়ে মানুষের জগতে নেমে এলেও সেখানে কিন্তু প্রাধান্য পেয়েছে রাজা-রাণী-রাজপুত্র-রাজকন্যার বিলাসী জীবন। তবে তা যে বাংলাদেশের মাটি-আলো হাওয়ায় প্রতিপালিত হচ্ছে এতে কোনো সন্দেহ নাই। আর এই পারবেশে বিচিত্র পেশাজীবী মানুষ উচ্চ-বর্ণ, নিম্নবর্ণ পরস্পর নির্ভরশীলতায় জীবন যাপন করছে।

'ঘুমন্তপুরী' শীর্ষক গল্পটিতে ঐ রাজা-রাজপরিবেশ- তন্ত্রমন্ত্রের প্রভাব পরিলক্ষিত।

তবে সেখানেও বাঙালি জীবনের সংস্কার, বিশ্বাস, আচার-আচরণ-পূজা-অর্চনা-বিয়ে- শাদী-যৌতুক প্রথার মধ্য দিয়ে বিচিত্র পেশাজীবী মানুষের পরিচয় পাওয়া যায়। 'কাঁকনমালা', 'কাঞ্চনমালা' গল্পে সরাসরি উচ্চশ্রেণীর মানুয ও নিম্নশ্রেণীর মানুষের চিত্র পাই। এখানে মানুষের বিশ্বাসভঙ্গ করার প্রবণতা, নিম্নশ্রেণীর সঙ্গে উচ্চশ্রেণীর আচরণ বৈষম্য, এসব কিছু পরিলক্ষিত হয়। এখানে সাধারণ রাখাল বন্ধুর সঙ্গে রাজপুত্র ওয়াদা ভঙ্গ করছে। আমরা উদ্ধৃতি দিয়ে বিষয়টি বিশ্লেষণ করতে পারি। যেমন—

> এক রাজপুত্র আর এক রাখাল, দুই জনে বন্ধু। রাজপুত্র প্রতিজ্ঞা করিলেন, যখন তিনি রাজা হইবেন, রাখাল বন্ধুকে তাঁহার মন্ত্রী করিবেন।
>
> রাখাল বলিল 'আচ্ছা'।
>
> দুইজনে মনের সুখে থাকেন। রাখাল মাঠে গরু চরাইয়া আসে, দুই বন্ধুতে গলাগলি হইয়া গাছ তলে বসেন রাখাল বাঁশী বাজায়, রাজপুত্র শোনেন। এইরূপে দিন যায়।
>
> রাজপুত্র রাজা হইলেন। রাজা রাজপুত্রের কাঞ্চনমালা রাণী, ভাণ্ডার ভরা মানিক, কোথাকার রাখাল, সে আবার বন্ধু! রাজপুত্রের রাখালের কথা মনেই রহিল না। (দক্ষিণারঞ্জন, ঠাকুরমার ঝুলি, পৃ. ৩৬)

এই যে চিত্র এখানে কিন্তু সরাসরি বাংলাদেশের পেশাজীবী হিসেবে রাখাল ও রাজপুত্রের জীবনচিত্র প্রতিফলিত। এখানকার মানুষের মনস্তত্ত্ব, আচার-আচরণ এমনকি প্রাকৃতিক পরিবেশ সবকিছুই বাংলাদেশের। মাঠের গাছ তলায় রাখাল, রাখালী বাঁশীর সুর স্মৃতিতে দোলা দিয়ে যায়। কিন্তু তার মধ্যে রাজপুত্রের ওয়াদাভঙ্গের কারণে সমস্ত শরীরে সূচ বিঁধে সে অসুস্থ হল— এ অংশটুকু কাল্পনিক বলে মনে হয়। তবে পেশাজীবী হিসেবে দাসীর বিশ্বাসঘাতকতা তার দারিদ্র্যজনিত কামনা বাসনার মনস্তাত্ত্বিক কারণ বলে মনে হয়। এছাড়া দাসী অপকৌশলে রাণী হয়ে যেসব কর্মকাণ্ড করছে তাও তার শিক্ষা-দীক্ষার অভাবজনিত কারণে। রাজপুত্রের কাঞ্চনমালা ও কাঁকনদাসীর মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে যে প্রতিযোগিতা তা কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের ঐতিহ্যগত শিক্ষাদীক্ষারই প্রতিযোগিতা। যেমন—

> ১. 'রাজপুরীতে গিয়া কাঁকনমালা পুরী মাথায় করিল। মন্ত্রীকে বলে,— আমি নাইয়া আসিতেছি, হাতী ঘোড়া সাজাও নাই কেন?' পাত্রকে বলে 'আমি নাইয়া আসিব, দোল-চৌদলা পাঠাও নাই কেন?' মন্ত্রী, পাত্রের, গর্দান গেল।
>
> সকলে চমকিল এ আবার কি! —ভয়ে কেহ কিছু বলিতে পারিল না। কাঁকনমালা রাণী হইয়া বসিল, কাঞ্চনমালা দাসী হইয়া রহিলেন! রাজা কিছুই জানিতে পারিলেন না। (ঠাকুরমার ঝুলি, পৃ. ৩৮)

এমনিভাবে দাসী তার সীমাবদ্ধ জ্ঞান বা অনভিজ্ঞতায় রাণী হয়ে প্রশাসনিক কাজের ব্যাঘাত ঘটাল, রাজপুরীর উৎসব-অনুষ্ঠানে পিঠা বানানোর প্রতিযোগিতায় হেরে গেল, আল্পনা আঁকড়ে যেয়ে মূর্খতার পরিচয় দিল। তখন সবাই বুঝলো প্রকৃত রাণী এ নয়। দাসীর দুর্বলতা যখন সবার কাছে ধরা পড়ল, তখন সে রেগে-মেগে আগুন হয়ে জল্লাদ ডেকে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানকারীদের গর্দান নেবার নির্দেশ দিল। কিন্তু ততক্ষণে জনতা ঐক্যবদ্ধ হয়ে জল্লাদকে বেঁধেছে এবং নকল রানীকে শাস্তি দিয়েছে। অতএব বোঝাই যাচ্ছে, এ দেশের মানুষের মূল্যবোধ সবসময় অসহায় মানুষের পক্ষে ক্রিয়াশীল। সে নিম্ন পেশার হোক আর উচ্চ পেশার হোক এবং এটাই বাঙালির সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতিবোধে পুনরায় রাজা ও রাখাল দীর্ঘ বিরহের পর বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হল। আর এই পরিবেশ, সমাজ, সংস্কৃতি গল্পের শুরুতেই পরিলক্ষিত হয়েছিল। এখানে পাগলের একটি চরিত্র পরিদৃষ্ট হয়। পাগল কিন্তু আসলে সাধারণ মানুষ নয়, সে একজন সাধক, সিদ্ধ মহাপুরুষ। সিদ্ধ মহাপুরুষরা সাধারণ মানুষের কাছে সাধু-সন্ন্যাসী -পাগল-ফকির বলেই পরিচিত। অথচ বাঙালি সমাজে এখনো তাদের প্রভাব পরিলক্ষিত। এ সমাজের শাসন মূলত উদার প্রেমের শাসন। এই উদারচেতনায় দেখা যায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে গরীব মানুষের সারিতে রাজা বাদশাও এসেছেন। আবার অনেক অহংকারী সামন্তপ্রভুও অসহায় দরিদ্র পেশাজীবীর মানুষের কাছে পরাভূত হয়েছেন।

'সাতভাই চম্পা' গল্পটিতে রাজপরিবারে রাজার বহুবিবাহ ও সতীনে সতীনে মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব কলহের বস্তুনিষ্ঠ চিত্র পরিলক্ষিত হয়। যে রানীদের সন্তান হয়নি, তারাই সন্তানবতী ছোট রানীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে ঘুঁটে কুড়েনীর পেশা নিতে বাধ্য করেছে। এ থেকে মনে হয় এদেশের গরীব মানুষগুলোর অনেকেই সমাজ-সভ্যতার উত্থান পতনে রাজা-বাদশাদের অনেকেই নিম্নবর্গের মানুষে পরিণত হয়েছে আবার নিম্নবর্গের অনেক মানুষই উচ্চবর্গের স্থান দখল করেছে। গল্পগুলোর অনেক গল্পে নিম্নশ্রেণীর পেশাজীবী মানুষগুলো রাজকন্যাকে বিয়ে করেছে, রাজা হয়েছে। আবার রাজপুত্র-রাজকন্যা প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে দরিদ্র পেশাজীবী মানুষে পরিণত হয়েছে। এই যে উত্থান-পতন, আমরা বাস্তব বাঙালি সমাজেও দেখতে পাই। দেখতে পাই অসহায় ক্ষুধিত আত্মা শান্তি পাবার আশায় প্রতিশোধ নেবার মানসে স্বপ্নের রাজ্যে গিয়েছে কিংবা কাল্পনিক একটি ঘটনা ঘটিয়ে শত্রুকে পরাজিত করে তৃপ্তি পেয়েছে। সমাজে তন্ত্র-মন্ত্রগুলোও একই কারণে প্রচলিত হয়েছে বলে ভাবা যায়। ভাবা যায় চাঁপাফুল, পারুল ফুলের বেদনা মথিত ভাষা কিংবা গাছপালা, পশুপাখি ইত্যাদির মুখ নিঃসৃত কথা।

'শীতবসন্ত' গল্পটিতেও রাজা ও সুয়োরাণী-দুয়োরাণীর কাহিনী বিধৃত। এখানেও সতীন-সৎমার হিংসা প্রতি হিংসা ও সতীন পুত্রের প্রতি অবহেলা পরিলক্ষিত।

গল্পটিতে ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়ায় দুয়োরাণীকে টিয়ে পাখি বানালেও কিন্তু সতীনের হিংসা, ঈর্ষা বস্তুনিষ্ঠ, কল্পনা নয়। এ গল্পেও পেশাজীবী বাঁদী-দাসী আছে, জল্লাদ আছে, সাধক-মুনি আছে, আছে পেশাজীবী হিসেবে মন্ত্রী-অমাত্য, সান্ত্রী সেপাই ইত্যাদি। এখানে পাশাপাশি দু'টি পরিবেশ পরিলক্ষিত। একটি রাজপুত্র শীতের পরিবেশ এবং শীতের পরিবেশটি উচ্চশ্রেণীর, আর অপরটি বসন্তর পরিবেশ যা সাধু সন্ন্যাসীর মত পেশাজীবী মানুষের দুঃখ-কষ্ট ও গানের জীবনচিত্র বলে অনুভূত হয়।

নিয়তির পরাকাষ্ঠায় রাজা এক সময় নিঃস্ব হলে সুয়োরাণীর সঙ্গে অভিমান করে বনবাসে গেলেন। সুয়োরাণীও পথে পথে ঘুরতে লাগলেন। অবশেষে সমুদ্রের রোষে পড়ে সন্তান হারিয়ে তিনি নিজেও আত্মহত্যা করলেন। তার সন্তানরা হল সোনার মাছ। এরপর বসন্ত ঐ মাছ নিয়ে ভাই শীতের রাজ্যে যেয়ে তার সঙ্গে মিলিত হল। সৎ ভাইরা মানুষ হয়ে পাঁচ ভাই একত্রে কান্নাকাটি করে মিশে গেল। ওদিকে রূপবতী কন্যার পিঞ্জরে টিয়াপাখি বেশে মা এবং বনবাসী বাবা পড়ে থাকল।

এবার টিয়ে পাখি মানুষ হল। সুয়োরাণী দুয়োরাণীর উপর যাদু করেছিল বলে সে টিয়া পাখি হয়েছিল। রূপবতী রাজকন্যা টিয়াপাখিকে গোসল করাতে নিয়ে গেলে টিয়ার মাথার ওষুধ বড়ি খসে পড়ে। আর অমনি তার উপর থেকে যাদুর প্রভাব কেটে যায় এবং সে দুয়োরাণীতে রূপান্তরিত হয়। তারপর দুয়োরাণী স্বীয় স্বামী সন্তান এবং সপত্নী সন্তানদের সঙ্গে মিলেমিশে সুখে দিন কাটাতে লাগলেন।

এই যে গল্পের কাহিনি, এ কাহিনিতে যাদু-মন্ত্রের প্রভাবে ও অলৌকিকভাবে মানুষের পাখি হওয়া কিংবা মাছ হওয়া অথবা পুনরায় অন্যান্য জীব থেকে মানুষে পরিণত হওয়ার বিষয়টি অস্বাভাবিক মনে হলেও এখানে মানবিক আবেদনটুকু ও পারিবারিক জীবনে সপত্নীর হিংসা-ঈর্ষায় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াটা বাঙালি সমাজের বস্তুনিষ্ঠ চিত্র বলে মনে হয়। আর এ চিত্রে বিচিত্র শ্রেণীর পেশাজীবী মানুষ উদ্ভাসিত।

'কিরণমালা' গল্পটিতে রাজ পরিবেশের প্রাধান্য আছে। রাজা, মন্ত্রী, পাত্র-মন্ত্রি, পাইক-পেয়াদা. ঘেসেরা, রাঁধুনে, ব্রাহ্মণ, সন্ন্যাসী এবং কৃষক গৃহস্থের জীবনচিত্র নিয়ে কাহিনিটি গড়ে উঠেছে। গল্পটির মায়ার পাহাড়ের প্রসঙ্গটি আড়াল করলে হুবহু আমাদের কৃষি প্রধান বাংলাদেশের চিত্রই প্রস্ফুটিত হয়। উদার রাজা দরিদ্র কৃষক কন্যাকে বিয়ে করল। কিন্তু কন্যার সন্তান হবার সময় তারই দুই বড় বোন হিংসায় জ্বলে-পুড়ে তিন বছরে তার তিন তিনটি সন্তানকে নদীতে ভাসিয়ে দেয়। এই সন্তান তিনটিকে এক ব্রাহ্মণ পর পর তিন বছর নদীতে স্নান করার পর জলে দাঁড়িয়ে জপ-আহ্নিক করার সময় ভেসে আসার সময় পায়। এরা ঐ ব্রাহ্মণের ঘরে বড় হয়। একসময় ব্রাহ্মণ মরে গেলে তারা এক সন্ন্যাসীর আশীর্বাদ প্রাপ্ত তরবারি পেয়ে মায়ার পাহাড়ের মায়ামন্ত্র কাটিয়ে সম্পদশালী হয়ে ওঠে। তারপর বাবা-মা- ভাইবোন মিলিত হয়ে সুখে দিন কাটাতে থাকে।

এ কাহিনী থেকে আমরা বাঙালি প্রজাবৎসল রাজার সন্ধান পাই, এ দেশের সামাজিক স্তরের স্পষ্ট ধারণা লাভ করি, বাংলার কৃষক গৃহস্থের কামনা-বাসনার পরিচয় পাই, আপন আত্মীয় স্বজনের হিংসা-ঈর্ষার শিকার হতে দেখি, আবার স্বাভাবিকভাবে ভাগ্যক্রমে ব্রাহ্মণের সাহায্য পেতে দেখি এবং পরিশ্রম ও সন্ন্যাসীর আশীর্বাদে পেশাজীবী মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন লক্ষ্য করি।

উদ্ধৃতি দিয়ে বিশ্লেষণ করা যায় :

> ১. তখন মন্ত্রী বলিলেন, —মহারাজ, আগে আগে রাজারা মৃগয়া করিতে যাইতেন— দিনের বেলা মৃগয়া করিতেন, রাত্রি হইলে ছদ্মবেশ ধরিয়া প্রজার সুখ-দুঃখ দেখিতেন। সেদিনও নাই, সেকালও নাই, প্রজার নানা অবস্থা।
>
> শুনিয়া রাজা বলিলেন,— "এই কথা? কালই আমি মৃগয়ায় যাইব।" রাজা মৃগয়া করিতে যাইবেন, রাজ্যে হুলুস্থুল পড়িল। হাতী সাজিল, ঘোড়া সাজিল, সান্ত্রী সাজিল, পঞ্চকটক নিয়া, রাজা মৃগয়ায় গেলেন।
>
> রাজার তো নামে মৃগয়া। দিনের বেলায় মৃগয়া করেন, হাতীটা মারেন, বাঘটা মারেন, রাত হইলে রাজা ছদ্মবেশ ধরিয়া প্রজার সুখ-দুঃখ দেখেন।" (দক্ষিণারঞ্জন, ঠাকুরমার ঝুলি, পৃ. ৬১)
>
> একদিন রাজা এক গৃহস্থের বাড়ীর পাশ দিয়া যান; শুনিতে পাইলেন, ঘরের মধ্যে গৃহস্থের তিন মেয়েতে কথাবার্তা বলিতেছে।—
>
> রাজা কান পাতিয়া রহিলেন্
>
> বড বোন বলিতেছে, —'দ্যাখলো, আমার যদি রাজবাড়ীর সঙ্গে বিয়ে হয়, তো আমি মনের সুখে কলাই-ভাজা খাই!"
>
> ছোট বোন বলিল,— "আমার যদি রাজার সঙ্গে বিয়ে হইত, তো আমি রাণী হইতাম!"......
>
> শুনিয়া রাজা চলিয়া গেলেন। (ঠাকুরমার ঝুলি, পৃ. ৬১-৬২)

উদ্ধৃতিটির প্রথম অংশে রাজার প্রজাবৎসল মনোভাবের পরিচয় মেলে। দ্বিতীয় অংশে এসে আমরা বাঙালি সমাজের তিনটি স্তরের পরিচয় পাই। এই স্তরগুলোর পরেও পেশাভিত্তিক যে উপস্তর আছে তারও দৃষ্টান্ত রয়েছে। আমরা এখানে দেখছি তিনটি স্তরই রাজবাড়ী কেন্দ্রিক। তাহলে বোঝা যাচ্ছে, বাংলার ভূস্বামীদের অধীনেই সকল পেশার প্রচলন লক্ষণীয়। আর এই ভূস্বামী নিম্নবর্গের পেশাভিত্তিক মানুষগুলোর উপরই নির্ভরশীল। এই নির্ভরশীলতার কারণেই বাঙালি সমাজ সমন্বিত ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। তারপরেও যে পেশাজীবী মানুষের মানবিক আশা-আকাঙ্ক্ষা, কামনা-বাসনা, হিংসা-ঈর্ষা, লোভ-লালসা এবং অতৃপ্তি হেতু যে স্বপ্নের জগৎ গড়ে ওঠে তার ভিত্তিতে লোককথাগুলো সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে হয়।

পশুপাখির গল্পগুলোর মধ্যে 'শিয়াল পণ্ডিত' একটি অন্যতম গল্প। গল্পটি পড়লেই বোঝা যায়, সমাজে বিচিত্র ধরনের পেশাজীবী মানুষ বসবাস করে। এই বিচিত্র মানুষ নিয়েই বাঙালি সমাজ গঠিত। এই মানুষগুলোর কেউ শিক্ষিত, কেউ অশিক্ষিত, কেউ বুদ্ধিমান, কেউ নির্বোধ, কেউ উদার, কেউ শঠ ইত্যাদি। এই শঠ ধরনের একটি চরিত্র শিয়াল। শিয়াল মূলত একটি চতুর প্রাণী। এই চতুরতার জন্য সবাই তাকে ব্যঙ্গ করে পণ্ডিত বলে অভিহিত করে। মূলত গল্পটিতে শিয়ালকে শঠ পেশাজীবী মানুষের প্রতীক হিসেবে ধরা হয়েছে। প্রকারান্তরে কুমীর হল বোকা গৃহস্থ মানুষ। প্রকৃতপক্ষে চতুর মানুষগুলো সহজ-সরল বোকা মানুষদের ঠকায়। এই জন্য কুমীর শিয়ালের কাছে ঠকেছে এবং শেষ পর্যন্ত সন্তান-সন্ততি হারিয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে। আমাদের বাস্তব সমাজেও এমন চিত্র দুর্লক্ষ্য নয়। অর্থাৎ বস্তুনিষ্ঠ সমাজের সুখ-দুঃখে ভরা নানা পেশার মানুষের জীবনচিত্রই এখানে উদ্ভাসিত। যেমন—

> ইয়া-ইয়া গোঁফে চাড়া দিয়া, শিয়াল পণ্ডিত শটীর বনে এক মস্ত পাঠশালা খুলিয়া ফেলিল।
>
> এই পাঠশালায় বিভিন্ন জাতের ছাত্র ভর্তি হল। এ দেখে কুমীর তার ছানাকে ভর্তি করল। এখানে সমাজের শিক্ষা ব্যবস্থার চিত্রই প্রতিফলিত বলে মনে হয়। শঠ মানুষদের শোষণ-পেষণের চিত্র তার মধ্যে বাদ যায় না।
>
> কুমীরের ছানাকে ভর্তি করিয়ে দিয়ে মাঝে মাঝে বাচ্চাদের বাসায় নিয়ে আদর-যত্ন নেওয়ার কথায় কুমীর কুমীরাণীকে বলে—
>
> 'কালতো আমার ছেলেরা বিদ্যা গজ্ গজ্ ধনুর্ধর হইয়া আসিবে, আজ একবার দেখিয়া আসি।' ভাবিয়া কুমীরাণীকে বলিল, —ওগো ইলিস-খলিসের চচ্চড়ি, রুই-কাতলার গড়গড়ি, চিতল বোয়ালের মড়মুড়ি সব তৈযার করিয়া রাখ, ছেলেরা আসিয়া খাইবে।' বলিয়া কুমীর, পুরানো চটের থান, ছেঁড়া জালের চাদর, জেলে ডিঙ্গির টোপর পরিয়া একগাল শেওলা চিবাইতে চিবাইতে ভুড়িতে হাত বুলাইতে বুলাইতে পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে গিয়া উপস্থিত। (ঠাকুরমার ঝুলি, পৃ. ১১৯-২১)

উদ্ধৃতিতে অনুভূত হয় যে, কুমীর যদি কোনা গৃহস্থ বাঙালি পরিবারের অভিভাবক হয় তার সন্তানকে যদি শঠ অসৎ পেশাজীবী শিক্ষকের কাছে পড়তে দেয়, তবে এ সন্তান ও অভিভাবকের যে অবস্থা হবে শিয়াল পণ্ডিতগল্পে সে চিত্রই তুলে ধরা হয়েছে। পল্লী বাংলার সাধারণ মানুষের ঘরে অতিথি আপ্যায়নের উজ্জ্বল চিত্রও প্রতিফলিত এই গল্পে। যেমন—

> তাড়াতাড়ি উঠিয়া পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, —'আসুন, আসুন, বসুন, বসুন; হ্যাঁরে, গুরার তামাক দে, আরে ফড়িঙ্গে, নস্যির ডিবে নিয়ে আয়।

গ্রামের গৃহস্থ বাড়িতে অতিথি আপ্যায়নের এই চিত্রে তামাক সেবন কিংবা পান-তাম্বুলের প্রচলন আবহমান বাংলার ঐতিহ্য। অনেক সময় শঠ লোকেরা আদর আপ্যায়ন করে পেছনে ক্ষতি করে। এই ক্ষতি শিয়াল ধারাবাহিকভাবে করে গেছে। সে নিম্নশ্রেণীর পেশাজীবীদেরও ঠকিয়েছে। নাপিত, কুমোর, ঢুলি, পুরুত কেউই বাদ যায়নি। এ থেকে বোঝা যায়, বাংলাদেশের সমাজ ও সমাজে ভালো মন্দ মানুষের চিত্র।

'সুখু-দুখু' গল্পটিতে এক তাঁতী পরিবারের বস্তুনিষ্ঠ জীবন চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। এই প্রতিফলনে দেখা যায় দুই সতীনের হিংসা, দ্বন্দ্ব। তাঁতী মারা গেলে এ হিংসা-দ্বন্দ্ব আরো তীব্র হয়। বড় বৌ তাঁতীর সব কিছু নিয়ে পৃথক হয়ে যায় এবং তার সন্তানসহ সুখে দিন কাটায়। কিন্তু ছোট বউ তার সন্তান দুখুকে নিয়ে কষ্টে দিনপাত করে। গল্পে বর্ণিত হয়েছে—

> সুকুর মা আজ হাটে বড় মাছের মুড়াটা আনে, কাল হাটের বড় লাউটা আনে, রাঁধে, বাড়ে, সতীন সতীনের মেয়েকে দেখাইয়া দেখাইয়া খায়। দুখুর মা আর দুখু দিনে রাত্রে সূতা কাটিয়া কোনদিন একখানা গামছা, কোনদিন একখানা ঠেঁটী, এই হয়। তাই বেচিয়া এক বুড়ি পায়, তাই দিয়া মাযে ঝিয়ে চারিটি অন্ন পেটে দেয়। (ঠাকুরমার ঝুলি, পৃ. ১২৭)

বাঙালি সমাজের এই দুঃখী মানুষগুলো যেন প্রকৃতির স্বাভাবিক সহানুভূতিতে পেশাজীবী হয়ে বেঁচে থাকে। তাই বাতাস তাদের সাহায্য করবে বলে কথা দেয়, কলাগাছ এগিয়ে আসে ঘোড়া সাহায্য করে বলে কল্পনা করা হয়। কল্পনায় চাঁদের বুড়িও উদার দৃষ্টিতে সহানুভূতি দেখায়। এটুকু কল্পনা বলেই মনে হয়। কিন্তু চাঁদের বুড়ির আদর আপ্যায়ন, পুকুরে ডুব দিয়ে গোসল করে আসার কথা, ক্ষার খৈল গায়ে মেখে গোসল করার তাগাদা দেওয়া, পান্তা খেতে বলা এসব যেন আবহমান বাংলার দাদী-নানীর শাশ্বত আদর আপ্যায়ন। তদ্‌সঙ্গে বাঙালি মায়ের সন্তান বাৎসল্যের পরাকাষ্ঠাও ভিন্ন প্রকৃতির বলে উপলব্ধি জন্মে। উপলব্ধি জন্মে এসবই বাংলার নিম্নবর্ণের পেশাজীবী মানুষের বাস্তব ও কল্পনায় সমন্বিত রূপ যেন গল্পগুলোতে প্রতিফলিত।

গল্পটির সারমর্মে সুখু ও দুখুর মায়ের অহংকারেরপতন ঘটেছে। তারা প্রকৃতির কাছে দুখুর সমতুল্য সাহায্য সহযোগিতা পায়নি। চাঁদের বুড়ির কল্পনায় সুখুর ব্যবহারও খারাপ বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। অর্থাৎ সুখুদের উপর প্রকৃতি বিরূপ হয়ে প্রতিশোধ গ্রহণ করেছে। ঘোড়া লাথি মেরেছে, কলাগাছের এক কাঁদি কলা তার উপর ছিঁড়ে পড়েছে, গাই শিং বাঁকা করে তাড়া করল, অজগর সুখুকে খেয়ে ফেললো— এসব মানসিক কল্পনায় প্রতিশোধ গ্রহণের চিত্র উদ্ভাসিত।

কিন্তু সুখুর জন্য সুখুর মায়ের দুয়ারে আল্পনা এঁকে, ঘট পল্লব নিয়ে জোড়া পিঁড়ি

সাজিয়ে বরণ ডালা নিয়ে অপেক্ষা করার দৃশ্যটি শাশ্বত বাঙালি মায়ের হৃদয়গত সংস্কার সংস্কৃতির বিষয় বলেই মনে হয়। এবং তাও পেশীজীবী মানুষের হৃদয় থেকে উৎসারিত।

মোটকথা 'ঠাকুরমার ঝুলি' গল্প গ্রন্থের গল্পগুলোতে বাঙালি সমাজের বস্তুনিষ্ঠ চিত্র উদ্ভাসিত হয়েছে। এ সমাজের মানুষগুলো নানাভাবে নানা পেশায় শ্রেণী বিভক্ত হয়ে আছে বটে, কিন্তু তারা ব্যক্তি পরিবার, সমাজ ও জাতিগতভাবে শাসনে-পেষণে, বাস্তব-কল্পনায়, সংস্কার-বিশ্বাসে, সংস্কৃতি-সভ্যতায়, ঐতিহ্য-মূল্যবোধে, ব্যবসা-বাণিজ্যে, ধর্ম-কর্মে, আচার-অনুষ্ঠানে, জীবিকা-পেশায় আবহমান বাংলার শাশ্বত চিত্র তুলে ধরেছে।

সূত্রপঞ্জী :

১. পল্লব সেনগুপ্ত; লোককথার অন্তর্লোক, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৫ আগষ্ট, ২০০০। পৃ. ৯

২. অন্তরা মিত্র, জাতীয়তাবাদী পদ্ধতিতে বাংলা লোককথার বিচার-বিশ্লেষণ, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, সেপ্টেম্বর ২০০৪। পৃ. ১০

৩. জাহিদুর রহমান, বাংলাদেশের পেশাজীবী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম পুনর্মুদ্রণ, বৈশাখ ১৪১৪, এপ্রিল -২০০৭।

৪. নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস, পৃ. ২১০.....

৫. নীহাররঞ্জন রায় বাঙালীর ইতিহাস, পৃ ১৩২-৩৩

৬. আহমদ শরীফ : বাঙলা বাঙালী ও বাঙালীত্ব অনন্যা, ৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০০৭, পৃ. ৬৮

৭. ড. এম. এ. রহিম, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ফাল্গুন-- ১৩৮৮, মার্চ ১৯৮২, পৃ. ৩০৮

৮. আহমদ শরীফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯-৭০

৯. ড. এম. এ. রহিম, ঐ পৃ. ৩১২

১০. নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস, পৃ. ৫২৫

১১. রেভারেণ্ড লাল বিহারী দে, ফোক টেলস অব বেঙ্গল, (বাংলার উপকথা), মেরাজ প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন্স, ৪-৬ জয়চন্দ্র ঘোষ লেন, প্যারীদাস রোড, ঢাকা।

প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারী ২০০৫, ফাল্গুন ১৪১১, পৃ. অনুবাদকের নিবেদন অংশ।

১২. ঐ, অনুবাদকের নিবেদন অংশ, পৃ. ৯-১০

লোককথায় নারী নির্যাতন

পীযূষ মণ্ডল

লোককথা লৌকিক সমাজের এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। জনগোষ্ঠীর মানবিক ও মানসিক সেতু বন্ধনের মাধ্যম। সাধারণ মানুষ এসব কাহিনী বলে চলেছেন সেই কোন ভুলে যাওয়া কাল থেকে। সারাদিনের ক্লান্তি শেষে তারা যখন লোককথা বলেন তখন নিজের জীবন ও সামাজিক পরিবেশের না-মেটা আকাঙ্ক্ষা ও ইচ্ছাপূরণ নানাভাবে প্রকাশ হয়ে পড়ে। লোককথার গল্পরসের মাধ্যমেই সামাজিক বোধের উন্মেষ ঘটবে। জীবনকে না জানলে ব্যক্তি মানুষের উপলব্ধি পূর্ণতা পায় না। লোককথা আমাদের সেই সোনারকাঠি রূপোরকাঠির জীবনের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেয়। লোককথা শুধুমাত্র আনন্দের অভিব্যক্তি নয়, এর মধ্যে লোকসমাজের বেদনার সংগ্রামশীল রূঢ় বাস্তবের ঐতিহাসিক রূপটি লুকিয়ে আছে। দারিদ্র্য বঞ্চনা উৎপীড়ন ইচ্ছাপূরণের তাগিদ ও কঠিন জীবনযুদ্ধের জ্বালা লোকসমাজের সর্বক্ষণের সঙ্গী। লোককথায় যে বাস্তব অবস্থার প্রকাশ ঘটে তা আসলে রূপকের আবরণে জীবনের কথা। লোককথায় অতিলৌকিক ঘটনাবলী রয়েছে, রয়েছে কল্পনার ছড়াছড়ি। মানুষ বলেই সে কল্পনা করতে পারে আর বঞ্চিত জীবনের ইচ্ছাপূরণের আকাঙ্ক্ষায় অতিলৌকিক ভাবনাচিন্তার চিত্রায়ন ঘটে। কিন্তু এমন কোন চরিত্র বা আচরণ নেই যা আমাদের সমাজের বাইরে। এই সব চরিত্রগুলি সবই আমাদের চেনা মানুষ। মানুষের কামনা বাসনা স্বভাব আচার আচরণ সামাজিক সম্পর্ক সর্বোপরি পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নারীর অবমূল্যায়ন চরিত্রগুলির মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়।

প্রবহমান কাল ধরে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীরা অবহেলিত নির্যাতিত। তারই প্রকাশ ঘটেছে লোককথাগুলির মধ্যে। নদীয়ায় প্রাপ্ত লোককথাগুলির মধ্যে অন্যতম 'চিল মা' গল্পে আমরা দেখি এক ব্যক্তির পরপর সাতটি কন্যাসন্তান। তখন সে ঠিক করল এরপর কন্যা সন্তান হলে সে তাকে জলে ভাসিয়ে দেবে। দেখা গেল এবারও লোকটির কন্যা সন্তান জন্ম নিল। তখন লোকটি সত্যিসত্যিই হাড়ির মধ্যে কন্যা সন্তানটিকে রেখে জলে ভাসিয়ে দিল।

একটি চিল ও কাকের খুব বন্ধুত্ব ছিল। একদিন তারা দেখে একটি হাড়ি জলের মধ্যে ভাসছে। তখন হাড়িটিকে তারা তুলে আনার চেষ্টা করে। অবশেষে হাড়িটিকে জল থেকে তুলে এনে দেখে তার মধ্যে একটি মানব শিশু কন্যা।

চিল মা শিশুকন্যাটিকে মানুষ করতে থাকে। মেয়েটি আস্তে আস্তে বড় হয়ে উঠল। একদিন কন্যাসন্তানটি পাখির বাসায় মানুষ হচ্ছে বলে কাঁদতে থাকে। তখন তার

চোখের জল গিয়ে পড়ে গাছের নিচে বসে থাকা পথিকেব গায়ে। পথিক গাছে উঠে দেখল একটি সুন্দরী কন্যা। পথিক তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিল।

'চিলমা' এসে পথিকের সঙ্গে কন্যার বিয়ে ঠিক করল। কন্যার প্রতি চিলমার স্নেহ তাকে নিয়ে চলল সন্তানের সঙ্গে। একদিন চিলমা মানুষের মত করে উঠোনে হাঁটছিল। তখন তার কন্যাটি ঘরে রান্না করছিল, কন্যাটি মনের অজান্তে গরম ফ্যান উঠোনে ছুঁড়ে দিলে তা গিয়ে পড়ে চিলের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে চিলমা মারা যায়।

এই গল্পের মধ্যে নারীর প্রতি অবমাননা ঘটেছে দারুণভাবে। এবং এই নির্যাতন বর্তমান সমাজেও তার প্রভাব বিস্তার করেছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে কন্যা সন্তানরা অবহেলিত দীর্ঘকাল ধরে। গল্পের মধ্যেও আমরা দেখি এক ব্যক্তি তার কন্যাসন্তানকে জলের মধ্যে ভাসিয়ে দিচ্ছে। বর্তমানে মানুষ যত শিক্ষিত হচ্ছে ততই যেন কন্যাসন্তানের প্রতি অবহেলা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। গল্পের মধ্যে কন্যাসন্তানটিকে উদ্ধার করেছে চিল ও কাক। বর্তমান সমাজে আমরা দেখি পরিত্যক্ত কোনো শিশুকে আগলে বসে আছে রাস্তার কুকুর। গল্পের শেষে দেখি চিলমা মানবসমাজে আসায় তার মৃত্যু হল।

সাধারণত আমরা জানি পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষদের দ্বারা নারীরা নির্যাতিত হয়। কিন্তু নদীয়ার লোককথার 'সাতভাই ও একবোন' গল্পে আমরা দেখি একজন নারীর দ্বারা অন্যত্র নারী নির্যাতিত হচ্ছে।

এক রাজার সাতটি ছেলে ও সবার ছোট একটি মেয়ে। হঠাৎ রানী একদিন মারা গেল। রাজা আবার দ্বিতীয়বার বিয়ে করল। কিন্তু ছোটরানী এই ছেলেমেয়েদের মেনে নিতে পারল না। উপরন্তু তাদের কীভাবে ক্ষতি করা যায় সেই চিন্তা করতে লাগল।

রানী একদিন এক সাধুর কাছে থেকে শিখে নিল কীভাবে মানুষকে পাখি বানানো যায়। সেই মন্ত্রপ্রভাবে ছোটরানী সাতভাইকে পাখি করে দিল। তারা দিনে হবে পাখি রাতে হবে মানুষ। সাতভাই তখন একটি তালগাছে বাসা তৈরি করল। এবং রাতে থাকার জন্য তালগাছের তলায় একটি ঘর বানাল।

অন্যদিকে রাজবাড়িতে ছোটরানী সাতভাইয়ের বোনকে খুবই খাটায়। খেতে দেয় পোড়া রুটি, কখনো আবার না খাইয়ে রাখে। তখন বোনটি মনের দুঃখে বনে চলে গেল। তালগাছের নিচে যে ঘরটি রয়েছে সেখানে গিয়ে সে কাঁদতে লাগল। সন্ধ্যার সময় সাতভাই ঘরে এসে তাদের বোনকে চিনতে পারল। এবং বোনের কাছে সব দুঃখের কথা শুনল। তখন তারা তাদের বোনকে আর বাড়িটিকে একটি নদীর তীরে নিয়ে এল।

একদিন বোন কাঁদতে কাঁদতে নদী থেকে ফিরছিল। তখন এক সাধুর সঙ্গে তার দেখা হয়। সাধুবাবাকে তার সমস্ত দুঃখের কথা খুলে বলল। তখন সাধুবাবা বোনকে একবাণ্ডিল সুতো দিল। এবং সাধুবাবা বলল এই সুতো দিয়ে তৈরি জামা সাতভাইকে পরিয়ে দিল তারা আবার মানুষ হয়ে যাবে। কিন্তু একটি শর্ত মানতে হবে, জামা

যতক্ষণ না শেষ হবে ততক্ষণ কোন কথা বলা যাবে না। বাড়িতে এসে বোন কারো সঙ্গে কোন কথা না বলে জামা তৈরি করতে শুরু করল। মাঝরাতে সব সুতো ফুরিয়ে গেল। একটি জামার অর্ধেক হলেই সাতটি জামা তৈরি হয়ে যাবে।

তখন পাশেই রাজার বাড়িতে সুতো চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ল সে। রাজা সকালে তার বিচার করবেন। রাত শেষ হবার আগেই বোন বাকি জামাটির অর্ধেক বুনে শেষ করে ফেলল। সকালে যখন বোনকে দরবারে আনা হল, সেই সময় আকাশ দিয়ে সাতভাই উড়ে যাচ্ছিল। সাতটি জামা বোন সেই দিকে ছুঁড়ে দিল। তারা জামাগুলি গায়ে পরতেই মানুষ হয়ে গেল। রাজা তাদের কাছে সব কথা শুনল। তখন একটি বাক্সের মধ্যে একজোড়া গরম লাল টকটকে জুতো ওদের হাতে দিয়ে বললেন এই উপহার ছোট রানীকে দেবে।

বাড়ি গিয়ে তারা রাজার কথা মত সেই জুতো রানীকে দেয়। ছোটরানী সেই জুতো পায়ে দিতেই অমনি জ্বলেপুড়ে মারা গেল।

সংসারে থাকতে গেলে নানা কারণে মাঝেমধ্যে অশান্তি হতে পারে। কিন্তু সেই অশান্তি আবার কেটেও যায়। সমস্যা যেমন আছে তার সমাধানও আছে। সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, হাসি-কান্না ইত্যাদি মিলেমিশেই জীবন, জীবনে তো বৈচিত্র্য থাকবেই। কিন্তু এই বৈচিত্র্যের মধ্যেই আমরা দেখি এমন এক একটি সমস্যা আমাদের সামনে এসে উপস্থিত হয় যার সমাধান সম্ভব নয়। যেমন 'সাতভাই ও এক বোন' গল্পে সৎ মায়ের প্রতিহিংসা। আমাদের বাস্তব জীবনে সমাজের আনাচে কানাচে এই সমস্যাগুলি দানা বাঁধে প্রতিনিয়ত। এতে সাংসারিক জীবন হয়ে ওঠে বিষণ্ণ। সন্তানরা ভোগে নিরাপত্তাহীনতায়। তাদের উপর নেমে আসে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন। যেমন খেতে না দেওয়া, বেশি কাজ করানো। আবার অনেক সময় আমরা দেখি সৎ মায়ের প্রতিহিংসা কখন চরম পর্যায়ে পৌঁছায় যাতে সন্তানের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটে।

ঢাকার গ্রামাঞ্চলে জনপ্রিয় কাহিনীগুলি সাধারণভাবে কিস্‌সা নামে পরিচিত। কিস্‌সা শব্দের অর্থ গল্প, কাহিনী। ঢাকার গ্রামাঞ্চলে কিস্‌সা শিরোনামায় প্রচলিত রচনাগুলি একদিকে যেমন লোককথা অন্যদিকে তেমনি গীতিকা। সংগৃহীত কিস্‌সাগুলি গীতিধর্মী রচনা। এই লোককথাগুলি বিশ্লেষণ করলে নারীর প্রতি পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গী এবং নারী নির্যাতনের চিত্র আমরা পাব।

গ্রন্থে প্রথম কাহিনীর নাম চূড়ামণির কিস্‌সা। এই কিস্‌সা সাতখণ্ডে বিভক্ত। একটি কেন্দ্রীয় কাহিনীর আধারে সাতটি কাহিনীর মাধ্যমে 'কিস্‌সা' সমাপ্ত। জনৈক শিষ্যকে আশ্চর্য ঘটনার তাৎপর্য বর্ণনা প্রসঙ্গে তাঁর গুরু এই সাতটি কাহিনী বলেছেন। এসব কাহিনীর কয়েকটিতে নারী নির্যাতনের দৃশ্য আমাদের মানসিকতাকে ক্ষুণ্ণ করে।

চূড়ামণির কিস্‌সার দ্বিতীয় খণ্ডের কাহিনীটি হল, গুরু ও শিষ্য অনেক পথ অতিক্রম করে গাছের তলায় এসে বসল। তখন চূড়ামণি বাজারে খাবার আনতে গিয়ে দেখে, নদীর ধারে একটি হাত যখন জলের মধ্যে পড়ে তখন ঢেউ এসে তাকে টানে তুলে দেয়। টানে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে পাড়ের বালু সরে যায় তখন হাতটি আবার জলের মধ্যে

এসে পড়ে। এই দৃশ্য চূড়ামণি গুরুর কাছে এসে বলে। গুরু তখন আসল কাহিনীটি বলতে থাকে।

এক রাজার সাত ছেলে এক মেয়ে। একদিন রাজার ছেলেরা বাণিজ্যে যাবার প্রস্তুতি নেয়। যাবার আগে বোনকে জিজ্ঞাসা করে তার জন্য কি আনবে? বোন তখন বলে তার চিড়িয়াখানায় সবই আছে একটি বাঘ নেই। তাই বোন তাদের একটি বাঘ আনতে বলে।

এরপর হঠাৎ একদিন একজন সাধু এসে উপস্থিত হয় সওদাগরের বাড়িতে। সওদাগরের চিন্তা সে দূর করবে। বাড়ির সকলে তাকে দেখতে এলেও এল না শুধু সওদাগরের কন্যা। এক সময় সাধু জানালা দিয়ে সওদাগরের কন্যাকে চিড়িয়াখানার মধ্যে দেখতে পায়। কন্যাকে দেখে সাধু ভাবতে লাগল কিভাবে তাকে হাত করা যায়। সাধু তখন সওদাগরকে প্রশ্ন করে কেন তার কন্যা আশীর্বাদ নিতে আসে নি? তখন সওদাগরকে সে আদেশ দেয় রাত্রে যেন কন্যাকে তার কাছে নিয়ে আসে। তাকে সে আশীর্বাদ করবে। রাতে কন্যাটি যখন সাধুর কাছে এল, সেই মুহূর্তে সওদাগরকে সে ফুল আনতে বাগানে পাঠায়। এই সুযোগে সাধু কন্যার হাত চেপে ধরে। তখন সে তার কাছ থেকে পালিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে দরজা আটকে রাখে। সাধু তখন সওদাগরকে বলে তার মেয়ে অলক্ষ্মী। এই মেয়ের জন্যই তার অমঙ্গল। এই মেয়েকে বাড়ি থেকে বের করে দিতে হবে। সওদাগর তখন সিন্দুকের মধ্যে মেয়েকে আটকে নদীতে ভাসিয়ে দিল।

এদিকে সওদাগরের সাত ছেলে বাণিজ্য করে দেশে ফিরছিল। তখন নদীর মধ্যে সিন্দুক দেখতে পেয়ে সিন্দুকটি নৌকার মধ্যে টেনে তোলে। সিন্দুকটি তারা খুলে দেখে তার মধ্যে তাদের বোন। বোনের কাছে সমস্ত ঘটনা শুনে তারা একটি বুদ্ধি করল। বোনের জন্য যে বাঘটি তারা এনেছে সেটি সিন্দুকের মধ্যে আটকে জলে ভাসিয়ে দিল।

সাধু সেই সিন্দুকটিকে বাড়ি নিয়ে আসে। সাধু যখন সিন্দুকটি খুলল বাঘটি তখন সাধুকে খেতে শুরু করল। সাধুর সমস্ত দেহটি বাঘ খেলেও খেল না শুধু হাতটি। যে হাত দিয়ে সে কন্যার হাত ধরেছিল, সেই হাতটি ছিল পাপে পূর্ণ। হাতটি নদীতে ফেলা হল নদীর জল কাঁদতে শুরু করে। সেজন্য ঢেউ হাতটিকে উপরে তুলে দেয় সঙ্গে সঙ্গে মাটিও সরে যায়।

গল্পের মধ্যে নারীর প্রতি অত্যাচার চরম পর্যায়ে পৌঁছায় অসৎ সাধুর আচরণে। গল্পে সাধু ভণ্ড মানুষের প্রতীক। ভালোমানুষের আড়ালে ভেকধারী অসৎ চরিত্রের মানুষ। এই সব মানুষেরা নিজের স্বার্থ চরিতার্থতার জন্য ভালোমানুষের ছদ্মবেশ ধারণ করে। এরা সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নতুন ছদ্মবেশ ধারণ করে। নতুন ফন্দি আঁটে। ফলে এদের চেনা মুশকিল। এই ছদ্মধার্মিকদের পাশবিক লালসার শিকার হয় নারীরা। এরা ছড়িয়ে রয়েছে সমাজের বিভিন্ন প্রান্তে। এসব মানুষদের জন্য মেয়েরা স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারে না। তারা অনুভব করে নিরাপত্তাহীনতা জনিত

মানসিক যন্ত্রণা। ফলে নারীরা গৃহবন্দী হয়ে থাকে। কিন্তু তাতেও এইসব ভেকধারী মানুষদের শান্তি নেই। তারা আবার পরিকল্পনা করে কীভাবে নারীদের ঘরের বাইরে আনা যায় যাতে তারা তাদের জৈবিক চাহিদা পূরণ করতে পারে। গল্পের মধ্যে সাধুর অসততার প্রকাশ ঘটে সওদাগর কন্যার হাত ধরার সঙ্গে সঙ্গে এবং পরিকল্পনা করে কন্যাটিকে বাড়ি থেকে বের করে আনার জন্য। যাতে সাধু তার অবদমিত চাহিদা পূরণ করতে পারে।

কিশোরগঞ্জের লোককাহিনীর দ্বিতীয় খণ্ডে কিশোরগঞ্জ অঞ্চলের লোককাহিনীর রোমাঞ্চ কথা, রাক্ষস-ক্ষোক্কসের গল্প এবং রঙ্গকথা পর্যায়ের গল্পগুলি সংকলিত হয়েছে। এই গল্পগুলির সংগ্রাহক মোহাম্মাদুর রব সাহেব।

এই গ্রন্থের একটি উল্লেখযোগ্য গল্প হল 'রাজার ঝি ও মোল্লা'। গল্পটির প্রথমাংশে মোল্লার কাহিনী ইংরেজি লোককথার অসাধু ধর্মযাজক এবং দ্বিতীয়াংশে উজিরের কাহিনী আমাদের ধূর্ত বন্ধুর কথা স্মরণ করিয়ে দিলেও শেষ পর্যন্ত রাজকন্যার বিশ্বস্ততাই এর মূল বক্তব্য। আর এসব ঘটনার অন্তরালে প্রবাহিত হয়েছে রাজকন্যার প্রতি মোল্লা ও উজিরের নির্যাতনের ছবি।

এক মোল্লা রাজার মেয়েকে পড়ায়। রাজকন্যার উপর মোল্লার কুদৃষ্টি পড়ে। এবং সে মনে মনে চিন্তা করতে থাকে কিভাবে তার মন্দ আশা পূরণ হয়। একদিন রাজাকে গিয়ে বলে, আমি স্বপ্ন দেখেছি আপনি, বেগম সাহেবা ও রাজপুত্রসহ হজ করতে গেছেন।

রাজারও ইচ্ছে হজে যাওয়ার কিন্তু একটি সমস্যা হল তার কন্যার তখনও বিয়ে হয়নি। মোল্লা তখন বলে, মেয়ের জন্য চিন্তার কিছু নেই। রাজা তখন আশ্বস্ত হয়ে হজে গেল।

এর পরদিন মোল্লা কন্যার কাছে এসে বসল। তারপর মোল্লার কথায় ও আচরণে কু-অভিপ্রায় প্রকাশ পেল। কন্যাটি তার অভিসন্ধি বুঝে বলল, আমার শরীর ভালো নয় আপনি আরেকবার আসবেন। মোল্লা তখন ভাবল তার উদ্দেশ্য সফল হচ্ছে।

মোল্লা চলে যাবার পর উজিরকে ডেকে বলল, মোল্লাকে আর কখনো যেন মহলে ঢুকতে না দেওয়া হয়। পরদিন মোল্লা জোর করে ঢুকতে চাইলে উজির তাকে বাধা দিল। শেষপর্যন্ত জুতো দিয়ে মোল্লার মুখে মারা হল।

মোল্লা তখন বাড়ি ফিরে রাজার কাছে চিঠি লিখল। সে জানাল উজিরের সঙ্গে তার কন্যা অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত হয়েছে। রাজা তখন পুত্রকে দেশে পাঠাল এবং মেয়েকে কেটে জলে ভাসিয়ে দেবার আদেশ দিল।

রাজপুত্র বোনকে না কেটে তাকে বনবাসে দেবার পরিকল্পনা করল। তখন বোনকে মক্কাশরীফ নিয়ে যাওয়ার নাম করে গভীর জঙ্গলে ফেলে আসে।

রাজকন্যা খাদ্যের খোঁজে বনে ঘুরে বেড়ায় এমন সময় এক বাদশাপুত্র শিকারে এসে কন্যাকে দেখতে পেল। বাদশার পুত্র তাকে বিয়ে করতে চাইল। এরপর তাদের বিয়ে হল। একে একে কন্যার দুটি ছেলে হল।

একদিন রাজকন্যা বলল, অনেকদিন সে বাপ-মাকে দেখে না। সে এইবার বাপের দেশে যাবে। কন্যা দুই ছেলেকে নিয়ে উজিরের সঙ্গে বাপের বাড়িতে চলল।

পথে কন্যার কাছে উজির কুপ্রস্তাব করে। কন্যা কিছুতেই রাজি না হওয়ায় তার দুই পুত্রকে হত্যা করে উজির। এরপর উজির তার দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। কন্যা এবার ছলনার আশ্রয় নেয়। কন্যা উজিরকে বলে, তোমাকে রাজপুত্রের বেশভূষা ধারণ করতে হবে।

উজির কন্যার কথা বিশ্বাস করে শহরে পোশাক আনার জন্য রওনা হয়। তারপর উজির ফিরে এসে দেখে কন্যা নেই। তখন উজির দেশে ফিরে গিয়ে সবাইকে বলে কন্যাটি প্রেতিনী ছিল দুই পুত্রকে হত্যা করে কোথায় চলে গেছে।

বাদশাপুত্র উজিরের কথা বিশ্বাস না করে কন্যার খোঁজে বের হল। একদিন সে এক খেয়াঘাটে এসে দেখেখেয়ানীর হাতে এক কঙ্কন। এই কঙ্কন তার স্ত্রীর। খেয়ানী তাকে পথ চিনিয়ে দিল। যেতে যেতে সে শ্বশুরের দেশে এসে পৌঁছাল। কন্যাও দুদিন পূর্বে এখানে এসেছে। শহরে এসে দেখল এক মোল্লাকে অর্ধেক মাটির মধ্যে পুঁতে রাখা হয়েছে।

রাজপুত্রের সঙ্গে কন্যার দেখা হল। কয়েকদিন শ্বশুরবাড়ি থেকে রাজপুত্র দেশে ফিরল। অবশেষে উজিরকে শাস্তি দেওয়া হল।

গল্পের মধ্যে নারী নির্যাতনের চিত্র দারুণভাবে প্রকাশিত হয়েছে। যারা নারী নির্যাতনে লিপ্ত হয়েছে তারা সকলেই সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তি। যারা সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করে। মোল্লা সম্প্রদায়ের শাসন অতিষ্ঠ অষ্টাদশ ঊনবিংশ শতকের লোকসমাজের স্বাভাবিক class-hatred এর জন্য মুসলমানের মোল্লা বা হিন্দু ব্রাহ্মণ, এমনকি priest কেউ বড় একটা সম্মান পায় না। কারণ এসব মানুষ ধর্মের আড়ালে মানুষের ওপর নানারকমভাবে অত্যাচার চালিয়েছে। তারা সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করেছে কঠোর ধর্মীয় অনুশাসনের জোরে। আর এই অনুশাসন নেমে আসত প্রধানত নারীর উপর। এছাড়াও সমাজে সকলের চোখ এড়িয়ে নারীর উপর চলত তাদের লালসা চরিতার্থ করার প্রয়াস। আমাদের আলোচ্য গল্পেও দেখি এক মোল্লার লালসার স্বীকার হয় এক রাজকন্যা। মোল্লা যখন তার অবদমিত ইচ্ছাপূরণ করতে না পারে, তখন তার পরিণাম হয় আরও ভয়ানক। কন্যার জীবন সংশয় হয় তাকে পরিবার ছেড়ে বনে গিয়ে থাকতে হয়। এই গল্পের আর একটি চরিত্র উজির। সেও মোল্লার সমগোত্রীয়, কারণ তার দ্বারাও নির্যাতিত হয় কন্যাটি। এবং কন্যাটিকে তার সতীত্ব রক্ষার জন্য তার নিজের দুই সন্তানকেও হারাতে হয়। অর্থাৎ এসব মানুষদের লালসার জন্য নারীকে দিতে হয় চরম মূল্য। বর্তমান সমাজেও আমরা একইরকম চিত্র দেখে অভ্যস্ত।

লোককথায় প্রেম

জয়ন্ত বিশ্বাস

ফোকটেলসের বাংলা হল সংক্ষেপে কথা। লোককথা হল লোকের কথা। লোককথা হল লোকসমাজের কথা। কথা সাধারণত মুখে মুখে রচিত হয়ে থাকে। আর শ্রুতি পরম্পরায় প্রজন্মের পর প্রজন্ম টিঁকে থাকে। লোক সাহিত্যের একটি অংশ লোককথা। লোককথা ব্যষ্টির রচনা হলেও সমষ্টির গ্রহণ বর্জনের মধ্য দিয়ে একটি নির্দিষ্ট রূপলাভ করে। তাই রচয়িতার পরিচয় ছাড়াই নানাধরনের লোককথা প্রচলিত হয়েছে। এক কথায় লোককথা লৌকিক সমাজ থেকে জাত। একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমানায় বসবাসকারী, একই পরিবেশে, একই ধরনের ঐতিহ্যকে স্বীকার করে, যখন একই রকম জীবনযাত্রা ঐক্য সৃষ্টি করে তখন তাদের লোক বলা চলে। সূর্যাস্তের সময় তারা যখন লোককথা বলেন তখন নিজ নিজ জীবন ও সামাজিক পরিবেশের না পাওয়া চাহিদার কথা প্রকাশিত হয়। লোক সমাজের সহজ সরল অনুভব, অভিজ্ঞতা লোককথার মূল বিষয়। লোক সমাজের নিজস্ব সৃষ্টি হলেও এর আন্তর্জাতিক সীমা বহুদূর বিস্তৃত। তাই লোকসংস্কৃতির একাধিক শাখার মধ্যে লোককথা সবচেয়ে জনপ্রিয়। স্বাভাবিক কারণে প্রত্যেক মানুষ অতি সহজে অন্যের লোককথাকে নিজের করে নিতে দ্বিধাবোধ করে না। কারণ লোককথায় রয়েছে গল্পরসের প্রাধান্য। আর গল্পরসের মাধ্যমেই সামাজিক বোধের উন্মেষ ঘটায়।

লোককথায় লুকিয়ে আছে আনন্দ, হাসিকান্না, ব্যথাবেদনা, শোক। লোক সমাজের বেদনাময় সংগ্রামী ভাবনার রূঢ় বাস্তব চিত্র এবং সুদূর প্রাচীন কাল থেকে হয়ে আসা মানুষের প্রেম ভালোবাসার কথা। লোককথার রূপকের আড়ালে রয়েছে জীবনের কথা। লোককথার কিছু নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য আছে-- যেমন একটি নিটোল কাহিনি থাকবে, কিংবা এক বা একাধিক মোটিফ থাকবে। কাহিনির মধ্যে একটি পরম্পরা থাকবে, থাকবে রাজা বা রাজপুত্রের নিঃসঙ্গ জীবন বেদনা। ব্যর্থ প্রেম, কখনো কখনো ব্যভিচার, কখনো প্রেমের সুন্দর পরিণতি। লোককথা আমাদের সেই সোনার কাঠি রূপার কাঠির জীবনের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেয়।

যশোরের লোককাহিনি :

নেক্‌বখত স্বামীস্ত্রীর গল্প। একটি মেয়ে ছিল। মেয়েটি কোরান শরীফে হাফিজ দিল। সে বিয়ে করল এক মূর্খকে। বিয়ের রাত্রে সে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করল কোরান শরীফের উপর কি হাদিস রাখা যায়। স্বামী উত্তর না দিয়ে স্ত্রীকে বলল— বারো বছর পর আমি তোমার কাছে ফিরে আসব। আর না আসলে তালাক। পশ্চিমে গিয়ে স্বামী এলেম শিখল। স্ত্রীর কথা ভুলে গেল। বারো বছর প্রায় অতিক্রান্ত হতে চলেছে। উস্তাদজীর কাছে সব কথা বলে ছুটির আবেদন করে। উস্তাদজী বুড়ো মুচির থেকে পরামর্শ নিতে বলল। বুড়ো মুচি সবকথা শুনে একটি লণ্ঠন দিয়ে তা জ্বালিয়ে আনতে বলে। লোকটি সেখানে আলো দেখে, দৌড়ে যায় গিয়ে দেখে আলো নেই। এই ভাবে সারারাত কেটে ভোর রাত্রে এক গৃহে এসে পৌঁছাল। গিয়ে দেখে এক মেয়ে নামাজ পড়ছে। আলো জ্বালানোর আগেই তাদের মধ্যে পরিচয় হল এবং বারো বছর পর স্বামী-স্ত্রীর মিলন হল।

কাহিনিতে ধর্মপ্রাণ নারনারীর মনোবাঞ্ছা পূরণের কথা বলা হয়েছে। অলৌকিক শক্তির প্রভাব গল্পে লক্ষণীয়। কিন্তু প্রেম ভালোবাসা বার বছর পরেও হারিয়ে যায় নি। দীর্ঘ বারো বছর পরে স্বামী ফিরে এসেছে স্ত্রীর কাছে। কোন বাধা তাকে আটকাতে পারেনি। যদিও কোন বাধার বিষয়ে আলোকপাত করা হয় নি। তাদের মিলন ঘটল।

—এখানে প্রেম বিশ্বজনীন হয়ে উঠেছে।

আবদুল্লাহ, বাদশার গল্প :

এক দেশে এক বাদশার এক ছেলে, নাম ছিল আবদুল্লাহ। একদিন শিকার করতে গিয়ে বাদশা দেখল— আকাশ দিয়ে মৃগপরী সাত বোন উড়ে যাচ্ছিল। ছোট বোন মৃগপরী রাজপুত্র দেখে আকৃষ্ট হল। এবং পরী তার আসল রূপ রাজপুত্রকে দেখিয়ে কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। রাজপুত্র তাকে খুঁজতে খুঁজতে এক জ্ঞানী বুড়ির কুটিরে পৌঁছল। বুড়ির কথা মতো পূর্ণিমার রাত্রে পরীদের স্নানের দীঘির পাশে অপেক্ষা করতে থাকে। পরীদের স্নানরত অবস্থায় তাদের জামাকাপড় গুলি লুকিয়ে রাখে। বড় পরী রাগ করে রাজপুত্রকে মারতে চাইলে বুড়ি তাকে উদ্ধার করে। আবদুল্লাহ পুনরায় তাদের কাপড় চুরি করে। এবার বড় পরী ছোট বোনকে রেখে গেল এবং শর্ত দিল বারো বছর আবদুল্লাহ তাকে স্পর্শ করতে পারবে না। এর মধ্যে বুড়ির ঘরে ছোট পরীকে রেখে রাজপুত্র বাবা মাকে দেখতে গেল। বাবা মা তাকে ছাড়তে রাজি হল না। বাবা মার কথা অমান্য করে রাজপুত্র ফিরে এলেও পরীকে দেখতে পেল না। পরী অদৃশ্য হয়ে গেল। পরীকে খুঁজতে খুঁজতে পাশের রাজ্যে দেখতে পেল এক রাজকন্যা প্রত্যেক রাত্রে একজন করে স্বামী খায়। আবদুল্লাহ্ ভয় না পেয়ে নিজে বর সাজলো।

বিয়ে হল, বিয়ের রাত্রে রাজকন্যার রাক্ষস রূপকে মারতে সক্ষম হল। রাজকন্যা রাজপুত্রের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাকে একটি লাঠি উপহার দিল। যে লাঠির জোরে সমুদ্রের জল শুকনো এবং ছোট পরীকে নৃত্যের মাধ্যমে চিনতে পারল। রূপসী মৃগপরীকে সঙ্গে নিয়ে দেশে ফিরে এল রাজপুত্র।

কাহিনিতে রূপকথার প্রভাব আছে। কিন্তু প্রেমের সাধনায় যেকোন সাধ্যে পৌঁছানো যায় তা গল্পে লক্ষ্য কবা গেল। সুন্দরী পরীর প্রেমে পড়ে রাজপুত্র পাহাড়-পর্বত, নদী-সমুদ্র পার হয়ে গেল। সাত পরীর নৃত্যের মধ্য থেকে ছোট পরীকে চিহ্নিত করতে পারল। প্রমাণিত হল ছোট পরী, ঘোষিত হল প্রেমের জয়। আসলে প্রেম শুধু ব্যক্তিকে চেনে। চেনে রক্তমাংসের তৈরি শরীরের প্রতিটি কোষকে। তাইতো একই রূপে সজ্জিত সাত জোড়া পা দেখে নিজের ভালোবাসাকে চিনে নিতে অসুবিধা হয়নি রাজপুত্রের। আবদুল্লাহের, চরিত্রে বোঝা গেল প্রেম সর্বত্রগামী। এখানে আছে ত্যাগ, আছে কঠোর পরিশ্রম। এবং প্রেমকে জয় করার লক্ষ্যে পৌঁছনোর বাসনা। লোককথায় এই ভাবেই প্রেম বড় হয়ে উঠেছে।

বিভাস কন্যার গল্প

এক দেশে এক রাজপুত্র ও মন্ত্রীপুত্রের মধ্যে ভালো ভাব ছিল। রাজপুত্র মন্ত্রী পুত্রকে বিভাস আনতে বলল। মন্ত্রীপুত্র বাণিজ্যে গিয়ে বিভাস কন্যার ছবি নিয়ে এল। সেই ছবি দেখে রাজপুত্র কন্যার প্রেমে পড়ে গেল। বিভাসের রূপে রাজপুত্র মূর্চ্ছিত হয়ে গেল এবং তাদের মধ্যে মিলন হল। তারপর রাজপুত্র বংশীবাদিকার ছদ্মবেশে রাজকন্যার অন্দর মহলে ঢুকল। রাজকন্যার সঙ্গে বংশীবাদিকা দিন কাটাতে থাকে। একদিন রাজকন্যার বিয়ে ঠিক হল। তখন রাজপুত্র রাজকন্যাকে সব কথা খুলে বলল। রাজপুত্র ও রাজকন্যা সিদ্ধান্ত নিল তারা পালিয়ে বিয়ে করবে। রাজপুত্র ঘোড়া কিনল। রাজকন্যা টাকা-পয়সা আনল। রাত্রে পালাতে গিয়ে এক চাকরের কাছে ধরা পড়ে যায়। চাকরকে জল আনতে বলে, এই ফাঁকে চাকরের ঘোড়াটিকে মেরে রাজকন্যা আবার পালিয়ে গেল। অন্য দিকে রাজপুত্র ক্লান্তিতে পথে ঘুমিয়ে পড়ল। তারপর রাজকন্যা সাত ডাকাতের হাতে পড়ে। রাজকন্যা বুদ্ধি করে বলে যে— পুকুরের মাঝখান থেকে যে মাটি আনতে পারবে সে রাজন্যাকে পাবে। ডাকাতদল পুকুরে নামলে রাজকন্যা পুরুষ বেশে এক রাজবাড়িতে আশ্রয় নেয়। রাজবাড়িতে এক রাক্ষসকে হত্যা করে রাজকন্যা। রাজা রাজকন্যাকে রাজ্য দান করে এবং নিজের মেয়ের সঙ্গে পুরুষ বেশি রাজকন্যার বিয়ের প্রস্তাব দেয়। মেয়ের সঙ্গে বিয়েও হয়। কিন্তু মিলন হয়নি। কারণ জানতে চাইলে বিভাস বলে যে, একশ এক জন পাগল ও দেশ বিদেশের রাজাদের সামনে সব কাহিনী বলবে। কাহিনি শুনে স্বামী রাজপুত্র এবং সাত ডাকাত আত্মপ্রকাশ করল। তখন রাজপুত্র বিভাস আর সেই দেশের রাজকন্যাকে

নিয়ে সেই রাজ্যে দিন যাপন করতে লাগল।

গল্পে রূপকথার অনুসরণ থাকলেও বিভাসের সঙ্গে রাজপুত্রের মিলন কাহিনি মূল বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে। বহু দ্বন্দ্ব সংঘাত ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে প্রেমের জয় ঘোষিত হয়েছে। লোককথায় চিত্রিত হয়েছে প্রেম করে পালিয়ে যাওয়ার চিত্র, অন্যদিকে রয়েছে বিয়ের ব্যবস্থা। বর্তমান সমাজে নরনারীর প্রেমের প্রতিরূপ অনেক আগে লোককথায় পাওয়া যায়। সমাজের রক্তচক্ষুকে অস্বীকার করে পালিয়ে বিয়ে করা এবং প্রেমের প্রতিষ্ঠা দেওয়া যতই বিতর্কিত হোক, প্রেমের জয় কিন্তু ঘোষিত হয়েছে। অনেক গল্পে আমরা দেখেছি পুরুষ চরিত্রের সংগ্রামের মাধ্যমে প্রেমের জয় হয়েছে। কিন্তু এখানে পুরুষ চরিত্র প্রায় নির্লিপ্ত থেকে গেছে। প্রেমের প্রতিষ্ঠা দিয়েছে রাজকন্যা। কঠোর সংযম, বুদ্ধির প্রয়োগ ঘটিয়ে রাজকন্যা প্রেমিক রাজপুত্রকে খুঁজে পেয়েছে। স্বামীকে পেতে সে নারী হয়ে আরেক জন নারীর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। সংসার করেছে, কিন্তু নিজেকে ধরা দেয়নি, এই আত্মপ্রত্যয় প্রেমের কারণেই সম্ভব। তাই গল্পের শেষে মিলন ঘটেছে। এবং প্রেমের জয় ঘোষিত হয়েছে। প্রেম ও পুণ্যের জয় ঘোষণাই লোক কাহিনিগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য। লোক জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা, কামনা-বাসনা, চাওয়া-পাওয়া ও স্বপনলোকের বাণী প্রতিফলিত হয়েছে লোক কথায়।

কিশোরগঞ্জের লোককথা :

মদন সাধুর গল্প

রূপতন সদাগর নামে এক সদাগর বাস করত। তার এক পুত্র ও এক কন্যা ছিল। সুলতানী শহরের সমলার সঙ্গে মদন সাধুর বিয়ে হয়। বিয়ের পর মদন সাধুকে বাণিজ্যে পাঠায় তার পিতা। বোন কুকুরার কুমন্ত্রের ফলে মদন সাধু বাণিজ্যে যেতে বাধ্য হয়। স্ত্রী সমলার বাধাকে অগ্রাহ্য করে। বিয়ের এক বছর বাণিজ্যে যাওয়া মানা আছে তাও সে আর মানে না। বাণিজ্যে সাধুর সঙ্গে হারমাদদের বিরোধ বাধে। চণ্ডীর অলৌকিক শক্তিতে সাধু হারমাদদের মারল। কিন্তু তারা আবার প্রাণ ফিরে পেল। পরে সাধুও তার সঙ্গী পঞ্চাকে বন্দী করল। পরে যাদুকর ধুবনীর কথায় বাঁচল। হারমাদের ভাইদের বুদ্ধিতে সাধুকে তার বোনের সঙ্গে বিয়ে দেবার ব্যবস্থা করল। দুঃখে সাধু স্ত্রী সমলার কথা মনে করতে লাগল। স্বামীকে উদ্ধার করার জন্য সমলা শাশুড়ীর থেকে বিদায় নিয়ে রওনা হল। বহু সৈন্য নিয়ে হারমাদদের ঘেরাও করে এবং সমলার বুদ্ধির জোরে জয়ী হয়। সমলা স্বামী ও পঞ্চাকে উদ্ধার করে। ফেরার পথে পাতালপুরীর রাজ্যকে নিপাত করে সমলা। দীর্ঘ যুদ্ধ যাত্রা করে সমলা স্বামী, পঞ্চাকে নিয়ে দেশে ফিরে আসে। সুখে জীবন যাপন করে।

গল্পের পরিসমাপ্তিতে সমলার ভালোবাসায় সাধুর চোখে আনন্দ-অশ্রু দেখা যায়। স্বামীর প্রতি প্রেম ভালোবাসায় শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ যাত্রায় জয়ী হয়। সমলার স্বামীর প্রতি ভালোবাসাই সংগ্রামী করে তুলেছে তাকে। সত্যে উপনীত হয়েছে। নারী হয়ে যুদ্ধ যাত্রা করেছে। স্বামীর প্রতি তার নিষ্ঠা, কর্তব্যকে সঠিক ভাবে পালন করেছে। ভালোবাসাকে প্রতিষ্ঠা দিতে মৃত্যু ভয়কে উপেক্ষা করেছে। স্বামীর জীবন বাঁচিয়ে সে বাস্তব সত্যকে যেমন প্রতিষ্ঠা করেছে তেমনি অমর করে রেখেছে দাম্পত্য সম্পর্ককে। উল্টোদিকে সাধুকে দ্বিতীয়বার বিয়ে দিতে চাইলে সে অন্য নারীর প্রতি আকৃষ্ট হয়নি। স্মরণ করেছে বাড়িতে অপেক্ষারত স্ত্রীর কথা। নারী দেহের প্রতি সাধুর কোন লোভ লালসা দেখা যায়নি। সমস্ত গল্পটিতে প্রেমের টানে বহু প্রতিকূলতাকে নায়ক নায়িকা অতিক্রম করতে সচেষ্ট হয়েছে। পরিশেষে জয় ঘোষিত হয়েছে প্রেম-ভালোবাসার।

সুফিয়ানী বাদশার গল্প

এক দেশে সুফিয়ানী বাদশা ও সুলেমান বাদশা নামে দুই বাদশা ছিল। সুলেমান বাদশা মৃত্যুর সময় বন্ধু সুফিয়ানী বাদশাকে একটি ঘোড়া, একটি শাড়ী ও একটি আংটি উপহার দিয়ে যায়। দুই বাদশার এক জন করে ছেলে ছিল। তাদের মধ্যেও খুব বন্ধুত্ব ছিল। শাড়ীর মধ্যে এক পরীর ছবি দেখে তারা পরীর প্রতি আকৃষ্ট হয়। এবং বহু দুর্জয়কে জয় করে। রাক্ষসদের সঙ্গে যুদ্ধ করে পরীরাজ্যে উপস্থিত হয়, দুই পরীর সঙ্গে দুই বন্ধুর বিয়ে হয়। এবং গল্পের সমাপ্তি ঘটে।

গল্পে পরীকে লাভ করার জন্য রাক্ষসদের সঙ্গে জহুর বাদশা এবং সায়েদ বাদশাকে যুদ্ধ করতে হয়। দীর্ঘ প্রতিকূলতাকে তারা জয় করে। নির্জন দ্বীপে বছরের পর বছর কাটাতে হয়। মৃত পরীকে প্রাণ ফিরিয়ে পরীর দেশে নিয়ে যেতে হয়। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হল বন্ধুত্ব সুন্দরী পরীর কাছেও হারিয়ে যায় নি। একা একা বন্ধুরা বিয়ে করতে রাজি হয় নি। দুই বন্ধুর জন্য দুই জন সুন্দরী পরী ঠিক করা হয়। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর দুই বন্ধু পরীদের দুই বোন যথা আলম আরা ও মালেকার বিবাহ হয়। ত্যাগের মধ্য দিয়ে ভালোবাসা জয়ী হয়।

চিহিজান বাদশার গল্প

চিহিজান বাদশা নামে এক বাদশা ছিলেন। বাদশার কোন সন্তান ছিল না। সকলে তাকে আঁটকুড়া বলতো। এমনকি বাড়ির মালিনীরা তার মুখ দর্শন করতো না। মনের দুঃখে বাদশা বনবাসী হলেন। বাদশার সাথে সাথে সেই দেশেব এক আঁটকুড়া মালীও বনবাসে গেল। আল্লাহ্ এদের কষ্ট সহ্য করতে না পেরে জিব্রাইলকে ফকির-ছদ্মবেশে জঙ্গলে পাঠালেন। বাদশাকে এক পুত্র সন্তান ও মালীকে একটি কন্যা সন্তান দেওয়ার কথা বললেন। কথামতো ফকির সাহেব দুটি ফল এনে একটি বাদশা বেগমকে ও

অন্যটি মালীকে খেতে বললেন। সেইমতো বাদশার ঘরে ছেলে এবং মালীর ঘরে কন্যা সন্তানের জন্ম হল। ইতিমধ্যে আল্লাহ্ বাদশাকে স্বপ্ন দেখায় বাদশা পুত্র যেন বার বছর পৃথিবীর আলো না দেখে। আলো দেখলে তার দুঃখ কষ্ট বেড়ে যাবে। তাই তাকে পাতালে রাখার ব্যবস্থা করা হল। কিছু দিন কাটার পর আল্লাহ্ চিহিজান বাদশার ছেলে ফলিদ বাদশাকে সুন্দর পৃথিবীর স্বপ্ন দেখালেন। সুন্দর পৃথিবীর আলো বাতাস সে দেখল এবং বাইরে বেরিয়ে এল। অন্যদিকে বাদশার ফুলের বাগানে মালীর সুন্দরী কন্যা মালা গাঁথার কাজ করে। ফলিদ বাদশা হরিণ শিকার করার জন্য গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করল। আল্লাহ্র ইচ্ছায় হরিণ কোথায় যেন মিলিয়ে গেল, শিকার করা হল না। সে গিয়ে পৌঁছল মালিয়ানীর বাগানে। সুন্দরী মালীয়ানীকে দেখে তার প্রেমে পড়ল। মালীয়ানীকে ছেড়ে বাদশা যেতে চায় না। সারাদিন রাত বাদশা মালীর কাছে পড়ে থাকে। এই দেখে পিতা শাহাজাদার বিয়ে দেবে ঠিক করল। মালিয়ানীর বুদ্ধিমতো শাহাজাদা চারটি শর্ত আরোপ করে। শর্তগুলি মেনে নিয়ে মানিক বাদশার কন্যা লালমতি বিয়ে করতে রাজি হয়ে গেল। মালির কুচক্রে সে চোখ বেঁধে বিয়ে করতে গেল। কুচক্রী মালী আরো বলল যে, সে যদি লালমতির মুখ দেখে তবে বাদশা কানা হয়ে যাবে। হরবোলার ডাকে সাড়া না দিয়ে বাদশা বালিশে মাথা গুঁজে বসে থাকে— হরবোলার গীতে-তা পরিষ্কার—

শোন শোন প্রাণের পতি
বলি যে তোমারে
নতুন বাগে নতুন ফুল
রসে টলমল করে।।
তাতুন বাগে ফুটছে ফুল
ভ্রমর হইয়া যাও।
উঠ উঠ প্রাণের পতি
আঁখি মেলিয়া চাও।

এইভাবে নানান কষ্টের মধ্য দিয়ে চারটি পরীক্ষা দেয় হরবোলা। মালিয়ানীর কুমন্ত্রে শাহজাদা বাণিজ্যে যায়। বাণিজ্যে গিয়ে বিপদে পড়ে। হরবোলা তাকে উদ্ধার করে। বাদশা যখন সব জানতে পারল মালী কন্যাকে হত্যা করে হরবোলাকে নিয়ে সুখে জীবন কাটায়।

গল্পটিতে শাহাজাদা ও মালিনীর জন্ম হয়েছে আল্লাহ্র দয়ায়। মঙ্গল কাব্যের মতো দেবতার আশীর্ব্বাদে তাদের জন্ম। মধ্যযুগের বহু সাহিত্যে এবং লোককথায় ফল খেয়ে গর্ভবতী হওয়ার ঘটনা আছে। এখানেও তার প্রতিফলন ঘটেছে। নায়ক শাহজাদা নায়িকা মালিনীকে দেখে তার প্রেমে পড়ে। মালিনী জীবন নিয়ে খেলা শুরু করে। প্রথমে বিয়েতে শর্ত আরোপ, চোখ বেঁধে বিয়ে করতে যাওয়া, স্ত্রীর মুখ দেখতে না

দেওয়া, বাণিজ্যে পাঠানো সব কিছুর পিছনে মালিনীর ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু উল্টোদিকে শাহাজাদার সব অন্যায় অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করে গেছে হরবোলা। যেন আধুনিক যুগের উপন্যাসের ত্রিকোণ প্রেমের কাহিনী লোককথায় স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। সে স্বামীর ভালোবাসা পাওয়ার জন্য নিজের জীবনকে বাজি রেখেছে। বহু কষ্টে শর্তগুলি পূরণ করেছে। স্বামী মুখ দেখেনি তবুও হরবোলা স্বামীর প্রতি বিরূপ হয়নি। চোখের জল ফেলেছে, নিজে কষ্ট পেয়েছে তবুও স্বামীকে জানতে দেয়নি। বাণিজ্যে গিয়ে কারারুদ্ধ অবস্থায় শাহাজাদা মালিনীকে মনে করে। মালিনী কিন্তু সেই ডাকে সাড়া দেয়নি। স্বপ্ন দেখেছে হরবোলা চিন্তিতও হয়েছে সে—

শুয়েছিল হরবোলা গো
জোড় মন্দির ঘরে
কালা স্বপন দেখিয়া কন্যা
উঠ্যা কান্দন জুড়ে।

এখানেই প্রেমের সার্থকতা। মালঞ্চীর দেশে থেকে হরবোলা স্বামীকে উদ্ধার করেছে। বাইজি রানী হরবোলার ঘরে শাহজাদা উপস্থিত হয়। বাইজির সঙ্গে তিন দিন, তিনরাত কাটায়। স্ত্রীর গর্ভে সন্তান আসে। মাতৃত্বকে মুখ বুজে সহ্য করে নেয় হরবোলা। বাদশার কামনাকে পূরণ করে হরবোলা। মালিনী শাহাজাদার কাছে ক্ষমাচাইলে শাহজাদা ক্ষমা করেনি। বাদশা মালিনীকে হত্যা করে হরবোলাকে গ্রহণ করে। জন্ম হল ওলীক বাদশার। স্বামী-স্ত্রী সুখে জীবন কাটাতে লাগল। আসলে গল্পে প্রেমের জয়ই প্রমাণিত হল। মালিনীর প্রেমে ছিল স্বার্থ, হরবোলার প্রেম ছিল নিঃস্বার্থ। হরবোলা স্বামীপরায়ণ, স্বামী বলতে সে পাগল। কিন্তু মালিনীর মধ্যে কোন ত্যাগ ছিল না। হরবোলার মধ্যে ছিল ত্যাগ, কঠোর সংগ্রামী ভাবনা, যে কোন বাধাকে অতিক্রম করে স্বামীর মন জয় করার বাসনা। সত্যের জয় ঘোষিত হয়েছে গল্পে। প্রেমের জয় হয়েছে, ব্যভিচারের পরাজয় ঘটেছে।

বারিবীর রাজপুত্র সুবোধ কুমারের কিস্‌সা

বীরপুর শহরে রাজার ছেলের নাম ছিল সুবোধ। সুবোধের যার সঙ্গে বিয়ে হল তার নাম ছিল উদয়মালা। মৃত্যুর পর সুবোধ রাজসিংহাসনে বসে। সে পিতার মতো প্রজাদের ভালোবাসতে পারেনি। সুবোধ ছিল অত্যাচারি রাজা। এক সময় প্রজাদের আক্রমণে রাজা ও রানীকে দেশ থেকে পালাতে হয়। রানী গর্ভবতী অবস্থায় রাক্ষসদের আশ্রয়ে থাকে। রাক্ষসী ও রানী দুই জনের ঘরে দুই সন্তান জন্মায়। রাক্ষসীর সন্তানের নাম দেওয়া হয় নীল কমল, রানীর সন্তানের নাম রাখা হয় লাল কমল। দুজনের মধ্যে ভালো বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। একদিন রাক্ষসী রানীকে খেয়ে ফেলে। নীলবাদশা রাক্ষসী

মাকে হত্যা করতে দ্বিধাবোধ করেনি। কারণ বন্ধুর প্রতি ভালোবাসা তার অনেক বেশি। সত্যি সে অবিচল, একদিন পাশের রাজ্যের রাজকন্যাকে রাক্ষস খাবে বলে বন্ধুদ্বয় জানতে পারে। লাল ও নীলবাদশা রাক্ষসকে মেরে রাজকন্যাকে প্রাণ দান করে। পার্শ্ববর্তী রাজা নীল বাদশার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে চায়। কিন্তু নীল অস্বীকার করে। কর্তব্যপরায়ণ রাক্ষস পুত্র দাদা লালের বিয়ে না দিয়ে বিয়ে করবে না বলে জানিয়ে দেয়। পরিশেষে দুই বন্ধুর দুই রাজকন্যার সাথে বিয়ে হয়। তারা সুখে জীবন করতে থাকে।

গল্পে নরনারীর প্রেমের তীব্র আকর্ষণ দেখানো হয়নি। এখানে বন্ধুত্ব ভালোবাসাকে বড় করে দেখানো হয়েছে। দুষ্ট রাক্ষসী মাকে মারতে পিছপা হয়নি নীল। নীল কখনো অসত্যের সঙ্গে আপোস করেনি। রাজকন্যার বিয়ের প্রস্তাবকে একবাক্যে প্রত্যাখ্যান করেছে। তার কাছে কর্তব্য বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। রাক্ষসের সন্তান হয়েও মানবিক বোধের উন্মেষ ঘটিয়েছে নীল। তার কাছে ত্যাগ, মানবিক মূল্যবোধ বড হয়ে দেখা দিয়েছে। রাজকন্যার সঙ্গে দাদা লাল বাদশার বিয়ে দিয়ে বন্ধুত্বকে সে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। এভাবে গল্পে দুই বন্ধুর আন্তরিক ভালোবাসা ফুটে উঠেছে।

ঢাকা জেলার লোককথা

চূড়ামণির কিস্‌সা

এক দেশে এক গুরু শিষ্য ছিল। শিষ্য চূড়ামণি হল এক বিধবার পুত্র। দুইজনে মিলে গাছের নিচে চিঁড়ামুড়ি খায় আর গুরুর কাছে গল্প শোনে— এক দেশে এক রাজা ছিল। তাব একটি মাত্র সন্তান। ছেলেকে পড়ানোর জন্য একজন মাস্টার রাখা হয়। সেও পড়াশুনা করে। একদিন মাস্টার কথায় কথায় বলে 'আল্লায় যাকে বিদ্যা দিয়াছে, তার বিদ্যা হইবে। আল্লায় যাকে বিদ্যা দেয় নাই শত চেষ্টায়ও তার বিদ্যা হইবে না।"

এই কথা শুনে রাজার ছেলে পড়াশুনা ছেড়ে দিয়েছে। তার এক উত্তর— "আল্লায় দিলে হবে" সে রাজার কথাও শুনল না। রাজা রাগ করে তাকে এক সদাগরের সাথে পাঠিয়ে দিল এবং সদাগরকে নির্দেশ দিল সমুদ্রের তীরে ছেড়ে দিতে। সদাগর ঘুমন্ত রাজপুত্রকে ছেড়ে চলে যায়। রাজপুত্র পাগলের মতো ঘুরে বেড়ায়। পরে একটি গাছের তলায় আল্লার নাম নিয়ে বসে রইল। এমন সময় গাছে শুক ও সারী নামে দুটি পাখি এসে বসে। শুক সারীকে বলে— "আমার কথামতো যদি কাজ করতে পার তবে দুনিয়াতে আর কোন কিছুর অভাব থাকবে না।" রাজার পুত্র সোনার তরীর কথা ভাবছিল। হঠাৎ দেখে একটি কলা গাছের ভেলা ভেসে আসছে। ভেলার মধ্যে একটি মশারী টাঙানো। মশারীর ভেতরে সুন্দরী কন্যা ছিল। রাজার ছেলের কারণে কন্যা নতুন প্রাণ পেল। কন্যা রাজার ছেলেকে সব কথা জানাল। সেই সওদাগর বাণিজ্য

থেকে ফেরার পথে রাজার ছেলে ও কন্যাকে দেখে হতবাক! তাদের জাহাজে তুলে নিল। কন্যাকে দেখে সওদাগর তার প্রতি আকৃষ্ট হল। পুনরায় ঘুমন্ত অবস্থায় রাজপুত্রকে ফেলে দিল। রাজকন্যা, রাজপুত্রের কথা জিজ্ঞাসা করলে সওদাগর তাকে বিয়ে করতে বলে। রাজপুত্র আল্লার নাম করলে আবার একটি শোলার নাও এসে হাজির। নাও করে রাজপুত্র দেশে ফিরে যায়। সওদাগরের বাড়িতে তখন নানা দেশের রাজা, জমিদার, সওদাগরের বিয়ে খেতে আসেন। সভায় যখন মোল্লা মুনসীরা হাজির তখন রাজপুত্র রাজকন্যার ঘোমটা খুলে দিল। এবং সব ঘটনা সকলের সামনে বলে দিল। রাজার সভায় উপস্থিত মান্যগণ্য ব্যক্তিরা সওদাগরের বিচার করতে বসল। সওদাগরকে কুত্তা দিয়ে খাওয়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। এভাবে গল্পের সমাপ্তি ঘটে।

এই গল্পে রাজপুত্র ও রাজকন্যার প্রেমের পরিণতি ঘটল আল্লার ইচ্ছায়। রাজপুত্র আল্লার কৃপায় পড়াশুনা ছাড়ল। সোনার তরী পেল। রাজকন্যা তাকে সওদাগরের হাত থেকে রক্ষা করল। অলৌকিকতা গল্পে থাকলেও প্রেমের সাধনার কথা অস্বীকার করা যায় না। রাজপুত্রকে প্রথম বার যখন সমুদ্রতীরে ফেলে আসা হয় তখন সে ফিরে আসার জন্য উদ্বিগ্ন হয়নি। কিন্তু দ্বিতীয় বার সে আল্লার কাছে পার্থনা জানিয়েছে শুধুমাত্র রাজকন্যার জন্য। এখানেও রাজপুত্রের প্রেমের প্রতি আকর্ষণ প্রতিফলিত হয়েছে। সওদাগরের বিয়ের সভায় রাজপুত্রের রাজকন্যার ঘোমটা খুলে দেওয়া, এবং সভায় সত্য কথা বলার মধ্যে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। ভালোবাসা, সত্যকে প্রতিষ্ঠা দিতে সে ভীত হয়নি। সব কিছু সে যখন আল্লার উপর ছেড়ে দিয়েছে, তেমনি রাজকন্যাকেও ছেড়ে দিতে পারত। রাজপুত্র তা কিন্তু করেনি। নিজের আবিষ্কারকে নিজের ভালোবাসাকে, ছিনিয়ে নিতে দ্বিধাবোধ করেনি। এখানেই প্রেম জয়ী হয়েছে।

চূড়ামণি একদিন একটি ঘরের মাপে চার কোণা পুকুর দেখতে পেল। পুকুরের জল টগ্‌বগ্ করে ফুটতে দেখল। তখন গুরু বলল, এক দেশে এক রাজা ছিল এবং তার এক মাত্র পুত্র সন্তানও ছিল। আর ছিল উজীরের, নাজিরের এবং কোতোয়ালের একজন করে পুত্র। চার বন্ধু তর্ক করে একদিন এক নতুন বৌ-এর মুখের কাপড় খুলে দিয়ে তার নাম জিজ্ঞাসা করল। কাজটি করেছে রাজার ছেলে। বিচারে চার বন্ধুর শাস্তি হিসাবে ছাই খেতে দেওয়া হয়। রাগ করে চারভাই পালিয়ে গেল ভিন রাজ্যে। আশ্রয় নিল এক বুড়ির ঘরে। জীবনের উন্নতি করার জন্য তারা কাজের খোঁজে পথে বেরিয়ে পড়ে। একদিন হঠাৎ করে রাজার ছেলেকে আর পাওয়া গেল না। অন্য তিনজন এক সওদাগরের বাড়িতে থাকতে লাগল। সওদাগরকে একটি সুন্দরী কন্যাব ছবি দেখাল তারা। সওদাগরের একজন যাদুগিন্নী ছিল। যাদুগিন্নীর দুটি নাতি ছিল তারা যাদুগিন্নীর ইচ্ছামত যা খুশি তা জানতে পারে। অন্যদিকে রাজার ছেলেও এক সুন্দর রাজবাড়িতে উপস্থিত হল। সেখানে কোন জনমানুয নেই। কিন্তু রংমহলের পালঙ্কে এক সুন্দরী

কন্যা মৃত অবস্থায় পড়ে আছে। রাজপুত্র তখন তার পায়ের কাছের সোনার কাঠিটি মাথার কাছে, এবং মাথার কাছের রূপার কঠিটি পায়ের কাছে রেখে দিল। সাথে সাথে কন্যার প্রাণ ফিরে এল। রাজকন্যাকে সমস্ত ঘটনার বিবরণ দিল রাজকুমার। রাজকন্যার জীবন বাঁচানোর জন্য তাকে সে স্বামী রূপে গ্রহণ করল। অন্যদিকে যাদুগিন্নী সুন্দরীর খোঁজে বেরিয়ে রাজপুত্রকে মেরে ফেলে। রাজকন্যাকে ধরে সওদাগর বাড়ি নিয়ে আসে। সওদাগর তাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেয়। কন্যা সওদাগরের থেকে এক মাস সময় চেয়ে নেয়। তারপর সওদাগরের ইচ্ছামতো কাজকরতে বলে। রাজকন্যার দেখভালের দায়িত্ব পড়ে রাজপুত্রের বন্ধুদের উপর। রাজ কন্যা কাঁদতে কাঁদতে তাদের সব জানিয়ে দেয়। উজীরের ছেলে ও কোতোয়ালের ছেলের দ্বারা মুক্তি পেল, রাজপুত্রের ছেলেও প্রাণ ফিরে পেল। সওদাগরের ঐ যাদুগিন্নী ঘরের পাশে এলে হঠাৎ পুকুর হয়ে যায় এবং জল ফুটতে থাকে। ফুটন্ত জলে চারজন মারা যায়।

গল্পটিতে চার বন্ধুর মিলের কথা ফুটে উঠেছে, একথা অস্বীকার করা যাবে না। কিন্তু গল্পের প্রথমে পরস্ত্রীর মুখের কাপড় খুলে দেওয়ার মধ্যে নারীর প্রতি আকর্ষণের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। রাজপুত্রের দ্বারা রাজকন্যার উদ্ধার এবং তাকে প্রাণ দান করার মধ্যে প্রেমের রূপ প্রতিফলিত হয়েছে। রাজপুত্রের মৃত্যু, রাজকন্যাকে ধরে নিয়ে যাওয়া এবং বন্ধুদের দ্বারা রাজপুত্র উদ্ধার, রাজকন্যাকে বাঁচানো যেন ভালোবাসার স্বরূপকে তুলে ধরেছে। দীর্ঘ প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে একাধিক ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যেও প্রেমের জয় ঘোষিত হয়েছে।

চূড়ামণিকে গুরু বাজার থেকে চিঁড়ামুড়ি আনতে বলল। চূড়ামণি রাস্তায় একটি শ্বেত পাথর দেখতে পায়। তাতে লেখা রয়েছে—

"আও মেরা প্রেয়সী চুম্বন কা হার"

থুক তেরা গরমে গারমে ঘোরা কা সওয়াল।"

গুরু বলে যে এক দেশে এক রাজা ছিল, রাজার পুত্রকে ছোট বেলায় বিয়ে দেওয়া হয়েছিল। একদিন সে সখ করে শ্বশুর বাড়িতে বেড়াতে যাবে বলে ঠিক করে। কিন্তু তার মনে প্রশ্ন জাগে তার ছোট বেলায় বিয়ে হয়েছে, দেখা যাক তার স্ত্রী সতী না অসতী তার পরীক্ষা নেওয়া দরকার। তারপর রাজার ছেলে একটি ঘোড়ায় করে কতকগুলি লাল জওহর, মতি, পান্না, নিয়ে শ্বশুর বাড়ির উদ্দেশে রওনা হয়। শ্বশুর-দেশে গিয়ে বাজারে একটি দোকানদারকে ঘোড়াটি দিয়ে দোকানটি নিল। ইতিমধ্যে রাজকন্যা দুই সখী নিয়ে পুকুরে স্নান করতে এলে তাদের চিনে নেয়। স্বর্ণকার দিয়ে একাধিক গহনা বানিয়ে দোকান দিয়ে বসে। আর একটি হার বানায় মুক্ত, হীরা, পান্না দিয়ে। একদিন রাজকন্যাদের দাসী হার কিনতে আসে। দাসীকে হারের লোভ লাগিয়ে বলে রাজকন্যাকে হার পরিয়ে একটি চুমু খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলে হারটি বিনা

পয়সায় দিয়ে দেবে। দাসী রাজি হয়ে যায়। রাজকন্যাকে স্বীকারও করায়। কথা মতো কাজও হয়। কিছু দিন পর রাজার ছেলে হাতি, ঘোড়া, সোনা, মণি মুক্ত হিরা পান্না নিয়ে শ্বশুর বাড়ি উপস্থিত হল। রাজা পুত্রকন্যাকে বলে

"আও মেরা প্রেয়সী
চুম্বন কা হার।"

এই কথা শুনে মাত্রই রাজকন্যা আশ্চর্য হয়ে যায়। রাজকন্যা প্রতিশোধ নিতে ব্যবস্থা নিল। কন্যা কয়েকটা ঘোড়া নিয়ে স্বামীর দেশে রওনা হল। ঘোড়াগুলির মধ্যে একটি ছিল পক্ষীরাজ। স্বামীর দেশে প্রচার করে দিল ঘোড়া বিক্রির কথা। রাজার ছেলে উজির ছেলেকে নিয়ে ঘোড়া কিনতে এল। পক্ষীরাজ ঘোড়া পছন্দ হল রাজপুত্রের। রাজার ছেলে সওদাগরকে ঘোড়ার দাম জিজ্ঞাসা করলে সওদাগর একটি শর্ত আরোপ করে। শর্তটি হল— "আপনি পেছনের দিকের কাপড় তুলবেন, আমি শুধু থুক দিমু", তবে ঘোড়াটি উপহার দেব দাম লাগবে না। রাজপুত্র রাজি হয়ে যায়। কথা মতো কাজ হয়। কিছু দিন পর পক্ষীরাজ ঘোড়া চড়ে রাজপুত্র শ্বশুর বাড়ি গেল। রাজকন্যা হারটি নিয়ে রাজপুত্রের কাছে গেল, এবং সে বলে— " আও মেরা প্রেয়সী চুম্বন কা হার"— তখন কন্যাও উত্তর দেয় "থুক তেরা গারমে ঘোড়া কা সওয়ার।" রাজার ছেলে আশ্চর্য হয়ে গেল। তারপর দুজনে সব কথা খুলে আলোচনা করে। পরিশেষে মধুর মিলন হয়। দুইজনেই এইকথা শ্বেত পাথরে লিখে রাখে।

গল্পটি বাস্তব দাম্পত্য সম্পর্ক কাহিনী। একজন শিশুকে বিয়ে দেবার যে ক্ষতিকর দিক আছে তার উল্লেখ করা হয়েছে। পূর্বে ছেলে মেয়েদের ভবিষ্যৎ জীবন গড়ার কোন অধিকার তাদের ছিল না। প্রেমের কারণে কঠোর বিদ্রোহ এখানে নেই ঠিকই, কিন্তু প্রেমের পথে সূক্ষ্ম বাধা যে বড় হয়ে উঠতে পারে তার সুন্দর প্রতিকার করা হয়েছে। গল্প শেষে যে দাম্পত্য মিলন দেখানো হয়েছে তা চিরকাল অটুট থাকবে। গল্পটির আরেকটি দিক হল— হাস্যাকৌতুক। হাসির মধ্যে একটি বাস্তব চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। প্রেম ভাবনা মুখ্য বিষয় না হলেও, প্রেমের আবহ তৈরি করে প্রেমের জয় ঘোষণা করা হয়েছে।

রাজকুমার সফরচান ও সবুজ নিশাপরীর কিস্‌সা

বাংলাদেশে রাজকুমার সফরচান আর সবুজ নিশা পরীর কিস্‌সা প্রচলিত আছে। এক দেশে এক বাদশা ছিল তার একমাত্র পুত্র সন্তান ছিল। রাজকুমারের নাম সফরচান। রাজার এক উজির ছিল, উজিরের এক পুত্র ছিল। রাজকুমার একদিন এক সুন্দরী পরীর দেখা পায়। পরী তাকে নাম ঠিকানাও দিয়ে যায়। রাজকুমার পরীর সন্ধানে বের হয়। সভাসদ নিয়ে সমুদ্র যাত্রা করে। কিন্তু ঝড় বৃষ্টির মধ্যে সমুদ্রে নৌকা ডুবে যায়। কোন রকমে জীবন বাঁচিয়ে গভীর অরণ্যে আশ্রয় নেয়। জঙ্গল অন্য বাদশার

দখলে। সেই বাদশা রাজপুত্রর সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ে ঠিক করে। মেয়েও রাজপুত্রকে ভালোবাসে। কিন্তু রাজপুত্রের মন পড়ে আছে পরীর প্রতি। পরীর সন্ধান না পেয়ে সে মর্মাহত। রাজপুত্র অনেক কষ্ট করে বাদশা এবং বাদশা কন্যার হাত থেকে রক্ষা পায়। একদিন গভীর জঙ্গলে এক মরা সুন্দরী কন্যার দেখা পায়। রাজপুত্র সোনারকাঠি ও রূপার কাঠির মাধ্যমে তার প্রাণ ফিরিয়ে দেয়। পরিচয় জানা যায় সে সবুজ নিশার বোন। তার আমন্ত্রণ নেয় রাজকুমার। পরে সবুজ নিশার সঙ্গে রাজপুত্রের মিলন হয়।

গল্পে প্রেমের এক নিটোল কাহিনী রচনা করা হয়েছে। পরীকে দেখে তার সন্ধানে বেড়ানো, সমুদ্রের মাঝে সঙ্কটে পড়া, বাদশা ও বাদশা কন্যার কাছ থেকে বেরিয়ে আসা গভীর প্রেমের সাধনায় সম্ভব। রাজপুত্রের নির্দিষ্ট কক্ষে পৌছানো এবং পরী জয় করা তার অভীষ্ট ছিল। গল্পে তা সম্ভব হয়েছে।

মিশরের লোককথা

প্রাচীন মিশরের লোককথা বর্তমানে প্রচলিত আছে। প্রাচীন মিশরের লোককথা সংকলন করেন সেই সময়ের পুরোহিতরা। পুরোহিতদের দ্বারা এই সংকলিত লোককথার পেছনে ধর্মীয় কারণ থাকলেও মোটিফের বিচারে এগুলি লোককাহিনীই। লোক সমাজের কথা এসবে বিধৃত। এই ধরনের লোক কথাগুলির মধ্যে পেয়েছি প্রেম, ভালোবাসা, সুখ-দুঃখ, সমাজ ব্যবস্থা, এমন কি ব্যভিচারের প্রসঙ্গও।

মিশরের লোককথার প্রাচীন রূপ হল 'জাহাজ ডোবা মানুষ'। গল্পের কাহিনীটি হল একজন মানুষ লোহিত সাগরের উপর দিয়ে জাহাজ নিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ জাহাজ ডুবে যায়। সে একটি দ্বীপে আশ্রয় নেয়। দ্বীপে একটি সাপের বাস ছিল। সাপটি তার দুঃখের কথা বলে মানুষটির কাছে। দ্বীপে একটি মানবি কুমারী ছিল। মানবি কুমারীও আত্মারাজাদের সঙ্গে কোথায় হারিয়ে গেল। মানুষটি একটি জাহাজে উদ্ধার পেল। এই গল্পে একটি নিটোল কাহিনি আছে। গল্পে একটি মোটিফ আছে। কথার মধ্যে রয়েছে রহস্যময়তা। রাজার নিঃসঙ্গ জীবনের দুঃখ বেদনা এবং ব্যর্থ প্রেমের আভাস দেওয়া আছে।

মিশরের আরেকটি লোককথা—এক রাজার এক পুত্র ছিল। জন্মের পর রাজপুত্রের ভবিষ্যৎ বাণী হয় রাজপুত্রকে হত্যা করবে সাপ, কুমির, কিংবা কুকুর। রাজপ্রাসাদের উঁচু ঘরে তাকে রেখে দেওয়া হয়। রাজপুত্র বড় হল। সে ভবিষ্যৎ বাণীকে অমান্য করে অভিযানে বেরিয়ে পড়ে। পৌছে যায় ভিন্ন এক রাজ্যে। সেই রাজ্যে রাজার এক কন্যা ছিল। রাজা শর্ত দেয় রাজকন্যা যে ঘরে আছে সে ঘরে পৌছাতে পারলে তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবে। রাজপুত্র রাজকন্যাকে লাভ করার জন্য সেই ঘরে পৌছে যায়। তাদের বিয়েও হয়। স্বামীকে রাজকন্যা সাপের হাত থেকে বাঁচায়। রাজপুত্র নিজে

কুমিরের হাত থেকে বাঁচে। কিন্তু রাজপুত্রের কুকুরের কামড়ে মৃত্যু হয়। লোককথায় নিয়তি বড় হয়ে দেখা দেয়। ভালোবাসার পরাজয় ঘটে। কিন্তু রাজপুত্র সর্বদাই নিয়তিকে অস্বীকার করেছে। তাইতো সে রাজকন্যাকে পাবার জন্য তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে সুউচ্চ ঘরে পৌঁছায়। বাধাকে বাধা বলে মনে করেনি। কিন্তু রাজপুত্রের কাছে বড় বাধা হয়ে উঠল নিয়তি। ত্যাগ, পরিশ্রম করেও সে জীবন যুদ্ধে হেরে গেল। ঘটনাটি ব্যতিক্রমী হলেও মোটিফটি বিশ্বজনীন হয়ে উঠেছে।

রোমান লোককথায় প্রেমের ট্র্যাজিক পরিণতি দেখা যায়। এক রাজার দুই ছেলে—অনুপ ও বাটু। বাটু দাদা বৌদির সঙ্গে থাকে। বৌদির কুপ্রস্তাবে বাটু সাড়া না দেওয়ায় দাদার বাড়ি থেকে চলে যেতে হয়। পরে দেবতার বরে রূপসী মেয়েকে বিয়ে করে। ভালোবাসতে থাকে সুন্দরী কন্যাকে। সুখে সংসার করে। কিন্তু ভাগ্যচক্রে এক ফারাওকে সুন্দরী কন্যা আবার বিয়ে করে। বাটুকে যে ভুলে যায়। শক্তি বলে বাটু রূপ পরিবর্তন করে। কখনো গাছ, কখনো ষাঁড়। এইভাবে বৌ-এর প্রতিশোধ নিতে চায়। কিন্তু প্রতিশোধ নিতে পারে না। পরিশেষে বৌ-এর সন্তান রূপে জন্ম গ্রহণ করে। রাজসিংহাসনে বসে মাকে হত্যা করার আদেশ দেয়। রাজসভায় সকলের সামনে রাজা (বাটু) পূর্ব কথা সব বলে। এইভাবে ব্যর্থ প্রেমের নিষ্ঠুর পরিণতি লক্ষ্য করা যায়। গল্পে বাটু সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে চায় কিন্তু সে ব্যর্থ হয়। প্রথমে বৌদি পরে স্ত্রী সকলের কাছ থেকে দুঃখ ছাড়া সুখ পায়নি। গল্পে স্ত্রীর গর্ভে জন্ম নেওয়ার বিষয়টি বিশ্বজনীন মোটিফ হয়ে উঠেছে। রোমান গল্পে প্রেমের জয় ফুটে ওঠেনি ঠিকই কিন্তু প্রেমের করুণ ট্র্যাজেডি দেখানো হয়েছে।

নদীয়ার লোককথা

পথের বীর গল্প : এক সময় দুই দেশে দুই জমিদার ছিল। তাদের মধ্যে খুব রেশারেশি ছিল। দুই জমিদারের যুদ্ধে একজন জয়ী হয়। অন্য একজন পরাজিত হয়। পরাজিত জমিদারের ছোট ছেলে বাদে সকলেই মারা যায়। একদিন দিঘির ধারে সে বসে আছে। জয়ী জমিদারের হাতিকে মাহুত স্নান করাতে আসে। পরাজিত জমিদারের ছেলে কিছুতেই ওঠে না। সে বলে যে, ইচ্ছা করলে হাতিসহ ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারে। বলা মাত্রই জয়ী জমিদারের কাছে তাকে পরীক্ষা দিতে হয়। হাতি ছুঁড়ে ফেলেও দেয়। জমিদার কান্নাকাটি শুরু করে। জমিদার বলে যদি হাতি ফিরিয়ে আনতে পারে তবে একমাত্র মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেবে। এবং রাজত্বের অর্ধেক দিয়ে দেবে। বীর হাতি আনতে রাজি হয়। হাতি আনতে গিয়ে গভীর বনে বীর একজন মৃত কন্যার দেখা পায়। সোনা ও রূপার কাঠি দ্বারা তার জীবন বাঁচায়। রাক্ষসদের হত্যা করে। হাতিকে উদ্ধার করে। পরিশেষে সুন্দরী কন্যাকে বিয়ে করে রাজ্যে ফিরে আসে, জমিদারের মেয়েকে সে বিয়েকরে রাজত্বের অর্ধেক লাভ করে জীবন কাটাতে থাকে।

বুড়ির ছেলে : এক বুড়ির এক ছেলে ছিল। একদিন সে দেখে রাজার ঘোড়া তাদের বাড়ির দেওয়া তেলে মুখ ঘষে। একদিন বুড়ির ছেলে ঘোড়াটিকে বলে যে, সাত সাগর তের নদীর পারে ফেলে দেবে। কথাটি রাজার কানে যায়। রাজা তাকে ডেকে নির্দেশ দেয় যদি সে একাজ করতে পারে তবে তার কন্যার সঙ্গে বিয়ে দেবে এবং অর্ধেক সম্পত্তি দেবে। নচেত গর্দান নেবে। বুড়ির ছেলে সাহস করে রাজি হয়ে যায়। রাজা ঘোড়াটি ফিরিয়ে দিতে বলে। তরী নিয়ে ঘোড়া ফিরিয়ে আনতে যায়। পথে রাক্ষসীদের মেরে ঘোড়া নিয়ে ফিরে আসে। রাজকন্যার বিয়ে হয়। অর্ধেক রাজত্ব পায়। সুখে জীবন যাপন করে।

গল্প দুটিতে অনেকগুলি মটিফ লক্ষ্য করা যায়। নায়কোচিত আচরণ করে রাজকন্যাকে লাভ করে। জমিদারের মেয়েকে বিয়ে করার জন্য দুটি গল্পেই নায়ক অসম্ভবকে সম্ভব করেছে। বীরত্বের গল্প-গাথা হলেও জমিদারের মেয়েকে বিয়ে করার মধ্যে প্রেমের অপরিসীম শক্তি অন্তর্নিহিত আছে। ভালোবাসা থেকে জন্ম নিয়েছে বীরত্ব। জমিদার কন্যাকে পাবার জন্য তারা নিজের জীবনকে নিয়ে ভাবেনি। কাজে অসফল হলে গর্দান হতে পারে এই ভাবনাও ছিল। কিন্তু তারা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি। এখানেই গল্পগুলি বিশ্বজনীন হয়ে উঠেছে।

লোককথার ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমী

দেবাশীষ রায়

অরণ্য যাপনে অভ্যস্ত ও সংগ্রহজীবী আমাদের পূর্বপুরুষগণের মননে চারপাশের প্রকৃতি তথা গাছপালা ও সমগ্র পশুকুলের প্রভাব ধীর পথে বিবর্তিত হতে হতে টোটেম বিশ্বাস বা গোত্রদেবতার রূপ পায়। বিষয়টিকে পদ্ধতিগত নামশব্দ দ্বারা প্রকাশ করার চেষ্টা করলে বলতে হয় সাংস্কৃতিক বিবর্তন ধারা। গোষ্ঠীবদ্ধ মানবমনে Anima, Animatus, Mana এর পথ বেয়ে দৃঢ়মূল করতে সক্ষম হয়েছিল টোটেম বিশ্বাস। এই বিশ্বাস এর দ্বারা রচনা হয়েছিল বনস্পতির সাথে মানবের সম্পর্ক, ঘটেছিল হিংস্র পশুকুলের সাথে সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন। দেবতা হিসাবে বরণ করা গাছটি বা পশুটির উপর আরোপ করা হয়েছিল কতকগুলি বিশিষ্ট চরিত্র বৈশিষ্ট্য; সর্বশক্তিমান, ত্রিকালদর্শী, সত্যদ্রষ্টা, সহায়ক, উপকারী ইত্যাদি গুণ সম্পন্ন টোটেম ধারণা সংগ্রহজীবী অরণ্যচারী গোষ্ঠীসমাজের সমগ্র দর্শনকে প্রভাবিত করে। ফলস্বরূপ লোককথায় আসে 'কথা বলা ঘোড়া' (বি ২১১.১.১৩), 'কথা বলা গোরু' (বি ২১১.১.৫), 'কথা বলা পাখি' (বি ২১১.৩) ইত্যাদির মতো মোটিফ।

"তারা ছাড়ে কই? শেষে সেই বিহঙ্গমা বিহঙ্গমীর কথা বলিলাম। বিহঙ্গমা বিহঙ্গমীর কথা জান? বলি শোন, এক বনে বড় একটা শিমুলগাছে এক বিহঙ্গমা-বিহঙ্গমী থাকে"—কথাগুলো শুনলেই ইচ্ছা করে এর পরের কথাগুলো জানতে, কিন্তু সাহিত্য সম্রাটের 'দেবী চৌধুরাণী'র ব্রজেশ্বর বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্রহ্মঠাকুরাণীর (উদ্ধৃত অংশের বক্তা) কাছে আসার জন্য উদ্ধৃত অংশের পর তাকে থামিয়ে অন্য কথা বলতে বাধ্য করেছে। ব্রজেশ্বরের থামিয়ে দেবার আগে সাহিত্য সম্রাটের কলম কিন্তু দুটি বিশেষ শব্দ বাংলা লোককথার ভাঁড়ার থেকে নিজের মতো করে উদ্ধৃত করেছে। শব্দদুটি 'বিহঙ্গমা-বিহঙ্গমী' সংস্কৃত 'বিহঙ্গম' থেকে যাদেব জন্ম এবং বাংলা লৌকিক ভাষায় ও লোককথায় এদেরই প্রকাশ 'ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমী' রূপে। যদি সংখ্যাতত্ত্বের আশ্রয়ে বাংলা লোককথার বিস্তার ও তার মধ্যে ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমীর উপস্থিতির স্থান বিষয়ে ছক টানা হয় তাহলে দেখা যায় যে, টোটেম— বিশ্বাস জাত দুটি পাখি খুব বড় স্থান অধিকার করে নেই। ব্যঙ্গম পরিবারকে নিয়ে লিখতে গিয়ে এবিষয়টা নজরে আসে। কমস্থান অধিকার করা সত্ত্বেও চরিত্র দুটির প্রচার কিন্তু ব্যাপক। লোককথা বা রূপকথার সম্পর্কে শুধু এরা দুজনেই এসেছে। বিশ্বকবি, দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদারের 'ঠাকুমার ঝুলি'র ভূমিকা রচনা কালেও উল্লেখ করলেন ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমীর কথা। এই ভূমিকায় তাঁর হতাশা চোখে

পড়ার মতো। "স্বদেশের দিদিমা কোম্পানী একেবারে দেউলে। তাঁদের ঝুলি ঝাড়া দিলে কোন কোন স্থলে মার্টিনের এথিক্স এবং বার্কের ফরাসী বিপ্লবের নোটবই বাহির হইয়া পড়িতে পারে, কিন্তু কোথায় গেল রাজপুত্র পাত্তরের পুত্র, কোথায় ব্যঙ্গমা ব্যঙ্গমী, কোথায়— সাত সমুদ্র তেরো নদী পারের সাত রাজার ধন মানিক।" দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদারের 'ঠাকুমার ঝুলি' নামের উজ্জ্বল সংকলনটিতে ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমী সাকুল্যে মাত্র দুবার দেখা দিলেও কবিগুরু অন্যান্য সব বড় বড় চরিত্রের সঙ্গে 'সাত রাজার ধন মানিক' হিসাবে স্থান দিলেন এই দুই পাখিকে। বিষয়টি মনে প্রশ্ন জাগায়। কবিগুরুর কলম থেকে যে বাণী নির্গত তা যদি প্রশ্ন উত্থাপন করে তবে উত্তরের সন্ধানে অনুসন্ধিৎসু পাঠক হিসাবে আবার তাঁর রচনারই আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। 'ঠাকুমার ঝুলি' ভূমিকার প্রথম লাইনটি সে প্রশ্নের উত্তর—"ঠাকুমার ঝুলিটির মত এতবড় স্বদেশী জিনিস আমাদের দেশে আর কি আছে?" ব্যঙ্গমা পরিবারের এই নিখাদ স্বদেশী চরিত্র, মহাজ্ঞানী-মহাজন থেকে শুরু করে ময়লা মেদুর থান পরা, তেল চিট্‌চিটে বালিশ মাথায়, অর্থনৈতিক বিভাজনে 'লোক' শ্রেণীতে পড়া ঠাকুমা ও তাঁর নাতিকে পর্যন্ত দীর্ঘকাল ধরে মোহিত করে রাখার বা কালজয়ী হিসাবে প্রতীয়মান হবার প্রধান কারণ। 'লোককথা'র সৃষ্টিকর্তা যে গোষ্ঠী সমাজ তাদের মুখের ভাষায় এই বিশেষ মৌখিক সাহিত্যের রূপকে সংরক্ষণ করার চেষ্টা যদি 'মান্য' হয় তাহলে সে কাজটি সম্পন্ন হয়েছে (বর্তমান বিষয়ের সাপেক্ষে) দক্ষিণা বাবুর প্রচেষ্টায় এবং কবিগুরুর ভূমিকায়। সাহিত্য সম্রাটের নিজস্ব শৈলীতে তাঁর রচনার বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই বিহঙ্গমা-বিহঙ্গমী রূপে (১৮৮২-১৮৮৩ খ্রীঃ বঙ্গদর্শন) সাদা কালোতে ব্যঙ্গমা ব্যঙ্গমীর নামমাত্র প্রকাশিত। কিন্তু অন্নদাশঙ্করের 'হট্টমালার দেশে' (মার্চ ১৯৮০ খ্রীঃ) তারা স্ব-রূপে ও চরিত্র মহিমায় একটা সম্পূর্ণ ছড়ার বিষয়বস্তু। অন্নদা বাবু বাংলা লোককথার এই দুটি বিশেষ চরিত্রের কোনো ঝলক দেখাননি, যা প্রকাশ করেছেন তা সম্পূর্ণ বাংলা লোক কথার ঐতিহ্যসম্মত ব্যঙ্গমা ব্যঙ্গমী চরিত্র। ব্যঙ্গম পরিবারকে বুঝতে হলে অবশ্য পাঠ্য অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমী' ছড়াটি। ছড়াকার ব্যঙ্গমার ভবিষ্যৎ জ্ঞানের পরিচয় দিতে প্রয়াসী। ছড়াটির মধ্যে ব্যবহৃত শব্দগুলি যেন ঐতিহ্যসম্মত শব্দরূপে ছুঁয়ে যায় (১৪ নং লাইনের 'ঘোড়াপ্লেন' শব্দটি বাদে), রাজপুত্রকে সমস্যাভরা পথের নানা 'কাটানের' পথ বাতলে দেওয়ার মধ্যেও খুঁজে পাওয়া যায় লোককথার 'জ্ঞানী', 'কথা বলা' ব্যঙ্গম পরিবারকে। ছড়াটির মধ্যে অন্নদাশঙ্কর রাজপুত্রের তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে যাওয়ার সময় আসতে পারে এমন একের পর এক সমস্যার কথা ব্যঙ্গমার মুখ দিয়ে বলিয়েছেন, আর ব্যঙ্গমী তার কাটান জানতে চেয়েছে। ছড়াটির শেষে এসে কিন্তু ছড়াকার ঐতিহ্য সবটা মানেননি, ব্যঙ্গমীর এক বিশে ডাকের ছন্দবদ্ধ রূপ প্রকাশ করে তাকে দিয়ে রাজপুত্রের প্রতি ঘরে ফেরার নির্দেশ দিয়েছেন।

এবার দেখি বাংলার লোককথায় ব্যঙ্গম পরিবারের স্বরূপ কিরকম। আগেই মিত্র মজুমদারের প্রকাশ রীতিকে মান্য হিসাবে ধরেছি, তাই ঐতিহ্য বাহক হিসাবে ঠাকুমার ঝুলি আমার এ রচনার প্রথম আশ্রয়। ঠাকুমার ঝুলির মন জুড়ানো-ঘুম পাড়ানো (যদিও ঠাকুমার ঝুলির গল্প শুনে ঘুম আমার কেটে যায় মনে হয় বিছানার আরাম ছেড়ে টান টান হয়ে বসি আর রাজপুত্রের সাথে পার করে দি তেপান্তরের মাঠ।) লোককথাগুলোর মধ্যে 'রূপতরাসীর' পাতে, 'নীলকমল আর লালকমল' গল্পের (টাইপ : ৬৫৫ বুদ্ধিমান দুই ভাই) '৬' সংখ্যক অংশে বড় অশ্বত্থের বাসায় পাওয়া যায় ব্যঙ্গম পরিবারের দেখা। চরিত্র বিচারের ক্ষেত্রে পরিস্থিতির বিশ্লেষণ প্রয়োজনীয়। সুতরাং নীলকমল আর লালকমল গল্পে ব্যঙ্গম পরিবারকে যখন দেখা গেল তখন তার পরিস্থিতি সম্পর্কে একটু আলোচনা করা যাক,—

তরোয়ালে ধার দিয়ে দুই ভাই লালকমল আর নীলকমল রাক্ষসের দেশের উদ্দেশে যেতে যেতে হয়রান হয়ে একটু বিশ্রাম নেওয়ার জন্য বসে অশ্বত্থের তলায়। গাছের উপর বাসায় ব্যঙ্গমী বলে ব্যঙ্গমাকে— "আহা এমন দয়াল কারা, দু-ফোঁটা রক্ত দিয়া আমার বাছাদের চোখ ফুটায়!" এরপর লাল, নীল দু ফোঁটা রক্ত দানের ব্যাপারে সম্মতি জানায় ও ব্যঙ্গমাকে দুই ভাই হাতের আঙুল চিরে রক্ত দেয়। লালকমল নীলকমলের রক্তে চোখ ফোটে দুই ব্যঙ্গম বাচ্চার। সোঁ সোঁ করে নেমে এসে ব্যঙ্গম বাচ্চারা চোখ ফোটাবার বিনিময়ে দুই রাজপুত্রের কিছু উপকার করতে চায়। নীলকমল সৌজন্য দেখিয়ে কোনো উপকার গ্রহণ করতে চায় না কিন্তু ব্যঙ্গমা বাচ্চারা তাদের গন্তব্যে অর্থাৎ রাক্ষসের দেশের উদ্দেশে নদী, মাঠ, পর্বত, মেঘ, চন্দ্র, সূর্য পার করে নিয়ে চলে 'সাত দিন সাত রাত' ধরে, অষ্টম দিনে তাদের গন্তব্যে পৌঁছে দেয়। এই গন্তব্যে পৌঁছে যাওয়ার পর কেমন যেন ঝট করে মিলিয়ে যায় ব্যঙ্গম বাচ্চারা। এরপর আবার '৮' নং অংশে 'আইবুড়ি'র কাটা মাথা নতুন কাপড়ে জড়িয়ে 'মরণ কাটি ভিমরুলের সোনার কৌটো' নিয়ে ব্যঙ্গম ব্যঙ্গম বলে দুই ভাই ডাক দিয়েছে। লালকমল নীলকমল গল্পে ব্যঙ্গম পরিবারকে এরপর আর পাওয়া যায় না। ব্যঙ্গমা ব্যঙ্গমীকে বিশ্লেষণ করার জন্য গল্পে ঐ সংক্রান্ত যে মোটিফগুলো পাওয়া যাচ্ছে সেগুলি হল—

বি ২১১.৩ : কথা বলা পাখি

বি ৪৫০ : উপকারী পাখি

বি ৫৫২ : পাখি বাহিত মানুষ

প্রথম দুটি মোটিফ সরাসরি ব্যঙ্গমা ব্যঙ্গমীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আর তৃতীয়টির সম্পর্ক অর্ধেক অর্ধেক কিন্তু ব্যঙ্গমা ব্যঙ্গমী ছাড়া এ গল্পে বি ৫৫২ অসম্ভব তাই এই মোটিফটিকে নিয়েই ব্যঙ্গম পরিবারের আলোচনা দরকার।

ব্যঙ্গমা ব্যঙ্গমীর সন্ধানে একঝুলি ছেড়ে এবার অন্য ঝুলিতে যাত্রা করি। এবারের ঝুলিটির জন্য আমরা সবাই শ্রী মিত্র মজুমদার মহাশয়ের কাছে কৃতজ্ঞ। 'বঙ্গোপন্যাস

ঠাকুরদাদার ঝুলি'র 'শঙ্খমালা' গল্পের '৬' সংখ্যক অংশে ব্যঙ্গমা ব্যঙ্গমীর প্রকাশ। গল্পে ব্যঙ্গমার উক্তি ব্যঙ্গমীর প্রতি, "শঙ্খসাধু বাণিজ্যে যায়, আজ এই শঙ্খসাধুর ঘরে নীলমানিক রাজার জন্ম হইবে।" ব্যঙ্গমার কথা কিন্তু ব্যঙ্গমী সম্পূর্ণ রূপে বিশ্বাস করে না, তাই পুনরায় ব্যঙ্গমার উক্তি—"ব্যঙ্গমী বিশ্বাস করিলে না? ঐ নদীর ওপারে মানিক হংস নামে এক পক্ষী আছে, স্নান করিয়া উঠিয়া, সাধু মানিক হংস বলিয়া ডাক দিলেই, সেই পাখি আসিয়া সাধুকে পিঠে করিয়া ছয় মাসের পথ প্রহরে ফিরাইয়া আনিবে।" এরপর শঙ্খমণি ব্যঙ্গমীর কথা সঠিক কিনা তা যাচাই করার উদ্দেশ্যে উদ্ধৃত নির্দেশ অনুসারে কাজ করেছেন। এই গল্পে আমরা যেসব মোটিফ পাচ্ছি সেগুলি হল।

বি ২১১.৩ : কথা বলা পাখি

বি ৪৫০ : উপকারী পাখি

বি ১৪৩ : জ্ঞানী পাখি

এছাড়া বি ৫৫২ মোটিফটিও এখানে পরোক্ষভাবে আসে।

১৫০ গ টাইপের গল্প, 'ডালিম কুমার ও ব্যঙ্গমা ব্যঙ্গমী' (অধুনা দিব্যজ্যোতি মজুমদার ও অরুণ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় শিশু কিশোর আকাদেমি, তথ্য সংস্কৃতি বিভাগ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক প্রকাশিত 'সারা পৃথিবীর রূপকথা' নামক সংকলনে ভারতখণ্ডে স্থান পেয়েছে।) গল্পেও ব্যঙ্গমা ব্যঙ্গমীর বসবাস বটগাছের চূড়ায়, এবং কথা বার্তা মানুষের ভাষায়, আকার তাদের মস্ত বড় বড়, মনে তাদের মানবজাতির জন্য মায়া দয়ার শেষ নেই। ডালিম কুমারের মনের কথা জেনে তাই কিভাবে সে তার বোনের জন্য রোগ সারাবার 'দাড়িম ফুল—ফল' সংগ্রহ করবে সে পথ বাতলে দিয়েছে। এগল্পে ব্যঙ্গমা তার ভারিপুরুষ গলায় বলেছে, "বটগাছ তলায় পড়ে আছে যে আমাদের ঠোকরানো বটফল সেই ফল থলি ভর্তি করেই নিয়ে গিয়ে সাপেদের গায়ে ছড়িয়ে দিলে সব সাপ মরে যাবে।" বিষয়টি নিঃসন্দেহে ব্যঙ্গম পরিবারের পবিত্রতার পরিচয় বহন করে। এই নির্দেশ অনুসরণ করে ডালিম কুমার ও ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমী গল্পে আমরা যেসব মোটিফ পাচ্ছি (ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমী সংক্রান্ত) সেগুলি—

বি ১২২.১ : যে পাখি উপদেশ দেয়

বি ১৪৩ : জ্ঞানী পাখি

বি ২১১.৩ : কথা বলা পাখি

বি ৪৫০ . উপকারী পাখি

'নীলকমল আর লালকমল', 'শঙ্খমালা', 'ডালিম কুমার ও ব্যঙ্গমা' এই তিন কথার মধ্যেকার ব্যঙ্গমা ব্যঙ্গমীকে সামনে রেখে ব্যঙ্গম পরিবারের চরিত্র বৈশিষ্ট্যের সাধারণীকরণ করা যাক— প্রথমেই বলতে হয় বাংলা লোককথায় ব্যঙ্গমা ব্যঙ্গমী মূলত (মোটিফ অনুসারে) 'কথা বলা পাখি'। লোককথার আলোচনায় আমরা আবার ব্যঙ্গমা ব্যঙ্গমী সম্পর্কে বি ১৪৩ মোটিফও পাই যা 'জ্ঞানী পাখি' রূপে নির্দেশ করে। প্রসঙ্গত

উল্লেখ্য 'বাংলা একাডেমী ঢাকা' থেকে প্রকাশিত 'লোককলা তত্ত্ব ও মতবাদ' বইতে ওয়াকিল আহমেদ ব্যঙ্গমা ব্যঙ্গমীকে 'সত্যদ্রষ্টা পাখি' হিসাবে উল্লেখ করে বি ১৩১ মোটিফটি নির্দেশ করেছেন। উপকারী পাখি হিসাবেও ব্যঙ্গমা ব্যঙ্গমীর পরিচয় আছে। আবার যথাযথ উপদেশের মাধ্যমে কথাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার ক্ষেত্রে ব্যঙ্গমা ও তার স্ত্রীর পারদর্শিতা বর্তমান। টোটেম বিশ্বাসজাত হবার কারণে রাজপুত্র বা মানবগোষ্ঠির সদস্যকে সমস্যামুক্ত করে সঠিক পথে চালনা করতে প্রয়াসী ব্যঙ্গম পরিবার, একই কারণে তারা ত্রিকালদর্শী। এই তিন কালের সম্যক ধারণা প্রকৃত সত্য সম্পর্কে তাদের ওয়াকিবহাল করেছে ফলে আলোচ্য চরিত্র দুটি দেখা দিয়েছে 'সত্যদ্রষ্টা পাখি' রূপে। বিহঙ্গ যেহেতু তারা, 'খ' তাদের বিচরণ ক্ষেত্র এবং নীল আকাশে ডানা মেলে ধরা সাধারণ জৈবিক ক্রিয়া। কথার মধ্যে উপস্থিত হবার পর ব্যঙ্গমা যদি নিজেরাই শুধু আকাশে উড়ত, তাহলে গল্পের আকাশ ছেড়ে শ্রোতার মনের আকাশে ওড়া তাদের পক্ষে মুশকিল ছিল কিন্তু ব্যঙ্গমা ব্যঙ্গমী সম্বলিত গল্পের বিশ্লেষণে প্রাপ্ত বি ৫৫২ মোটিফ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় মানবগোষ্ঠির সদস্যের মঙ্গলসাধনের উদ্দেশ্যে বাহন হিসাবেও এরা সক্রিয়। ব্যঙ্গম পরিবার মানব সদস্যকে, এক পরিবেশ পরিস্থিতি থেকে আর এক সম্পূর্ণ নতুন পরিবেশ পরিস্থিতিতে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে বা উড়িয়ে নিয়ে গেছে। সুতরাং সত্যভ্রষ্টা পাখি হিসাবে এরা যেমন তিনকালের অবস্থার সংযোগকারী তেমনি আবার রাজপুত্রকে একজগৎ থেকে অন্য জগতে নিয়ে যাবার ক্ষেত্রেও এরা সংযোজক। তাই এই সংযোগ ক্ষমতা এদের একটা বিশেষ চরিত্র বৈশিষ্ট্য। গোষ্ঠি সদস্যদের মনের মধ্যে বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে সেই সময়ের সমাজে দুর্গম পথের কথা দাগ কাটত, মনে হত যদি নীল আকাশের পাখি হয়ে ডানা মেলে দেওয়া যেত তবে বোধহয় সমস্ত পথের দুর্গমতা মিটে গিয়ে সরল সুগম হত কর্কশ পথ। মনের এই চিন্তা সেদিন হয়ত বা প্রভাব ফেলেছিল ব্যঙ্গমা ব্যঙ্গমীর উপর যার উত্তরাধিকার সূত্রে দূর আজ নিকট হয়েছে, আমরা আজ হয়ে উঠেছি আকাশ ছাড়িয়ে মহাকাশের যাত্রী। ডালিম কুমার ব্যঙ্গমা ব্যঙ্গমী গল্পে দেখা যায় আলোচ্য চরিত্রদুটির ঠোকরানো বটফলের দ্বারা দাড়িম বনের সব সাপ মরে যাবে। এই নির্দেশ অনুসরণে বলতে পারি বাংলা লোককথার ব্যঙ্গমা ব্যঙ্গমী খল তথা নাবাচক শক্তির বিরুদ্ধে পবিত্র হ্যাঁ বাচক শক্তি হিসাবে প্রতীয়মান। যে কটু-খল- বিষ, পবিত্র-সত্য-অমৃতকে আবৃত করে রাখে তার নীল বেড়াজালকে নষ্ট করার ক্ষমতা সম্পন্ন এই দুই বিহঙ্গ। সুতরাং মানবসমাজকে সত্যামৃতের সাথে সংযোগ ঘটানোর ক্ষেত্রেও অগ্রণী ভূমিকায় অবতীর্ণ এই দুই চরিত্র। আগেই বলেছি প্রকৃত সত্য সম্পর্কে এদের স্পষ্ট ধারণা বর্তমান, তাকে সম্বল করে কখনো যেমন এরা নিজেরা সংযোগ ঘটিয়েছে তেমনি কখনো আবার কোনপথে গেলে বা কার মাধ্যমে সংযোগ ঘটতে পারে তার নির্দেশও দিয়েছে উপদেশ দিয়েছে (বি ১২১.১)। একটু ভাবলেই বোঝা

যায় টোটেম দেবতা হিসাবে পূজ্য সুতরাং সে সবসময়েই সত্যের পথে চালনা করে এবং সহায়ক হিসাবে দেখা যায়। ব্যঙ্গমা ব্যঙ্গমী এইসব গুণাবলীর সার্থক প্রকাশ হিসেবেই আগে বলা নানা ক্ষেত্রে সক্রিয়।

বাংলা লোককথার ব্যঙ্গম পরিবারের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমার চোখে সবচেয়ে উজ্জ্বল হিসাবে যেদিকটা ধরা পড়ে তা হল— 'রক্ত সম্পর্ক' নীলকমল আর লালকমল গল্পে ব্যঙ্গম বাচ্চাদের চোখ ফোটানোর জন্য দুফোঁটা রক্ত দিয়ে দুই রাজপুত্র সে সম্পর্ক স্থাপন করেছে। স্থাপন করেছে কোনোকিছু পাবার আশা ছাড়াই শুধুমাত্র উপকার করার মানসিকতা নিয়ে, মানবিকতা নিয়ে। অরণ্য জীবন থেকে সদ্য উঠে আসা গোষ্ঠিসমাজ তখনও ভুলতে পারেনি সামগ্রিক জঙ্গলের সাথে তাদের সম্পর্ক। তাই গাছ তাদের আশ্রয় হয়েছে পাখি তাদের বহন করে দূরদেশে নিয়ে যেমন গেছে তেমনি অপরপক্ষের প্রয়োজনেও এগিয়ে এসেছে মানবসমাজের প্রতিনিধি রাজপুত্র সাবলীলভাবে, হাসি মুখে খোলামনে। অরণ্য যেমন পাবার আশা ছাড়াই দানের পর দান করে গেছে মানব বিবর্তনের ক্ষেত্রে, মানব গোষ্ঠির পক্ষ থেকে সেই দানের প্রতি সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে দেবত্ব আরোপ করা হয়েছে। প্রকৃত দেওয়া নেওয়া অতিপ্রাকৃত জগতের সঙ্গে রচনা করেছে খুব কাছের সম্পর্ক। যদিও সে অপরিমেয় সম্পর্ক-ক্ষেত্রের অংশমাত্র ব্যঙ্গম পরিবারের সাথে 'রক্ত সম্পর্ক' রচনার মাধ্যমে ধরা পড়ে তবু এই সম্পর্ক রূপকথার জগতের সাথে লোকসমাজের যেন এক সেতু যা বাংলা লোকসমাজ ও লোককথাকে পৌঁছে দিয়েছে এক অন্য মাত্রায়।

লোকসাহিত্যের আলোচনার মাধ্যমে লোকসংস্কৃতির সংগ্রহ নির্ভর ক্ষেত্র থেকে বিজ্ঞানসম্মত বা 'লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞান' এর দিকে যাত্রাপথ সুগম হয়েছে। এই চলার পথে বিভিন্ন উপাদান বিষয়ক নানা আলোচনা বা আলোচনা ধারার সন্ধান পাওয়া যায় সেসব দিকে চোখ বুলালে আমরা দেখতে পাই সবচেয়ে বেশি আলোচনা লোককথাকে নিয়েই হয়েছে। সেজন্যই এই উপাদানের আলোচনা ক্ষেত্রটি এত বিজ্ঞানসম্মত। যাইহোক ঐ বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা অনুসরণ করে বা বিভিন্ন দেশের লোককথার পাঠ গ্রহণের মাধ্যমে বলা যায় লোককথার একটা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র বর্তমান। সেক্ষেত্রে এক চরিত্র একই দেশের বিভিন্ন স্থানে ভিন্নভিন্ন রূপে যেমন আসে বিভিন্ন দেশেও একইভাবে তারা স্পষ্ট হয়, গল্পের মূল কাঠামো অপরিবর্তিত রেখে। ব্যঙ্গমা ব্যঙ্গমীর ক্ষেত্রেও এই নীতির প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। মূল চরিত্র 'কথা বলা পাখি', 'সত্যদ্রষ্টা পাখি', 'জ্ঞানী পাখি'র সন্ধান ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ও সারা বিশ্বের দেশে দেশে দেখা যায়।

যেমন ত্রিপুরার একটা ৪৬০. খ টাইপের (ভাগ্যের অন্বেষণে যাত্রা) গল্পে বি ২১২.৩ (কথা বলা পাখি) এবং বি ৪৫০ (উপকারী পাখি) মোটিফের সন্ধান পাওয়া যায়। আমাদেব খুব কাছের প্রতিবেশী দেশ নেপালে ৪৬৫ ক (অজানার খোঁজে যাত্রা)

টাইপের গল্পে বি ২১২.৩ , বি ১৪৩ ও বি ১৩১ মোটিফ পাওয়া যায়। এই গল্পে অনেকটা ব্যঙ্গমা ব্যঙ্গমীর ধাঁচে শকুন-শকুনিকে দেখা যায়। মালয়েশিয়ার•৪৩১ নং টাইপের (বনের মধ্যে বাড়ি) গল্পে বি ২১২.৩, বি ১২২.১ মোটিফ পাওয়া যায়। তিব্বতের ১৬০ নং টাইপের গল্পেও বি ২১২.৩, বি ৪৫০ মোটিফ আমরা পাই। বাংলার লোককথার 'শুক-সারি'র সাথে ব্যঙ্গম পরিবারের বড় মিল আমরা খুঁজে পাই, বসবাসের দিক থেকে ও অন্যান্য ক্ষেত্রেও। সুতরাং বাংলার লোকসমাজের ব্যঙ্গম পরিবারের সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে নাহলেও কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়ে নানা নামে কথা বলা বা জ্ঞানী পাখির দল সারা পৃথিবীর লোককথার আকাশে ডানা মেলেছে এবং বড় গাছের ডালে বাসা বেঁধেছে, প্রয়োজনে উপদেশ দিয়েছে বা ঘটিয়েছে কালের সাথে কালের সংযোগ বা স্থানের সাথে স্থানের। এইসব নানা দিক বিশ্লেষণ করার পরেও কিন্তু ব্যঙ্গমা ব্যঙ্গমীর পূর্ণ রূপ হিসাবে আমি ব্যঙ্গমা ব্যঙ্গমীকে নির্দেশ করার পক্ষে। অন্যান্য দেশের কথায় প্রাণী বা পাখির সাধারণ বৈশিষ্ট্য নিয়েই জ্ঞানী পাখি কথা বলেছে কিন্তু বাংলার লোককথায় সে নতুন এক কল্পনার পাখি বাংলার গোষ্ঠি-হৃদয় থেকে তার কল্পনার ডানা, বাংলার গোষ্ঠি— মনন থেকে তার কল্পনার প্রাণ। তাই তারা একান্তভাবেই আমাদের লোককথার বিশেষ উজ্জ্বল অংশ।

বাঙালীর ইতিহাস রচনার উদ্দেশ্য নিয়ে রচিত 'বাঙলা বাঙালি ও বাঙালীত্ব' বইতে আহমদ শরীফ লিখেছেন, "বস্তুত বাঙালীর ইতিহাস লোকধর্মের, লোকায়ত দর্শনের, লোকসাহিত্যের, লোকশিল্পের, লোকবিশ্বাস—সংস্কারের ইতিকথারই অন্য নাম" আহমদ শরীফের এই আলোচনা ও বিনয় ঘোষের 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি'র কর্মকাণ্ড অনুসরণ করে বলতে পারি বাংলার ঐতিহ্যসম্পন্ন লোকউপাদানগুলি ইতিহাসের বিশেষ উপাদান স্বরূপ। সেই সূত্রে লোককথা ও এর নানা চরিত্রের বঙ্গীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উপযোগিতা বর্তমান। আমরা এখনও যে গোত্রবিশ্বাস আমাদের পরিচয়ের মধ্যে বহন করছি (এখনও আমাদের কারোর গোত্র শাণ্ডিল্য, কারোর ভরদ্বাজ, কারোর কাশ্যপ এগুলি সবই আমাদের সেই পূর্বের জীবনযাত্রার পরিচয় বহন করে। শাণ্ডিল্য = বেলগাছ, ভরদ্বাজ = ভরত বা ভারুই পাখি, কাশ্যপ = কচ্ছপ) তার উৎপত্তি ঐ বর্বর জীবনের সময়ে। আবার পরবর্তী কালে যাপনের নানা অভিঘাতের ছাপ গোষ্ঠি মননের মাধ্যমে ছুঁয়ে গেছে বাংলার লোককথাকে; ব্যঙ্গমা ব্যঙ্গমীকে সেসকল সমাজচেতনা কোথাও কোথাও পরিবর্তন করেছে, এসেছে কথান্তর কিন্তু মূল যে কথা বলা চরিত্র তার পরিবর্তন ঘটেনি।

বাংলা লোককথার এই দুটি চরিত্রের উপর বিভিন্ন দিক থেকে যদি আলোকসম্পাত করা হয় তবে উঠে আসে এর একটি বিশেষ গতিধর্ম। 'আম-সন্দেশ' খেয়ে ধুলোয় লুটো পুটি খাওয়া খোকন সোনা হোক বা বিশ্বকবি, অন্নদাশঙ্কর কিংবা বঙ্কিমচন্দ্র এই গতিধর্মের কারণেই বারবার লোককথার বিষয়ে বলতে, লিখতে বা শুনতে গিয়ে সবার

প্রথমে লোককথার স্বপ্নপুরীর ফ্রেম থেকে ব্যঙ্গমা ব্যঙ্গমীকে তুলে আনতে বা গ্রহণ করতে চেয়েছেন। ঠাকুমার স্নেহসিক্ত ব্যঙ্গম পরিবারের এইসব নানা দিক থেকে শুনে মনে হয় বাংলার লোককথার ধারায় প্রকৃতঅর্থে নান্দদিক ঐকতান সৃষ্টির ক্ষেত্রে এই চরিত্রদুটি এতটাই গতিধর্মী যে এদের গতি 'ছাপার বই', 'স্টিলের কলম' কেউ ছিন্নভিন্ন করতে সক্ষম নয়।

বর্তমান পরিবেশ পরিস্থিতি তবে আলাদা, ঠাকুমার ঝুলির ভূমিকায় বিশ্বকবি লিখেছিলেন, "স্বদেশের দিদিমা কোম্পানী একেবারে দেউলে।" বিনয় ঘোষ তাঁর 'টাকা আর টাকা আর মন' প্রবন্ধে লিখেছেন, 'টাকার মন্থনদণ্ডে মন থেকে শুধু বিষ উঠে, অমৃত নয়।" বিশ্বকবি আর বিনয় ঘোষের লেখা দুটি লাইনের সূত্র ধরে আমরা স্পষ্টই বুঝতে পারি আমাদের সংস্কৃতির দেউলে রূপ অনুভব করতে পারি ধনতন্ত্রের বিষ বাষ্প। যে পরিবেশ ব্যঙ্গমা ব্যঙ্গমীর জন্ম দিয়েছিল তা 'পোদ্দারবাড়ি'র খোকন সোনাকে আম-সন্দেশ খেতে ডাকত, মাটিতে গড়াগড়ি দিতে ডাকত, ডাকত ঠাকুমার ঝুলি থেকে গল্প শুনতে। পোদ্দারবাড়ি আজও আছে খোকন সোনার মত 'তোজোসোনা'ও বর্তমান, শুধু মাটিকে সে 'Dirty' বলে, তাই মাটিও তাকে ডাকে না। ঠাম্মা তার বাড়িতেই নেই তাই ঝুলিও নেই। পোদ্দারবাবু আর পোদ্দারবিবি ঝুলির বদলে তার হাতে বেশ চকচকে 'Harry Potter' দিয়েছেন, আর দিয়েছেন নানা 'Activity Based Toy' তবে সেগুলোও তার নাড়বার সময় নেই, সামনে 'Unit Test'। এই পরিস্থিতিতে সত্যি মনে হয় গৃহসীমানার দেওয়ালের মতো আরও নানান দেওয়াল শক্ত কালো হয়ে বোধহয় আমাদের প্রজন্মের বৃদ্ধি বিবর্তন আটকে দিচ্ছে মনে হয় চোখের সামনে নীল আকাশ দেখতে দিচ্ছে না, চোখের সামনের আকাশ না থাকলে, সবুজ গাছ না থাকলে লোককথার আকাশ তো রচনা করা অসম্ভব আর কথার আকাশটি যদি না থাকে তবে পবিত্র ব্যঙ্গম পরিবারের দেখা মেলা সম্ভব নয়।

এই সাংস্কৃতিক পরিবেশ পরিস্থিতির মধ্যে ব্যঙ্গম পরিবারের কথা চর্চা করতে করতে মনে হয় ব্যঙ্গমা ব্যঙ্গমী বোধহয় আজও আছে কিন্তু তারা সত্যিকারের রাজপুত্রকে খুঁজে পাচ্ছে না, যদি পেত হয়ত বলে দিত কোন পথে গেলে বা কি ছড়িয়ে দিলে কিংবা কোন কাঠির স্পর্শে আবার জাগবে 'পোদ্দারবাবু- পোদ্দারবিবি'তে ভরা ঘুমন্তপরী, কোন গাছের কোন ফুলের স্পর্শে তোজো সোনার ঠাকুমা ফিরে আসবে তার ভরা ঝুলি নিয়ে আর তার ভাঙ্গা গলার মেদুর ডাকে তোজো আবার খোকন সোনা হয়ে ধুলোয় গড়াগড়ি যাবে।

গ্রন্থপঞ্জি (বাংলা)

১। অন্নদাশঙ্কর রায় : হট্টমালার দেশে (শৈব্যা পুস্তকালয়, কলকাতা- ৭০০০৭৩)।
২। আহমদ শরীফ : বাঙলা বাঙালি ও বাঙালিত্ব (অনন্যা, ৩৮/২ বাংলা বাজার, ঢাকা।)।

৩। ওয়াকিল আহমেদ : লোককলা তত্ত্ব ও মতবাদ (বাংলা একাডেমী, ঢাকা)।

৪। ড: বরুণকুমার চক্রবর্তী : বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ (অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলকাতা- ৭০০ ০০৯)।

৫। ড: মযহারুল ইসলাম . ফোকলোর পরিচিতি ও পঠন পাঠন (বাংলা একাডেমী, ঢাকা)।

৬। দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় কথা মালা খুশির ছড়া (দি সী. বুক এজেন্সী, কলকাতা- ৭০০ ০০৭)।

৭। দিব্যজ্যোতি মজুমদার : বাংলা লোককথার টাইপ ও মোটিফ ইনডেক্স (লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার)।

৮। দিব্যজ্যোতি মজুমদার ও অরুণ চট্টোপাধ্যায় : সারা পৃথিবীর রূপ কথা, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড (শিশু কিশোর আকাদেমি, তথ্য সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার)।

৯। পল্লব সেনগুপ্ত · লোক সংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ (পুস্তক বিপণি, কলকাতা-৯)।

১০। পল্লব সেনগুপ্ত : লোককথার অন্তর্লোক (লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, কলকাতা- ৭০০০৩৪)।

১১। বিনয় ঘোষ . মেট্রোপলিটন মন * মধ্যবিত্ত * বিদ্রোহ (ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান)।

১২। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপ্যাধ্যায় : দেবী চৌধুরাণী (সাহিত্য বিহার, কলকাতা-৯)

১৩। রীতা ঘোষ . বাংলা লোককথার রূপতত্ত্ব (পুস্তক বিপণি, কলকাতা -৯)

১৪। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় . রূপকথা (একালের সমালোচনা সঞ্চয়ন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)।

১৫। শ্রী দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার . ঠাকুমার ঝুলি বাংলার রূপকথা (মিত্র ও ঘোষ পালবিশার্স)। বঙ্গোপন্যাস ঠাকুরদাদার ঝুলি (মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স)।

গ্রন্থপঞ্জি (English)

1 E.E Evans- Pritechard Social Anthropology (Cohen & west Ltd. London E.c4)

2. Hemendra Nath Banerjee- Introducing Social & Cultural Anthropology (K K. Publication, 4 Nivedita sarani, Kolkata)

3. Lal Behari Dey-Folktales of Bengal (Book Club, Kolkata-700059)

4 Makhan Jha- An Introduction to Anthropological thought (Vikas Publishing House Pvt Ltd., New Delhi -110014)

5 R.H Lowie- Cultural Anthropology (George G Harrap & Co. Ltd. London)

প্রসঙ্গ রাক্ষসকথা

সুমহান বন্দ্যোপাধ্যায়

লোককথাগুলো কল্পকাহিনি। দেশ ও বিদেশের লোককথাগুলোতে রাক্ষস দৈত্যদের বিবরণ আছে। এরা লোক-কথাগুলোর কেন্দ্রীয় চরিত্র বা নায়ক না হলেও, কাহিনির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র রূপে এদের উপস্থিতি দেখা যায়। রাক্ষস-খোক্কসরা সত্যিকারের ছিল কিনা তা নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে, আরেকটি কল্পকাহিনি তৈরি হবার সন্দেহ আছে। কিন্তু এই কাহিনিগুলোতে সমাজমনের এমন কিছু প্রতিফলন আছে, যা নিতান্ত অবহেলার নয়। রাক্ষসদের গোষ্ঠীগত একটি সত্তারও পরিচয় নজর এড়ায় না। রাক্ষস কাহিনির বিশ্বজোড়া উপস্থিতি এদের গুরুত্ব বহুগুণ বৃদ্ধি করেছে। প্রশ্ন হচ্ছে এই রাক্ষসদের বৈশিষ্ট্য কী? কেমন তাদের দেখতে? কাহিনিগুলোতে তারা কিরূপে প্রতিভাত হচ্ছে? দেশকাল নিরপেক্ষ ভাবে তাদের কি কোন পার্থক্য থাকছে? এগুলো ছাড়াও তাত্ত্বিক ভাবে দেখলে রাক্ষসদের তথা রাক্ষস কাহিনিগুলোর বৌদ্ধিক তাৎপর্য রয়েছে। প্রাথমিক ভাবে এই প্রশ্নগুলি নিয়ে প্রবন্ধ অগ্রসর হবার চেষ্টা করবে।

লোককথা চর্চার ধারা ও রাক্ষস কথা

লোককথা চর্চার সূচনা উনিশ শতকের প্রথমের দিকেই হয়েছিল। গ্রিম ভাইদের হাতে মূলত তুলনামূলক লোককথার সংকলন ও আলোচনা প্রকাশিত হয় (১৮১২-১৮১৫ খ্রীঃ)। এই সংকলনের একটি বড় উদ্দেশ্য ছিল আধুনিক ও প্রাচীন লোককথাগুলির ধরনের মধ্যে তুলনা করা। এই তুলনার দ্বারা দেশ ও কালের ভিন্নতার প্রেক্ষিতে লোককথাগুলোর মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য খোঁজার চেষ্টা করা হয়। লোককথা চর্চার পরবর্তী উল্লেখযোগ্য প্রয়াস এদের শ্রেণিবিভাগ করা। এখানে অ্যান্টি আর্নে ও স্টিথ থমসনের প্রয়াস অগ্রগণ্য (Aarne, 1982)। আর্নে-থমসন টাইপ-মোটিফের আলোকে লোককথার বিশ্লেষণে ব্রতী হন। এভাবে লোককথার উপাদানকে আলাদা করে বোঝার ও ব্যাখ্যার যে সূচনা হল তা আরও পরিণতি পেল ভ্লাদিমির প্রপের কাজে (Propp, 1968)। লোককথাগুলির অঙ্গসংস্থানিক গঠন কেমন হতে পারে তার বিশ্লেষণ করেন প্রপ।

লোককথার উপাদান বিশ্লেষণ বিভিন্ন সময়ে এই বিষয়ে চর্চার একটি মূল ধারা হিসেবে রয়ে গেছে। জর্জ হর্ণার (Horner, 1966) আফ্রিকার বুলু জনগোষ্ঠীর লোককথার উপাদানগুলির বিশ্লেষণ করেছেন। ক্যামেরুনের বুলুদের একটি নির্দিষ্ট

লোককথার (The porcupine and her son, Lindi) মূলানুগ অনুবাদ ও ভাবানুবাদ করে তিনি দেখিয়েছেন, এই ধরনের কাহিনি কিভাবে সমাজে ঐতিহ্য ধরে রাখার ক্ষেত্রে জোরালো সওয়াল করেছে। তাদের বিশ্ববীক্ষণের প্রতিফলন লোককথাগুলোতেও ফুটেছে। লোককথাগুলি যে আসলে 'সাংস্কৃতিক মন্তব্য' (Cultural comment) কোন নির্দিষ্ট সমাজ সংস্কৃতির প্রেক্ষিতে তা আলোচনা করেছেন এরিকা ফ্রিডেল (Friedl, 1975)। প্রপের রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন পল পাউলিসন (Powlison, 1972)। ইয়াগুয়া লোককথার ক্রিয়াবাদী বিশ্লেষণে তিনি প্রপের পদ্ধতির প্রয়োগ করেন। লেভিসস্ট্র মূলত মিথের বিশ্লেষণ করলেন— তাঁর পদ্ধতি লোককথা বিশ্লেষণে উল্লেখযোগ্য। হ্যামণ্ড জুশু আদিবাসী গোষ্ঠীর লোককথা বিশ্লেষণ করেছেন লেভি-স্ট্রসের অবয়ববাদী পদ্ধতির অনুসরণে (Hammond, 1977)। অবয়ববাদী পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটিয়েছেন মারান্দা দম্পতিও।

তুলনামূলক আলোচনার মধ্য দিয়ে উপাদানের আনুপাতিক বিশ্লেষণ লোককথা চর্চায় আমরা লক্ষ করি। হ্যামসেন স্পেনীয় দক্ষিণ আমেরিকায় প্রচলিত ৬৫৯ ধরনের লোককথা চিহ্নিত করেছেন। এর মধ্যে ৩৪টি বোকা রাক্ষসের গল্প আলাদা ভাবে পাওযা যায় (Hamson, 1955)। তুলনামূলক পদ্ধতি লোককথা চর্চায় নিঃসন্দেহে একটি প্রধান ধারা। এই ধারায় আরেকটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন নাই তুং তিং এর চীনা ও উত্তর আমেরিকার ইণ্ডিয়ানদের লোককথার তুলনামূলক আলোচনা (Ting, 1985)। লোটে মটজ্ (Motz, 1982) লোককথায় দানব (giant) চরিত্র নিয়ে আলোচনা করেছেন। জার্মান মিথের বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে তিনি দানবকে নতুন দৃষ্টিকোণে উপস্থাপিত করেছেন।

বাংলা লোককথা চর্চায় টাইপ-মোটিফ ইনডেক্স নির্ভর আলোচনা, তুলনামূলক পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ এবং অবয়বাদী-রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণই মূলধারা। এর পাশাপাশি অবশ্য মার্কসীয় দৃষ্টিকোণে লোককথা দেখার প্রয়াস দেখা যায়। তবে বাংলায় লোককথা সংগ্রহের ইতিবৃত্ত যথেষ্ট প্রাচীন, বলা উচিত গ্রিমভাইদের সমসাময়িক। ১৮১২ সালে গ্রিম ভাইদের গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশ পায়, আর ঐ বছরই উইলিয়াম কেরির সংকলন *ইতিহাসমালা)* লোককথা সংগ্রথিত হয় (চক্রবর্তী, ২০০৮)। তবে বাংলা লোককথা চর্চায় উপাদানগত বিশ্লেষণ তুলনামূলক ভাবে কম। যদিও মলয় বসু, সুধীর রায় প্রমুখের আলোচনা এই অভাব কিছুটা পূরণ করেছে। আর রাক্ষস নিয়ে সেভাবে উপাদান গত আলোচনা প্রায় নেই, এক দুটি ব্যতিক্রম বাদে (চট্টোপাধ্যায়, ২০১০)। বর্তমান আলোচনাটি মূলত উপাদানগত বিশ্লেষণ; যদিও বিশ্লেষণী কাঠামোয় অবয়ববাদী, তুলনামূলক, বিবর্তনবাদী এবং ব্যাখ্যাধর্মী বিশ্লেষণের (interpretative analysis) ছায়াপাত এখানে লক্ষ করা যাবে।[১]

রাক্ষস ভাবনা : দেশে-বিদেশে

বাল্মীকি রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের চতুর্থ সর্গে রয়েছে:

"প্রজাপতি ব্রহ্মা অগ্রে জল সৃষ্টি করিয়া জলের রক্ষা বিধানার্থে প্রাণীগণকে সৃষ্টি করিলেন। প্রাণীগণ সৃষ্ট হইবামাত্র ব্রহ্মার নিকট বিনীতভাবে উপস্থিত হইয়া কহিল, আমরা ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়াছি, এক্ষণে কি করিব।

ব্রহ্মা হাস্যমুখে উহাদিগকে কহিলেন, তোমরা এই জলকে রক্ষা কর। তখন ঐ সমস্ত প্রাণীর মধ্যে কেহ কহিল, 'রক্ষাম' আমরা রক্ষা করিব..... তখন প্রজাপতি ঐ ..... প্রাণীগণের এইরূপ কথা শুনিয়া কহিলেন, তোমাদের মধ্যে যাহারা 'রক্ষাম' বলিল তাহারা রাক্ষস হউক।"[২]

আরেকটি কাহিনিতে পাওয়া যায়, ব্রহ্মার রাগ থেকে জন্মায় রাক্ষস। রাক্ষসরা দেখতে বীভৎস, মানুষ ছাড়াও এরা গো-ভক্ষণকারী। আবার বিষ্ণুপুরাণ অনুযায়ী কশ্যপের ঔরসে দক্ষ কন্যা খসার গর্ভে জন্মায় রাক্ষসরা। পৌরাণিক বিবরণ অনুযায়ী এরা—

"হরপার্বতীর বরে এরা সদ্য গর্ভধারণ করে সদ্য পুত্র প্রসব করতে পারতেন। নবজাতক সন্তান তৎক্ষণাৎ মায়ের মত বয়স পেত। রাক্ষসরা মায়াবী, কামচারী, অমিতবলশালী, যজ্ঞনাশক ও বিবিধ রূপধারী। নিষিদ্ধস্থানে বিচরণ করেন এবং তপস্বী ও মানুষের ওপর নানা অত্যাচার করেন ও এদের খেয়ে ফেলেন। কন্যার আত্মীয় স্বজনকে হত্যা করে বা তাদের অঙ্গহানি করে বলপূর্বক বিয়ে করা বা গৃহপ্রাচীরাদি ভেদ করে রোদনশীল কন্যাকে বলপূর্বক বিয়ে করা এঁদের সমাজ ব্যবস্থা।"[৩]

রাক্ষসদের বীজপুরুষকে যদি অনুসন্ধান করা হয়, তাহলে বলতে হয়, রাক্ষসরা আসলে দেবতাদেরই সৃষ্টি। দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার তৈরি নগরে এদের বাস। কিন্তু সামাজিক ও আচরণগত বৈশিষ্ট্যে এদের সঙ্গে দেবতা এবং মানুষ উভয়েরই ভেদরেখা থেকে যাচ্ছে।

"Ancient Hinduism tells that Devas and Asuras are half brothers, sons of the same father *Kasyapa*; but some of the *Devas*, like *Varuna*, are also named *Asuras*. But much later at puranic age *Asura* (also *Rakshasa*) came to exclusively mean any of a race of anthropomorphic, powerful, possibly evil beings.[8] বোঝা যাচ্ছে, অসুর ও রাক্ষস শব্দদ্বয় পরিবর্ত শব্দ রূপে ব্যবহৃত হয়। এরা মানুষের মতো দেখতে তবে দুষ্ট প্রকৃতির বলশালী জনগোষ্ঠী। আরেকটি জায়গায় রাক্ষসদের বলা হয়েছে : .....rakshas, is a race of mythological humanoid beings or unrighteous spirit in Hindu and Buddhist mythology. Rakshas are also called man-eaters."[৫]

রাক্ষসদের শারীরিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে যা পাওয়া যাচ্ছে তা হল : এদের দেহ প্রকাণ্ড,

দেখতে কদাকার এবং ভয়ানক, গাত্রবর্ণ কালো, মুখের দুপাশ দিয়ে দুটি দাঁত বেরিয়ে আছে। এদের হাতের নখগুলি তীক্ষ্ণ এবং বিষাক্ত। এরা জন্তুর মতো গর্জন করে। যদিও রামায়ণ-এ রাক্ষসদের যে বর্ণনা আছে তার সঙ্গে এই বিবরণ পুরোপুরি খাপ খায় না। এদের নর-খাদক বলা হয়েছে। সেই সঙ্গে এরা মায়াবী, নানা রূপধারণ করতে পারত।

আসলে রামায়ণ মহাভারতের যুগ থেকে পৌরাণিক যুগ হয়ে, লোককথায় রাক্ষস সম্বন্ধে ধারণার বিবর্তন ঘটেছে। রামায়ণের যুগে রাক্ষসদের যেভাবে তপস্যা করতে দেখা যাচ্ছে, লোককথায় তার লেশমাত্র নেই। পৌরাণিক যুগেও রাক্ষসদের মধ্যে ভালোমন্দ উভয়ই দেখা যাচ্ছে। শারীরিক বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়েও এদের সবাই যে কদাকার তা নয়। কিন্তু লোককথায় রাক্ষস মাত্রই দুষ্ট, ক্ষতিকর এবং বিকট আকৃতি সম্পন্ন।

সুর অর্থাৎ দেবতার বিপরীতে অসুর। দিতির পুত্র দৈত্য, দনুর পুত্র দানব; জলসম্পদের রক্ষক রাক্ষস। অ-সুর বললে শুধু রাক্ষস নয়, মানুষকেও বোঝায়। কিন্তু মানুষের থেকে রাক্ষসদের তফাৎ বেশ স্পষ্ট। বরং রাক্ষসদের সঙ্গে দেবতাদের মিল অনেক বেশি। দেবতাদের ন্যায় রাক্ষসরাও অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা সম্পন্ন, এরাও মায়াবী ইচ্ছামত রূপ বদল করতে পারে, অমিত শক্তি, বিলাস বৈভবের জীবন। এসমস্ত কিছুর নিরিখে মানুষদের থেকে অনেকটা আলাদা রাক্ষসদের অবস্থান। কিন্তু রাক্ষসরা দেবতা ও মানুষ উভয়ের ক্ষতিসাধনে তৎপর। অপরদিকে মানুষ দেবতার অনুগ্রহ লাভে সচেষ্ট। রাক্ষসকে সে দমন করতে চায়। দেবতা তাই মানুষের সহায়ক শক্তি হলে, রাক্ষস বিরুদ্ধ বা ক্ষতিকর শক্তি। অর্থাৎ যাদু বা magical power এর সঙ্গে রাক্ষসদের সম্বন্ধ।

ইউরোপীয় ধারণায় রাক্ষসদের আর্কিটাইপের মধ্যে evilness এর যে ধারণা তা আমাদের দেশের রাক্ষস ভাবনার সঙ্গে মেলে না। শুধু তাই নয় ইউরোপীয় মত অনুযায়ী রাক্ষসদের শ্রেণিবিভাগও আমাদের দেশজ ধারণার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়। আমরা রাক্ষস বা ঐ জাতীয় শব্দ দিয়ে যা বোঝাচ্ছি ইংরাজীতে তার অর্থ demon. এছাড়া ইংরাজি ভাষায় আরও নানা ধরনের রাক্ষস আছে। যথা—

'Ogre'— An ogre is s large, cruel, monstrous, and hideus humanoid monster .....are often depicted in fairy tales and folklore as feeding of human beings. In art ogres are often depicted with a large head, abundant hair and beard, a voracious appetite, and a strong body.'

'Giant'— The mythology and legends of many different cultures include monsters of human appearance but prodigious size and strength.... gigantic peoples are featured as primeval creatures associated with chaos and wild nature..... are frequently in conflict with the gods.....

Fairy tales... have formed our modern perception of giants as stupid and violent monsters, frequently said to eat humans, and especially children."

'Monster' — A monster is any fictional creature, usually formed in legends or horror fiction, that is somewhat hideous and may produce physical harm or mental fear by either its appearance or actions.

'Demon' — A super natural being described as something that is not human and in ordinary usage malevolent.

খুব আকর্ষণীয় মিল হচ্ছে: রাক্ষস, দৈত্য, দানব ইত্যাদি শব্দগুলির মূল (ব্যুৎপত্তি) অর্থের সঙ্গে যেমন কোন ক্ষতিকর বা ঘৃণাসূচক বা হীনতাবাচক অর্থ-নেই; তেমনি demon শব্দটিও আদতে কোন নেতিবাচক অর্থ বহন করে না। কেউ কেউ এদেরকে পতিত দেবদূত হিসেবে গণ্য করেছেন।

রাক্ষসদের এই বিবরণের পাশাপাশি বাংলা লোককথায় রাক্ষসদের যে শারীরিক বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে, তা দেখা যেতে পারে। কিন্তু এও বলে রাখা ভাল, বৈশিষ্ট্যগুলি খুব স্পষ্ট ভাবে আলাদা করে বলা নেই। বিক্ষিপ্ত ইঙ্গিত থেকে একটা আঁচ করতে পারা যায়।

(১) এই বলে রাক্ষসী মাটিতে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। দেখতে লাগল যেন এই লম্বা এই উঁচু বিন্ধ্য পাহাড়টা। (পৃ.৭৪, দে)

(২) .....নানারকম বিকট আওয়াজ কানে আসতে লাগল। রাক্ষসরা চরে এল. যে যার পেট ভরে ছাগল ভেড়া গোরু ঘোড়া মোষ হাতি খেয়ে। (পৃ. ৭৪, ঐ)

(৩) নদীর ধারে পৌঁছে, নিজের আসল বিকট চেহারা ধরে, তিনগুনো বড় হয়ে রাক্ষসী তার হতভাগ্য স্বামীকে ধরে, ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে, খেয়ে ফেলল। (পৃ. ৬৩, ঐ)

(৪) ঐ যে রাক্ষসীদিদি হরিণের ঠ্যাং ছিঁড়ে চিবুচ্ছে। কি বড় হাঁ রে বাবা! চোয়ালটা যেন আকাশ পর্যন্ত উঁচু! খা. .হ তো খাচ্ছেই রাক্ষসী; (পৃ ৬২, ঐ)

(৫) যথাসময়ে দৈত্য আসিয়া উৎপাত শুরু করিল। তাহার তিনটি মাথা, দেহের অর্ধেক মানুষের মতো, অর্ধেক ঘোড়ার মতো, নিঃশ্বাস এত গরম যে কাহারও গায়ে লাগিলে সে দগ্ধ হইয়া যাইবে। (পৃ ১১১, ভট্টাচার্য)

(৬) রাত্রে রাক্ষসীরা আপন রূপ ধরিয়া মানুষ খাইতে বাহির হয়........ (পৃ. ১৪৮, ঐ)

বিদেশী লোককথা গুলিতেও ওগার বা দৈত্যের পরিচয় পাই। ফরাসী লোককথা Finette Cendron এ দৈত্য ও দৈত্য পত্নীর দেহাকৃতির বিবরণ রয়েছে। কাহিনি থেকেই বলি কেমন সে রূপ—

".......a horrible old woman with a single eye in the middle of her forehead and a hideous face. She was fifteen feet tall and thirty feet in girth." (page 71, Gant, 1969)

আর তার স্বামীর বিবরণটি এইরূপ :

".....an ogre who was six times as tall as his wife. His voice shock the whole castle, he too had one enormous eye, and he used a log for a walking-stick. He sniffed the air and promptly accused his wife of hiding some children from him." (Ibid)

আফ্রিকার লোককথায় আবার মনস্টার এসেছে। সেখানে তার যে ছবিটি ফুটে উঠছে তা হল—

"Suddenly Kweku Tsin heard a mighty crashing and roaring, and looking up, he saw a horrible, scaly monster coming towards him. (p.118, Arnott, 1969)

.....the monster who smelt the human beings before thay heard him. (p.118 1 bid)

Lifting its huge claws, the monster grabbed Anasi and Kweku Tsin" (p.119, Ibid)

দেশী হোক বা বিদেশী লোককথার রাক্ষস দৈত্যদের মধ্যে কতকগুলি মিল চোখে পড়ে। কিন্তু অমিল ও অসংগতির দিকগুলি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথমে মিলের বিষয়গুলোই বলা যাক।

১. সাধারণভাবে রাক্ষস-দৈত্যদের চেহারা সাধারণ মানুষদের থেকে অনেক বড়, ভয়ানক, কদাকার হয়। বাংলা লোককথায় তিনমাথাওয়ালা, অর্ধেক দেহ ঘোড়ার মতো, দৈত্যের কথা পাওয়া যায়। তেমনি ফরাসী লোককথার দৈত্য নব্বই ফুট লম্বা, তার কপালে একটি মাত্র চোখ, তার মুখটি বিকট, বীভৎস। এদের কণ্ঠস্বর এতই প্রবল যে গোটা দুর্গ কেঁপে ওঠে। আফ্রিকার গল্পের দানবের দেহ প্রকাণ্ড এবং আঁশযুক্ত, তার হাতে বড় বড় নখ।

২. রাক্ষসরা বাতাসে শুঁকে মানুষের গন্ধ পায়।

বাংলা লোককথায় পাই—

'হাঁউ মাউ খাঁউ/ মানুষের গন্ধ পাঁউ।'

ফরাসী কাহিনির দৈত্য বাতাসে মানুষের বাচ্চাদের গন্ধ পেয়ে গিয়েছিল, যেমনটি আফ্রিকার কাহিনির দানব আনাসি ও তার ছেলে কিওকুর গন্ধ পেয়ে তার বড় বড় নখ দিয়ে তাদের পাকড়াও করেছিল।

৩. খাদ্যাভ্যাসের দিক দিয়ে দেশী বিদেশী দেত্য দানোর খুব মিল। তারা নরমাংস ভোজী। এছাড়াও জীবজন্তুর কাঁচা মাংস না হলে তাদের চলে না। আশুতোষ ভট্টাচার্য

কৃত লোককথা সংগ্রহের (১৩৭৩) অন্তর্গত কাহিনিতে দেখি রাক্ষসীরা রাত্রে আপন রূপ ধরে মানুষ খেতে বার হয়। লালবিহারী দে'র *বাংলার উপকথা*-র রাক্ষসরা হাতি-ঘোড়া, গরু-মোষ খেয়ে রাত্রে ফিরে আসে। আফ্রিকার লোককথাতেও দেখেছি যে দানবের গুহায় প্রচুর ভক্ষিত প্রাণীর হাড়গোড় জমা হয়েছিল।

৪. দেশ ও বিদেশের রাক্ষসরা প্রকাণ্ড প্রাসাদে বাস করে। তাদের প্রাসাদে বৈভবের ছড়াছড়ি। এখানে তাদের রাজকন্যাকে ঘুমপাড়িয়ে বা বন্দী করে রাখতে দেখা যায়। কিন্তু রাক্ষস দৈত্যরা সবসময় হৃদয়বৃত্তি রহিত এমনটি বললে ভুল হবে। কী এক অজ্ঞাত কারণে রাক্ষস-রাক্ষসীরা প্রাসাদের সবাইকে খেয়ে ফেললেও রাজকন্যাকে বাঁচিয়ে রাখে। এমনকি নিজেদের মৃত্যুর রহস্যও বলে দেয় তাকে। ফরাসী রূপকথা 'ফিনেত সেঁদ্রো'তে দেখি দৈত্যপত্নী বাচ্চা দুটিকে পাত্রের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিল।

রাক্ষস কাহিনিগুলোর সবচেয়ে বড় সমস্যা হল রাক্ষস বলতে যে সংবর্গ এই কাহিনিগুলো নির্মাণ করে তার বৈশিষ্ট্যগুলি একেবারে স্পষ্ট নয়। এই কাহিনিগুলো অবলম্বন করে বিভিন্ন কোষগ্রন্থ রাক্ষস দৈত্য দানব অসুর ইত্যাদির যে বৈশিষ্ট্য প্রদান করেছে তাও ধোঁয়াশাপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এমনকি ইংরেজি অনুসরণে যথার্থ প্রতিশব্দ বাংলায় তৈরী করা যায় না। ডিম্ন্, মনস্টার এবং জায়ান্ট এই তিন ক্ষেত্রে বাংলায় (*নৃ-বিজ্ঞান কোষ*) দানব শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। আর ওগার্-কে একমাত্র রাক্ষস বলা হচ্ছে (খান, ২০০১)।

"Demon : দানব

বিভিন্ন ধর্মে দানবের অস্তিত্ব দেখা যায়। এরা মানুষের শত্রুবলে গণ্য হয়। দানবদের মনে করা হয় অতি মানবের চেয়ে কম ক্ষমতা সম্পন্ন সত্তারূপে। বিশ্বাস করা হয় যে দানবরা মানুষের সমস্যা ও দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী। আরও ধারণা করা হয় যে, দানবরা ভূগর্ভে বসবাস করে তবে পৃথিবীর সর্বত্র যাতায়াত করতে পারে। তাদের অদৃশ্য হবার ক্ষমতা আছে এবং আবার মানুষের রূপ ধারণও করতে পারে। এমন ধারণাও আছে যে কোনো কোনো দানব আবার মানুষের উপকারও করে থাকে।" (পৃ ৪০৪, খান, ২০০১)

"Giants : দানব

অস্বাভাবিক রকমের মোটা কোনো প্রাণী, মানুষ ও অন্যকিছু। এগুলো উত্তর আমেরিকান লোককথায় প্রায়ই দেখা যায়। দানবরা সর্বদা পুরুষজাতীয় এবং স্বগোত্রভোজী। দানবে বিশ্বাস বাস্তব বিশ্বজনীন বিষয়। বাংলা ভাষায় ভৌতিক কাহিনিতে দানবের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।" (পৃ. ৫৬৪, ঐ)

"Monster : দানব

অদ্ভুত আকৃতি ও রূপের প্রাণী। এমন এক ধরনের প্রাণী যে, জন্তু ও মানব সমন্বয়ে গঠিত। আবার এমন ধরনের অদ্ভুত বিকৃত আকারের প্রাণীর মধ্যে কিছুটা মানব

গুণাবলিও থাকে। আসলে এধরনের দানবের উপস্থিতি পুরাণ বা রূপকথায় দেখতে পাওয়া যায়।" (পৃ. ১২০, ঐ, ২য় খণ্ড)

"Ogre : রাক্ষস

ওগার এমন এক ভয়ঙ্কর রূপকথার রাক্ষস, যে মানুষ গিলে খায়। বিভিন্ন ধরনের রূপকথায় রাক্ষসের উল্লেখ পাওয়া যায়।" (পৃ. ১৬৬, ঐ)

ভাবনার উভয়বলতা

রাক্ষস সম্বন্ধে আমাদের ধারণা একেবারেই সর্বসম্মত নয়। দুটি কোষ গ্রন্থে রাক্ষসকুলের যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে, তা পাশাপাশি রাখলেই এই পার্থক্য বোঝা যাবে। ইন্টারনেটের কোষগ্রন্থে (উইকিপিডিয়া) জায়ান্টকে বলা হচ্ছে মানুষের মতোই দেখতে, তবে আকারে অনেক বড় এবং অমিত বলশালী। কিন্তু নৃবিজ্ঞানের কোষ বলছে, মানুষ ছাড়া অন্য কিছুও জায়ান্ট হতে পারে। তাছাড়া এই বিভিন্ন ধরনের রাক্ষসের মধ্যে তফাৎ কোথায় তা নিয়ে একজনের বক্তব্যের সঙ্গে অন্যের বক্তব্য কোথাও মেলে না। ফলে সমস্ত বিষয়টিই বদলেছে। আমাদের বলতে হবে, আমাদের নিজেদের মধ্যে যে 'ambiguity' থাকে তাই রাক্ষস ভাবনার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত। এর সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য মৃত ব্যক্তির সম্বন্ধের কথা বলেছেন ফ্রয়েড।

"খুব সম্ভবত দানবের যাবতীয় ধারণা মৃতের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। এই সম্পর্কের মধ্যে উভয়বলতা বর্তমান।" (ফ্রয়েড, ১৯৯৩, পৃ. ৫৫)

এই উভয়বলতার উপাদান হিসেবে নানা বিরোধাভাসযুক্ত বিষয় দানব বা রাক্ষস ধারণার মধ্যে রয়ে গেছে। প্রথমত, জীবিতের সঙ্গে মৃতের একটি দূরত্ব থেকে যায়। মানুষ আত্মাকে একদিকে তার প্রিয় সামগ্রী দিয়ে স্বজন করে নিতে চায়। অন্যদিকে সে আবার ভূতের ভয় পায়। ফলে জীবিত ও মৃতের জগতের মধ্যে দূরত্ব একটি প্রাসঙ্গিক ধারণা। এই দ্বিতীয় জগতের উপর মানুষের পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ নেই। এর অনেককিছুই তার কাছে ধোঁয়াশা। ফলে এই সংক্রান্ত ভাবনাগুলির মধ্যেও একটি অস্পষ্টতার ছাপ থেকে যায়। যেমনটি দানব রাক্ষসদের ক্ষেত্রে হয়েছে। তাহলে যে দ্বিতীয় প্রসঙ্গটি উঠে আসে তাহল দানব ও মানুষের জগতের মধ্যে একটি অনপনেয় দূরত্ব।

দ্বিতীয়ত, দূরত্বের ফলে এক অজানা জগৎ সৃষ্টি হয়, যা অজানার কারণে অনিশ্চিত, এই জন্যই তা আতঙ্ক সৃষ্টিকারী। ফলে এর সঙ্গে ভয় বা আতঙ্কের নানা উপাদান একাত্রিত হয়ে যায়।

তৃতীয়ত, মানুষ মানুষকে খেয়ে ফেলছে এ দৃশ্য ভয়ের এবং ভয়ানক। তাই যে সব জনজাতির মধ্যে নরমাংস ভোজন প্রচলিত (এটা শুনেছে বা দেখেছে), তা মানুষের কাছে ভয়ের বার্তা নিয়ে এসেছে। এর সঙ্গে রাত্রির অনুষঙ্গ রাক্ষসদের অশুভ আগমনকে আরও তীব্র করে তুলেছে। এদের মধ্যে কতকগুলি স্বাভাবিক প্রাকৃতিক

নিয়মের (মানুষের মানদণ্ডে) ব্যতিক্রম দেখা যায়। যেমন, রাক্ষস বা রাক্ষসী তার আত্মীয় স্বজনকে (স্বামী, সন্তান বা সন্তানতুল্য) ভক্ষণ করছে। আত্মীয় সম্পর্কের এই যে অস্বীকার (denial) মানুষের নিরিখে তা স্বাভাবিক নয়। রাক্ষসের প্রবল ঘ্রাণ শক্তিও মনুষ্যেতর বৈশিষ্ট্য।

রাক্ষসদের ভিন্নধর্মী বৈশিষ্ট্য দ্বারা সম্ভবত আশুতোষ ভট্টাচার্যও বিভ্রান্ত হয়েছেন। 'পক্ষীরাজ' নামক লোককথাটি শুনিয়ে, তার সঙ্গে যে মন্তব্য যোগ করেছেন তিনি তা থেকে এটাই মনে হয়। অধ্যাপক ভট্টাচার্য লিখছেন—

"দৈত্য শব্দটির ইংরেজি কয়টি প্রতিশব্দ পাওয়া যায়, যেমন giant, demon, dragon, monster, spirit, ইত্যাদি। সংস্কৃতেও দৈত্য, দানব, অসুর, রাক্ষস ইত্যাদি বিভিন্ন শব্দ পাওয়া যায়। সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে প্রত্যেকটি শব্দকেই প্রকৃত একার্থবাচক বলিয়া মনে হইবে না।.....

........*দৈত্যের আকৃতি সর্বদাই বিকৃত থাকে।*

ইংরেজিতে one eyed devil-এর কথা শুনিতে পাওয়া যায়। এখানেও দৈত্যের তিনটি মাথা।

.....দৈত্য বলিতে দেবতারই শত্রু বুঝায়— পূর্বেই বলিয়াছি, তাহারা কশ্যপ মুনির ঊরস ও দক্ষকন্যা দিতির গর্ভজাত; সুতরাং *তাহারা সুন্দর দেবাকৃতি* ।" [বঙ্কিম অক্ষর বর্তমান প্রবন্ধকারকৃত] (ভট্টাচার্য : ১৩৭৩ : ২১৩-২১৪)

আশুবাবু একবার বলছেন দৈত্যরা বিকৃত দেহ; আবার তিনিই পরক্ষণে লিখছেন, তাহারা সুন্দর দেবাকৃতি বিশিষ্ট। কেউ কেউ বলতে পারেন প্রথম ক্ষেত্রে তিনি দৈত্যের বিদেশী ধারণাটি ব্যক্ত করেছেন; আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে দৈত্যের দেশীয় রূপটি লিখেছেন। কিন্তু এই অভিমত নস্যাৎ হয়ে যায় এই কারণে যে, তাঁরই করা সংকলনের (ভট্টাচার্য, ১৩৭৩) ২১১ পৃষ্ঠায় দৈত্যের বিকৃত দেহের কথাই সংগৃহীত হয়েছে এবং এটি দেশীয় লোককথা।

রাক্ষসী : নারী বিদ্বেষ

রাক্ষসী, দৈত্যপত্নী ইত্যাদির প্রসঙ্গ দেশীয় লোককথায় যেমন আছে, তেমনি বিদেশী লোককথাগুলিতেও রয়েছে। বিদেশী লোককথাগুলিতে রাক্ষসী বা দৈত্যের স্ত্রী অপেক্ষা রাক্ষস বা দৈত্য বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। তারাই সেখানে প্রধান ক্ষতিকর শক্তি। কিন্তু দেশী গল্পগুলিতে রাক্ষসীদেরকেই দুষ্ট হিসেবে দেখানো হয়েছে। রাক্ষসদের কথা আছে। তারা দলবদ্ধভাবে চরে বেড়ায়, মানুষ-পশু-জন্তু খায়, নগর জনপদ ধ্বংস করে। কিন্তু স্বাধীন চরিত্র হিসেবে তাদের কার্যকলাপ সেভাবে চিত্রিত হয় নি, যতটা রাক্ষসীদের ক্ষেত্রে হয়েছে।

রাক্ষসীরা সুন্দরী রমণীর বেশ ধরে, কখনও রাজার মহিষী রূপে রানিমা সেজে সাধারণ মানুষের মধ্যে মিশে থাকে। কখনও বাড়ির কাজের মেয়ে হয়েও তাদের ছদ্মবেশিনী হয়ে থাকতে দেখা যায়। তারা মানুষের সঙ্গে সংসারও পাতে। ঘরকন্না করে। মানুষের সঙ্গে সহবাসে তাদের সন্তানাদি হয়। অথচ সেই রমণী বেশী রাক্ষসী মানুষের ক্ষতি করে। যেমন 'সূতাশঙ্খ' নামক লোককথাটিতে (ভট্টাচার্য, ১৩৭৩)।

রাজ্যের রানির আয়ু যে একজোড়া পাশার মধ্যে তা একমাত্র জানত এক রাক্ষসী। রাজপ্রাসাদের পাশে এক তালগাছে তার বাস। এক দিন সে ভিখারিনীর ছদ্মবেশে রাজপুত্রের কাছে পাশা চেয়ে নিয়ে পাশাবতী নামে রাক্ষসী বোনদের রাজত্বে পাঠিয়ে দেয়। তারপর সে রানিকে খেয়ে ফেলে। নিজে রানির রূপ ধরে। তার আবার সাত ছেলে হয়। এদিকে যে আরও জেনে নিল রাজপুত্র ডালিমকুমারের আয়ু ডালিমের বীজে। সেই বীজ হস্তগত করে রাজপুত্রকে অন্ধ করে দিল।

গল্পের শেষে দেখা যায় ডালিমকুমার সূতাশঙ্খ সাপকে হত্যা করে সবাইকে উদ্ধার করছে।

'চারবন্ধু' (ভট্টাচার্য, ঐ) শিরোনামা লোককথাটিতেও দেখি তিনজন পরমাসুন্দরী যুবতী আসলে রাক্ষসী। এরা রাজপুত্র ও তার তিনবন্ধুকে বশ করে রাজপ্রাসাদে নিয়ে যায়। এই পরমাসুন্দরীদের দলে একজন রাজকুমারী ছিল, সে রাজকুমারকে চিনতে পারে। মজার কথা সে কিন্তু রাক্ষসীদের দলেই ছিল, রাক্ষসীরা তাকে খায় নি। 'কেশবতী' (দ্রষ্টব্য, ঐ)-র কাহিনিতেও দেখি রাক্ষস নয়, রাক্ষসী 'অপরূপ সুন্দরী নারীর' বেশ ধরে ব্রাহ্মণকে বিবাহ করছে। বিবাহের ফলে ব্রাহ্মণ ও রাক্ষসীর একপুত্র হয়, তার নাম সহস্রদল। আবার মানবী স্ত্রীরও একটি পুত্র ছিল, যার নাম চম্পাদল। সহস্রদল আর চম্পাদল আবার অভিন্ন হৃদয়। এখানেও দেখা যায় রাক্ষসী নিজমূর্তি ধরে একসময় ব্রাহ্মণ ও তার মানবী স্ত্রীকে খেয়ে ফেলে। শুধু তাই নয়, কাহিনি আরও অগ্রসর হলে দেখা যায়, সাতশো রাক্ষসী একটি রাজ্যের সব মানুষকে খেয়ে কেবল রাজকন্যা কেশবতীকে বাঁচিয়ে রেখেছিল।

এই সাতশো রাক্ষসীর প্রাণ ছিল জলের নিচের স্ফটিক স্তম্ভের দুইটি মৌমাছির মধ্যে। বুড়ি রাক্ষসীর থেকে কেশবতী এই তথ্য কৌশলে সংগ্রহ করে চম্পাদল ও সহস্রদলকে জানিয়ে দেয়। চম্পাদল অসীম বীরত্বের সাহায্যে মৌমাছি দুটিকে হত্যা করলে সাতশো রাক্ষস মারা যায়। চম্পাদলের সঙ্গে কেশবতীর বিবাহ হল। এদিকে সহস্রদল রাক্ষসী মাকে হত্যা করে।

'সাতমায়ের এক ছেলে' (দ্রষ্টব্য, ভট্টাচার্য, ১৩৭৩) গল্পেও দেখি রাজা মৃগয়ায় গিয়ে পরমাসুন্দরী রমণী ভেবে যাকে বিবাহ করে রানি করছেন, সে আসলে রাক্ষসী। এখানেও রাক্ষসী রানি সবাইকে খেয়ে ফেলতে থাকে। 'নরঘাতক সন্ন্যাসী' কাহিনিতেও

পাই, 'যুবতীটি আসলে রাক্ষসী। ছলে ভুলাইয়া মানুষকে ভক্ষণ করাই তাহার কাজ' (ঐ, পৃ. ১২৭)। 'হাড়ের স্তূপ' কাহিনিতেও সুন্দরী যুবতীরা রাক্ষসী (ঐ পৃ. ১৪৮)

সবক'টি কাহিনিতেই দেখা যাচ্ছে, রাক্ষসীরা সুন্দরী যুবতী রূপে ছলাকলায় ভুলিয়ে যুবা পুরুষদের আকৃষ্ট করছে। রাজা বা রাজপুরুষের সঙ্গে তাদের বিবাহ হচ্ছে। এরপর তারা স্বমূর্তি ধরে মানুষ আত্মীয় পরিজনকে খেয়ে ফেলছে। আমার মনে হয়, লোককথার এই রাক্ষসীরা প্রতীকী, এবং তারা শিশুর সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে একটি জরুরি শিক্ষা দিচ্ছে। এই শিক্ষাটি হল, রূপ দেখে ভোলা উচিত নয়, এবং মেয়েরা রাক্ষসী হতে পারে। সামাজিকভাবে মেয়েদের ক্ষতিকর বা দুষ্ট হিসেবে দেখা হয়েছে রাক্ষসীর মধ্য দিয়ে। সমাজে মেয়েদের অবদমিত করে রাখার এ এক কৌশল। তুমি যদি দুষ্ট হও তাহলে তোমাকে মারার, কটু কথা বলার বৈধতা আমার থাকে। লোককথার মধ্য দিয়ে নারীর প্রতি সমাজের বিদ্বেষকে এভাবে ছোট শিশুদের মনেও চারিয়ে দেওয়া হল।

এই রাক্ষসীদের সঙ্গে দেখা যাচ্ছে মানুষের বিবাহ হচ্ছে। কিন্তু রাক্ষসবর্গের কেউ মানুষ কন্যা বিবাহ করছে না। বিবাহের ফলে মানুষের ঔরসে রাক্ষসীর গর্ভে যে সন্তান (পুত্র) জন্মাচ্ছে সে কিন্তু আবার তার রাক্ষসী মাকেই হত্যা করছে। এই পুত্র সন্তান মানুষের কন্যাকে বিবাহ করতে পারে। এটাও আসলে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোর বহিঃপ্রকাশ। রাক্ষসীর পুত্র হলে বাবা যেহেতু মানুষ তাই তার সগোত্রভুক্ত হচ্ছে সন্তানটি। এই সন্তান যে তার রাক্ষস জন্মজনিত সম্পর্ক অস্বীকার করছে এর প্রমাণ সে নিজের রাক্ষসী মাকে হত্যা করছে। রাক্ষসী-মানুষ বিবাহে আমার সব সময়ই দেখি মূলত পুত্র জন্মাচ্ছে, কন্যা নয়। এটিও সম্ভবত পিতৃতন্ত্রের কারিগরী। এই ব্যবস্থা প্রতিলোম বিবাহকে অনুমোদন করে না। তাই রাক্ষসী বিবাহ ঘটছে (অনুলোম)। কিন্তু রাক্ষসের মানবী বিবাহ পাওয়া যায় না। এর অন্তর্নিহিত বক্তব্যটি কী এই : যে তুমি নিচু জাতে (বা বর্গে) বিবাহ করতে পারো; কিন্তু তার রূপে ভুলে যেন রাক্ষসী এনো না। অনুলোম সমাজ অনুমোদিত, কিন্তু তবুও অবাধ নয়, একটি সতর্কীকরণ এর সঙ্গে থাকছে, এই ধরনের বিবাহ না হলেই ভালো। যদিও এই ধরনের বিবাহ ভারতীয় সমাজে হয়েছে, এবং এর ফলে জাত সন্তানরা সমাজের নিম্নবর্গের বিভিন্ন জাতির অঙ্গীভূত হয়েছে।

রাক্ষস কাহিনিতে তাই সুন্দর রমণীদের ছদ্মবেশে ভয়ানক রাক্ষসীরা লুকিয়ে থাকে না; নিপাট নিটোল গল্পের ছদ্মবেশে লুকিয়ে থাকে এক অসুন্দর পুরুষতন্ত্র।

রাক্ষসকথা ক'টি অন্য দিক

রাক্ষস কাহিনিগুলির আরও ক'টি এমন বৈশিষ্ট্য আছে যা একটু আলাদা করে বলতে হয়।

রাক্ষসদের ক্ষেত্রে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, তাদের প্রাণ অন্য কোন বস্তুতে নিহিত আছে। কখনও তা টিয়াপাখির দেহে, কখন বোলতা বা ভোমরা বা মৌমাছির দেহে। আত্মা যে দেহের বাইরে যেতে বা থাকতে পারে এই অনুমান ছিল মানুষের। একে দেহবহিঃস্থ আত্মার (external soul) ধারণা হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

রাক্ষসরা তাদের বেশ বদল করতে পারে ইচ্ছামতো। তারা মায়াবী। মানুষ বা সুন্দরী রমণীর রূপ ধরে তারা মানুষের সমাজে মিশে যেতে পারে। এই রূপান্তর (transformation) রাক্ষস কাহিনিতে অন্যমাত্রা যোগ করেছে।

অমিত শক্তির অধিকারী হয় রাক্ষসরা। এদেরকে কোথাও কোথাও (বিদেশী কাহিনিতে বিশেষ করে) বৃহৎ সৌধ নির্মাণকারী হিসেবে দেখানো হয়েছে। কাহিনিগুলিতে আমার (দেশী-বিদেশী) পাই, রাক্ষসরা প্রভূত প্রাচুর্যের মধ্যে বিরাট প্রাসাদে বাস করে।

প্রধানত বিদেশী রাক্ষস কথাগুলিতে পাওয়া যায় রাক্ষসরা মানুষের কাছে বুদ্ধিতে পরাস্ত হয়েছে। ফরাসী কাহিনি 'ফিনেত সেঁদ্রো' তে দেখা যায়, বুদ্ধি করে কিভাবে রাক্ষসকে পুড়িয়ে মারা হচ্ছে এবং তার স্ত্রীর শিরশ্ছেদ করা হচ্ছে। আফ্রিকার লোককথাতেও মানুষের বুদ্ধির কাছে রাক্ষস পরাভূত হয়। আমাদের দেশের কাহিনিগুলোতে বীরত্বের সঙ্গে বুদ্ধির মিশ্রণ ঘটেছে।

এতকিছু মিলিয়ে রাক্ষস কাহিনিগুলোর সামগ্রিক বিচার বিশ্লেষণের থেকে কিছু তাত্ত্বিক ধারণা উঠে আসে কিনা দেখা যাক।

তত্ত্ব নির্মাণের প্রয়াস

সরাসরি না হলেও, এডওয়ার্ড বার্নেট টাইলরের বিবর্তনবাদী ধারণার সঙ্গে রাক্ষস ভাবনার একটি যোগসূত্র পাওয়া যেতে পারে। টাইলর সর্বাত্মাবাদের যে তত্ত্ব উপস্থাপিত করেছেন সেখানে আত্মার (soul) বিবর্তনের কথা বলেছেন। কতকগুলি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে এই আত্মা বিবর্তিত হয়। প্রথমে ছিল অশরীরী আত্মা (apparitional soul) এবং ভূতের (ghost soul) ভাবনা। এই আত্মার ধারণা এ পর্যায়ে আবার তিনভাবে বিকশিত হয়েছে, যথা—

(১) আত্মার সাধারণ ধারণা

(২) জন্মান্তরবাদ (the doctrine of metempsychosis)

(৩) মৃতব্যক্তির আত্মার বাসস্থান (residence of departed soul)

বাস্তবে রাক্ষস ভাবনার মধ্যে এই তিনটি বিষয়ের কিছু কিছু অনুসূত্র রয়ে গেছে। আত্মার ধারণা খুবই স্পষ্ট, সেই সঙ্গে বহিঃস্থ আত্মার ধারণাও। জন্মান্তরবাদের মধ্যে রূপান্তরের ইঙ্গিত থেকে যায়। বাসস্থান প্রসঙ্গে দু-ধরনের ব্যবস্থা রয়েছে— এক অন্য প্রকারের বসতি প্রাসাদ অট্টালিকা; আর দ্বিতীয়ত অন্য কোন প্রাণীর দেহ। আফ্রিকা

ইউরোপের কাহিনিতে গুহাবাসী রাক্ষসও দেখা যাচ্ছে। এর মধ্যে অন্য বসতি ধারণা কিন্তু স্পষ্ট হয়েছে। সর্বাত্মাবাদী চিন্তাধারা অনুযায়ী পরবর্তী যে পর্যায়ের কথা টাইলর বলেন, তা হল প্রেতাত্মাদের উপাসনা (manes worship)। এখানে আত্মারাই পূজনীয় পদে উন্নীত হয়। দেবতা ও আত্মা এই দুইয়ের মাঝামাঝি এ অবস্থা। টাইলর লিখেছেন—

"...souls in origin but demons or deities in quality...."

টাইলরের বিবর্তনবাদী ধারণা অনুযায়ী রাক্ষসদের এক অর্থে সাংস্কৃতিক উদ্বর্তন (cultural survival) রূপে গণ্য করা যায়।

রাক্ষস বা দানবদের নানা ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে একথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। সংক্ষেপে এই বিভিন্ন ধারণাগুলি হল—

(১) দানবেরা হল কোন বহিঃজাগতিক ঘটনা (লুডউইগ লেস্টনার)।

(২) লাগামছাড়া বন্যতার শক্তি হ'ল দানব (উল্‌ফ গাং গোলফার)।

(৩) দেবতাদের কোন প্রাচীন অবস্থা (জ্যাকব গ্রিম)।

(৪) প্রাকৃতিক ক্ষতিকর শক্তি (উইজিন মগ্‌ক্)।

(৫) মৃতদেহ ভক্ষণকারী গোষ্ঠী (স্কানিং)।

(৬) মৃতের প্রতিভূ এবং স্বয়ং মৃত (টারভিলে পেত্রে) (Motz, 1982)।

মটজ অবশ্য এর কোন মতটিকেই মানেন নি। জার্মান মিথগুলোর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেছেন তিনি, বিশেষ করে এডিক কাহিনিগুলো। এর থেকে তিনি সিদ্ধান্তে এসেছেন দানবরা আসলে আদি দেশজ জনগোষ্ঠীগুলোর দেবতা (gods of the native population)। মটজ এই ভাবনার মধ্যে দ্বিমেরকৃত (dual) চরিত্র খুঁজে পেয়েছেন। মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্বের উভয়বলতার কথা এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য।

তামিল লোককথায় প্রতিফলিত দানব বা রাক্ষসের কথা আলোচনা করেছেন ইতালীয় অধ্যাপিকা গ্যাব্রিয়েলা ফেরো-লুজি (Ferro-Luzzi, 1998)। বর্তমান প্রবন্ধটির বাহু পর্যবেক্ষণের সঙ্গে ফেরো-লুজির দৃষ্টিভঙ্গীর মিল পাওয়া যায়। তিনি—

... Stresses the impossibility of essentially defining the concept of demon because it partly overlaps with the concepts of animal, ordinary man, holy man, and god.

(Ferro-Luzz ::1998 : 405)

তাঁর আলোচনায় দানবের যে বৈশিষ্ট্য উঠে এসেছে তা এই রকম : অতিমানবিক ক্ষমতা, অতিমানবিক বা অতিপ্রাকৃতিক ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা, অনিষ্ঠকারী (malevolence), নির্বুদ্ধিতা (Stupidity) এবং সেই সঙ্গে আপাতভাবে কিছু ভালোগুণ (Seemingly positive praits)। দানবের শারীরিক বা দৈহিক বর্ণনার যে চিত্র তিনি পেয়েছেন, তা থেকে তিনি বলতে বাধ্য হয়েছেন—

The concept of demon, therefore, is another fuzzy or polythetic-prototype, one with no essence.

(Ibid : 412)

মানুষের অদম্য বাসনা যেন ভারতীয় 'বৃহৎ ঐতিহ্যে'র এক অন্যতম প্রধান পাপকে ব্যক্ত করেছে। পণ্ডিত 'বৃহৎ ঐতিহ্যের' ধ্বজাধারীদের হাতে এটিই হয়ে দাঁড়িয়েছে দানব। এমনটিই ছিল ফেরো-লুজির সিদ্ধান্ত। তাঁর নিজের ভাষায়—

Demons animated by indomitable desires thus embody a cardinal sin of 'great tradition' Hinduism. The projection of this sin on cross-culturally malevolent demons seems to be the brain child of learned Hindus filtered down to the popular level where it peacefully coexists with its converse.

(Ibid : 414)

রাক্ষস-দানব-দৈত্য ভাবনার মধ্যে দেশ-কাল-সংস্কৃতি ভেদে ভিন্নতা লক্ষণীয়। বিচিত্র উপাদান ও কার্যকারণ এই ভিন্নতা সৃষ্টি করেছে। এজন্য নামকরণ থেকে শুরু করে দেহগত বৈশিষ্ট্য সর্বত্রই সংস্কৃতিভেদে পার্থক্য লক্ষ করা যাচ্ছে। আসলে বৃহৎ, ভয়ানক, ক্ষতিকর এবং অতিপ্রাকৃতিক ঘটনার মুখোমুখি হয়েছে মানুষ বারবার। কোন আপাত পরিচিত বিষয় বা ঘটনা বিরূপ বা বিরুদ্ধ শক্তি হিসেবে আকস্মিকভাবে মানুষের জীবনে এসে পড়েছে। তাই পরিচিত রাক্ষস বা অসুর (এখানে পরিচয়ের নৈকট্য যত না, তার চেয়ে অপরিচয়ের দূরত্ব বেশি) পরবর্তী সময়ে ভয়ানক ক্ষতিকর জীব হিসেবে প্রতিপন্ন হয়েছে। এই ঘটনাগুলো এমনভাবে নানা সময়ে এসেছে যে এদের সম্বন্ধে মানুষের ধারণা অনেক সময় দানা বাঁধতে পারে না। তাই পরস্পর বিরোধিতা, উভয়বলতা এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এজন্য বলা যায়, বাস্তব কিছু উপাদান, উপকল্প ও কল্পনার সমন্বয়ে একটি সাংস্কৃতিক নির্মাণ হল রাক্ষস। এরই কাহিনি মৌখিক পরম্পরায় বহমান হয়েছে রাক্ষসকথা রূপে এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে।

পাদটীকা

১. এই রচনাটি বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় সংকলিত লোককথার উপর ভিত্তি করে রচিত। এর বাইরেও রাক্ষস কাহিনি নানা ধর্মে পাওয়া যায়। এখানে অবশ্য ধর্মীয় কাহিনির রাক্ষস-দানব আলোচিত হয়নি। যদিও রাক্ষস সংক্রান্ত ভাবনার উৎস খোঁজার ক্ষেত্রে ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের প্রয়োজনে ধর্মীয় কাহিনির রাক্ষস-দৈত্য-দানব এসেই যায়।

২. বাল্মীকি রামায়ণ, হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য কর্তৃক অনুবাদিত, ২য় খণ্ড, ১৯৭৬

৩. পৌরাণিকা, অমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৭৯ (দ্বিতীয়খণ্ড)

৪. Wikipedia,

৫ তদেব

উল্লেখপঞ্জী

খান, সাদাত উল্লাহ, ২০০১, *নৃবিজ্ঞান কোষ,* (১ম ও ২য় খণ্ড), বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

চক্রবর্তী, বরুণকুমার, ২০০৮, *বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা।

চট্টোপাধ্যায়, মুনমুন, ২০১০, রাক্ষস কথা একটি নৃ-তাত্ত্বিক পাঠ, *Multiverse of Folkcultures, An Eastern Perspectives,* Gurudas College, Kolkata.

দে, লালবিহারী, , *বাংলার উপকথা* (অনুবাদ : লীলা মজুমদার),

ফ্রয়েড, সিগমুণ্ড, ১৯৯৩, *টোটেম ও টাবু*, সুবর্ণরেখা, কলকাতা (ভাষান্তর · ধনপতি বাগ)।

বন্দ্যোপাধ্যায়, অমলকুমার, ১৯৭৯, *পৌরাণিকা,* কলকাতা।

ভট্টাচার্য, আশুতোষ, ১৩৭৩ (ব) *বাংলার লোকসাহিত্য,* (চতুর্থ খণ্ড), ক্যালকাটা বুক হাউস, কলকাতা।

ভট্টাচার্য. হেমচন্দ্র, ১৯৭৬, *বাল্মীকি রামায়ণ,* (২য় খণ্ড) (অনুবাদিত), কলকাতা।

ইংরেজি

Arne, Antti and Stith Thompson. 1928, *The types of the Folktale . A Classification and Bibliography,* Academia Scientifica Fennica, Helsinki

Arnot, Kathleen: 1969, *African Fairy Tales* , Somaiya Publication Pvt. Ltd ; Bombay

Ferro—Luzzi, G.E.. 1998: Demonology in Tamil Folktales: *Anthropos* Bd 93, H. 4/6 : 405-415

Gant, Roland; 1969, *French Fairy Tales;* Somaiya Publication Pvt.Ltd., Bombay

Hammond Tooke, W D ; 1977, Levi-Strauss in a Garden of Millet : The Structural Analysis of a Zulu Folktale, *Man*, (N S), Vol 12 (1) : 76-86

Hansen. T.L.; 1955; The Distribution and Relative Frequency of Folktale Types in Spanish South America, *The Journal of American Folklore;* Vol.68 (267) · 90-93

Hansen, William; 1997, Mythology and Folktale Typology : Chronicle of a Failed Scholarly Revolution; *Journal of Folklore Research;* Vol 34(3) :275-280

Motz, Lotte; 1982, Gaints in Folklore and Mythology . A New Approach; *Folklore;* Vol. 93(1) : 70-84

Powlison, Paul.S., 1972, The Application, of Propp's Functional Analysis of a Yagua Folktale, *The Journal of American Folklore;* Vol. 85(335) : 3-20.

Propp, Vladimir; 1968, *The Morphology of the Folktale;* Texas University Press, Austin.

Ting, Nai-Tung; 1985; A Comparative Study of Three Chinese and North-American Indian Folktale Types. *Asian Folklore Studies.* vol.44(1) : 39-50.

www wikipedia.com (accessed on 15.06.11)

বাংলাদেশে লোককথা চর্চা

রাশনা শারমীন

লোক ঐতিহ্যের সুবিশাল অঙ্গন বাংলাদেশ। এখানে লোককথার রয়েছে সমৃদ্ধ এক ভাণ্ডার। যদিও বাগার্থ (Formalized)লোককলার উল্লেখযোগ্য এ ধারাটি (Form)নিয়ে বিজ্ঞানসম্মত গবেষণা এ দেশে খুব অল্পই হয়েছে। লোককথা নিয়ে গবেষণার ইতিহাস এখানে খুব সমৃদ্ধ না হলেও আবহমানকাল ধরে এ দেশের মানুষের জীবন-যাপনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে এ অঞ্চলের লোককাহিনীগুলো। শিশু কিশোর থেকে শুরু করে সকল রসের মানুষের কাছে এটি খুব আদরণীয় একটি সাহিত্যধারা। পুরাণের চূর্ণ অংশ সম্বলিত এসব লোককাহিনী আমাদের শেকড়ের সন্ধান দেয়। তাই কালে কালে, যুগে যুগে লোককাহিনী বলার বা শোনার মানুষের অভাব হয় নি এ দেশে। বহু যুগ আগের কিস্‌সা-কাহিনী,ব্রতকথা, কিংবদন্তি সবসময় উদ্দীপ্ত করেছে ছেলেবুড়োদের। বয়স শ্রেণি নির্বিশেষে লোককাহিনী শোনা বা বলার প্রক্রিয়া এখানে আজও ক্রিয়াশীল। আজও গ্রামাঞ্চলে খোলা উঠোনে মাদুর পেতে নানি দাদির পাশে গোল হয়ে বসে লোককথা শোনার সংস্কৃতি বিলুপ্ত হয়ে যায় নি। তবে বাংলাদেশের শহরাঞ্চলে ব্যস্ত জীবন আর আধুনিক বিকল্প বিনোদনের প্রভাবে লোককথা বলা বা শোনার প্রচলন অস্তমিত প্রায়।

লোককথাগুলোর মধ্যে আমাদের নৃতাত্ত্বিক , প্রত্নতাত্ত্বিক ও সমাজ ইতিহাসের অনেক বৈশিষ্ট্য লুক্কায়িত থাকে। এর নন্দনতাত্ত্বিক সৌন্দর্যও আমাদেরকে কম আকৃষ্ট করে না। বাঙালির কাছে এর আবেদন বিশেষভাবে বলার মতো। সেকালের দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী থেকে শুরু করে আজকের সময়ের অনেক সাহিত্য প্রেমিকই লোককথা সংগ্রহ ও সংরক্ষণে মনোনিবেশ করেছেন আপন আপন প্রাণের টানে। বিলুপ্তির হাত থেকে লোককথাগুলোর অস্তিত্ব রক্ষায় বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন এসব সংগ্রাহকেরা। লোকসাহিত্যের অপর ধারাগুলোর মতোই এখানে সমান তালে সংগৃহীত হয়েছে লোককথাগুলো। তবে ছড়া, প্রবাদপ্রবচন, ডাক খনার বচন, মৈমনসিংহ গীতিকা, লোকসংগীতের মতো ধারাগুলো নিয়ে সাহিত্যিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে গবেষণা যতখানি হয়েছে লোককথা বিষয়ে গবেষণার কাজ সে তুলনায় অপ্রতুল। বিশেষ করে এ চিত্র আরও প্রকট হয়ে ধরা পড়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের দিকে তাকালে। মৈমনসিংহ গীতিকা, ছড়া,

লোকগীতি, প্রবাদ প্রবচন ইত্যাদি নিয়ে। স্বতন্ত্রভাবে যত বই প্রকাশ হয়েছে, শুধু লোককথা নিয়ে স্বতন্ত্র ও সামগ্রিক গবেষণা এবং গ্রন্থ প্রকাশ সে তুলনায় অনেক কম। যে কয়েকটি বই পাওয়া যায় তাতে লোককথার সবকটি ধারা, যেমন— রূপকথা, উপকথা, কিংবদন্তি, ব্রতকথা ইত্যাদির সামগ্রিক সমৃদ্ধ আলোচনা ধরা পড়ে নি। তবে বর্তমান বাংলাদেশে লোককথা নিয়ে গবেষণাধর্মী কাজ যে একেবারেই নেই, বিষয়টি সেরকমও নয়।

২

বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে লোকসাহিত্য চর্চা শুরু হয় ৪০এর দশকে, স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পরও যা ক্রিয়াশীল রয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে 'লোকসাহিত্য সমিতি'র মাধ্যমে লোকসাহিত্যের চর্চা শুরু হলেও বাংলা একাডেমীর প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে লোকসাহিত্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটির অবদান অনস্বীকার্য। দু একটি বিচ্ছিন্ন সংকলন ছাড়া এ কাজের সামগ্রিক সফলতা বাংলা একাডেমীর। প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই লোককথা সংগ্রহে নিরবচ্ছিন্ন কাজ করে এলেও এগুলোর প্রকাশনার কাজ আশানরূপ অবস্থায় এসে পৌঁছেছে ৭১ পরবর্তী বাংলাদেশে। বাংলা একাডেমীর সংগৃহীত ২২০০ লোককথার মধ্যে বেশিরভাগই স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে সংকলিত ও প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা একাডেমীর নিয়োজিত ও অনিয়োজিত সংগ্রাহকেরা বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে এসব লোককথা সংগ্রহ করেছেন। এগুলো বাংলা একাডেমীর সংরক্ষণ শাখায় সংগৃহীত রয়েছে। এর এক বিরাট অংশ প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে। ৫০ এর দশকের শেষে এবং ৬০ এর দশকে যখন মূলত এ লোককথাগুলো সংগৃহীত হয় তখন পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকভাবে ফোকলোর সংগ্রহ ও সংকলনের পদ্ধতি প্রক্রিয়া সম্পর্কে আমাদের অঞ্চলে সম্যক ধারণা ছিল না। ফলে এ সমস্ত উপকরণ সংগ্রহ নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতার সাথে করা হলেও প্রেক্ষাপটগত তথ্যের অভাব রয়েছে। আধুনিক গবেষকদের কাছে এটি একটি বড় দুর্বলতা হিসেবে প্রতীয়মান হয়েছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাংলা একাডেমীর ফোকলার উপবিভাগ স্বতন্ত্র বিভাগ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলে লোকসাহিত্য সংগ্রহের আধুনিক পদ্ধতির সঙ্গে পরিচয় ঘটে বাংলা একাডেমীর কর্মীদের। যার সুবাতাস লাগে লোককথা সংগ্রহ পদ্ধতিতেও। ফোকলোর চর্চার আধুনিক তথ্যায়ন ও রেকর্ডিংয়ের নতুন বিজ্ঞানসম্মত অভিযাত্রা শুরু করে বাংলা একাডেমী। এর পর থেকে এদেশে লোকসাহিত্য চর্চা ও গবেষণা এগিয়েছে সময়ের হাত ধরেই। তবে লোককলার আঙ্গিক হিসেবে স্বতন্ত্রভাবে লোককথা নিয়ে যত কাজ হয়েছে তার চেয়ে লোকসাহিত্যের অন্য কয়েকটি ধারা নিয়ে এ দেশে কাজ হয়েছে ঢের বেশি।

বাংলা একাডেমীর উদ্যোগে ১৯৮৫, ১৯৮৬ও ১৯৮৭ সালে ঢাকায় জাতীয় পর্যায়ের তিনটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়, যা বাংলাদেশে ফোকলার চর্চার পথকে সুবিস্তৃত করে। পাশাপাশি বাংলা একাডেমীতে ফোকলোরের একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার ও অডিও ভিজুয়াল শাখার আত্মপ্রকাশ ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে থাকে লোককথা চর্চার ক্ষেত্রটিতে।

ফোকলোর চর্চার মাধ্যমে লোককথাকে আরও সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে ১৯৯৮ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ফোকলোর বিভাগ প্রতিষ্ঠার ঘটনাটি লোককথা চর্চাকে এগিয়ে দিয়েছে অনেক ধাপ ওপরে।

এসবের পাশাপাশি আরও কিছু প্রাতিষ্ঠানিক ও সাংগঠনিক উদ্যোগ বিচ্ছিন্নভাবে লোককথা চর্চার ওপর কাজ করার স্বপ্নকে লালন করেছে। এগুলির মধ্যে রয়েছেঃ কবি জসীমউদ্দীন ও শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীনের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং ড. মযহারুল ইসলামের সভাপতিত্বে গঠিত ঢাকার 'বাংলাদেশ ফোকলোর পরিষদ'(১৯৭৩), ড. মযহারুল ইসলামের একক উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত'বাংলাদেশ ফোকলোর সোসাইটি' (১৯৯০). ড. আবদুল জলিলের উদ্যোগে গঠিত 'লোকসংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র' (১৯৯৬), মাহবুবুল হক ও শামসুল হোসাইনের উদ্যোগে চট্টগ্রামে গঠিত 'লোকসংস্কৃতি পরিষদ' (১৯৮৬), প্রভৃতি। এসব সংগঠন নিয়মিতভাবে সক্রিয় না হলেও বাংলাদেশ ফোকলোর সোসাইটি তুলনামূলকভাবে কর্মতৎপর।

৩

বাংলাদেশে লোককথা সংগ্রহের সূত্রপাত বাংলা একাডেমীর হাত ধরেই। বাংলা একাডেমী অনেকদিন ধরে 'লোকসাহিত্য' নামে যে সংকলন প্রকাশ করে আসছে তাতে পর্যাপ্ত না হলেও কিছু কিছু লোককথা প্রকাশিত হয়েছে। একাডেমীর সংগ্রহশালায় বৃহদাকৃতির ৬২৯টি ভল্যুমের মধ্যে ২২০০ টি লোককথা রয়েছে। (সূত্র ফোকলার চর্চায় বাংলা একাডেমীর ভূমিকা, ড. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ; একুশের প্রবন্ধ ফোকলোর (২০০৭)। 'বাংলা একাডেমী ফোকলোর সংকলন'-এর ৭১টি খণ্ডের মধ্যে ২ ও ৩ সংখ্যক খণ্ডে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে একটি করে লোককাহিনী ছাপা হয়েছে। পরবর্তীকালে লোককাহিনীর বিষয়ভিত্তিক সংকলন প্রকাশিত হয়। লোককাহিনীর যেসব সংকলন প্রকাশ করা হয়েছে সেগুলো হলো ঃ ৩১ সংখ্যক খণ্ডে রাজশাহীর লোককাহিনী; ৬ ও ৩৩ সংখ্যক খণ্ডে শোলকি কিস্‌সা ; ৮ ও ৩৯ সংখ্যক খণ্ডে বোকার কিস্‌সা; ১০ ও ৩৪ সংখ্যক খণ্ডে কিংবদন্তি; ৩০, ৩৫, ৪২ সংখ্যক খণ্ডে পশু পাখির কিস্‌সা, ৩২ সংখ্যক খণ্ডে রূপকথা, ৩৮ সংখ্যক খণ্ডে পরীর কিস্‌সা; ৮ সংখ্যক খণ্ডে জোলার কিস্‌সা এবং ২৪ সংখ্যক খণ্ডে সদাগরের কিস্‌সা। এগুলোর বেশিরভাগই স্বাধীনতা পরবর্তী সংকলন ও প্রকাশনা। পুরনো জেলার মধ্যে

নোয়াখালী, খুলনা, যশোর, বগুড়া, পাবনা ও দিনাজপুরের লোককথা সংগৃহীত নেই। শ্রেণি বিবেচনায় লোককথা সংগ্রহে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে রূপকথা, পশুপাখির কিস্‌সা, বোকার কিস্‌সা এবং শোলকি কিস্‌সা। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে লোকসাহিত্য সংকলন দ্বিতীয় খণ্ডে (১৯৬৩) ও তৃতীয় খণ্ডে(১৯৬৫) একটি করে লোককথা আঞ্চলিক ভাষায় লিপিবদ্ধ ও সংকলিত হওয়ার মধ্য দিয়ে লোককথা সংকলনের কাজ শুরু করে বাংলা একাডেমী। দ্বিতীয় খণ্ডে একই কিস্‌সার দুটি ভাষ্য প্রকাশিত হয়— একটি রংপুর থেকে ও অন্যটি ঢাকা থেকে সংগৃহীত। তৃতীয় খণ্ডে সংকলিত কিস্‌সাটি কুমিল্লা থেকে সংগৃহীত। লোকসাহিত্য সংকলন ষষ্ঠ খণ্ডে (১৯৬৫) চট্টগ্রাম, রংপুর, কুমিল্লা, ফরিদপুর ও ঢাকা থেকে সংগৃহীত লোককাহিনী আঞ্চলিক ভাষায় প্রকাশিত হয়। আলাদাভাবে রংপুরের লোককথাগুলি সপ্তম খণ্ডে স্থান পেয়েছে। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে সংগৃহীত এসব লোককথায় টাইপ ও মোটিফ ইনডেক্স নির্ণয়ের দিকটি গুরুত্ব পায় নি।

আশরাফ সিদ্দিকীর সম্পাদনায় বাংলা একাডেমী থেকে 'কিশোরগঞ্জের লোককাহিনী' প্রকাশিত হয় স্বাধীনতার কয়েক বছর আগে, ১৯৬৫ সালে। এটি কিশোরগঞ্জের লোককাহিনীর প্রতিনিধিত্বমূলক সংকলন। ৩০টি লোককাহিনী সংকলিত হয়েছে এখানে। সংগৃহীত কাহিনীগুলোর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ পাওয়া যায় এখানে। এগুলির টাইপ সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা করেছেন তিনি । তবে আঞ্চলিক ভাষায় প্রকাশ না করে সেগুলো প্রকাশ করা হয়েছে সাধু ভাষায়। ফলে কাহিনীর রসমাধুর্য বহুলাংশে বিনষ্ট হয়েছে। বইটিব দ্বিতীয় খণ্ড বের হয় ১৯৯৫ সালে।

পূর্ব বাংলায় এ ধরনের আঞ্চলিক লোককাহিনীর আর একটি সংগ্রহ মোহম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত ও বাংলা একাডেমী প্রকাশিত 'ঢাকার লোককাহিনী' (১৯৬৫)। এ গ্রন্থে ঢাকার তিনটি লোককাহিনী সংকলিত হয়েছে। তবে ঢাকার আঞ্চলিক ভাষা অনুসৃত হয় নি এতে। কথকদের সম্পর্কেও পর্যাপ্ত তথ্য পাওয়া যায় না এখানে।

রাজশাহীর লোককাহিনী সংকলিত হয়েছে গোলাম সাকলায়েন সম্পাদিত লোকসাহিত্য সংকলনঃ ৩১ খণ্ডে (১৯৮৫। এ গ্রন্থে রাজশাহীর ৬টি লোককথা সংকলিত হয়েছে।

লোককাহিনীর অন্যান্য সংকলনগুলি হচ্ছেঃ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত ও বাংলা একাডেমী প্রকাশিত 'যশোরের লোককাহিনী' (১৯৭৪), প্রভাংশু ত্রিপুরার 'ত্রিপুরার লোককাহিনী' (২০০৭), শাহিদা খাতুন ও মোহাম্মদ ইসহাক আলী সম্পাদিত বাংলা একাডেমী ফোকলোর সংকলনঃ ৭১ খণ্ড (১৯৯৮)। মোট ৬১টি কাহিনী সংকলন ভুক্ত হয়েছে খণ্ডটিতে। কাহিনীগুলোর বিষয়বস্তু বউ, জামাই, শাশুড়ি, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী, শিষ্য পণ্ডিত, মৌলবি, উকিল, গোয়ালা, চাষী, রাখাল, ধোপা, কাঠুরিয়া, কলু,

জোলা, সাধু, শিষ্য, রাজা, উজির, সওদাগর, রাজকন্যা, রাক্ষস, শিয়াল, বেজী ইত্যাদি। এগুলোর মধ্যে ঠক, সাধু, শিষ্য, রাজা, উজির, সওদাগর, রাজকন্যার কাহিনিই বেশি। কাহিনীগুলো অনিয়োজিত সংগ্রাহক কর্তৃক বৃহত্তর ঢাকা জেলা থেকে সংগৃহীত। ১৯৭৩ থেকে ১৯৭৬ সালের মধ্যে তিনজন সংগ্রাহক এগুলো সংগ্রহ করেন। এঁদের মধ্যে মোঃ কোহিনূর রহমান খান ৪৯টি , খোন্দকার জহীর উদ্দীন ৫টি এবং কাজী সাহাজ উদ্দীন ৭টি কাহিনী সংগ্রহ করেন। সংকলনভুক্ত এ কাহিনীগুলোর শ্রেণিকরণ ও টাইপ মোটিফ সূচি নির্ণয় জরুরি।

এছাড়া বাংলাদেশের রূপকথার উল্লেখযোগ্য সংকলনগুলোর মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ্যঃ আনেয়ার হোসেন খান সম্পাদিত লোকসাহিত্য সংকলনঃ ৩২ খণ্ড (১৯৮৫)। এ গ্রন্থে সংকলিত রূপকথার সংখ্যা ১১টি ও সামীয়ুল ইসলাম সম্পাদিত লোকসাহিত্য সংকলনঃ৩৮ খণ্ড (১৯৮৪)।

কিংবদন্তির উল্লেখযোগ্য সংকলন হচ্ছেঃ বাংলা একাডেমী সংকলিত লোকসাহিত্য সংকলন, ১০ম খণ্ড(১৯৭০)। মুহম্মদ আশরাফ আলী সম্পাদিত লোকসাহিত্য সংকলনঃ ৩৪ খণ্ড(১৯৮৫)। এ গ্রন্থে ২৫টি কিংবদন্তি সংকলিত হয়েছে।

বাংলা একাডেমী প্রকাশিত পশুকথাগুলি তিনটি খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। পশু-পাখির কিসসা সংকলিত হয়েছে দুটি খণ্ডে। সেগুলো হলোঃ মাহমুদা খানম সম্পাদিত লোকসাহিত্য সংকলন ঃ ৩৫ খণ্ড (১৯৮৫)। এ গ্রন্থে ১২টি পশুকথা সংকলিত হয়েছে। মোহাম্মদ ইসহাক আলী সম্পাদিত লোকসাহিত্য সংকলন ঃ ৪২ খণ্ড (১৯৮৫)। এ গ্রন্থে ২২টি পশুকথা সংকলিত হয়েছে। শিয়ালের কিস্‌সা সংকলিত হয়েছে মোহাম্মদ সাইদুর সম্পাদিত লোকসাহিত্য সংকলন ঃ ৩০ খণ্ডে (১৯৮৫)। এ গ্রন্থে ২১টি পশুকথা সংকলিত হয়েছে।

কিস্‌সার উল্লেখযোগ্য সংকলনগুলো হচ্ছে ঃ বাংলা একাডেমী সম্পাদিত লোকসাহিত্য সংকলন, ২য় খণ্ড (১৯৬৩)। এ গ্রন্থে ১টি কিস্‌সা সংকলিত হয়েছে। বাংলা একাডেমী সংকলিত সংকলন, ৩য় খণ্ড (১৯৬৪), এ গ্রন্থে ১টি কিস্‌সা সংকলিত হয়েছে। বোকার কিস্‌সা সংকলিত হয়েছে বাংলা একাডেমী সংকলিত লোকসাহিত্য সংকলনঃ ৮মখণ্ডে(১৯৭১) ও মফিজুল ইসলাম সম্পাদিত লোকসাহিত্য সংকলন ঃ ৩৯ খণ্ডে (১৯৮৫)। এ গ্রন্থে সংকলিত বোকার কিস্‌সা সংখ্যা ১৩টি।

সদাগরের কিসসা সংকলিত হয়েছে মোমেন চৌধুরীর ও জান্নাতুন আরা আহমেদ সম্পাদিত লোকসাহিত্য সংকলনঃ ২৪ খণ্ডে (১৯৮৩)। এ গ্রন্থে সংকলিত সওদাগরের কিস্‌সার সংখ্যা ৬টি।

শোলোকি কিস্‌সা সংকলিত হয়েছে মোহাম্মদ আবদুল কাইউম সম্পাদিত লোকসাহিত্য সংকলন, ৬ষ্ঠ খণ্ডে (১৯৬৬)। এ গ্রন্থে আটকুড়া রাজা সম্পর্কিত ৬টি

কিস্‌সা সংকলিত হয়েছে এবং মোমেন চৌধুরী ও জান্নাতুন আরা আহমেদ সম্পাদিত লোকসাহিত্য সংকলন ঃ ৩৩ খণ্ডে (১৯৮৫)। এ গ্রন্থে ২৮টি শোলোকি কিস্‌সা সংকলিত হয়েছে।
বাংলা একাডেমী থেকে বাংলাদেশের লোককথার কিছু ইংরেজি অনুবাদও প্রকাশিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে ঃ কবীর চৌধুরী অনূদিত Folktales of Bangladesh (১৯৮৫), আশরাফ সিদ্দিকী সম্পাদিত Tales from Bangladesh (১৯৭৬), খোন্দকার আশরাফ হোসেন ও জাকারিয়া সিরাজী অনূদিত ফোকটেলস ফ্রম বাংলাদেশ (১৯৮৫)। আবদুল হাফিজ সম্পাদিত Folktales of Bangladesh (১৯৮৫) এবং নিয়াজ জামানের Animal tales from Bangladesh (১৯৮৫)।

সংগ্রহ হিসেবে এগুলো গুরুত্বপূর্ণ হলেও এ সংকলনগুলোতে রয়েছে নানারকম সীমাবদ্ধতা। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি তেমনভাবে অনুসৃত হয় নি এর কোনোটিতেই। অধিকাংশ সংকলন আঞ্চলিক ভাষায় রচিত হলেও টাইপ মোটিফ নির্ধারণ করা হয় নি এগুলোর। দুর্বোধ্য ও আঞ্চলিক শব্দের টীকা-টিপ্পনিও সংযোজিত হয়নি সর্বক্ষেত্রে। সংগৃহীত কাহিনীগুলোর ব্যাখ্যামূলক নির্দেশনা নেই অনেক ক্ষেত্রেই। লোককাহিনীগুলোর কথকদের সম্পর্কে যেসব তথ্য পাওয়া যায় তাও পর্যাপ্ত নয়।

৪

সংগ্রহের পরেই লোককথা চর্চার গুরুত্বপূর্ণ শাখা গবেষণা। বাংলাদেশে লোককথা সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ এবং বৈজ্ঞানিক আলোচনা সমৃদ্ধ প্রথম গ্রন্থ আবদুল হাফিজের 'লোককাহিনীর দিক-দিগন্ত'। মুক্তধারা থেকে ১৯৭৬ সালে বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। বইটিতে ৮টি অধ্যায়ে লোককথা সম্পর্কে গভীর অনুসন্ধানী ও ব্যাপক বিশ্লেষণধর্মী তাত্ত্বিক আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে লোককাহিনীর সংজ্ঞা নিরূপণ করে সেগুলির শ্রেণিকরণ করেছেন লেখক। দ্বিতীয় অধ্যায়ে সংযোজিত হয়েছে 'লোককাহিনীর পঠন পাঠনের সমস্যা'। তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় 'দেশে দেশে লোককাহিনীর সংগ্রহ।' চতুর্থ অধ্যায়ের শিরোনাম : 'লোককাহিনীর আন্তর্জাতিক পঠন-পাঠন'। পঞ্চম অধ্যায়ে 'লোককাহিনীর সংগ্রহ ও সংরক্ষণ,' ষষ্ঠ অধ্যায়ে 'টাইপ ও মোটিফ অনুযায়ী কাহিনীর শ্রেণিবিভাগ,' সপ্তম অধ্যায়ে 'লোককাহিনীর তুলনামূলক আলোচনা ' ও অষ্টম অধ্যায়ে 'লোককাহিনীর বিচার ও মূল্যায়ন' বিষয়ে বিশদ আলোচনা স্থান পেয়েছে। গ্রন্থটিতে তিনি গবেষণাধর্মী বক্তব্য তুলে ধরতে গিয়ে অনেকাংশেই পাশ্চাত্য লোককলাবিদদের মুখাপেক্ষী হয়েছেন। অনেক ক্ষেত্রেই তাত্ত্বিক বিষয়ে নিজের সিদ্ধান্তের পরিবর্তে পাশ্চাত্য গবেষকদের মতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন তিনি।

১৯৮৫ সালে বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত হয় মফিজুল ইসলামের

'*লোককাহিনী*' গ্রন্থটি। এ গ্রন্থে লোককাহিনীর সংজ্ঞা, শ্রেণিবিভাগ, বাংলাদেশ ও ভারত উপমহাদেশে লোকসাহিত্য সংগ্রহের ইতিহাস, লোককাহিনীর লিখিত ঐতিহ্য ও লোককাহিনীর সংগ্রহ পদ্ধতি নিয়ে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা করা হয়েছে।

আশরাফ সিদ্দিকীর '*কিংবদন্তীর বাংলা*' (১৯৭৫) বাংলাদেশের লোককথা চর্চার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। এ বইটিতে প্রথম বাংলাদেশের কিংবদন্তি নিয়ে বিশদ আলোচনা পরিলক্ষিত হয়। এ গ্রন্থে বেশ কিছু কিংবদন্তির উল্লেখ করা হয়েছে। সেগুলিকে তিনি ১২টি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। এগুলো হলো : ইতিহাসভিত্তিক, অর্ধ-ইতিহাসভিত্তিক, পুঁথিভিত্তিক, সন্ন্যাসী ও দরবেশ, প্রেম-বিরহ, পরী, ভূত-প্রেত, স্থানীয় কাহিনী, লোকপুরাণ, সর্বাত্মবাদমূলক, রূপকথাভিত্তিক ও সাম্প্রতিক ঘটনাভিত্তিক। এ গ্রন্থে তিনি কিংবদন্তির মোটিফ বিশ্লেষণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

২০০৮ সালে প্রকাশিত হয় মুহম্মদ ফরিদ উদ্-দীন রচিত '*বাংলার লোককথা : ব্যাখ্যাদানকারী কাহিনী*' গ্রন্থটি। এ গ্রন্থে লেখক অবকাঠামোগত দিক থেকে ব্যাখ্যাদানকারী কাহিনীগুলোর সঙ্গে সাধারণ লোককাহিনীর তুলনা ফুটিয়ে তুলেছেন। পাশাপাশি প্রবাদ-প্রবচন-বর্ণনামূলক ধাঁধার সঙ্গেও এগুলোর তুলনা ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পেয়েছেন। আঞ্চলিক শব্দ-শব্দার্থ ও কথক-কথকীদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় সংযোজিত হয়েছে গ্রন্থটিতে। মুহম্মদ ফরিদ উদ্-দীনের লোককথা বিষয়ক আরেকটি গ্রন্থ হলো '*কাহিনী কিংবদন্তী*' (১৯৮৬)।

কিংবদন্তি নিয়ে উল্লেখ করার মতো কাজ হচ্ছে : ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত হোসেন উদ্দীন হোসেনের '*যশোর জেলার কিংবদন্তী*'।

এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্রিকায় বা গ্রন্থে লোককাহিনী বিষয়ক কিছু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু প্রবন্ধ হলো—

মযহারুল ইসলাম, 'একটি লোককাহিনীর পাঠ পর্যালোচনা', *সাহিত্য পত্রিকা* ঢাকা শীত ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ।

মনোয়ারা খাতুন, 'লোককথায় সমাজ', *বাংলাদেশের লোকসাহিত্যে সমাজ*, ঢাকা ২০০১।

মাহবুবুল হক, 'লোককথায় সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ', *বাংলার লোকসাহিত্য : সমাজ ও সংস্কৃতি*, ঢাকা ২০১০।

সুস্মিতা চক্রবর্তী, 'লোককাহিনী ও পুরুষতন্ত্র : নারীর লিঙ্গায়িত সামাজিক পরিচয় নির্মাণ ও স্বতন্ত্র স্বর', বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ৫২ বর্ষ ২য় সংখ্যা, অক্টোবর ২০০৯।

বাংলাদেশে লোককথার বিভিন্ন অনুষঙ্গগুলো নিয়েও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার কাজ পরিচালিত হয়েছে অল্পবিস্তর। বাংলাদেশে ফোকলোর বিয়য়ক কিছু

পত্র-পত্রিকাতেও বিচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত হয়েছে লোককথা বিষয়ক প্রবন্ধ-নিবন্ধ। কুষ্টিয়া থেকে প্রকাশিত লোক-ঐতিহ্য ও লোকসাহিত্য, বাংলাদেশ ফোকলোর পরিষদের মুখপত্র লৌকিক বাংলা পত্রিকা, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোকলোর বিভাগ থেকে প্রকাশিত ফোকলোর জার্নাল এবং বাংলাদেশ ফোকলোর সোসাইটির উদ্যোগে প্রকাশিত ফোকলোর পত্রিকা বাংলাদেশে লোককথা চর্চার পথকে সম্প্রসারিত করেছে।

৬

নিজস্ব জাতিসত্তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে, সমাজ মানসের রূপরূপান্তরের পালাবদল চিহ্নিত করার লক্ষ্যে লোককথা চর্চার গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু দুঃখের বিষয় লোকসাহিত্যের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে গবেষকদের মধ্যে প্রচুর উৎসাহ দেখা গেলেও লোককথা সম্পর্কে কোনো উল্লেখযোগ্য গবেষণা হয় নি বাংলাদেশে। সমৃদ্ধ ভাণ্ডার থাকা সত্ত্বেও গবেষণা কাজের অপ্রতুলতার কারণে লোককথা চর্চা সমৃদ্ধ কোনো জায়গা দখল করতে পারে নি আজও। বাংলা একাডেমীতে পাণ্ডুলিপি আকারে লোককথার যে সংগ্রহ আছে আকৃতি ও প্রকৃতিগত দিক থেকে তা বাংলাদেশের এক উল্লেখযোগ্য সম্পদ। তবে সংগ্রহ অনেক থাকলেও গবেষণা ও এ বিষয়ে গ্রন্থ রচনার ধারাটি এখানে বেশ দুর্বল। আশা করা যায়, সীমাবদ্ধতার এ দিকটি অচিরেই দূর হবে। লোককথার সমৃদ্ধ এ ভাণ্ডার নিয়ে বিজ্ঞানসম্মত গবেষণা হবে এবং লোককথাগুলো ঠাঁই করে নেবে বিশ্বমানের প্রকাশনায়। শুধু লোকের মুখে মুখে নয়; বাংলার লোককথা বেঁচে থাকবে যথাযথ মর্যাদায় —লোকোত্তীর্ণ ও কালোত্তীর্ণ হয়ে।

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের রূপকথার বিচার বিশ্লেষণ

ননীগোপাল মালো

বাংলা সাহিত্যে শিশুমন বিকাশের কর্তব্য পালন করেছিলেন রূপকথা সংগ্রাহক দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার। আমরা জানি বাংলা লোকসাহিত্য হল লোকসংস্কৃতির বিজ্ঞানবঋদ্ধ শাস্ত্রের অত্যন্ত সুস্পষ্ট উপাঙ্গ অর্থাৎ বিজ্ঞানের ভাষায় লোকসংস্কৃতিকে যদি 'genus' বলি তবে লোকসাহিত্যকে Species বলা যায়। লোকসংস্কৃতির সবচেয়ে বড় এবং সমৃদ্ধ শাখা হল লোকসাহিত্য। লোকসাহিত্যের বিভাগগুলির মধ্যে সমৃদ্ধতম বিভাগ হল গদ্যাকারে বর্ণিত কাহিনী। আর লোককথা হল তারই একটা অংশ বিশেষ। এই লোককথার প্রায় সামগ্রিক পরিচয় মেলে যার মধ্যে সেটি হল 'রূপকথা'। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার বাংলা রূপকথার প্রথম সংগ্রাহক। যদিও এই প্রয়াসের সূচনা করেছিলেন লালবিহারী দে। তিনি যে রচনা করেছিলেন সেটা ছিল ইংরাজিতে। শিশুমনের অস্পষ্ট আবেগ, অসম্ভব কল্পনা, ক্ষীণ প্রতিধ্বনিকে অলৌকিকতার মাধ্যমে রূপময় করে তোলাই রূপকথার কাজ। আর দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার প্রথম বাংলা ভাষায় আপামর বাঙালিকে হৃদয়ের রূপকথা শোনালেন। শিক্ষিত মানুষেরা এতদিন যা এড়িয়েগেছেন, সেই গ্রাম্য, মৌখিক সাহিত্যকেই মুন্সীয়ানার সঙ্গে লিখিত রূপ দিলেন তিনি ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই এড়িয়ে যাওয়ার ব্যাপারটিকে বেশ সুন্দর করে তুলে ধরেছিলেন— "পালা, পার্বণ, যাত্রা কথকতা এসমস্তও ক্রমে মরানদীর মত শুকাইয়া আসাতে, বাংলা দেশের পল্লীগ্রামে যেখানে রসের প্রবাহ নানা শাখায় বহিত, সেখানে শুষ্ক বালু বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ইহাতে বয়স্কলোকেদের মন কঠিন স্বার্থপর এবং বিকৃত হইবার উপক্রম হইতেছে। তাহার পরে দেশের শিশুরাও কোন পাপে আনন্দের রস হইতে বঞ্চিত হইল। তাহাদের সায়ংকালীন শয্যাতল এত নীরব কেন? তাহাদের পড়াঘরের কেরোসিনদীপ্ত টেবিলের ধারে যে গুঞ্জনধ্বনি শুনা যায় তাহাতে কেবল বিলাতী বানান-বহির বিভীষিকা। মাতৃদুগ্ধ একেবারে ছাড়াইয়া লইয়া কেবলই ছোলার ছাতু খাওয়াইয়া মানুষ করিলে ছেলে কি বাঁচে!"

যে স্নেহ দেশের রাজ্যেশ্বর থেকে দীনতম কৃষককে পর্যন্ত বুকে করে মানুষ করেছে সকলকে শুক্ল সন্ধ্যায় আকাশের চাঁদ দেখিয়ে ভুলিয়ে ঘুমপাড়ানি গানে শান্ত করেছে, নিখিল বঙ্গদেশে এই চির পুরাতন গভীরতম স্নেহ থেকে এই রূপকথা উৎসারিত। তবে

রূপকথা ছোটদের সাম্রাজ্য, যদিও এর রচনা বড়দের হাত ধরেই হয়ে থাকে। তবে ছোটদের জন্য লিখিত হলেও এর মধুর রোমান্সে বড়রাও পুলকিত হল। সাহিত্য যেমন অতীত এবং বর্তমান সমাজের দর্পণ। রূপকথাগুলি হল প্রাচীন সমাজ জীবনের দর্পণ।

'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ' বাঙ্গালীকে এত অতি মহাব্রতে দীক্ষিত করিয়াছেন, হারানো সুরের মণিরত্ন মাতৃভাষার ভাণ্ডারে উপহার দিবার যে অতুল প্রেরণা, তাহার মূল ঝরনা হইতেই জাগরিত হইয়া উঠিয়াছে দেশজননীর স্নেহধারা— এই বাঙ্গালার রূপকথা'।

প্রাবন্ধিক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রূপকথার তাৎপর্য সম্পর্কে বলেন—

"আমাদের বঙ্গদেশের সামাজিক ব্যবস্থা ও বিচারের কি এক সম্পূর্ণ ছবি এই রূপকথার মধ্যে প্রতিফলিত হইয়াছে! ইহার রচনার কাল সম্বন্ধে আমরা অজ্ঞ হইলেও ইহা নিঃসংশয়িত ভাবে বলা যায় যে, আমাদের সামাজিক ব্যবস্থার দৃঢ়ীকরণ সমাপ্ত হইবার পর ইহার জন্ম। সমস্ত রূপক ও বর্ণনা বাহুল্যের অন্তরালে আমাদের বঙ্গদেশের পরিবার ও সমাজের একটি নিখুঁত ছবি ইহার মধ্যে পাওয়া যায়। আমাদের বহুবিবাহ, আমাদের গৃহের সপত্নীবিরোধ, সপত্নী পুত্রের প্রতি বিমাতার অত্যাচার, রূপসী প্রণয়িনীর মোহ ও পরিশেষে সেই মোহভঙ্গ, আমাদের শঠতা ও বিশ্বাসঘাতকতা ইত্যাদি আমাদের পারিবারিক জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি কল্পনার উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত হইয়া আমাদের সম্মুখে দেখা দেয়।"

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ঢাকা জেলার উলাইল গ্রামে বিখ্যাত মজুমদার বংশে জন্মগ্রহণ করেন। রাজা উদয়নারায়ণ, প্রতাপাদিত্যের বংশধর তাঁরা, যাঁরা দীর্ঘদিন মুঘলদের সঙ্গে লড়াই করে দেশপ্রেমের পরিচয় দিয়েছেন। দক্ষিণারঞ্জনের বাবা রমারঞ্জন কুসমাময়ী দেবীকে বিয়ে করেন, যিনি ছিলেন যশোরের বিখ্যাত গুহরায় পরিবারের মেয়ে। তাঁদের প্রথম সন্তান দক্ষিণারঞ্জন ন'বছর বয়সে তাঁর মাকে হারান। মাতৃবিয়োগের পর পণ্ডিত পিতা তাঁর পড়াশুনার জন্য তাঁকে ময়মনসিংহের দীঘাপতিয়া গ্রামে পিসির কাছে রেখে আসেন। সন্তানহীনা বিধবা পিসিমা রাজলক্ষ্মী চৌধুরানী ছিলেন লোককথার এক অফুরন্ত ভাণ্ডার। পিসিমার সংস্পর্শে এসেই দক্ষিণারঞ্জন লোককথার প্রতি আকৃষ্ট হন। তাঁর লোককথা বিশেষ করে রূপকথা সংগ্রহের মূলে এই পিসিমার প্রভাব যে যথেষ্ট তা অনুমেয়।

রবীন্দ্রনাথ দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের রচিত রূপকথা সম্পর্কে বলেছেন, বাঙালীর ছেলে যখন রূপকথা শোনে তখন কেবল যে গল্প শুনে সুখী হয় তা নয়— সমস্ত বাংলাদেশের চিরন্তন স্নেহের সুরটি তার তরুণচিত্তের মধ্যে প্রবেশ করে, তাকে যেন বাংলার রসে রসাইয়া নেয়।

গদ্যাকারে বর্ণিত কাহিনীগুলির মধ্যে সমাজ ও মানুষের বেশির ভাগ স্থান দখল করে আছে লোককথা। আর লোককথা পরিপুষ্টি লাভ করে রূপকথা নিয়ে। লোককথার সবচেয়ে বিস্তৃততর শাখা হল রূপকথা। যার রূপকার হলে দক্ষিণারঞ্জন

মিত্র মজুমদার। অনেক রকম রূপকথা তিনি নানা ভাবে সংগ্রহ করেছেন, আর রূপকথার পরিমণ্ডল রচনা ও ভাষা নৈপুণ্য দক্ষিণারঞ্জনের সংকলিত রূপকথার বৈশিষ্ট্য। তাঁর 'ঠাকুরমার ঝুলি' থেকে কিছুটা উদ্ধৃত হল—

'এক তাঁতী দুই স্ত্রী। দুই তাঁতীবউর দুই মেয়ে সুখু আর দুখু। তাঁতী বড় স্ত্রী আর বড় মেয়ে সুখুকে বেশি বেশি আদর করে। বড় স্ত্রী বড় মেয়ে ঘর সংসারের কুটাটুকু ছিঁড়িয়া দুইখানা করে না; কেবল বসিয়া বসিয়া খায়। দুখু আর তার মা সুতা কাটে, ঘর নিকোয়, দিনান্তে চারটি ভাত পায়, আর, সকলের গঞ্জনা সয়।

একদিন তাঁতী মরিয়া গেল। অমনি বড় বউ তাঁতীবউ তাঁতীর কড়িপাতি যা ছিল সব লুকাইয়া ফেলিল, আপন মেয়ে নিয়া, দুখু আর দুখুর মাকে ভিন্ন করিয়া দিল।

সুখুর মা আজ হাটের বড় মাছের মুড়াটা আনে, কাল হাটের বড় লাউটা আনে, রাঁধে, বাড়ে, সতীন সতীনের মেয়েকে দেখাইয়া দেখাইয়া খায়।

দুখুর মা আর দুখুর দিনে রাত্রে সুতা কাটিয়া কোনদিন একখানা গামছা, কোন দিন একখানা ঠেঁটী, এই হয়। তাই বেচিয়া এক বুড়ি পায়, দেড়বুড়ি পায় তাই দিয়া মায়ে ঝিয়ে চারিটি অন্ন পেটে দেয়।" (সুখু আর দুখু : ঠাকুরমার ঝুলি)

আলোচ্য উদ্ধৃতি থেকে বেশ বোঝা যায় রূপকথার ভাষা হয় খুবই সহজ সরল। এবং রূপকথার পরিমণ্ডলও যেন পরিকল্পিত।

দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার মহাশয় শিশুমনের উপযোগী ভাষা রচনা করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। এই প্রবণতা তিনি তাঁর পিসিমার সান্নিধ্যে থাকার দরুণ পেয়েছিলেন। শুধু পিসিমশাই নয় পিসিমার অগাধ সম্পত্তি দেখাশুনার জন্য বহু জায়গা, বহু মানুষের সান্নিধ্যও দক্ষিণারঞ্জন মহাশয়ের পরম প্রাপ্তি। রবীন্দ্রনাথের মতোই তাঁকেও প্রকৃতি-প্রেমিক, মানব-প্রেমিক করে তোলে গ্রাম বাংলার মাটি মানুষের প্রত্যক্ষ ছোঁয়া।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের ঠাকুরমার ঝুলি'র রূপকথা সম্পর্কে বলেছিলেন, 'দক্ষিণারঞ্জন বাবুর 'ঠাকুরমার ঝুলি' বইখানি পাইয়া, তা খুলিতে ভয় হইতেছিল। আমার সন্দেহ ছিল, আধুনিক বাংলার কড়া ইস্পাতের মুখে ঐ সুরটা পাছে বাদ পড়ে। এখনকার কেতাবী ভাষায় ঐ সুরটি বজায় রাখা বড় শক্ত। আমি হইলে তো এ কাজে সাহসই করিতাম না। ইতিপূর্বে কোন কোন গল্পকুশল অথচ শিক্ষিতা মেয়েকে দিয়া আমি রূপকথা লিখাইয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছি— কিন্তু হোক মেয়েলি হাত, তবুও বিলাতী কলমের যাদুতে রূপকথায় কথাটুকু থাকিলেও সেই রূপটি ঠিক থাকে না, সেই চিরকালের সামগ্রী এখনকার কালের হইয়া উঠে।

কিন্তু দক্ষিণাবাবুকে ধন্য! তিনি ঠাকুরমার মুখের কথাকে ছাপার অক্ষরে তুলিয়া পুঁতিয়াছেন তবু তাহার পাতাগুলি প্রায় তেমনি সবুজ, তেমনি তাজাই রহিয়াছে, রূপকথার সেই বিশেষ ভাষা, বিশেষ রীতি তাহার সেই প্রাচীন সরলতাটুকু তিনি এত

দূর রক্ষা করিতে পারিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার সূক্ষ্ম রসবোধ ও স্বাভাবিক কলানৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে।"

কেবলমাত্র ভাষার সারল্য 'ঠাকুরমার ঝুলি'তেই নেই, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের অন্যান্য বিখ্যাতগ্রন্থ গুলি যেমন—

* ঠাকুরমার ঝুলি (১৯০৭) (রূপকথা)
* ঠাকুরদার ঝুলি (১৯০৮) (রূপকথা)
* ঠান দিদির থলে (১৯০৯) (ব্রতকথা)
* দাদামহাশয়ের থলে (১৯১৩) (রূপকথা)

সরলতা এবং ভাষার নিপুণতা দক্ষিণারঞ্জন মহাশয়ের সংকলিত রূপকথার বৈশিষ্ট্য। এবারে 'দাদামহাশয়ের থলে' রূপকথার একটি উদ্ধৃতি তুলে দেখাতে পারি—

"ব্রাহ্মণ বেনের বাড়ির সামনের পথ দিয়া বাড়ি যান। হাতে সেই ঘড়া। যাইতে যাইতে, দূর হইতে বেনে যাহা দেখিতে পাইল। বেনে দেখিল— 'বাঃ! ঠাকুর তো আর এক ঘড়া মোহর লইয়া যাইতেছে! ঠাকুরের নিশ্চয় অনেক ধন আছে! তাই তো, ঠাকুর এতধন কোথা হইতে পায়! একঘড়া তো আগেই সিন্ধুকে পুরিয়াছি, এ ঘড়াও লইতে হইবে।" ভাবিয়াই বেনে তাড়াতাড়ি করিয়া বাহিরে আসিয়া ডাকিল,— "প্রণাম হই, প্রণাম হই— ঠাকুর খুড়ো! কোথায় যাওয়া হইতেছে? এদিকে আসুন, পায়ের ধূলা দিন। আমরা কি এতই হতভাগা, এদিকে একবার চাহিতেও নাই ঠাকুর খুড়ো? আসুন, আসুন— ওরে কে আছিসরে! ঠাকুর-খুড়োর পা ধুইবার জল আন, আমাকে দে!— আসুন, আসুন—

ব্রাহ্মণ বলিলেন,— "বেনে-ভাইপো, একবার তুমি যা করিয়াছ— আবার তোমার বাড়িতে। (ব্রাহ্মণ ও বেনে ভাইপো : দাদামশায়ের থলে)

অর্থাৎ আলোচ্য অংশটি থেকে বেশ বোঝা যায় এই বেনে ভাইপো ব্রাহ্মণকে একবার ঠকিয়েছে এবং এবারও ঠকাতে চায় তা বেশ ভালো করেই ব্রাহ্মণ বুঝতে পেরেছে।

অর্থাৎ খুব সহজেই বেনে-ভাইপো পরিকল্পনা করেছে। সহজ সরল বলেই ব্রাহ্মণ বেনে ভাইপোর বাড়িতে পুনরায় গিয়েছে।

লোককথা হল নীতি সম্মত গল্প। আর কথাতেও তার প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। আর রূপকথাতে থাকে নানান উপদেশ। যেগুলি আমাদের সমাজ জীবনেও বেশ প্রচলিত। এবারে প্রসঙ্গক্রমে দক্ষিণারঞ্জন মহাশয়ের 'দাদামশায়ের থলে'র কয়েকটি রূপকথার নীতি বা সার কথা বা উপদেশগুলি ক্রমান্বয়ে উল্লেখ করছি—

'হবুচন্দ্র রাজা গবুচন্দ্র মন্ত্রী' রূপকথাতে হবুচন্দ্র রাজা এবং গবুচন্দ্র মন্ত্রীর নানান কার্যকলাপ এবং কথা প্রসঙ্গে যে সারকথা বা উপদেশগুলি বেরিয়ে আসে তা হল—

১। লোভই পাপের মূল, লোভ করিও জয়, লোভেই, ঘটিতেপারে, মরণ নিশ্চয়।

২। মূর্খ-সনে স্বর্গ-সুখেও কেউ করো না বাস।
একদিন, ঘটিতে পারে, মহা সর্বনাশ।

৩। গুরুবাণী সপুদদেশ, অমৃতের ধার, যে না শুনে, পরিণামে— মরণ তাহার।

৪। স্নেহময় ক্ষমাময় চির গুরুজন,
তাঁদের সে ক্ষমা পেতে করিও যতন।

৫। মন্দকাজে, শেষে যখন আসে অনুতাপ, গুরু, বিভু, ডাকিও, যাবে যত ভয় ও পাপ।

'সওদাগরের সাত ছেলে' রূপকথার সারকথা বা উপদেশ বা নীতিকথাগুলি নিম্নরূপ—

১। সময়ে না চিনে নিলে দোয়াত কলম বই, ভবিষ্যতে, নেই পথ আর, মূর্খ হওয়া বৈ!

২। মূর্খ হয়ে রয় যাহারা, বুদ্ধি নাইক মোটে যত দুষ্ট লোকেরা সব তাদের পিছেই জোটে!

৩। ফাঁকি দিয়ে কাজ করলে শেষে, ঠিক সবাইকে ঠক্‌তে হয়। বলতে হয় 'ধিক!''

৪। তবু জেনো মূর্খগুলোর সব কাজেতেই মাটি, যেখানে যায়, সেখানে পায় সাজা পরিপাটি!

৫। মূর্খ বলে সব কাজেতেই, দুর্দশাটি তার। 'মূর্খের মরণ' এটি সকল কথার সার।

আলোচ্য রূপকথাতে সওদাগরের সাত ছেলের লেখাপড়া বা শেখার জন্য প্রতিকাজেই তারা বোকামির পরিচয় দিয়েছে। এবং যে কাজেই পা বাড়িয়েছে সেই কাজ থেকে ধাক্কা খেয়ে নিজেদের সম্বল খুইয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছে।

'দাদামশায়ের থলে'র 'জামাই' নামক রূপকথার উপদেশ বা নীতি বাক্য বা সারকথা গুলি হল—

১। ভালো করে বুঝতে হয় উপদেশের বাণী। তা না করেই জামায়ের শাস্তি এত খানি।

২। মুখস্থ করলেই হয়? কিছু বোঝা চাই। তা না হলে বিপদ হতে পারে সর্বদাই!

৩। জিভের লোভ, সবখানেই, সামলাতে হয় আগে। তা না হলে দেখলে তো স্বাদ কেমন-মজা লাগে?

৪। বুদ্ধি যা হোক খরচ বাড়ে ভেবে করো কাজ, তানা হলে, দেখলে কেমন, পেতে হয় লাজ।

৫। বুদ্ধি একটু চাই-ই। তা যেমন হোক না, সে! নয় কি?—
না হলে, তার সকল কাজে হাজার লোক হাসে।

'জামাই' রূপকথাতে বুদ্ধিহীন জামাই এর বোকামির জন্য তাকে বারে বারে শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে অপমানিত হতে হয়েছে।

'সরকারের ছেলে' রূপকথাতে যে নীতিকথা বা উপদেশগুলি পাই, সেগুলি হল—

১। শত্রু যারা, মিত্র তারা, এই টি জেনো ঠিক, তারাই করে উপকার, যারা দেয় 'ধিক'।

২। নতুন নতুন ভাবনা নিয়ে, লাগবে জগৎ-কাজে, ভগবানের উজল নাম রাখবে মনোমাঝে।

৩। শত্রুরও উন্নতি দেখে খুশী যাঁর প্রাণ, পৃথিবীতে সেই জেনো দেবতা সমান।

৪। যতই বড় হও না, রেখো মনে ব্যথা স্বদেশের স্বগ্রামের — কুঁড়েখানির কথা।

'সরকারের ছেলে' রূপকথাতে গ্রামের ছেলে রাজার মন্ত্রী হয়েও কিন্তু সে গ্রামকে ভোলেনি। সে দীর্ঘদিন পরে গ্রামে যাবার অনুমতি চেয়ে গ্রামে গিয়ে জমি কিনে প্রকাণ্ড বাড়ি করে, পুকুর কেটে, পাঠশালা খুলে, অতিথিশালা খুলে সমস্ত বাবার নামে মন্ত্রী রামধন উৎসর্গ করে দিল। পুরোনো গ্রামখানি আরও সুন্দর করে দিল, চমৎকার হয়ে উঠল গ্রামটা।

'রাজপুত্র' রূপকথাতে আমরা দেখতে পাই যে বৃদ্ধ রাজা আর রাজ কার্য চালাতে পারছেন না। রাজপুত্র কেবল মাত্র ঘুরে বেড়ায়। মৃত্যুকালে রাজা তার পুত্রকে বলে গেলেন যে যদি ভালোমত রাজ্য চালাতে পার তবে তুমিও মানুষের মত মানুষ হবে। 'রাজপুত্র' রূপকথাতে রাজা রাজপুত্রকে যে উপদেশটি দিয়েছিলেন তা হল—

"প্রতিদিন, প্রতিগ্রাসে মুড়া খাইও।
টাকা ধার দিয়া টাকা লইও না।
প্রজাকে সর্বদা শাসনে রাখিও।
তিন ঠেঙ্গে যার আর তে মাথার কাছে বুদ্ধি নিও।
—এই কথামত, তুমি কাজ করিও।"

রাজার কথা মত রাজপুত্র প্রতিদিন দুই শত মাছ ধরার নির্দেশ দিলেন এবং প্রতিদিন রানী দুইশত মাছের মাথা রাঁধেন আর রাজপুত্র খেতে থাকেন। এবং রাজপুত্র অসুখে পড়িলেন। রাজপুত্রের আর অসুখ সারে না। এবার তিনি মাছের মুড়া খাওয়া ছাড়লেন।

রাজপুত্র এখানে বোকামির পরিচয় দিলেন। এই ভাবে রাজপুত্র একটার পর একটা বোকামির পরিচয় দিতে লাগল। এই গল্পে আরও কয়েকটি নীতি কথা পাওয়া যায়। সেগুলি নিম্নরূপ—

১। বিদ্বানেরো ভুল আর বড় ভুল হয় নয়কো দোষ, যদি সে ভুল শোধ্‌রে সুসময়।

২। বুঝতে সে সব চেষ্টা করো, গুরুর কাছে গিয়ে, দেখবে, জগৎ উজ্জ্বল সেই কথার আলো দিয়ে।

প্রত্যেকটা লোককথাই নীতি সম্মত গল্প। সে রূপকথাই হোক, ব্রতকথাই হোক আর পরীকথাই হোক। আসলে সমাজকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যই এই সকল রূপকথা তথা লোককথার উদ্ভব।

এবারে দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের সংকলিত রূপকথাগুলিকে বিশ্লেষণ করে দেখাচ্ছি। বিশ্লেষণের আগে কাহিনীগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করছি।

প্রথমেই দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার মহাশয়ের 'ঠাকুরমার ঝুলি' রূপকথার 'কলাবতী রাজকন্যা গল্পের আলোচনা সংক্ষপে করছি।— এক রাজার সাত রানী। তাদের কারুরই সন্তান নেই এক সন্ন্যাসী তাদের একটি শিকড় দিয়ে কেটে দুধের সঙ্গে খেতে বলে সাত রানীকে। সাতরানী সেগুলি নিয়ে এসে মহা আনন্দে কখন খাবে তাই ভাবতে থাকে। প্রথম পাঁচরানী ছোট এবং ন'রানীকে বাদ দিয়ে নিজেরাই ওষুধ বেটে খেয়ে নিল। ছোট ও নরানী শীল নোড়া এবং বাটি ধুয়ে খাওয়ায় তাদের পেট থেকে একটা পেঁচা এবং একটি বানর জন্ম নিল। এর পর পাঁচরানীর পাঁচপুত্র ময়ূরপঙ্খী নিয়ে ভ্রমণ করতে বেরল। যেখানে আছে কলাবতী রাজকন্যা। সেখানে পৌঁছতে নানান অসুবিধার মধ্যে পড়ে বানর এবং পেঁচার দ্বারা নানান ভাবে উপকৃত হয়ে তাদের উপকারকে অস্বীকার করেছে। এইভাবে কলাবতী রাজকন্যাকে রাজার রাজপুত্রগণ আর আনতে পারল না। অবশেষে বানর অর্থাৎ বুদ্ধু কৌশলে কলাবতী কন্যাকে নিয়ে এলে বুদ্ধুর মা আর পেঁচা অর্থাৎ ভুতুমের মা কন্যাকে বরণ করে নিল। শুনে অন্য পাঁচ রানী রেগে গিয়ে দরজায় খিল দিয়ে দিল। এইভাবে কলাবতী কন্যা রাজপুরীতে ফিরে এল। পর দিন বুদ্ধুর সঙ্গে মহাধুমধাম করে মেঘবরণ চুল কুঁচবরণ কলাবতী রাজকন্যার বিবাহ হল। আর একদেশের রাজকন্যা হিরাবতীর সঙ্গে ভুতুমের বিবাহ হল। ওরা আসলে সত্যিকারের বানর এবং পেঁচা ছিল না। ওরা ছিল পোষাক পরা মাত্র। এর পর রাজা বুদ্ধুকে এবং ভুতুমকে রাজপুত্র হিসাবে স্বীকার করে বুদ্ধুকে বুধকুমার এবং ভুতুমকে রূপকুমার নাম দিয়ে রাজার দুই পাশে বসিয়ে ছোটরানী ও ন'রানীকে রানী হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে সুখে দিন কাটাতে লাগলেন।

এবারে রূপকথাটিকে বিশ্লেষণ করছি—

ক. টাইপ : ৭৫০ ইচ্ছাপূরণ।

খ. মোটিফ : ১. এল ১২ প্রিয় কনিষ্ঠ পুত্র

২. এম ২০৫ সংকল্পভাঙা

৩. কে ১৮৬০.২ সঠিক সময়ে প্রতারণা

৪. জে ২৪৬১ এখন আমি কি করি

৫. এল ১০ বিজয়ী কনিষ্ঠ পুত্র

৬.টি ১৩৫.৫ মালাবদল করে বিয়ে

৭. এইচ ১৫১.১.৩ বিস্ময়কর কাজ দেখিয়ে চিহ্নিত করণ।

এখানে অর্থাৎ কলাবতী রাজকন্যা গল্পে ছোট রানী এবং নরানীর ইচ্ছাই অবশেষে পূরণ হল তাই গল্পের টাইপ সংখ্যা হয়েছে ৭৫০ অর্থাৎ ইচ্ছাপূরণ। আবার অনেকগুলি মোটিফ সংখ্যাও পাওয়া যায় এখানে বানর অর্থাৎ বুদ্ধুকে রাজা প্রিয়পুত্র হিসাবে স্বীকার করল। তাই প্রিয় কনিষ্ঠ পুত্র এর মোটিফ সংখ্যা হল এল ১২. আবার এল ২০৫ মোটিফ সংখ্যা দিয়ে বোঝানো হয়েছে সংকল্প ভাঙাকে। এখানে রাজা প্রথমে বানর এবং পেঁচাকে পুত্র হিসাবে স্বীকার করবে না বলে স্বীকার করেছিল। । পরে আবার স্বীকার করে নেয়। পাঁচপুত্র যখন ময়ূরপঙ্খী নিয়ে ভ্রমণে বেরিয়েছিল তখন বানর এবং পেঁচা কি করে উঠবে বুঝে উঠতে পারছিল না তাই তার মোটিফ সংখ্যা হল জে ২৪৬১ অর্থাৎ এখন আমি কি করি। আর সবশেষে বানর অর্থাৎ রূপকুমার জয়লাভ করল তাই এর মোটিফ সংখ্যা হল এল ১০ বিজয়ী কনিষ্ঠ পুত্র। এই গল্পে একদম শেষের দিকে বানরের সঙ্গে কলাবতী রাজকন্যার মহা ধূমধাম করে বিয়ে হল মালাবদল করে তাই এর মোটিফ সংখ্যা হল— টি ১৩৫.৫ অর্থাৎ মালাবদল করে বিয়ে। সাতরানীকে গাছের শিকড় বেটে খাওয়ারকথা সন্ন্যাসী বললেও প্রথম পাঁচ রানী নিজেরাই খেয়ে ছোট এবং নরানীকে না দেওয়ার কারণে পরবর্তীতে তাদের শাস্তি হয়েছিল। তাই এর মোটিফ সংখ্যা হল--- ৫৬১.২.৮.১ অর্থাৎ লোভের শাস্তি এর পরে বানর অর্থাৎ বুদ্ধু নিজেই একটা বিস্ময়কর কাজ করে দেখিয়ে দিল। তাই এর মোটিফ সংখ্যা হল এইচ ১৫১.১.৩ অর্থাৎ বিস্ময়কর কাজ দেখিয়ে চিহ্নিতকরণ ইত্যাদি।

V.J. Propp এর অনুসরণে বিশ্লেষণ ঃ

১। Function এর ১০এ আছে প্রতিশোধ অথবা কাজে অগ্রসর হওয়া। নায়ক এ বিষয়ে সম্মত হয় ও সিদ্ধান্ত নেয়। এখানে বানর এবং ভুতুম প্রতিশোধমূলক কাজে অগ্রসর হয় এবং অন্য পাঁচ রাজপুত্রের প্রতি প্রতিশোধ নিতে চেষ্টা করে।

২। ৪ নং Function এ আছে খলনায়ক নায়কের বিরুদ্ধে কাজ করে। প্রাথমিক পরীক্ষা শুরু করে। আলোচ্য গল্পের খলনায়ক পাঁচ পুত্র বারে বারে বুদ্ধু ও ভুতুমের বিরুদ্ধে নানান কাজ করা শুরু করে দেয়।

৩। ১৬ নং Function এর নায়ক ও খলনায়ক সংঘাতে লিপ্ত হয়। আলোচ্য

কাহিনীতে রাজার পাঁচপুত্র এবং ছোট দুই পুত্র বুদ্ধু ও ভূতুম পরস্পর সংঘাতে লিপ্ত হয়।

৪। ২৫ নং Function-এ নায়ককে কঠিন কাজ সমাধা করতে বলা হয়। 'কলাবতী রাজকন্যা' গল্পে নায়ক খলনায়কের সঙ্গে সংঘাতে নানা ভাবে লিপ্ত হয় নানান কঠিন কাজ সমাধান করতে বলে তাদের মা।

৫। ২৬ নং Function এ নায়ক কঠিন কাজ সমাধা করে। এই কাহিনীতে রাজার প্রথম পাঁচরানীর পাঁচপুত্রের নানান কার্যকলাপকে স্বার্থসিদ্ধি না করতে দেওয়ার জন্য ছোট রানী ও নরানীর পুত্র জলের তলায় গিয়ে কলাবতী রাজকন্যাকে উদ্ধার করে নিয়ে এসে সঠিক কাজ সমাধান করেছিল।

৬। ৩০ নং Function এ খল নায়কের শাস্তি দেওয়া হয়। এখানে ঐ পাঁচপুত্রকে বানর এবং পেঁচার প্রতি অবিচার করার জন্য গল্পের শেষে তাদের শাস্তি পেতে হয়।

এবারে লেভিস্ট্রসের রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পদ্ধতির মাধ্যমে বিশ্লেষণ :

লেভিস্ট্রসের রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি অনুসারে আলোচ্য গল্পের যুগ্ম বৈপরীত্য বা Binary opposition গুলি হল—

১। শূন্যতা	২। চাওয়া	৩। ভয়	৪। দুঃখ
পূর্ণতা	পাওয়া	নির্ভয়	সুখ

লেভিস্ট্রস রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পদ্ধতির মাধ্যমে সর্বপ্রথমে গল্পের মূল অংশগুলিকে চিহ্নিত করেছেন তার নাম দিয়েছেন 'মিথেম'। তাঁর তৈরি মিথেম অনুসারে আলোচ্য 'কলাবতী রাজকন্যা' গল্পের মিথেম গুলি হল—

১। রাজার সাতরানীর কোন সন্তান ছিল না।

২। রানীরা মনে মনে সকলেই সন্তান কামনা করতেন।

৩। এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা হলে তিনি তাদের একটি গাছের শিকড় দিলেন।

৪। সকল রানী সন্তান সম্ভবা হলেন।

৫। সাতরানীর সাতটি পুত্র সন্তান হল।

৬। সাতরানী কিন্তু সকলে ঠিক ঠাক গাছের শিকড় বাটা পায় নি।

৭। পুত্ররা সকলেই দেশ ভ্রমণে বেরিয়ে গেল কলাবতী রাজকন্যার জন্য। সঙ্গে বুদ্ধু ও ভূতুমকে নিয়ে গেল না।

৮। অবশেষে প্রথম পাঁচপুত্র কিন্তু কলাবতী রাজকন্যাকে পেল না।

৯। এবং বুদ্ধু কলাবতী রাজ কন্যাকে পত্নী হিসাবে পেল।

১০। রাজার মনে যে অশান্তি ছিল তা একেবারে ছেড়ে গিয়ে সংসার সুখের হয়ে উঠল।

এবারে Binary Opposition গুলিকে মিথেম দিয়ে সাজানো হচ্ছে—

শূন্যতা	পূর্ণতা	চাওয়া	পাওয়া
১। রাজার কোন সন্তান ছিল না			
		২। রানীরা মনে মনে সন্তান কামনা করতেন।	
			৩। এক সন্ন্যাসীর কাছ থেকে একটি গাছের শিকড় পেল
		৪। সকল রানী সন্তান সম্ভবা হলেন।	
			৫। সাতরানীর পুত্র সন্তান হল।
৭। পুত্ররা সকলেই দেশ ভ্রমণে বেরিয়ে গেল কলাবতী রাজ-কন্যার জন্য।			
			৯। বুদ্ধু কলাবতী রাজকন্যাকে পেল।
	১০। রাজার মনের অশান্তি দূর হয়ে সংসার সুখের হয়ে উঠল।		

এ্যালান ডাণ্ডেসের সূত্রের মাধ্যমে কাহিনীর বিশ্লেষণ :-

আলোচ্য কাহিনীটিকে অ্যালান ডাণ্ডেসের সূত্রের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করলে একটি সূত্রকে লক্ষ্য করে নিতে হবে। তা হল—

LL> LL

L = Lack (অভাব বোধ)

LL = Liquidated of Lack (অভাববোধ পূরণ)

আলোচ্য 'কলাবতী রাজকন্যা' গল্পে অভাব বোধ আছে। অর্থাৎ সাতরানীর কোন সন্তান ছিল না। অর্থাৎ এটা হল Lack. আর পরবর্তী তে রানীদের পুত্র সন্তান হলে সেই অভাব বোধ পুরণ হল অর্থাৎ এটা হল LL.

সাতভাই চম্পা রূপকথার বিশ্লেষণ :

সাতভাই চম্পা রূপকথার বিশ্লেষণের আগে গল্পটির বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা করছি—

এক রাজার সাত রানী। পরপর ছয় রানীর কোন সন্তান হয় না। শেষে ছোট রানী সন্তান সম্ভবা হলে রাজা ছোট রানীকে খুব ভালো বাসতেন। তাকে নিয়েই তার সব আশা ভরসা। ছোট রানীর পরপব ছয়টি পুত্র সন্তান এবং একটি মাত্র কন্যা সন্তান জন্ম নিল, তার নাম হল পারুল। যখন রাজার কোন সন্তান হচ্ছিল না তখন তার রাজপুরীতে কোন পুজো হয় না। এমন সময় এক মালী এসে পাঁশ গাদার উপরে সাত চাঁপা ও এক পারুল গাছে টুলটুলে সাত চাঁপা ও এক পারুল ছিঁড়তে গেল। মালীকে দেখে পারুল বলল মালী ফুল নিতে এসেছে দেব কি না দেব তখন সাত চাঁপা বলল—

'না দিব, না দিব ফুল উঠিব শতেক দূর,

আগে আসুক রাজা, তবে দিব ফুল"।

এই ভাবে একে একে রাজা, বড়রানী, মেজ এই ভাবে সব রানী আর সব শেষে আসে ঘুঁটে কুড়ানী। ঘুঁটে কুড়ানী এলে চাঁপা ও পারুল ফুল ছিঁড়তে দিল। ঐ ফুলের মধ্য থেকেই সাত রাজপুত্র এবং এক রাজকন্যা মা মা করে ডেকে ঘুঁটে কুড়ানির কোলের কাছে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপর সব রানীকে ফেলে সাতপুত্র এক পারুল মেয়ে এবং ছোট রানীকে নিয়ে রাজপুরীতে ফিরে গেলেন রাজা।

Type Index ও Motif Index এর দ্বারা বিশ্লেষণ ঃ

'সাত ভাই চম্পা' গল্পটিকে যদি Type ও Motif Index দ্বারা বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে কেমন হবে—

ক. টাইপ : ৪০ ৩ক এক ইচ্ছার সফল পরিণতি।

খ. মোটিফ :

১. এল ১২ সঠিক সময়ে প্রতারণা

২. জে ২৪৬১ এখন আমি কি করি

৩. ই ৬০০ পুনর্জন্ম

'সাতভাই চম্পা' গল্পে রাজার ইচ্ছা ছিল তার স্ত্রী সবাই সন্তানের জন্ম দিক আর তাই ছয়রানীর না হলেও ছোট রানীর সাতটি সন্তান অর্থাৎ ছয়টি পুত্র সন্তান আর একটি কন্যা সন্তান হওয়ায় রাজার ইচ্ছা পূরণ হল তাই গল্পের টাইপ হয়েছে ৪০৩ ক অর্থাৎ ইচ্ছার সফল পরিণতি।

আবার ছোট রানীকে সঠিক সময়ে প্রতারণা করার জন্য এর মোটিফ সংখ্যা হয়েছে এল ১২-সঠিক সময়ে প্রতারণা। যখন ছোট বউকে অন্য রানীরা ঘুঁটে কুড়ানি বানিয়ে রাখল তখন ছোট রানী বুঝতে পারছিল না কি করবে। তাই এই অংশের মোটিফ সংখ্যা হল জে ২৪৬১ অর্থাৎ আমি এখন কি করি। আর পারুলের ফুলের মধ্য দিয়ে জন্ম হওয়ার কারণে এর মোটিফ সংখ্যা হল— ই ৬০০ অর্থাৎ পুনর্জন্ম।

লেভিস্ট্রসের রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পদ্ধতির মাধ্যমে বিশ্লেষণ :

'সাতভাই চম্পা' গল্পটিকে লেভিস্ট্রসের রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে প্রথমে Binary Opposition গুলি দেখা যাচ্ছে।

Binary Opposition গুলি হল—

১। চাওয়া ২। সুখ ৩। হিংসা

পাওয়া দুঃখ ভালবাসা

এবারে গল্পের মিথেম গুলোকে বার করছি—

১। রাজার কোন সন্তান ছিল না। তাই তার সন্তান চাই।

২। একে একে সাতটা বিয়ে করল।

৩। ছোটরানীর সন্তান হবে বলে রাজা তাকে খুব আদর করত। কিন্তু অন্য রানীরা তাকে দুঃখ দিত।

৪। অন্যান্য রানীরা তা সহ্য করতে পারত না।

৫। এই ভাবে সাত চাঁপা ও এক পারুল গাছে ফুল ফুটত।

৬। এক মালি একদিন সেটা ছিঁড়তে গেলে ফুল নানা অছিলায় সকলকে ফেরাতে থাকে।

৭। পরে জানতে পারল ওরা ছোটরানীরই সন্তান। তাদের সুখের আর অন্ত থাকল না।

৮। রাজত্ব পেল তার ছয় পুত্র এবং এক মেয়ে পারুল।

৯। ছোটরানী ঘুঁটে কুড়ানির দশা কেটে গিয়ে সুখ লাভ করল।

১০। রাজা ছোট রানী ও সাত সন্তানকে নিয়ে রাজপুরীতে ফিরে গেল।

১১। রাজপুরীতে সুখের জয়ের ডঙ্কা বেজে উঠল।

এবারে Binary Opposition অনুসারে মিথেম গুলি সাজিয়ে নিচ্ছি

চাওয়া	পাওয়া	সুখ	দুঃখ
১। রাজার সন্তান ছিল না তাই রাজার সন্তান চাই			
			২। ছোট রানীর সন্তান হবে বলে রাজা তাকে খুব আদর করত। কিন্তু অন্য রানীরা তাকে খুব দুঃখ কষ্ট দিত

চাওয়া	পাওয়া	সুখ	দুঃখ
		৩। পরে যখন জানতে পারল সাত চাঁপা ও পারুলই তার সন্তান তখন ছোট রানীর সুখের অন্ত ছিল না	
	৪। রাজাও পেল তার ছয় পুত্র ও এক কন্যা পারুলকে।		
		১১। রাজপুরীতে সুখের জয় ডঙ্কা বেজে উঠল।	

অ্যালান ডাণ্ডেসের সূত্রের মাধ্যমে কাহিনীটির বিশ্লেষণ :—

আলোচ্য কাহিনীটিকে অ্যালান ডাণ্ডেসের সূত্রের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করলে একটি সূত্রকে লক্ষ্য করতে হয়। সূত্রটি হল—

L> LL

L = Lack (অভাববোধ)

L = Liquidated of lack (অভাববোধ পূরণ)

আলোচ্য 'সাতভাই চম্পা' গল্পে অভাব বোধ আছে এবং সেই অভাববোধ পূরণের উপায় আছে। এখানে অভাব বোধ হচ্ছে রাজার কোন সন্তান ছিল না অর্থাৎ L, আর অভাববোধ পূরণ হল রাজার ছয় পুত্র এবং এক কন্যাকে পাওয়া অর্থাৎ LL (Liquidated of Lack)

V.J. Propp এর Function এর মাধ্যমে বিশ্লেষণ ঃ

১। ১০ নং Function অনুসারে প্রতিরোধ ও প্রতিশোধমূলক কাজে লিপ্ত হয়। এখানে রানীরা ছোট রানীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক কাজ করবে।

২। ২৬ নং Function অনুযায়ী নায়ককে কঠিন কাজ সমাধা করতে হয়। আলোচ্য গল্পে রাজা অনেক ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে অনেক কঠিন কাজ সমাধা করেছে।

উপরোক্ত কাহিনীকে আরও নানা ভাবে বিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে।

এবারে 'দাদামশাইয়ের থলে'র রূপকার 'হবুচন্দ্ররাজা ও গবুচন্দ্র মন্ত্রী' গল্পের কাহিনী বিশ্লেষণ করে দেখানো যাক। এই গল্পের কাহিনীটি বিশ্লেষণ করার আগে কাহিনীটিকে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হল—

এক দেশে এক রাজা ছিলেন আর ছিলেন এক মন্ত্রী। দুজনেই বুদ্ধিতে প্রখর। একদিন রাজ বাড়ির সামনে দিয়ে একটি শূকর গেলে রাজা তাকে চিনতে পারলেন না। মন্ত্রীও চিনতে পারলে না। মন্ত্রী অনেকক্ষণ ধরে দেখে বললেন, ওটা বোধ হয় হাতি, না খেতে পেয়ে শুকিয়ে গিয়েছে। কিন্তু অনেকক্ষণ পর দেখতে পেলেন যে তার শুঁড় নেই। তখন চিন্তাভাবনা করলেন যে এটা বোধহয় রাজভাণ্ডারের খাবার খেয়ে মোটা হয়ে গিয়েছে, ইঁদুর মোটা হয়ে এমন রূপ ধারণ করেছে। রাজ্যে অনেকগুলি বিদেশি লোককে দেখে তারা গর্ত খুঁড়ছে আর মন্ত্রী এবং রাজ্যের সেপাই সকলে ভাবলেন যে ওরা বোধ হয় রাজ্যে চুরি করবার জন্য সিঁদ কাটছে। কিন্তু ওরা রান্না করার জন্য উনুন কাটছিল। সিঁদ কাটতে গিয়ে এক লোকের মৃত্যু হল। রাজা কোতোয়ালকে গর্দান নেওয়ার নির্দেশ দিলেন। মন্ত্রী এসে বললেন, মহারাজ মন্ত্রীর দোষ নেই। লোকটি আগেই মরা ছিল। এবার রাজা মন্ত্রীকে মালীকে ধরে নিয়ে আসতে বলেন। কারণ মালি যদি ভালো করে দেওয়াল তৈরি করত তাহলে লোকটা চাপা পড়ত না। মালিকে দেখে রাজা বললেন, তোর জন্য গৃহস্থের অমঙ্গল হচ্ছে তোরও গর্দান দেওয়া হবে। মালি বলল, আমি না আমার মামাতো ভাই করেছে। মালি কাঁদতে লাগল এই ভাবে একের পর এক বোকামির পরিচয় রাজা, মন্ত্রী এবং রাজ্যের অন্যান্য সকলে এসে দিতে লাগলেন।

আর এক সন্ন্যাসী তার শিষ্য মশানে এসে হাজির হল। শিষ্য ভয়ানক মোটা আর ভারী, ওজন চৌদ্দ মন। চিৎকার করতে করতে তার ভুঁড়ি অর্ধেক কমে গিয়েছে। শিষ্যকে প্রায় শূলের কাছে এনে সন্ন্যাসী সকলকে ডাকছে। সন্ন্যাসী এসে শূল ধরল। মহারাজ কঠোর পরিশ্রম করে মাহেন্দ্র ক্ষণে শূল তৈরি করে তাতে নিজেই চড়বেন বলে ঠিক করলেন। এটি শুনে মন্ত্রী, সেপাই সকলে কাঁদতে লাগলেন।

এবারে 'হবুচন্দ্র রাজা ও গবুচন্দ্র মন্ত্রী' গল্পের কাহিনীটিকে নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করছি।—

Type Index ও Motif Index এর সাহায্যে কাহিনীর বিশ্লেষণ :

খ। মোটিফ ১। ৫৬১.২.৮.১ লোভের শাস্তি

২। ১০১০ অসম্ভব কাজ

৩। এম ২০৫ সংকল্প ভাঙা

৪। জে ২৪৬১ এখন আমি কি করি

৫। এইচ ১৫১.১.৩ বিস্ময়কর কাজ দেখিয়ে চিহ্নিত করণ।

আলোচ্য কাহিনীতে রাজা এবং মন্ত্রী নিজেদের বুদ্ধির প্রাবল্যে মনে করেছিলেন বিনা কারণে সকলকে শাস্তি দিয়ে নিজেদের প্রভাব প্রতিপত্তি নিয়ে থাকবেন। এক ধরনের লোভ কাজ করেছিল। আর তার জন্য রাজাকে শূলে চড়ানো হবে বলে ঠিক হয়েছিল তাই এর মোটিফ সংখ্যা হল ৫৬১.২.৮.১ অর্থাৎ লোভের শাস্তি। আবার রাজা কি করে শূলে চড়বেন এটাও ছিল অনেকের কাছে অসম্ভব ব্যাপার আর তাই রাজা করলেন তাই এটা অসম্ভব কাজ আরতাই এর Motif সংখ্যা হয়েছে ১০১০ কিন্তু রাজা যখন এসে বললেন, 'আমি শূলে যাইব' তখন সন্ন্যাসী মন্ত্রীরা সকলে কি করবে বুঝে উঠতে পারছিলেন না। তাই এর মোটিফ সংখ্যা হয়েছে 'জে ২৪৬১' অর্থাৎ এখন আমি কি করি।

লেভিস্ট্রসের রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পদ্ধতির মাধ্যমে বিশ্লেষণ :

লেভিস্ট্রসের বিশ্লেষণ পদ্ধতির অন্যতম উপায় হল প্রথমে Binary Opposition বা দ্বৈত-বৈপরীত্যগুলিকে খুঁজে বার করা। আলোচ্যগল্পের কাহিনীর মধ্যে যে Binary Opposition গুলি খুঁজে পাওয়া যায় সেগুলি নিম্নরূপ—

১। বোকা	২। গুরু	৩। রাজা
চালাক	শিষ্য	প্রজা

এবারে গল্পের কাহিনীর কয়েকটি অংশকে ভাগ করে নিয়ে মিথেম গুলিকে পরপর আলোচনা করে দেখছি।

১। রাজা এবং মন্ত্রী দুজনেই ছিলেন বোকা।

২। রাজা এবং মন্ত্রী এই বোকামির জন্য তারা শূকরকে চিনতে পারেন না।

৩। সকল সিপাইকে বললেন ঐ জন্তুটিকে এনে আটকে রেখে দিতে।

৪। এর পর— বিদেশী লোকেরা রান্না করে খাবে বলে উনুন কাটছিল।

৫। তাদেরকে চোর সন্দেহ করে ধরে আনাও রাজার বোকামির পরিচয়।

৬। আবার চোরটা দেওয়াল চাপা পড়ে মরে গিয়েছে শুনে কোতয়ালকে দিয়ে মালিকে গর্দান দেওয়ার ব্যবস্থা করা। এটাও বোকামির পরিচয়।

৭। এক সন্ন্যাসী ছিল সে খুব চালাকি করত।

৮। আর সন্ন্যাসীর শিষ্য কেবলমাত্র চাওয়ার জন্য পাগল হয়ে যেত। তাই তার তখন ওজন হয়েছিল চোদ্দ মন।

৯। সন্ন্যাসীর চালাকির জন্য শিষ্যও এদেশে থাকার পরিকল্পনা ছেড়ে দিল।

এখন Binary Opposition অনুসারে মিথেমগুলোকে সাজানো হল—

বোকা	চালাক	গুরু	শিষ্য
১। রাজা ও মন্ত্রী দুজনেই ছিলেন বোকা।			
২। রাজা ও মন্ত্রী এই বোকামির জন্য শূকরকে চিনতে পারলেন না।			
৫। তাদেরকে চোর সন্দেহ করে ধরে আনাও রাজার বোকামির পরিচয়।			
৬। আবার চোরটা দেওয়াল চাপা পড়ে মরে গিয়েছে শুনে কোতয়ালকে দিয়ে মালিকে গর্দান দেওয়ার ব্যবস্থা করা।	৭। এক সন্ন্যাসী ছিল। সে খুব চালাকি করত।		
			৮। সন্ন্যাসীর শিষ্য কেবলমাত্র পাওয়ার জন্য পাগল হয়ে যেত। তাই তার ওজন হয়েছিল চোদ্দ মন।
	৯। সন্ন্যাসীর চালাকির জন্য শিষ্যও এদেশে থাকার পরিকল্পনা ছেড়ে দিল।		

V. J. Proppএর Function গুলির সাহায্যে বিশ্লেষণ :

জে. প্রপ লোককথার ৩১টি Function এর কথা বলেছেন। আর এই Function অনুযায়ী 'হবুচন্দ্র রাজা এবং গবুচন্দ্র মন্ত্রী' গল্পের কাহিনীকে বিশ্লেষণ করলে এমন হবে—

১। ১০ নং Function অনুসারে নায়ক প্রতিরোধ ও প্রতিশোধমূলক কাজে লিপ্ত হয়। আলোচ্য কাহিনীতে রাজা তার বোকামির জন্য অর্থাৎ বুদ্ধি কম থাকার জন্য সকলের সঙ্গে প্রতিশোধ মূলক কাজে লিপ্ত হয়েছে।

২। ৪নং Function এ আছে খলনায়ক নায়কের বিরুদ্ধে কাজ করে। এখানে তেমন খলনায়ক না থাকলেও সন্ন্যাসী কিন্তু পরোক্ষে খলনায়কের কাজের মতই কাজ করেছে। অর্থাৎ খলনায়ক এখানে রাজাকে নানা ভাবে পরাস্ত করার চেষ্টা করেছে।

৩। ১৬ নং Function -এ আছে নায়ককে কঠিন কাজ সমাধা করতে বলা হয়। এখানে রাজা নিজেই শূলে চড়তে রাজি হল এটাও জোরপূর্বক কাজ বলাই যেতে পারে।

৪। ২৫ নং Function এ আছে নায়ক কঠিন কাজ সমাধা করে। আলোচ্য কাহিনীতে রাজা কিন্তু অবশেষে নিজেই শূলে চড়বেন বলে ঠিক করলেন এটা একরকম কঠিন কাজ বলেই মনে করা হয়েছে। আবার রাজা নিজেই শূলে চড়ার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছেন।

'ঠাকুরমার ঝুলি'র আর একটি গল্প 'সোনার কাঠি রূপোর কাঠি' গল্পের কাহিনী বিশ্লেষণের আগে গল্পটি সংক্ষেপে একটু আলোচনা করছি।

এক রাজপত্র, এক মন্ত্রিপুত্র এক সওদাগরের পুত্র আর এক কোটালের পুত্র চার জনের খুব ভাব। কোন কাজ করে না। সারাদিন ঘুরে বেড়ায়। একদিন চার জনের মা স্থির করলেন, ওদের সবাইকে আজকে ছাই খেতে দেব। সওদাগরের স্ত্রী, মন্ত্রীর স্ত্রী, কোটালের স্ত্রী তাদের পুত্রকে থালা ভর্তি ছাই খেতে দিল। রাজপুত্রকে তার মা ভাতই দিল কিন্তু থালার এক পাশে একটু ছাইও দিল। পুত্রদের সঙ্গে এরকম আচরণ করেছে বলে পুত্ররা আর দেশে থাকবে না। এমন পরিস্থিতিতে চার পুত্র ঘোড়া ছুটিয়ে তেপান্তরের মাঠে এসে পৌছল। মাঠের চারদিক দিয়ে চার জন ছুটল। তারা একটা নিশানা ঠিক করেছিল যে যে যেখানেই থাকুক তারা এসে সবাই এখানে থাকবে। এই ভাবে একটা মস্ত বড় বনে তারা পৌছল। বনে কোথাও কোন ফলমূল নেই। খাবার খুঁজতে খুঁজতে একটা হরিণের মাথা পেল। তার মধ্যে আছে এক রাক্ষুসী। হরিণের মাথা যেই কাটতে যায় তাকেই রাক্ষস খেয়ে ফেলে! এমন সময় এল রাজার ছেলের পালা। তাকে আর সবাই বলে, পালাও পালাও। রাজপুত্র দৌড়ে পালাল। দৌড়ে গিয়ে একটি আম গাছের মধ্যে ঢুকে পড়ল। রাক্ষসী তার পিছু নিল। রাক্ষসীর ছলনাতে রাজার ছেলে না ভুলে সেখান থেকে আবার চলে গেল। এমন সময় এক রাজা বনের মধ্যে এসে সুন্দরী রাজকনা বেশধারী রাক্ষসীকে বিয়ে করে বাড়ি নিয়ে যায়। রাজপুত্র এই ভাবে একের পর এক আমগাছ থেকে বোয়ালের পেটে, বোয়ালের পেট থেকে শামুকের মধ্যে এই রকম করে ঘুরে বেড়াল। এভাবে সে এসে পৌছাল একমস্ত পুরীতে। সেখানে এসে সে দেখল সোনার খাটে গা, রূপোর খাটে পা দিয়ে রাজকন্যা শুয়ে আছে। তার দুই দিকে দুইটি কাঠি একটি রূপোর অপরটি সোনার। রাজপুত্র

শিয়রের রূপার কাঠিটি পায়ের দিকে আবার পায়ের দিকের কাঠিটি শিয়রের দিকে দিলে রাজকন্যা উঠে বসল। তারপর রাজপুত্রকে সবকিছু জানাল। এই রাজকন্যাকে ঐ সুন্দরী রাক্ষসীর মা এবং আরও অন্যান্যা রাক্ষসীরা আটকে রেখেছে। এইরকমভাবে চলতে চলতে একদিন রাজপুত্র এক কঠিন কাজ করে রাক্ষসীদের মেরে ফেলে রাজকুমারীকে সঙ্গে নিয়ে নিজের রাজ্যে চলে এল। রাজপুত্র তার তিন বন্ধুকে ফিরে পেল। পৃথিবীর যত রাক্ষস ছিল সব মরে গেল। দেশে গিয়ে রাজপুত্ররা, বাপ মায়ের আদরে, সুখে দিন গুণতে লাগল।

Type Index ও Motif Index এর দ্বারা বিশ্লেষণ :

ক) টাইপ : ৭২৫ স্বপ্ন

খ মোটিফ : ১. এইচ ১৫১.১.৩ বিস্ময়কর কাজ দেখিয়ে চিহ্নিত করণ।

২. ই ৬০০ পুনর্জন্ম

৩. এইচ ১০1০ অসম্ভব কাজ

৪. জে ২৪৬১ এখন আমি কি করি

৫. কে ১৮৬০.২ সঠিক সময়ে প্রতারণা

৬. ৫৬১.২.৮.১ লোভের শাস্তি

আলোচ্য কাহিনীটিতে রাজা, মন্ত্রী, সওদাগর ও কোটালের এদের চারজনের স্বপ্ন ছিল তাদের পুত্রদের ঠিক ভাবে মানুষ করা। কিন্তু বিধাতা বিরূপ তা আর তাদের পূরণ হল না স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে গেল। তাই আর বাস্তবে রূপায়িত হল না। তাই এ টাইপ সংখ্যা হয়েছে ৭২৫ অর্থাৎ স্বপ্ন।

এখানে রাজার পুত্র সেই রাক্ষসীর দেশে গিয়ে রাক্ষসীদের কৌশলে মেরে রাজকুমারীকে উদ্ধার করে নিয়েএসে বিস্ময়কর কাজ দেখিয়ে চিহ্নিত করেছে তাই এর মোটিফ সংখ্যা হয়েছে 'এইচ ১৫১.১.৩ অর্থাৎ বিস্ময়কর কাজ দেখিয়ে চিহ্নিত করণ।' আবার এইচ ১০1০ অর্থাৎ অসম্ভব কাজ, যেটা কিনা রাক্ষসীর পক্ষে সম্ভব হয়নি। কেননা রাজার কুমার সে তো পরাজিত হবার পাত্র নয়। তাই সে রাক্ষসীকে তার বাজে কাজ করতে বাধা দেওয়ায় রাক্ষসী আর তার কাজ করতে পারেনি। আবার হরিণের মাথা থেকে যখন রাক্ষসী বেরিয়ে এসেছিল তখন রাজকুমার কি করবে বুঝে উঠতে পারছিল না। তাই এর মোটিফ সংখ্যা হয়েছে জে২৪৬১। আলোচ্য কাহিনীতে রাজার কুমার একদম পুরো সঠিক সময় পিতা কর্তৃক, রাক্ষসী কর্তৃক প্রতারিত হয় তাই এর মোটিফ সংখ্যা হয়েছে কে ১৮৬০.২ অর্থাৎ সঠিক সময়ে প্রতারিত হওয়া।

লেভিস্ট্রসের রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পদ্ধতির মাধ্যমে বিশ্লেষণ :

লেভিস্ট্রসের রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পদ্ধতির যুগান্তকারী আবিষ্কার হল 'বিপরীতমুখি দুটি শক্তির অস্তিত্ব অনুভব করণ।' তিনি সর্ব প্রথমে গল্পের মূল অংশগুলিকে চিহ্নিত করেছেন এবং তার নাম দিয়েছেন 'মিথেম'। তাঁর তৈরি মিথেম অনুসারে আলোচ্য 'সোনার কাঠি রূপার কাঠি' গল্পের মিথেমগুলি উল্লেখের আগে—কাহিনীর যুগ্ম

বৈপরীত্য বা Binary Opposition-গুলি বের করে নেওয়া থাক—

১ চাওয়া ২. ভয় ৩. মানুষ

পাওয়া নির্ভয় রাক্ষস

এবারে মিথেমগুলোকে তুলে ধরছি—

১। রাজার, মন্ত্রীর, সওদাগরের স্বপ্ন ছিল পুত্রদের মনের মত করে মানুষ করবে।

২। পুত্ররা তাদের নিজেদের মত করে চলতে পেরেছিল।

৩। এক বনে গিয়ে এক রাক্ষসীর সঙ্গে দেখা হল তাদের।

৪। সকলে ভয়ে পেয়ে গেল রাক্ষসকে দেখে।

৫। রাক্ষস সবাইকে খেয়ে ফেলল কেবলমাত্র রাজপুত্রকে পারল না।

৬। রাজপুত্র এইভাবে চলতে চলতে মস্ত এক রাজপুরীতে গিয়ে উপস্থিত হল।

৭। রাজপুরীতে গিয়ে এক রাজকন্যার সঙ্গে দেখা হল।

৮। কৌশলে রাক্ষসীদের মেরে ফেলল।

৯। রাজকুমারীকে নিয়ে দেশে ফিরে গেল।

১০। রাক্ষসীর আর রাজপুত্রকে খাওয়া হল না।

চাওয়া	পাওয়া	মানুষ	রাক্ষস
১। রাজার, মন্ত্রীর, সওদাগরের, কোটা-লের খুব ইচ্ছা তাদের পুত্রদের মনের মতো করে মানুষ করে।			
	২। পুত্ররা নিজের ইচ্ছামত চলতে পেরেছিল		
			৩। এক বনে এক রাক্ষসীর সঙ্গে দেখা হল তাদের।
		৪। সকলে ভয়ে পালিয়ে গেল রাক্ষসকে দেখে	

চাওয়া	পাওয়া	মানুষ	রাক্ষস
			৫। রাক্ষস সবাইকে খেয়ে ফেলল কেবল-মাত্র রাজপুত্রকে পারল না।
		৬। রাজপুত্র এই ভাবে চলতে চলতে রাজপুরীতে গিয়ে পৌঁছাল।	
		৭। রাজপুরীতে গিয়ে রাজকুমারীর সঙ্গে দেখা হল।	
			৮। কৌশলে রাক্ষসীদের মেরে ফেলল।
		৯। রাজকুমারীকে নিয়ে দেশে ফিরে গেল	
	১০ রাক্ষসীর আর রাজপুত্রকে খাওয়া হল না।		

V. J. Propp এর Function দ্বারা বিশ্লেষণ :

ভি. জে. প্রপ গল্পের পাত্রপাত্রীদের ক্রিয়াশীলতাকে ৩১টি বিভাগে বিভক্ত করেছেন। এই ক্রিয়াশীলতা অনুসারে 'সোনার কাঠি রূপোর কাঠি' গল্পটিকে বিশ্লেষণ করলে যেমন দাঁড়ায়—

১। Function ৪নং এ আছে খলনায়ক নায়কের বিরুদ্ধে কাজ করে। এই গল্পে যদিও খলনায়ক প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত নেই। কিন্তু রাক্ষসী কিন্তু পরোক্ষভাবে খল নায়কের ভূমিকা পালন করেছে।

২। Function ১০এ আছে নায়ক প্রতিরোধ অথবা প্রতিশোধমূলক কাজে অগ্রসর হয়। আলোচ্য গল্পে রাজপুত্র কিন্তু রাক্ষসীর সঙ্গে প্রতিরোধ ও প্রতিশোধমূলক কাজে অগ্রসর হয়েছে।

৩। ১৬ নং Function এ আছে নায়ক ও খলনায়ক সংঘাতে লিপ্ত হয়। আলোচ্য কাহিনীতে রাজপুত্র এবং রাক্ষসী পরস্পর সংঘাতে লিপ্ত হল।

৪। ২৫ নং Function-এ নায়ককে সব কঠিন কাজ সমাধা করতে বলা হয়। এখানে যদিও রাজপুত্রকে কঠিন কাজ সমাধা করতে তেমন ভাবে কেউ বলেনি কিন্তু সে নিজে থেকেই বুঝে নিয়েছে কি করতে হবে। আর ২৫ নং Function টি এখানে উপযুক্ত হয়েছে।

৫। ২৬ নং Function অনুসারে রাজকুমার অনেক কঠিন কাজ সমাধা করে অর্থাৎ রাজকুমারীকে রাক্ষসদের কাছ থেকে খুব কৌশলে উদ্ধার করে এনেছে।

৬। ৩০ নং Function অনুসারে রাক্ষসী তার কৃতকর্মের জন্য শাস্তি পেল।

অ্যালান ডান্ডেসের সূত্রের মাধ্যমে কাহিনীর বিশ্লেষণ :

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার মহাশয়ের প্রায় প্রত্যেকটা রূপকথার কাহিনীকে এই সূত্রের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা যায়। এই আলোচ্য কাহিনিটিকে বিশ্লেষণ করলে এই রূপ হবে। সূত্রটি হল—

L L

L = Lack (অভাববোধ)

LL = Liquidated of Lack (অভাববোধপূরণ)

এই কাহিনীতে অভাববোধ আছে। রাজার, মন্ত্রী, সওদাগরের ও কোটালের পুত্র তাদের ছেড়ে চলে গেলে তারা সকলেই পুত্র হারা হয়েছে। অর্থাৎ অভাববোধ আছে পুত্র ছাড়া থাকা হল অভাব অর্থাৎ L. আর সব শেষে যখন পুত্ররা ফিরে আসে তখন অভাববোধ পূরণ হয় অর্থাৎ এটা হল LL.

দক্ষিণারঞ্জন গতানুগতিক শিক্ষায় বেশীদূর অগ্রসর হতে না পারলেও তাঁর সংকলিত লোককথাগুলির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য আছে তার কথন রীতিতে। কলকাতার 'বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি পরিষদ' দক্ষিণারঞ্জনকে সম্বর্ধনা জানিয়ে মানপত্রে 'কথাসাহিত্য সম্রাট' হিসাবে সম্বোধন করে। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত দক্ষিণারঞ্জন লেখার কাজে অবিচল ছিলেন। লোকসংস্কৃতিবিদ শঙ্কর সেনগুপ্তের বক্তব্য এ ব্যাপারে প্রণিধানযোগ্য— "His writings above all are free from the western and sanskritic influences. He is famous in Bengal, as the emperor of folkliterature." (Folk lore of Bengal- Sankar Sengupta)

প্রসঙ্গ বাংলার লোককথা : সংগ্রহে—
বিদেশী প্রশাসক ও মিশনারীবৃন্দ

তিমির বরণ চক্রবর্তী

এক। **কথামুখ :**

বাংলার লোকসংস্কৃতি চর্চার ধারা আজ বহুবিস্তৃত। বহুপণ্ডিত, লোকসাহিত্য প্রেমী ও গবেষকগণের আন্তরিক প্রচেষ্টা, শ্রম ও উন্নত গবেষণার দ্বারা সংগৃহীত, পরিপুষ্ট ও বিশ্লেষিত হয়ে বাংলার লোকসংস্কৃতি চর্চা আজ উন্নত স্তরে এসে পৌঁছেছে। এই সাফল্যের মূলে দেশী-বিদেশী পণ্ডিত, গবেষক ও লোকসংস্কৃতিপ্রেমীর অবদান অবশ্যই স্বীকার্য। ইতিহাসের প্রেক্ষিতে এ'কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বিদেশী পণ্ডিত এবং গবেষকগণের ভূমিকা এ'ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে গণনীয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার নবজাগরণ পাশ্চাত্য ভাবধারার সংস্পর্শেই হয়েছিল। বাংলাদেশ, জাতি, সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতি এই নবজাগরণের ঢেউয়েই উদ্বেলিত হয়ে সেদিন থেকে আজ এক নবচেতনার স্তরে এসে পৌঁছেছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর সেই সার্বিক নবচেতনার আলো বাংলার ঐতিহ্যময় লোকসংস্কৃতির বিস্তৃত আঙিনাকেও আলোকিত করেছিল। বহু যুগ ও কালের সঞ্চিত বাংলার লোকসংস্কৃতি সেদিন পাশ্চাত্য মানবিকতার স্পর্শ লাভ করে অনন্য গুরুত্ব লাভ করে। বাঙালির পরম সম্পদ অবহেলিত লোকসংস্কৃতি কতিপয় বিদেশী ভারতবন্ধুর আন্তরিক ও অনুসন্ধানী দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বর্তমান প্রবন্ধে সেইসব বিদেশী ভারতবন্ধুর কার্যের মূল্যায়ন-এর সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করে পূর্বপুরুষের ঋণ শোধ করার চেষ্টা করব।

বাংলার লোকসংস্কৃতি চর্চা যতই উন্নত বা বিজ্ঞানভিত্তিক হোক না কেন, এর সাফল্যের মূলে যে কয়েকজন বিদেশী বন্ধুর নির্দেশিত পথই কাজ করে চলেছে, তা অস্বীকার করার পথ নেই। কেননা, এই যুগেই বাংলার লোকসংস্কৃতি সংগ্রহ ও চর্চার কাজ বিপুল পরিমাণে ও সার্থক বিজ্ঞান মনস্কতার সঙ্গেই শুরু হয়েছিল। কিন্তু আক্ষেপের সঙ্গেই বলতে হয় যে, ঐ ব্যাপারে আজো খুব বিশেষ কিছু আলোচনা করা হয়নি। 'উইলিয়ম কেরী', 'জেম্‌স্‌ লঙ' অথবা 'মর্টন' শুধু সংগ্রাহকই ছিলেন না. ছিলেন তার চেয়ে অনেকগুণ বেশী। উক্ত বিদেশী মিশনারী ও প্রশাসকগণ কেবলমাত্র বাংলার লোকসংস্কৃতির উপাদান সংগ্রহ করেই ক্ষান্ত হননি, অনেক গভীরে তাঁদের কর্মপ্রচেষ্টার শিকড় প্রবিষ্ট হয়েছে। বলতে দ্বিধা নেই যে কেরী, লঙ, মর্টন-এর মতো বা বাংলার

লোকসংস্কৃতি চর্চার আদিযুগের (১৭৮৪ থেকে ১৯১২) আরো অনেক বিদেশী বন্ধুর মতো কাজ এ যুগেও কি আমরা করে উঠতে পেরেছি? মিশনারীগণ অথবা ব্রিটিশ শিভিলিয়ানরা যে উদ্দেশ্যেই ভারত বা বাংলায় আসুন না কেন, তাঁদের মহৎ কর্মের দ্বারা আমাদের সংস্কৃতি যে বহুভাবে উপকৃত হয়েছে, সেকথা স্বীকার করতে কুণ্ঠা বোধ করলে হবে না, কেননা, একথা ভুললে চলবে না যে, আদিমযুগের লোকসংস্কৃতি চর্চার বিজ্ঞানভিত্তিক ভূমির উপরই প্রতিষ্ঠিত হয়ে বর্তমান কালের বাংলার লোকসংস্কৃতি চর্চা আরো বিজ্ঞাননিষ্ঠ হয়েছে।

বর্তমান প্রবন্ধের শিরোনামযুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে যাঁদের নিয়ে আলোচনা করব, তাঁরা হলেন উইলিয়ম কেরী, এডওয়ার্ড টুইটি ডালটন, গের্বন হেনরী ডামণ্ট, হাবার্ট হোপ রিসলে, স্যার জর্জ আব্রাহাম গ্রীয়ারসন, উইলিয়ম ম্যাককুলক এবং রেভারেণ্ড লাল বিহারী দে।

দুই। **কথাশুরু : উইলিয়ম কেরী :**

ইংলণ্ডের নরদামটন শায়ারের কয়েকজন ব্যাপ্‌টিস্ট মিশনারী ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয়দের মধ্যে খ্রিস্টানধর্ম প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সেই উদ্দেশ্যেই ১৯ নভেম্বর ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে উইলিয়ম কেরী কোলকাতার মাটিতে পদার্পণ করেন। ওই একই উদ্দেশ্যে তাঁর বাংলা ভাষা চর্চার শুরু এবং বাংলাদেশ ও বাঙালিকে খুব কাছে থেকে জানবার চেষ্টা। এই প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ কেরীর বাংলা ভাষার প্রতি অনুরাগ জন্মে গেল এবং স্বভাবতই এই অনুরাগ ধীরে ধীরে কেরীকে বাঙালির আপন জনে পরিণত করলো। "এই প্রেম অহৈতুকী ছিল না। তাঁহার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ও একমাত্র লক্ষ্য ছিল অখ্রিস্টিয়ান সমাজে খ্রিষ্টধর্মের প্রচার এবং সেই উদ্দেশ্য লইয়াই তিনি বাংলা ভাষার চর্চা আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের মন চিরকাল সেই উদ্দেশ্যকে আঁকড়াইয়া থাকিতে পারে নাই, কাজ করিতে করিতে ভাষার প্রতি প্রীতি আপনিই জন্মিয়াছে এবং উইলিয়ম কেরী এই ভাষাকে বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার কাজে শেষ পর্যন্ত অন্য প্রেরণার কথা বিস্মৃত হইয়াছেন।"[১]

সমালোচকের উক্ত মন্তব্যটুকু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু, তা'হলেও বলতে হয়, এই সত্য কেবল বাংলা ভাষাকে 'বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত' করতেই নয়, এই সত্য বাংলা দেশ, বাংলার সাহিত্য সংস্কৃতি, বিশেষ করে বাংলায় লোকসংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে উইলিয়ম কেরীকে প্রেরণা জুগিয়েছিল, যে প্রেরণা ছিল একান্ত আন্তরিক, যার জন্য তিনি কোন গৌরব দাবি না করে নিজেকে বলেছেন ঃ "I can plod, I can persevere in my definite persuit. To this I owe everything."[২]

সে যাই হোক, কেরীকে প্রকৃত অর্থে সৃজনশীল লেখক বলা যায় না। তবুও তিনি যে দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি, বিরাট সংগঠনীশক্তির অধিকারী ও পুরুষকারের প্রতীক ছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। মহৎ এই গুণগুলিই সহায় সম্পদহীন, দারিদ্র্যপীড়িত ও 'only a cobbler' কেরীকে শ্রীরামপুর মিশন ও ফোর্ট উইলিয়ম

কলেজের দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত করেছিল। এবং পরবর্তী সময়ে বাংলা-বাঙালি ও বাংলার লোকায়ত জীবনের সঙ্গে তাঁকে পরিপূর্ণভাবে সমীভূত করে দিয়েছিল। এই সূত্রের অনুষঙ্গে আমরা তাঁর নামে প্রচারিত দুটি বিখ্যাত সংকলনগ্রন্থ 'কথোপকথন' (১৮০১) এবং 'ইতিহাস মালা' (১৮১২) নিয়ে অগ্রসর হয়ে দেখাবার চেষ্টা করব যে, এই দুই গ্রন্থে বাংলার লোকায়ত জীবনের বাণী তথা লোকসংস্কৃতির উপাদান কতখানি বিধৃত রয়েছে। কিন্তু প্রাসঙ্গিক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা শুধুমাত্র 'ইতিহাসমালা'য় ধৃত 'লোককথা' বা কহিনী নিয়েই আলোচনায় অগ্রসর হব, কেননা, 'কথোপকথনে' নয়। 'ইতিহাসমালা'তে 'লোককথা'ই বৃহৎ স্থান অধিকার করে আছে এবং বলাবাহুল্য, এই লোককথাগুলি একাধিক ভাবযুক্ত। এই একাধিক ভাবযুক্ত অসংখ্য 'লোককথা'গুলির বিস্তৃত আলোচনা বর্তমান প্রবন্ধের স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয়, তাই 'ইতিহাসমালা'র অন্তর্গত লোককথাগুলির নাম উল্লেখ করে তাদের 'টাইপ' ও 'মোটিফ' নির্ণয় করে সুধী পাঠকবর্গের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করব।

'ইতিহাসমালা'য় 'লোককথা' : টাইপ নির্ণয় :

[ক] **পশুকথা :**

(১) টাইপ : ১-৯৯ বন্যপশু। গল্প সংখ্যা : ৯, ২৭, ৩৫, ৪২, ৪৩, ৫০, ৬২, ৭৯, ৮৪, ১১৬, ১১৭, ১৩০।

(২) টাইপ : ১০০-১৪৯ বন্যপশু ও গৃহপালিত পশু। গল্প সংখ্যা : ৮, ১৫, ৩০, ৬৬।

(৩) টাইপ : ১৯০-১৯৯ মানুষ ও বন্যপশু। গল্প সংখ্যা : ৫, ১৩, ১৬, ৪৭, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৬৯, ৮২, ৮৮. ৯৪, ১০৩, ১১৮, ১৩৩, ১৪৯।

(৪) টাইপ : ২০০-২১৯ গৃহপালিত পশু। গল্প সংখ্যা : ১৪০।

(৫) টাইপ : ২২০-২৪৯ পাখী। গল্প সংখ্যা : ২৯, ৩৬, ৬১, ৭২, ১০২, ১৪২।

(৬) টাইপ : ২৭৫-২৯৯ অন্যান্য জন্তু ও বস্তু। গল্প সংখ্যা : ২৮, ৪৫, ৬৮, ৭৪, ১০৮।

[খ] **সাধারণ লোককথা :**

(১) টাইপ : ৩০০-৩৯৯ অলোকিক বাধা। গল্প সংখ্যা : ২০, ৭৭, ১২৮।

(২) টাইপ : ৪৬০-৪৯৯ অস্বাভাবিক বা অলৌকিককার্য, অসাধ্য সাধন। গল্প সংখ্যা : ১, ৪, ১০, ১৮, ৫৮, ৫৯, ৬৩, ৯৭, ১০০, ১০৭, ১৪৫, ১৪৮।

(৩) টাইপ : ৫০০-৫৫৯ অলৌকিক সাহায্যকারী/কারিণী। গল্প সংখ্যা : ৩, ২৫, ৪০, ৮৭, ১০০, ১০৬, ১৪৩।

(৪) টাইপ : ৫৬০-৬৪৯ যাদু বা ঐন্দ্রজালিক বস্তু। গল্প সংখ্যা : ৩৮, ৯৩, ৯৬. ৯৯, ১২৫।

(৫) টাইপ : ৭০০-৭৪৯ অন্যান্য অলৌকিক কাহিনী। গল্প সংখ্যা : ৭, ৬৫, ৭৮, ৮০, ১১৪, ১৪৪।

(৫) ১. টাইপ : ৭৫০-৮৪৯ ধর্মীয় বা নীতিমূলক কাহিনী। গল্প সংখ্যা : ২, ১৭, ১৯, ২৩, ৩১, ৩৩, ৩৪, ৪৮, ৪৯, ৫৩, ৫৯, ৬০, ৬৭, ১২০, ১২৪, ১২৭, ১২৯, ১৩২।

(৫) ২. টাইপ : ৮৫০-৯৯৯ রোমাঞ্চকর/রোমান্টিক কাহিনী।
গল্প সংখ্যা : ৬, ১২, ২২ ৩৯, ৯৫, ১১৯, ১২২, ১৪১।

[গ] হাসি ও পারিবারিক কাহিনী :

(১) টাইপ : ১২০০-১৩৪৯ বোকার গল্প। গল্প সংখ্যা : ১১, ২৬, ৪৬, ১২৩, ১৩৮, ১৩৯, ১৪৭।

(২) টাইপ : ১৮৭৫-১৯৯৯ মিথ্যাবাদীর কাহিনী। গল্প সংখ্যা : ১১০, ১৫০।

(৩) টাইপ : ২০০০-২৩৯৯ সূত্রমূলক কাহিনী। গল্প সংখ্যা : ৩৭, ৪১, ১০৯, ১১২।

(৪) টাইপ : ২৪০০-২৪৯৯ অশ্রেণীভুক্ত কাহিনী। গল্প সংখ্যা : ১৪, ২১, ২৪, ৩২, ৪৪, ৫২, ৫৭, ৬৪, ৭৩, ৭৪, ৭৬, ৭৯, ৮১, ৮৫, ৮৬, ৮৯, ৯১, ৯২, ৯৮, ১০৪, ১১১, ১১৫, ১২১, ১২৬, ১৩১, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৬, ১৩৭, ১৪৫।

মোটিফ নির্ণয় :

[ক] লোকপুরাণ [মিথ] :

(১) মোটিফ : এ ০-এ ৯৯ সৃষ্টিকর্তা। গল্প সংখ্যা : ১০০।

(২) মোটিফ : এ ১১০-এ৪৯৯ দেবতা। গল্প সংখ্যা : ১৪৪ দেবী ভাগবতী [ভগবতী]।

[খ] জীবজন্তু :

(১) মোটিফ : বি ০-বি ৯৯ লোকপৌরাণিক জীবজন্তু। গল্প সংখ্যা : ৮, ১৫, ২৭, ২৯, ৩৬, ৪২, ৬৬, ৭০, ১১৭।

(২) মোটিফ : বি ১০০-বি ১৯৯ ঐন্দ্রজালিক জীবজন্তু। গল্প সংখ্যা : ১৩, ১৬, ৪৩, ৬২, ৬৮, ৭১।

(৩) মোটিফ : বি ২০০-বি ২৯৯ মানবিক গুণসম্পন্ন জীবজন্তু। গল্প সংখ্যা : ৯, ২৩, ৩৫, ৪৫, ৪৭, ৫০, ৭২, ৮৪, ১১৬, ১৪২।

(৪) মোটিফ : বি ৩০০-বি ৫৬৯ বন্ধুভাবাপন্ন বা উপকারী জীবজন্তু।
গল্প সংখ্যা : ৩০, ৬১, ১৩০, ১৪০।

[গ] ট্যাবু বা বিধিনিষেধ :

(১) মোটিফ : সি ০-সি ৯৯৯। গল্প সংখ্যা : ৩০, ৫৫, ১০৮, ১৪৮।

[ঘ] ঐন্দ্রজালিকতা বা যাদু :

(১) মোটিফ : ডি ০-ডি ৬৯৯ রূপান্তরকরণ বা আকৃতি পরিবর্তন। গল্প সংখ্যা : ৩।

(২) মোটিফ : ডি ৭০০-ডি ৭৯৯ যাদুশক্তি থেকে মুক্ত হওয়া। গল্প সংখ্যা : ১৭।

(৩) মোটিফ : ডি ৮০০-ডি ১৬৯৯ ঐন্দ্রজালিক বস্তুসমূহ। গল্প সংখ্যা : ৯৯।
(৪) মোটিফ : ডি ১৭০০-ডি২১৯৯ যাদুশক্তি ও তার প্রকাশ। গল্প সংখ্যা : ৯৩, ৯৬।

[ঙ] **মৃত্যু :**

(১) মোটিফ : ই ০-ই ১৯৯ পুনর্জীবন। গল্প সংখ্যা : ৫।
(২) মোটিফ : ই ২০০-ই ৫৯৯ ভূতপ্রেত ও অন্যান্য অশরীরী আত্মা। গল্প সংখ্যা : ১০৫।

[চ] **অসাধ্যসাধন :**

মোটিফ : এফ ৯০০-এফ ১০৯৯ অস্বাভাবিক ঘটনাসমূহ। গল্প সংখ্যা : ৪, ৭, ১৮, ২০, ৪০, ৫১, ৫৮, ৬৩, ৭৩, ৯৪, ৯৭, ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১৪৩, ১৪৫, ১৪৮।

[ছ] **রাক্ষস-খোক্কস-দৈত্য-দানব-ডাইনী :**

মোটিফ : জি ০-জি ৩৯৯ নানাবিধ দৈত্য ও ডাইনী। গল্প সংখ্যা : ৬৫, ৮৬।

[জ] **পরীক্ষা :**

(১) মোটিফ : এইচ ৯০০-এইচ ১০৯৯ পৌরুষের পরীক্ষা : কার্যভার। গল্প সংখ্যা : ১০, ৬৪।
(২) মোটিফ : এইচ ১৪০০-এইচ ১৫৯৯ অন্যান্য পরীক্ষা। গল্প সংখ্যা : ১০৪, ১২৫।

[ঝ] **চালাক ও বোকা :**

(১) মোটিফ : জে ০-জে ১৯৯ জ্ঞানার্জন ও রক্ষা। গল্প সংখ্যা : ২, ১৯, ২৪, ৫৭, ৫৯, ৬০, ৬৭, ৮৩, ৯১, ১১০, ১১৩, ১১৫, ১২০, ১২১, ১২৬, ১২৭, ১২৯, ১৩১, ১৩৫, ১৩৬।
(২) মোটিফ : জে ১১০০-জে ১৬৯৯ চালাকি। গল্প সংখ্যা : ১১, ১৩, ১৪, ৩৩, ৩৮, ৩৯, ৪১, ৪৮, ৫২, ৫৮, ৭৬, ৭৯, ৮৯, ৯৮, ১১০, ১১১, ১২৩,১৪৬, ১৫০।
(৩) মোটিফ : জে ১৭০০ জে-২৭৯৯ বোকা। গল্প সংখ্যা : ১৮, ৩১, ৩৩, ৭০, ৭৪, ৭৮, ৮৫, ৯০, ১০২, ১১৯, ১২৪, ১৩৮, ১৩৯, ১৪০, ১৪৯।

[ঞ] **প্রতারণা :**

(১) মোটিফ : কে ০-কে ৯৯ প্রতারণার দ্বারা প্রতিযোগিতায় জেতা। গল্প সংখ্যা : ১৩৭।
(২) মোটিফ : কে ৩০০-কে ৪৯৯ চুরি ও প্রতারণা। গল্প সংখ্যা : ১৪৫।
(৩) মোটিফ : কে ১৫০০-কে ১৫৯৯ ব্যভিচারের সঙ্গে যুক্ত প্রতারণা। গল্প সংখ্যা : ৬।

[ট] **ভাগ্যচক্র :**

মোটিফ : এল ০-এল ৪৯৯। গল্প সংখ্যা : ২০, ২৮, ৯৫।

[ঠ] **অদৃষ্ট ও কপাল :**

মোটিফ : এন ০-এন ৮৯৯। গল্প সংখ্যা : ২০, ৪৪, ৫৪, ৬৯, ৭৭, ৮০, ৮৭, ৮৮, ১৩৩।

[ড] **ধর্ম :**

(১) মোটিফ : ভি ০-ভি ৫৯৯। গল্প সংখ্যা : ৩৪ [বংশগত], ১০১ [রাজধর্ম], ১০৪ [স্বভাবগত], ১১৮ [দস্যুবৃত্তি], ১৩৪ [পাপ-পুণ্য সংক্রান্ত]।

[ঢ] **চারিত্রিক গুণ ও বৈশিষ্ট্য :**

মোটিফ : ডবলিউ ০-ডবলিউ ২৯৯। গল্প সংখ্যা : ১, ২২, ৪৯, ৮১, ১৩২।

[ণ] **হাসিঠাট্টা :**

মোটিফ : একস্ ০-একস্ ১৭৯৯। গল্প সংখ্যা : ২৬, ৪৬।

[ত] **বিভিন্ন মোটিফ :**

(১) মোটিফ : জেড ০-জেড ৯৯ সূত্র। গল্প সংখ্যা : ৩০, ১০৯ [পদাবলী সাহিত্য সূত্র], ৮২[উপাখ্যান সূত্র], ৯২[মহাকাব্যভুক্তসূত্র], ১১২ [মঙ্গল কাব্যভুক্ত সূত্র]. ১২৮ [ভৌগোলিক ও পৌরাণিক সূত্র], ১৪৭ [ঐতিহাসিক সূত্র]।

(২) মোটিফ : জেড ১০০-জেড ১৯০ সংকেতধর্মীতা। গল্প সংখ্যা : ২১।

(৩) মোটিফ : জেড ৩০০-জেড ৩৯৯ বিশেষ ব্যতিক্রম। গল্প সংখ্যা : ৩২।

** 'ইতিহাসমালা'র গল্পগুলি এতই বিচিত্র যে, কোন্ কথাটির মূল অভিপ্রায় কোন্‌টি অথবা কোন্ গল্পটির মূল 'টাইপ' কোন্‌টি তা' নির্ণয় করা বেশ কঠিন বা শক্ত। তবুও বিশিষ্ট লোককথা বিশ্লেষক 'অ্যান্টি আর্নে' এবং 'স্টিথ থমসন' নির্দেশিত পথের সঙ্গে বর্তমান লেখকের ব্যক্তিগত ধ্যান ও ধারণা প্রয়োগ করে 'ইতিহাসমাল'র অন্তগর্ত 'কথা'গুলির 'টাইপ' ও 'মোটিফ' নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়েছে।

সব শেষে বলা যায় যে, বাংলা লোকসংস্কৃতির জগতে উইলিয়ম কেরীর নাম স্মরণীয় হয়ে আছে। উইলিয়ম কেরী বাংলার লোকায়ত জীবনকে আমাদের সামনে তুলে ধরতে "নিজেকে যে প্রবলভাবে সক্রিয় রেখেছিলেন তা আজকের বাঙালীর ও বাঙলা ভাষার সর্বপ্রকার দৈন্যের দিনে বড় বেশি করে মনে পড়ে যায়।"[৩] আর মনে পড়ে যায় তাঁর সেই বাঙালি প্রাণকে, যে প্রাণের ভাষা বলেছিল : "I may say indeed that their manners, customs, habits and sentiments are obvious to me asif I was myself as a native."[৪]

তথ্যসূত্র :

(১) সজনীকান্ত দাস : 'উইলিয়ম কেরীর কথোপকথন' : ভূমিকাংশ (১৩৪৯)।

(২) ইউস্টেস্ কেরী Memoir of Dr. Carey : পৃ. ৬২৩।

(৩) ড. সনৎ কুমার মিত্র : লোকায়ত বাঙলা ও উইলিয়ম কেরী : পৃ. ৬।

(৪) ড. সুশীল কুমার দে : Bengali Literature in the Nineteenth Century : পৃ. ১২৫।

তিন। এডওয়ার্ড টুইটি ডাল্টন

বাংলার লোককাহিনী সংগ্রহ ও চর্চার প্রাথমিক পর্যায়ে যেমন হেনরী ড্রামণ্ড একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, ঠিক তেমনই ভূমিকা অবলম্বন করে স্মরণীয় হয়ে আছেন এডওয়ার্ড টুইটি ডাল্টন। বাংলা সরকারের দ্বারা প্রকাশিত ও ডাল্টন কর্তৃক লিখিত গ্রন্থ 'Descriptive Ethnology of Bengal'-এর মাধ্যমে

ডাল্টনের বাংলা লোকসংস্কৃতি সংগ্রহের ও সংরক্ষণের কাজে আত্মপ্রকাশ। এবং এই আত্মপ্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গেই তাঁর উক্ত কর্মে প্রতিষ্ঠা ও স্বীকৃতি লাভ ঘটে।

· সে যাই হোক, ডাল্টনের পূর্বোক্ত সুবৃহৎ গ্রন্থখানি লোকসংস্কৃতির বহুবিচিত্র উপাদানে পূর্ণ। গ্রন্থখানির আখ্যাপত্রে লেখা আছে :

Descriptive Ethnology of Bengal/By Edward Tuite Dalton, C.S.I. Printed for the Government of Bengal, Under the direction of the council of the Asiatic Society of Bengal. Calcutta : Office of the Superintendent of Government Printing, 1872.

আখ্যাপত্রের মাধ্যমে জানা গেল যে, গ্রন্থখানি বাংলার 'এশিয়াটিক সোসাইটি'র তত্ত্বাবধানে ও পরিচালনায় বাংলা সরকারের পক্ষে লেখা হয়েছে। এবং অন্যান্য তথ্য অনুসরণ করে জানা যায় যে, 'ডাল্টন'-এর উক্ত গ্রন্থখানির মূল লক্ষ্য ছিল 'বাংলাদেশের জাতিতাত্ত্বিক জরিপকার্যের পরিচালনা করা' এবং সেই সূত্রেই প্রাপ্ত বাংলার লোকসংস্কৃতির উপাদানের পরিচয় দেওয়া।

তিন. ক. এই গ্রন্থের মধ্যে যে সকল জাতি এবং উপজাতির লৌকিকসমাজ ও সংস্কৃতির বিষয় আলোচিত হয়েছে তা বহুবর্ণময়। মানবতত্ত্বের এমন কোন দিক নেই যা এখানে আলোচিত হয়নি। একইভাবে আলোচিত হয়েছে বিভিন্ন জাতি ও উপজাতিসমূহের আদি বাসস্থান, তাদের ধর্ম, ঘর-বাড়ি, আমোদ-প্রমোদ, লোকসঙ্গীত, কিংবদন্তী, ডাইনীকথা, বিভিন্ন জাতি-উপজাতির ভাষার তুলনামূলক আলোচনা।

বর্তমান প্রসঙ্গ যেহেতু লোককথা বা কাহিনীভিত্তিক, সেহেতু এখানে লোকসংস্কৃতির অন্যান্য উপাদানের কথা উল্লেখ করছি না। উক্তগ্রন্থে 'ডাল্টন' বেশ কয়েকটি লোককথা, কাহিনী বা 'লিজেণ্ড'-এর কথা উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলো—মিথিক্যাল কাহিনী, লিজেণ্ড এবং লোককাহিনী বা কিংবদন্তী নামক কাহিনীগুলি। 'মিথিক্যাল কাহিনীটি' ইংরেজিতে লেখা এবং বেশ দীর্ঘ। স্বল্প পরিসরে এত দীর্ঘ কাহিনীটি উল্লেখ করা সম্ভব নয়। তা না হলেও, উল্লেখ করতে হয় যে, এই কাহিনীটির নেপথ্যের যে রূপ-রস ও আমেজ ধরা পড়েছে তার তাৎপর্য অনেকখানি। লোকসমাজ যে সর্বগ্রাহক অর্থাৎ সে যে সবকিছুকে নিজের উপাদান হিসেবে গ্রহণ করতে পারে এবং সর্বত্র বিচরণ করে লোকসংস্কৃতিকে পরিপুষ্ট করতে পারে, 'মিথিক্যাল' কাহিনীটি তারই উদাহরণ।

তিন. খ. দ্বিতীয় কাহিনীটি বা কিংবদন্তীটি হলো বরাভূম অঞ্চলের। বরাভূম পরিবারের অন্তর্গত 'দুই ভাইয়ের ঝগড়া' শীর্ষক কাহিনীটি। 'ডালটন' একে 'লিজেণ্ড' বলে অভিহিত করেছেন। কাহিনী বা 'কথা'টি হল ঃ

"Nathvaraha and Kesvaraha, two brothers, quarelled with father, the Raja of virat, and settled in the court of vikramaditya. Kes the younger was Sawan in two pieces, and with his blood vikram gave a tika (Mark on the forehead) to the eldest and a pair of umbrellas, and

told him that all the country he could ride round in a day and night should be his. Nath mounted his steed and accomplished a circuit of eight Yojanas, whatever that may be, within the time specified, and a precious stiff lime of country he took in riding round what is now Barahbhum, but it must be all true as the print of his horse's hoofs are still visible on the Southern slopes of the hills."[১] এখানে একইসঙ্গে 'কাহিনী' ও 'কিংবদন্তীর' উল্লেখ পাই। 'বরাহভূম' নামের উৎপত্তির সঙ্গে যেমন একটি 'কিংবদন্তীর' সৃষ্টি হয়েছে ঠিক তেমনই এই কিংবদন্তীর অন্তর্গত দুই ভাই—নাথবরাহ ও কেশবরাহ-এর ঝগড়া ও তার পরিণতি স্বরূপ ঘটনাটি 'লোককাহিনী' বা 'লোককথা'র রূপ লাভ করেছে। একে তাই 'লোককাহিনী' বা 'লোককথা' অথবা 'কিংবদন্তী' নামে অভিহিত করা চলে।

তিন. গ. তৃতীয় 'লিজেণ্ড'টি বা 'কাহিনী'টি বহুজাতির উৎপত্তি সংক্রান্ত। এডওয়ার্ড ডাল্‌টন এর শিরোনাম দিয়েছেন 'Legend regarding the origin of different nations.' এই 'কাহিনী' বা 'কথা'টি অতিপ্রাচীন।

কাহিনীটি হলো ঃ

"When the first parents had produced twelve boys and twelve girls, Sing Bonga prepared a feast of the flesh of buffaloes, bullocks, goats, sheep, pigs, fowls and vegetables and making the brothers and sisters pair off, told each pair to take what they most relished and depart. Then the first and second pair took bullocks and buffaloe's flesh, and they originated the Kols (Ho) and the Bhumij (Matkum); the next took of the vegetables only, and are the progenitors of the Brahmans and chatris; others took goats and fish, and from them are the sudras one pair took the shelfish and became Bhuiyas; two pairs took pigs and became santals. One pair got nothing, seeing which, the first pairs gave them of their superffuity, and from the pair thus provided spring the Ghasis who toil not, but live by praying on others."[২]

তিন. ঘ. 'ডাইনী' কাহিনী ঃ

লোকসমাজে বহুবিধ লোকসংস্কার থাকে এবং তা এতই তীব্র যে এর প্রতি লোকমনে অন্ধবিশ্বাস দানা বেঁধে ওঠে। এই বিশ্বাসের প্রেক্ষাপটেই লোকসমাজে ভূত, প্রেত, ডাইনী, নিশিডাক ইত্যাদি ঘটনার উল্লেখ দেখতে পাই। ডাল্‌টন তাঁর বইতে এ'রকম অনেক কাহিনীর উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে 'কোল' সম্প্রদায়ের 'ডাইনী' কাহিনীটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মানুষ অথবা কোন গৃহপালিত জীবের মধ্যে যে কোন ধরনের রোগ দেখা দিলে তার কারণ হিসেবে যে কথাগুলি উক্ত লোকসমাজ মনে করে, তার একটি হলো কোন দুষ্ট শক্তি বা কোন অপদেবতার ভর হওয়া। অন্য একটি হলো 'ডাইনী'তে ধরা। প্রথমক্ষেত্রে 'ওঝা' বা ঐধরনের কোন লোককে ডেকে রোগের

প্রতিকারের চেষ্টা করা হয়; দ্বিতীয়ক্ষেত্রে অর্থাৎ 'ডাইনী' পাওয়ার ক্ষেত্রে সমাধানটি বড়ই অদ্ভুত। 'হো' উপজাতির সমাজে যদি সন্দেহ জাগে যে কাউকে ডাইনীতে ধরেছে, তা হলে সেই ডাইনীকে ধরা ও তাড়ানোর জন্য এক বিশেষ ক্রিয়া অবলম্বন করা হয়। এই ধরনের একটি অদ্ভুত কাহিনী ডাল্‌টন আমাদের সামনে যে ভাবে তুলে ধরেছেন, তা হলো ঃ

"In the latter case a 'Sokha', or witch-finder, is employed to divine who has cast the spell and various modes of divination are restored to one of the most common is the test by the stone and paila. The latter is a large wooden cupshaped like a half coconut used as measure for grain. It is placed under a flat stone as a pirot for the stone to turn. A boy is then seated on the stone, supporting himself by his hands, and the names of all the people in the neighbourhood are slowly pronounced, and as each name is uttered, a few grains of rice are thrown at the boy. When they come to the name of the witch or wizard, the stone turns and the boy rolls."[৩]

পূর্বোক্ত কাহিনীটিকে 'ডালটন' 'ডাইনী' কাহিনী বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এটাও কী 'লোককথা'র অন্তর্ভুক্ত নয়? লোকসমাজের অন্তর্গত যে কোন ধরনের কাহিনী বা গল্পকে যদি সাধারণভাবে 'লোককথা' বলে অভিহিত করা যায় তাহলে হয়তো কিছু ভুল হয় না, কিন্তু অসংখ্য 'লোককথা'কে ধাঁচ বা বিষয় অনুযায়ী ভাগ করে আলোচনা করলে বিষয়টি বুঝতে সুবিধে হয় বলেই আমরা 'লোককথা'কে বিষয় অনুযায়ী কখনো 'লোক কাহিনী', 'কিংবদন্তী', 'ডাইনী কাহিনী', 'রূপকথা', 'পরীকথা', 'উপকথা', 'ব্রতকথা', 'পশুকথা' ইত্যাদি আরো বহু নামকরণে অভিহিত করে থাকি। সুতরাং ডাল্‌টন সংগৃহীত উক্ত 'কিংবদন্তী'টিকে 'লোককথা'র অন্তর্ভুক্ত করতে বাধা কোথায়?

তথ্যসূত্র :

১. এডওয়ার্ড টুইটি ডালটন ঃ Descriptive Ethnology of Bengal, 1872, P. 174.
২. এডওয়ার্ড টুইটি ডালটন ঃ Do, P. 184.
৩. এডওয়ার্ড টুইটি ডালটন ঃ Do, P. 197

চার। **গেবর্ণ হেনরী ডামণ্ট**

বাংলার লোককাহিনী সংগ্রহের ইতিহাসে ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের লোককাহিনী সংগ্রহের সূচনাবর্ষও হলো এটি। এই বছরেই প্রকাশিত 'The Indian Antiquary' এবং 'Descriptive Ethnology of Bengal'-কে মাধ্যম করেই বাংলা-লোকসংস্কৃতি সংগ্রহের আসরে হেনরী ডামণ্ট-এর আবির্ভাব।

"এই তরুণ বিদ্বান ও বুদ্ধিমান প্রশাসকটি ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষার্থে প্রাণ দান করেন।

কিন্তু তাঁর কথা কুত্রাপি ধরে রাখা হয়নি। সরকারী আরকাইভসে তাঁর বায়োডাটা পেলাম না। এন. বি-তেও তাঁর উল্লেখ নেই। কিন্তু তিনি বাঙলার লোকগল্প সংগ্রাহকদের আদিতম ব্যক্তিদের একজন হিসাবে আমাদের কাছে সম্মানিত। তাই তাঁর সম্পর্কে জানার কৌতূহল আমাদের যথেষ্ট।"[১]

চার. ক. চাকরিসূত্রে হেনরী ডামণ্ট বাংলাদেশের লোকজীবনের সঙ্গে নিজেকে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত করতে পেরেছিলেন এবং যথার্থ কারণেই তিনি বাংলার লোককথা সংগ্রহের দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। চাকরিজীবনে বদলির সূত্রে ডামণ্টকে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিভ্রমণ করতে হয় এবং সেই সুযোগে তিনি বিভিন্ন অঞ্চলের লোকজীবনের বহুবিচিত্র দিকের সঙ্গে পরিচিত হবারও সুযোগ পান। বলাবাহুল্য, এই সুযোগের সদ্ব্যবহারও তিনি করতে পেরেছিলেন। এই অভিজ্ঞতার ফসল 'ইণ্ডিয়ান এণ্টিকোয়ারী'র পাতায় প্রথম থেকেই পরিবেশন করতে থাকেন। শুধু লোককাহিনীই নয়, বাংলার লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানসমৃদ্ধ বিভিন্ন নিবন্ধ তিনি বিভিন্ন সময়ে উক্ত পত্রিকার মাধ্যমে প্রকাশ করেন ঃ

"Among the early collectors publishing in Indian Antiquary, Gaborn Henry Damant, B. C. S. a civil servant in Rangpur, now in Bangladesh collected and published twenty Bengali tales from Dinajpur (Bangladeh). These tales are still currents all over Bangladesh. Other articles by Damant were some accounts of 'Palis of Dinajpur' 'on the Dialects of Palis' 'Inscriptions on a cannon of Rangpur', and 'Notes on Hindu choronograms'. These articles are more or less based on local legends and stories. The first information about the Palis, a tribe of Dinajpur. In the first article Damant supplied a mythical story on the origin of the Pali tribe. He also collected some Bengali charms from Rangpur, one of which was for 'driving away evil spirit' and the others were usually used by snake charmars."[২]

চার. খ. 'ইণ্ডিয়ান এণ্টিকোয়ারী' ও ডামণ্টের রচনাবলী

'ইণ্ডিয়ান এণ্টিকোয়ারী' পত্রিকার সঙ্গে ডামণ্ট আজীবন যুক্ত ছিলেন। কালক্রম অনুসরণ করে উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত ডামণ্টের প্রবন্ধাবলীকে সাজাতে গেলে, এইভাবে সাজানো যায় ঃ

(১) Bengali Folklore-A Legend From Dinajpur, By G. H. Damant, B. C. S., I. A., Vol 1, 1872. PP. 119-120. এখানে যে লোককথাটি মুদ্রিত হয়েছে, তা হলো 'দুয়োরানী ও সুয়োরানী'র গল্প। দ্বিতীয় আব একটি কাহিনী 'সাতভাই', রাক্ষস ও রাজা'র গল্পটি উক্ত পত্রিকায় ১৭০ থেকে ১৭২ পৃষ্ঠায় ছাপা হয়। তৃতীয় গল্পটি 'এক ব্রাহ্মণ ও রাজার কাহিনী'। যতদূর মনে হয় ডামণ্টই এর প্রথম সংগ্রাহক। গল্পের শেষ লাইনটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ডামণ্ট লিখেছেন ঃ 'Tailor-

bird, my story is ended, Let me hear yours' পৃ. ১৭১।

(২) Bengali Folklore—More Legends from Dinajpur, By G. H. Damant, B.C.S., I. A, Vol. I, 1872. (continued from page 172), pp 218-219. The Fourth story : 'The prince and the sages'. গল্পটি আমাদের কাছে পরিচিত। একে রূপকথা বা পরীকথার অন্তর্ভুক্ত করা যায়। ডামন্টের পরেও অন্যান্য বহুবিখ্যাত লোককথা সংগ্রাহক এই কথাটি সংগ্রহ করেছেন।

এরপর ২১৯ পৃষ্ঠায় সংগৃহীত গল্পটির নাম 'রাজা ডালিম এবং অপ্সরাগণ'। ডামন্টের ভাষায় ঃ 'The Fifth Story : King Dalım and the Apsaras'.

এই গল্পটি খুব পুরানো বলে মনে হয়।

(৩) Bengalı Folklore Legend from Dinajpur By G. H. Damant, B.C.S., I.A., Vol. I, 1872, (continued from Page 219), pp 285-286. 'The Sixth Story : The Four Friends' বা চারবন্ধুর কথা।

(৪) Bengali Folklore—Legend from Dinajpur by G. H. Damant, B.C.S, I.A. Vol-1 1872. (continued from page 287) p.p. 344-345. The Seventh Story : The History of Rogue বা এক প্রতারকের কথা।

রাজপুত্র ও নাপিতপুত্রের বন্ধুত্ব এবং নাপিতপুত্র কর্তৃক রাজপুত্রকে প্রতারণা এবং পুনরায় নাপিতপুত্র কর্তৃক রাজপুত্রকে উদ্ধার করা ও তাকে বন্ধু বলে স্বীকার করাই এই গল্পের মূল উপজীব্য। এরপর ৩৪৫ পাতাতেই সংগৃহীত হয়েছে অষ্টম গল্পটি। যার নাম 'বণিক ও দৈত্যের কথা'।

(৫) Bengali Folklore—Legend From Dinajpur, By G. H. Damant, B.C.S., I.A., Vol. II, 1873 (contınued from vol. I, P. 345). 'The two Ganja eaters' বা দুজন গাঁজাখোরের গল্প। এটি পূর্বোক্ত পত্রিকায় ২৭১ থেকে ২৭৫ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত। গল্পটির মধ্যে বিদেশী গল্পের ছায়া পড়েছে। এই মিশ্রণ স্বয়ং ডামন্টের, না সংগ্রাহকের, তা ঠিক বলা যায় না।

(৬) Legend From Dinajpur, By G. H. Damant, B.C.S., 'The Story of the Touch Stone' বা 'পরশপাথর'-এর গল্প। পূর্বোক্ত খণ্ডের ডিসেম্বর, ১৮৭৩ সংখ্যার ৩৫৭ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়। এই গল্পটি বহুল প্রচারিত হলেও ডামন্ট সংগৃহীত এই গল্পটিতে কিছু নতুনত্ব আছে।

(৭) Bengali Folklore—Legend From Dinajpur By G. H. Damant, B.C.S, I.A., Vol. IV, 1875, pp. 53-59 (continued from vol. III. p. 343) 'The finding of the Dream' বা 'স্বপ্ন-বৃত্তান্ত'-এর গল্প। এটিও দুয়োরানী ও সুয়োরানীর গল্প। তবে এই কাহিনী বিন্যাসে কিছু পরিবর্তন বা নতুনত্ব লক্ষ্য করা যায়।

(৮) Bengali Folklore–Legend From Dinajpur By the Late, G. H. Damant M.A., I.A., Vol. IX, 1880, January এখানে পর পর তিনটি লোককথা প্রকাশিত হয়েছে। কথাগুলি যথাক্রমে ঃ

(ক) 'The Brahmin and the Merchant' বা 'ব্রাহ্মণ ও বণিকের' গল্প।

(খ) Adi's, wife অর্থাৎ 'আদির স্ত্রীর' গল্প এবং (গ) The prince and his two wives অর্থাৎ 'রাজপুত্র এবং তার দুই পত্নী'র গল্প।

চার. গ. 'ইণ্ডিয়ান এন্টিকোয়ারী'-তে প্রকাশিত 'লোককাহিনী' বা 'লোককথা'র 'টাইপ' নির্ণয় ঃ

এই পত্রিকায় ডামন্ট মোট লোককথা প্রকাশ করেন বাইশটি। এগুলি উপকথা, পরীকথা, রূপকথা রূপে বিভক্ত করা যেতে পারে। আর তাই-ই যদি হয়, তাহলে তার 'টাইপ' চিত্রটি এইভাবে সাজানো যায় ঃ

গল্পের নাম	টাইপ
১. দুয়ো ও সুয়ো	৬৬ এ
২. সাত ভাই, রাক্ষস ও রাজার কাহিনী	১৬০
৩. এক ব্রাহ্মণ ও রাজার কাহিনী	৩০২
৪. রাজপুত্র ও সন্ন্যাসীগণ	৩০২ এ
৫. রাজা ডালিম ও অপ্সরাগণ	৫৫১
৬. চার বন্ধুর কথা	৪৬২
৭. এক প্রতারকের কথা	৬৭৪
৮. বণিক ও দৈত্যের কথা	৫৫০
৯. দুজন গাঁজাখোরের গল্প	৫৫০
১০. পরশপাথরের গল্প	৫৫১
১১. স্বপ্নবৃত্তান্ত	৯১৬
১২. ব্রাহ্মণ ও বণিকের গল্প	৯৩৪
১৩. আদির স্ত্রীর গল্প	১৫২৫ জি
১৪. রাজপুত্র ও দুইপত্নীর কাহিনী	১৭৩০
১৫. গইল হাটের মাশুল	৬৫৫

ডামন্ট 'ইণ্ডিয়ান এন্টিকোয়ারী'র বিভিন্ন সংখ্যায় বাইশটি লোককথা বা লোককাহিনী সংগ্রহ করেছেন, কিন্তু তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য পনেরোটি কাহিনীর 'টাইপ' নির্ণয় করা হয়েছে। গল্পগুলির বঙ্গানুবাদ বর্তমান লেখকের। টাইপ নির্ণয়সূত্রে 'স্টিথ থমসনের' এবং 'টাইপ নম্বর' বিভাজনের কয়েকটি ক্ষেত্রে ড. আশরাফ সিদ্দিকীর Bengali Folk collections and studies [1800-1947] গ্রন্থখানির সাহায্য নে'য়া হয়েছে।

তথ্যসূত্র :

১. শঙ্কর সেনগুপ্ত : দেশ বিদেশের লোকগল্প ঃ আলোচনা ও সংকলন [কবয়ো বদন্তি], পৃ. ৬২।

২. গেবর্ণ হেনরী ডামন্ট : 'ইণ্ডিয়ান এন্টিকোয়ারী', 'ভল্যুম ১ (১৮৭১) ঃ Some accounts of the Palis of Dinajpur, পৃ. ৩৩৮।

পাঁচ। হাবার্ট হোপ রিসলে ঃ 'ট্রাইবস্ এন্ড কাস্টস্ অব বেঙ্গল'

বাংলার লোকসংস্কৃতি চর্চার ইতিহাসে ১৮৯১ সালটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সালেই 'ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস'-এর বিশিষ্ট কর্মী স্যার হাবার্ট হোপ রিসলে দুটি খণ্ডে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'Tribes and castes of Bengal' [Calcutta, 1891] প্রকাশ করেন। বাংলার বিভিন্ন প্রান্তের বহুজাতি ও উপজাতির জাতিতাত্ত্বিক আলোচনা এবং লোকসংস্কৃতির বহুবিচিত্র উপাদানে সমৃদ্ধ দু' খণ্ডের এই গ্রন্থ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলার লোকসংস্কৃতি, জাতিতাত্ত্বিক আলোচনায় ক্ষেত্রে রিসলের এই গ্রন্থখানি লোকসংস্কৃতির গবেষকদের কাছে আজও আকরগ্রন্থ হিসেবে পরিগণিত হয়ে আছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনার প্রেক্ষিতে একথা বলা প্রয়োজন যে,

এই গ্রন্থ দু'খানি মূলত বাংলার লোকসংস্কৃতি সংগ্রহের গ্রন্থ নয়। বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থানকারী বিভিন্ন জাতি ও উপজাতির বহু বিচিত্র বংশ, কুল, বর্ণ, গোত্র ইত্যাদির পূর্ণ বিবরণী ও পরিচয় দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এই দু'খানি গ্রন্থ লিখিত। বলাবাহুল্য, এই জরিপকার্য পরিচালিত হয়েছে জাতিতাত্ত্বিক, নৃতাত্ত্বিক আলোচনার দৃষ্টিকোণ থেকে। তাই এই গ্রন্থ দুখানিতে একইসঙ্গে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে বসবাসকারী বহু বিচিত্র জাতি উপজাতির জাতিতত্ত্ব বা নৃতত্ত্বের পরিচয় যেমন ফুটে উঠেছে, তারই পাশাপাশি ঐসব জাতিমণ্ডলীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয় লিপিবদ্ধ হয়েছে। এই শেষোক্ত পরিচয়ই আমাদের লোকসংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে একান্ত প্রয়োজনীয়। এবং আমাদের বর্তমান আলোচনাও তাই উক্তসীমার মাঝে আবদ্ধ হবে।

পাঁচ. ক. উক্ত গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয়খণ্ডে যে সমস্ত জাতিসম্প্রদায় ও তাদের অবলম্বন করে লোকপুরাণ, কিংবদন্তী, লোককথা ইত্যাদি গ্রথিত হয়েছে, তারা হলো মুচি, মুণ্ডা, সাঁওতাল, বাগদী, বাউড়ি, চাকমা, চামার, চণ্ডাল, ধোপা, ডোম, খাসি, হো উপজাতি. সিলারি উপজাতি, তাঁতি প্রভৃতি। 'ট্রাইবস্ এণ্ড কাস্টস্ অব বেঙ্গল'-এ 'বাগদী' জাতির উৎপত্তি ও তাদের পেশা অবলম্বন করে দুটি লোককাহিনী বা কিংবদন্তী সংগৃহীত হয়েছে। প্রথমটি সংগৃহীত হয়েছে বাংলার মধ্য ও পশ্চিমপ্রান্তে বসবাসকারী, যাদের রিসলে অভিহিত করেছেন 'Aboriginal' বলে যারা এসেছে বাগদী সম্প্রদায় থেকে। দ্বিতীয় কিংবদন্তীটি সংগৃহীত হয়েছে কোচবিহার অঞ্চলে বসবাসকারী বাগদী সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে। এই কিংবদন্তীটি খুবই রোমাঞ্চকর। এখানে শিব দেবতা নন, পরন্তু রক্তমাংসে গড়া মানুষ। কোচ উপজাতি সমাজে তাঁর বাস এবং তিনি বাস করেন অনেক উপপত্নীর সঙ্গে। শিবের এই উপপত্নীর সঙ্গে ঘর করার সংবাদ পেয়ে পার্বতী হিংসা ও রাগে ফেটে পড়েন এবং ছদ্মরূপ ধরে মর্ত্যে আসেন এবং কোচ উপজাতি

সম্প্রদায়ভুক্ত শিবের কার্যকলাপের সন্ধানে প্রবৃত্ত হন এবং অবশেষে শিবকে উক্ত লোকসমাজ থেকে উদ্ধার করে নিজের কাছে নিয়ে যান।

পাঁচ. খ. বিশেষ মন্তব্য

পূর্বোক্ত কাহিনীটি নানাকারণে উল্লেখযোগ্য। কেননা, বাগদী সম্প্রদায়ের উৎপত্তির কথা বলতে গিয়ে প্রসঙ্গক্রমে 'কোচ' উপজাতি সমাজে জাত শিব-পার্বতীর যমজ সন্তানের কথা, পরবর্তীকালে এই যমজ সন্তানের বিবাহের কথা, তাদের মাধ্যমে বিষ্ণুপুরের মহারাজা বীর হাম্বিরের জন্মকাহিনী এবং তার ঔরসে জাত চার কন্যা সন্তানের কথা এবং তাদের বংশধরস্বরূপ চার উপজাতি সৃষ্টির কথা এবং রামের ঔরসে জাত প্রথম বাগদী প্রজন্মের কথা এবং সেই 'বাগদী' সম্প্রদায় কিভাবে উচ্চশ্রেণীর মহিলাদের পাল্কীবাহকের কাজে নিযুক্ত হলো তার কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। এই কিংবদন্তীর অন্তর্গত জাতিতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক আলোচনাগুলিও মূল্যবান। এই কিংবদন্তীর অন্তর্গত কাহিনীগুলি বোধকরি রিসলেই প্রথম সংগ্রহ করেন এবং এদিক দিয়ে বিচার করলে রিসলের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য।

পাঁচ. গ. 'ধোবা'-দের উৎপত্তি সংক্রান্ত কাহিনী ঃ

এই প্রসঙ্গে রিসলে চারটি কিংবদন্তীর উল্লেখ করেছেন। এর প্রথম দুটি হলো নেতামুনি বা নেতু ধোবানিকে কেন্দ্র করে। তৃতীয়টির উৎস মহারানী সীতা এবং চতুর্থ কিংবদন্তী বা কাহিনীটির মূলে আছেন রাজা রামচন্দ্র। প্রথম দুটি কিংবদন্তীর কথা মনসামঙ্গল কাব্যে উল্লেখ আছে, তাই এখানে, আলোচনা করছি না। তৃতীয় ও চতুর্থ কথা দুটি হলো 'রামের ধোবা' ও 'সীতার ধোবা'। এই কথা বা কাহিনী দুটিব মধ্যে বৈচিত্র্য আছে, আছে আভ্যন্তরিক গঠন কাঠামো (Internal Structure) সংক্রান্ত সাদৃশ্য। বলাবাহুল্য, এই দুটি কিংবদন্তী বা লোককথা দুটি একে অপরের পরিপূরক। রিসলের অনুসরণে 'রামের ধোবা' ও 'সীতার ধোবা' কাহিনী দুটি এখানে বর্ণনা করা হলো ঃ

"In Eastern Bengal two great divisions are recognised Ramer Dhoba and Sitar Dhoba, the former claiming descent from the washerman of Rama, and the later from those of Sita. Members of these two groups eat and drink together but never intermarry. The story is that originally Rama's washermen worked only for men and sita's only for women. The latter received a special payment of nine pans (720) of golden countries for washing Sita's menstrual clothes, and this made Rama's washermen covetous, so that one day they stole those garments and washed themselves. From that time it is said each branch of the caste took to washing indifferently for either sex."[১]

আগেই বলা হয়েছে যে, রিস্‌লে তাঁর 'The Tribes and castes of Bengal'

গ্রন্থে যা আলোচনা করেছেন, তা হলো বাংলার অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের লোকজীবনের সম্পদকে জাতিতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের দৃষ্টিকোণে বিচার। আর এই দৃষ্টিকোণের বিচারের প্রেক্ষিতেই তিনি বাংলার লোকসংস্কৃতির অন্তর্গত বেশ কিছু লোককাহিনী বা লোককথা অথবা কিংবদন্তীর কথা উল্লেখ করেছেন। বাংলা-লোকসংস্কৃতির পরম সম্পদ এইসব 'কিংবদন্তী' বা 'লোককাহিনী' অথবা 'লোককথা'গুলির মূল্য অপরিসীম। কেননা, এইসব 'কাহিনী' বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে রিস্‌লে উক্ত কাহিনীর জাতিতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব ও জাতিতত্ত্বমূলক আলোচনা করে উক্ত 'কথা'গুলির বিজ্ঞানভিত্তিক ভূমিও তৈরি করে গেছেন, এই কৃতিত্ব কোনো মতেই ভুলবার নয়।

তথ্যসূত্র :

১. H. H. Risley : The Tribes and castes of Bengal, Vol. I. (1891) P. 243.

ছয়। **স্যার জর্জ আব্রাহাম গ্রীয়ারসন**

"গ্রিয়ার্সন সাধারণো ভাষাবিদ্‌রূপেই পরিচিত। কিন্তু ভারতের উত্তরাখণ্ডের আধুনিক আর্যভাষায় রচিত সাহিত্য ও লোকগীতির সংগ্রহ ও পরিবেশনের [কোনও কোনও ক্ষেত্রে ইংরেজী অনুবাদসহ] মূলে ছিল যুগপৎ ভাষা বিজ্ঞানীর ভাষা জিজ্ঞাসা ও সাহিত্য রসিকের রসপিপাসা।"[১] বলাবাহুল্য, এই দুই মহৎ গুণের প্রেরণাতেই তিনি তাঁর জীবনের দুই-তৃতীয়াংশ বাংলা তথা ভারতবিদ্যার সাধনাতে উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর এই উৎসর্গীকৃত সাধনার এক বিশেষ দিক হলো বাংলার লোকসংস্কৃতির চর্চা। গ্রীয়ারসনের জীবনের এই দিকটাই আমাদের আলোচ্য।

স্যার গ্রীয়ারসন-এর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি 'Linguistic Survey of India'-র পঞ্চম খণ্ডটিতে আলোচিত বাংলার লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপকরণের মধ্যে ধৃত বাংলার 'লোককাহিনী' বা 'লোককথা'গুলি নিয়ে আলোচনায় অগ্রসর হব।

ছয়. ক. Linguistic Survey of India : লোককথা ঃ

এই গ্রন্থে 'লোককথা' সংগৃহীত হয়েছে মোট সাতটি এবং সঙ্গে কিছু 'কিংবদন্তী'ও। এর মধ্যে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য 'লোককথা' তুলে ধরছি। উক্ত 'কথা'টির শিরোনাম হলো ঃ

'ধোপার গাধা ও কুকুর'

একজন ধোপার একটা গাধা ও একটা কুকুর আছিল। একদিন গাধা কুকুরোক্ কয় ঃ শালা মুঁই সারাদিন মেহনত করোঁ আর তুঁই বসিয়া খাইস আর ভুকিস। কুকুর কয় ঃ শালা মুঁই যে কাম করোঁ সে কাম কি তুঁই করিবার পারিস। আইজ হাতে মুঁই তোর কাম করিম্ তুঁই মোর কাম্ করিব। এই কথার পর হাতে কুকুর ধোপার কাপড় উসাবার নাগিল্, আর গাধা ধোপার বাড়িৎ পহোরা দিবার নাগিল্।

কদ্দিন পরে ধোপার বাড়িৎ একদিন রাইতোৎ চোর আসিয়া সিঁদ কাটিবার নাগিল্। গাধা চোরক দেখিয়া চিল্লিবার নাগিল্। ধোপা নিন্দ্ হাতে উঠিয়া ভাল করিয়া ঘাস ভুসি

দিয়া গাধাক্‌ক বন্ধিয়া থুইয়া যায়া শুতিল্‌। গাধা কিন্তুক আগের থাকিয়া আরও বেশী করিয়া চিল্লিবার নাগিল্‌। ধোপা চিল্লাক শুনিয়া রাগ হয়া একটা ঠেঙ্গা দিয়া গাধাক্ খুব করিয়া ডাংবার নাগিল্‌। তখন কুকুর আইল্লা হাতে কয় কেমন রে ভাই গাধা কেমন ডাং।

ঐজে কয় ঃ

যার কাম তাক সাজে।
আর হৈলে নাটী বাজে।।

এই গ্রন্থে সংগৃহীত আবো ছটি লোককথাও বিভিন্ন বিষয়বৈচিত্র্যে পূর্ণ। সীমায়িত আলোচনায় উক্ত লোককথাগুলি বিবৃত করা সম্ভব নয়। জনৈক লোকসংস্কৃতিবিদ যথার্থই বলেছেন ঃ

"Grierson furnished the names of the informants and also the places where the materials were collected. He supplied the original text along with a free inter linear translation. It should be remembered that the individual languages themselves were the main concern of the editor of the survey. Grierson's folklore collection, though a by-product of a larger study, still furnished excellent specimens of genuine texts which can safely be used."

এই মতকে বহুলাংশে স্বীকার করে নিয়ে অন্য এক সমালোচক মন্তব্য করেছেন ঃ

"গ্রিয়ার্সনের রচনার বিষয় বিচিত্র। নব্বই বৎসর আয়ুষ্কালের মধ্যে প্রায় সত্তর বৎসরই গ্রিয়ার্সন ভারতবিদ্যার সাধনাতে উৎসর্গ করিয়াছেন। ভারতের ন্যায় বিরাট দেশ ও তাহার বিচিত্র মানুষ ও বিচিত্রতর জীবনধারা সম্পর্কে গ্রিয়ার্সনের ব্যাপক ও গভীর অনুসন্ধিৎসার বাঙ্ময় সাক্ষ্য তাঁহার বিপুল রচনা সম্ভার।"[২]

তথ্যসূত্র ঃ

১. অনিলকুমার কাঞ্জিলাল ঃ ভারতকোষ (৩য় খণ্ড), পৃ ২৪০।
২. অনিলকুমার কাঞ্জিলাল ঃ ওই, পৃ. ২৪১।

সাত। **রেভারেন্ড উইলিয়ম ম্যাককুলক**

বাংলা লোককথা সংগ্রহের ইতিহাসে হার্বার্ট রিসলের পরেই যাঁর নাম উল্লেখ করতে হয়, তিনি হলেন রেভারেণ্ড উইলিয়ম ম্যাককুলক। পেশায় তিনি ছিলেন একজন ধর্মযাজক। নিম্নবঙ্গের 'United Free church'-এর একজন ধর্মযাজক হিসেবেই তিনি বাংলায় আসেন। যেভাবেই হোক, তিনি বাংলার লোককথার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তার উপাদান সংগ্রহের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। একান্ত ধৈর্য, নিষ্ঠা এবং অক্লান্ত পরিশ্রমে তিনি বাংলার লোককথা সংগ্রহ করেন। তাঁর সংগৃহীত গ্রন্থের নাম 'Bengali Household Tales'. ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে লণ্ডন থেকে উক্ত গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়।

'Bengali Household Tales'-এ মোট আঠাশ (২৮)টি 'কথা' সংগৃহীত

হয়েছে। তিনশোরও বেশি পৃষ্ঠায় গল্পগুলি সংগৃহীত হয়েছে। বাংলার লোককথার বিচিত্র উপাদান ও রসের পরিচয় পাওয়া যায় এই কথাগুলিতে।

সাত. ক. ম্যাককুলক-গ্রন্থের সামগ্রিক মূল্যায়ন ঃ

আগেই বলা হয়েছে যে, আলোচ্য কথাগুলি সংগৃহীত হয়েছে নিম্নবঙ্গের দক্ষিণাঞ্চল থেকে। স্বভাবতই উক্ত কাহিনীগুলিতে বাংলাদেশের উক্ত অঞ্চলের লোকঐতিহ্যের বৈশিষ্ট্যগুলি ধরা পড়েছে। ঐ সম্বন্ধে ম্যাককুলক তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন ঃ "When he let himself go, to make a good story of almost anything by his way of telling it. Moreover, I was able to ascertain that he did not improvise but narrated his Tales in stereotyped form." এই কথা থেকে অনুমান করা যায় যে, লোককথা সংগ্রহের বৈজ্ঞানিক রীতিটিই অবলম্বন করেছিলেন ম্যাককুলক। শুধু একদিকে নয়, অন্যান্য অনেক ব্যাপারেই 'কথা' সংগ্রহের ক্ষেত্রে ম্যাককুলক অভিনবত্ব ও বিজ্ঞান মনস্কতার পরিচয় দিয়েছেন।

তাঁর সংগৃহীত কাহিনীগুলির প্রত্যেকটির সঙ্গেই পূর্বভারত থেকে সংগৃহীত সমান্তরাল কাহিনীর উল্লেখ করেছেন ম্যাককুলক। এর ফলে আমরা সংগৃহীত কাহিনীগুলির তুলনামূলক আলোচনা করবার সুযোগ পাই। অধিকন্তু প্রতিটি কাহিনীর সঙ্গে প্রয়োজনীয় পাদটীকা দেওয়ায় এবং গ্রন্থ শেষে আট পৃষ্ঠার পরিশিষ্ট সংযোজন করায় সংকলনটির মূল্যও বৃদ্ধি পেয়েছে। কিছু উদাহরণের সাহায্যে ব্যাপারটি বুঝিয়ে দে'য়া যাক ঃ

সাত. খ. পাদটীকা থেকে উদাহরণ

১ সংখ্যক কাহিনী 'Karmasutra'-এর অন্তর্গত 'Gradually, the Brahman's fear passed off' ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ম্যাককুলক পাদটীকায় বলেছেন—"He forgot the need of caution. 'For, when disaster has drawn nigh, the minds of men often become obscured'—'Hitpp' 1, 27. But no care would have a stailed now. For, 'When Fate descendsd, caution is in vain'—'Anwari Suhaile', 1, 19, quoted in CLER, P. 566. 'Niyatih Kena badhyate'—who (or what) can resist Fate? is a very common expression of condolence with a friend in Bengal, when a doar relative had died. It is the ending of a Sanskrit Sloka : 'Matulio Yasya Govindah/Pita yasya Dhananjayah/So Abimanyu rane hata/'Niyatih kena badhyate?' i.e. Though Krishna was his uncle and Arjuna his father, yet, Abimanyu dies low on the battle field. Who can resist Fate?

সাত. গ. শব্দার্থ ও ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনার উদাহরণ ঃ

৫ সংখ্যক কাহিনী 'ব্রাহ্মণের দেবতা ভক্ষণ'-এর অন্তর্গত বিশেষ কয়েকটি শব্দের অর্থ ও তাদের ভাষাতাত্ত্বিক পরিচয় পাদটীকায় যেভাবে দিয়েছেন, তা হলো ঃ

(ক) Qhar : Sk. Khara = any alkali such as Soda or Potash.

(খ) Gandusha : The drinking of a little water out of the hand before and after a meal, by way of rising the mouth, is a prescribed ceremony, which must on account be omitted.

(গ) Bet : Sk. Vilva, the tree Aegla Marmelos, the leaves of which are essential in the Puja-ritual worship of siva.

(ঘ) Holy grass : Sk. durva.

(ঙ) Sandal wood : The water etc. formed the arghya, a reverential oblain made to Gods and Venerable men. etc.

সাত. ঘ. পরিশিষ্ট থেকে নমুনা ঃ

২ সংখ্যক কাহিনী, 'ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ'-এর অন্তর্গত 'জ্যোতিষী কর্তৃক ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের কর্মফল'-এর দোষগুণ বিচার প্রসঙ্গে ম্যাককুলক পরিশিষ্টে যা ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা হলো ঃ

Undeniably, the remarks of the astrologer imply a modified doctrine of Karma. The assert ploinly that man is, to a very considerably extent, master of his fate and can battle to good purpose 'with his evil star'or, it sufficiently perverse, with his good one. This is a quite a common way of thinking among Hindus, and, consequently it may be questioned whether the practical influence of Indian fatalism is bad."

সাত. ঙ. সমান্তরাল কাহিনীর ব্যবহার ঃ

'Bengali Household Tales'-এ সংগৃহীত বাংলা লোককথার সমান্তরাল পূর্ব ভারতীয় অন্য লোককাহিনীর উদাহরণ দিয়েছেন। যথা ২৯ সংখ্যক 'ডাইনীর নৈশভোজন'-এর [The witch's Dinners] উল্লেখ করা যায়। উক্ত কাহিনীর 'I've got off safe and sound' অংশের সমালোচনা করতে গিয়ে পাদটীকায় ম্যাককুলক বলেছেন ঃ

"Similarly, in the story ot 'The Dreadless one and the Drakos', the former fools the latter into letting himself beboiled by pretending he will dye him the same colour as himself, and so make him immortal, analogous cases of fooling will be found." তুলনামূলক লোককথার উদাহরণ দিয়ে ম্যাককুলক যে বিজ্ঞানমনস্কতার পরিচয় দিয়েছেন তা সে-দিনের বিচারে অভাবনীয়।

আট। লালবিহারী দে

বাংলার লোকসংস্কৃতির চর্চার ক্ষেত্রে লালবিহারী দে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। তাঁর সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার আগে দু'একটি কথা বলার প্রয়োজন আছে। প্রথমটি হলো বাংলা লোকসংস্কৃতি চর্চায় লালবিহারী দে-র মনোনিবেশের কারণ প্রসঙ্গে। ইংরেজী সাহিত্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের (Mental and Moral Philosophy) খ্যাতিমান

অধ্যাপক এবং খ্রিস্টধর্মাবলম্বী লালবিহারী দে-কে যখন লোকসংস্কৃতি চর্চায় আত্মনিয়োগ করতে দেখি, তখন সঙ্গত কারণেই আমাদের মনে কৌতূহল জাগে। কারণ যে লালবিহারী দে ধর্মান্তরিত খ্রিস্টান, তিনি খ্রিস্টধর্মের প্রচার-প্রসার ও তার মাহাত্ম্যজ্ঞাপনেই যিনি নিবেদিত প্রাণ, তাঁর লেখনী ইংরেজী ভাষায় সদাসর্বদাই সচল। সেই লালবিহারী দে যখন গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষের জন্য চিন্তা করে তার লোকসমাজের অন্তঃপুরে রক্ষিত লোকসংস্কৃতির সম্পদগুলিকে তাঁর পাকা কলমের মাধ্যমে লিপিবদ্ধ করে আমাদের সামনে তুলে ধরলেন, তখন আমরা বিস্মিত হই, মুগ্ধ ও শ্রদ্ধাবনত হই তাঁর বাঙালি মনের এবং বাংলার লোকসংস্কৃতির প্রতি আন্তরিকতার পরিচয় পেয়ে। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে এমনটি কি করে সম্ভব হল? এটা কি লালবিহারী দে-র নিতান্তই কোন সাময়িক খেয়াল? না ব্যক্তিগত ও আন্তরিক প্রাণের তাগিদ? বোধকরি এই দ্বিতীয় কারণ অর্থাৎ প্রাণের তাগিদ ব্যাপারটিই সত্যি।

মূলত মনেপ্রাণে, চিন্তা-ভাবনায় এবং সৃষ্টি ও কৃষ্টির মতাদর্শে লালবিহারী দে ছিলেন সত্যিকারের বাঙালি। হিন্দুধর্মকে বাহ্যিকভাবে পরিত্যাগ করেছিলেন বটে, খ্রিস্টধর্মের প্রসারলাভ ঘটুক এও তাঁর কাম্য ছিল, কিন্তু এসব কিছুর অন্তরালেও তাঁর একটি বিশেষ মন বাঙালি জীবন ও সমাজের সঙ্গে ছিল ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। স্বদেশের জন্য তিনি সর্বদাই গর্ববোধ করতেন। ধর্মে খ্রিস্টান হয়েও মানসিক চেতনার রাজ্যে তিনি ছিলেন পুরোপুরি বাঙালি এবং ভারতীয়। আশৈশব তাঁর এই মন এবং তার আন্তরিক তাগিদই তাঁকে বাংলার লোকসংস্কৃতি চর্চায় অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল। অন্য কোন উদ্দেশ্য বা বিশেষ কোন স্বার্থসিদ্ধির জন্য তিনি এই মহৎ কর্মে ব্রতী হননি।

সে যাক, যে দুখানি গ্রন্থের জন্য বাংলার লোকসংস্কৃতির জগতে তিনি পরিচিত, তা হলো (ক) 'Bengal Peasant's Life' বা গোবিন্দ সামন্ত, (খ) 'Folk Tales of Bengal' বা বাংলার উপকথা। এছাড়াও লালবিহারী দে-র আরো একখানি অপূর্ব গ্রন্থ—'চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান' এবং অন্যান্য অনেক বিষয়ে বেশ কিছু প্রবন্ধ আছে, যার মাধ্যমে তিনি লোকসংস্কৃতির চর্চা করেছেন। এই প্রসঙ্গে 'Calcutta Review', 'Bengal Magazine' এবং 'অরুণোদয়' পত্রিকার নাম করতে হয়। প্রধানত এই তিনটি পত্রিকাকে অবলম্বন করেই লালবিহারী দে-র বাংলার লোকসংস্কৃতি চর্চা বা উক্ত বিষয়ক সাধনকর্ম প্রবাহিত হয়েছে।

আট. ক. 'ফোক্ টেলস্ অফ্ বেঙ্গল' বা 'বাংলার উপকথা' ঃ

প্রাসঙ্গিক আলোচনার ভিত্তিতে আমরা লালবিহারী দে-র পূর্বোক্ত গ্রন্থখানির মূল্যায়ন করবার চেষ্টা করব।

গ্রন্থখানি উৎসর্গ করা হয়েছে বেঙ্গল স্টাফ কোর-এর ক্যাপ্টেন আর. সি. টেম্পলকে। এই সংকলন গ্রন্থটি ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হয়। এতে মোট বাইশ (২২)টি লোককথা সংগৃহীত হয়েছে।

বলাবাহুল্য, "লেখার ধরনে কোনো মমতার পরিচয় নেই, নিরলঙ্কা.ভাবে গল্পের কাঠামোগুলি ধরে দিয়েছেন, কোথাও কোনো তত্ত্বকথা আরোপ করেননি, বর্ণনার বাহুল্য নেই, সংলাপ অনেক জায়গায় অতি নীরস। আশ্চর্যের বিষয় হল তবু সেই ন্যাড়া বিবৃতির অসম্ভব, অবাস্তব, অভাবনীয় সব ঘটনার মধ্য দিয়েও সেকালের বাঙালীর চরিত্র, তার আশা-নিরাশা সুখ-দুঃখে মেশা জীবনযাত্রা কেমন ফুটে উঠেছে। কিছু বাদ যায়নি, একদিকে সেই জাঁকজমক, অন্যদিকে সেই অভাব অনটন, সেই চিরদিনের লোভ, হিংসা, বিফলতা, ব্যর্থতা, সেই মহত্ত্ব, সেই সার্থকতা। গল্পকারের নিজের চরিত্রের বলিষ্ঠতা গল্পের মধ্যে ছাড়া পেয়েছে।"[১]

সত্যিই তাই, লালবিহারী দে-র এই সংকলনটি বাংলা লোককাহিনী সংগ্রহের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় সংযোজন। অবশ্য কিছু-কিছু ত্রুটিও এতে ধরা পড়েছে। কিন্তু, তবুও এই গ্রন্থের সীমাহীন মূল্যের কথাই বারবার স্মরণ করতে হয়।

আট. খ. সংকলনে ধৃত গল্পগুলির 'টাইপ' ও 'মটিফ' নির্ণয় ঃ

গল্পের নাম	টাইপ	মটিফ
(১) Life's Secret [গোপন প্রাণ]	৪১২	টি. ১১৩
(২) Phakirchand [ফকিরচাঁদ]	৫১৬	ডি. ১৮১২.২
(৩) The Indigent Brahman [গরীব ব্রাহ্মণের কথা]	৫৬৪	ডি. ৮১২
(৪) The story of the Rakshasa [রাক্ষসের গল্প]	৪১০	জি. ৫৩৫
(৫) The story of Swet Basanta [শ্বেত বসন্ত]	১৬৪০	এন. ৬৮৩
(৬) The Evil Eye of Sani [শনির দৃষ্টি]	৬৭৪	এইচ. ২৭১.১
(৭) The Box whom seven mother's suckled [সাতমায়ের একছেলে]	৯২৩ বি	এল. ৪৩২.২
(৮) The Story of Prince Sabur [লক্ষ্মীমণির স্বামী]	৪২৬	জি. ২৫০
(৯) The origin of opium [আফিং কি করে হল]	২০৩১	ভি. ২২৯.১০.২
(১০) Strike but Hear [আগে কথা পরে কাজ]	৯১৬	এইচ. ৯০০
(১১) The Adventures of		৯৫০ কে. ৩৩৫.১.১

Two Thieves and of their sons, Part I & II		(১ম অধ্যায়)
[দুই চোরের গল্প]	কে. ৩০১	(২য় অধ্যায়)
(১২) The Ghost Brahman [ব্রাহ্মণভূত]	৯২৬	জি. ৫০০
(১৩) The Man who wished to be perfect [নিখুঁত মানুষ]	৪৬০	এস. ২৫০
(১৪) A Ghosty Wife [ভূত বউ]	১০৬১	জি. ২৫৯.৫
(১৫) The Story of a Brahmadaitya [ব্রহ্মদৈত্যের কথা]	৫০০	এন. ৫৭১
(১৬) The Story of Hıraman [হীরামনের গল্প]	৫৪৬	বি. ২১১ ৩.৩
(১৭) The origin of Rubies [চুনীর জন্ম]	৪৬৭	ডি. ৮০০
(১৮) The Match making Jackel [শেয়াল ঘটক]	১৭০৯	বি. ৪৩
(১৯) The Boy with the Moon on his forehead [চাঁদের কপালে চাঁদ]	৫৫৬	এইচ. ৭১.১.১
(২০) The Ghost who was afraid [ভীতু ভূত]	১১৬৮	কে. ৭১১
(২১) The Field of Bones [হাড় খটখটির মাঠ]	৮৫০	ই. ৫০
(২২) The Bald wife [টেকো বউ]	৪৮০	ডি. ৫৬২

** 'টাইপ' ও 'মটিফ' নির্ণয়ে ড. আসরাফ সিদ্দিকীর বাংলা লোককথা ও কাহিনীর 'টাইপ' ও 'মটিফ' নির্ণয় গ্রন্থের 'টাইপ ও মটিফ' অধ্যায়ের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। গল্পের বাংলা নামকরণে লীলা মজুমদারের 'বাংলার উপকথা' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত নামকরণ রক্ষিত হয়েছে।

তথ্যসূত্র ঃ

১. লীলা মজুমদার রেভারেণ্ড লালবিহারী দে-র বাংলার উপকথা অনুবাদকের নিবেদন অংশ। পৃ. ৪।

সৃষ্টি কাহিনীর প্রকারভেদ ও ঐক্য

মোঃ আখতার হোসেন

হে ঈশ্বর, তুমি বৃহৎ মনুষ্যত্বের জন্য আহবান করো। বৃহৎ সম্মিলনের মধ্যে শক্তি উপলব্ধি করার ক্ষমতা দাও। তুমি আমাদের বিচ্ছিন্ন জীবনের প্রাত্যহিক জড়ত্ব উদাসীন হতে উদ্ধার কর। যে কঠোরতায় যে উদ্যমে, যে আত্মবিজর্সনে আমাদের সার্থকতা তার মধ্যে আমাদের প্রতিষ্ঠিত করো। দূর করো সমস্ত আবরণ আচ্ছাদন, সমস্ত ক্ষুদ্র দম্ভ, সমস্ত কোলাহল সমস্ত অপবিত্র পবিত্র আয়োজন— রবীন্দ্রনাথের এই কামনা সমস্ত ধর্মীয় দর্শনের মূল। সভ্যতা ও জ্ঞানের উন্মেষকালে মানুষের সীমিত শক্তি যখন প্রকৃতি পুঞ্জের তীব্র প্রতিকূলতায় প্রতিনিয়ত ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে থাকতো, তখন সে দেবতার আশীর্বাদ লাভের আশায় প্রার্থনা করেছে, পূজা অর্চনা করেছে। মানুষের অসহায় নির্ভরতা থেকে উত্তরণের তাগিদেই পূজা অর্চনার আয়োজন। ফলে বৈরিভাব দূর হয় সখ্যতায় এবং একতার ভাব সৃষ্টি হয় মানুষে-মানুষে, সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে। অসভ্যতার অন্ধকারকে বিধ্বস্ত করে আলোর বর্তিকা জ্বেলে দেয়। প্রাচীন গ্রন্থে এসবের বিশেষ বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। প্রাচীন ভারতে যাগযজ্ঞ, ক্রিয়াকর্ম, রীতি-আচার-অনুষ্ঠানের কমতি ছিল না। ঋগ্‌বেদ ও যজুর্বেদে অনেক ইষ্টি বা ইচ্ছা পূরণের ক্রিয়া কলাপের প্রাচুর্য আছে।

ধীরে ধীরে আদিম মানব সভ্যতার বিবর্তন শুরু হয়। চন্দ্র, সূর্য, নদ-নদী, পশু-পাখি, পাহাড়-পর্বত, অগ্নি-জল প্রভৃতি প্রাকৃতিক বস্তুর মধ্যে মানুষ একটা দৃশ্য শক্তির অস্তিত্ব অনুভব করে। ভূত প্রেতে তার বিশ্বাস জন্মায়, আর সে তার কাছে মাথা নোয়ায়। এবার প্রকৃতির বস্তুপূজা শুরু হয়। চন্দ্র, সূর্য, অগ্নি, সাপ, ব্যাঙ, গাছ পাথর আনুষ্ঠানিক ভাবে পূজা পেতে শুরু করে। মানুষ যেদিন অদৃশ্য শক্তির অস্তিত্ব অনুভব করেছিল, সেইদিনই তার মনের একান্ত অলক্ষ্যে ধর্মের বীজ উপ্ত হয়। তেত্রিশ কোটি অদৃশ্য শক্তির অস্তিত্বের অনুভূতি ও বিশ্বাস থেকে তিনটিতে নেমে আসতে মানুষের কত কাল লেগেছিল বলা যায় না। তবে তিন থেকে একে এসে পৌঁছুতে বহু বছর লেগেছিল।

ধর্ম সম্পর্কে বলা যায়, যা ধারণ করা হয় তাই ধর্ম। কোনো জনগোষ্ঠির লোক তাদের বৃহত্তর কল্যাণের জন্য যা ধারণ করে তাই সেই সম্প্রদায়ের ধর্ম হতে পারে। ধর্ম জীবনের অবলম্বন, ধর্ম ব্যতীত ব্যষ্টি কিংবা সমষ্টির কোনো পরিচয় নেই। ধর্মের ভারতীয় সংজ্ঞা অনুসারে বলা যায, জীব মাত্রেরই ধর্ম আছে। সভ্য জাতির ধর্ম সমূহের

প্রধান কথাই হল এই যে, এর আধ্যাত্মিক চৈতন্যটি একজন ব্যক্তি বিশেষের হৃদয়ে সর্বপ্রথম উদ্ভূত হয়। এই ব্যক্তি বিশেষকে কেন্দ্র করে ও তাঁর বাণীকে অবলম্বন করে সেই ধর্ম প্রচারলাভ করে। [১] হিন্দু ধর্ম গ্রন্থ গুলোকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন শ্রুতি আর স্মৃতি। শ্রুতি হচ্ছে যা প্রকাশিত হয়েছে এবং সবাই বুঝতে পেরেছে। হিন্দুদের মতে শ্রুতি হল ঈশ্বরের বাণী। শ্রুতি আবার দুই ভাগে বিভক্ত। বেদ ও উপনিষদ। বেদ সংস্কৃত শব্দ 'বিদ' থেকে এসেছে যার অর্থ মানুষের জ্ঞান। আর বেদ প্রধানত চার প্রকার। ঋগবেগ, যজুর্বেদ, সামবেদ, ও অথর্ববেদ। যদিও এ বেদগুলো ঠিক কোন সময় হতে পৃথিবীতে প্রচলিত আছে তার সঠিক তথ্য কারো জানা নেই। তবে সাধারণ ভাবে মনে করা হয় বেদের বয়স আনুমানিক চার হাজার বৎসর। পৃথিবীর কোন অংশে এই বেদ প্রথম এসেছিল তা কারো জানা নেই। তবে হিন্দু ধর্মে মনে করা হয়, এটি ভগবান প্রদত্ত সবচেয়ে বিশুদ্ধ এবং পবিত্র গ্রন্থ। এরপরে গুরুত্ব পেয়েছে উপনিষদ। উপনিষদ এসেছে সংস্কৃত শব্দ 'উপা' থেকে যার অর্থ কাছে। 'নি' অর্থ নিচে এবং 'ষদ' অর্থে বসা। অর্থাৎ কাছে এসে বসা। এক সময় ছাত্ররা তাদের শিক্ষকদের পায়ের কাছে বসত এটাকে বলা হচ্ছে উপনিষদ। এর অর্থ হচ্ছে জ্ঞান যা যাবতীয় অজ্ঞতা দূর করে দেয়। পৃথিবীতে দু'শোর বেশি উপনিষদ রয়েছে, তবে হিন্দুরীতিতে বলে এর সংখ্যা একশো আটটি। এগুলোর মধ্যে কিছু উপনিষদকে প্রধান উপনিষদ বলা হয়েছে। পরের স্তরের ধর্মগ্রন্থ গুলো হচ্ছে স্মৃতি। স্মৃতি মানে যা মনে রাখা হয় অর্থাৎ স্মরণে রাখা। হিন্দু বিশেষজ্ঞরা বলেন এই স্মৃতি নামক গ্রন্থগুলো লিখেছেন ঋষিরা। আর এর অবস্থান শ্রুতির পরে। এগুলোকে বলে ধর্মশাস্ত্র। এখানে মানুষ, সম্প্রদায়, সমাজ কিভাবে চলবে তার দিক নির্দেশনা আছে। স্মৃতির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল বিভিন্ন পুরাণ। পুরাণ অর্থে প্রাচীন। এসব পুরাণে বিভিন্ন দেবতা, বিশ্বসৃষ্টি, প্রলয় ইত্যাদি সম্পর্কে বলা হয়েছে। যেমন পুরাণের গল্প 'বিষ্ণুর অবতার' নামক গল্পে সৃষ্টিতত্ত্ব স্থান পেয়েছে। এই গল্পে বিশ্ব সৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে বলা হয়েছে, এইরূপ এই সৃষ্টির আছে কল্প কাল। এইকাল অতিক্রম হলে প্রলয় অর্থাৎ সৃষ্টি নাশ হয়ে আবার নতুন সৃষ্টি হয়। এছাড়া এজগতের সৃষ্টি হবার পূর্বে আর এক জগতের প্রলয় হয়েছিল। বিষ্ণু নানারূপ জন্তু ও মানুষের রূপ ধরে বিভিন্ন কাজ করে চলেছেন। এই রূপটিকেই বলা হয় অবতার। বিষ্ণু প্রলয় উপস্থিতির দিন কাল ঠিক করেছেন। তিনি একটি খুব ছোট মাছের রূপ ধরে কৃতমালা নামক নদীতে গিয়েউপস্থিত হলেন। সেই সময় সূর্যের পুত্র বৈবস্বত মনু সেই নদীর নিকটে থেকে তপস্যা করছিলেন। একদিন মনু কৃতমালা নদীতে নেমে স্নান করছিলেন। এমন সময় হঠাৎ দেখলেন একটি অত্যন্ত ছোট মাছ জলের সঙ্গে তার অঞ্জলির ভিতর উঠে এসেছে। তিনি মাছটিকে জলে ফেলে দিতে উদ্যত হলে সে সময় সেই মাছ জলে ফেলে না দেওয়ার জন্য কাকুতি মিনতি শুরু করে। কারণ জলে ফেলে দিলে বড় মাছ খেয়ে ফেলবে। মনু মাছের অনুরোধ রক্ষা করলেন এবং যত্নের সাথে কলসীর ভিতরে রেখে দিলেন। কিন্তু

সেই মাছ এত দ্রুত বড় হচ্ছিল যে খুব অল্প সময়ের মধ্যে কলসী থেকে বের করে চৌবাচ্চায় রাখতে হয়। কিছুদিন পরে দেখা গেল চৌবাচ্চাতেও তাকে রাখা সম্ভব হচ্ছে না, তখন মাছটিকে হ্রদে রাখা হল, এক সময় হ্রদও মাছের চেয়ে ছোট হয়ে গেল। অবশেষে বিশাল আকৃতির মাছটিকে অতিকষ্টে মনু ঘাড়ে করে সমুদ্রে রেখে আসেন। সমুদ্রে ফেলা মাত্রই মাছটি লক্ষ্য যোজন বড় হয়ে যাওয়ায় মনু আশ্চর্য হলেন এবং সহজেই বুঝতে পারলেন ভগবান স্বয়ং এখানে মাছ রূপে উপস্থিত হয়েছেন। তিনি মাছকে বলেন, আপনি নিশ্চয় স্বয়ং বিষ্ণু, আপনাকে নমস্কার। মাছরূপী ভগবান তখন নিজের পরিচয় উন্মুক্ত করেন এবং বলেন :

> আমি দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালনের নিমিত্তে মৎস্যরূপ ধারণ করিয়াছি। আজ হইতে সাতদিনের মধ্যে সকল সৃষ্টি সাগরের জলে ডুবিয়া যাইবে। সেই সময় তোমার নিকট একখানি নৌকা আসিবে, তুমি সপ্তর্ষিদিগকে আর আর সকল জীবের দু'টিকে সঙ্গে লইয়া তাহতে উঠিয়া বসিও। তখন আমিও আবার আসিব আমার শিঙে তোমার নৌকাখানাকে বাঁধিয়া দিও।' [২]

এই বলে বিষ্ণু চলে গেলেন। তারপর ক্রমে তাঁর কথা মত সমস্তই ঘটতে শুরু করে। সমুদ্র উথলিয়ে উঠতে শুরু করে। সে সময় ছোট মাছটি দেখা দেয়। এখন লক্ষ্য যোজন বড় হয়েছে। তার দেহ সোনার বরণ আর মাথায় শিঙ। সেই শিঙে নৌকা বেঁধে দিলে আর কোনো বিপদের আশঙ্কা থাকল না। প্লাবন ধ্বংস ও উদ্ধারের এইরূপ কাহিনীর বর্ণনা আছে মুসলমান ও খ্রিষ্টানদের পবিত্র গ্রন্থেও। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে হযরত নূহ (আঃ) এর ঘটনা বর্ণনা করেছেন :

> 'তুমি (নূহ) আমার তত্ত্বাবধানে ও আমার আদেশে নৌকা তৈরি কর এবং জালেমদের সম্পর্কে আমাকে কিছু বলিও না। নিশ্চয়ই তারা নিমজ্জিত হবে। সে নৌকা তৈরি করতে লাগল এবং গোত্র প্রধানরা যখনই তার নিকট দিয়ে যেত তাকে উপহাস করত, তখন সে বলত, তোমরা যদি উপহাস কর তবে আমরাও উপহাস করব, যেমন তোমরা উপহাস করছ। এবং তোমরা অচিরে জানতে পারবে কার উপর লাঞ্ছনা দায়ক শাস্তি আসবে ও স্থায়ীশাস্তি কার জন্য অবশ্যম্ভাবী। অবশেষে আমার আদেশ এলে ভূপৃষ্ঠ প্লাবিত হল। আমি বললাম. এতে প্রত্যেক জীবের এক এক জোড়া উঠিয়ে নাও, যাদের বিরুদ্ধে পূর্ণসিদ্ধান্ত হয়েছে তারা ব্যতীত তোমার পরিবার-পরিজন এবং ইমানদারগণকে উঠিয়ে নাও। তার সঙ্গে আর কয়েকজন বিশ্বাস করেছিল। সে বলল, এতে আরোহণ কর, আল্লাহর নামে এর গতি ও স্থিতি নিশ্চয়ই আমার প্রভু ক্ষমাশীল, পরমদয়ালু, পর্বত প্রমাণ তরঙ্গের মধ্যে এ (নৌকা) তাদের নিয়ে বয়ে চলল, নূহ তার পুত্রকে যে তার থেকে পৃথক ছিল, তাকে ডেকে বলল, হে পুত্র! আমাদের সঙ্গে

> আরোহণ কর এবং কাফেরদের সঙ্গী হয়ো না। সে বলিল, আমি পর্বতে আশ্রয় নেব যা প্লাবন হতে বাঁচাবে। নূহ (আঃ) বলল আজ আল্লার বিধান হতে রক্ষাকারী কেউ নেই, তবে যাকে দয়া করবেন।
> এরপর তরঙ্গ ওদের বিচ্ছিন্ন করে দিল এবং সে নিমজ্জিতদের অন্তর্ভুক্ত হল। এবং বলা হয়, হে পৃথিবী! আমার পানি শোষণ কর এবং হে আকাশ ক্ষান্ত হও! বন্যা প্রশমিত হল এবং কার্য সমাপ্ত হল, নৌকা জুদী পর্বতে স্থির হল এবং বলা হল ধ্বংসই জালিম গোষ্ঠীর পরিণাম।' ৩

'বৈবস্বত মনু ও আশ্চর্য মাছের কথা' গল্পে সৃষ্টি প্রলয় সম্পর্কে আর একটি গল্প উদ্ধৃত আছে। গল্পটিতে একজন সঠিক পুরুষ ও একটি ছোট মাছের চরিত্রের আড়ালে সৃষ্টি ও স্রষ্টার লীলার উদাহরণ উপস্থাপন করা হয়েছে। গল্পটি এইরূপ . সত্যযুগে একজন ঋষি ছিলেন তার নাম মনু, পিতার নামছিল বিবস্বান বৈবস্বত অর্থ বিবস্বানের পুত্র। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সুন্দর ও দীর্ঘ দেহী। মনু প্রতিদিন চারিনী নদীতে স্নান করে তপস্যায় বসেন। একদিন তিনি ধ্যানরত ছিলেন এ সময় সেই নদীর ছোট একটি মাছ এসে অনুনয় করে বলে সে বিপদে পড়েছে, বড় মাছ আক্রমণ করেছে। তার জীবন বিপন্ন প্রায়। এমতাবস্থায় মনুই পারে তার জীবন বাঁচাতে। মাছের আর্তনাদে মনুর ধ্যান ভঙ্গ হল। তাঁর মনে দয়া হল। তিনি ছোট মাছটিকে প্রথমে নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে কলসীতে রাখলেন। তারপর মাছটি বড় হলে বড় দীঘিতে, এরপর খুব বড় হলে মাছের ইচ্ছায় গঙ্গায় এবং সবশেষে জায়গায় সংকুলন না হওয়ায় মাছটিকে তার ইচ্ছা অনুযায়ী সমুদ্রে রেখে আসেন। মাছটি ছিল খুবই বড়, ভারি। গায়ে দুর্গন্ধ এমন ছিল যে, কারও পক্ষে এর আশে পাশে যাওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু তিনি সব ধরনের কষ্ট সহ্য করে মাছটিকে নিরাপদ সমুদ্রে ছেড়ে দেন। সমুদ্রে ছেড়ে দেওয়ার সময় মাছ তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং এর প্রতিদান দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। মাছটি বিদায় বেলায় হাসতে হাসতে বলে পৃথিবীর প্রলয় হতে আর বেশি দেরি নেই। মনুকে এই বিপদ হতে রক্ষার উপায় হিসেবে খুব বড় নৌকা প্রস্তুত করে তাতে খুব মোটা খুব শক্ত দড়ি বেঁধে রাখতে বলে। সেই নৌকায় সব রকমের বীজ সঙ্গে নিয়ে সপ্তর্ষিদের নিয়ে উঠতে অনুরোধ করে। কোন সময় এই মহাপ্রলয় হবে সে প্রসঙ্গে মাছটি বলে, যখন তার মাথায় শিং থাকবে তখন হবে। মাছের কথা মত মুনি নৌকা প্রস্তুত করে উঠে রইলেন। এক সময় শিংওয়ালা মাছ এলে শক্ত দড়ি দিয়ে নৌকাখানা বেঁধে দিলে আর কোনো ভয় থাকল না। এর পরের ঘটনা নিম্নরূপ :

> তারপর মেঘ ডাকিতে লাগিল; ঢেউ সকল পর্বতের মতো উঁচু হইয়া ছুটিতে লাগিল : অকূল সমুদ্রের ভিতরে ভয়ঙ্কর ঝড়ে পড়িয়া নৌকাখানি ঘুরপাক খাইতে লাগিল। সেই সময় ঝড়ে সংসারের সকল প্রাণী ডুবিয়া মরিল, কেবল মনু আর সেই সাতজন ঋষি সেই মাছের দয়াতে প্রাণে বাঁচিয়া রহিলেন। শেষে জল কমিতে লাগিল। ক্রমে হিমালয়ের চূড়া দেখা

দিল। তখন সেই মাছ বলিল— মুনি ঠাকুর এই পর্বতের চূড়ায় নৌকা বাঁধুন। মাছের কথায় মুনিরা সেইখানে নৌকা বাঁধিলেন। সেই মাছ ছিলেন ব্রম্ভা। তিনি এইরূপ করিয়া প্রলয়ের সময় সেই আটটি মুনিকে বাঁচাইয়া ছিলেন। [৪]

'দেব আর অসুরের কথা' গল্পে স্রষ্টার পরিচয় দেবার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। অদিতি আর দিতি কশ্যপের স্ত্রী ছিলেন। অদিতির পুত্র ধাতা মিত্র, অর্যমা, শক্র, বরুণ, অংশ, ভগ, বিবস্বান, পুষা, সবিতা, ত্বষ্টা, বিষ্ণু এই বারোজন। অদিতির পুত্র বলে এঁদের আদিত্য বলা হয়। দেবতারা তাদের দলের। দিতির পুত্র হিরণ্যকশিপু। দিতির সন্তান বলে এদের বংশের লোক-দের দৈত্য বলে। অসুরেরা এই দলের লোক। তবে সব দেবতাই অদিতির সন্তান নয় বা সব অসুরও দিতির সন্তান নয়। এই দেবতা ও অসুরদের মধ্যে সব সময় ভয়ানক শত্রুতা ছিল। দেবতাগণ চাইতেন অসুরকে বিতাড়িত করে স্বর্গের অধিকার লাভ করতে। আবার অসুররা দেবতা বধ করে স্বর্গকে দেবতা মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। এই দ্বন্দ্ব চিরকালীন, এর সূত্রপাত সমগ্র সৃষ্টির আদিতে। এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে

যখন ভাল করিয়া সৃষ্টির কাজ আরম্ভ হয় নাই তখন হইতেই দানবেরা দেবতাদিগকে জ্বালাতন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ব্রহ্মা যখন সৃষ্টি আরম্ভ করেন, তখন তিনি একটা পদ্মের ভিতর বাস করিতেন। তখন জল ছাড়া আর কিছুই ছিল না। সেই জলের উপর নারায়ণ অনন্ত শয্যায় নিদ্রা যাইতেছিলেন। সে সময়ে নারায়ণের নাভি হইতে একটি পদ্ম বাহির হয় তাহারই ভিতরে ব্রহ্মার বাসা ছিল। ইহার মধ্যে কখন নারায়ণেরহাত হইতে দুই বিন্দু জল আসিয়া সেই পদ্মের উপর পড়ে। তাহা দেখিয়া নারায়ণ বলেন— এই দুই বিন্দু জল হইতে দুইটা দৈত্য বাহির হউক। [৫]

মুসলমানদের ঐশী গ্রন্থ পবিত্র আল্ কুরআনেও সৃষ্টির শুরুতে সৃষ্টিকর্তার অবস্থান সম্পর্কে বর্ণনা দেওয়া আছে। সৃষ্টির সময় স্রষ্টার আসন ছিল পানির উপর :

'আর তিনিই সর্বশক্তিমান, যিনি সৃজন করিয়াছেন আসমান ও জমিনকে ছয় দিবসে। আর তখন তাঁর তখত (আসন) ছিল পানির উপরে।' [৬]

সৃষ্টিকর্তা আগুন, মাটি, পানি, বাতাস ও নিজের সেফাত নূর দ্বারা সমগ্র বিশ্বের যাবতীয় বস্তু সৃষ্টি করেছেন। তবে এদের মধ্যে মানুষকে তাঁর জ্ঞান অর্জন করার ক্ষমতা দিয়েছেন। তিনি যুগে যুগে দেশে -দেশে এক সত্যের বাণী প্রচার করে গেছেন। তাঁর সত্যবাণী প্রচারের প্রয়োজনে প্রত্যেক জাতির মধ্যে জ্ঞানী সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছেন। এদের সাধু, গুরু, মুনি, ঋষি বা মহৎজন বলা হয়। তিনি প্রত্যেকের মধ্যে আমিত্বের অস্তিত্বে বিরাজিত। অন্য কথায় এই আমিত্বের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন রূপে নারায়ণ বার বার প্রকাশিত হচ্ছেন। উক্ত গল্পের গভীর তত্ত্ব সেই সত্য প্রমাণ করে। ভারতের ঋষি,

মুনি প্রবর্তিত 'সাধনা ও জ্ঞান' কাণ্ডে এই আমি বা আত্মার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া আছে। এখানে বলা হয়েছে, আমি আছি তাই আমার জগৎ আছে, জগতের উৎপত্তিকে বৈদিক ভাষায় বিসৃষ্টি বলে। অর্থাৎ প্রবৃত্তির মুখে, কামনার বশে আমি যেন আমা হতে এই জগৎকে ছুঁড়ে ফেলে স্বতন্ত্র ভাবে সৃষ্টি করেছি। বেদে আছে—

কামস্তদগ্রে সমর্বত্ততাথি
মনসো রেত: প্রথমং যদাসীৎ।

অর্থাৎ আমার মনে কামনার বিকাশ হল আর জগতের বিসৃষ্টি হল। এই বিশ্বসৃষ্টি আমার বা আত্মার কামনা সঞ্জাত। একোহহং বহু স্যাম। অর্থাৎ ইচ্ছার বিকাশই সৃষ্টি। এই আমি রুদ্র গণ ও বসুগণের সাথে বিচরণ করি। আমি ইন্দ্র, অগ্নি ও অশ্বিদ্বয়কে ধারণ করি। আমি বিশ্বভুবন নির্মাণ করতে করতে বায়ুর ন্যায় সর্বত্র প্রবহমান। আমারই মহিমা ভূলোক ও দ্যুলোককে অতিক্রম করেছে। এটিই আমি আত্মব্রহ্মণ। সৃষ্টির মধ্যে এর সৎ স্বরূপ, আমি যখন জীবের মধ্যে থাকি তখন জীব এবং বাইরে থাকি তখন শিব। জীব শিবকে দেখতে চায়, জীব-শিবের মিলন চেষ্টা হতেই সাধনার উদ্ভব। [৭] সর্বভূত আমাতে বর্তমান, আমি সর্বভূতে বর্তমান। সাধনকাণ্ডে আছে— হে মহাদেব! তুমিই মনুষ্যের সাধকের একমাত্র গম্য, যেমন নদ-নদী সব সমুদ্রে গিয়ে পতিত হয়; তেমনি রুচির বৈচিত্র্য থাকলেও ঋজু কুটিল পথ অবলম্বন করলেও পরিণামে তোমাতে গিয়েই জীবের জীবত্বের পর্যবসান হয়। তাই সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত, আবার সন্ধ্যা থেকে প্রাতঃকাল পর্যন্ত আমি যা করি তাতে শিবেরই পূজা হয়। অর্থাৎ ইচ্ছায়, অনিচ্ছায়, চেষ্টায়-অচেষ্টায়, আমার দ্বারা যে কার্য সাধিত হয় তার মাধ্যমে তোমারই পূজা হয়। [৮] মুনি-ঋষি বা সাধকগণ বলেন, এই বিশ্ব সৃষ্টিতে স্রষ্টা ছাড়া আর কিছুই নাই। অণু থেকে অণু তুমি, মহান থেকে অতি মহান তুমি। এই তুমির প্রকাশ ঘটেছে আমির মধ্যে। আমি ছাড়া আর কিছুই নাই। আমি জীব, আমিই শিব। জীব শিবকে পূজা করে আত্মদান করে পরম তৃপ্তি লাভ করতে চায়। সেই তৃপ্তি লাভই সাধনা। সেই তৃপ্তিই ভক্তি ও মুক্তি। আমি চাই আমাকে। আমার আমিত্ব মৃগমদের মত আমারই মধ্যে লুকানো আছে, আমি তার সৌরভে প্রমত্ত হয়ে দশদিকে ঘুরে বেড়াই। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড খুঁজেও তাকে পাইনা। আমি আমাকে খুঁজে পাইনা বলেই কত নাম ধরে তাকে ডাকি। প্রবৃত্তি ও আসক্তি যখন যেমন নির্দেশ করে, তখন তাকে সেই নাম ধরে ডাকি। আমি যদি নিজেকে চিনতে পারি তবে তোমাকে চিনতে পারব। যতক্ষণ আমি আমাকে চিনতে পারব না, ততক্ষণ তোমাকেও চিনতে পারব না। ফলে তুমি আমি স্বতন্ত্র থাকবে। আমি তোমার পূজা করি, সেবা করি, উপাসনা করি— এটিই প্রকৃত সাধনা। এই সমগ্র বিশ্ব জগতে তুমি ছাড়া অন্য কোনো সৃষ্টিকর্তা বা পরমেশ্বর নাই।

ভারতীয় পুরাণ ও অন্যন্য ধর্মীয় গ্রন্থের আমিত্ববাদের সঙ্গে অন্যান্য ধর্মের মিল

লক্ষ্য করা যায়। উপেন্দ্রকিশোর সম্পাদিত গ্রন্থের পুরাণেরকথায় যে সমস্ত গল্প বর্ণিত আছে; তাতে গল্পের মধ্য দিয়ে মুনি— ঋষিদের শিব, বিষ্ণু বা স্রষ্টাকে পাবার জন্য যে ত্যাগের পরিচয় পাওয়া যায় তা অন্যান্য ধর্মের মধ্যেও আছে। সাধক বা মুনিরা যেমন স্রষ্টাকে পাবার জন্য জীবনের বস্তুগত ও ইন্দ্রিয়গত সুখ বিসর্জন দিয়েছেন তেমনি ত্যাগের মহিমা অন্যান্য ধর্মের মধ্যেও পাওয়া যায়। যেমন ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মুহম্মদ (সঃ) স্রষ্টার প্রেমের চরম পরীক্ষা দিতে একাধারে প্রায় পঁচিশ বৎসর ধ্যান সাধনা করেছেন। খ্রিষ্টধর্মের প্রবর্তক যীশু খ্রিষ্ট ও বৌদ্ধ ধর্মের গৌতম বুদ্ধের বেলাতেও একথা সমান প্রযোজ্য। পৃথিবীতে যত মহাজ্ঞানীজন এসেছিলেন তাঁরা সবাই ত্যাগ ও কঠোর ধ্যান সাধনার মাধ্যমে পরমসত্তাকে লাভ করার প্রয়াস পেয়েছেন। মুসলমানদের ধর্মীয় গ্রন্থ কুরআন শরীফের সুরা হাদিদে পরম সত্তার পরিচয়দান প্রসঙ্গে বলা হয়েছে :

> 'পূর্ব ও পশ্চিম সবদিকই আল্লাহরই সুতরাং যেদিকই মুখ ফিরাও, সে দিকই আল্লাহর দিক। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ।' [১০]

অর্থাৎ আমরা যেদিকেই তাকাই সেই দিকেই আল্লাহর প্রকাশরূপ দেখতে পাই। এভাবে আল্লাহ সর্বব্যাপী। সূরা হামীম সেজদাহ এ বলেছেন :

> 'আমি বাহ্য জগতে এবং তাহাদের দেহ ও আত্মার মধ্যে আমার নিদর্শন সমূহ তাহাদিগকে দেখাইয়া থাকি, যাহার ফলে নূরানী তত্ত্ব সমূহ তাহাদের জন্য প্রকাশিত হয়।' [১১]

সৃষ্টিকর্তা তাঁর নূরানী সত্তাদিয়ে সমগ্র জগৎ সৃষ্টি করেছেন, তাই বিশ্বের প্রতিটি বস্তু কণা স্রষ্টার অংশ। তিনি আগুন, মাটি পানি ও বাতাস বা নিজের জাত নূর দ্বারা আদম বা মানুষকে সৃষ্টি করে নিজের সেফাত নূর বা নূরে মুহম্মদ তার মধ্যে প্রবেশ করিয়েছেন। মানুষ সৃষ্টি সম্পর্কে সূরা বাকারায় স্রষ্টা আরো বলেছেন, তিনি নিজ রূহ হতে রূহ বা আত্মা ফুঁকে দিয়েছেন। তাই তিনি সূরা হাদীদে বলেছেন :

> 'তোমরা যেখানেই থাকো না কেন আল্লাহ তোমাদের সঙ্গে আছেন, তিনি সবকিছু দেখেন।' [১২]

পরম সত্তার এই পরিচয়ের মধ্যেই নিহিত আছে সৃষ্টি সত্তার পরিচয়। তাই আত্মা বা নিজেকে অনুসন্ধান করলেই এই পরম সত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। সমগ্র বিশ্বের মধ্যে তিনি ছাড়া যে আর কেউ নেই, তার বড় প্রমাণ 'কালেমা ত্যাইয়েবা'—লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু অর্থাৎ সমগ্র সৃষ্টিতে তিনি ছাড়া অন্য কোন পরমেশ্বর নেই। এই স্রষ্টার প্রকাশ বিভিন্ন নামে, বিভিন্ন ভাবে। আমার মধ্যেই আছেন তিনি, তাই তুমি আমি এবং আমিই তুমি। এটিই সৃষ্টির একমাত্র মন্ত্র। পৃথিবীর সব ধর্মের মূল মন্ত্র এটিই। স্রষ্টার এই পরিচয় উদঘাটনই প্রকৃত ইবাদত। পরম সত্তার প্রকৃত পরিচয় অনুসন্ধানের জন্য চাই প্রেমময় উপলব্ধি। নিজের আত্মার পরিশুদ্ধি। সূরা শাম্‌শে স্রষ্টা বলেছেন :

'সেই সফলকাম যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করিয়াছে, ব্যর্থ আচ্ছন্ন কারীই।' [১৩]

পরম প্রেমিকের সাথে মিলনের একমাত্র পথ নিজের আত্মার বিশুদ্ধতা, তপস্যা বা ধ্যানে বসে জিকির বা সার্বক্ষণিক জপ করে তা অর্জন সম্ভব। এই জন্য স্রষ্টা সূরা আনকাবুতে জিকির বা জপকে সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে :

> 'তুমি (মুহম্মদ) তোমার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট গ্রন্থ আবৃত্তি কর কারণ নামায প্রতিষ্ঠা কর, কারণ নামায অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। আর আল্লাহর জিকিরই সর্ব শ্রেষ্ঠ ইবাদত, তোমরা যা কর আল্লাহ তা জানেন।'[১৪]

তপোবনে বা আশ্রমে মুনি-ঋষিগণ যা করেন এটিও সেই স্রষ্টার স্মরণ। এর মাধ্যমে পরম সত্তাকে নিজের মধ্যে উপলব্ধি করা যায়। স্রষ্টার অবস্থান সর্বদা সর্বত্র। কালেমা তৈয়াবাতে সেই কথাই বলা হয়েছে। এই জন্য কালেমা তৈয়াবার জিকির সর্ব শ্রেষ্ঠ। স্রষ্টা সূরা ইব্রাহীমে বলেন :

> 'তুমি কি লক্ষ্য কর না আল্লাহ কিভাবে উপমা দিয়ে থাকেন? সৎ বাক্য লা ইলাহাইল্লাল্লাহর তুলনা উৎকৃষ্ট বৃক্ষের মত যার মূল সুদৃঢ় ও যার শাখা-প্রশাখা উর্ধ্বে বিস্তৃত, যে প্রত্যেক মৌসুমে তার প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে ফলদান করে। এবং আল্লাহ মানুষের জন্য উপমা দিয়ে থাকেন যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করে। যারা এই সত্য বাক্য বা শাশ্বত বাণীতে বিশ্বাসী, তাদের ইহজীবন ও পরজীবনে আল্লাহ সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন।' [১৫]

সুফী গুরু, মুন-ঋষি বা সাধক ব্যক্তিগণ এই সুপ্রতিষ্ঠাকে স্রষ্টার সঙ্গে মিলন এবং স্রষ্টাতে বিলীন হওয়াকে বুঝে থাকেন। এটিই প্রকৃত মোক্ষলাভ বা মুক্তি পাওয়া। স্রষ্টা কুরআন শরীফে স্পষ্ট বলেছেন, প্রত্যেক নফসের মৃত্যু ঘটবে অর্থাৎ আগুন, পানি ও বাতাস দ্বারা তৈরি সৃষ্টি ধ্বংস হবে, কিন্তু আল্লাহর প্রকাশ রূপ বা আত্মার কোনো বিকাশ নেই।[১৬] ধ্যান সাধনার মাধ্যমে এই আত্মাকে পরিশুদ্ধ কবতে পারলেই পরমাত্মার মধ্যে মিলে গিয়ে জীব ও জড় দেহের মধ্যে পরিক্রমণের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। পৃথিবীর সব ধর্মের মহামানবগণ এই তত্ত্বই সমাজে প্রচার করেছেন।

'উপেন্দ্র কিশোর সমগ্রে' সংগৃহীত 'পুরাণের গল্প এবং মহাভারতের কথা' গ্রন্থে যে সব গল্প বর্ণিত হয়েছে সেখানে প্রাধান্য লাভ করেছে ধর্মীয় প্রসঙ্গ। এইসবগল্পে মুনি বা সাধকদের ভূমিকা সিদ্ধ পুরুষের মত। তাঁরা অত্যন্ত সৎ, ধার্মিক ও সর্বত্যাগী ঈশ্বর প্রেমিক। তাদের মাধ্যমে সূক্ষ্মভাবে ধর্মীয় মাহাত্ম্য প্রচারের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। এরা সারাজীবন ধ্যান সাধনার মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তার নৈকট্য লাভ করে থাকেন। এঁদের মাধ্যমে ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করলে সঠিক পথ পাওয়া সম্ভব। প্রত্যেক ধর্মেই পথপ্রদর্শকের পর সত্যবাদী সাধক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটেছে। তাঁরা সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানুষকে যথার্থ ধর্মীয় জ্ঞানে দীক্ষা দিয়েছেন। মুসলমানদের মধ্যেও আছেন এমন

ব্যক্তিবর্গ, যাদের বলা হয় ওলি, আউলিয়া, পীর-মুর্শিদ। এদের মাধ্যমে ধর্ম চর্চার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কুরআন শরীফের সূরা তাওবায় বলা হয়েছে:

> 'হে বিশ্ববাসীগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও।'[১৭]

অনুরূপভাবে আল্লাহ সূরা মায়িদায় বলেছেন,

> 'হে ইমানদারগণ তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং অন্বেষণ কর তাঁর নৈকট্যের উপকরণ।'[১৮]

অর্থাৎ আল্লাহকে পেতে হলে সিদ্ধ পুরুষদের সাহচর্য লাভ করতে হবে। সূরা নেসায় আল্লাহ বলেছেন :

> 'হে মুসলমানগণ! তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের আনুগত্য কর।' [১৯]

এই নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গই সত্যবাদীগণ। তাদের বিভিন্ন ধর্মে সাধক, মহাপুরুষ, মুনি, ঋষি, ওলী-আউলিয়া বলা হয়েছে। এঁরাই সৃষ্টির সেরা। আল্লাহ বলেন :

> 'যারা স্রষ্টাকে বিশ্বাস করে এবং সৎ কাজ করে তারাই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ।'[২০]

পাকরূহ সম্পর্কে পবিত্র ইঞ্জিল শরীফে বর্ণিত আছে ঈশা (আঃ) বলেছেন, ভাইয়েরা আমি চাই না যে, পাক রূহের দেওয়া দান সম্বন্ধে তোমাদের অজানা থাক। তোমরা জান, যখন তোমরা আল্লাহর এবাদত করতে না, তখন এমন সব মূর্তির দিকে তোমাদের টেনে নিয়ে যাওয়া হত যারা কথা বলতে পারে না। আমি তোমাদের জানাচ্ছি, আল্লাহর রূহের দ্বারা কথা বললে কেউ বলে না, ঈশার উপর বদদোয়া পড়ুক। একই পাকরূহের দেওয়া বিশেষ দান ভিন্ন ভিন্ন রকমের। আমরা ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে একই প্রভুর সেবা করি। আমাদের প্রত্যেককে ভিন্ন ভিন্ন কাজ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু একই আল্লাহ ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে কাজ করে থাকেন। সবার উপকারের জন্যই এক এক মানুষের মধ্যে এক এক রকম করে পাক রূহ প্রকাশিত হয়। কাউকে কাউকে সেই পাক রূহের মধ্য দিয়ে জ্ঞানের কথা বা বুদ্ধির কথা বলতে দেওয়া হয়। কাউকে কাউকে পাক রূহ দ্বারা বিশ্বাস, রোগ ভাল করার কেরামতি বা ক্ষমতা, নবী হিসেবে আল্লাহ কালাম বলার ক্ষমতা, ভাল কাজ করার ক্ষমতা দেন। আল্লাহ যেভাবে ইচ্ছা করেন, সেই ভাবেই এইসব দান প্রত্যেককে আলাদা আলাদা করে দেন। [২১]

মহাভারতে লিখিত আছে, সৃষ্টির পূর্বে সবকিছুই অন্ধকারময় ছিল। সমগ্র প্রক্রিয়া সম্পর্কে বলা হয়েছে :

> 'সৃষ্টির পূর্বে কেবলই অন্ধকার ছিল। তারপর প্রথমে একটি ডিম হইল। ব্রহ্মাণ্ডের সকল বস্তুর বীজ এই ডিমের ভিতরে ছিল। ডিমটি যখন ফুটিল, তখন তারার ভিতর হইতে সকলের আগে ব্রহ্মা বাহির হইলেন, তারপর ক্রমে দেব, দানব, যক্ষ, পিশাচ, পৃথিবী, জল, বায়ু, আকাশ প্রভৃতির সৃষ্টি

হইল। ব্রহ্মার অনেক পুত্র, তাহার মধ্যে মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু এবং বশিষ্ঠ এই সাতজনকে সপ্তর্ষি বলে। ব্রহ্মার বুক হইতে ধর্ম ও ভৃগু এবং তাহার পায়ের বুড়া আঙুল হইতে দক্ষের জন্ম হয়। দক্ষের পঞ্চাশটি কন্যা ছিল, মরীচির পুত্র কশ্যপ এই পঞ্চাশটির মধ্যে তেরটিকে বিবাহ করেন। সেই তেরটি কন্যার নাম অদিতি, দিতি, দনু, কালা, দনায়ু, সিংহিকা, ক্রোধা, প্রধা, বিশ্বা, বিনতা, কপিলা, মুনি ও কদ্রু। ইহারাই দেব, দৈত্য, গন্ধর্ব, অপ্সরা প্রভৃতির মাতা। [২২]

সৃষ্টি তত্ত্ব সম্পর্কে আরো বলা হয়েছে, রাক্ষস, বানর, যক্ষ, কিন্নর, পুলস্ত্য হতে সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি পুলহ হতে জন্ম গ্রহণ করেছিল। এছাড়া অন্যান্য কয়েকজনের সন্তানও প্রাণী জগতে আছে। এভাবে ক্রমে সব প্রাণীর সৃষ্টি হয়েছে। সৃষ্টির শুরুটি ছিল এই সংসারের শিশুকাল, তারপর একদিন প্রলয় এসে সমস্ত সৃষ্টি নষ্ট করে দিবে। তারপর বিধাতা নতুন সৃষ্টি করবেন। দিনের পর যেমন রাত, তেমনি সৃষ্টির পর ধ্বংস অনিবার্য। সংসারটি এক ধরনের মায়াজাল, স্রষ্টা ক্রমাগত এটি বুনছেন, বড় করছেন, আবার গুটিয়ে ফেলছেন। সৃষ্টির কালকে চারটি যুগে ভাগ করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে সত্যযুগ, ত্রেতাযুগ, দ্বাপরযুগ ও কলিযুগ। সত্যযুগের মানুষ ছিল সত্যবাদী এবং অনেক লম্বা প্রায় একুশ হাত। ত্রেতাযুগ থেকে মানুষের সংসার জীবন জটিল হতে শুরু করে। তখন মানুষ দুষ্ট ও খাটো হতে থাকে। তখন মানুষের উচ্চতা ছিল চৌদ্দ হাত। দ্বাপর যুগের মানুষের চরিত্রের ভাল ও মন্দ দু'টো ভাগ ছিল সমান। সে সময় মানুষ সাত হাত লম্বাছিল। কিন্তু শেষ যুগ বা কলিযুগের মানুষ মাত্র সাড়ে তিন হাত লম্বা। এদের চরিত্র অতিশয় নোংরা, মিথ্যার হার এত বেশি যে, যে কোনো সময় স্রষ্টা রুষ্ট হয়ে সব নষ্ট করে ফেলবেন, তখনই হবে প্রলয়। সৃষ্টি ও প্রলয় সম্পর্কে মুসলমানদের ধর্মীয় গ্রন্থ হাদীশে কুদসীতে আছে, বিশ্ব প্রতিপালক এক সময় নিজের সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না। যখন অখণ্ড অচৈতন্যের মধ্যে ছিলেন, তখনও তিনিই ছিলেন একক সাঁই রূপে। এইরূপটি কেমন তা দেখতে এক সময় ইচ্ছে হলে তিনি নিজের মধ্যে প্রেম সত্তার জন্ম দিলেন। তাঁর নাম হল কাদেরগণী, এরপর মহাশক্তির আধার রূপে বা কূয়াকারে কুয়াশারূপ ধরে গুপ্ত জ্ঞান ও ধনাগারেই রইলেন। দীর্ঘকাল অতিক্রমের পর সেখানে আচমকা এক মায়াময় রূপ দেখলেন। তখন আকর্ষণ অনুভব করলে দয়াময় নিজেই নিজেকে খণ্ডন করলেন। ফলে জাত হতে সেফাত নূর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সূরা নূর এর পঁয়ত্রিশ আয়াতে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রেম বা মহব্বতে সৃষ্টি মুহম্মদী নূরের সাথে জাত নূরের শুরু হল অভিনয়। সৃষ্টির মধ্যে শুরু হল আল্লাহর লুকোচুরি খেলা। 'আমানইল্লামালাউনা হুমাকুম' কুরআনের এই আয়াতের গভীর তত্ত্ব বিশ্লেষণ করলে সৃষ্টির এই সত্য উদঘাটন করা সম্ভব। সৃষ্টির শুরুতে স্রষ্টা নৈরাকার অবস্থায় একটি ডিমের আকার তৈরি করে পাক পাঞ্জাতন সৃষ্টি করে তার মধ্যে গোপন রইলেন।

এর বাহিরের আবরণ হচ্ছেন জগৎ জননী মা ফাতেমা বা আদ্যাশক্তি, যার উল্লেখ প্রত্যেকটি ধর্মীয় গ্রন্থে উল্লেখ আছে। এই ডিমের পাতলা পর্দা রূপে আছেন ইমাম হাসান ও ইমাম হোসেন। ডিমের কুসুম সাদৃশ্য হচ্ছেন মুহম্মদ ও আত্মারূপে আছেন আল্লাহ স্বয়ং। সেখানে থাকা অবস্থায় এক সময় হা, হু, হে শব্দ করলে ডিম ফেটে যায়। এভাবে আকাশ পাতাল জমীন সৃষ্টি করলেন, তিনি খালেক বা সৃষ্টিকর্তা রূপ ধারণ করলেন। সৃষ্টির শুরু যে ডিম থেকে তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ এখন সমগ্র সৃষ্টি প্রক্রিয়া ডিম বা ডিম্বানু থেকে শুরু হচ্ছে। সৃষ্টির শুরুতে আকাশ ও পৃথিবী জড়ানো ছিল। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌ বলেন :

> 'কাফেররা কি দেখে না যে, আসমানসমূহ জমিল ছিল জড়ানো, পরে আমি তাদিগের উভয়কে সবেগে পৃথক করিয়াছি; এবং পানি দ্বারা প্রত্যেক প্রাণবান বস্তু পয়দা করিয়াছি; এতদসত্ত্বেও কি ওরা ঈমান আনিবেনা?'[২৩]

এই পানি হচ্ছে বীর্য এবং এর মধ্যে থাকা শুক্রানু যা ডিম্বানুর সঙ্গে মিলিত হয়ে সৃষ্টি শুরু করে। এভাবে তিনি আঠারো হাজার মাখলুকাত সৃষ্টি করেন। এরপরেও তিনি গুপ্ত অবস্থায় রয়ে গেলেন। আল্লাহ নামটি তাঁর সবগুলো গুণের যোগফল হিসেবে বিবেচিত। তিনি এই বিশ্ব চরাচরে সর্বত্র বিদ্যমান। তিনি একদিকে 'কুল্লে শাইন এবং অপর দিকে কুল্লে মুহিত। অর্থাৎ তিনি আকার-সাকার-নিরাকার। তিনি একই সাথে স্বপ্রকাশিত আবার দৃষ্টি বহির্ভূত। অর্থাৎ তিনি একই সাথে সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে বিরাজ করছেন, আবার আরশে মওলায় বা সিংহাসনেও বসে আছেন, একই সাথে বিদ্যুৎ যেমন বিদ্যুৎ কেন্দ্রেও থাকে, আবার গ্রাহকদের নিকটেও থাকে। আল্লাহ্‌ প্রথমে ডিম্বরূপে ছিলেন, এরপর ময়ূররূপ ধারণ করলেন। তখন সেই ময়ূরের গনহা ছিলেন পাক পাঞ্চাতন বা পঞ্চশক্তিরূপ। বর্তমানে এই পঞ্চশক্তি বা হাতের পাঁচ আঙুলের মাধ্যমে স্রষ্টা সমগ্র বিশ্বকে গতিশীল রেখেছেন। তিনি দীর্ঘদিন ময়ূর রূপে থাকার পর আদম রূপে প্রকাশ পেতে চাইলেন। তাই তিনি আদমকে সৃষ্টির সেরা করে সৃষ্টি করলেন। কুরআন শরীফে তিনি এই ঘোষণা দিলেন।

> 'এবং তিনি আদমকে যাবতীয় নাম শিক্ষা দিলেন, তারপর সে সকল ফেরেশতাদের সামনে পেশ করলেন এবং বললেন, তোমরা এ সমুদায়ের নাম আমাকে বলে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। তারা বলিল মহান পবিত্রময় আমাদের তো কোন জ্ঞান নেই যা আপনি আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন। তাছাড়া নিশ্চয়ই আপনি মহাজ্ঞানী। তিনি বললেন, হে আদম ওদের (ফেরেশতাদের), এদের (সকলের) নাম বলে দাও, যখন সে (আদম) তাদেরকে নাম সমূহ বলেছিল, তিনি বললেন আমি কি বলি নিয়ে, সমগ্র আসমান ও যমিনের অদৃশ্য বস্তু সম্বন্ধে আমি অবহিত এবং তোমবা যা ব্যক্ত কর বা যা গোপন রাখ নিশ্চিভাবে আমি তাও জানি।' [২৪]

আদমের প্রকৃত নাম আদম শফিউল্লাহ বা জ্ঞান ভাণ্ডার। আল্লাহর অখণ্ড নূর থেকে বিশ্বজগৎ ও আদমের মধ্যে প্রকাশের প্রয়োজনে আর একটি নূর সৃষ্টি করলেন (সূরা নূর ৩৫), যার নাম নূরে মুহম্মদ বা প্রশংসাকারী। অর্থাৎ তিনি জাত নূও, নূরে মুহম্মদ বা সেফাত নূর (গুণবাচক নূর) হয়ে আদমের মধ্যে প্রবেশ করলেন। তাই সূরা বাক্কারায় আলিফ-লাম-মীম বলতে অনেক সাধন আল্লাহ রাসূল ও আদমকে বুঝেন। নূর মুম্মদ আল্লাহর সত্তার অংশ তিনি সমগ্র মানবজাতির পথ প্রদর্শক হিসেবে বিশ্ব সৃষ্টির পূর্বেই সৃষ্টি হয়েছেন। তাই কুরআন শরীফে আল্লাহ মুহম্মদ (সঃ) কে বলেছেন :

> 'হে মুহম্মদ! আমি তোমাকে বিশ্বজগতের প্রতি রহমত ও সমগ্র মানব জাতির পথ প্রদর্শক রূপে প্রেরণ করেছি।' [২৫]

আদমকে আগুন, পানি, মাটি ও বাতাস দিয়ে তৈরির পরও তার সৃষ্টি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়নি। অর্থাৎ আদম জীবন্ত ছিল না, আল্লাহ যখন তার নিজের রূহ আদমের মধ্যে ফুকে দেন (সুরা বাকারাহ) তখন আদম প্রাণ পেলেন ও চলা ফেরার শক্তি পেলেন। ফুকে দেওয়া এই রূহই নূরে মুহম্মদ যা সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে বিরাজ করছে। তাই তিনি সমগ্র সৃষ্টির রহমত। এছাড়া সমগ্র দানব জাতির দৈহিক কাঠামোর মধ্যে আত্মারূপে অবস্থান করছেন। তাই আল্লাহ বলেছেন, হে মুহম্মদ কিয়ামতের দিন তোমার সুপারিশ ছাড়া কেউ বেহেশত বা শুভ কিছু পাবে না। কারণ, যিনি প্রত্যেকটি মানুষের কর্ম দেখেন, তিনিই একমাত্র ভাল বা মন্দ বলার অধিকার রাখেন। তিনি প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে আছেন তাই সুপাবিশ করতে পারবেন। মুহম্মদ (স:) একটি নূরের নাম, তিনি ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে আরবদেশে মানুষ রূপে জন্ম গ্রহণ করলেও তাঁর কোনো ছায়া ছিলনা। নূরের তৈরি হওয়া জন্য ছায়া নেই, মাটির তৈরি হলে ঠিকই ছায়া পডত। নূরের তৈরি হওয়ার জন্যই বিশ্বের সব সৃষ্টির মধ্যে চিরকাল থাকবেন।

মুসলমানদের ধর্মীয় গ্রন্থের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সূরা হচ্ছে সূরা ফাতেহা। এই সূরায় মুম্মদ (স:) আমাদের সবাইকে সহজ-সরল-পথে পরিচালিত হওয়ার জন্য প্রার্থনা জানিয়েছেন। মুসলমানরা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের প্রতিরাকাতে এই সূরা বাধ্যতামূলক ভাবে পাঠ করে। হযরত আদম (আ:) থেকে শুরু করে পৃথিবীর প্রত্যেকটি ধর্মের যত মহৎজন বা মহাজ্ঞানীজন এসেছিলেন তারা সবাই এই পথের পথিক ছিলেন। অর্থাৎ সত্য পথ মূলত একটিই, সবাইকে সেই পথে চলতে হবে।

পরিশেষে বলা যায়, মহান ও পরম সত্তা বা একক সত্তা থেকে প্রথমে দ্বিতীয় সত্তা এবং এই দ্বিতীয় সত্তা থেকে সমগ্র বিশ্ব সত্তার আবির্ভাব হয়েছে। এবং সে প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে। স্রষ্টা সৃষ্টির মধ্যে সেফাত বা গুণ বাচক নূরের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়ে চলেছেন। তিনি যুগে-যুগে বিভিন্ন জাতিতে-জাতিতে ভিন্ন-ভিন্ন নামে প্রকাশিত হয়েছেন। এটিই হচ্ছে সর্বেশ্বরবাদ, যা হিন্দু, ইসলাম ধর্মের সূফীগণ ও অন্যান্য ধর্মেও অনুসাবীরা বিশ্বাস করে থাকেন। সর্বেশ্বরবাদের মূল কথা হল জৈব-অজৈব সব কিছুই

ঐশ্বরিক এবং পবিত্র। তাই হিন্দুরা গাছ, সূর্য, চন্দ্র, জীবজন্তু, এমনকি মানব প্রজাতির মধ্যেও ঈশ্বরের প্রকাশ মনে করেন। উপেন্দ্রকিশোর রচনা সমগ্রের 'পুরাণ' ও 'মহাভারতের কথা' গ্রন্থের গল্পগুলোয় গূঢ় তত্ত্বের সাথে তাই অন্যান্য ধর্মের মূল চিন্তা ধারার ঐক্য লক্ষ্য করা যায়।

তথ্য নির্দেশ :

১। আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোকশ্রুতি, দ্বিতীয় প্রকাশ, কলকাতা, ১৯৮৫,পৃষ্ঠা, ৯।

২। সুনীল জানা সংকলিত ও সম্পাদিত 'উপেন্দ্র কিশোর সমগ্র,' বিষ্ণুর অবতার (গল্প), প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ২০০১, পৃষ্ঠা ২৩৯।

৩। সূরা হুদ, আয়াত ৩৭ থেকে ৪৪ পর্যন্ত।

৪। সুনীল জানা সংকলিত ও সম্পাদিত উপেন্দ্র কিশোর সমগ্র, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৭৩।

৫। তদেব, পৃষ্ঠা ২৭৫।

৬। সূরা হুদ, আয়াত ৭।

৭। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, তন্ত্র পরিচয়, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১০১।

৮। তদেব, পৃষ্ঠা ১০।

৯। সূরা হাদীদ, আয়াত ৩।

১০। সূরা বাকারাহ, আয়াত ১১৫।

১১। সূরা হামীম সেজদাহ, আয়াত, ৫৩।

১২। সূরা, হাদীদ ৪

১৩। সূরা, শামস্ আয়াত ৯ এবং ১০।

১৪। সূরা আন কাবূত, আয়াত ৪৫।

১৫। সূরা ইব্রাহীম, আয়াত ২৪ থেকে ২৮।

১৬। সূরা আম্বিয়া, আয়াত ৩৫।

১৭। সূরা তাওবাহ, আয়াত ১১৯।

১৮। সূরা মায়িদাহ, আয়াত ৩৫।

১৯। সূরা নেসা, আয়াত ৫৯।

২০। সূরা বাইয়িনাহ, আয়াত ৭।

২১। ইঞ্জিল শরীফ (বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি কর্তৃক অনূদিত) ৭ম সিপারা : ১, করিন্থীয়, পৃষ্ঠা ৩৪০।

২২। সুনীল জানা সংকলিত ও সম্পাদিত উপেন্দ্রকিশোর সমগ্র, পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ২৭১।

২৩। সূরা আম্বিয়া আয়াত ৩৩।

২৪। সূরা বাকারাহ আয়াত ৩৩ ৩৪।

২৫। সূরা সাবা, আয়াত ২৮।

পৌরাণিক কাহিনির লৌকিক রূপান্তর

প্রণয় কুমার কুণ্ডু

মেটামরফোসিস বলতে বোঝায় আকৃতির রূপান্তর বা পরিবর্তন। ইংরাজি শব্দটির দেখা পাই ১৫৩৩ খ্রিষ্টাব্দে, ইংরাজিতে। লাতিন গ্রীক ফরাসীতেও শব্দটি আছে। অবিশ্যি তার বানান ও উচ্চারণ আলাদা। ১৫৩৩ খ্রিষ্টাব্দের আগে শব্দটি প্রায় অজানা ছিল। কিন্তু কাফকা যখন এই নামে একটি গল্প লিখলেন, তখন সারা বিশ্বে সাড়া পড়ে গিয়েছিল। এবং তখন থেকেই শব্দটি খুবই পরিচিত হয়ে উঠেছে, নানা ক্ষেত্রে ও প্রসঙ্গে এখন শব্দটির ব্যবহার হয়ে থাকে।

কাফকার মেটামরফোসিস গল্পটির বিষয়বস্তু আসলে একটি রূপান্তরের কাহিনী। লেখক একদিন ভোরে ঘুম থেকে উঠেই বুঝতে পারলেন যে তিনি আর মানুষ নন, হ'য়ে পড়েছেন একটি কক্রোচ বা আরশোলা। সেই অবস্থায়, লেখকের মানসিক প্রতিক্রিয়া কীভাবে ঘটেছিল— তাই নিয়ে গল্পটি রচিত। মানুষ থেকে আরশোলায় রূপান্তর : বিষয়বস্তুর দিক থেকে গল্পটি এক কথায় অসাধারণ ও অতুলনীয় এক সৃষ্টি। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধে বিধ্বস্ত য়ুরোপীয় সমাজ-জীবনে দেখা দিয়েছিল এক নেতিবাচক চিন্তাধারা— যার প্রভাব পড়েছিল সাহিত্যে ও শিল্পে এবং দর্শনেও। এর ফলে উদ্ভূত হয়েছিল অস্তিত্ববাদ, পরা-বাস্তবতাবাদ, অযৌক্তিকতাবাদের মতো নেতিবাচক দার্শনিক তত্ত্ব। এবং এইসব চিন্তাধারাকে আশ্রয় করে লেখা হয়েছিল কাব্য গল্প-উপন্যাস নাটক। ছবির জগতে এসেছিলেন পিকাসো। কাফকার মেটামরফোসিস যে তারই ফসল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। বাহ্যত এই গল্পের বিষয়বস্তু নিছক কাল্পনিক বলে মনে হ'তে পারে। কিন্তু গল্পটির এক গভীরতর অর্থ আছে। তা হচ্ছে— একটি বস্তুর বা ঘটনার রূপান্তর ঘটা একটা স্বাভাবিক প্রবণতা, যা' শুধু মানবজীবনের ক্ষেত্রেই নয়— সাহিত্যের ক্ষেত্রেও যা' প্রযোজ্য।

কাফকার গল্পের মেটামরফোসিস অর্থাৎ এক ব্যক্তি জীবনের আরশোলায় রূপান্তরের ব্যাপারটা অবাস্তব মনে হ'তে পারে। কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই রূপান্তর কল্পনা নয়। তা বাস্তব ঘটনা। প্রাচীন পৌরাণিক কাহিনীগুলির দিকে লক্ষ্য রাখলেই তা বোঝা যায়। শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিক্রম করে পৌরাণিক কাব্যের কাহিনীগুলি কীভাবে লৌকিক কাহিনীর রূপ পরিগ্রহ করেছে তা প্রকৃতপক্ষে সাহিত্যচর্চার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বলা বাহুল্য, পৌরাণিক কাব্য ও লৌকিক সাহিত্যের অবস্থান স্বতন্ত্র ও বিপরীতমুখী। দেখা যাচ্ছে, কাল থেকে কালান্তরে পৌরাণিক কাহিনী রূপান্তরিত

হ'তে হ'তে একসময় লৌকিক রূপ ধারণ করেছে। এবং তার ভিতর দিয়ে লোকসংস্কৃতি তথা লোকসাহিত্যের একটি বিশিষ্ট রূপ সৃষ্টি হয়েছে যা আলোচ্য বিষয় হিসেবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়।

প্রাচীনকালে যখন পুরাণের কাহিনীগুলি রচিত হয়, যার মধ্যে মহাকাব্যও ছিল, তার বিছনে একটা উদ্দেশ্য রয়ে গেছে। সেই উদ্দেশ্য হচ্ছে— দেব-দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করা। পুরাণের কাহিনী বা রামায়ণ—মহাভারতের কাহিনীর পর্যালোচনা করলেই তা বোঝা যায়। সেই প্রাচীনকালে প্রকৃতির নানা ক্রিয়ার দিকে লক্ষ্য রেখে এক একটি শক্তিধর দেব-দেবীর কল্পনা করা হয়েছিল : ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর থেকে শুরু করে অগ্নি ইন্দ্র বরুণ নারদ এমনকি শনির মতো দেবতার কথা ভেবেছিলেন প্রাচীন ঋষিরা। পাশাপাশি, মহিষাসুর বধের জন্যে দশ প্রহরণ ধারিণী দুর্গার রূপও কল্পনা করা হয়েছিল। সর্বোপরি ছিল ঈশ্বরের চিন্তা। তাঁকে নিয়ে সাকার-নিরাকারের প্রশ্ন উঠেছিল। ঈশ্বর ও দেব-দেবীর অস্তিত্ব নিয়ে নানান দার্শনিক তত্ত্বের উদ্ভব হয়েছিল। এবং ঐসব দেব-দেবীর মহিমা প্রচার করাই ছিল পুরাণ ও মহাকাব্য রচনার মুখ্য প্রেরণা।

প্রাচীন ভারতীয় পুরাণ ও মহাকাব্যের মধ্যে বেশ একটা মিল আছে। প্রাচীন ভারত ও গ্রীসে একাধিক দেবতা ও দেবীর কল্পনা করা হয়েছে তাদের পুরাণে ও মহাকাব্যে। ভারতীয় পুরাণের মতো গ্রীক-পুরাণে ভেনাস, এথেনা, আফ্রোদিতে, জুপিটার, হারকিউলিসের মতো দেব-দেবীর চিত্র দেখতে পাই। পাশাপাশি, রাম-সীতার মতো প্যারিস-হেলেনের মতো আদর্শ মানব-চরিত্রকেও তুলে ধরা হয়েছে গ্রীক পুরাণে। বস্তুত, প্রাচীন দু'টি দেশের সমস্ত পৌরাণিক কাহিনীর উদ্দেশ্য ও অন্বিষ্ট ছিল একই। সাধারণ মানুষের কাছে পুরাণগুলি মূল্যবান, কারণ পুরাণ-পাঠের ভিতর দিয়ে তাঁরা নিজেদের জীবনকে উচ্চস্তরে নিয়ে যেতে চাইবেন। আমরা যাকে ভারতীয়তা বলি - তার ভিত্তিস্থাপন করেছে আমাদের পুরাণগুলি, বিশেষত রামায়ণ ও মহাকাব্য। মাইকেল মধুসূদন বলেছিলেন যে তিনি হিন্দুধর্মের পরোয়া করেন না, কিন্তু আমাদের 'প্রাপ্ত মাইথোলজিগুলি ছিল তাঁর খুবই প্রিয়। ভারতীয় জীবনধারায় বিধি-বিধান ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের পার্থক্য ও বৈচিত্র্য সত্ত্বেও একটা ঐক্য থেকে গেছে। সেই ঐক্য রচনা করেছে পুরাণ ও রামায়ণ মহাভারত। সমগ্র ভারতে এইভাবেই পৌরাণিক মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত ও স্বীকৃত হয়ে এসেছে যুগে যুগে।

বলা বাহুল্য, কালক্রমে পৌরাণিক কাহিনীর জনপ্রিয়তা হ্রাস পেতে থাকে। তার সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই তাদের শুদ্ধিও বিনষ্ট হতে শুরু করে। ঘটতে থাকে বিকৃতি। পাশাপাশি, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এক একটি আঞ্চলিক লৌকিক সংস্কৃতির উদ্ভবের ফলে পৌরাণিক কাহিনীগুলি আঞ্চলিক সংস্কৃতির সঙ্গে মিশে গিয়ে এক একটি নতুন লৌকিক কাহিনীতে রূপান্তরিত হয়েছিল। কালক্রমে এমন অবস্থা দাঁড়ায় যে

রূপান্তরিত কাহিনীগুলি পৌরাণিক কাহিনীর তুলনায় জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। স্বভাবতই লৌকিক জীবনের সঙ্গে তার যোগ ছিল নিবিড়। সেই রূপান্তরের শিকড় প্রোথিত হয়েছিল নিঃশব্দে। বহু শতাব্দী ধরে। অবশেষে, পৌরাণিক ও লৌকিক কাহিনীর ধারা পাশাপাশি পৃথকভাবে প্রতিভাত হয়ে ওঠে।

পৌরাণিক কাহিনী তথা রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী অঞ্চল বিশেষে কীভাবে নবরূপে লৌকিক রূপ ধারণ করেছে তার কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যাক্। একথা অজানা নয় যে সংস্কৃত ভাষায় রচিত মহাকাব্য দুটি ভারতবর্ষের মুখ্য সব ভাষাতেই অনুবাদের ছদ্মবেশে প্রকাশিত হয়েছে। তাতে দেখা যায়— অনুবাদকমূলক সব রচনাতেই মূলকাহিনীর মধ্যে অনেক আঞ্চলিক লোক-কাহিনী জুড়ে দেওয়া হয়েছে। তার ফলে পৌরাণিক কাহিনী শুধু যে নতুন রূপ ও মাত্রা পেয়েছে তাই নয়— তার সঙ্গে রাম লক্ষ্মণ সীতা রাবণ বিভীষণ প্রমুখ চরিত্রগুলি তাদের মূল চাবিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনেকাংশে হারিয়ে ফেলে লৌকিক চরিত্রে রূপান্তরিত হয়েছে। এবং পৌরাণিক মাহাত্ম্য বহুল পরিমাণে অবলুপ্ত হয়ে গেছে। কালিদাস ও ভবভূতি রামায়ণের অনুসরণে লিখেছেন রঘুবংশ ও উত্তররামচরিত। কিন্তু তাঁরা মূল রামচরিত্র থেকে খুব একটা সরে আসেননি। রামচরিত্রের মাহাত্ম্য তাঁদের রচনায় প্রায় অটুট থেকে গেছে এবং পৌরাণিক বিশালতাও ক্ষুন্ন হয়নি। কিন্তু পরবর্তী কালে মূল রচনার প্রতি আনুগত্য হ্রাস পেয়েছিল। দক্ষিণ ভারতীয় ভাষায় রচিত রামায়ণ মহাভারত সম্বন্ধে আমার জ্ঞান খুবই সীমিত। তবে দেখেছি, কেরালার কথাকলি নৃত্যে রামায়ণের কাহিনীর আবশ্যিক একটা ভূমিকা আছে। যেমন, এই নৃত্যশৈলীতে রচিত জটায়ু বধ-এর উপস্থাপনা অনেকাংশেই স্বতন্ত্র।

একই কথা খাটে বাংলা রামায়ণ-মহাভারতের ক্ষেত্রে। কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাস তাঁদের অনুবাদমূলক রচনায় প্রচুর স্বাধীনতা নিয়েছেন। তাঁরা এমন সব উপ-কাহিনী সংযোজন করেছেন যেগুলি মূলকাব্যে নেই এবং যা লৌকিক কাহিনী ছাড়া আর কিছু নয়। ফলে, এঁদের কাব্যের কাহিনী যেমন মূলকাহিনী থেকে সরে গেছে, তেমনি রাম-সীতা, যুধিষ্ঠির অর্জুন ভীষ্ম দ্রৌপদী প্রমুখ চরিত্র এমনভাবে রূপান্তরিত হয়েছে যাতে তাদের আমরা আমাদের পারিবারিক সীমানায় অনায়াসে স্থাপিত করতে পারি। যেন তারা আমাদের পারিবারিক আত্মীয়। বলাবাহুল্য, এর পিছনে নিহিত আছে লৌকিক কৃষ্টির প্রভাব। তুলসীদাসের ও ভানুভক্তের রামায়ণ সম্বন্ধে একই কথা প্রযোজ্য।

মহাভারতের কৃষ্ণ সম্ভবত মহাকাব্যটির কেন্দ্রীয় চরিত্র। কেননা, চরিত্রটি যে শুধুমাত্র কুরু-পাণ্ডবের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে তাই নয়, এই মহাকাব্যের ঘটনাবলীর মধ্যে কৃষ্ণের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়ে গেছে। এহেন চরিত্রের যে রূপান্তর ঘটেছে তা বিস্ময়কর। মহাভারতের কৃষ্ণ মহাকাব্যটির আঞ্চলিক সংস্করণে বিচিত্ররূপে দেখা

দিয়েছেন। বৈষ্ণব সাহিত্যে তথা পদাবলীতে যে কৃষ্ণকে দেখি তা পৌরাণিক চরিত্রের তুলনায় সম্পূর্ণরূপে পৃথক এক চরিত্র। বৈষ্ণব সাহিত্যের বা পদাবলীর কৃষ্ণ মথুরা-বৃন্দাবনের গোপ সম্প্রদায়ের নায়ক, একই সঙ্গে ষোলশ গোপিনীর নাগর। তারা যখন যমুনার জলে চান করতে নামে পরণের পোষাক-আসাক খুলে ফেলে, ডাঙায় রাখা সেইসব কাপড়-চোপড় নাগর কৃষ্ণ লুকিয়ে রেখে গাছে উঠে আড়াল থেকে সেইসব নগ্ন গোপ-রমণীদের জল-ক্রীড়া দেখতে থাকে। এই দৃশ্যের কথা মনে পড়লে টিনা রোট্রোর আঁকা 'ঝোঁপের আড়াল থেকে বৃদ্ধদের স্নানার্থিনী নগ্ন যুবতীদের দেখা ' ছবিটির কথা চোখের সামনে ভেসে ওঠে, এমনকি 'বিজয়িনী' কবিতার কথাও মনে হ'তে পারে। আবার, অন্যত্র ওই কৃষ্ণ 'মাউলানী' রাধিকার প্রেমিক। শ্রীমতী রাধিকার স্বামীর নাম অনেকেই জানেন না। বেচারা আয়ান ঘোষ! স্বামীর আলিঙ্গনে ধরা না দিয়ে শ্রীমতী রাধা কৃষ্ণের 'মাউলানী' হয়েও রাত দুপুরে অভিসারে বেরিয়ে পড়ে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের জন্যে। রাধা-কৃষ্ণের এহেন প্রেমকে বৈষ্ণব পণ্ডিতরা তত্ত্বের গঙ্গাজলে শুদ্ধ করে নিয়েছেন। কোথাও আবার কৃষ্ণ হয়েছে কালা বা কালাচাঁদ এবং কালার প্রেমে পড়ে রাধা কুলত্যাগ করেছে। একালে এমন প্রেমকে অবৈধ প্রেম বলে থাকি। কিন্তু রাধা-কৃষ্ণের প্রেম হয়ে আছে স্বর্গীয় প্রেমের দৃষ্টান্ত। বলা বাহুল্য, কৃষ্ণের এই রূপান্তর সর্বাংশে ও সর্বার্থে লৌকিক রূপান্তর। এর ব্যতিক্রম দেখতে পাই বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণ-চরিত্র ব্যাখ্যায়। তিনি পৌরাণিক দৃষ্টিকোণ থেকে কৃষ্ণকে দেখেননি, দেখেছেন আদর্শ মানব-চরিত্র রূপে। কিন্তু মোদ্দা কথাটা এই যে কালান্তরে পৌরাণিক কৃষ্ণ চরিত্র তার মাহাত্ম্য হারিয়ে হয়ে উঠেছে নারীতে আসক্ত এক লৌকিক চরিত্র।

মধ্যযুগের বাংলা কাব্যের অনেকটা অংশ জুড়ে বসেছে মঙ্গলকাব্যগুলি। কাব্যগুলির উপজীব্য চণ্ডী, মনসা, ধর্ম ও অন্নদার মহিমা বর্ণনা। এই দেবীরা ও দেব আদতে ছিল পৌরাণিক। মহীশূরের চাণ্ডি পর্বতে চাণ্ডি বা চণ্ডীর মন্দির আছে, সেই চণ্ডীর মূর্তি অনেকটা দুর্গার মতো। চণ্ডীমণ্ডলের চণ্ডীর গায়ে কিন্তু পুরাণের গন্ধ নেই। অন্যদিকে, অন্নদা যে শিব-পত্নীরই নামান্তর তাতে কোন সন্দেহ নেই। দেখা যাচ্ছে, মঙ্গলকাব্যের দেব-দেবীদের যেভাবে চিত্রিত করা হয়েছে— তার মধ্যে সামান্যতম পৌরাণিকতা নেই। এমনকি এই কাব্যধারায় যে-সব কাহিনী ও অন্যান্য চরিত্র আছে— সবই লৌকিক ছাঁচে তৈরি। কালকেতু ও ফুল্লরা ব্যাধ সমাজের। ভাঁড়ু দত্ত, মুরারি শীল নীচ জাতের না হলেও নীচ প্রকৃতির তো বটে। চণ্ডীর প্রিয় পাত্র যে কালকেতু প্রাণভয়ে খড়ের গাদায় লুকিয়ে থাকে, তাকেই নায়ক রূপে দেখি চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে। এহেন বীরকে চণ্ডী দেবী সাত ঘড়া মোহর দিয়েছেন নতুন জনপদ গড়ার কাজে। যাইহোক, মঙ্গলকাব্যের পর্যালোচনায় যদি কাহিনীর প্রসঙ্গ ওঠে— তবে বলতেই হচ্ছে যে বাহ্যত দেব-দেবীকে নিয়ে লেখা হলেও এই কাব্যধারার কাহিনী প্রায় সর্বাংশেই লৌকিক ও আঞ্চলিক। এর মধ্যে পৌরাণিক উপাদান নেই বললেই চলে, যদিও চণ্ডী ঠাকরুনের

উদ্ভব হয়েছে পুরাণের দেবী থেকে।

পৌরাণিক কাহিনীর লৌকিক রূপান্তরের সবচেয়ে ভালো উদাহরণ দেবাদিদেব মহাদেব ও তদীয় পত্নী শ্রীমতী দুর্গার জীবন। মহাদেব ও শিবকে অভিন্ন মনে করা হয়। কালিদাসের কুমারসম্ভব-এ মহাদেব ও তাঁর প্রণয়-প্রার্থী পার্বতীকে যেভাবে দেখি, তাতে বলা যায় কালিদাস যথারীতি চরিত্র দু'টির পৌরাণিক রূপ বজায় রেখেছেন। কিন্তু বাংলা কাব্যে মহাদেব-পার্বতী হয়েছেন শিব-দুর্গা এবং লৌকিক আবরণে আবৃত। শিব-দুর্গা হয়ে উঠেছেন সাধারণ এক পরিবারের স্বামী-স্ত্রী, দু'ছেলে দু'টি মেয়ে নিয়ে তাঁদের সংসার। শিব শ্মশানে-মশানে ঘুরে বেড়ান। দরিদ্র রমণীর মতো অনেক কষ্টের মধ্যে দুর্গাকে মুখ বুজে সংসার চালাতে হয়— যেমন দেখা যায় গ্রামীণ দরিদ্র গৃহবধূদের। তাদের কষ্টের সীমা নেই। তবে তারই মধ্যে বৎসরান্তে ছেলেমেয়েদের নিয়ে দিন চারেকের জন্যে বাপের বাড়ি যান দুর্গা, ঐ ক'টা দিন তাদের ভাগ্যে ভালোমন্দ খাওয়া জোটে। একটাই দুর্ভোগ— দিনরাত কানের কাছে মাইক্রোফোনে অমায়িকভাবে হিন্দী গান শুনে কান ঝালাপালা হয়ে যায়। বাঙালীর কল্পনায় পৌরাণিক দুর্গা পুরোপুরি বাঙালী পরিবার গিন্নী রূপে ধরা দিয়েছেন। পৌরাণিক কাহিনীর এই লৌকিক রূপান্তর তারিফ করার মতো।

উনিশ শতকের গোড়ায় ও তার পরেও কলকাতা তথা বাংলার পল্লী অঞ্চলে কবিগান ও যাত্রা রীতিমতো জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। কবিগানের উদ্দেশ্য ছিল টুকরো টুকরো চটুল গানের ভিতর দিয়ে পৌরাণিক দেব-দেবীর কথা প্রচার করা। কিন্তু সেইসব গানের ভাষা ছিল কদর্য ও অশ্লীল। আগাপাশতলা লৌকিক ইতরতায় পরিপূর্ণ। ফলে, দেবতাদের দেবত্ব উধাও হয়ে যেতে সময় লাগত না। কবিগানের সবচেয়ে জমজমাট বিষয়বস্তু ছিল রাধা-কৃষ্ণের প্রেমঘটিত কাহিনী। এর বাইরে এক সময় যাত্রায় বিদ্যা-সুন্দরের কাহিনীও শ্রোতারা চুটিয়ে উপভোগ করতেন। এই কাহিনীর অন্যতম চরিত্র প্রবীণা মালিনী। সে বিদ্যা ও সুন্দরের মাঝে থেকে খবর চালাচালি করত। অনেকটা ক্যুরিয়র সার্ভিসের মতো। সুন্দর একদিন মালিনীকে বলেছিল, মাসি তোমার এত বয়স হয়েছে, কিন্তু রস তো যায়নি। উত্তরে মালিনী মাসি বলেছে, "মরিচ যতই পাকে তত হয় ঝাল।" মোক্ষম উত্তর। তাছাড়া, সেই সময় কেষ্ট যাত্রা সর্বত্র সাড়া ফেলে দিয়েছিল। গ্রামে-গঞ্জে সেই যাত্রা শোনবার জন্যে ভিড় উপচে পড়তো। রাধা-কৃষ্ণের নৌকা-বিলাস ছিল দেখার মতো। বলা বাহুল্য, লোকরঞ্জনের জন্যে যাত্রাওলারা যার-পর-নাই আদিরসাত্মক দৃশ্যাবলী জুড়ে দিতেন যাত্রার কাহিনীতে। সেকালের কেষ্ট যাত্রা ছিল পৌরাণিকতার শ্রেষ্ঠ লৌকিক রূপান্তর।

পৌরাণিক কাহিনীর আরো এক লৌকিক রূপান্তরের দৃষ্টান্ত ব্রত কথা। ব্রতকথারও উপজীব্য দেবদেবীর মহিমা প্রচার করা এবং তার জন্যে যেসব কাহিনী প্রচলিত তার সবই লৌকিক কথা। সাধারণত শিব দুর্গা লক্ষ্মীর মতো দেব-দেবীদের নিয়েই ব্রতকথা

রচিত হয়ে থাকে। যাঁরা ব্রতকথা শোনেন তাঁরা প্রায় সকলেই স্ত্রীলোক এবং তাঁরা যে অশিক্ষিত সমাজের তা না বললেও চলে। বলা বাহুল্য ব্রতকথা পৌরাণিক দেব-দেবীর কথা হলেও তার মধ্যে সামান্যতম পৌরাণিকত্ব থাকে না, তা আগাগোড়া লৌকিক কথা।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে— এখনো গ্রামাঞ্চলে শিবের ব্রতকথা মেয়েদের কাছে খুবই প্রিয়। শিবলিঙ্গের প্রতি মেয়েদের একটা বিশেষ দুর্বলতা আছে। শিবলিঙ্গ যে নরনারীর যৌনমিলনের প্রতীক তা অবশ্য অনেকেরই জানা নেই। শিব ঠাকুর বা শিবলিঙ্গের ভক্ত নয় এমন মেয়ে দুর্লভ। মেয়েদের জেনে রাখা ভালো— দেবাদিদেব মহাদেবই শিবলিঙ্গ রূপে রূপান্তরিত হয়েছে। এও এক পৌরাণিক দেবতার মেটামরফোসিসের উদাহরণ।

পৌরাণিক থেকে লৌকিক কাহিনীতে রূপান্তরের একটা ভালো জায়গা হচ্ছে উনিশ শতকের কলকাতায় ইতালীয় অপেরার অনুসরণে উদ্ভূত গীতিনাট্যগুলি। গীতিনাট্যের প্রধান উপাদান গান। সম্ভবত তার আকর্ষণেই গীতিনাট্য অভিনয় তখন উল্লেখযোগ্যভাবে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। লক্ষ্য করার বিষয় এই যে সমকালীন দর্শকের বা শ্রোতার রুচি গভীরভাবে নাট্যাভিনয়কে নিয়ন্ত্রিত ও প্রভাবিত করে। কবিগান বা যাত্রার মতো গীতিনাট্যের একটা বড় অংশ পৌরাণিক কাহিনী বা বিষয়বস্তু অবলম্বনে রচিত হয়েছে। তফাৎ হচ্ছে কবিগান বা যাত্রার দর্শক-শ্রোতারা ছিলেন অতি সাধারণ লোক-সমাজের। অন্যদিকে কলকাতার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত গীতিনাট্যের দর্শক— শ্রোতারা ছিলেন শিক্ষিত—পরিশীলিত সম্প্রদায়ের। ফলে, গীতিনাট্যে যেসব পৌরাণিক কাহিনী এবং চরিত্র পরিবেশিত হয়েছিল তার একটা মান নির্ধারিত ছিল, এমনকি লৌকিক রূপান্তরেও গীতিনাট্যের কাহিনী চরিত্র এবং গান শালীনতার সীমা ছাড়ায়নি। অর্থাৎ পৌরাণিককে লৌকিক স্তরে রূপান্তরিত করেও গীতিনাট্যের মৌল উপাদান গানগুলি বেশ উপভোগ্য ছিল। তার কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরা গেল।

১ বৃন্দে। কেন হে নাগর, রায়
বাঁশরিটি ধরে সুমধুর স্বরে
ডাকিতেছ শ্রীরাধায়।
ফুলের কামিনী, রাধা বিনোদিনী
মরে গুরু গঞ্জনায়।

২ ললিতা। ওহে শ্যাম এ তোমার ব্যাভার কেমন,
রাধা হলে কেন ডাক যখন তখন

কৃষ্ণ। সখি! কি দোষ আমার
রাধা নামে সাধা বাঁশি বাজে অনিবার।
সখি সদা মনে করি বাজায় না নাম ধরি

এমন নিলাজ বাঁশি সজনি,
না বাজালে তবু বাজে অমনি!

৩। রুক্মিনী। কেন কর ছলনা
সদা মগন কার ভাবে নাথ বল না।
কেন হে চাতুরী
বারবার পাইয়ে ললনা।

৪। আক্কুটে সব আগেই খেলে,
রোপটে বেড়াইবাদাড় পানে।
দাঁটার জোরে বাগাই বাগা,
বাঁশির শরে বন হরিণে।
তীর কানটায় মারি হাতী
খোঁচায় ভঁইস বরা গাঁথি
(ধরি) সাতনালায় পাথ্ গহন বনে।

৫। প্রথম যোগিনী। আমার যেমনি বেণী, তেমনি রবে চুল ভেজাব না।
দ্বিতীয়। আমি খুব ডুব দেব সই
তোর সলা তো শুনব না।।
তৃতীয়। আমি জল ছেটাব, ছড়াব
তোদের গায়ে দেব,
প্র-দ্বি। আমরা তবে চলে যাব, জলে নাবো না,
সকলে। আর ভাই সাঁতারে সাঁতারে
এপারে ওপারে করি আনাগোনা।

অনেকগুলি গীতিনাট্যের বিষয়বস্তু কৃষ্ণলীলা। এখানে সেইরকম গীতিনাট্য থেকেই গানগুলি নেওয়া হয়েছে। পৌরাণিক সেমিজে গা ঢেকে গীতিনাট্যের কাহিনী প্রকৃতপক্ষে এক একটি লৌকিক রূপান্তর। উদধৃত গানগুলি তারই নিদর্শন। এবং আদিরসাত্মক এইসব গান বেশ সরস ও উপভোগ্য।

আসলে, পৌরাণিক কাহিনী ও বিষয়বস্তু অনিবার্য কারণেই লৌকিক রূপান্তর পরিগ্রহ করেছে। কালের বা সময়েব অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সব কিছুরই পরিবর্তন ঘটেছে বা ঘটে চলেছে। এ ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। শেষ করার আগে পৌরাণিক কাহিনীর লৌকিক রূপান্তর নিয়ে আলোচনায় শিব ঠাকুরের কাছে আবার ফিরে যেতে হচ্ছে। বুড়ো বয়য়ে শিবের বিয়ে করার সখ হয়েছে। পাত্রী গৌরী—। এদিকে শিব সারাটা দিন কাটায় গাঁজায় দম দিয়ে ও ভাং খেয়ে। নন্দী-ভৃঙ্গীকে সঙ্গে নিয়ে বিয়ে করতে যাবার আগে শিব যদি কিঞ্চিৎ নেশা করে থাকেন, তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না। সেই অবস্থায় কোমরের কাপড় সম্ভবত টাইট হ'য়ে বসেনি। সেই অবস্থায় বিয়ের

আসরে ষোড়শী সুন্দরী গৌরীকে দেখে বুড়ো শিবের আদিখ্যেতার আর সীমা রইল না, মাথা ঘুরে গেল। সুন্দরী যুবতী মেয়েকে দেখলে সব পুরুষের যা' হয়। এক ঘর মেয়েদের সামনে সেই অবস্থায় শিবের কোমরের কাপড় পপাত ধরণীতল। ঐরকম একটা ক্রিটিক্যাল পরিস্থিতিতে গৌরীর এক বান্ধবী আক্ষেপ করেছে এই বলে—

এ্যাই এ্যাই এ্যাই ঐ বুড়া কি
এই গৌরীর বব লো,
বিয়ার বেলা সবার মাঝে
হৈল দিগম্বর লো।

দিগম্বর না হয়ে বুড়ো শিবের উপায় ছিল না। সে তো তখন পুরাণ কথিত দেবাদিদেব শিব ছিল না— সে ছিল এক গ্রাম্য বাঙালী বুড়ো। আর, কে না জানে— বুড়ো বয়সে ভিমরতি হয়। শিবেরও হয়েছিল। নইলে, বুড়ো বয়সে কেউ বিয়ে করে। তবে, তখন কুলীন বামুনরা বুড়ো বয়সে ঘাটে যাবার আগেও কাজটা সারতেন। বাঙালী এমনিতেই কাছা-খোলা স্বভাবের, বুড়ো হ'লে তো কথাই নেই, বিশেযত যদি নেশা-ভাঙের অভ্যেস থাকে। শিবের সেই দশাই হয়েছিল। কাজেই দিগম্বর হওয়ার ব্যাপারটা তার হাতে ছিল না। মোদ্দা কথাটা এই যে হর-গৌরীর বিয়ের এমন সরস বর্ণনা একমাত্র লৌকিক সৃষ্টিতেই সম্ভব। দেখা যাচ্ছে, শিবের বিয়ে লৌকিক কাহিনীর কাছে তৎসংক্রান্ত, পৌরাণিক কাহিনী ডাহা ফেল করেছে। বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা লাভের এমন উদাহরণ আর কোথায় আছে? পৌরাণিক কাহিনীর এমন লৌকিক মেটামরফোসিস আর কোথাও নেই।

বাইবেলের লোককথা

সুরঞ্জন মিদ্দে

গ্রীকশব্দ বিব্লস থেকে বাইবেল' শব্দটি এসেছে। যার প্রকৃত মানে হচ্ছে প্যাপিরাস গাছের মজ্জার ওপরেরছাল বিশেষ। 'বাইবেল' শব্দটির সাধারণ অর্থ হচ্ছে বই। একটি বই নয় একগুচ্ছ বই-এর সমাহার। মোট ৬৬টি বই-এর সংকলন হচ্ছে বাইবেল। বাইবেলের দুটি ভাগ। প্রথমটি ওল্ড টেস্টামেণ্ট আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে নিউ টেস্টামেণ্ট। আর এই 'টেস্টামেণ্ট' শব্দটি এসেছে ল্যাটিন টেস্টামেণ্টাম শব্দ থেকে। যার প্রকৃত অর্থ চুক্তি বা ইচ্ছাপত্র। ঈশ্বরেব সঙ্গে মানুষের চুক্তি। যা বারবার ইহুদী ধর্মগুরুদের সঙ্গে ঈশ্বরের হয়েছে। ইহুদী জাতির মূল ধর্মগ্রহেব নাম বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেণ্ট যা বর্তমানে খ্রিস্টানদেরও ধর্মগ্রন্থ। বস্তুত ওল্ড টেস্টামেণ্ট দিয়েই খ্রিস্টধর্মের সূচনা। কিন্তু বাইবেলের নিউ টেস্টামেণ্ট কেবলমাত্র খ্রিস্টানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। ওল্ড টেস্টামেণ্টের ভাষা প্রধানত হিব্রু আর নিউ টেস্টামেণ্ট মূলত গ্রীক ভাষায় লিখিত।

লোকসাহিত্যের একটি বিশেষ শাখা হল লোকপুরাণ। বৃহদর্থে লোকপুরাণকে একপ্রকার লোককথা বলা গেলেও তা ধর্মীয় প্রভাব থেকে আলাদা করা যায় না। লোকপুরাণ এক প্রকার কাহিনীর ব্যাপ্তি। যা প্রধানত পৃথিবী ও মানুষের সৃষ্টি কাহিনী কিংবা ধ্বংসের কাহিনী। তাই লোকপুরাণ শাস্ত্রটি উদারভাবে আলোচনা করলে একে 'দ্য সায়েন্স অব এ প্রিসায়েণ্টিফিক এজ' বলা যেতে পারে। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে 'বাইবেল' গ্রন্থকে এক ভিন্ন মাত্রায় বিশ্লেষণ করা চলে।

লোকপুরাণের একটি বিশেষ ভাগ হচ্ছে 'সৃষ্টি ও ধ্বংস বিষয়ক' লোকপুরাণ। আমাদের এই পৃথিবীর সৃষ্টি কীভাবে হল? পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা কে? কীভাবে সৃষ্টি হল মানুষ? মানুষের এই চিরন্তন জিজ্ঞাসার থেকেই সৃষ্টি হয়েছে লোকপুরাণ। 'বাইবেল' এমনই একটি উজ্জ্বল গ্রন্থ যা বিশ্বের সব ভাষা-সাহিত্যকে কম-বেশি আলোকিত করেছে। পৃথিবী ও মানুষের সৃষ্টিকাহিনী আর মৌখিকস্তরে নেই তা বাইবেল স্থিরভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে। বিষয়টি ভারতীয় বিভিন্ন সংস্কৃত গ্রন্থের সঙ্গে তুলনা হতে পারে। বাইবেলের পাশাপাশি বৃহদারণ্যক, উপনিষদ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, মহাভারত প্রভৃতি সমৃদ্ধ গ্রন্থের নাম উল্লিখিত হতে পারে। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের লোকপুরাণ এখনও লিখিত ও স্থায়ীভাবে প্রকাশিত হয়নি। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন,— লিখিত সাহিত্যের বহু আগেই লোকসাহিত্য তথা লোককথার সৃষ্টি। যেজন্য লিখিত বা

অলিখিত সমস্ত লোকপুরাণ গ্রন্থের সূচনাতেই এই জাতীয় সৃষ্টি প্রাধান্য পেয়েছে। লোকপুরাণের বহু কাহিনীই আজ ধ্রুপদী সাহিত্যে নিজের স্থান চিরায়ত করে নিয়েছে। সেদিক থেকে বাইবেলীয় লোককাহিনী এক বিশিষ্টতায় অনন্য হয়ে আছে। বিশেষ করে বাইবেলের সৃষ্টিকাহিনী উল্লেখ্য।

খ্রিস্টের জন্মের চারহাজার বছর আগেই ক্যাসপিয়ান সাগরের পশ্চিম থেকে উত্তর এশিয়া মাইনর, এবং দক্ষিণে মিশর পর্যন্ত বিশাল সীমানায় প্যালেস্টাইন সভ্যতার চূড়ান্ত বিকাশ ঘটেছিল। যার প্রাচীন নাম ছিল 'কনান' সভ্যতা। যা ইহুদীদের সভ্যতা নামে পরিচিত। বাইবেলের ওল্ডটেস্টামেণ্ট যাদের প্রধান পবিত্র ধর্মপুস্তক। ওল্ডটেস্টামেণ্টের অসংখ্য লোককাহিনী সমস্ত বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। তবে একথা আমাদের মানতে হবে বাইবেলের লোককাহিনীগুলি কোন একক জাতির সৃষ্টি নয়। শুধু ইহুদী জাতির একান্ত নিজস্ব সম্পদ নয়। আর এই ইহুদী সভ্যতার সঙ্গে সুমেরীয়, সেমিটীয়, ও মিশরীয় সভ্যতা মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

ইহুদীদের দেশের নাম প্যালেস্টাইন। যার প্রাচীন নাম ছিল 'কনান'। 'কনান' শব্দটি এসেছে সেমিটীয় 'কিনাখ্‌খী' শব্দ থেকে। কনান শব্দটির অর্থ 'লাল পশমের দেশ'। এই নামকরণের মধ্যে বোঝা যায় পশুপালন এদের প্রধান জীবন-জাবিকা ছিল। বাইবেলে 'কনানকে' বিখ্যাত নোয়ার পুত্র হামের বংশধর হিসাবে দেখানো হয়েছে।

ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়। একেশ্বরবাদ বাইবেলের তথা ইহুদী ধর্মের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। পৃথিবীতে একেশ্বরবাদী ধর্মগুলির মধ্যে ইহুদী ধর্ম সব চেয়ে প্রাচীন। সেই সময় অসংখ্য ইহুদী মিশরে নানা কাজে ক্রীতদাসে পরিণত হয়। ১২০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে মোজেসের নেতৃত্বে স্বদেশে ফিরে আসেন। ইহুদীরা আবার জু (jew) নামে পরিচিত। এদের ভাষা হিব্রু। এই হিব্রু শব্দটি ইহুদীপতি আব্রাহামের নাম থেকে উদ্ভূত হয়েছে। তবে এরা প্রথম দিকে যাযাবর ছিল।

বাইবেলের সৃষ্টি কাহিনী এক অনন্য বিশিষ্টতা লাভ করেছে। যেহেতু এই সৃষ্টিকাহিনীর স্থির লিখিত রূপ পাওয়া গেছে—ভবিষ্যতে এই লোকপুরাণের সৃষ্টি কাহিনী অপরিবর্তিতই থাকবে। বাইবেলের বিশ্বসৃষ্টির কাহিনীগুলি হল নিম্নরূপ—

১। পৃথিবীর সৃষ্টির সঙ্গে যাবতীয় উদ্ভিদ ও প্রাণীজগৎ।

২। মানব-মানবীর সৃষ্টি ও তাদের পতন

৩। 'নোয়ার নৌকো' ও বিশ্বব্যাপী ধ্বংসের জলপ্লাবন।

৪। পৃথিবীতে পুনরায় সৃষ্টির সূত্রপাত।

৫। সৃষ্টির ধারা অব্যাহত ও ঈশ্বরীয় কারণে ধ্বংস বন্ধ। এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয়— বাইবেলের সৃষ্টিকাহিনীতে একই সঙ্গে দু-দুটি সৃজনকাহিনী; আবার একই সঙ্গে দু-দুটি ধ্বংসকাহিনী একই বাইবেলের লোকপুরাণের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তাই

স্বাভাবিক ভাবে বাইবেলের এই সৃষ্টিকর্তা ও ধ্বংসলীলা বিশ্বপুরাণের ইতিহাসে এক বিরল নজির সৃষ্টি করেছে। এককথায় বাইবেলের লোককাহিনী অভিনব ও মৌলিকত্বের দাবীদার। আবার বাংলা ভাষায় বাইবেলের লোককথার চর্চা এতই নগণ্য যে, আলোচ্য প্রবন্ধটি পথিকৃতের দাবী করতে পারে। যদিও ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্যে প্রায় দু'শো বছর আগে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। বাইবেলের প্রথম পুস্তকের নাম জেনেসিস বা আদিপুস্তক। সৃষ্টিকাহিনী হচ্ছে বাইবেলের প্রথম পুস্তকের প্রথম অধ্যায়। বাইবেল শুরু হচ্ছে সৃষ্টিকাহিনীতেই। বাইবেল সোসাইটির সর্বশেষ বাংলা সংস্করণ থেকে সৃষ্টিকাহিনী সংক্ষিপ্ত আকারে দেওয়া হল—

১। ঈশ্বর আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির কাজ আরম্ভ করলেন। ঈশ্বর বললেন, দীপ্তি হোক। দীপ্তির হল আবির্ভাব। অন্ধকার থেকে তিনি দীপ্তিকে পৃথক করলেন। দীপ্তির নাম দিন ও অন্ধকারের নাম রাখলেন রাত্রি। রাত্রি ও দিনের অবসানে সমাপ্ত হল প্রথম দিবস [১]।

২। ঈশ্বর বললেন, সৃষ্ট হোক নভোমণ্ডল, বিভক্ত করুক জলরাশিকে। ঈশ্বর সেই নভোমণ্ডলের নাম রাখলেন আকাশ। রাত্রি ও দিনের অবসান হল। সমাপ্ত হল দ্বিতীয় দিবস।

৩। ঈশ্বর বললেন আকাশের নীচে সমস্ত জলরাশি এক স্থানে সংহত হোক, প্রকাশিত হোক শুষ্ক ভূমি! ঈশ্বর শুষ্ক ভূমির নাম স্থল ও সংহত জলরাশির নাম রাখলেন সমুদ্র। তিনি বললেন, স্থলভূমিতে উৎপন্ন হোক উদ্ভিদ। সমাপ্ত হল তৃতীয় দিবস।

৪। ঈশ্বর বললেন, রাত্রি থেকে দিনকে পৃথক করার জন্য আকাশ মণ্ডলে সৃষ্ট হোক জ্যোতিষ্করাজি। ঈশ্বর দিনে আলো দেবার জন্য সূর্য এবং রাত্রে আলো দেবার জন্য চন্দ্র— এই দুই বৃহৎ জ্যোতিষ্ক এবং নক্ষত্ররাজিও সৃষ্টি করলেন। সমাপ্ত হল চতুর্থ দিবস।

৫। ঈশ্বর বললেন, জলরাশিপূর্ণ হোক নানা জাতির জলচর প্রাণীতে এবং পৃথিবীর উপরে আকাশে উড়ে বেড়াক পক্ষীকুল। তিনি তাদের আশীর্বাদ করে বললেন, তোমরা বংশ বিস্তারকর। সমাপ্ত হল পঞ্চম দিবস।

৬। ঈশ্বর এইভাবে বিভিন্ন জাতির বন্য ও গৃহপালিত পশু এবং বিভিন্ন জাতির ভূচর প্রাণী ও সরীসৃপ সৃষ্টি করলেন। এরপর ঈশ্বর আপন সাদৃশ্যে মানুষ সৃষ্টি করলেন। ঐশ্বরিক সাদৃশ্যে নর ও নারী রূপে তাদের তিনি গড়লেন। সমাপ্ত হল ষষ্ঠ দিবস।

৭। এইভাবে বিশ্বসৃষ্টির কাজ সম্পূর্ণ হল। ঈশ্বর তাঁর আরব্ধ কর্ম সম্পূর্ণ করে সপ্তম দিবসে সকল কর্ম থেকে বিরত হয়ে বিশ্রাম নিলেন। সপ্তম দিবস হল বিশ্রাম দিবস। এই হল আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টিকাহিনী।

বৃহত্তর অর্থে বাইবেলের লোকপুরাণের কাহিনীকে এক প্রকার লোককথা বলাই সঙ্গত। আমাদের আলোচ্য পৃথিবীর সৃষ্টিকাহিনীর উল্লেখযোগ্য মোটিফ বা অভিপ্রায় নির্ণয় করা যেতে পারে।

প্রথম-মোটিফ— Supreme God as Creator । ঈশ্বর যাবতীয় সৃষ্টি করলেন শুধু নিজের ইচ্ছা পূরণের জন্য। ঈশ্বরের বল: সঙ্গে সঙ্গে সেই সমস্ত ইচ্ছা পরিপূর্ণ হল। বাইবেলের পৃথিবী সৃষ্টি কাহিনীতে এই মোটিফ অক্ষরে অক্ষরে সত্য হল। এমনকি এখানে ঈশ্বরের সংলাপ পর্যন্ত উধৃত হয়েছে।

দ্বিতীয়-মোটিফ— Raising the sky । আকাশকে পৃথিবী থেকে আলাদা করা। কেননা প্রথম মানব-মানবীর ধারণা ছিল আকাশ ও পৃথিবী খুবই কাছেই ছিল। পরে মানবের আচরণে আকাশ পৃথিবী থেকে অনেক উপরে উঠে যায়। এই মোটিফটি বাইবেলের কাহিনীকে মনে করিয়ে দেয়।

তৃতীয়-মোটিফ—Man Made from Creator's body । ঈশ্বরের শরীর থেকে মানুষ তৈরি হচ্ছে। বাইবেলের সৃষ্টি কাহিনী কিছু মিল থাকলেও পার্থক্য আছে। কেননা বাইবেলের মানুষ সৃষ্টি হয়েছে ঈশ্বরের আপন প্রতিমূর্তিতে— কিন্তু তা ঈশ্বরের শরীর থেকে নয় মাটি থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন স্বয়ং ঈশ্বর। তবে দুই লোক কাহিনীর মধ্যে ভাবগত একটা সামান্য সাদৃশ্য আছে।

চতুর্থ-মোটিফ— মা থেকে পৃথিবীর প্রথম মানুষের সৃষ্টি। একাহিনী কোরাণ কাহিনীতে আছে। বাইবেলে এই লোককাহিনীর কোন সমর্থন নেই। তার পরিবর্তে ঈশ্বর তাঁর নিজের প্রতিমূর্তিতে মাটি থেকে প্রথম মানুষকে সৃষ্টি করলেন। এই লোককাহিনী বিশেষ স্পষ্টভাবে আছে।

পঞ্চম-মোটিফ— পৃথিবীর প্রথম মানব আদমের বুকের হাড় থেকে পৃথিবীর প্রথম মানবী ঈভের সৃষ্টি। এই মোটিফটি বাইবেল ও কোরাণ সম্মত। উভয় গ্রন্থেই পৃথিবীর প্রথম মানবী সৃষ্টির বিশদ বর্ণনা আছে।

ষষ্ঠ-মোটিফ— ইশ্বরের নিষিদ্ধ ফল খেয়ে স্বর্গচ্যুতি। মোটিফটি বাইবেল ও কোরাণে পাওয়া যায়। তবে কোরাণে এই লোককাহিনীর একটি পরিশিষ্ট আছে। অবশ্য সেজন্য বাইবেলের লোক পুরাণ কাহিনীর কোনো পরিবর্তন হয় নি। এমনকি বৃহত্তর খ্রিস্টান জনসমাজেও কোনো প্রভাব পড়েনি।

সপ্তম মোটিফ— পৃথিবীর প্রথম মানব-মানবী ইচ্ছামত যা চাইতো তাই পেত। তারপর ঈশ্বরের অভিশাপে তাদের পরিশ্রম করে বাঁচতে হবে। এই মোটিফটি বাইবেলে আছে। কেননা পৃথিবীর প্রথম মানব-মানবী আদম ও ইভ ঈশ্বরের স্বর্গোদ্যানে বাস করেছিল।

এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয়, বাইবেলের এই লোকপুরাণ লোককথাগুলি যে

অঞ্চলেই সৃষ্টি হোক না কেন, ভারতবর্ষের কয়েকটি আদিবাসী লোককথায় এই লোককাহিনী প্রচলিত আছে। সেই সাদৃশ্য আমাদের কাছে চরম বিস্ময় জাগায়!

সৃষ্টির পর আসে ধ্বংস। তা অনিবার্য নিয়ম মেনেই আসে। বাইবেলের মহা জলপ্লাবন ঈশ্বরের সেই ধ্বংস কাহিনী হয়েও পুনরায় সৃষ্টিকেই আলোকিত আড়োলিত করে। সাধক নোয়া ও তার মহাজলপ্লাবন লোকপুরাণ কাহিনী বাইবেলের একটি প্রধান ঘটনা। 'নোয়ার নৌকা' নিয়ে পৃথিবীতে আজও বিতর্কের শেষ হয়নি। সেই সঙ্গে বিশ্বব্যাপী এই মহাবন্যার প্রভাব সুদূরপ্রসারী হয়েছে। পৃথিবীতে যে একটি মহাপ্লাবন হয়েছিল— পৃথিবীর পণ্ডিতেরা সে বিষয়ে একমত। এখানে একটা কথা আমাদের মনে রাখতে হবে; বাইবেলের মতো মহাগ্রন্থের সৃষ্টি হয়েছিল দীর্ঘকাল ধরে। 'নোয়ার নৌকা' ও জলমহাপ্লাবনের ধ্বংস কাহিনী বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টের প্রথম গ্রন্থ জেনেসিসের বিষয় হলেও নিউ টেস্টামেন্টেও তার প্রতিফলন দেখা যায়। বিশেষ করে বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্টের যিশুর বাণীতে এবং গসপেল সাধকদের বিবরণীতে পাওয়া গেছে। বাইবেলের বিখ্যাত মহাপ্লাবন সম্পর্কে থিয়োলজিয়ানদের ভাবনাগুলি আলোচনা করে দেখা যেতে পারে।—

১। মহাবন্যার ঘটনা পাপে ভরা মানুষকে সমূলে ধ্বংসকরা। সেই সঙ্গে মহাধ্বংসের পর নতুন করে সুন্দর সৃষ্টি হয়।

২ যিশু খ্রিষ্টের দ্বিতীয় আগমন ও মহাবিচার অনুষঙ্গে এই মহাপ্লাবনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তবে সর্বত্রই এই লোকপুরাণকে দেখানো হয়েছে ঈশ্বরের অলৌকিক ক্ষমতা প্রকাশরূপে।

বাইবেলের এই মহাপ্রলয় খ্রিস্টানদের মতে বিশ্বব্যাপী ব্যাপ্ত হয়েছিল। সমস্ত পৃথিবীতে ত বটেই পর্বতের উঁচু চূড়াতেও জল পৌঁছে গিয়েছিল। যেহেতু সমগ্র সৃষ্টি জলমগ্ন হবে, তাই নোযাকে ঈশ্বর আগে থেকেই বিশেষ নির্দেশ দিয়েছিলেন। সবচেয়ে পরম আশ্চর্যের কথা— পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি প্রাচীন লোকপুরাণে এই মহা জলপ্লাবনেরকাহিনী উল্লিখিত হয়েছে। বাইবেলে বর্ণিত মহাপ্লাবনের ঘটনাটি নিম্নরূপে দেওয়া হল—

১। ঈশ্বর নোয়াকে বললেন, মানুষের পাপে পৃথিবী পরিপূর্ণ। আমি সকল প্রাণীকে ধ্বংস করব। তুমি নোয়ার কাঠের একটা জাহাজ তৈরি কর। জাহাজটি হবে তিনশো হাত লম্বা। পঞ্চাশ হাত চওড়া এবং ত্রিশ হাত উঁচু। পৃথিবীতে আমি জল প্লাবন আনব আর তার ফলে পৃথিবীর সকল প্রাণী মৃত্যুমুখে পতিত হবে। কিন্তু তোমার সঙ্গে আমি এক সম্বন্ধ-স্থাপন করব। তুমি নিজের স্ত্রী, পুত্র ও পুত্র বধূদের সঙ্গে নিয়ে জাহাজে প্রবেশ করবে। আর সেই সঙ্গে সমস্ত জাতের জীব-জন্তুর মধ্য থেকে স্ত্রী ও পুরুষ এক এক জোড়া সংগ্রহ করে তাদের প্রাণ রক্ষার জন্য নিজের সঙ্গে জাহাজে নেবে। নোয়া ঈশ্বরের নির্দেশ অনুযায়ী সব কাজই করলেন।

২। নোয়ার ছয়শো বছর বয়সে দ্বিতীয় চান্দ্রমাসের সতেরো দিনের দিন মহা জলধির সমস্ত উৎস খুলে গেল এবং আকাশের বাতায়নগুলি উন্মুক্ত হল। আর চল্লিশ দিন ও চল্লিশ রাত ধরে পৃথিবীতে অবিরত বৃষ্টিপাত হতে লাগল। পৃথিবী থেকে তারা সকলেই লুপ্ত হল, কেবল নোয়া এবং জাহাজে তাঁর সঙ্গে যারা ছিল তারাই প্রাণে বাঁচল।

৩। সারা পৃথিবী বন্যার জলে একশো পঞ্চাশ দিন প্লাবিত হয়ে রইল। তারপর একশো পঞ্চাশ দিন পরে জলরাশি অপসৃত হল। সপ্তম চান্দ্রমাসের সতেরো দিনের দিন জাহাজটি এসে অরারট পর্বতের উপরে থামল। দশম মাস পর্যন্ত জল ক্রমশ হ্রাস পেতে লাগল। এরপর আরও চল্লিশ দিন পর নোয়া তাঁর তৈরি জাহাজের জানালা খুলে দাঁড় কাক ছেড়ে দিলেন। এরপর নোয়া একটি কপোত ছেড়ে দিলেন। সারা পৃথিবী জলমগ্ন থাকায় কপোতটি ফিরে এল। সাতদিন পর আবার কপোতটি ছেড়ে দিলেন। সন্ধ্যা বেলায় কপোতটি ঠোঁটে জলপাই গাছের একটি কচি পাতা নিয়ে ফিরে এল। তিনি আরও সাতদিন পর কপোতটিকে ছেড়ে দিলেন। কিন্তু এবার সেটি আর ফিরে এল না।

নোয়ার ছয়শো এক বছর বয়সে প্রথম মাসের প্রথম দিনে পৃথিবীর উপরের জল শুকিয়ে গেল। নোয়া জাহাজের ছাদ খুলে বাইরে চেয়ে দেখলেন ধরাতল শুষ্ক হয়েছে। দ্বিতীয় মাসের সাতাশ দিনের দিন পৃথিবী সম্পূর্ণ শুষ্ক হল।

এখন আমাদের প্রশ্ন মহা জল প্লাবন যদি নিতান্তই স্থানিক ঘটনা হয়, তবে পৃথিবী প্রায় সমস্ত লোকপুরাণে এই কাহিনী সংযুক্ত হল কী করে? লোককাহিনীর পরিযায়ী বৃত্তির কথা এখানে প্রয়োগ করা যায় সহজেই। লোকপুরাণ সৃষ্টিকারী কিম্বদন্তী অনুসারে কাহিনীর মালা তৈরি করে আনন্দ পায়। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান চুলচেরা বিশ্লেষণে এগিয়ে যায়। হয়তো সুমেরু দেশের সঞ্চিত বরফ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল। কেননা বরফের নীচে প্রাচীন কালের বহু প্রাণীর ফসিল পাওয়া গেছে। নৃতাত্ত্বিকরা অনুসন্ধান চালান— নোয়ার মৃত্যুর পর তার তিনপুত্র হ্যান, শেম্ ও জাফেৎ পৃথিবীর নানা স্থানে বসতি স্থাপনে উদ্যোগী হন। নোয়াও নিজে সুদীর্ঘ জীবনের অধিকারী ছিলেন। কিম্বদন্তী অনুসারে প্রচলিত আছে নোয়ার একপুত্র ভারতে এসেছিলেন।

পৃথিবীর নানা দেশের পুরাকাহিনী পাঠ করলে জানা যায় নোয়ার জলপ্লাবনের কাহিনীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য দেখা যাচ্ছে। তাই বাইবেলের 'নোয়ার নৌকা' কাহিনী তুলনামূলক লোকসাহিত্যে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সেজন্য বাইবেলের জলপ্লাবন কাহিনী পৃথিবীর বহু দেশের লোকসাহিত্যে স্থায়ী আসন করে নিয়েছে। বাইবেল পুরাণের সৃষ্টি তত্ত্ব অন্য সমস্ত সৃষ্টি কাহিনী থেকে অভিনব। শুধু অভিনবই নয় পরিণত মনস্কতার

পরিচয় আছে। আছে বিশিষ্টতা। যা আজকের আধুনিক মননে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য হয়েছে। যেমন—

১। পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্টির জন্য মাত্র একটি সপ্তাহ ব্যয়িত হয়েছে। এই পরিকল্পনা পরিণত মনস্কতার পরিচয়। যা আজকের দিনেও বিদ্যমান।

২। মাটি থেকে মানুষের সৃষ্টি হয়েছে। মানুষের শরীরে যে মাটি আছে— তা আজ প্রমাণিত। এই প্রসঙ্গে 'ক্ষিতি-অপ-তেজ-মরুৎ-বোম' কথাটি বিশেষভাবে স্মরণীয়। অন্যান্য লোকপুরাণে মানব সৃষ্টি ততটা বিজ্ঞান সম্মত নয়।

৩। 'জ্ঞান বৃক্ষের ফল' বাইবেলের এক উল্লেখযোগ্য কাহিনী। পৃথিবীর কোন লোকপুরাণে এই ধরনের কাল্পনিক বৃক্ষের উল্লেখ হয়নি। এটি সম্পূর্ণ রূপক কাহিনী। আধুনিক গবেষকেরা মানবজীবন নাট্যের অতিরিক্ত মাত্রা পেয়ে যাচ্ছেন।

৪। সর্প-ঈভ (পৃথিবীর প্রথম মানবী) কাহিনীটি বেশ উপভোগ্য ও নাটকীয়। বাইবেল ছাড়া আর কোনো লোকপুরাণে এই কাহিনী নেই। মূল কাহিনীতে পৃথিবীর প্রথম মানব অপেক্ষা সর্প নায়ক হয়ে উঠেছে। মহাকবিমিলটনের 'প্যারাডাইস লস্ট' মহাকাব্যে শয়তান বা সর্পের নায়ক হয়ে যাবার কাহিনী আলোচিত হয়েছে।

৫। বাইবেলের অভিশাপ বৃত্তান্ত— পৃথিবীর অন্যান্য লোকপুরাণে অবশ্যই আছে। পৃথিবীর প্রথম মানব-মানবী ও সর্পের (শয়তান) প্রতি ঈশ্বরের অভিশাপ— এই কাহিনীকে নাট্য ক্লাইম্যাক্সের পরিণতি দান করেছে। তাছাড়া এটা বলা হয়— এই অভিশাপ কঠোর হলেও মানব জাতির জীবনে প্রয়োজন ছিল। 'পুরস্কার ও শাস্তি' আধুনিক জীবনের চলার পথের পাথেয়।

সর্বোপরি, বলা যেতে পারে— বাইবেলের সৃষ্টির লোকপুরাণ কাহিনী আসলে একটি উৎকৃষ্ট ছোটগল্পের বিন্যাসে সজ্জিত হয়ে গেছে। একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে নির্দিষ্ট লক্ষ্যকে সার্থক করেছে। তার লিখিত রূপই ধ্রুপদীর মান্যতা দিয়েছে।

বাইবেলের প্রধান দুটি লোকপুরাণ কাহিনী সাহিত্যকে প্রভাবিত করেছে। প্রথমটি াদম-ঈভ কাহিনী আর দ্বিতীয়টি হল নোয়ার নৌকা ও মহাজলপ্লাবন। প্রথম লোকপুরাণটি ইংরাজি সাহিত্যে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। সেই অর্থে দ্বিতীয় লোকপুরাণটি কাব্যের উপেক্ষিতা বলা যায়। ১৬৬৭ খ্রিষ্টাব্দে মহাকবি জন মিলটনের 'প্যারাডাইস লস্ট' মহকাব্যে অমরত্ব লাভ করেছে। বাংলা ভাষায় ইংরাজি সাহিত্যের অনুবাদে সর্বাপেক্ষা জমপ্রিয়তা লাভ করেছিল মিলটনের 'স্বর্গভ্রষ্ট' কাব্যটি। 'স্বরগ বিচ্যুতি', 'সুখদ-উদ্যান ভ্রষ্ট কাব্য', 'সুখধাম বিলাসকাব্য', স্বর্গ হইতে মানুষের বিদায়' নামে বিগত দু'শো বছরে বাংলাভাষায় চর্চিত হয়েছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতের তপোবন শিক্ষাব্যবস্থা প্রসঙ্গে 'প্যারাডাইস লস্টের' উল্লেখ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ বরং মিলটনের সমালোচনাই করেছেন। সেই বিশ্লেষণ অভিনব মাত্রাও পেয়েছে।

আর 'নোয়ার নৌকা' প্রবাদ রূপেও গৃহীত হয়েছে। কখনো গল্পের রূপকের আড়ালে, কখনোও বা উপন্যাসের বিষয়ে। ১৩৮০ বঙ্গাব্দে গোলাম সামদানী কোরায়শী রচিত 'জলপ্লাবন' উপন্যাসটি বাংলা সাহিত্যে দিক চিহ্ন হয়ে আছে।

এই লোকপুরাণগুলি ছাড়া অসংখ্য লোককাহিনী বাইবেলের ওল্ডটেস্টামেণ্টে ছড়িয়ে আছে। যেমন নোজেসের জন্মকথা, ইহুদীদের মিশর ত্যাগের কাহিনী, বিখ্যাত আর্ক সংক্রান্ত কাহিনী, সেই সময়েব ইতিহাস চিত্র, প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস ও সংস্কার, লোককাহিনী একমাত্র বাইবেলের মাধ্যমেই আমাদের কাছে সবচেয়ে সঠিকভাবে এসেছে। পৃথিবীর বহু সভ্যতা বন্যার বিধ্বংসী প্লাবনে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। যতদিন বন্যা প্লাবন থাকে, ততদিন নোয়ার নৌকাও থাকবে। তাই এই লোককথাটি পৃথিবী সৃষ্টির উপাখ্যান অপেক্ষাও দীর্ঘজীবী হবে ও বারে বারে তার শিষ্ট ও মৌখিক সাহিত্যে প্রতিফলিত হবে।

উৎস :

* পবিত্র বাইবেল— ভারতের বাইবেল সোসাইটি-- বাঙ্গালোর।

* বাইবেলের দেশ— ডেনিস ব্যালি-- অনুবাদ সুবোধ বিকাশ দত্ত— কলকাতা।

* 'বাইবেল ও লোকপুরাণ'— প্রদীপ্ত সেন—লোকপুরাণ ও সংস্কৃতি— সম্পাদক— পল্লব সেনগুপ্ত— ১৯৮২।

*বাইবেল যুগে যুগে— দীপ্তিপ্রকাশ মণ্ডল— স্কটিশ চার্চ স্কুল।

* লোক সাহিত্য ও খ্রীস্টজন সমাজ— শ্রীহর্ষ মল্লিক—পুস্তক বিপণি।

লেখক পরিচিতি

অচিন্ত্যকুমার গঙ্গোপাধ্যায়—অধ্যাপক ডোমকল কলেজ, লোকসংস্কৃতির গবেষক।

অতসী নন্দ গোস্বামী—লোকসংস্কৃতির গবেষিকা।

ড. অনির্বাণ মান্না—অধ্যাপক শালতোড়া মহাবিদ্যালয়, বাঁকুড়া, লোকসংস্কৃতির গবেষক।

অনুপম দে—গবেষক।

ড. অমিতা মণ্ডল—লোকসংস্কৃতির গবেষিকা।

ড. এস. এম. আবুদায়েন—সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ।

ড. কোয়েল চক্রবর্তী—অধ্যাপিকা, আচার্য গিরিশচন্দ্র বসু কলেজ, গবেষিকা।

ড. গোকুলানন্দ মিশ্র—প্রবীণ শিক্ষাব্রতী, অধ্যাপনা থেকে অবসর নিয়েছেন। একনিষ্ঠ গবেষক।

চূড়ামণি হাটি—কবি, প্রাবন্ধিক এবং লোকসংস্কৃতির গবেষক।

জয়ন্ত বিশ্বাস—নূর মহম্মদ স্মৃতি মহাবিদ্যালয়ে অধ্যাপনারত, গবেষক।

ড. তপনকুমার বিশ্বাস—বিভাগীয় প্রধান, লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়; গবেষক, লোকসংস্কৃতি বিষয়ক একাধিক গ্রন্থের রচয়িতা।

ড. তিমিরবরণ চক্রবর্তী—প্রফেসর, আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়; প্রতিষ্ঠিত লোকসংস্কৃতিবিদ, বহু উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের রচয়িতা।

ড. তুলিকা মজুমদার—লোকসংস্কৃতির একনিষ্ঠ গবেষিকা। একাধিক গ্রন্থের রচয়িত্রী।

ড. দিব্যজ্যোতি মজুমদার—প্রবীণ লোকসংস্কৃতিবিদ এবং গবেষক, লোককথা চর্চায় নিবেদিত প্রাণ। বহু গ্রন্থের রচয়িতা।

ড. দিলীপকুমার রায়—পেশায় অধ্যাপক, আলিপুরদুয়ার কলেজে কর্মরত, প্রতিষ্ঠিত গবেষক, অনেকগুলি গ্রন্থের রচয়িতা।

ড. দীপককুমার বড় পণ্ডা—লোকসংস্কৃতির একনিষ্ঠ গবেষক।

দেবতুষি মিশ্র চৌধুরী—গবেষিকা।

ড. দেবলীনা দেবনাথ—কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকসংস্কৃতি বিভাগের সঙ্গে অধ্যাপনার সূত্রে যুক্ত। লোকসংস্কৃতির গবেষিকা।

দেবাশীষ রায়—গবেষক।

ননীগোপাল মালো—গবেষক।

নারায়ণ হালদার—রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনারত, গবেষক।

ড. পার্থসারথি হাটী—খাতরা আদিবাসী মহাবিদ্যালয়ে অধ্যাপনারত, লোকসংস্কৃতির গবেষক।

পীযূষ মণ্ডল—অধ্যাপক শ্রীপৎসিং কলেজ, গবেষক।

ড. প্রণয়কুমার কুণ্ডু—উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেসর পদে আসীন ছিলেন। বিদগ্ধ সমালোচক ও সুপ্রতিষ্ঠিত লেখক।

ড. প্রদ্যোত ঘোষ—প্রবীণ লোকসংস্কৃতিবিদ। বহুগ্রন্থের রচয়িতা।

প্রমোদ নাথ—উত্তরবঙ্গের জনজাতি সংস্কৃতি চর্চায় নিবেদিত প্রাণ। বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের রচয়িতা।

ড. বরুণকুমার চক্রবর্তী—ভূতপূর্ব বিভাগীয় প্রধান, লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়।

বাবুল চট্টোপাধ্যায়—কবি, প্রাবন্ধিক, গবেষক।

ড. বিকাশ পাল—সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজে অধাপনারত, গবেষক।

ড. বিজনকুমার মণ্ডল—কিউরেটার, গুরুসদয় মিউজিয়াম, প্রতিষ্ঠিত গবেষক।

ড. বিমলেন্দু মজুমদার—জনজাতির সংস্কৃতি চর্চায় নিবেদিত প্রাণ। বেশ কয়েকটি মূল্যবান গবেষণা গ্রন্থের রচয়িতা।

ড. বিশ্বজিৎ রায়চৌধুরী—কর্মসূত্রে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত। লোকসংস্কৃতির গবেষক।

ব্যাসদেব ঘোষ—গবেষক।

ড. মাধুরী সরকার—লোকসংস্কৃতির প্রতিষ্ঠিত গবেষিকা, বেশ কয়েকটি গ্রন্থের রচয়িতা।

মামুদ শাম্স আল্দীন সুমন—বাংলাদেশ উত্তরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে অধ্যাপনা সূত্রে যুক্ত। লোকসংস্কৃতির গবেষক।

ড. মুহম্মদ আবদুল জলিল—রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোকলোর বিভাগেব সাবেক চেয়ারম্যান। প্রতিষ্ঠিত লোকসংস্কৃতিবিদ ও বহু গ্রন্থের রচয়িতা।

ড. মোহাম্মদ আখতার হোসেন—সহযোগী অধ্যাপক, ফোকলোর বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন—সহকারী অধ্যাপক, ফোকলোর বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

ড রতনকুমার নন্দী—নৈহাটি ঋষি বঙ্কিম কলেজে অধ্যাপনা করতেন। বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত। একনিষ্ঠ লোকসংস্কৃতির গবেষক।

রত্না রশীদ—প্রতিষ্ঠিত গবেষিকা। কয়েকখানি লোকসংস্কৃতি গ্রন্থের রচয়িত্রী।

রাশনা শারমীন—গবেষিকা, বাংলাদেশ।

লীনা চাকী—প্রতিষ্ঠিত লেখিকা, পেশায় সাংবাদিক।

ড. শতঞ্জীব রাহা—প্রফেসর, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, প্রতিষ্ঠিত গবেষক।

ড. শর্মিলা বাগচী—প্রফেসর, ভাগলপুর বিশ্ববিদ্যালয়, বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও গবেষক।

ড. শহীদুর রহমান—রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোকলোর বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান, প্রতিষ্ঠিত লেখক।

ড. শান্তি সিংহ—প্রবীণ শিক্ষাব্রতী, গবেষক, কবি ও সমালোচক, অনেক গ্রন্থের রচয়িতা।

ড. সনৎকুমার নস্কর—প্রফেসর, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রতিষ্ঠিত প্রাবন্ধিক ও গবেষক।

ড. সুবীর কর—প্রাক্তন প্রফেসর, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, প্রতিষ্ঠিত লোকসংস্কৃতিবিদ।

সুব্রত চক্রবর্তী—প্রাবন্ধিক ও সাংবাদিক।

ড. সুব্রতকুমার পাল—অধ্যাপক, রাঁচী বিশ্ববিদ্যালয়, লোকসংস্কৃতির একনিষ্ঠ গবেষক।

ড. সুমহান বন্দ্যোপাধ্যায়—নৃ-বিজ্ঞানী, প্রতিষ্ঠিত গবেষক, 'লৌকিক' পত্রিকার সম্পাদক। নরসিংহ দত্ত কলেজে অধ্যাপনারত।

ড. সুরঞ্জন মিদ্দে—রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনারত, প্রতিষ্ঠিত গবেষক।

সুশান্তকুমার মহাপাত্র—গবেষক ও প্রাবন্ধিক।

সৈকত সিনহা—গবেষক।

ড. সৌমেন দাস—বাগবাজার গার্লস কলেজে অধ্যাপনারত, লোকসংস্কৃতির গবেষক।

স্বপন শর্মা—ত্রিপুরায় কলেজে অধ্যাপনারত, গবেষক।

হরেন ঘোষ—প্রবীণ শিক্ষাব্রতী, উত্তরবঙ্গের জনজাতি চর্চায় নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তিত্ব।

ড. হবিবুর রহমান রাসেল—লোকসংস্কৃতির গবেষক, বাংলাদেশ।